প্রবোধ কুমার সান্যাল রচনাবলী

প্রবোধকুমার সান্যালের

রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

Sanyal, Prabodh Kumar

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
58958
20/11/78
AGARTALA, TRIPURA

S.L = 7123.
REFERENCE

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :

ভবানী মুখোপাধ্যায়/মনীষী বসু

Granthaprakash
Rs - 16.00

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ষোল টাকা

ভূমিকা

'মহাপ্রস্থানের পথে' বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে বর্তমানে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে এই অনন্য সাধারণ গ্রন্থটি দেওয়া হয়েছে। সেই কালে বাঙালী বিদ্বৎ সমাজ এই মহাগ্রন্থের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন একথা আমরা পূর্বে বলেছি।

'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রকাশের পর দীর্ঘ ব্যবধান। ইতিমধ্যে লেখক তাঁর প্রকৃতিগত বৈরাগ্যবশতঃ ঘুরেছেন হিমালয়ের এখানে ওখানে, দুর্গম শিখরে। মৌনী সন্ন্যাসীদের দিব্য জীবন। হিমবাহ থেকে তুষার নদীর উৎপত্তি, কোথায় অপ্সরাদের অবগাহন ক্ষেত্র, কোথায় পুরাকালের বণিকশকটের পথ, কোথায় কোন মায়ালোক—এ সবের সন্ধান করেছেন প্রবোধকুমার নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, পর্যটকের দৃষ্টিতে। প্রবোধকুমার বোধকরি মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন হিমগিরির এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রচনার জন্য। এই পর্যটনের ফলশ্রুতি "দেবতাত্মা হিমালয়", এবং আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে দুটি বিভিন্ন খণ্ডে সেই গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার এক আলোড়ন সৃষ্টি হল। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বয়ং, অবশ্য ইংরাজীতে। তিনি সেদিন অনেক কথার সঙ্গে লিখেছিলেন,

"বিশেষ করে স্বাগত জানাই তাঁকে যিনি শুধু ভৌগোলিকের দৃষ্টিতে হিমালয়কে দেখেন নি, যিনি বন্ধু বলে তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। একদিকে তার আছে সৌন্দর্য ও কাব্য; অন্যদিকে যেমন ভয়-ভীষণতা তেমনি ভাবের প্রশান্ত গাম্ভীর্য। হিমালয়ের এই বিভিন্ন মেজাজ-মর্জির সঙ্গে যাঁরা আপন আপন সুর মেলাতে পারেন, তাঁরাই হিমালয়ের রস গ্রহণে সমর্থ হন। এ গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল আমাদের এই মহান বন্ধু ও সখার সুরে নিজ অন্তরের সুর নিবিড়ভাবে মিলিয়েছেন—এ-তাঁর লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হিমালয় অঞ্চলে তাঁর বহুবার পর্যটনের কথা ভেবে আমি ঈর্ষান্বিত বোধ করি।"

জওহরলাল নিজে ছিলেন হিমালয় প্রেমিক, একবার গ্লেসিয়ারে পা পিছলে তিনি বিপদে পড়েছিলেন—প্রবোধকুমার সম্পর্কে একটি উক্তি তিনি ঠিকই করেছিলেন, "প্রবোধকুমার সান্যাল আমাদের এই মহান বন্ধু ও সখার সুরে নিজ অন্তরের সুর নিবিড় ভাবে মিলিয়েছেন।" সত্যই, 'দেবতাত্মা হিমালয়' পড়তে বসে এই কথাটি বার বার মনে হবে।

'দেবতাত্মা হিমালয়' কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের কাহিনী নয়। এ কাহিনী সমগ্র হিমালয়ের। তিনি বিস্তারিত ভাবে পথ পরিচয় দিয়েছেন সেই সঙ্গে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু কোনো ক্লেশই তিনি সেদিন গ্রাহ্য করেন নি। তিনি এই গ্রন্থ সুরু করেছেন সুইডিশ পর্যটক ও আবিস্কারক সোয়েনহেডিনের উক্তি দিয়ে। সোয়েনহেডিন অনেক দুর্গম অঞ্চলে গেছেন, অনেক পাহাড় পর্বত দেখেছেন, কিন্তু হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। তাঁর কাছে সেদিন হিমালয় দেবভূমি মনে হয়েছিল।

লেখক প্রবোধকুমার কোথাও স্বীকার না করলেও তিনিও হিমালয়কে দেবতাদের আবাসভূমি বলেই গ্রহণ করেছেন। 'দেবতাত্মা হিমালয়' নামকরণেই তার পরিচয়। তিনি অজানার আহ্বানে হিমালয়ে দৌড়েছেন। কিন্তু সত্যই কি হিমালয় তাঁর কাছে অজানা? মনে হয় তা নয়, হিমালয় তাঁর কাছে অতি পরিচিত, তাই এই জীবনে সে ডাক দিয়েছে বারংবার। হিমালয় নিত্য নূতন, তাই সেই হিমালয় তাঁকে আকর্ষণ করেছে।

'দেবতাত্মা হিমালয়' তাই ভ্রমণ কথা নয়, অথচ তার মধ্যে আছে ভ্রমণের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত। 'দেবতাত্মা হিমালয়' যেন হিমালয় পরিচয়। সমগ্র হিমালয়ে ছড়িয়ে আছে অনেক প্রাচীন দেব-দেউল, মন্দির ও বৌদ্ধমঠ। এই হিমালয়ে সংসারবিরাগী সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী, তীর্থপথিক, সত্যসন্ধানী অজস্র মানুষের বাস—লেখক তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন। এই সব নানা শ্রেণীর মানুষের জীবন রহস্যের কিছু অংশ পাওয়া যাবে লেখকের বর্ণনায়।

দীর্ঘকাল ধরে 'দেবতাত্মা হিমালয়' 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—এবং সেই কালে এই রচনা পাঠক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, এই কথাটির উল্লেখ প্রয়োজন। জীবনরসিক লেখক এক আশ্চর্য মোহমুক্ত মন নিয়ে লিখেছেন দেবতাত্মা হিমালয়।

প্রবোধকুমার ১৯২৩-থেকে দেশ পর্যটন সুরু করেছেন। তখন তাঁর কৈশোর সবে অতিক্রান্ত। সেই থেকে তিনি একরকম ঘর ছাড়া মানুষ। নির্জন গৃহকোণ তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি বার বার তাই ছুটে গিয়েছেন দেশ দেশান্তরে।

লেখকের ব্যক্তি জীবনের এই তথ্যটুকু তাঁর সাহিত্য বিচারের একটা প্রয়োজনীয় সূত্র। প্রশ্ন জাগে কিসের অন্বেষণে এই পর্যটন? ঈশ্বর না পরম সত্য! এই প্রশ্ন সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা

যায় পরম সত্যই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। সেই সত্য তাঁর কাছে মানুষের মূর্তি নিয়ে উপস্থিত। মানুষ তাঁর কাছে আনন্দের খনি।

খনি। দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রণার আধার। জীবনের তীর্থযাত্রায় নানা শ্রেণীর নর-নারীর মধ্যেই লেখক সেই পরম সত্যের সন্ধান করেছেন। আর এই কারণেই সুন্দর, অসুন্দর-মানুষের প্রেমের পুলক, আরণ্যিক লালসার উন্মাদনা—ঃ পিছনে যে জীবন যন্ত্রণা তাকে দূর থেকে দূরবীনে তিনি দেখেননি, দেখেছেন কাছ থেকে। তাই তাঁর আঁকা রেখাচিত্র কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখায় সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বর্ণ বাহুল্য নেই। কাব্যিক জৌলুষ নেই। নিরাভরণ আটপৌরে ছবি। চাঁদের আলোর চশমায় নয়, তিনি দেখেছেন মানুষকে 'প্রখর দিনের আলোয়'। তাই তাঁর গল্প উপন্যাসে এত চেনা মানুষের ভীড়।

প্রবোধকুমার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সাহিত্য বিচারক স্বর্গতঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক জায়গায় বলেছেন,

"আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে H. G wells ও G. K. Chesterton ও এই পর্যায়ে পড়েন। ইঁহাদের জীবন কৌতূহলের মধ্যে একটু নির্লিপ্ততা, একটু কল্পনার মায়ালীলা লক্ষ্য করা যায়। জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপপত্তি (theory) লইয়া, সমাজ বিন্যাসের একটা অচিন্তিত পূর্ব রূপ কল্পনার প্রেরণায় ইঁহারা জীবন পর্যালোচনায় অগ্রসর হন। ইঁহারা জীবনকে দেখেন হয়ত সত্যানুগ দৃষ্টিতে। কিন্তু একটু তীর্যক ভঙ্গীতে। জীবনের ভালোমন্দ, হাসি-কান্না, নিয়ম বিশৃঙ্খলা, সব লইয়া ইহার সমগ্রতা হইতে ইহারা রস আহরণ করেন না। জীবনের যতটুকু খণ্ডাংশে ইঁহাদের পূর্বানির্ধারিত মানস কল্পনা সমর্থিত হয়, ততটুকুর প্রতি ইঁহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ।"

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় আরো অনেকখানি অংশ পাঠকদের উপহার দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে হল। প্রবোধকুমার প্রসঙ্গে আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিমত অখণ্ডনীয় মনে করি। তিনি প্রবোধকুমারের জীবন দর্শন অসামান্য কৌশলে প্রকাশ করেছেন।

তাঁর 'নদ-নদী' উপন্যাসটি আর একবার পড়ার সময় এই কথাগুলি মনে জাগল। 'নদ-নদী' প্রবোধকুমারের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশকালের রচনা। এই উপন্যাসের বিষয় বস্তুর মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে তা লক্ষ্য করার মতো। এতাবৎ তিনি যে সব উপন্যাস লিখেছেন 'নদ-নদী'এর বক্তব্য তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিরিশের দশকের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সেই কালের তরুণ-তরুণীর চিন্তাধারায় যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে 'নদ-নদী' তারই একটি

'ডকুমেণ্টারি' বা দলিল। আদর্শনিষ্ঠ নর-নারী বিঘ্ন-বিপদ উপেক্ষা করে অগ্রসর হয়েছে, তাদের লক্ষ্য সম্মুখ পানে। বিচ্ছেদ-মিলনের সমাবেশে কাহিনী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। জনকল্যাণে আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ নতুন যুগের নর-নারী জনকল্যাণের আগ্রহে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দেশ তখনও স্বাধীনতা লাভ করেনি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বের বাঙালী জীবনের এক বাস্তবানুগ কাহিনী 'নদ-নদী'। বীরেশ, নলিনী, অনুশীলাকে হয়ত ১৯৭৪-এর বাংলাদেশে দেখা যাবেনা; কিন্তু এঁরা ছিলেন, বাংলাদেশের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে এমনই নর-নারীর দল। পাথর থেকে মানুষ হওয়ার সাধনায় তারা আকুল। তাই প্রশ্ন ওঠে—একটি মেয়েকে দিনে দিনে আবিষ্কার করা, দিনে দিনে তার চোখে আবিষ্কৃত হওয়ায় কি কোনো আনন্দ নেই। 'নদ-নদী' উপন্যাসে সেই অনাদিকালের আবিষ্কার কাহিনী, মানব-মনের চিরন্তন রহস্য কথাকার প্রবোধকুমার অসামান্য কৌশলে বিবৃত করেছেন।

ছোট গল্পে প্রবোধকুমার যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা-একান্ত ভাবে তাঁর নিজস্ব, তাঁর ছোট গল্পগুলির মধ্যে জীবনের আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে। এইখণ্ডে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্প সংযোজিত হল। এই গল্পগুলি লেখকের ভাষায় "একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ মনোভাবের পরিচয়।" সকল গল্পেরই এই একই ইতিহাস। তারা বিশেষকালের খণ্ডচিত্র। প্রবোধকুমার অল্প কথায় গল্প বলতে অদ্বিতীয়। এই কয়েকটি মাত্র গল্পে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে, পরবর্তী খণ্ডে তাঁর আরও কিছু অতিখ্যাত কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী :

	পৃষ্ঠা
নদ নদী (উপন্যাস)	১—২১১
দেবতাত্মা হিমালয় (ভ্রমণ-কাহিনী)	২১২—৪৫৬
গল্প (দেবতার গ্রাস, স্ফুলিঙ্গ, রুক্মিণী)	৪৫৭—৪৮৮

নদ ও নদী

(উপন্যাস)

(রচনাকাল ১৩৪৫)

উৎসর্গ

শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু-

এক

ফুলশয্যার রাতের দু-একটি কথা স্মরণীয় বৈকি।

সমস্ত ব্যাপারটাই বীরেশের কাছে যেন একটি অবাস্তব কাহিনী—এর আরম্ভ যেমন অহেতুক, পরিণতির চেহারাও তেমন অস্পষ্টতায় ভরা। তবু কাহিনীটা সেই পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ সামাজিক ও পারিবারিক কচকচি, এতে আনন্দ অপেক্ষা দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যস্ততাটাই প্রধান। বীরেশের মনে অসীম ক্লান্তি ও বিরক্তি।

মাসি, মামী আর মাসতুতো ভাইবোনেরাই এই কর্মকাণ্ডের পার্শ্ব চরিত্র, পিতা অধিনায়ক, তিনি কর্মনিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন। তিনি বিপত্নীক এবং একক পুত্রের জনক।

উৎসবের সর্বাঙ্গীণ আনন্দে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ। বিবাহটা আনন্দ-উৎসব, এই যথেষ্ট। উচ্ছ্বাসটা ভিতরে-বাহিরে, আলোয়-সজ্জায়, বাঁশিতে-হাসিতে, আত্মীয়-পরের আনাগোনায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত,—কৃপণতা কোথাও নেই। যদি-বা থাকে সেটা ব্যক্তিগত, লোকলোচনের অন্তরালে। উৎসবের আলোকমায়ার ধাঁধাঁ এড়িয়ে কোনো দিব্যদৃষ্টিই কোনোকালে সেখানে পৌঁছয়নি।

বীরেশের অস্তিত্ব এর মধ্যে কোথাও নেই। সে উপলক্ষ্য, তাকে ঘিরেই বিয়ে। তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হবার প্রয়োজন নেই, তাকে কেন্দ্র ক'রে একটা প্রকাণ্ড উৎসব দাঁড়িয়ে উঠেছে এ কথাটা বড় নয়,—সে ছাড়া আর সমস্তই নির্ভুল সত্য। কেবল সে—শ্রীমান্ বীরেশ,—সমারোহের মধ্যে সে একটা অবলুপ্ত যন্ত্র মাত্র। প্রকাণ্ড রেলগাড়িখানা দ্রুতগতিতে চলেছে সেটা দৃশ্যমান, কিন্তু অলক্ষ্যে ইঞ্জিনের নাড়িতে নাড়িতে যেখানে প্রাণশক্তি স্ফুরিত হচ্ছে সেটা ভুলে থাকা অপরাধ নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

হেমন্তরাত্রির অসীম শূন্যের দিকে চেয়ে বীরেশ একা বসেছিল ছাদে। তারকায় তারকায় তার সকল চৈতন্য নিরুপায় আশ্রয় খুঁজে ফিরছিল,—আপন হৃদয়ের মধ্যে যেন শত শত আহত পক্ষীর ন্যায় দুরন্ত চিন্তার দল ডানা ঝটপটিয়ে মাথা খুঁড়ছে। মনে হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ জীবনে আঘাত হবে বড়, সঙ্কট হবে বহুমুখী। অগাধ চিন্তায় যখন সে একান্তে আচ্ছন্ন, এমন সময় পিছনের সিঁড়ি থেকে কলকণ্ঠের ডাক এলো,—এই যে বীরেশদা, পালিয়ে ব'সে আছেন আড়ালে,···চলুন, বৌদিদির সঙ্গে ভাব করবেন!

বীরেশ হাসিমুখে তাকালো তাদের দিকে। ঠিক চেনা গেল না, মাসতুতো বোনেদের সহপাঠিনী শ্যামলী-দীপালী-রেবা-রেখার দল। তাদের কথার চেয়ে বেশী উল্লাস, হাসির চেয়ে বেশী ভঙ্গী,—তারা কেবল উৎসবেই এসে যোগ দেয়নি, উৎসব উপলক্ষ্য ক'রে নিজেদেরও প্রকাশ করতে এসেছে।

—কই উঠলেন না যে? চাঁদের আলো অনেকদিন পান করেছেন, এবার কিন্তু সামনে মধু-র ভাণ্ডার।

—আকাশের তারার চেয়ে জ্বলবে চোখের মণি। আমরা কিন্তু সমস্ত রাত আপনাদের পাহারা দেবো, তা ব'লে রাখলুম।

—আ, চলুন না বীরেশদা।

বীরেশ হেসে বললে, যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে তোমাদের সব ষড়যন্ত্র পণ্ড হবে ত'?

ওরই মধ্যে যিনি শাস্ত্রমতে ললন্তিকা, তিনি দু-পা এগিয়ে এসে বললেন, তা মনেও করবেন না, ফুলের গন্ধে দেশ ছেড়ে ঘুম পালাবে। ফুলের পাপড়িতে বাসী দাগ না পড়লে চোখের পাতা বুজবে না। বুঝলেন ত'?

একজন বললেন, বিয়ের লগ্নে হোলো বরবেশ, রাজবেশ হোলো বাসরে, আর ফুলশয্যায়—

—কি রে, বল্‌তে গিয়ে যে থাম্‌লি?

—তুই বল্ না?

সবাই চুপ। বীরেশ হেসে যুগিয়ে দিল,···রসের সমাপ্তি না হলে তাকে বলে রসাভাস, ফুলশয্যার বর হলেন রতিদেবতা। যাও অভিধান খুলে অর্থ করোগে'।

সবাই ছুটে পালিয়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে নেমে। একজন কেবল দাঁড়িয়েছিল আগাগোড়া নিঃশব্দে। এদিক-ওদিক চেয়ে কাছে এসে সে বীরেশের হাত ধরলো। কম্পিতকণ্ঠে বললে, চলো বীরেশ। সমস্ত ব্যাপারটা তুমি মলিন ক'রে দিতে চাও কেন, এই কি তোমার এম্-এ পাস করার শিক্ষা?

উঠে দাঁড়িয়ে বীরেশ বললে, উৎসাহ আসছে না। তুমি ত' সবই জানো, নলিনী?

—কিচ্ছু জানি নে, জানবার সময় এ নয়। কেবল এই মিনতি জানাচ্ছি আর কেউ যেন জানতে না পারে। চল তুমি।—নলিনী তার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চললো।

অনুষ্ঠানের বিবৃতি এরপর না দিলেও চলবে। ফুলশয্যার আয়োজনে সমস্ত ঘরখানা অলঙ্কৃত। বিছানার উপর মরশুমী ফুলের মেলা, রেশমী বালিশের

চারিপাশে পুষ্পস্তবক, মেঝের উপর পুষ্পবৃষ্টি। সেইগুলি পার হয়ে যাঁর দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ে, তিনি সর্বালঙ্কারভূষিতা নববধূ।

সমস্ত ব্যাপারটা মিটতে ঘণ্টাখানেক লাগলো। কৃষ্ণরাধা রইলেন মালঞ্চে, সখীর দল ঘর থেকে বেরিয়ে গোপনে প্রহরায় নিযুক্ত রইলো। নলিনী নামে যাঁর পরিচয় ঘটলো, তিনি সকল কাজ সেরে গা ঢাকা দিয়ে চ'লে গেলেন। এদিকে তাঁর উৎসাহ কম। অন্তরাল খুঁজে অন্ধকারে তিনি আত্মগোপন করলেন।

ঘরে আলো মৃদু জ্বলছে! জানালাগুলি সবই খোলা। মশারির মধ্যে অজস্র ফুলের বিরক্তিকর বিছানার উপর শুয়ে আড়ষ্ট স্বামী আর স্ত্রী। দুজনের মাঝখানে হস্তপরিমিত ব্যবধান—দুটি অজানা জীবন যেন অনন্ত রহস্য নিয়ে পাশাপাশি স্থির হয়ে রয়েছে। সাড়াশব্দ নেই, পার্শ্বপরিবর্তন নেই, এমন কি নিশ্বাসের আওয়াজ অবধি দ্রুত নয়।

বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে ঘড়ির টিক্‌টিক্ আওয়াজ তাল মিলিয়ে চললো প্রায় দুই ঘণ্টা। গোপিনীর দল যারা নিদ্রা আর মশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এতক্ষণ ছিটে-ফোঁটার আশায় জেগে ছিল, তারা এবার ব্যর্থকাম হয়ে অনুযোগ জানিয়ে বললে, কবিতায় ছন্দপতন হলেও তাকে বলে রসাভাস। এই ব'লে অভিমান জানিয়ে জানালার আড়াল থেকে তারা চ'লে গেল।

আর কেউ জেগে নেই, রাত্রি নিঃসাড় হয়ে এলো। কিন্তু ঘুমের লেশ নেই বীরেশের চোখে, এবং এ সংবাদটা সে না জানিয়ে থাকতে পারলো না। অভিমানিনীদের দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাওয়া সে ভ্রূক্ষেপই করলো না, মশারি ছাড়িয়ে উঠে এক একে ভিতর বাড়ির জানালাগুলো সে বন্ধ ক'রে দিল। ঠিক ঐ সময় নববধূ পার্শ্ব-পরিবর্তন করলো।

ঘরের আলোটা থাক্! চিন্তার রাজ্যে যে একটা অন্ধকারের ছায়া দেখা যাচ্ছে, বাইরের আলো নিবিয়ে সেটাকে আর দুর্গম ক'রে কাজ নেই। আলোটা সাহস ও স্পষ্টতার প্রতীক। ওটা নিবলে অস্তিত্বের দৃঢ়তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন,—কেবল নিজেকে চেনা যায় না তাই নয়, নিজেকে চেনানোও যায় না,···অপরকে আবিষ্কার করাও চলে না। আলোটা থাক্।

দুজনের মাঝখানে ব্যবধান ঠিকই রইলো। বিছানার একান্তে শুয়ে বীরেশ একটু ইতস্ততঃ ক'রে অতি মৃদুকণ্ঠে ডাক্‌লো,—জেগে আছো?

কথার প্রতিধ্বনিতে নববধূ একটু ন'ড়ে উঠলো মাত্র, উত্তর দিতে পারলো না। বীরেশ বললে, শুভদৃষ্টির সময় তুমি মাথা নিচু করেছিলে, মুখ তুলতে পারোনি, মনে আছে?

হুঁ।…অনন্ত রহস্যপাথার থেকে উপরভাগে যেন ছোট্ট একটি বুদ্বুদ ফুটে উঠলো।

বীরেশ প্রশ্ন করলো তোমার নামটা আমাকে বলবার কেউ দরকার মনে করেনি।…নাম কী তোমার?

নিঃসঙ্কোচ সুস্পষ্ট জবাব এলো,—লীলাবতী।

তুমি জানো, এ বিয়েতে আমার মত ছিল না এবং আজও নেই?

লীলাবতী বললে, জানি,।

জানো?…তোমার বয়স কত?

আঠারো।

উত্তপ্ত কণ্ঠে বীরেশ বললে, মিছে কথা! তোমার বয়স তেরো।

কয়েকটি মুহূর্তের কঠিন স্তব্ধতা। তারপর আস্তে আস্তে উঠে লীলাবতী মশারি থেকে বেরিয়ে এসে মেঝের উপর একখানি সতরঞ্চি পাতলো। মৃদু এবং কঠিন কণ্ঠে কেবল বললে, মিছে কথা আমি কখনো বলি নে—এই ব'লে বালিশ না নিয়েই আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সে সতরঞ্চির উপর শুয়ে পড়লো।

নববধূর পক্ষে এর চেয়ে বড় প্রতিবাদ জানানো আর কী হ'তে পারতো? বীরেশ কেবল স্তব্ধ হয়ে এই কঠিন আত্মাভিমানের দিকে চেয়ে রইলো। আশ্রিত বালিকার প্রতি এই অহেতুক রূঢ়তা সংশিক্ষার পরিচয় নয়—নলিনী একথা বলতে পারতো। কিন্তু আহত বীরেশ নিজেকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখলো।

পাকস্পর্শের দিনটা নানা গোলমালেই কেটে গেল। যারা যাত্রী আর নিমন্ত্রিত, তারা বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের শেষ আলো ম্লান হয়ে এলো। এর পরে পরিবারের যে চেহারাটা দাঁড়ালো সেটা আকণ্ঠ নির্জনতায় ভরা। বাবার এক পিসি রইলেন, তিনি রাঙাদিদি।

কিন্তু ব্যাপারটা চাপা রইলো না। নববধূ যে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী নয় এই সংবাদ আবর্তিত হয়ে গিয়ে উঠলো অধিনায়কের কানে। সুরেনবাবু বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন, কেন?

রাঙাদিদি বললেন, শুভদৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা হয়নি।…এ তুমি কী করলে সুরেন?

সুরেনবাবু বললেন, এর মানে কী, পিসিমা?

মানে, রূপ আছে গুণ নেই,…আমি তুমি যে-কালের, ওরা সে-যুগের নয়,—একথা তুমি ভুলে গিয়েছিলে।

বৌমার গুণের অভাব কী শুনি?

সে গ্রামের মেয়ে, সে শিক্ষিত নয়, তার রুচি নেই।—রাঙাদিদি একেবারে গল্পের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে দিলেন।

সুরেনবাবু বললেন, কিন্তু এসব নালিশ ত' আমি শুনবো না। আমি নিজে বিচার ক'রে মেয়ে দেখে এনেছি এই যথেষ্ট। তাকে বিনা প্রতিবাদে অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে হবে, এই আমার বিধান।

রাঙাদিদি বললেন, কিন্তু তোমার ছেলে কলকাতা শহর থেকে এম্-এ, বি-এল্ পাস করেছে। তার চেহারা অন্য রকম!

আমি করিনি এম্-এ পাস?

দিনকালের তফাত আছে, সুরেন।

তুমি কী বলতে চাও, পিসিমা?

কিছু না। আমি শুধু কাঁদতে চাই আমার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে। আমার জন্যে একখানা গাড়ি ডাকিয়ে দাও। এই ব'লে রাঙাদিদি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

কিন্তু রাঙাদিদি গেলেন না, সমস্ত বাড়িটার রুদ্ধকণ্ঠ বৈরাগ্য দেখে তিনি চ'লে যেতে পারলেন না। তিনিই এদের মধ্যে একমাত্র সচল, এ বাড়িটার জীবনচেতনাকে সক্রিয় রাখার জন্য মুখ বুজে তাঁকে অধিষ্ঠিত থাকতেই হোলো। এ বিয়েতে তাঁরও মত ছিল না, তিনিও সুস্পষ্ট ক'রে জানিয়েছিলেন। বর-কনের মধ্যে আপসের চেষ্টা তিনি করেননি। বড়ঘরের বউ তিনি, উচ্চশিক্ষিত শ্বশুরকুলে আবাল্য মানুষ, স্বামীর কাছে অনেক দূর অবধি লেখাপড়া শিখেছিলেন, তিনি নিজে তাঁর ছেলে-মেয়েকে বিলাত পাঠিয়েছিলেন, আপন বিষয়-পত্রের ব্যবস্থা তাঁর নিজের হাতে। প্রতিরাত্রে কুদৃশ্যের অবতারণার আশঙ্কায় তিনি সন্ত্রস্ত থাকেন, এবং তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ হবার ঠিক সময়টিতে লীলাবতী তাঁর কাছে এসে শোয়। বালিকার কোনো চাঞ্চল্য, কোনো মনোবেদনা অথবা বিকার নেই। একটা আশ্চর্য বৈরাগ্য আর কাঠিন্য দিয়ে তার চারিদিক মোড়া।

একদিন রাত্রে রাঙাদিদি বললেন, লেখাপড়া তুই কতটুকু জানিস ভাই?

লীলাবতী বললে, সামান্য।

স্বামীকে খুশী করবার কি কোনো অস্ত্র তোর হাতে নেই? মন ভোলাতে পারিস নে?

খুশী যে নয়, তার মন ভোলাবো? সামান্য তীব্র হাসির ঝলক তার মুখের কাছে এসে ফিরে গেল, কিন্তু ওইটুকুতেই রাঙাদিদি চমকে উঠলেন। আর যাই হোক, এ মেয়েকে উপদেশ দিয়ে তৈরি ক'রে তোলা সহজ নয়।

আর একদিন তিনি প্রশ্ন করলেন, বীরেশ কি তোর সঙ্গে কথা বলে না বৌ?

লীলাবতী বললে, যা বলেন, তা বুঝতে পারি নে।

—লেখাপড়ার কথা বলে?

—না।

—তবে?

লীলাবতী চুপ ক'রে রইলো। উদ্বিগ্ন রাঙাদিদি বললেন, এ ত' তোমাদের ভালো হচ্ছে না ভাই। মুখ দেখাদেখিও তোমাদের নেই, আমি ত' সবই দেখতে পাই।...তুই পারবি নে ভাই?

অন্ধকারে লীলাবতী রাঙাদিদির পায়ের উপর হাত রাখলো। বললে, কী করতে হবে বলুন?

রাঙাদিদি বললেন, পোড়া বাংলাদেশের মেয়েরা চিরকাল যা করে!... বুঝতে পারলি?

—না রাঙাদিদি।

—পায়ে ধ'রে বল্ যে, হিন্দুর ঘরের মেয়ের আর কোনো উপায় নেই। বলতে পারবি?

লীলাবতী চুপ ক'রে রইলো। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে তার পিঠের উপর হাত বুলিয়ে রাঙাদিদি বললেন, এদেশে ছেলেরা খাদক মেয়েরা খাদ্য। উঁচু গলায় কিছু বলতে যাওয়া অধর্ম। যারা দাসী তারা পায়ের তলায় থাকবে, মাথা তুলবে না। পরের ঘরে থেকে, পরের ভাত খেয়ে, পরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়াই এদেশের সতীত্ব ভাই।

লীলাবতী রাঙাদিদির পায়ের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিল। অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে রাঙাদিদি বললেন, সংসারে শান্তি রাখার জন্যে যদি চাকার তলায় বুক পেতে দিতে হয়, কেউ ফিরেও চাইবে না। মান সম্ভ্রম খুইয়ে নিজেকে নষ্ট করলে তবেই ওরা বলে, লক্ষ্মী বউ।...যা ভাই লীলা, তুই এখনি যা, পা জড়িয়ে ধ'রে বল্—আশ্রয় দাও, পায়ে ঠেলো না।

রাঙাদিদির কণ্ঠস্বরে হক্‌চকিয়ে লীলাবতী চুপ ক'রে রইলো। তাঁর কথার তলায় কী যেন প্রকাণ্ড একটা বিদ্রূপ নিহিত আছে। বৃদ্ধার সমগ্র জীবনের ভিত্তি যেন বিপ্লববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মুখের ভাষায় যেন কেমন একটা অন্তর্নিহিত সমাজদ্রোহিতার স্ফুলিঙ্গ। লীলাবতী স্তব্ধ বিস্ময়ে কাঠ হয়ে ব'সে রইলো। রাঙাদিদি এক সময়ে বললেন,...কই গেলি নে রে?

লীলা বললে, আমি ত' কোনো অন্যায় করিনি, রাঙাদিদি?

বালিকার কণ্ঠে অবিচলিত কাঠিন্য অনুভব ক'রে রাঙাদিদি তৎক্ষণাৎ বললেন, আচ্ছা থাক্।...অন্যায়! মেয়ে হয়ে এ দেশে জন্মেছিস, এই ত' সকলের বড় অন্যায় পোড়ারমুখী! বেশ,—তবে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাক্।

কেমন যেন একটা স্বস্তি পাওয়া গেল এই বৃদ্ধার কাছে। লীলাবতী প্রায় কণ্ঠলগ্ন হয়ে রাঙাদিদির কাছে শুয়ে পড়লো। মরুভূমিতে সে এই ক'দিন বিচরণ করেছে, খুঁজতে খুঁজতে সে মরুদ্যানে এসে পৌঁছল। বৃদ্ধার পাশে শুয়ে তার মনে হ'তে লাগলো যেন এক বৃহৎ বনস্পতির কোটরে তার আশ্রয় মিলে গেছে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় নির্ভয়ে এখানে আত্মগোপন করা যায়...লীলাবতী নিবিড় স্বস্তিতে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো।

দুই

আটদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেল। এই আটদিনে প্রতি পদে লীলাবতীর কাঁটা ফুটেছে, প্রতি পলকে তার বুকের এক সঙ্গোপন কোণ থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে! অলক্ষ্যে সে রইলো, গ্রামের মেয়ের ভাষাহীন চেহারায় বেদনার ইতিহাস পড়তে পারা গেল না,—এবং অলক্ষ্যেই এই আটদিনে তার বয়স আট বছর বেড়ে গেল। এমন পরানুগত পরানুগ্রাহিতা তার জীবনে এই দিন-যাপনের ঘৃণায় তার আকণ্ঠ ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগলো।... বিবাহিত জীবন কুশ্রীতায় ভরা, নারীর জীবন পাপ-পঙ্কিল, পত্নীর জীবন ক্রীতদাসীত্বের অবমাননায় ধূল্যবলুণ্ঠিত।

বিবাহের অষ্টম দিনে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আছে, সুরেনবাবু সে কথা ভোলেননি। আগের দিন রাত্রে তিনি জানিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর নির্দেশক্রমে বীরেশ যথারীতি সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অষ্টমঙ্গলার লগ্ন সকালের দিকে, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুরেনবাবু যতই ব্যস্তভাবে ভিতরে বাহিরে পায়চারি করতে লাগলেন, ততই বীরেশের দিক থেকে দীর্ঘসূত্রতা প্রকাশ পেতে লাগলো। অবশেষে তিনি গলা বাড়িয়ে জানাতে বাধ্য হলেন, আর আধঘণ্টার বেশী সময় নেই।

বীরেশ এক সময়ে ব'লে বসলো—আমার যাবার উৎসাহ নেই।

কথাটা আলগোছে সুরেনবাবুর কানে গেল। তিনি একে আত্মাভিমানী দাম্ভিক মানুষ, তার উপর গত কয়েক দিন উত্তাপ জমেছিল মনে মনে। ফিরে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, উৎসাহ তোমার নেই কেন, বীরেশ?

বীরেশ মাথা তুললো না, কিন্তু মেঝের উপর আঙুল দিয়ে দাগ কেটে বললে, প্রত্যেকদিন একটা না একটা আচার অনুষ্ঠান পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু এ যে সামাজিক অনুষ্ঠান!—মাথায় টোপর দিয়ে বিয়ে করতে যাওয়ার মানে, এই সমস্তগুলোকে নির্বিচারে মেনে নেওয়া। সুতরাং তোমাকে যেতেই হবে।

ফস্ ক'রে বীরেশ ব'লে বসলো, আমি নিজের ইচ্ছেয় মাথায় টোপর তুলিনি। এ বিয়েতে আমার মত ছিল না।

সংযত কণ্ঠে সুরেন্দ্রবাবু বললেন, তবে করলে কেন?

আপনাদের পীড়াপীড়ির জন্যে।

বেশ, সেই পীড়াপীড়ি আজো ফুরোয়নি। পরিবারের সম্মান রাখার জন্যে আজো তোমাকে এই অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। যাও, আর সময় নেই।

বীরেশ যেন সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ঝড়ের আগে যে আয়োজন, সেই আয়োজন ছিল তার উপবাসী বুকের মধ্যে। পুরুষের জীবনে যেখানে সকলের বড় হেস্তনেস্ত, সেখানেই সে যেন সকলের বড় মার খেয়েছে। সে যে ধৈর্য হারাবে অসংযত হয়ে উঠবে এতে বিস্ময় নেই। আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে বললে,—আপনার এই নির্দেশ পালনে পরিবারের সম্মান হয়ত বাঁচবে, কিন্তু আমার মাথা অপমানে হেঁট হয়ে যাবে।

সুরেনবাবু দু-পা এগিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার এ কথার মানে?

মানে এই, এই বিয়েতে আমার সমস্ত মন বিদ্রোহ করেছে। আমার রুচি আমার আদর্শ, আমার শিক্ষা এ বিয়েতে সায় দেয় না। সমস্তটা জবরদস্তি ক'রে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা আমাকে দিয়ে আদেশ পালন করাচ্ছেন কেবল অভিভাবকত্বের সুযোগ নিয়ে।

সুরেন্দ্রবাবু স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে বললেন, তুমি কী চেয়েছিলে, শুনি?

বীরেশ বললে, সে আপনাকে এখন বলা মিথ্যে।—আমি যা চাইনি তাই আমার ওপরে চাপানো হয়েছে।

কিন্তু মালাবদল পাড়ার লোকে করেনি, করেছিলে তুমি।

করেছিলাম, আপনার সম্মান রক্ষার জন্য।

আমার সম্মান রক্ষার জন্য প্রথম কাজটা তুমি করেছিলে, দ্বিতীয়টা করছ না কেন?

বীরেশ চুপ ক'রে রইলো। সুরেন্দ্রবাবু পুনরায় বললেন, লেখাপড়া শিখেছ অনেক, কিন্তু বাঙালীর ঘুণধরা মেরুদণ্ড তোমার মধ্যে। সৎসাহসের দরকার ছিল যখন তখন বাইরের সমাজে মাথা তুলে প্রতিবাদ জানাতে পারোনি, আজ সামান্য আনুষ্ঠানিক আনন্দকে বিষাক্ত করবার জন্যে ঘরের মধ্যে বিক্রম প্রকাশ করছ। ঘরের মধ্যে ব'সে বীরের অভিনয়ে না আছে বীরত্ব, না আছে যশ!!...এই ব'লে তিনি ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই কয়েকটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে একজন বর্ষীয়সী মহিলা সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে এলেন। ভাঁড়ারের কাজে রাঙাদিদি সকালের দিকে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি বেরিয়ে এসে হাসি মুখে দাঁড়ালেন। বললেন, বৌমা, এসো মা এসো, ওমা নলিনী যে? সকাল বেলায় মাসি-বোনঝি মিলে আমাদের পাড়ায় কেন গো?

বীরেশের মামীমা রাঙাদিদির পায়ের ধুলো নিয়ে হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজ ত' অষ্টমঙ্গলা। কই, এরা যায়নি কেন এখনো?

রাঙাদিদি বললেন, বড় জ্বালায় পড়েছি মা। তোমরা যা হোক ব্যবস্থা করো! নলিনী, তোমাকে ওরা একটু ভয় করে, তুমি একবার দেখো মা, যদি বীরেশ তোমার কথা শোনে।...গলা নামিয়ে পুনরায় বললেন, সকালবেলায় বাপ-বেটায় এক চোট বচসা হয়ে গেছে!

নলিনীর মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। বললে, নতুন বৌ কোথায়?

কল-ঘরের দিকে।

পিছনের বারান্দা পার হয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়াতেই লীলাবতীকে পাওয়া গেল। নলিনী এগিয়ে গিয়ে হেসে তার চিবুক নেড়ে বললে, সকাল-বেলায় লক্ষ্মীপ্রতিমা দর্শন! অমি যে এলাম তোমাকে সাজিয়ে দিতে।

লীলাবতী বললে, আহা, একা ফেলে পালিয়েছিলেন, এতদিনে মনে পড়লো বুঝি?

একা?—নলিনী হেসে কুটি কুটি। বললে, বিয়ে করিনি এখনো, তাই ব'লে কি আমি এতই অজ্ঞান? একা না থাকতে পেলে তুমি যে আমাদের মুণ্ডপাত করতে?—কাপড় চোপড় কোথায়?

রাঙাদিদির ঘরে।—

বিস্ময় প্রকাশ ক'রে নলিনী বললে, কেন? বীরেশের ঘরে থাকে না তোমার জিনিসপত্র?

না।—ব'লে লীলাবতী মুখ ফিরিয়ে নিল।

নলিনী বললে, তোমরা যাবে কখন?

লীলাবতী তার মুখের দিকে তাকালো, পরে চট্‌ ক'রে বললে, আপনি বিশ্রাম করুন আমি এক্ষুনি আসছি কাপড় ছেড়ে। এই ব'লে সে অন্তদিকে চ'লে গেল।

বাড়ির সমস্ত আবহাওয়াটা বেশ থম থম করছে। অমঙ্গল না হোক, অশান্তির একটা ছায়া যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিজের মনের আতঙ্ক এবং চিত্তের এই বৈলক্ষণ্য এ বাড়িতে প্রকাশ ক'রে বলা নলিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। যে নিগূঢ় কারণ আজকের এই অশান্তির চক্রান্তে বাঁধা, সে-সংবাদ হয়ত নলিনীই কেবল জানে, আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং মুখের হাসি এবং গতিবিধির সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, অস্বাভাবিক অধ্যবসায় বজায় রেখে সে পুনরায় দালান পেরিয়ে এলো।

ছেলেমেয়েরা খেলা নিয়ে মেতে রয়েছে, মাসিমা রাঙাদিদিকে নিয়ে একান্তে পারিবারিক আলাপ নিয়ে ব্যস্ত। সুরেনবাবু নিজের ঘরে গিয়ে বোধ করি বরক'নের বিদায়ের জন্যে অপেক্ষায় রয়েছেন। সমস্ত দিকে একবার তাকিয়ে নলিনী বীরেশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বীরেশ তখন বিছানার উপর মুখ গুঁজে প'ড়ে রয়েছে।

নলিনী হাসিমুখে ডাকলে, বৌ পেয়ে আটদিন বুঝি রাতে ঘুম হয়নি, তাই ঘুমিয়ে নিচ্ছ?···নাও ওঠো, যেতে হবে, মনে নেই?—এই ব'লে ভিতরের ও বাইরের সমস্ত জানালাগুলো একে একে খুলে দিল।

বীরেশ মুখ তুলে বললে, আমি ব'লে দিয়েছি আমি যাবো না।

—কেন?

—এ বিয়ে আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না।

নলিনী উষ্ণ-কণ্ঠে বললে, মন্ত্র প'ড়ে বৌ ঘরে এনেছ, মনে আছে সে-কথা?

মন্ত্র আমি পড়িনি, নলিনী।

মাথায় টোপর দিয়েছ, পিঁড়িতে বসেছ, সাত পাক ঘুরেছ, বাসরে ঢুকেছ, গাঁটছড়া বেঁধে বৌ এনেছ সঙ্গে—এই যথেষ্ট। সমস্ত সমাজের কাছে স্বীকার করেছ।

—তবু এ বিয়ে আমি মানি নে।

—মানো না।···কিন্তু বালিকা বউ তোমার কাছে কী অপরাধ করেছে, বীরেশ?

—অপরাধ সবাই করেছে তার ওপর, আমি করিনি।

নলিনী বললে, তোমার আইন-পড়া বিদ্যে কি এই কথা বলে? আটদিন আগে তুমি ত' নাবালক ছিলে না? তুমি এমনই জায়গায় আঘাত করতে

চাইছ যেখান থেকে প্রতিঘাত আসবে না। এক বালিকার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চাও স্বেচ্ছাচারে? এই বীরত্ব দেখাবে বলেই বুঝি তোমার বীরেশ নাম রাখা হয়েছিল?

বীরেশ উঠে বসলো। বললে, নলিনী, তুমি জানো যে, ওই বৌকে নিয়ে আমি কোনো কালে ঘর করতে পারবো না?

কিন্তু এই ত' আটদিন ঘর করলে।

একদিনও করিনি, সমস্ত দিন রাত্রে আমার সঙ্গে এক মিনিটও দেখা হয় না। তুমি জানো, ভালো ক'রে আমি তার মুখও দেখিনি আজও?

বিবর্ণ ভয়ার্ত মুখে নলিনী বললে, সে কি?

বীরেশ বললে, হাঁ, বাবার অসঙ্গত অভিভাবকত্বের এই পরিণাম!

নলিনীর চোখে জল এলো। বললে, কিন্তু এ যে তোমার ভুল হচ্ছে বীরেশ।

বাবার ভুল আরো অনেক বড়। আমার সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা ক'রে কেবলমাত্র গায়ের জোরে তিনি এই কাজ করেছেন।

বৌকে কি তোমার ভালো লাগেনি?

মেয়েটিকে ভালো লেগেছে, কিন্তু স্ত্রী হিসেবে আমি তাকে সহ্য করবো না।

মেয়েটির ভবিষ্যৎ?

অন্ধকার।

এর পর তুমি কী করতে চাও?...এ কথা তুমি জানো, জীবনে যা কিছু চাওয়া যায় তা সব পাওয়া যায় না?

বীরেশ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। পরে বললে, মাথার খোঁপায় তুমি রক্তজবা প'রে এলে কি আমাকে এই কথা জানাতে?

না, ওটা বিয়ের সঙ্কেত, তোমাকে সাবধান করতে এলাম।

বীরেশ বললে, নলিনী, একসঙ্গে দুজনে এম্-এ পাস করেছিলুম, কত ব্যর্থ স্বপ্ন দেখেছি মনে পড়ে?...আজ সব চূর্ণ হয়ে গেছে।

নলিনী মুহূর্তের জন্য এদিক ওদিক তাকালো। তারপর চক্ষের পলকে বীরেশের একখানা হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, আমার কথা রাখো, লীলাকে নিয়ে কাজ সেরে এসো। —এই যে বৌদিদি, আমি এই ঘরে বড়বাবুর মান ভাঙাচ্ছি। আঃ যাও বীরেশ, আর দেরী ক'রো না।

কিন্তু মামীমা এসে ঘরে ঢোকার আগেই বীরেশ উঠে বাথরুমের দিকে চ'লে গেল। যে মন্ত্র তার কানে ঢুকলো তারপরে প্রতিবাদ জানাতে আর তার সাহস হোলো না।

স্ত্রীকে নিয়ে যথাসময়ে সে যাত্রা করলো। লীলাবতীর আত্মীয়-স্বজন থাকেন পূর্ব-দক্ষিণ দেশের কোন্ গ্রামে। তার মা জীবিত, বাপ নেই। পারিবারিক অবস্থা বেশ ভালো। ছুটি বড় ভাই, তাঁরা বিদেশে চাকুরি করেন। বিয়ের সময় তাঁরা ছুটির অভাবে এসে পৌছতে পারেননি। লীলাবতীর মা জমিদারবাড়ির ছোটবৌ। লীলাবতীর মামা থাকেন কলকাতায়, সেখানেই সে গেছে।

পরদিন সকালে বীরেশ ফিরে এলো, এবং এলো সে একা,—সঙ্গে লীলাবতী নেই। সুরেনবাবু, রাঙাদিদি, মামীমা, নলিনী সকলেই এসে দাঁড়ালেন। সুরেনবাবু প্রশ্ন করলেন, বৌমাকে কি রেখে এলে ?

বীরেশ বললে, আপনার অমতে রেখে আসতে আমি চাইনি, কিন্তু তিনি নিজেই আসতে চাইলেন না।

কেন ?

বীরেশ একবার সকলের মুখের দিকে তাকালো। বললে, এ বাড়িতে তাঁর আসতে রুচি নেই, এই কথাই আমাকে ব'লে দিলেন।

রাঙাদিদি বললেন, নতুন বৌয়ের মুখে এসব কী কথা ? ...তুই কী বললি ?

কিন্তু বীরেশের উত্তর শোনবার আগেই কাঁপতে কাঁপতে সুরেনবাবু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সমস্ত পৃথিবী, সমগ্র সৃষ্টি, পারিবারিক হিতাহিত এবং তাঁর নিজের ইহকাল পরকাল অন্ধ ছায়ার মতো তাঁর চোখের সামনে দুলতে লাগলো। তাঁর দম্ভ, তাঁর শাসন, তাঁর অধিনায়কত্ব এবং পিতৃত্ব—সমস্তর বাইরে এমন একটা কিছু শক্তির ষড়যন্ত্র চলেছে যার উপর তাঁর একেবারেই হাত নেই। নিরুপায় আশ্রয়ের জন্য তাঁর ক্লিষ্ট হৃদয় চারিদিকে হাতড়াতে লাগলো।

নলিনী একটু আড়ালে স'রে গেল। স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন রাঙাদিদি। মামীমা প্রশ্ন করলেন, তুমি কী বললে ?

বীরেশ বললে, আমি জিজ্ঞেস করলুম, এই কি তোমার শেষ কথা ? তিনি বললেন, যে-বাড়িতে আদর ক'রে আমাকে স্থান দেওয়া হয়নি, সেই বাড়িতে পায়ে ধ'রে আমি থাকতে পারবো না, আমি জানবো যে আমার বিয়ে হয়নি। অপমানের প্রতিশোধে নিজেকেই আমি ধ্বংস করবো।

মামীমা বললেন, নতুন বৌয়ের এত বড় আস্পর্ধা ?

নলিনী বেরিয়ে এসে বললে,—মাসিমা, নতুন বৌয়ের স্পর্ধাটাই দেখলে, কিন্তু পরের মেয়েকে নতুন ঘরে এনে অভদ্রভাবে যারা আট দিন ধ'রে তাকে অকথ্য অপমান করে—তাদের কি তুমি শিক্ষিত বলবে, সম্রান্ত বলবে ? তোমার ভাগ্নে কি-ভাবে সেই নাবালিকাকে খুঁচিয়েছে একবার ভাবো দেখি ? ...আজ সকলের মুখে সে কলঙ্ক মাখিয়ে দিলে !

রাঙাদিদি বললেন, নাবালিকা মেয়ের কথা ধরতে নেই। মন ভালো হ'লে সে আবার আসতে চাইবে। শাস্ত্রমতে বিয়ে, একি আর ভাঙে বাবা? আর সে যদি দুকথা বলেই থাকে, তার মামা-মামীরা ত' আর সে কথা বলেনি!

তাদেরও একই মত।—ব'লে বীরেশ ঘরে গিয়ে ঢুকলো। নলিনী দাঁড়িয়েছিল, ভিতরে এসে বললে, তাদের মত তুমি কী ক'রে জানলে?

রাত অবধি জানতে পারিনি। খেয়ে দেয়ে একলা ঘুমিয়েছি, সকালে আসবার সময় সকলের কথা জানতে পারলুম।

বৌ কোথায় ছিল?

তার মামীর কাছে।

আসবার সময় তুমি কী ব'লে এলে?

বললাম, বিয়ে আমাদের হয়নি একথা ভালো ক'রে জানাবার আর জানবার ব্যবস্থা আমি শীঘ্রই করবো।

নলিনী আর পারলো না, কেমন একটা অকারণ উচ্ছ্বাসে তার দীর্ঘায়ত দুই চোখে অশ্রু ভ'রে এলো। মৃদুকণ্ঠে বললে, এ যে তুমি কী করলে কিছুই বোঝা গেল না। সমস্ত বিয়ের ব্যাপারটাই যেন ছেলেমানুষি, বোকামি, হঠকারিতা আর অজ্ঞানের ইতিহাস। তুমি আগে ছিলে বুদ্ধিমান, চকচকে যুক্তিবাদী—কিন্তু হয়ে গেলে নির্বোধ, একগুঁয়ে। যে সহপাঠীর সঙ্গে পড়েছি সে তুমি নয়, তোমার খোলস···এর পরে কী করবে শুনি?

বীরেশ বললে, আগাগোড়া জানবার অধিকার ত' তোমার নেই?

আছে কি না, সে-আলোচনা তোমার সঙ্গে করবার আর আমার রুচি নেই। তবু জানতে চাইছি, বলো।

কে তুমি?

নলিনী বললে, কেউ নই, আমি ভদ্রসমাজের হয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তোমাকে জবাব দিতে হবে।

বেশ, তাহ'লে শুনে রাখো। লোকমুখে যদি সংবাদ না পাও তাহ'লে সংবাদপত্রেই সে খবর পাবে।

নলিনী শিউরে উঠে বললে,—কী বলছ তুমি?

বলছি খুব ভেবে চিন্তে।

নলিনী দু' পা এগিয়ে গেল। তার চিবুক কাঁপছিল, আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললে, আবার বলো ত' কী বলছিলে? বীরেশ, দোষ নিয়ো না কিছু, আমি আর আগেকার মতন ক'রে তোমাকে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি নে।

বালিশে মুখ গুঁজে বীরেশ বললে, কেন বলো ত' নলিনী?

নলিনী বললে, তুমি আগের মতন আছো ?

মাথার ব্রহ্মতালুতে যদি হাতুড়ি মারা যায়, সহজ বুদ্ধিমান মানুষও পাগল হয়। এর চেয়ে বেশী কি জানতে চাও নলিনী,—বলো ?

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য নলিনীর দুই পায়ে একবার বেগ এলো, কিন্তু সে নড়লো না। বললে, এইবার নির্ভুলভাবে বলো দেখি, লীলাকে তুমি পছন্দ করলে না কেন ?

বীরেশ বললে, পছন্দ ত' করেছি।

গ্রহণ করতে পারবে না কেন ?

তুমি এত নির্বোধ নও যে, আগাগোড়া তোমাকে বোঝাতে হবে। আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত জীবনযাত্রায়, স্বভাব তৈরী হয়েছে আধুনিক কালের জটিল সমস্যাবাদে—নিরাশায় সন্দেহে, আর বিশ্বজোড়া অশ্রদ্ধায় আমার প্রাণের পথঘাট দিশাহারা—আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে এক গ্রামের মেয়েকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারবো না ত' ?

চাকর এসে খবর দিল, কর্তাবাবু আজ বেরোননি, তিনি ঘরে ব'সে রয়েছেন, আপনাকে ডাকছেন। দিদিমণি, আপনিও আসুন।

বীরেশের সঙ্গে নলিনীর চোখাচোখি হোলো। বেশ জানা যাচ্ছে, ঝড় একটা আসন্ন। উপরে শান্ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আলোড়িত হচ্ছে।

যাবার আগে নলিনী বললে, উত্তেজনার যত বড় কারণই ঘটুক তুমি সংযত ভাবে কথা বলবে, কেমন ? যাও তুমি আগে, আমি যাচ্ছি।

কথা দিলুম। —ব'লে বীরেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নলিনীর পা সরছে না। তার নিজের ভেতরে যে দুর্বলতা আছে সেটা আজ অবধি কোথাও প্রকট নয়, রক্তকমলের কোরকের অন্তরালে সেটা অতি সংগোপনে আছে ঢাকা, বাইরের আলো-বাতাসের চেহারা সে দেখেনি। তবু নলিনীর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। বীরেশের সকল অসন্তোষ আর বিদ্রোহ এবং এই বিবাহ-বিচ্ছেদের অতি নিচেকার রহস্যগর্ভে কিছু কি আছে তার অস্তিত্ব ? কিন্তু বাতাস না থাকলেও বেতসপত্র যেমন কাঁপে তেমনি এই তরুণীর অধীর হৃদয় ওই দালানটুকু পার হয়ে ঘরে ঢোকার পথে অকারণ শির শির করতে লাগলো।

ঘরের ভিতর আকণ্ঠ স্তব্ধতা। জানালার বাইরে চেয়ে সুরেনবাবু নীরবে ব'সে রয়েছেন, ওদিকে মেঝের উপর ব'সে বীরেশ মাথা হেঁট ক'রে রয়েছে। নলিনী মুহূর্তের জন্য একবার দাঁড়ালো, তারপর বললে, আমাকে ডাকছিলেন ?

নিশ্বাস ফেলে সুরেনবাবু বললেন হ্যাঁ, বসো। দু'চারদিন থাকো তোমরা,

বাড়িটা ভারী শূন্য ঠেকছে।…আচ্ছা নলিনী, তুমি ত' যথেষ্টই শিক্ষিত, কলকাতায় থেকে এম্‌-এ পাস করলে। এ ব্যাপারটায় তোমার কী মনে হয় বলো ত' ?

চৌকির উপরে ব'সে নলিনী বললে, ব্যক্তিগত ব্যাপার কিনা, বলা ভারি কঠিন।

তা বটে।—সুরেনবাবু বললেন, কিন্তু মনে আছে ত' ফরাসীদের দেশেও এই সেদিন পর্যন্ত—মানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও—মা-বাপ ছেলে মেয়ে খুঁজে দিত, ছেলেমেয়েরা তাদেরই সানন্দে বিয়ে করতো। সুখীও হ'তো। আমি কি ভুল করেছি ?

নলিনী বললে, আপনি ভুল করেছেন এ কথা আমার একবারও মনে হয়নি। —এই ব'লে অলক্ষ্যে সে একবার বীরেশের দিকে তাকালো। বীরেশ তেমনি স্তব্ধ নত মুখে ব'সে রয়েছে, কোনোরূপ চাঞ্চল্য তার নেই।

সুরেনবাবু বললেন, প্রথমটাই ধরা যাক্‌—বাল্যবিবাহ। বাল্য-বিবাহে আজকাল ছেলেমেয়ের সুবিধে কিংবা অসুবিধে সে আলোচনা থাক, কিন্তু বিজ্ঞান আলোচনায় দেখা গেছে, বিবাহের যা চরম প্রয়োজন, বেশী বয়স হয়ে গেলে সেখানে বিকৃতি ঘটে—স্বাস্থ্য, আয়ু, আনন্দ এগুলো সবই বিপন্ন হয়। আর সুবিধার দিক থেকে যদি বলো,—তাহ'লে ধরো সাধারণ বাঙ্গালীর পরমায়ু। গড়ে যে দেশের লোক চব্বিশ বছর বয়স অবধি বাঁচে তারা সন্তান মানুষ করবে কবে ? সন্তান মানুষ করার জন্য যে সাধনা ও অধ্যবসায়, যে ত্যাগস্বীকার আর কষ্টসহিষ্ণুতা, সে সবই যৌবনকালের পক্ষে সম্ভব। প্রৌঢ়ত্বে আর বার্ধক্যে জীবনে বিতৃষ্ণা না এলেও আসে ক্লান্তি, আসে উপেক্ষা—সকলের প্রতি আসে একটা স্বাভাবিক বৈরাগ্য। নলিনী, আমি সেইদিক থেকে বিচার করেছি।

এখানে মন্তব্য করা মানানসই হবে না। নলিনীর নিজের বয়স বাইশ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মতামত যাই হোক না কেন নীরব থাকাই শোভন হবে। নলিনীর মাথা নত হয়ে রইলো।

সুরেনবাবু বলতে লাগলেন, তোমাদের নিয়ে আলোচনা করার মানে এই, আমি নিজেকেও বোঝাবার চেষ্টা করছি। আমি পণ্ডিত তা বলি নে ; আমি সবই বুঝি তাও মানি নে ; কিন্তু বয়স হয়ে জেনেছি, শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আমার আছে,—ব্যক্তির দায়িত্ব যেমন সমাজে। বলতে পারো সমাজ জানি নে, বলতে পারো শৃঙ্খলা মানি নে—কিন্তু মানতে হবে একটা, যেখানে গোষ্ঠীর কথা আসে। মরুভূমিতে যাও সেখানে সমাজ মানার দায়িত্ব নেই, অরণ্যে

যাও সেখানে সমাজ মানার দায়িত্ব নেই, অরণ্যে যাও সেখানে কর্তব্য নেই, হিমালয় পর্বতের চুড়োয় যাও সেখানে অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ ত' যায় না, মানুষ যায় মানুষের কাছে। মানুষের জটলার ভিতর দিয়েই মানুষ পথ কেটে চলে। এই শৃঙ্খলাবোধ যারা ভাঙে যারা মানুষের ভিতরে থেকেও মানুষের বহুকালের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে কেবল খেয়াল খুশিতে ভাঙতেই চায়, গড়তে চায় না—আমরা তাদের পাগল বলি, তাদের স্থান গারদে। যারা বড় প্রতিভা, তারা ভাঙে কেবল নতুন ক'রে গড়বার জন্যে, তারা বর্তমানের ছাঁচে অতীতকেই আবার সৃষ্টি করে—তাদের ভাঙাও ভীষণ, গড়াও বিপুল। তারা আসে বহুযুগে একবার মাত্র।

বীরেশ একবার মুখ তুলে আবার নত হয়ে রইলো। সুরেনবাবু ঈষৎ হেসে বললেন, আর শিক্ষার কথা? ওদের দেশের পৌরাণিক পিগ্‌ম্যালিয়নের কথা মনে পড়ে,—পাথর থেকে মানুষ হবার সাধনা? ওই যে, তোমাদের বার্নার্ড শ' যা নিয়ে আধুনিক সাহিত্য তৈরি করলেন। একটি অশিক্ষিত নীচ জাতের সাধারণ মেয়েকে তৈরি করা হ'লো নানারূপ বিদ্যাশিক্ষার রসায়নে, নানাবিধ জারক রসে,—মেয়েটা অবশেষে লর্ডসভার মারফতে রাজার কোর্ট অবধি গিয়ে হাজির হ'লো। অদ্ভুত কাহিনী। যদি বস্তু ভালো হয়, ধাতু যদি আসল হয়, তার থেকে ভালো ছাঁচ তোলা সহজ। স্বামী-স্ত্রীর দুজনের শিক্ষা যদি হয় দুরকমের - তারা কেউ কারো বশ্যতা, সমতা স্বীকার করতে চায় না, শিক্ষাভিমান-ই তাদের পথে দেয় বাধা। তার চেয়ে গ্রামের পথের কাঁচা নরম মাটিতে প্রতিমা গড়া যায় ভালো,—সেখানে সমস্যা নেই, সন্দেহ নেই। একটি ভদ্রবংশের সুশ্রী মেয়ে—সরল নিরভিমান, অল্প শিক্ষিত, গ্রামের স্বভাবে সে মিষ্টি, হৃদয় নিষ্পাপ—বহু চিন্তার পরে এমন একটি মেয়েকে ঘরে আনলাম, যে সত্যকার ঐশ্বর্য সৃষ্টি করতে পারে।…তুমি বলো ত', আমি কি সত্যই ভুল করেছি? একটি মেয়েকে দিনে দিনে আবিষ্কার করা, দিনে দিনে তার চোখে আবিষ্কৃত হওয়ার কি কোনো আনন্দ নেই, নলিনী?

নলিনী গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিল। তারপর বললে, আমি নিজের কথাই কেবল আপনার কাছে বলতে পারি।

তাই বলো, তাই আমি শুনতে চাই! বর্তমান যুগের মন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নে।

নলিনী বললে, বাল্যবিবাহ খুবই ভালো,—যৌথ পরিবারের বাঁধন যতদিন ছিল, ততদিন তার বিরুদ্ধে কোনো কথা ওঠেনি। আজকের শিক্ষা আর অর্থনীতির সমস্যায় ব্যক্তি-জীবন বড় হয়ে উঠে যৌথ পরিবারের সেই বাঁধন

ভেঙে গেছে। পল্লী-জীবন ততদিন অক্ষুণ্ণ ছিল যতদিন নাগরিক-জীবনের বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখা যায়নি। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ সে প্রশ্ন আসে না,—কিন্তু আগেকার জীবনের মন্থর গতির মধ্যে বাল্যবিবাহ মানিয়ে যেতো,—ছেলের আর মেয়ের নিরুদ্বিগ্নভাবে মানুষ হয়ে ওঠার তখন দীর্ঘ সময় পাওয়া যেতো, কারণ তাদের সামনে কোনো সংগ্রাম অথবা সমস্যা ছিল না। তারপর মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ নানাদিকে বেড়ে চললো, বিদ্যা আর শিক্ষার শত শত শাখা-প্রশাখা, কত অদ্ভুত বিস্ময় চারিদিকে, কত দ্রুত গতিতে সবাই কতদিকে এগিয়ে চলেছে, অল্প সময়ে অনেক বেশি জানতে হবে, অনেকখানি আয়ত্ত করতে হবে। ধানের গোলায়, গোরুর দুধে, যৌথ পরিবারে, বাল্য-বিবাহে আর গ্রামের পঞ্চায়েতে যে-জীবন ধীরে-সুস্থে হেলে-দুলে চলতো—নাগরিক জীবনের গোলক-ধাঁধায় তার পথ হারিয়ে গেল। ছেলে-মেয়ে উভয়েই ইলেকট্রিক মেশিনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চললো, বাল্যবিবাহের কথাটা তাদের মনেই এলো না। বর্তমান যুগের প্রকাণ্ড আপিসে অনভিজ্ঞের জায়গা নেই, সেখানে একেবারে এসে দাঁড়াতে হবে অভিজ্ঞ প্রবীণ হয়ে, তবেই ঠাঁই হবে।…কচি ছেলে অথবা কচি মেয়েকে মানুষ ক'রে তুলে তবে ঘরকন্না করতে হবে, ততটুকু সময় হাতে নেই। তাদের হাতে অনেক কাজ, মনে অনেক চিন্তা, মাথায় অনেক সমস্যা!

সুরেনবাবু বললেন, মতের মিল নেই,—কিন্তু ভালো লাগছে তোমার কথা।—তারপর? তোমার লক্ষ্যটা কোন্‌দিকে, নলিনী?

লক্ষ্য নেই।…নলিনী বলতে লাগলো, এখানে লক্ষ্যের চেয়ে গতির কথাটা বড় ব'লে আমার মনে হয়। সমাজের ভিত্তি—নীতি আর প্রচলনের ওপর দাঁড়িয়ে।…আমাদের প্রফেসর ঘোষের কথাটা খুব ভালো লাগতো। তিনি বলতেন, কোন্ নীতিকে আমার মানবো, কোন্ প্রচলনকে আমরা স্বীকার করবো? আমরা উত্তর দিতে পারতাম না। যে বিধান এতকাল চ'লে এলো তাতে আর সান্ত্বনা নেই, বড় অভ্যাসেই সেটা জীর্ণ। অনেকটা যেন মফঃস্বলের আদালত। ওপরে ধর্ম আর ন্যায়বিচারের মুখোশ, ভেতরে হাকিম পেশকার থেকে আরম্ভ ক'রে আরদালি মুহুরি পর্যন্ত ঘুষ নিয়ে চলেছে, এটাও দাঁড়িয়ে গেছে একটা নীতির সামিল। আমরা যে-যুগে দাঁড়িয়ে আছি এর নিচের তলায় প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি, দিকে দিকে তারই অগ্নিস্রাব দেখা যাচ্ছে। সমাজের কোনো একটা সুস্পষ্ট আকৃতি বর্তমানে নেই; ব্যক্তিগত খেয়াল খুশির ওপরে আজকের ওলোট-পালটের যুগে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

এর পরিণাম কী তোমার মনে হয়?

বলা কঠিন। কারণ বাঙালী সমাজের গতি-প্রগতির আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রকাণ্ড বিপ্লবের দিকে এর গতি। নতুন সমাজ সৃষ্টির উৎসাহ কোথাও নেই, কেবল ভাঙনের হাতুড়ির শব্দই চারিদিকে শুনি। মনে হয় আমাদের স্বভাবের মধ্যে ব্যক্তি-জীবনের সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠার অভ্যাসের সঙ্গে গণতান্ত্রিক চেতনার একটা প্রবল প্রতিঘাত আসন্ন।

নলিনী থামলো। একবার চেয়ে দেখলো তার মতামত সুরেনবাবুর উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করছে কি না, কিন্তু তাঁর অটল গাম্ভীর্য দেখে কিছুই বোঝা গেল না। চুপ ক'রে ব'সে নলিনী নিজের কথাগুলোই মনে মনে বারংবার তোলাপাড়া করতে লাগলো।

সুরেনবাবু বললেন, আসল কথায় ফিরে আসা যাক্। যে সমস্যাটা দেখা দিল এতে আমার নিজের কথাটাই আমি বীরেশকে জানিয়ে রাখি। বাইরে যত গণ্ডগোলই দেখা দিক্ আমার নিজের ব্যবস্থাই আমাকে চালাতে হবে, নলিনী। আদর্শের আলোটা আমাকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। বিলেতে আর আমেরিকায় আমি নয় বছর ইঞ্জিনীয়ারিং কাজে কাটিয়েছি—ওদের সমাজের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে নিজের পথ আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। কোনো ভুল আমি করিনি। তোমাদের বর্তমান যুগের গোলক ধাঁধাঁয় প'ড়ে নিজের পথ আমি হারাতে পারবো না,—বৌমাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। সরল, সাধু, সৎপ্রকৃতির মেয়ে—এই মডেল আমি তুলে ধরতে চাই। যে উচ্চশিক্ষায় সংশয়, অশ্রদ্ধা, আর হিংসা আনে, সেই শিক্ষা আমি এই পরিবারে চলতে দেবো না। যাঁকে ঘরে এনেছি, তিনি ঘরেই থাকবেন। তাঁকে স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে—হিন্দু সংস্কার আর আদর্শকে আমি কোনো কারণেই ক্ষুন্ন হ'তে দেবো না।

বীরেশ এতক্ষণ পরে মুখ তুললো। বললে, কিন্তু যার জন্যে আপনার এই বিধান, তার প্রকৃতির পক্ষে যদি গ্রাহ্য না হয়?

তাতে ভয় পাবো না। কন্যার মতন তাঁকে বরণ ক'রে ঘরে তুলেছি। আমার স্নেহের পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে কোনো দুর্যোগ-ই আমি হাসিমুখে সহ্য করবো। এই সান্ত্বনা থাকবে, অন্তরের সঙ্গে যা বিশ্বাস করি, তার জন্যে দুঃখবরণ ক্লেশকর নয়।

কিন্তু আমি যদি এতে সুখী না হই?

সুরেনবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, নলিনীর কথা শুনে মনে হ'লো আধুনিক যুগ অল্পে সুখী নয়, অসন্তোষ তার প্রকৃতিগত। তোমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য প্রকাণ্ড প্রাচীন আদর্শ তার সব ঐশ্বর্য নিয়ে ভেঙে পড়বে,—একটি নিরপরাধ

জীবন ধ্বংস হবে,—সেই সুখের প্রশ্রয় আমি দিতে পারবো না। বৌমাকে এ বাড়ির সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে আমি এনে বসাবো এই আমার শেষ কথা।

নলিনীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

বীরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, কোনো কালেই আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না এই কথাই আমি বলতে পারি। আপনার দিক থেকে যা ন্যায়বিচার তাই আপনি করবেন।—এই ব'লে এগিয়ে এসে সুরেনবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে সে ঘর থেকে রুদ্ধ অশ্রু চাপতে চাপতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সুরেনবাবু স্থির হয়ে রইলেন এবং ওপাশে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অশান্ত ব্যাকুল হৃদয়ে নলিনী স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো।

একটু পরে রাঙাদিদি ঘরে এসে দাঁড়ালেন—বললেন, নলিনী, এসো ভাই—ওদের দলে ভিড়ে তোমার কেন মনখারাপ? কুটুম্বের মেয়ে, সকাল থেকে জলটুকু অবধি মুখে তোলোনি, এসো ভাই।

পিসিমা? সুরেনবাবু ডাকলেন।

রাঙাদিদি বললেন, হেস্তনেস্ত একটা করো বাপু, এসব আর ভালো লাগে না। ছোঁড়ার চেহারা শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে, মুখের দিকে চাইলে কান্না পায়।

সুরেনবাবু বললেন, বৌমা অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন জানি, কিন্তু আমি গিয়ে দাঁড়ালেই সব ঠিক হবে। এ-বাড়ির বৌয়ের উপযুক্ত দম্ভই তিনি প্রকাশ করেছেন। আমি খুশী হয়েছি। কাল আমি যাবো, তাঁকে মাথায় ক'রে ফিরিয়ে আনবো।

তিন

আষাঢ়ের শেষের দিকে শুক্লপক্ষ হ'লেও আকাশের ঘন বর্ষার ঝম্‌ঝম্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দিগন্তজোড়া গুরু গুরু মেঘের ডাক,—অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে চকিত বিদ্যুৎ প্রভাব করালী ভৈরবীর কাল-কটাক্ষ আকাশে-আকাশে জ'লে উঠেছিল

নিজেদের বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বেলে নলিনী একখানা বই হাতে নিয়ে বসেছিল। জানালার শার্সির গায়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছে, মেঘের গর্জনে কেঁপে উঠছে জানালা দরজা। বর্ষা নিবিড় হয়ে উঠেছে

BIRCHANDRA STATE LIBRARY AGARTALA, TRIPURA 58958 20/11/78 Rs-16.00

পথে ঘাটে, রাস্তার আলোগুলো ঝাপ্‌সা, ঘোলা জল ছিটিয়ে মোটরের চাকার শব্দ আসছে—বই হাতে নিয়ে বসেও নলিনীর মন পড়েছিল পথের দিকে।

জানালার শার্সিতে শব্দ হ'লো। মুখ তুলে নলিনী বললে, কে?—কিন্তু ভিজা শার্সির ভিতর দিয়েও সে বীরেশের মুখ দেখতে পেলো। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলে দিলে।

এত বৃষ্টিতে?

ভিতরে এসে বীরেশ বললে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। বেশিক্ষণ বসবার সময় নেই, ট্যাক্সি আছে সঙ্গে।

নলিনী উৎকণ্ঠ হয়ে প্রশ্ন করলো, কেন? কোথায় যাবে?

কোথায় যাবো সে কথা বলা কঠিন,—তবে যেখানেই যাই চিঠিপত্রে যেন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। আমি দুদিন আগেই বাড়ি ছেড়েছি।

দুদিন আগে?···মেসোমশাই কি লীলাকে ওখানে এনেছেন?

বীরেশ বললে, হ্যাঁ। যে-রাত্রে তাকে আনা হয়েছে সেই রাত্রি থেকেই আমি বাড়িতে নেই। বাবাকে জানিয়েছি, যেদিন একান্তভাবে আপনার আদর্শকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারবো সেইদিন ফিরবো। তার আগে আমাকে খুঁজবেন না।···আমি জানি, বাবা আমার কথা রাখবেন।

আমিও জানি।—ব'লে নলিনী স্তব্ধ হয়ে রইলো।

আমার কোনো ব্যবস্থা কিছুতেই হ'তে পারলো না নলিনী, এই বোধহয় নিয়তির নির্দেশ।

নলিনী বললে, একটা চালের ভুলে কতগুলো জীবন বিপন্ন হ'লো বলো ত'? তোমার, লীলার, মেসোমশায়ের···আরো হয়ত কারো! এর কি কোনো প্রতিবিধান নেই, বীরেশ?

তার গলার আওয়াজ কাঁপলো, কিন্তু বীরেশের সিদ্ধান্ত একটু কাঁপলো না। সে বললে, না। বাবা পথ ছেড়ে দেবেন না, আমাকেও পথ পেতে হবে! দেখা যাক্ জীবনটা কোন্ খেলায় মাতে। কিন্তু তুমি এর পর কী কববে বলো ত'?

কেমন ক'রে বলবো?

বিয়ে করবে ত'?

অবান্তর প্রশ্ন ক'রো না, বীরেশ। তোমার মুখ থেকে শুনতে ভালো লাগে না।

বীরেশ কিয়ৎক্ষণ নত হয়ে রইলো। কিন্তু তার দাঁড়াবার সময় নেই। সে বললে,—বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছে, হয়ত অনেকদিনের জন্যে। তবু তোমার

খোঁজখবর রাখতে আমার ভালো লাগবে,—তোমার কাছ থেকে দূরে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন নলিনী।

নলিনী ভগ্নকণ্ঠে বললে, কেন যাবে তুমি ?

সংসারের নাগালের বাইরে থাকতে চাই, সেই কারণে যাবো আমি।

· বীরেশ বললে, জীবনে যা চাওয়া যায় তার সবই পাওয়া যায় না, এ তোমারই কথা। যাক্‌গে, আমি চললুম—দু'পা গিয়ে আবার সে ফিরে এলো। বললে, একটা সাধ আমার যেন ব্যর্থ না হয়। তোমার বিয়ের তারিখ যেন জানতে পারি, লুকিয়ে এসে তোমার সেই রাজরানীর বেশ দূর থেকে দেখে যেতে চাই।

তার সঙ্গে সঙ্গে নলিনী বাইরে এলো। অশ্রুতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ, তবু প্রশ্ন করলো, মোটরের মধ্যে আর কে রয়েছে ?

ও আমার বন্ধু রজনীমোহন।—আচ্ছা চললুম।—ব'লে বীরেশ গাড়িতে উঠে দরজা টেনে বন্ধ ক'রে দিল। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চললো।

অনেকদিনের সহপাঠী বন্ধু, আত্মীয়, অনেক দীর্ঘদিনের অবকাশের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। ভালোবাসার সেই অশ্রু বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঝরঝরিয়ে নলিনীর দুই চিক্কণ গাল বেয়ে নামতে লাগলো। হাতে ছিল তার বর্ষার একখানা কাব্যগ্রন্থ, সেখানা বর্ষার জলেই ভিজতে লাগলো, গাড়িখানা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও নলিনীর সম্বিৎ ফিরলো না।

প্রবল ঝড়বৃষ্টির ভিতর দিয়ে মোটর স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। ভাড়া চুকিয়ে তারা স্টেশনে নেমে টিকিটঘরের দিকে গেল। দুজনেই স্বাস্থ্যবান্ যুবক, চেহারাও ফিট্‌ফাট। রজনী হাসিমুখে বললে, বাপের হোটের ছিলে এতকাল, একটি পয়সাও রোজকার করোনি। মাত্র পচিশ টাকা সম্বল ক'রে তোমার অ্যাড্‌ভেন্‌চার কতদূর গড়াবে ?

বীরেশ হাসিমুখে বললে, অনেকদূর। বিলেত থেকে আমেরিকা!

রজনী বললে, আমার অত সখ নেই বাবা! বেকারের জীবন কাটিয়েছি, এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই খুশী। কোথাকার টিকিট কাটবো বল্।

পরম উপেক্ষায় বীরেশ বললে, যেখানকার খুশি কাট্, যেখানে হোক গেলেই হ'লো।

তাহ'লে আমার পিসতুতো ভাইয়ের ওখানেই চল্, সে এখন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন-মাস্টার। খুব আমুদে ছেলে, বেশ কাটবে তার সঙ্গে—তুই দাঁড়া এখানে। ব'লে রজনী টিকিট কিনতে চ'লে গেল।

দুজনের সঙ্গে একটিমাত্র সুটকেস ও সামান্য একটা বিছানা ছাড়া আর কিছু

ছিল না। তাই নিয়ে তারা গিয়ে উঠলো এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। বড় কোনো একটা লক্ষ্য, বড় কিছু উদ্দেশ্য বীরেশের মনে ছিল না। তাকে যেতে হবে, তার যাওয়াটাই দরকার। তার দেহের রক্তের রং নীল, সেই রক্তে যেমনই উত্তাপ তেমনই চঞ্চলতা। যে আত্মাভিমান এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে তার এই তরুণ জীবন গ'ড়ে উঠেছে, সেখানে এলো একটা বিপরীত আঘাত, এ আঘাতের সঙ্গে তার মনের কোনো আপস নেই। ভবিষ্যৎটা তার চোখে অস্পষ্ট, কিন্তু তার জন্যে মনে কোনো বেদনা অথবা নিরাশা নেই, মহৎ কোনো স্বপ্ন সার্থক ক'রে তোলার দুরাকাঙ্ক্ষাও তার নেই—বরং পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন ক'রে একটা অনির্দিষ্ট বিপ্লবময় জীবনের দিকে সে যে উল্কার মতো ছিটকে পড়লো, এই নতুন আস্বাদটা তার বেশ ভালোই লাগছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেন একটা অসীম শক্তি ও স্বাস্থ্য অনুভব করছে! তার ব্যায়াম-করা মাংস-পেশীর ভিতরে যে সংহত বলিষ্ঠতা, প্রাণের ভিতরে দুরন্ত অধ্যবসায়ের যে উৎস-গহ্বর, সমস্তই যেন আত্ম-প্রকাশের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কখন বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছেড়েছে, কখনই বা ভরা বর্ষার প্রান্তর আর খাল-বিল পেরিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে, সেদিকে বীরেশের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গতির দোলায় গাড়ি দুলছে, যাত্রীর ছায়া দুলছে, বাইরে বর্ষণমুখর রাত্রিও দুলছে,—বীরেশ স্তব্ধ হয়ে ব'সে নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া ক'রে চলেছে। রঞ্জনী হিসাবী ছেলে, রাত্রির আহার শেষ ক'রে এসেছে, ভবিষ্যৎ জীবন-সমস্যা স্থগিত রেখে একটা সিগারেট শেষ ক'রে সে অলক্ষ্যে কখন যেন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিবাহের সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে বীরেশের মনের যোগ ছিল না, তার নির্লিপ্ত অন্তর দূরে ব'সে সেই দৃশ্যটা আর একবার পরিষ্কার ক'রে দেখতে লাগলো। যে-বালিকা এলো তার স্ত্রীর অধিকার নিয়ে, সে যে সম্পূর্ণ অপরিচিতই রয়ে গেল এজন্য বীরেশের কোনো ক্ষোভ নেই। তার চরিত্রের সামান্য স্বাতন্ত্র্য জানা গেল ফুলশয্যার রাত্রে এবং অষ্টমঙ্গলার বিদায়ের দিনে। তার জীবন যদি ব্যর্থ হয় তার সে দায়িত্ব বীরেশের নয়, সে যদি দুঃখ পায় তার প্রতিকম্পন বীরেশের গায়ে এসে লাগবে না। সত্য কথা বলতে কি, আসবার সময় অশ্রুমুখী নলিনীর চেহারাটা তার চোখের ওপর ভাসছে। আত্মীয়তা নলিনীর সঙ্গে ছিল একথা সে আগে জানতো না, কলেজে অনেকদূর এগিয়ে আলাপ হবার পর একদিন তার সঙ্গে আত্মীয়তা আবিষ্কৃত হ'লো। দূরের মানুষের সঙ্গে ইশারায় আগে আলাপ হ'তো, সহসা যেন দুজনেই এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে। এই আবিষ্কারের আনন্দে প্রথম দিনই তারা বেরিয়ে

পড়েছিল পথে পথে, সারাদিন সে কি অজস্র ভ্রমণ! সাহিত্য নিয়ে দুজনের কী আলোচনা, শেলী নিয়ে কী তর্ক, একালের এলিয়টকে নিয়ে তাদের কী ঘোরতর বিবাদ! বীরেশের ছিল দর্শনশাস্ত্র, নলিনীর ছিল ইংরেজি সাহিত্য। তুমুল তর্ক দুজনে। পূর্ববর্তী জীবনের মন্দ অভ্যাস আর প্রবৃত্তি পরবর্তী জীবনে এসেও মানুষেক মুক্তি দেয় না, - অবচেতন মনের তলায় থেকে সঙ্গোপনে মানুষের সকল কাজ ও কথাকে তারা পরিচালিত করে—এই ছিল এক এক-দিনের বিতণ্ডা।

বালিগঞ্জের এক নিরিবিলি চায়ের দোকানে, লেকের গাছের তলায়, গঙ্গার কোনো নির্জন ঘাটে অথবা ডায়মণ্ডহারবার আনাগোনার পথে ট্রেনের কামরায়,—তারা কেবল কথার পরে কথার মালা গেঁথে কাটিয়েছে। তাদের তরুণ বয়সের অগ্নিস্রাবী প্রাণময়তা আকাশে ফুলঝুরির মতো ফুটিয়েছে তারা, শরতের জ্যোৎস্নায় ঢেলে দিয়েছে মদিরা, বর্ষায়-বসন্তে নিবিড় মধুর স্বপ্ন ছড়িয়েছে দিকে দিকে। এর পরে যে তাদের একদিন শোচনীয় বিচ্ছেদ ঘটবে একথা কল্পনার অগোচরে ছিল। অনেক কথাই তারা আলোচনা করেছে, কিন্তু যে কথাগুলো বললে দুজনেরই ভালো লাগতো তা আর কোনোদিন বলা হয়নি। নরনারীর ভালোবাসা অথবা প্রণয় নিয়ে কত বিদ্রূপ আর পরিহাসই তারা করেছে, থিয়েটারী প্রণয়কাণ্ডের কাঁদুনি অভিনয় ক'রে কত সন্ধ্যায় তারা আমোদ করেছে, সুতরাং বিদায় নেবার সময় পাছে গদগদ ভাবালুতা প্রকাশ পায় এজন্য দুজনেই ছিল সতর্ক। তাদের পরিহাসের বস্তু তাদেরই জীবনে দেখা দেবে, ভাগ্যের এই বিদ্রূপ তারা সইতে পারবে না।

লোকলজ্জা না হ'লেও কানাকানি ছিল নলিনীকে নিয়ে। কলেজক্লাসের ব্ল্যাক-বোর্ডে একদিন একটি ছবি আবিষ্কৃত হ'লো,—পদ্মবনে মত্ত হস্তী। সে যে নলিনীকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে একথাও একদা প্রকাশ পেলো ওই ব্ল্যাক-বোর্ডে,—ওগো নলিনী, খোলো গো আঁখি, এখনো ঘুম ভাঙিল নাকি।' কলেজের ছাত্র-মহলে কী হাসাহাসি প'ড়ে গেল। বীরেশের নামে বেনামী চিঠি, নলিনীর বসবার জায়গায় ছুরি দিয়ে কাঠের ওপর খোদাই করা সতর্কবাণী! ওখানেই শেষ নয়, যৌন-নিগ্রহের দেশে মানুষ—বাঙালী বালকরা লালসার ফেনা মুখ দিয়ে বার করতে লাগলো গলগল ক'রে—নানা উপায় উদ্ভাবন ক'রে তারা জব্দ করতে লাগলো দুজনকে। যেদিন নলিনীর সীট-এ একটি সিঁথিমৌর এবং বীরেশের সীট-এ একটি টোপর পাওয়া গেল সেদিন কলেজে কী ভীষণ গণ্ডগোল। এমনি লাঞ্ছনার ভিতর দিয়েই তাদের কলেজের জীবন শেষ হয়।

বীরেশের চোখে তন্দ্রা নামলো।

ভোরের দিকে রজনীর ডাকাডাকিতে তার ঘুম ভাঙলো। গাড়ি এসে কোন্ একটা মফঃস্বলের স্টেশনে থেমেছে। বাইরের আকাশ মেঘ-মলিন, গতরাত্রির পুঞ্জীভূত অভিমান তার কপাল থেকে এখনো মোছেনি, এখনো হাসি ফোটেনি। এইভাবে ট্রেনে চড়ার অভ্যাস তার নেই। সে বরাবরই সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী, সঙ্গে চাকর থাকে—আরামের উপকরণ ভিন্ন সে কোনোদিন ভ্রমণই করেনি! ঘুমচোখে অসীম বিরক্তি মুখে মেখে সে রজনীর পিছনে পিছনে স্টেশনে নেমে পড়লো।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে আমাকে?

রজনী হাসিমুখে বললে, নরকে!

সে কি, এক নরক থেকে বেরিয়ে অন্য নরকে? এমন কিছু পাপ করিনি। একটু চা দাও, নইলে আর এক পা-ও নড়বো না।

চা? পঁচিশ টাকা যার ইহকাল পরকালের সম্বল, সে বাজে খরচ করবে কোন্ লজ্জায়?

তা বটে! অতঃপর তাকে কিছু আত্মসংযম করতে হবে বৈকি! নিরুৎসাহ হয়ে বীরেশ বললে, চিরকালের অভ্যাস কিনা, না পেলে একটু কষ্ট হয়।

রজনী বললে, জমিদারী অভ্যেস যত শীঘ্র ছাড়তে পারো ততই মঙ্গল!

আচ্ছা, এক পেয়ালা দে, আর কোনোদিন চাইবো না।

চা খাবার পর বীরেশ বললে,—নে এবার চল্, তোর পিস্তুতো ভাই-টাই কোথায় আছে খুঁজে বা'র কর। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে গেল।

ক্ষিদে? রজনী আবার তাকে ধমক দিল। বললে, কথায় কথায় ক্ষিদে? অ্যাড্‌ভেন্‌চার করতে বেরিয়েছ, পথের ধারে কোন্ উর্বশী তোমার জন্যে ষোড়শ উপচার সাজিয়ে রেখেছে শুনি?

তা বটে! ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তার মনে থাকলে এখন থেকে আর চলবে না। পৃথিবী তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিয়েছে, জীবনের বাস্তবতা ভয়ঙ্কর কটাক্ষে তাকে আতঙ্কিত করছে, তার সুখলালিত জীবন অতঃপর শেষ হয়ে গেল। এখন ক্ষুধার অন্ন পথ থেকে খুঁটে খুঁটে তাকে খেতে হবে, নিজেরই অশ্রুর অঞ্জলি পান ক'রে তাকে তৃষ্ণা মিটাতে হবে। পৃথিবী সুন্দর হ'তে পারে, কিন্তু স্নেহহীন। মানুষ বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু মানুষ বড় নিষ্ঠুর। বীরেশ রজনীর পিছনে পিছনে চলতে লাগলো।

রজনী স্টেশনমাস্টারকে খুঁজে বা'র ক'রে প্রশ্ন করলো, নীরেনবাবু কোন্ বাসায় থাকেন, দয়া ক'রে বলবেন আমাদের?

মাস্টারবাবু বললেন, নীরেন? আমাদের অ্যাসিস্টাণ্ট্ মাস্টার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সে ত' দুমাস হ'লো এখান থেকে বদ্‌লি হয়ে গেছে। সে এখন আছে খুলনায়।—আপনি কে?

—আমি তার মামাতো ভাই। আগে জানতে পারিনি যে, সে এখানে নেই। আচ্ছা, নমস্কার।

দুজনেই ভারি দ'মে গেল। কিন্তু এতদূর এসে আর কোনো উপায় নাই। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। রজনী বিরক্ত হয়ে বললে, তুই বড়লোকের ছেলে হলে হবে কি, ভারি অপয়া।

বীরেশ হেসে উঠলো। বললে, এবার যুদ্ধটা জমবে ভালো। তোমাদের খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে, সঙ্কটজনক পরিস্থিতি, তাই হয়েছে। বেশ লাগছে এবার। চল্ একদিকে হাঁটা দিই।

ভগ্নমনোরথ হয়ে রজনী বললে, এমনটা হবে কে জানতো। বেস্পতিবারের বারবেলায় বেরিয়ে···

তোর মাথা! কুসংস্কারের দড়ি বাঁধা কোমরে, পথে বেরিয়েছিস ভাগ্য ফেরাতে! বুকের ছাতি অত ছোট কেন? আয় আমার সঙ্গে। ব'লে বীরেশ তাকে টানতে টানতে স্টেশনের বাইরে নিয়ে চললো।

বাইরে এসে দেখা গেল অপরিচিত নতুন দেশ। তারা শহুরে মানুষ, গ্রামের সঙ্গে তাদের পরিচয় রেলগাড়ির জানালা দিয়ে। উপন্যাসে পড়েছে গ্রামের কথা, কাব্যে গ্রামের সৌন্দর্যবর্ণনাও দেখেছে। সেই উপন্যাস অথবা কাব্য তাদের প্রতারণা করেনি, সৌন্দর্য অবশ্যই আছে। কিন্তু একি, কারো গায়ে জামা নেই! কারো পায়ে জুতো নেই! সামনে নোংরা মিঠাইয়ের দোকানে বড় বড় মাছি ভন্‌ভন্ করছে। নারকেল দড়ির রাশ পরানো দুটো রুগ্‌ণ ঘোড়ার ঘাড়ে একখানা জীর্ণ ঝড়ঝড়ে ছ্যাক্‌ড়া গাড়ি। গত তিনদিনের বৃষ্টিতে মেটে পথ হাঁটু-প্রমাণ কাদায় পরিপূর্ণ, তার পাশে ঘন কচুরিপানায় একটা ডোবা। সেই কাদার উপর দিয়ে একখানা কাঁঠাল-বোঝাই গোরুর গাড়ি সর্বাঙ্গে কাদা মেখে পথ পার হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, দু একটি করোগেটের ঘর ছাড়া আর সবই পাতার কুটির। এই পাথর কাদা ভেঙ্গে তারা কোথায় ও কোন্‌দিকে যাবে, গিয়ে কী করবে, কোথায়ই বা আস্তানা মিলবে, এই সব কথা তোলাপাড় করতে করতে অসীম নিরুৎসাহে তারা একবার থমকে দাঁড়ালো।

হোটেল! তুই কি বিলেতের মিড্‌ল্যাণ্ডে এসেছিস যে দু'পা এগোতেই ইন্ পাবি? এর নাম বাংলার পল্লী, আদি ও অকৃত্রিম।

খাবো কী, থাকবো কোথায় ?

রজনী বললে, সোনার বাংলার ধানসেদ্ধ খাও, নদী খুঁজে জল গেলো, আর থাকো পাতার ঘরে। চেয়ে দেখ চারদিকে, শস্যলক্ষ্মী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বীরেশ বললে, আমি যাব না কোথাও, স্টেশনের ধারে প'ড়ে থাকবো।

বটে ? দেশে পুলিশ নেই, গোয়েন্দা নেই ? তারা চাকরি বজায় রাখার জন্যে বিপ্লবী ব'লে যদি ধরিয়ে দেয় ?

প্রমাণ করবে কী ক'রে ?

প্রমাণ! প্রমাণ বুকের ছাতি, হাতের মাস্‌ল—পরাধীন দেশের প্রমাণের অভাব ? নে চল্, এগো।

ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ান এসে ধরলো,—বাবু যাবেন নাকি ?

বীরেশ বললে, ওহে কর্তা, এদিকে থাকা-টাকার জায়গা কোন্‌দিকে বলতে পারো ?

পারি বৈকি, জমিদারবাবু আপনারা,—মামলা করতে এইয়েছেন কি ? চলুন বাবু আমি নে যাবো।

মামলা করতে আমরা আসিনি ভাই, তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি।

গাড়োয়ান তার মাড়ি বার করা দাঁত খুলে হাসতে লাগলো। পরে বললে, কাছারির দিকে যাবেন ত' ?

কাছারি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ কাছারির দিকেই যাবো বটে! নিয়ে যাবে তুমি ? পথ কতটা ?

দেড় কোশ বাবু। দেখবেন বাবু পক্ষীরাজ ঘোড়া, কেমন উড়তি পড়তি যায়!

কত নেবে ?

মালিক আপনারা, খেতে দেবেন যা হয়। তিন গণ্ডা পয়সা দেবেন, বাবু।

—তিন আনা! বলো কি ? আনা দুই দিতে পারি।

—প্রাণে মারবেন না, বাবু। আচ্ছা যা হয় দেবেন, আর এট্টা পয়সা। আসেন। চ্চ্, চ্চ্, ছব্‌রু রে।

গাড়ি চ'ড়ে কাদা ভেঙে খানা-খোন্দলে চাকাসুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে দুর্গানাম জপ করতে করতে তারা চললো। পক্ষীরাজ ঘোড়া 'উড়তি-পড়তি' গেল না, ঘুমুতে ঘুমুতে ল্যাজ দিয়ে মশা-মাছি তাড়িয়ে দিব্যি হেঁটেই চলতে লাগলো। যাবার তাড়া নেই, বেলা এখনো বাড়েনি, মেঘমলিন আকাশ, নিরিবিলি গ্রামের পথ, দুই বন্ধু পরম পুলকে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে চললো।

বীরেশ একসময় রজনীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললে, প্রথম দিনেই লাভের চেহারা দেখা যাচ্ছে, কী বল্ ?

রজনী বললে, কেন ?

দেড় ক্রোশ রাস্তা—ন'পয়সা ভাড়া। ড্যাম্ চীপ্। খুব ঠকানো গেছে ব্যাটাকে, কী বলিস ?

রজনী উৎসাহ প্রকাশ না ক'রেই বললে, আনা দুই হ'লেই ভালো হ'তো।

কেন ?

পরম বিজ্ঞের মতো রজনী বললে, দরিদ্র দেশ! গাড়োয়ান ভাবছে ওরই বেশী লাভ! তোরা শহুরে লোক, গ্রামের কী বুঝবি ? আমার দিদিমার ছোট দেওরের এক দৌহিত্রের মামাশ্বশুর তার শালীর বিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামে। গ্রামের আমি অনেক জানি।

বীরেশ মুখ টিপে হেসে বললে, তুই এখন থেকে এই ভাবেই আমাকে জ্ঞান দান করবি ?

তা কী করব, 'কাঁচা মাল' এনেছি সঙ্গে, তাকে ভদ্রসমাজের যোগ্য ক'রে তুলতে হবে ত'! পঁচিশ টাকার ধনী এসেছেন গ্রামে, সাড়া প'ড়ে গেছে, তা জানিস ?

আমি না হয় পঁচিশ টাকার ধনী, তুই যে গাধাও নয়, ঘোড়াও নয়!

থাম্। জানিস আমার পিসতুতো ভাই এখানে চাকরি করতো, আমি তোর কী না করতে পারি ?

উচ্চরোলে দুই বন্ধু পল্লীপথ সরগরম ক'রে হেসে উঠলো।

দেড় ক্রোশ পথ পেরিয়ে কাছারির কাছাকাছি এসে পৌছতে প্রায় ঘণ্টা দুই লাগলো। কিন্তু কাছারির দৃশ্য বড়ই করুণ। ঝড়ে চাল নেই, খড়ো ঘর, পাকা একটি সুপ্রাচীন অশ্বত্থময় দালান, গাছতলায় দু-একখানা চৌকি, একটি বিড়ির দোকান, দু'খানা করোগেটের চালা। কাছারির কাছে এসে কাছারি খুঁজে বার করতে হ'লো। এ অঞ্চলটি অনেক ফাঁকা, স্থানীয় দুচারজন লোকজনও দেখা গেল। গাড়ি থেকে নেমে তারা ভাড়া চুকিয়ে দিল।

সেটা ছুটির বার নয়। কাছারির আশে পাশে মামলা মোকদ্দমার গুঞ্জন চলেছে। কিন্তু এতই ক্ষীণ, এতই নিঃশব্দ মন্থর গতিতে, যে কাছারির অস্তিত্বটাই হাস্যকর। এদিকে গাড়িখানা পেরিয়ে যাবার পর জনহীন পল্লী প্রান্তর এতই নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল হয়ে দেখা দিল যে, বেশিক্ষণ টিকে থাকাই যেন শাস্তিস্বরূপ মনে হ'তে লাগলো। কেন এই স্বেচ্ছনির্বাসন ? কেনই বা এই আত্মদ্রোহিতা ? রজনীর কৈফিয়ত আছে। সে গরীবের ছেলে, পথে বেরিয়েছে ভাগ্য ফেরাতে। সম্পদ ও সৌভাগ্যের সঙ্কেত যেদিক থেকে আসবে, সে পালাবে। তাকে বেঁধে রাখার কারণ নেই, আয়োজনও নেই। কিন্তু সে নিজে ? তার কোনো কৈফিয়ত

নেই। আপাত বিচার যদি কেউ করে তবে তার গৃহত্যাগ হবে পরিহাসের বিষয়। বউ পছন্দ হয়নি, মনের দুঃখে তাই সে বিবাগী! কেন হয়নি? স্ত্রীর বয়স অল্প, অল্প লেখাপড়া জানে, হালফ্যাশানের তরুণীপনা তার নেই, সে গ্রামের একটি সরলা বালিকা। এই,—এ ছাড়া তার আর কিছু বলবার নেই। তার আদর্শ, তার রুচি, তার জটিল শিক্ষা আর জটিলতর চালচলন, জীবন সম্বন্ধে তার ভীষণতর দৃষ্টিভঙ্গী,—এ সব পৃথিবীর লোকের কাছে হাসির বস্তু। কেউ শুনলে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বিদ্রূপ ক'রে বলবে, যাও, ঘরে ফিরে যাও, বাছা! বাতাসের সঙ্গে বিবাদ ক'রে ছেলেমানুষি ক'রো না। তার ভাগ্য ফেরাবার দরকার নেই, ইংরেজি ভাষা ও আইনের ছাত্র হিসাবে তার অসামান্য খ্যাতি। আজও সে প্রাক্‌টিসে নেমে অতি সহজে অনেক বেশী পয়সা জমাতে পারে। পিতার একমাত্র পুত্র সে, সম্পত্তি তার কম নয়। তার মাসিক হাত খরচের যা পরিমাণ সে একটা বৃহৎ পরিবারের ভাত। আগামী অক্টোবরে তার বিলেত যাবার কথা, শীঘ্রই জাহাজের সীট রিজার্ভ করতে পারতো—কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল। প্রকাণ্ড একটা ভূমিকম্প! উৎকেন্দ্রিক হয়ে ছিট্‌কে এসে পড়লো একটা অদ্ভুত অপরিচিত জীবনযাত্রায়। এখানে তাদের প্রকাণ্ড প্রাসাদের বিলাস উপকরণ নেই, রাঙাদিদির দিনরাত্রির সস্নেহ প্রহরা নেই, অবকাশের নিরিবিলি মুহূর্তগুলিতে নলিনীর মধুর সাহচর্য নেই, অনাহূত আহারের আয়োজন, অপ্রার্থিত সেবা কোথাও কিছু নেই। সমস্ত পল্লীর সৌন্দর্য, নির্জন প্রান্তর, নিঃসঙ্গ সকালের চেহারা—সমস্তটা মিলিয়ে বীরেশের চোখে কালো ছায়া নেমে এলো।

অদূরে একখানা পরিত্যক্ত চালাঘর। বোধকরি এই বর্ষাতেই কাৎ হয়ে পড়েছিল—রজনী করিৎকর্মা লোক, হৃদয়াবেগে সময় অপব্যয় না ক'রে সে ব্যাগবিছানা দুই হাতে নিয়ে সেই চালাঘরের দাওয়ায় এসে উঠলো। কার ঘর, কে মালিক, জানবার এখন দরকার নেই। জিনিসপত্র রেখে জামা জুতো খুলে কোমর বেঁধে রজনী মজুরের কাজে লেগে গেল। আধঘণ্টা পরিশ্রমের পর আর কিছু না হোক, মাথা গুঁজে দাঁড়াবার মতো জায়গা সে বানিয়ে তুললো।

দুজন লোক এসে দাঁড়ালো। প্রশ্ন করলো, কে বাবু আপনারা?

তোমরা কে?

আমি গাঁয়ের চৌকিদার,—থানার লোক। আর এ হ'লো এ ঘরের মালিক।

বীরেশ বললে, খুশী হলাম। আর কোনো অসুবিধে হবে না। এখানে ঘরামি কোথায় থাকে বলতে পারো? চালাটা তৈরি ক'রে দেবে।

আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। থাকবো এখানে কয়েকদিন।

কলকাতার নাম শুনেই আভূমিপ্রণত হয়ে তারা দুই বন্ধুকে প্রণাম জানালো। বললে, জল হাওয়া এখানে ভালো বাবু, থাকতে পারলে গতরে শক্তি লাগবে।—কিন্তু থাকবেন কেন বাবু?

তোমাদের দেশে কি আসতে নেই?

আচ্ছা, আচ্ছা, থাকেন বাবু, বেশ ত'।

যে ব্যক্তিটি চালাঘরের মালিক,, সে বললে, ঘরটা তৈরি ক'রে নিতে হবে। ঘরামি চাইছেন, কত দেবেন বাবু? এত বড় একটা ঘরের কাজ—খাটুনি আছে।

কত দিতে হবে?

তা বাবু আজকালকার দিন, সব ঘরটা করতে অন্তত দুটো টাকা লাগবে বৈকি!

রজনী এগিয়ে এসে বললে, চাটাই চৌকি যদি সব দিতে পারো তাহ'লে না হয় তাই দেবো।

তা পারবো বাবু, যদি বলেন আমরাই কাজে লাগি

—বেশ ত'।

রুধিরের গন্ধে যেমন বাঘের আমদানি হয় তেমনিভাবে দড়ি, খড়, বাঁকারি চাটাই, হোগ্‌লা ইত্যাদি এনে সেই বেলার মধ্যেই তিন চারজন লোক মিলে ঘর, দাওয়া, দরজা জানালা সমস্ত নূতন ক'রে তৈরি ক'রে ফেললো। তাদেরই উৎসাহে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ে উভয়ের ভোজনও সমাপ্ত হ'লো। কিছু দূরে জলাশয় রয়েছে। দু' একটা কলাইয়ের থালা গেলাসও এসে জুটলো। জানা গেল, নিকটেই বেশ বড় গ্রাম, সেখানে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস। এই গ্রাম তামার বাসন আর বেতের জিনিসপত্রের জন্য এই জেলায় বিখ্যাত। স্থানীয় কামার পাড়ার প্রসিদ্ধি কম নয়। সংবাদগুলি শুনে বীরেশ কিছু উৎসাহিত হ'লো।

ক্রমে ক্রমে কাছারির দু'চার জন পাইক পেয়াদা, থানার দারোগা, ডাক্তারখানার লোক, সব্‌-রেজিস্টারবাবু, একে একে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হ'তে লাগলো। এবং আশ্চর্য, দেখতে দেখতে এই গ্রামের নিরালা একান্তে নানা জল্পনা-কল্পনায় দীর্ঘ আটটা দিন বেশ যেন স্বচ্ছন্দেই কেটে গেল।

শ্রাবণের প্রথম দিকে বর্ষাটা বেশ ঘন হয়ে নামলো। কিন্তু ওদের জীবনযাত্রাটা এরই মধ্যে অনেকটা ধাতে বসেছে। চালার মালিকটি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়েছে, তাদের বড়লোক মনে ক'রে স্বেচ্ছায় তাঁবেদারি ক'রে,

এটা ওটা এনে দেয়, সুখ দুঃখের কথা কয়। রজনী রাঁধে, বীরেশ জল আনে, ঘর ঝাড়ে, মোছে। জুতো জামা ওরা তুলে রেখেছে, গ্রামের পটভূমিতে সেগুলো একটু বেমানান, খালি পায়ে গেঞ্জি গায়েই ওরা আনাগোনা করে, এখানে ওখানে টহল দিয়ে আসে। বিশ্রামের ফাঁকে রজনী কোনো গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে এক এক সময় বেরিয়ে পড়ে। বীরেশ চৌকির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে বাইরের বাদলের ঝিম্‌ঝিম্‌ শব্দ শোনে, জানালার বাইরে চেয়ে মেঘের স্বপন বোনে, আর ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিনটা গ্রামের হাটের বার। হাটকে কেন্দ্র ক'রেই গ্রামে যত বেচাকেনা। স্থানীয় বোর্ড থেকে কয়েকটা খোড়ো চালা তৈরি করা আছে, তার নিচে আশপাশের দু'চারখানা গ্রাম থেকে ফড়েরা মালপত্র এনে বসে। হাটের বারেই গ্রামের গৃহস্থদের দেখা পাওয়া যায়।

দু'চারজন ভক্ত ইতিমধ্যেই জুটে গিয়েছিল। চৌকিদার, ডাকপিওন, মালিক, ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ান, বোর্ডের এক কেরানী, দুজন ফড়ে—এরা সবাই খাতির ক'রে বীরেশ আর রজনীকে এই গ্রামের ঐশ্বর্যের সংবাদ জানাচ্ছিল, এবং এই দলটিকে কেন্দ্র ক'রে সেদিন হাটতলায় জনতাও কম হয়নি।

এমন সময় ওধারে চালার তলায় এক গণ্ডগোল দেখা গেল। জন দুই লাঠিধারী পাইক একজন ফড়ের ঘিয়ের টিন কাৎ ক'রে ফেলে তার উপর মারমুখী হয়ে উঠেছে। ঘি-ওয়ালা গরীব লোক, প্রায় তিন ক্রোশ দূর থেকে তার মাল ব'য়ে এনেছে, ঘিয়ের টিন ওল্‌টানো দেখে সে বাজারের মাঝখানে কেঁদেই আকুল।

বীরেশ গিয়ে দাঁড়ালো তাদের মাঝখানে। উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃতের গন্ধে চতুর্দিক ভর্‌ভর্‌ করছে। ফড়ের দলের মধ্যে ঠেলাঠেলিতে পাইক দু'জন চোখ রাঙিয়ে নিতান্তই যখন লাঠি তুললো, বীরেশ একজনের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল। রজনী বললে, তোর অত মাথাব্যথা কেন, তুই চ'লে আয়।

থাম্‌ রজনী।

কিন্তু বীরেশের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেবার জন্যে দু'জন পাইকই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুতরাং রজনী আর নিরপেক্ষতা রাখতে পারলো না, সেও যুদ্ধ ঘোষণা করলো। লাঠিধারী দ্বিতীয় পাইককে সে যখন বাধা দিল, তখন তাদেরই বন্ধুর দল—সেই চৌকিদার, মালিক, কেরানী, গাড়োয়ান—সকলেই উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলো, বাবুমশাইরা, পাইকদের সঙ্গে যদি আপনারা বিবাদ করেন ত' আমরা আপনাদের সঙ্গে আর ভাব রাখতে পারবো না।

ফড়ে বেটাদেরই দোষ, ওরা কেন খারাপ মাল আনে? দু'চার ঘা মার খেলে ছোটলোক কি আর মরে বাবু? যান, আপনারা চ'লে যান্, লাঠি ফিরিয়ে দিন।

বীরেশ ডান হাতে লাঠি কেড়ে নিয়েছে, বাঁ হাতে ধরেছে পাইকের গলার কামিজের মুটি। বললে, মারবো না তোমাদের, কিন্তু লাঠিও দেবো না। ওদের ক্ষতিপূরণ দেবে কে? বজ্জাত, পাজি,—মাটিতে নাকখত দাও।

পিছন থেকে আর সবাই বীরেশকে টানাটানি করতে লাগলো, ছেড়ে দিন বাবু, নিজেদের সর্বনাশ করবেন না, ওরা হাকিমের লোক। এখুনি আপনাদের হাতকড়া দেবে। ওদের সঙ্গেই আছে।

বটে!···লাঠিখানা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে দুই হাতে পাইকদের ঘাড় ধ'রে বীরেশ বললে, হাতকড়া পরের কথা, ওই ফড়ের পায়ের তলায় একবার নাকখত দাও আগে। দাও শীগ্‌গির, নইলে কীচক-বধ করবো।

পাইকের মাথাটা ধ'রে টিন-ওল্টানো ঘিয়ের ওপর তার মুখখানা বীরেশ জোর ক'রে রগড়ে দিল। ঘিয়ে আর কাদায় তার মুখখানা হ'লো কিম্ভূত-কিমাকার। বললে, লাঠি দেবো না, এবার যাও।

হাকিম আসছেন। কে একজন ব'লে উঠলো।

বীরেশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। দ্বিতীয় পাইকের হাতখানা ধ'রে বললে, তুমি ঘিয়ের টিনে হাত দিয়েছিলে?

সে বললে, না।

ফড়ের মাথার ওপর লাঠি তুলেছিলে?

না।

গরীবের ওপর এই জবরদস্তি করো কেন তোমরা?

পাইক বললে, যারা মালে ভেজাল মেশায় তাদের ওপর আমরা কড়াকড়ি করি।

ভেজাল তোমরা চেনো?

ও লোকটা ভেজাল ছাড়া বেচে না।

বেশ, তবে ঘুষ চাইছিলে কেন? ঘুষ না পেলেই বুঝি ঘিয়ে ভেজাল মিশে যায়?

কিন্তু দূরে হাকিমকে দেখে পাইকরা আবার ফুঁসিয়ে উঠলো। বললে, গ্রামে গুণ্ডামি করতে এসেছ বিদেশ থেকে?···বেশ করবো আমরা, দেখে নেবো তোমাদের।—চেনো না হাকিমকে? আমরা হুকুমের চাকর।

হাকিম আসার সংবাদে জনতা স'রে পড়েছিল। রজনীর মুখ শুকিয়ে গেল। দূর থেকে দেখা গেল তাদের অসময়ের বন্ধু সেই চৌকিদারই হাকিমকে পথ

দেখিয়ে বীরদর্পে এইদিকে আসছে। সঙ্গে কয়েকজন লোক। গ্রামে ডাকাত পড়েছে!

কাদামাখা পাইক ছুটে গিয়ে বললে, হুজুর, গুণ্ডার দল মেরেছে আমাদের। বলুন, ওদের গ্রেপ্তার করি।

হাকিম এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কারা—আপনারা?

বীরেশ বললে, আমরা এই গ্রামে বাস করতে এসেছি।

কোনো কাজে?

না, এমনি।

গুণ্ডামি কি আপনাদের পেশা? আমার লোকেদের মেরেছেন কেন?

বীরেশ সোজা দৃষ্টিতে হাকিমের দিকে তাকালো। ছাঁটা ছোট ছোট চুল মাথায়, ছাঁটা গোঁফ, মুখে কেমন যেন নিষ্ঠুরতা, চোখ দুটো আত্মাভিমানে রাঙা। বয়স ত্রিশের কিছু বেশি। হাতে তামাকের পাইপ ও ছড়ি।

বীরেশ একটু হাসলো। হেসে বললে, গুণ্ডামি যদি কেউ করে, আমাদের বাধা দেবার অধিকার আছে।

সে বিচার আমি করবো, আপনারা নয়। আপনাদের গ্রেপ্তার করা হবে না কেন, সেই কথা বলুন।

এর পর সহসা ইংরেজিতে বচসা চললো। ফৌজদারী আইনের ভালো ছাত্র বীরেশ, তার অনর্গল ইংরেজি ব্যাখ্যায় হাকিম কিছু বিপন্ন বোধ করলেন। বীরেশ বললে, আপনাকে একথা জানিয়ে রাখি, এ মামলা এখানেই শেষ হবে না। এখান থেকে জেলায়, জেলা থেকে সেসনে, সেখান থেকে হাইকোর্ট, দরকার হ'লে প্রিভি-কাউন্সিল, এবং প্রমাণ করবো এখানকার হাকিমের সঙ্কেতে পাইকরা ফড়েদের কাছে ঘুষ নেয়, এবং ঘুষ না পেলে তারা বাজারে গিয়ে গুণ্ডামি করে। বীরেশ উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

হাকিম আদেশ দিলেন, এদের গ্রেপ্তার করো।

কাদামাখা পাইক জিজ্ঞেস করলো, হাতকড়া লাগাবো কি, হুজুর?

হাকিম আসামীদের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, না, এমনি নিয়ে চল্। —আপনারা কি জামিনের বন্দোবস্ত করবেন?

কঠিন রুক্ষকণ্ঠে বীরেশ বললে, আজ্ঞে না, আপনার আচরণের সীমানা অবধি দেখতে চাই। আপনার হাজতের চেহারাটাও একবার দেখি, কাজে লাগবে।

—নাম কী আপনাদের? নাম ধাম পরিচয় বলুন। ওহে অবনী, সব লিখে নাও ত'? ওয়ারেণ্ট পরে সই করিয়ে নিয়ো।

—নাম পরিচয়, কিছুই বলব না। এই, চুপ কর্! ব'লে বীরেশ রজনীকে একটা ধমক দিল।

হাকিম দু'পা এগিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে মারলেন সেই ঘি-ওয়ালা ফড়ের পিঠে। মার খেয়ে ফড়েটা উঠে হাকিমের পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়ে বললে, হুজুর, রক্ষে করুন। আমাদের কারো দোষ নেই! পাইকরাও খুব ভালো লোক, ওই দুইজন কলকাতার গুণ্ডাই যত নষ্টের গোড়া। হুজুর আমাদের বাঁচান।

তীব্র বিদ্রূপের হাসি হেসে হাকিম আসামী দু'জনের দিকে তাকালেন। বীরেশ বললে, চমৎকার!

হাকিমের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

তাদের হাজত-বাস হ'লো, এবং থানা থেকে তাদের সম্বন্ধে তদন্ত চলতে লাগলো। বিনাশর্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেই তাদের মুক্তি দেওয়া হবে, হাকিমের মনে এই বাসনা ছিল। দারোগা গিয়ে আসামীদের এই কথা জানালো। আসামীরা তাকে বিদায় দিয়ে বললে, আমরা বেশ আছি, হাকিমকে বোলো।

ইতিমধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটির কানে খবরটা পৌছেছিল। তারা গ্রামে এসে নির্ভুল ও নিরপেক্ষ তদন্ত ক'রে গেল। তারপর দিন দুয়েকের মধ্যে কলকাতার ইংরেজি বাংলা সংবাদপত্রে খবরটি সালঙ্কারে প্রকাশিত হ'লো। সম্পাদকীয় লেখা হ'লো না বটে, কারণ মামলা বিচারাধীন, কিন্তু সংবাদ সাজানোর মধ্যেই হাকিমের অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণ রঙীন ভাষায় বেরিয়ে গেল।

বাংলা গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে সমগ্রভাবে তদন্ত করার জন্য জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হুকুম পাঠালেন। কংগ্রেস কমিটির লোক, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, পুলিসের বড়কর্তা, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্, লোক-লস্কর, হাতী-হাওদা, গাড়ি-ঘোড়া, তাঁবু-আরদালী সহকারে প্রকাণ্ড একখানা জাহাজ রিজার্ভ ক'রে বাংলার একটি গণ্ডগ্রামে ঘিয়ের টিন ওল্টানোর তদন্তে যাত্রা করলো। গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল। বাংলার আইনপরিষদে একজন কংগ্রেসী সভ্য একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনলেন, সদস্যদের সঙ্গে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উঠলো, কারণ সেই ঘি-ওয়ালা ছিল মুসলমান, কোয়ালিশন দলের অনেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা করলেন; জনৈক সভ্য অশ্লীল উক্তি করবার জন্য পরিষদে তুমুল বিতণ্ডা চললো, অবশেষে ক্ষমাপ্রার্থনা। স্পীকার রুল জারি করলেন। মুলতুবী প্রস্তাব ছয় ভোটে পরাজিত হ'লো। অতঃপর সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মাননীয় সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি, জেলা-কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করিবার জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেসী সভ্য : মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব পরিষদকে কি এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, সরকারী তদন্ত নিরপেক্ষ হইবে ?

স্বরাষ্ট্র-সচিব : এই প্রশ্ন উঠে না।

কংগ্রেসী সভ্য : মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব কি বলিতে পারেন, তদন্তের সুবিধার জন্য আসামীগণকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হইবে ?

স্বরাষ্ট্র-সচিব : উত্তর পাইতে হইলে পূর্বাহ্নে নোটিশ চাই।

পরিষদে তুমুল গণ্ডগোল উঠলো। কংগ্রেস ও জাতীয় দল প্রতিবাদ জানিয়ে পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ ক'রে গেলেন।

সংবাদটি বিলেতে গিয়ে পৌঁছলো। কমন্স-সভায় একজন শ্রমিক-সভ্যের উত্তরে ভারত-সচিব উত্তর দিলেন, ভারত-সরকারের নিকট হইতে এখনও সম্পূর্ণ সংবাদ আসে নাই।

অতঃপর তদন্ত-কাণ্ডের কী ফলাফল হ'লো সুস্পষ্ট জানা গেল না, কিন্তু দেবীপুরের তদন্তের পর সপারিষদ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের বড়কর্তা আশ-পাশের জঙ্গলে কয়েকটা বন্যশূকর শিকার ক'রে বিদায় নিলেন এবং একদা মহকুমা হাকিমের হাতে হাত মিলিয়ে বীরেশ ও রজনী হাসিমুখে হাজত থেকে বেরিয়ে এলো। সকলেই ইংরেজ বাহাদুরের জয় ঘোষণা করলো। পাইকের বেতন থেকে ঘি-ওয়ালা ক্ষতিপূরণ পেলো। টাকাটা অবশ্য গোপনে হাকিমকেই দিতে হ'লো। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত দলিল ও ফাইলে ঘটনাটা চাপা প'ড়ে গেল এবং এই সূত্রে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেক করায় একখানা জাতীয় সংবাদপত্রের কাছ থেকে জরুরী আইনবলে দু'হাজার টাকা আমানত দাবী করা হ'লো। হাইকোর্টে সম্প্রতি এই নিয়ে মামলা চলছে।

গোলমাল মিটবার পর সকলেরই ধারণা ছিল, দুটি যুবক এবার গ্রাম ত্যাগ ক'রে তাদের দেশে চ'লে যাবে, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সেই অনুরোধই জানিয়ে গেছেন। হাকিমকে বিদায় দিয়ে তারা ঘরের কাছে এসে দেখলো, তাদের ব্যাগ-বিছানা নিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ি জুতে সেই গাড়োয়ান অপেক্ষা করছে। তারা এসে দাঁড়াতেই গাড়োয়ান বললে, আসুন বাবুরা ইস্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ কিন্তু বাবু দয়া ক'রে দশটি পয়সা দেবেন।

বীরেশ ফিরে দেখলো, তাদের ঘরখানা ভূষিমালে আর খড়ের বস্তায় বোঝাই হয়ে আছে। ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে মালিক দরজায় তালা বন্ধ ক'রে তাদের নমস্কার জানিয়ে বললে, মনে রাখবেন বাবু আপনারা—আহা অনেক কষ্ট পেয়ে গেলেন।

রুদ্ধ আক্রোশে বীরেশ ফুঁসছিল। রজনী বললে, এবার কিন্তু খুব সাবধান, এটা ওদের ষড়যন্ত্র। আমরা জোর ক'রে ঘর দখল করতে গেলেই ট্রেস্‌পাস্‌। আর ছাড়া পাওয়া যাবে না। তখন সত্যি সত্যিই গুণ্ডা ব'লে প্রমাণ করবে। তুমি যে দু'টাকা খরচ ক'রে ঘর মেরামত করেছ তার ত' কোনো প্রমাণ নেই।

বীরেশ বললে, কিন্তু এ গ্রাম ছেড়ে আমরা কোথাও যাবো না ত'!

কিছুতেই যাবো না। চল্‌ অন্য জায়গা দেখি।—এই গাড়োয়ান, আমাদের জিনিসপত্র দাও, আমরা যাবো না।

বেলা বারোটা কি দুটো বলা কঠিন। কিন্তু দেখতে দেখতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে এলো। বৃষ্টিতেই ভিজতে ভিজতে ব্যাগ-বিছানা হাতে নিয়ে সমগ্র পৃথিবীর বিপক্ষে রুদ্ধ আক্রোশ মুখে মেখে কাদাপায়ে বীরেশ রজনীর পিছনে পিছনে নিরুদ্দিষ্টভাবে চলতে লাগলো। একসময় প্রশ্ন করলো, তোর হাতে পুঁটলী আর ঝুড়ি কিসের রে, রজনী?

রজনী হাসিমুখে বললে, রসদ।

কিসের রসদ?

কাঁচামাল রে।

সে আবার কি?

চাল, ডাল, আলু, মশলা, তেল, ঘি।

বীরেশ হতবাক হয়ে বললে, হ্যাঁ, তুই পারবি। তোরাই সংসারে উন্নতি করবি।

রজনী বললে, যাই বলো, যেখানেই যাও, পেট যায় সঙ্গে। গরম ভাত ফোটালে কে বেশি খায় দেখবো।

কিন্তু ফোটাবি কোথায়?

আয় দেখি,—ওই যে একখানা চালা। দেখি, জায়গা দেয় কি না!

রাংচিতার এক বেড়ার ধারে এসে দাঁড়িয়ে তারা শুনলো, ভিতরে যেন ঢেঁকির আওয়াজ হচ্ছে। তারা সাড়া দিয়ে ডাকলো, কে আছো গো ঘরে?

একটি লোক তখনই বেরিয়ে এলো। লোকটি মুসলমান। বললে, কী চাই বাবু?

তোমাদের এই দাওয়ায় একটু ঠাঁই দেবে?

লোকটি তখনই পিছিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বললে, এ গাঁয়ে তোমাদের কেউ থাকতে দেবে না বাবু। যাও তোমরা।

কিন্তু ভীষণ বেগে বৃষ্টি আসার জন্য বাধ্য হয়ে দু'জনে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। গলা বাড়িয়ে দেখলে, ভিতরে ঢেঁকি নয়, তাঁতের কাজ চলেছে।

তারা করুণ আবেদন জানিয়ে বললে, কর্তা, একবেলার জন্যে রইলুম, দুটো ভাত ফুটিয়ে খেয়েই চ'লে যাবো।

তাঁতীগিন্নী খটাস্ ক'রে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো, তার পিছনে পিছনে কর্তা। কর্তা চোখ রাঙিয়ে বললে, মাগী, তুই আবরু মানিস নে?

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে বললে, না মানি নে। বাছাদের খাবার জায়গা নেই এখন তোমার আবরু?···তোমরা থাকো বাবা, একবেলা কেন, যদ্দিন মর্জি।

কর্তা চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে মাগী, পাইকদের হাতে তুই মরবি। মরণদশা তোর!

মরি মরবো, তোমারই হাতে কোন্ বেঁচে আছি?—দাঁড়াও বাবা তোমাদের জায়গা ক'রে দিই।···আমার হাতে জল আর কাঠকুটো নেবে কি?

বীরেশ ঘাড় নেড়ে জানালো নেবে। রজনী গদগদ কণ্ঠে বললে নেবো বৈকি, মা আমার অন্নপূর্ণা!

আহা, বাছারা ভিজে ঢোল! মুখ দুখানি শুকিয়ে আমসি!—এই ব'লে পিতলের ঘড়া বা'র ক'রে তাঁতীগিন্নী জল আনতে চ'লে গেল। কর্তা একবার সমস্ত ব্যাপারটা নিরীক্ষণ করলো, তারপর বললে, আচ্ছা আমিই রান্নার কাঠ এনে দিচ্ছি। বাম্ভনের সেবা করব, ভয় কি?—এই ব'লে সে চ'লে গেল।

তাঁতী-পরিবারের ঘর-দোর যৎসামান্য। হাত-পা নাড়ার জায়গার অভাব ঘটলেও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। বর্ষায় ভিজতে কিছু আর বাকি নেই। কাপড় জামা দূরের কথা, বিছানাটায় রাত্রে শোওয়া চলবে কি না সন্দেহ। কাঁচা মাটির দাওয়াটুকুর উপর বৃষ্টির ছাটে এরই মধ্যে কাদায় পিছল হয়ে গেছে। জলের ঝাপ্টা থেকে আড়াল করার জন্য তাঁতীবৌ দুখানা বড় চাটাই এনে যুগিয়ে দিল। অনেক কষ্টে যদি বা আস্তানা তৈরি হলো, ভিজে কাঠ জ্বালতে গিয়ে ধোঁয়ায় তাদের চোখে জল গড়িয়ে এলো। কলাপাতার উপর আধ-সিদ্ধ ভাত। একসময় যখন তারা পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন সমাপ্ত ক'রে উঠলো, তখন সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। তাঁতীবৌ বললে, কাল বাবা তোমাদের সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো, আজ একটু কষ্ট ক'রে থাকো। তোমরা কি গাঁয়ে এখন থাকবে বাবা?

রজনী বললে, যদি জায়গা পাই থাকবো বৈকি, মা।

ওনার কথা ধ'রো না, পাগল-ছাগল-মানুষ। আমি সব ক'রে কম্মে দেবো।

যে আজ্ঞে।

রজনী নরম জায়গায় আবেদন পৌছিয়ে দিতে জানে। কারো কাছে নেওয়া বীরেশের এই প্রথম।

বৃষ্টিতে পথের দিকে চাইবার আর উপায় নেই, পথ অন্ধকার। এধারে ওধারে বাঁশবন, আশ-শেওড়ার জঙ্গল, শালুক আর পানায়ভরা ডোবা, শৃগালের চীৎকার, ঝিল্লীর ঝনক্, ব্যাঙের ডাক,—সমস্তটা মিলিয়ে দুর্গম গ্রাম বীভৎস আঁধারে আচ্ছন্ন। এই গ্রামের সৌন্দর্য কোথাও নেই, একে ভালোবাসা সম্ভব নয়—এত বড় অপরাধ তারা করেনি যে, এর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে হবে।

প্রহরখানেক রাত্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁতীবৌ এসে তাদের ডাকলো—এসো বাবা, তোমাদের শোবার জায়গা করেছি। এসো আমার সঙ্গে।

মুখ দিয়ে দু'জনের কথা সরলো না, ভিজা হাওয়ার ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে ব'সে তারা দীর্ঘরাত্রির দিকে তাকিয়ে অকূল-পাথার ভাবছিল। তাঁতীবৌর পিছনে পিছনে এসে ভিতর দিক্‌কার শেষের একখানা চালায় গিয়ে উঠলো। তাঁতীবৌ বললে, এখানায় আগে গোরু থাকতো। উত্তর দিকে ফুটো আছে, তা জল আসবে না ভেতরে। মোটা ক'রে খড় পেতে দিয়েছি - তোমাদের উপযুক্ত কি আর হয়েছে, বাবা? এই লম্পটা রইলো, আলো নইলে চলবে কেন?

অব্যক্ত কৃতজ্ঞতায় বীরেশ কেবল বললে, এই আমাদের যথেষ্ট।

তাঁতীবৌ চ'লে গেল। খড়ের গাদার উপর দুই বন্ধু আরাম ক'রে শুয়ে বললে, আঃ, অকূলে ভাসতে ভাসতে খড়কুটো পাওয়া গেল।

রজনী বললে, হৃদয় আছে প'ড়ে পথে ঘাটে, কেবল খুঁজে নেওয়া দরকার।

গোয়ালাঘরে আস্তানা পেয়ে তারা কয়েকদিন আর নড়তে চাইলো না। হিসেব ক'রে দেখলো, প্রায় দেড়মাস তারা দেশ ছেড়ে এসেছে। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। দেশে ফেরবার কল্পনা তাদের মনে নেই।

শহরে খরচ বেশি পড়ে; গ্রামে খরচ কম। আসবার পর থেকে তাদের কয়েকটি টাকা মাত্র ব্যয় হয়েছে। সম্প্রতি আহারসামগ্রী বাবদ সামান্য কয়েকটি টাকা তারা তাঁতীবৌয়ের কাছে গচ্ছিত রেখেছে। স্ত্রীলোকটি সব আয়োজন ক'রে দেয়। তারা রেঁধেবেড়ে খায়, তাঁতীবৌ তাদের বাসন মেজে দেয় সানন্দে। হাটতলা থেকে রজনী একখানা শাড়ি এনে জোর ক'রে তাকে গছিয়ে বলেছে, অধম সন্তানের উপহার।

তাঁতীবৌ সেই উপহার মাথায় তুলে নিয়েছে। কর্তা নিশ্বাস ফেলে জানিয়েছে, পাইকদের হাতে মাগী মরবেই।

তাঁতীবৌ হাসিমুখে বলেছে, বেঁচে মরেছি তোমার হাতে, ম'রে বাঁচবো তাদের হাতে। ঐতো আমার ছেলেরা, ওদেরই হাতে মাটি পাবো।

গ্রাম থেকে যুবক দুটি আজও বিদায় নেয়নি, এ জন্য গ্রামে একটা আতঙ্ক

ছিল। কিন্তু হাকিমের সঙ্গে যারা লড়াই করলো এবং হাকিমের হাত ধরাধরি ক'রে হাজত থেকে বেরিয়ে এলো, আজও কেউ তাদের তাড়াতে পারলো না,—এটা সামান্য ব্যাপার নয়। আতঙ্কিত হ'লেও গ্রামের জনসাধারণ তাদের সম্ভ্রমের চোখে না দেখে পারলো না। চৌকিদার আবার তাদের সেলাম ঠুকেছে, ডাক-পিওন আর মালিক হাত কচলেছে। হাটতলার কড়েরা দূর থেকে তাদের দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে বলাবলি করে, হুজুররা আসছেন। গ্রামের ডাক্তারখানা আর স্থানীয় বোর্ডের ঘরে তাদের নিয়ে জটলা বসে। আশপাশের পাঁচ-সাতখানা গ্রামে তাদের খ্যাতি এবং অনেকেই জেনেছে ওরা সাধারণ নয়,—বাংলাদেশ ত দূরের কথা, বিলেত পর্যন্ত ওদের নিয়ে আলোড়ন উঠেছিল। ওরা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধেও গ্রাম ত্যাগ করেনি।

সেদিন হাটতলা থেকে ফিরে সবে মাত্র তারা আহার শেষ ক'রে উঠেছে, এমন সময় বাইরে হাঁকাহাঁকি শোনা গেল। তাঁতীকর্তা হাতে একগাছা লাঠি নিয়ে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তাঁতীবৌকে মারতে গেল—হারামজাদী, দেখেছিস ঐ পাইকরা এবার এসেছে গলা টিপে ধরতে। আমাদের ঘর জ্বালাবে, ফাটকে দেবে—ওই শোন্! মাগী তোকে খুন করব!

বাইরে কয়েকজনের কোলাহল শুনে তাঁতীবৌ একটু ভয় পেলো বৈকি! বীরেশ আর রজনী বেরিয়ে এসে বললে, যতক্ষণ আমরা আছি তোমাদের কোনো ভয় নেই।

তার মানে, তোমরা থাকবে না তখন মরবো? ওসব চালাকি শুনি নে, তোমরা এখুনি বেরোও আমার ঘর ছেড়ে। কালকূটে ঢুকেছে আমার খড়ের গাদায়।

দুই বন্ধু বাইরে আসতেই দুই জন সেই পুরনো পাইক, একটি ভদ্রলোক ও জন দুই সরকার তাদের নমস্কার জানালো। পাইক দু'জনের সভক্তি প্রণামের কি ঘটা! বীরেশ প্রশ্ন করলো,—কী চাই আপনাদের?

হাকিমসাহেব আপনাদের নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছেন, এই চিঠি। বিশেষ অনুরোধ, আজ সন্ধ্যায় আপনারা পায়ের ধূলো দেবেন।

চক্ষের নিমেষে তাঁতীবৌ সবটা বুঝে নিল, তারপর দৌড়ে ভিতরে গিয়ে দাঁত খিচিয়ে উঠলো,—মিন্‌সে কোথায়, আজ ওর ছান্দ ক'রে তবে ছাড়বো।

চার

হাকিমের লোকেরা বিদায় নেবার পর বীরেশ চিঠিখানা খুলে পড়লো।

—প্রীতিভাজনেষু,

আশা করি আপনারা কুশলে আছেন। একটা অত্যন্ত অপ্রিয় ঘটনার

সংঘাতে আপনাদের সহিত পরিচয়; ঘটনাটা দুঃখদায়ক হইলেও বিরোধের মধ্যেই আপনাদিগকে উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রমানুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। দেবীপুর গ্রামে বসিয়া কাহারও চরিত্রে অসাধারণত্ব দেখিব ইহা আগে কল্পনা করি নাই।

আজ আমার গৃহে একটি শুভ অনুষ্ঠান, আমার স্ত্রীর জন্মতিথি। এই উৎসব উপলক্ষ্যে আপনাদিগকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইতেছি। সন্ধ্যা আটটার সময় আপনারা আসিয়া আমাদের উভয়ের সহিত আহার করিলে বিশেষ বাধিত হইব। আমার স্ত্রীও একান্ত অনুরোধ জানাইতেছেন। ইতি—

প্রীতিকামী

অনিলকুমার সেন

চিঠি প'ড়ে বীরেশ বললে, টেবল্ উলটে গেল যে রে!

রজনী বললে, গ্রেপ্তারের ফন্দি নয় ত'?

কাদা ভেঙে রাত আটটায় গাঁ পেরিয়ে যাবো, লোকটা বোধহয় জব্দ করতে চায়।

ভালো খাওয়া পেলে কষ্ট সইবে। পান্তা ভাত আর খেতে পারি নে!

কিন্তু এই অঞ্চলে তাদের যেরূপ খ্যাতি রটেছে তাতে তাদের সহজে জব্দ করা কঠিন। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার উপর তাদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত নয়, এর মধ্যে সত্যকারের আতঙ্ক নিহিত ছিল। হাকিম ও ম্যাজিস্ট্রেটও তাদের হায়রান করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছে গ্রামবাসীর পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। ফড়ে আর চাষার জন্য তারা লড়াই করেছে, বড়লোকের ছেলে হয়ে সম্পদ ত্যাগ করেছে, সুতরাং কর্তৃপক্ষের অনেকেই তাদের সাম্যবাদী ব'লে সন্দেহ করেন। চাষাভূষো আর মজুরদের ক্ষেপিয়ে তোলা ছাড়া তাদের আর কী কাজ আছে? যাই হোক, যুবক দুটির কৃপায় এই জেলায় জন চারেক গোয়েন্দার চাকরি জুটে গেছে। তারা অশরীরী প্রেতের মতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিচরণ করে, কিন্তু প্রহারের ভয়ে ওদের সামনে আসতে সাহস করে না।

অনেকদিন পরে আকাশের চেহারা দেখে আজ তারা ধোপদস্ত ধুতি আর পাঞ্জাবি বা'র করলে। তাঁতীবৌর চোখে আনন্দাশ্রু। জাতিতে সে মুসলমান, কিন্তু স্নেহপ্রকাশের সময় সে তার জাতের কথা ভুলে যায়! সে তার ঘরে গিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে চন্দনকাঠ বার ক'রে ঘ'সে চন্দনতিলক দিল দু'জনের দুই কপালে। রজনী মুগ্ধ অভিভূত কণ্ঠে বললে, রোজ সন্ধ্যেবেলা তুমি ওই তুলসীতলায় আলো দাও, উঠানে ও দুটো বুঝি পীরের দরগা?

তাঁতীবৌর আনন্দাশ্রু সহসা করুণ মাতৃস্নেহে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ফুঁপিয়ে কেঁদে সে বললে, না বাবা ও আমার মুন্নি আর রহমান, ওইখেনে ওরা আছে মাটির তলায়। সাত বছর হ'লো। ওলাউঠোয় গেল ওরা দু'জনে!

দু'জনে আর কথা বলতে পারলো না। রজনী আড়ালে গিয়ে অলক্ষ্যে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে এলো।

রাস্তায় নেমে রজনী বললে, জুতোটা অনেক কষ্টে পরিষ্কার করেছি রে। হাতে নিয়ে চল্, হাকিমের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পায়ে দেওয়া যাবে।

আমি পারবো না। – বীরেশ জানিয়ে দিল।

কিন্তু রাস্তায় নেমে কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল, হাকিমের দুই পেয়াদা সেই সরকারবাবুটি তাঁদেরই জন্যে পথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের লক্ষ্য ক'রেই রজনী তাড়াতাড়ি জুতোটা প'রে নিল। একজন পেয়াদার হাতে ছিল একটা পেট্রোমাক্স লণ্ঠন, বোধ করি দশখানা গ্রামের মধ্যে সেইটিই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল আলো। তারা নমস্কার জানিয়ে বললে আসুন, তাঁরা আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছেন!

অনেককাল পরে একটা আভিজাত্য বোধ করা গেল। দু'জনের সাবান-ঘষা মুখ, গোঁপ-দাড়ি কামানো, তার উপর ধোপদস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে জুতো,—আর চেহারা? অন্তত হাকিমের পাশে নিতান্ত বেমানান হবে না।

হাকিমের দরজার কাছে যখন তারা পৌছল, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। ফুলের বাগান দেওয়া আধুনিক ধরনের একটি বাংলো, সামনের বারান্দায় একটা বড় টেবিলের উপর কড়ি-কোটা চীনামাটির পাত্রে একগোছা ঝুঁটিবাঁধা কেতকী। পল্লীগ্রামে হ'লেও গ্যাস বাতির আলোয় সমস্ত বাংলোটা আলোকিত। তাদের দেখে হাসিমুখে হাকিম এবং তাঁর স্ত্রী দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন। দুটো বড় বড় কুকুর ছুটে এলো তাঁদের আগে অভ্যর্থনা জানাতে। হাকিম এসে দু'জনের হাত ধ'রে উপরে তুলে নিলেন। বললেন, ইনি আমার স্ত্রী মিসেস্ অনুশীলা সেন। আসুন, আসুন—

নমস্কার বিনিময়ের পর রজনী বললে, ইনি আমার বন্ধু বীরেশ চৌধুরী, আমি রজনী রায়—

মহিলাটির বয়স পঁচিশের মধ্যে। চেহারাটা সুশ্রী, এবং আধুনিক পালিশে উজ্জ্বল। পরনে একখানা চকোলেট ক্রেপ শাড়ি, ঝলমলে জরির পাড়। হাতে আর গলায় চিক্‌চিকে চুড়ি আর হার, পায়ে হালফ্যাশনের স্লিপার। তিনি বললেন, গ্রামে এমন রাস্তা নেই যে গাড়ি চলবে। সুতরাং আপনাদের হাঁটিয়েই নিয়ে এলুম, খুব কষ্ট হয়েছে ত'?

অনিলবাবু হেসে বললেন, এ গ্রামে পা দেওয়া থেকেই ওঁরা কষ্ট পাচ্ছেন।

সকলেই সকলের মুখের দিয়ে চেয়ে এই অর্থপূর্ণ কথায় উচ্চ হাসি হেসে উঠলো। বীরেশ হাসিমুখে বললে, আর কোনো কষ্টের কারণ আছে কি না তাই ভাবছি।

মিসেস্ সেন বললেন, ওঁর ওপব আপনার সন্দেহ বুঝি আজো যায়নি ?

বীরেশের মুখ রাঙা হয়ে এলো। বললে, না হাজত থেকে বেরিয়ে ওঁর সঙ্গে খুব আলাপ হ'য়ে গিয়েছিল।

রজনী বললে, আপনারা কতদিন এখানে আছেন ?

এই প্রায় দু'বছর হ'লো। বদ্‌লি হবার কথা চলছে, কিন্তু আমার এ অঞ্চল ছাড়তে ইচ্ছে নেই, কেমন সুন্দর গ্রাম।

চায়ের ট্রে এসে হাজির হ'লো। মিসেস্ সেন বললেন, অভ্যেস আছে ত' ?

আছে। বীরেশ বললে, —তবে তাঁতীমা'র ঘরে এসব পাওয়া যায় না।

মিসেস্ সেন হাসতে হাসতে চা ঢালতে লাগলেন।

মিস্টার সেন বললেন, হাটতলায় আমি হাকিম, এখানে কিন্তু অনিল সেন। আপনারা অতিথি নিমন্ত্রিত, এখানে আপনাদের সেবা করব।

মিসেস্ সেন বললেন, ফরমালিটি রাখো। আচ্ছা আপনাদের এ অঞ্চল কেমন লাগে ?

অনিলবাবু বললেন, সে ত' অভিজ্ঞতাতেই প্রকাশ।

রজনী বললে এখানে হঠাৎ এসে পড়েছি দু'জনে, পাড়াগাঁ ভালো লাগতে একটু দেরি লাগে। এখনো ঠিক ধাতে বসেনি।

অনিলবাবু বললেন, থাকুন এখানে, আমাদের দল ভারি হোক। এখানকার কাজ-কারবার ভালো, তবে কেউ অরগ্যানাইজ করে না। আপনারা যদি থাকেন তবে আমি সাধ্যমতো সাহায্য করতে পারি। আগে ইউনিয়ন বোর্ডটা অধিকার করা দরকার। কেউ কোনো চেষ্টা করে না এখানে, শহরকে তুলে এনে যদি আমরা গ্রামে বসাতে পারি তবেই কাজ হয়।

বীরেশ আকৃষ্ট হয়ে উঠলো। বললে, আমারও একটা প্ল্যান আছে।

সিগারেট ও চুরুটের পাত্র এলো। পাঁচ সপ্তাহ পরে রজনী সিগারেট মুখে তুললো।

আপনি ?

বীরেশ বললে, আমি খাই নে।

মিসেস্ সেন বললেন, গ্রামে রাস্তাঘাট নেই, লাইব্রেরী নেই, ক্লাব নেই, ডাকবাংলো নেই। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে ? শহরের কোনো জিনিস কিনতে

পাওয়া যায় না। ইস্কুল, পাঠশালা, লেখাপড়ার গন্ধও নেই! যাকে বলে, অশিক্ষায় অন্ধ। ‘কিন্তু কি জানেন, আমি বিশ্বাস করি মানুষের চেষ্টায় সবই হ’তে পারে, তবে তার আগে হাতের মধ্যে ক্ষমতা পাওয়া দরকার।

বীরেশ বললে, ক্ষমতা ত’ আপনাদের আছে!

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হেসে উঠলো, হাসির কারণ কিছু রহস্যময়। মিসেস্ সেন বললেন, এ দেশে কোনো বড় কাজ করবার ক্ষমতা হাকিমদেরও নেই। তারা ফড়েদের ঠ্যাঙাতে পারে, পাইক পাঠিয়ে বিনা অপরাধে লোককে হাজতে পাঠাতে পারে, দেশের কর্মীদের হায়রান করতে পারে – কিন্তু দেশের কাজ করবার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা হাকিম নয়, হাকিমের অভিনয় করে, চাকরি করে।

বীরেশের চোখ দপ্ দপ্ করতে লাগলো। বললে, আমাদের পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন কেন আপনারা?

গোয়েন্দা! অনিলবাবু বললেন, কই এ ত’ আমরা জানি নে।

রজনী বললে, তারা ত’ ধরুন হাকিমের হুকুমেই চলে।

অনিলবাবু বললেন, যদি গোয়েন্দা আপনাদের পিছনে লেগে থাকে তবে অত্যন্ত অনুতাপের কথা। অবশ্য আপনাদের জানিয়ে রাখলুম আমার দিক থেকে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি বুঝতে পারলে তাদের বাধাই দেবো। কর্তৃপক্ষরা এ খবর আমাকে দেয়নি।

মিসেস্ সেন বললেন, এদেশের হাকিমকেও ওরা বিশ্বাস করে না, তা জানেন?

সবাই হাসলো। ভদ্রমহিলা বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। এদেশের ছাগলকেও ওরা ভয় পায়, কারণ তার দুধ খেয়ে মহাত্মাজীর মতন একজন বিপজ্জনক মানুষ তৈরি হ’তে পারে।

আবার হাসির রোল উঠলো।

বীরেশ তার নিজের জন্য একটা অপ্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করলো। সহসা মনে হ’লো, দেশ ছেড়ে আসার জন্য তার মনে আর কোনো ক্ষোভ নেই। তার আত্মীয়স্বজনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে সে আর কী দিয়ে? তাদের স্মৃতিও তার কাছে দুঃখদায়ক। দেশের কাজে সে নামবে এমন একটা সুলভ কল্পনা নিয়ে সে পথে বেরিয়ে আসেনি। বস্তুত দেশের কাজ বলতে যা বোঝায় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা সে জানে না। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাবার একটা লোভ আছে তার মনে মনে। ক্ষমতাকে সে ভালোবাসে। পিতার সঙ্গে তার যে বিবাদ, সে যে কেবল আদর্শ নিয়ে তাই নয়, তার বলিষ্ঠ আত্মস্বাতন্ত্র্য কোথাও ঠাঁই

পায়নি, তার মনে এই রুদ্ধ অভিমানও ছিল। ক্ষমতার চেহারা সে জানে, ক্ষমতায় পৃথিবী করতলগত করা যায়, এবং ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যই তার জন্ম।

সে বললে, ধরুন, এই গ্রামে যদি কাজে নামি, আপনি কী মনে করেন?

অনিলবাবু বললেন, আপনার কী কী আয়োজন আছে, বলুন?

কিছু নেই। আপনি আমাকে একটা থাকার জায়গা দিতে পারেন?

থাকার জায়গা! হ্যাঁ, তা, পারি বৈকি? তুমি কী বলো, অনুশীলা?

মিসেস্ সেন বললেন, ওঁরা ভালোভাবে থাকতে না পেলে কিছু ক'রে উঠতে পারবেন কি? তোমাদের কোর্টের পাশে ওই যে কো-অপারেটিভের ঘর দুটো প'ড়ে রয়েছে ওটায় বন্দোবস্ত ক'রে দাও না।

মন্দ আইডিয়া নয়। আচ্ছা, দেখি—

অনুশীলা বললে, কিন্তু তাঁতীবৌয়ের অত আদর যত্ন, ওঁরা কি তাকে ছেড়ে আসতে পারবেন?

বীরেশ বললে, তাঁতীবোকে ছেড়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু তার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন, মিসেস্ সেন।

অনুশীলার বড় লোভ হচ্ছিল এই উগ্রস্বভাব জেদী এবং আদর্শবাদী ছেলেটিকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে। সে চট্ ক'রে বললে, খুঁজলে হয়ত আরো পাওয়া যায়, বীরেশবাবু,—কিন্তু হৃদয় খোঁজবার মানুষ সংসারে বড় কম।

বীরেশ মুখ তুলে তাকালো। হাকিমের স্ত্রীর ভিতর দিয়ে কথা কয়, এ যে নলিনী ভিন্ন মুখে। সব ছেড়ে সে এসেছে, কিন্তু কৈ, নলিনী ত' তাকে ছাড়েনি। চোখ দুটো তার ঝাপ্‌সা হয়ে এলো মুহূর্তের জন্য! কিন্তু সে আত্মসংবরণ ক'রে হেসে বললে, হৃদয় খোঁজার কাজটাই বাজে কাজ, যেমন ঈশ্বর খোঁজাটা হাস্যকর। কী বলুন অনিলবাবু?

অনেকটা তাই বটে!

অনুশীলা প্রশ্ন করলো, আপনারা কয় ভাই-বোন, বীরেশবাবু?

মৃদু তিরস্কার ক'রে বীরেশ বললে, আলাপটা কিন্তু এবার ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে।

তা হোক, বলুন আপনি।

রজনী এবার রাগ ক'রে বললে, ভারি একরোখা তুই। আমি বলছি,—ও একটিমাত্র ছেলে, আর ভাই-বোন নেই।

ওঃ তাই। মা-বাবার আদরে বুঝি মানুষ?

অনিলবাবু বললেন, বলাই বাহুল্য।

রজনী বললে, না, শিশুকাল থেকেই ওর মা নেই, আর বাবা তখন বিলেত থেকে আমেরিকায়।

অনিলবাবু ও অনুশীলা একেবারে স্তব্ধ। চায়ের বাটিতে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে বীরেশ বললে, এর পর স্বভাবত যে প্রশ্ন ওঠে তাই জিজ্ঞেস করুন।

তার কণ্ঠ যেমন রুক্ষ তেমনি সহজ। কিন্তু অনুশীলা আর কোনো প্রশ্ন করলো না। একসময় কেবল এই অপ্রীতিকর স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বললে, মেঘ ডাকছে, আবার বৃষ্টি নামতে পারে।—আপনারা কোন্ খাওয়াটা পছন্দ করবেন, ভাত না লুচি?

দু'জনেই বললে, ভাত দেবেন।

আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা ক'রে আসি। এদিকে আমার সবই প্রস্তুত।—এই ব'লে অনুশীলা ভিতর দিকে চ'লে গেল।

রজনী এতক্ষণে তার আসল কথাটা পাড়লো। বললে, আমরা কাল রাত্রে দু'জনে যা স্থির করেছি, আপনাকে বলতে চাই, অনিলবাবু।

কী বলুন ত'?—অনিলবাবু উৎসুক হয়ে উঠলেন।

যে-কারনেই হোক এ গ্রামে আমাদের ওপর কেউ তেমন খুশী নয়, তাই একটু অসুবিধে হ'তে পারে! কিন্তু যদি আমরা থাকবার মতন একটা ভালো জায়গা পেতুম, তাহ'লে হয়ত,—এই ধরুন, কিছু একটা ব্যবসা-বাণিজ্য করার যদি সুবিধে হয়ে ওঠে···

বেশ ত'।

এ অঞ্চলে তামার বাসন, বেতের কাজ, মনিহারি,—এগুলো বেশ চলে এই আমাদের ধারণা।

অনিলবাবু বললেন, থাকার ব্যবস্থা আপনাদের আমি ক'রে দেবো, আর এও দেখবো এ অঞ্চলের লোকেরা আপনাদের অসুবিধে না ঘটায়। ব্যবসায় প্রথম হাত দিলে খুব ভালো হয়, এদিককার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তারপর আপনারা সাহায্যের লোক পাবেন। হ্যাঁ, আরও কিছু কাজ এদিকে হ'তে পারে। প্রথমে ধরুন, ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের নানারূপ কাজ,—বিশেষ ক'রে রাস্তাঘাট, নদীনালা, শিক্ষা, ঔষধপত্র ইত্যাদি; দ্বিতীয়ত, নদীর ওপারে জঙ্গল, তারপর পাহাড়—অবশ্য ছোট ছোট; ওদিকে লোহার ওরস্ পাওয়া যায়,—ওদিক থেকেও এক্সপ্লয়েট করা চলে,—তবে ও কাজে সাহস আর লোকবল দুই-ই দরকার।

বীরেশের স্বপ্ন জাগ্রত হ'লো। সমস্ত মন দিয়ে সে দু'জনের কথা শুনছিল। গ্রামের জনসাধারণ, প্রকাণ্ড বাণিজ্য, প্রচুর অর্থ, নদীর ওপারে পাহাড়, অজানা দেশ, দুর্গম ভবিষ্যৎ,—এবং এদেরই নিংড়ে নিয়ে বিপুল ক্ষমতার অধীশ্বর হওয়া।

যে শক্তি তার বাঁধন কেটে দূরের দিকে ঠেলে দিয়েছে সেই শক্তিই কি তাকে স্বর্ণময় শক্তিময় ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে না? এই সেদিন পর্যন্ত তার জীবনে নানা কল্পনা ছিল। সে বিলেতে যাবে, ব্যারিস্টার হবে, আইন-ব্যবসায়ে সে শীর্ষস্থান অধিকার করবে, দেশের নেতৃত্ব নেবে, মানুষকে শাসন করবে। তার কল্পনা ছিল: সে পৃথিবী ভ্রমণ করবে,—যাবে মেরুদেশে, যাবে গৌরীশৃঙ্গে, যাবে সাহারায়! আজকে আবার একটা অপরিকল্পিত নতুন জীবন যেন চারিদিক থেকে তাকে ইসারায় কাছে ডাকছে। বাণিজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, ...হ্যাঁ, ক্ষমতা তার বড় প্রিয়। ক্ষমতায় সে অন্ধ হ'তে জানে, মহিমান্বিত হ'তে জানে। ক্ষমতা হাতে পেলে আধুনিক কাল, আধুনিক যুগকে চূর্ণ ক'রে সে নতুন একটা আকার দিতে পারে। ক্ষমতা যেদিন সে পাবে, সে হবে সর্বাধ্যক্ষ একনায়ক। এই অদ্ভুত শাস্ত্র আর আচার, আর চিরাচরিতের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্তি দিতে গেলে একনায়কত্ব নেওয়া ছাড়া আর গতি নেই। সে হবে সর্বাধিকারী। সমাজের অনুশাসনকে সে জায়গা দেবে না, তাকে হ'তে হবে একটা প্রবল প্রতিবাদ। যদি তাকে বর্বর হ'তে হয়, নিষ্ঠুর হ'তে হয়, সে হবে মহিমান্বিত বর্বর। তার দানবীয় সংহারশক্তিকে স্তবের দ্বারা তুষ্ট করতে হবে, তার কাছে নতি স্বীকার ক'রে পূজা দিতে হবে।

বাইরে বাদলের ধারা আবার আকাশ কেটে নেমে এলো। কৃষ্ণপক্ষের প্রান্তরভরা অন্ধকার আজ বীরেশের খুব ভালো লাগছে; দুর্যোগ আর দুর্গমের ভয়াল আকৃতি কেমন যেন একটা নিবিড় আনন্দের আবেশ তার মনের উপর বুলিয়ে দিচ্ছে। ইচ্ছা করে এই আঁধার রাত্রে দূরের নদী পার হয়ে গিয়ে পাহাড় কেটে সে বা'র ক'রে আনে লৌহদণ্ড, আর তাই দিয়ে বানায় ইন্দ্রের বজ্র। আঁচল-ধরা হয়ে সে জন্মায়নি, মেরুদণ্ডহীন হয়ে সে বাঁচবে না, সর্বস্বান্ত নগণ্য বাঙালীর মতো মরবে না। সমস্ত জীবন তার বারুদের একটা স্তূপাকার, বিরাট গর্জনে আগুন জ্বালিয়ে তবে সে চূর্ণ হয়ে পড়বে।

অনুশীলা এসে দাঁড়াতেই বীরেশের চমক ভাঙলো। ইতিমধ্যে রজনী পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বা'র ক'রে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় অনিলবাবুর মারফত টুকে নিচ্ছে। কোনো সময়েই সে নিজের গণ্ডা ভুলবে না, তার কম্পাসের কাঁটা একটিমাত্র দিক নির্ণয় করে। সেটি তার হিসাব-বুদ্ধি!

হাসিমুখে অনুশীলা সহসা বললে, রজনীবাবু, আপনিও কি বাড়ি থেকে রাগ ক'রে দেশছাড়া হয়েছেন?

বীরেশ ও রজনী দু'জনেই থতমত খেয়ে মুখ তুলে তাকালো। রজনী বললে, —কই, না।

বীরেশ বললে, আপনি এ খবর পেলেন কোথা থেকে?

অনুশীলা বললে, বিলেত পর্যন্ত আপনাদের খবর পৌঁছল, আর আমি এ খবরটুকু পাবো না? অবাক্ করলেন আপনারা।

অনিলবাবু বললেন, তোমার প্রশ্নগুলো ভারি অসুবিধাজনক অনুশীলা। ব্যক্তিগত খবর মেয়েদের ভারি মুখরোচক।

অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে বীরেশ বললে, উড়ো খবর যারা রটায়, ভেতরে তারা তলিয়ে দেখে না।

অনুশীলা বললে, যাই বলুন, ভারি অভিমানী আপনি, কোথাও এতটুকু আঁচ সইতে পারেন না। প্রথম থেকে সেই যে আপনি আমার উপর চ'টে আছেন, এখনো একটু প্রসন্ন হলেন না।

বীরেশ বললে, ভয়ানক নালিশ আপনার। আপনার বাড়িতে পাত পাতবো অথচ আপনার ওপর রাগ করব, এতই নির্বোধ আমাকে ঠাওরালেন?

রজনী বললে, আপনি এক কাজ করুন মিসেস্ সেন, সব বাদ দিয়ে ওকে এক হাঁড়ি মধু খাইয়ে দিন, তবে যদি ওর মুখ মিষ্টি হয়।

পাচক এসে জানালো, আহার প্রস্তুত। রজনীর উক্তির উপর মন্তব্য বীরেশের মুখের মধ্যে রয়ে গেল। অনুশীলা হাসিমুখে কেবল বললে, না রজনীবাবু, ওল খেয়ে যার গলা ধরে তাকে তেঁতুল দিতে হয়। আসুন আপনারা।

হাল আমলের একটি পরিবার। বুঝতে পারা যাচ্ছে এঁদের সন্তানাদি এখনো হয়নি। কুকুর দুটো একবার ঘোরাফেরা ক'রে খাবারঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ভিতরে এসে শ্বেতপাথরের বড় টেবিলের উপর বিপুল ভোজের আনুপূর্বিক ব্যবস্থা দেখে রজনী মনে মনে শিউরে উঠলো। না খেয়ে নাড়ি মরে এসেছে, এগুলি সব আত্মসাৎ ক'রে ফিরে যাওয়ার অর্থ অনেকটা আত্মহত্যা করা। ওগুলোর মধ্যে কী-কী খাবে সে আলোচনা থাক্, কিন্তু কী-কী খাবে না তাই সে তোলা-পাড়া করতে লাগলো, কিন্তু তেমন একটি দফাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

অনিলবাবু তাদের নিয়ে বসলেন। একটু পরেই নূতন সজ্জা ও সর্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে অনুশীলা পুনরায় আসরে এসে নামলো। কপালে তার শ্বেত ও রক্তচন্দনের কারুকলা, পরনে শাদা জরির ফুল্কি দেওয়া নীলাম্বরী, গলায় তারকার মালা, মাঝখানে বড় একখানি হীরকখণ্ড। বীরেশ মাথা নত ক'রে নিল। রজনী ফস্ ক'রে ব'লে উঠলো, কী আশ্চর্য, নানা বাজে কথায় ভুলেই গেছি সমস্ত ব্যাপারটা আপনার জন্মতিথি উপলক্ষ্য ক'রে।...বাঃ, কী সুন্দর মানিয়েছে আপনার স্ত্রীকে অনিলবাবু!

অনিলবাবু স্ত্রী-গৌরবে হেসে বললেন, মেয়েদের ওই ত' কাজ সারা দিনের, কি বলুন বীরেশবাবু ?

বীরেশ মুখ নত রেখেই সামান্য হাসলো। অনিলবাবু পুনরায় বললেন,. আজ আমার তপোভঙ্গ না হ'লে বাঁচি।

আহারের এই সর্বব্যাপী আয়োজনে আগে থেকেই রজনীর সর্বাঙ্গ পুলক ও হর্ষে রোমাঞ্চিত, তার উপর এই সুস্বাদু রসিকতা। সুগন্ধি ও সুসিদ্ধ ফাউল-কারির দিকে মুখ নত ক'রেই সে সানন্দে গদগদ হাসি হেসে উঠলো।

অনুশীলা বীরেশের দিকে অলক্ষ্যে একবার তাকিয়ে বললে,—আগেকার দিনে তাই হ'তো শুনেছি, কিন্তু একালে সহজে তপোভঙ্গ যে হয় না তোমাদের, এই দুঃখ।·· কি বলুন বীরেশবাবু ?

বীরেশ বললে, এখন কিছু বললে সিডিশন্ হ'তে পারে।

হাসিমুখে অনুশীলা ডিসগুলো সাজাতে লাগলো। রজনী বললে, খাবার আগে আজ আমরা অনুশীলা দেবীর অগণ্য জন্মতিথি কামনা করবো, বারে বারে আজকের এই তিথিতে আমরা যেন এসে মিলতে পারি।···দেখুন, উত্তম আহারের সময় কাঁটা-চামচেগুলো ভারি বিরক্ত করে, তাড়াতাড়িতে ওগুলো যেন হাতে জড়িয়ে যায়।

অনিলবাবু বললেন, আপনার অসুবিধে হ'লে ওগুলো সরিয়ে দিন্। বয় !

বয় এসে রজনীর পাশ থেকে কাঁটা চামচগুলি নিয়ে গেল।

ভদ্রতা রক্ষার্থে বীরেশ বললে, কিন্তু কই, আপনি বসবেন না আমাদের সঙ্গে, মিসেস্ সেন ?

অনুশীলা পরিবেশন করতে করতে বললে, যাক আমার সাধনা সার্থক,. আপনি আত্মীয়তা করেছেন এতক্ষণে।

লজ্জায় বীরেশ আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এতক্ষণে জানা গেল এ নলিনী নয়, আর কেউ। অনিলবাবু বললেন, উনি রাত্রের দিকে এসব খান্ না !

আচ্ছা, এবার তাহ'লে আমরা ব'সে পড়ি ? লালাসিক্ত মুখে রজনী আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

হ্যাঁ, এবার বসতে পারি। আমাদের উভয়ের আন্তরিক শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ আপনাদের জানাই।

অনুশীলা বললে, আমার জন্মতিথি কয়েকবারই এসেছে, কিন্তু আজকের আনন্দ অভিনব। পল্লীগ্রামের নিঃসঙ্গ জীবনে আপনাদের মতন দু'জন শিক্ষিত ভদ্র বন্ধু পেয়ে আমরা সত্যই কৃতার্থ। আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক হোক, একান্ত মনে এই কামনা করি। এবার খেতে বসুন, আপনারা।

বীরেশ বললে, বিরূপ আর বিপরীত একটা অবস্থায় আপনাদের সঙ্গে পরিচয়। হয়ত' আপনাদের মনোবেদনা দিয়েছি, হয়ত' আমাদের আচরণে ঔদ্ধত্য আর রূঢ়তা আপনাদের বিক্ষুব্ধ করেছিল। কিন্তু আপনারা কেবল ক্ষমাই করেননি, আমাদের প্রতি অকৃপণ স্নেহে আপনারা কাছে তুলে নিয়ে আশ্রয় দিতে চেয়েছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের পথে অকুণ্ঠ সাহায্য করার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে অগ্রসর হয়েছেন,—আপনাদের এই মহত্বের কাছে অবনত, চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ।

একমুখ খাবার পুরে গিলতে না পেরে রজনী অব্যক্তকণ্ঠে বললে—আমিও বলব মিসেস্ সেন, আগে খেয়ে নিই।

তার বর্তমান করুণ অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

ভোজনের আদিপর্ব চলতে লাগলো। বাইরে তখন অনর্গল অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ চলেছে।

কিছু দূর এগিয়ে এসে একসময় মুখ তুলে অনিলবাবু বললেন, বীরেশবাবু খেতেই পারছেন না, দেখছ না অনুশীলা ?

অনুশীলা বললে, কিছু ব'লো না, উনি ভারি অভিমানী। দেখছি অনেকক্ষণ থেকে, দেখি না কী করেন !

বীরেশ বললে, এত আয়োজন, ঠিক আয়ত্ত করা কঠিন।

বড় একখানা মাংসের টুক্‌রো মুখে পুরে রজনী বললে, ওটা অমনিই, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

বীরেশ বললে, আমার বন্ধুকে ক্ষমা করবেন। খাবার দেখলেই ও ফাঁসির খাওয়া খায়।

রজনী বললে, তোর খাওয়া দেখলে আমার ব্রাহ্মসমাজকে মনে পড়ে।

অনুশীলা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো।

পাচক আর তিন চার পদ নানা রসের প্লেট এনে হাজির করলো। রজনীর চোয়াল তখন ব্যথা করছে, তবু ক্লান্ত কণ্ঠে সে বললে, এবারে মানরক্ষা হ'লে হয়।

অনিলবাবু বললেন, কোনো তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে খান রজনীবাবু।

এতক্ষণ পরে রজনী একটু লজ্জা পেলো। বললে, কি জানেন, সেই ইস্কুল কলেজের পুরনো অভ্যাস, দশ মিনিটের মধ্যে না হ'লে যেন খাওয়াই হ'লো না।

বীরেশের চেয়ারের পিছন দিকে অনুশীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার আহার নিরীক্ষণ করছিল। সহসা সে আর আত্মসংবরণ করতে পারলো না, ঈগলপক্ষীর ন্যায় পিছন থেকে একটু ঝুঁকে সে বীরেশের ডিসের উপর হাত বাড়ালো।

বললে, অত লাজুক কেন, অমনি ক'রে ভাত মাখে না, এমনি ক'রে মাখতে হয়। - এই ব'লে সে জব্দ ক'রে ভাত মেখে দিতে লাগলো। পুনরায় বললে, ফেলুন হাত থেকে কাঁটা চামচ,—অনভ্যেসের কৌটা! ভাত মেখে যে খেতে শেখেনি, সে বাড়ি থেকে রাগ ক'রে দেশছাড়া হয়, কোন্ সাহসে?

অনিলবাবু হেসে বললেন,—এবার কিন্তু ঠিক বলেছ অনুশীলা। এইবার ঠিক বীরেশবাবুর খাওয়া হবে। নিন্ আর একবার চেষ্টা করুন, বীরেশবাবু।

বীরেশ হতবুদ্ধি হয়ে একবার শুধু তাকালো। সত্যি বলতে কি, মহাব্যস্ততা সত্ত্বেও রজনী মুখ তুলে একবার না হেসে পারলো না।

অনুশীলা বললে, এখনো ষোল আনা হয়নি—এই ব'লে সে ভাতমাখা হাতেই বীরেশের ডানহাতখানা ডিসের উপর চেপে দিয়ে পুনরায় বললে, খান্ এবার 'গুড্ বয়' হয়ে।

এমনি ক'রেই সেদিন সান্ধ্যভোজনের পর্ব সমাপ্ত হ'লো। হাত ধুয়ে এসে দাঁড়াতেই তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী এসে হাসিমুখে বললে, নিন্, পান নিন্।

ও পান খায় না, দিন আমাকে। রজনী প্লেট থেকে পান তুলে নিল।

সিগারেট?—অনিলবাবু সিগারেটের ট্রে বাড়িয়ে ধরলেন।

থ্যাঙ্কস্—সিগারেট আমি খাই নে। বীরেশ ভয়ে ভয়ে জানালো। রজনী সিগারেট নিল।

অনুশীলা বললে, আপনি যে দেখছি সকল রসে বঞ্চিত। এমন আধ্যাত্মিক অভ্যেস কেন একালে?

বৃষ্টি তখনো অবিশ্রান্ত ঝরছে। বাইরেব দিকে চেয়ে রজনী চিন্তিত হয়ে বললে, এতই যখন করলেন তখন গোটা দুই ছাতাব বন্দোবস্ত করুন, মিস্টার সেন।

অনুশীলা বললে, ছাতা? কেন?

এবার আমরা বিদায় নেবো।

বীবেশ বললে, যথেষ্ট রাত হয়েছে!

বা বে। অনুশীলা ভীষণ অনুযোগ ক'রে বললে, কোথা যাবেন এ বৃষ্টিতে? ঘরে আপনাদের বিছানা ক'রে দিলুম,—মানুষের অভাবে ওই নরম বিছানাকে কাঁদাবো সারারাত?

রজনী বললে, বলেন কি!

বলি ভালো! অনুশীলা স্বামীর দিকে একবার চেয়ে হেসে বললে, খাইয়ে-দাইয়ে কাদাবৃষ্টিতে ঠেলে দেবে? ভেবেছেন কী আপনারা? খড়ের গাদার ওপর টান, না তাঁতিগিন্নীর জন্ম দুর্ভাবনা?

বীরেশ চিঁ চিঁ ক'রে বললে,—কিন্তু সে কী ক'রে হয়?

অনিলবাবু বললেন, কী ক'রে কী হয় দেখিয়েই দাওগে না, অনুশীলা?

অনুশীলা তর্জনী প্রসারণ ক'রে সহাস্যে বললে, শীগ্‌গির ঘরে যান বলছি ভালো কথায়, আমি কোনো কথাই শুনতে চাই নে। আজও আপনাদের হাজতবাস!

কথা কাটাকাটি ক'রে আর লাভ নেই। তাদের কোনো কথাই আর খাটবে না। অগত্যা তারা ঘরে গিয়ে সেই রাত্রির মতো প্রবেশ করলো এবং সমস্ত রাত ধ'রে সেই মার-খাওয়া পাইকটি তাদের দরজার কাছে শুয়ে মশার কামড়ে সারারাত ওলোট-পালোট খেতে লাগলো। নরম শয্যা আর নেটের মশারির মধ্যে তারা রইলো বন্দী হয়ে।

পাঁচ

এর পরে ছয় মাসের কাহিনীতে রস যদি বা কিছু ছিল, রহস্য ছিল না। দুর্যোগের বিপর্যস্ত জীবন—কতকটা রসের কেন্দ্র বৈকি! ভাগ্যের বিদ্রূপ, বিরূপের চক্রান্ত, আত্মীয়বিচ্ছেদ, ছোট কৃপণতা, ছোট ছোট মহত্ত্ব আর ঈর্ষা—সমস্তগুলো একত্র ক'রে দূরের পরিপ্রেক্ষণে বিচার করলে অবশ্যই কিছু রসের অবতারণা ঘটে। কিন্তু আসল কথাটা এই—নদীর ভাঙনে একদিকের তট ধ্বংস হয়, অন্যদিকে শস্য ফলাবার চর পড়ে। দু'জনের জীবন এগিয়েই চলেছে।

প্রথম অবস্থায় পিতার কাছে বীরেশ একখানা জরুরী চিঠি পাঠিয়েছিল—তার ভাষা অনেকটা এই :—

শ্রীচরণেষু,

ভাগ্যের পরীক্ষায় আর যুদ্ধে আমি লিপ্ত। কিন্তু আলোর সন্ধানও আমি পেয়েছি। সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল, যদি কোথাও সহায়তা না থাকে। আমার জীবনে আইন-অমান্য-আন্দোলন করেছি বটে, তবে কিছুতেই কোনো চুক্তি করবো না এমন নেশা আমার নেই। আপনার কার্যকরী সহানুভূতি পেলে আমার পথ সুগম হয়। এই পত্র পেয়ে আমাকে অন্তত শ' পাঁচেক টাকা পাঠাবেন। এ টাকা আপনার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ, আমার পক্ষে অনেক। আমি বিশেষ বিপন্ন। ইতি—

প্রণত বীরেশ

চিঠির উত্তর আসেনি তা নয়, এসেছিল অনেকটা বিলম্বে এবং বোধ করি বহু বিবেচনার পর :

দীর্ঘজীবেষু,

একালের বালকদের সকল দাম্ভিকতার পিছনে থাকে অন্তঃসারশূন্য সাহসের নামে আন্তরিক ভয়। যে আইন-অমান্যটা সন্ধির জন্য সর্বদা উৎসুক তার ভিতরে আছে স্বভাব-দৈন্য। একদিন জাহাজের খালাসীর ছদ্মবেশে আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলুম, বাঙালীর অদৃষ্ট-বাদের সঙ্গে আপস করিনি। তোমার অজ্ঞাতবাসেই জানাতে চাই তুমি অসীম শক্তি সংগ্রহ করছ ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্রের জন্য। তোমাকে সাহায্য ক'রে আমার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবো না। অতঃপর আমার সঙ্গে আর পত্রালাপ করবার চেষ্টা ক'রো না, কেবল জেনে রেখো আমার আশীর্বাদ রইলো তোমার সকল বিঘ্ন আর বিপদে। একটি সংবাদ তোমার জানা দরকার। আমার স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমি দানপত্র রচনা করেছি, সর্বসমেত দুই লক্ষ টাকার বেশি হয়নি। কোথায় এবং কাকে সেই দান করেছি তা জানতে চেয়ো না, সে সংবাদ আমার মৃত্যুর পর তোমার কানে পৌঁছবে আশা করি। ইতি —

সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

চিঠি পেয়ে বীরেশ কেবল মনে মনে পিতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে ছিল। এ চিঠি তাকে ক্ষুব্ধ করেনি; পিতার প্রতি তার সমগ্র অন্তর শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠেছিল।

এর পরে অসীম অধ্যবসায় সহকারে অর্থ সংগ্রহ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। দেবীপুরকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি গ্রাম একত্র ক'রে দু'জনে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পুনরায় উজ্জীবিত ক'রে তুললো। হাকিমের সহযোগিতায় সে যখন এই ব্যাঙ্ককে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হ'লো, সেই সময় একদা সহসা এক সহস্র টাকা তার হাতে এসে পৌঁছল। ইনসিওর ক'রে টাকা পাঠিয়েছে নলিনী! তার সঙ্গে ছোট একটি চিঠি :

বিনা সম্ভাষণেই আমার বক্তব্য তোমার কাছে নিবেদন করি। মেসোমশায়ের কাছে তোমার চিঠি এবং তাঁর উত্তর—দুটি কাগজই পড়েছি। সহসা মনে হ'লো আমি বা কম কিসে? ব্যাঙ্কের পুঁজি নিয়ে আমিও যদি একটা দানপত্র প্রস্তুত করি মন্দ কি? সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমি বিদেশে যাবো বৈরাগিনী হয়ে। যোগিনী হবারও বাসনা আছে, কারণ তাহ'লে 'মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে' যাওয়া সহজ হ'তো। তুমি দাম্ভিক, দেবতামাত্রেই দম্ভের অবতার, কিন্তু

এই সামান্য নৈবেদ্য ফিরিয়ে দিয়ো না। হাতের লেখায় নাম চিনে নিয়ো। ইতি—

সেইদিন চিঠির জবাবে বীরেশ তাকে জানিয়ে দিল, দানপত্র গ্রহণ করলুম, তবে টাকার অভাব ইতিমধ্যেই আমার মিটেছিল। এই টাকায় তোমার নামে মন্দির গ'ড়ে তুলবো। তোমার খোঁজ আমি নেবো না, কিন্তু আমার সন্ধান তুমি পাবে। পূজারিণীই একদিন দেবী হয়ে ওঠে মন্ত্রের সাধনায়। ইতি—বীরেশ।

শীতের মাঝামাঝি কাছারির পাড়ায় সামান্য একটু জমি সংগ্রহ ক'রে বীরেশ একটি ছোটখাটো দোকান প্রতিষ্ঠা করলো। আড়ৎদারদের কাছ থেকে তামা ও পিতলের বাসন, তাঁতের কাপড়, বেতের জিনিসপত্র মাটির খেলনা ইত্যাদি এনে জমা করলো। তারপর অনুশীলার পরিচয়পত্র নিয়ে কলকাতায় অনুশীলার এক ব্যবসায়ী আত্মীয়ের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ ক'রে দিল। তিনি বেশ কিছু কিছু মালপত্রের অর্ডার পাঠাতে লাগলেন। দোকান নিয়ে রজনী ব'সে গেল। এইটি তার বহুদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা। উভয়ের মধ্যে শর্ত হ'লো এই, লাভ-লোকসানের আধাআধি দুইজনে সমান অংশে ভাগ ক'রে নেবে।

আইন-পড়া বিদ্যাটা এ গ্রামে বীরেশের কাজে লেগেছিল। অনিল সেন হাকিম হ'তে পারেন,—অনুশীলা একদিন হাসতে হাসতে বলছিল—কিন্তু আইনের কলাকৌশল সম্বন্ধে হয়ত তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অনিলবাবু হেসে বললেন, এ ত' মেয়েলি তর্ক। আমি ভালো আইনজ্ঞ না হ'তে পারি, কিন্তু হাকিম হিসাবে বীরেশবাবুর চেয়ে আমার খ্যাতি বেশি এই আমার সান্ত্বনা। অনুশীলা বললে, বীরেশ যে গ্রামের লোককে এত শত্রুতা সত্ত্বেও আয়ত্ত করতে পারছে এ কেবল ওর আইনবোধ আর যুক্তিবাদের ফলে।

বীরেশ বললে, তা নাও হ'তে পারে। ওদের কাছে আইন আর যুক্তির অবতারণা করার চেয়ে যদি একটা উদাহরণ অথবা মডেল দাঁড় করানো যায়, তাহ'লে দেখছি কাজ হয় বেশি।

অনুশীলা বললে, কিন্তু মডেল আর উদাহরণ এতকাল ওদের সামনে কম ছিল না। ধান পাট বেচে টাকা হয়, কিন্তু ব্যবসায়ী সম্মেলনে ওরা কি বুঝতে চায়? কো-অপারেটিভ সোসাইটির মালিক যে ওরাই, একথা বুঝতে ওদের এক শতাব্দী লাগবে। ওরা জানে টাকায় সংসার চলে, জানে ধান সিদ্ধ করলে ভাত হয়, কিন্তু একথা কি জানে, টাকা মানে গভর্ণমেণ্ট, ধান মানে শক্তি?

বীরেশ বললে, কিন্তু হৃদয়ের সংস্পর্শ যদি না থাকে, যুক্তি দিয়ে কতটুকু কাজ হয়?

অনিলবাবু বললেন, যুক্তি ত' গভর্নমেণ্টের তরফেও আছে, কিন্তু এত ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও এ দেশের গভর্নমেণ্ট জনপ্রিয় হ'তে পারলো না কেন ?

অনুশীলা চ'টে উঠলো, গভর্নমেণ্ট একটা মহিলা-মজলিস নয় যে, সেখানে কাজের চেয়ে হৃদয় নিয়ে বেশী কারবার। হৃদয়বত্তা থাকলেই নিরপেক্ষতার অভাব ঘটে। হাইকোর্টের যাঁরা জজ, তাঁদের হৃদয় অপেক্ষা ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির অনেক বেশী দরকার। হৃদয়ের কারবার অন্দরমহলে।

বীরেশ বললে, কিন্তু মিসেস্ সেন, এ ত' আদালত নয়, এ যে গ্রাম,— এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। নিরপেক্ষতা ভালো, কিন্তু তার মধ্যে আত্মীয়তা নেই, সেই জন্য দূরে দূরে থাকতে হয়, কিন্তু আত্মীয়তা মানুষকে বুকে টেনে নেয়। যারা মিশনারী তারা যে মন্দ কথা বলে তা নয়—বরং বুদ্ধি আর যুক্তি তার প্রস্তাবকে মেনে নেয়, কিন্তু মিশনারীর আত্মীয় নেই সে পর, সে দূরের।

অনুশীলা সবিস্ময়ে বললে, এ সব কথা আপনি পেলেন কোথায় ?

হাসি মুখে বীরেশ বললে, তার মানে ?

অনুশীলা তার দুই চক্ষের বিদ্যুৎ-কটাক্ষ স্বামী আর বীরেশের উপর বুলিয়ে বললে, আপনার আচরণের সঙ্গে এসব কথাবার্তা ত' মানায় না ?

আমার আচরণ কি নিতান্তই পীড়াদায়ক ?

অনিলবাবু বললে, মুস্কিলে ফেললে, ভদ্রলোককে দেখলেই তুমি ক্ষেপিয়ে তুলতে চাও। উনি ত' ঠিকই বলেছেন।

বীরেশের সেই প্রথম কালের সঙ্কোচ আর জড়তা এখন আর নেই, আলাপ পরিচয় এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। সে বললে, অনিলবাবু, মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই সামান্য, তাদের আমি বিশেষ জানি নে। জানি নে ব'লেই তাদের কথায় কিছু মনে করি নে।

অনুশীলার মুখখানা এই মন্তব্যে টক্‌টকে হয়ে উঠলো। কিন্তু সে মুখের হাসি মিলোতে দিল না। বললে, মেয়েদের তাচ্ছিল্য করেন, এই ত' ? সে ত' ফ্যাশন্! তবু ওরই মধ্যে কিছু পরিচয় থাকলে আপনি কি আর বে-হিসাবী হ'তেন ?

আসুন অনিলবাবু, আমার আজকে বোর্ডের সভা আছে।

অনিলবাবুর সঙ্গে বীরেশ বেরিয়ে গেল, আর পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আহত হাকিমের স্ত্রী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক হাসিটুকু কালির মতো সমস্ত মুখে মেখে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলতে লাগলো।

এই নিষ্ফল ক্ষোভের চেহারা নতুন নয়। আঘাত ক'রে প্রতিঘাত সহ্য ক'রে যাওয়ায় অনুশীলার একটি তীব্র আনন্দ ছিল। এটা তার পক্ষে গোপনীয়। মেয়েরা পথ কেটে চলে পুরুষের অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতের রহস্য দিয়ে তারা নিজেদের গতিবিধি ঘিরে রাখে। প্রথম দিন থেকেই তার প্রচেষ্টা ছিল—কেমন ক'রে এই দুঃশীলকে করায়ত্ত করা যায়। এখানে জয়ের উল্লাসটা বড় কথা নয়, এখানে আবিষ্কারের আনন্দ ছিল। বীরেশকে ঘিরে একটা মহিমার মণ্ডল দেখা যায়, কিন্তু সেটা কি ধার করা চন্দ্রমণ্ডল?···সেটা তার বিশেষ একটা নীতি, অথবা চরিত্র? এসব না জানতে পারলে অনুশীলার স্বস্তি নেই। যাকে কাছে পাওয়া যায়, তার নির্ভুল প্রকৃতি জানতে পারার জন্য একটা অশ্রান্ত উদ্বেগ তাকে দিন দিন উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলছে।

বোর্ডের সভায় সেদিন মাননীয় অতিথিস্বরূপ অনিলবাবু উপস্থিত ছিলেন। ছোটখাটো মহকুমা হ'লেও দেশী কারবারের কতকগুলি কেন্দ্র আশপাশে থাকার জন্য এই গ্রামের প্রসিদ্ধি কম নয়। কাঁচামাল চলাচলের সুবিধার জন্য পথ-ঘাটের ভালো বন্দোবস্ত নেই। স্থানীয় বোর্ডের সভায় কয়েকটা প্রস্তাব ছিল। সভার যিনি সভাপতি, তিনি হলেন দূর গ্রামান্তরের এক আখ-মাড়াই কলের একজন অংশীদার। তাঁর দলবল সভায় ছিল। বীরেশের উপস্থিতি এবং বোর্ডের তালিকায় তার পক্ষে সভ্যতালিকাভুক্ত হওয়া জীবনবাবু পছন্দ করেননি। ছোকরার সম্বন্ধে তাঁর মনে গভীর আতঙ্ক ছিল।

সভার প্রারম্ভে হাকিমকে স্তুতিবাদ জানিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো হ'লো। হাকিম তার উত্তরে বললেন, গ্রামকে সংগঠন করা এবং তার উন্নতির জন্য একটি বিশেষ উৎসাহ এসেছে। যাঁরা এই কাজের ভার নিচ্ছেন তাঁরা এখানে নবাগত হ'লেও এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তাঁদের কর্মধারায় আমরা দেখতে পেয়েছি আন্তরিক কল্যাণ-বুদ্ধি, এবং গঠনমূলক পরিকল্পনা-শক্তি। আপনাদের উৎসাহে এবং কার্যকরী সহায়তায় যদি এই কর্মীরা কার্যক্ষেত্রে সফল হন তবে দেশের সত্যকারের উন্নতি হবে।

সভায় বীরেশকে বক্তৃতা দিয়ে তার প্রস্তাব উপস্থিত করতে হ'লো। সে বললে, কাজ করবেন গ্রামবাসীরা, কারণ সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ তাঁদেরই, আমরা সাহায্য করতে পারলে সুখী হবো। কাজ ক'রবার চেষ্টা এতদিন বাইরে থেকে এসেছে, বাইরের বুদ্ধিমান লোকেরা এসে দেশসেবার আদর্শ নিয়ে কাজ করতে চেয়েছে, কিন্তু তাতে ফল ফলতে পারে না। উন্নতির জন্যে যা কিছু কাজ করার দরকার, তার উদ্ভব হবে ভিতর থেকে, নিচের তলা থেকে। যারা চাষী এবং

শ্রমিক তাদের প্রথমে জানতে হবে, দেশের আর্থিক শক্তির উৎস তারাই,—তাদের হাতে উৎপাদিত লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য নিয়ে দেশের শ্রী আর গৌরব······

সভাপতি ঘণ্টা বাজালেন। বললেন, এ সভা রাজনীতির আলোচনার জন্য নয়, এখানে গ্রামেরই কথা বলুন।

বীরেশ পুনরায় স্বরু ক'রে বললে, গ্রামবাসীর জীবনের কথা বাদ দিয়ে গ্রাম নয়। এটা রাজনীতির আলোচনাক্ষেত্র নয় তা জানি, কিন্তু জনসাধারণের অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির যেটুকু সম্পর্ক, সেটুকু আলোচনা করা অপরাধ নয়, গ্রামের পক্ষ থেকে সভাপতি মহাশয়কে একথা জানাই।—শুনুন, যাদেরউৎপাদিত ধনসম্ভার নিয়ে দেশের গৌরব তাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া দরকার। ইব্রাহিম-পুরের চিনির কল আপনারা অনেকেই জানেন। এই সব চিনির কলের যাঁরা মালিক তাঁদের হাতে চিনির দর, চিনির বাজার। তাঁদের একটি নিজস্ব চক্রান্ত আছে, যার জন্যে চিনির রাজ্যে উত্থান-পতন ঘটে। মালিকের যাঁরা এজেণ্ট তাঁরা নানা গ্রামে প্রচারকার্য করেন যাতে চাষীরা তাঁদের করতলগত থাকে। অনেক টাকা তাঁরা দাদন দেন। এই দাদন দেবার ব্যাপারে চাষীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে। অনেক সময়ে দরিদ্র চাষীরা সেই দাদন পরিশোধ করতে গিয়ে বিকিকিনির ব্যাপারে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়,—আমাদের এই দেবীপুরের আশেপাশে তার করুণ চেহারা চোখে পড়ে। সঙ্ঘবদ্ধ চাষীদের পক্ষে এর প্রতিকার হওয়া দরকার। তারা যদি গরীব থাকে তবে মালিকদের পক্ষে অনেকের স্ববিধে। আমাদের এই গ্রামের সামান্য যে রাস্তাঘাট রয়েছে, তারই উপর দিয়ে চিনি-কলে আখের বোঝা রপ্তানি হয়, সেই রাস্তাঘাটের কোনো সংস্কার নেই। সামনে নদী রয়েছে, কিন্তু চাষীরা এই নদীর সাহায্যে মহাজনী কারবারের কোনো স্ববিধা পায় না। গ্রামবাসীদের হাতে টাকা থাকে না, শস্য বিক্রির ব্যাপারে জমিদারের কাছে আর ঋণদাতাদের কাছে তাদের মাথা বিক্রি হয়ে রয়েছে,—এই সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমি প্রস্তাব করি, গ্রামের প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্য এমন দু'তিনটি রাস্তা করার প্রয়োজন, যাতে এই গ্রামের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ সহজ হয়। জেলা-কর্তৃপক্ষের সহযোগে সেই কার্য-পদ্ধতি প্রথমেই নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। জেলা-বোর্ডে আমাদের সেই প্ল্যান্ পেশ করতে হবে।

এই সভার পরে গ্রামে একটা গণ্ডগোল দেখা গেল। জীবনবাবু চিনির কলের কর্তৃপক্ষের কাছে বীরেশের দলের সম্পর্কে একটা গোপন বিবরণ দাখিল করলেন। কলের মালিকেরা তার উপর মন্তব্য বসিয়ে জেলা-হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, এই অঞ্চলের চাষীদের মধ্যে অসন্তোষ এবং অরাজকতা

সৃষ্টি করার জন্য বীরেশ চৌধুরীর দল আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। কর্তৃপক্ষের চর সমস্ত দিকে নজর রাখতে লাগলেন।

কিন্তু সত্য ও সৎবৃত্তির একটা নিজস্ব পন্থা আছে, যেখানে নানা বিরোধের মধ্যেও সে নিজের পথ কেটে চলে। প্রতিদিন বাইরের দিক থেকে জানা গেল, এ গ্রামের যারা হোমরা-চোমরা তাদের গোপন চক্রান্ত বীরেশদের কাজে সর্বপ্রকার বাধা জন্মানোর জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় স্বর্গ-মর্ত্য একাকার করছে, কিন্তু সেই অনুপাতেই অন্যদিকে যে সমবায়-পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে বিভিন্ন গ্রামের চাষীরা বীরেশের কাজে এগিয়ে আসতে লাগলো, তাতে তার অসামান্য প্রতিষ্ঠার সংবাদই এনে দিল। ফলে দেখা গেল, স্থানীয় বোর্ডের যারা এতকাল স্থায়ী সভ্য থেকে একটা চিরস্থায়ী স্বার্থ নিয়ে বসেছিল তারা আর আনুগত্য পায় না তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। জলে, ঝড়ে, রোদে, শীতে—বীরেশ গ্রামে গ্রামে গিয়ে তার অসাধারণ বাক্‌শক্তি এবং মধুর আচরণের গুণে জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। তার পরিশ্রম ব্যর্থ হ'লো না, দশজন সভ্য সংখ্যার মধ্যে সাতটি পদ সে নিজের লোকের জন্য অধিকার করলো।

হাকিমসাহেব তাঁর তাসখেলার আড্ডায় এ কথা প্রচার ক'রে দিলেন, এবং অনুশীলাও বীরেশ আর রজনীর সম্মানে আর একদিন চা-পার্টির আয়োজন করলো।

রজনী দোকান জমিয়ে তুলতে পেরেছিল। খুচরা কারবার তার কম, কিন্তু পাইকারী আমদানী-রপ্তানির জন্য মোটামুটি লাভের অঙ্কটা তার কম নয়। তাঁতের কাপড়, গামছা, বাসন-কোসন এবং বেতের জিনিসপত্র চালান দিয়ে গত মাসেই তাদের দোকানে প্রায় তিনশো টাকা লাভ দাঁড়িয়েছে। যারা উৎপাদন করেছিল তারা খতিয়ে দেখলো—গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিনিময়-মূল্যে তারা ক্ষতিগ্রস্তই হয়ে এসেছে; এবার লভ্যাংশ অনেক বেশি; মধ্যস্থের পাওনা চুকিয়ে টাকায় প্রায় তিন আনা তারা পায়। এ সংবাদটা চারিদিকে যখন রটলো যে, চাষীদের ঘরে টাকা এনে দিয়েছে, তখন সমবায়-ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি করা সহজ হ'লো। আড়ৎদাররা পাঁচ টাকার শেয়ার ছয় টাকায় কিনেই ক্ষান্ত হ'লো না, অনেকে দশখানা শেয়ারও কিনে বসলো। ব্যাঙ্কে আমানতীর পরিমাণ দেখে জীবনবাবুর দল ভীত হয়ে ওদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানারূপ নিন্দা রটাতে লাগলেন। যদি এই প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় তবে আখের চাষীরা এবং জমির মালিকরা বেহাত হ'তে পারে, এই কারণে চিনির কলের মালিকরা দাদনের হার বাড়ালেন এবং সুদের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। তাতে কাজ কিছু হ'লো বটে, তবে সেই টাকার বাড়তি ভাগটুকু বেশী ডিভিডেণ্ড ঘোষণা

ক'রে বীরেশরা টেনে নিল। কলের মালিকদের কানে সে-কথা উঠলো। তারা ডিরেক্টর-বোর্ডের জরুরী অধিবেশন আহ্বান করলেন।

তাদের গোপন বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত করা হ'লো সে আলোচনা নিষ্ফল, তবে কিছুদিনের মধ্যেই সমবায়-ব্যাঙ্কের সর্বময়কর্তা বীরেশের কাছে এই প্রস্তাব এলো, গ্রামের চতুঃসীমায় এবং সমগ্র মহকুমায় জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, পথঘাটের সংস্কার, জলাশয় ও কূপ-খননের কাজ, কুটিরশিল্পের বিস্তৃতি—ইত্যাদি ব্যাপারে তারা সমবায়-ব্যাঙ্কের পঁচিশ হাজার টাকার শেয়ার কিনতে চান। প্রথম তিন বৎসর নিঃস্বার্থ কল্যাণ প্রেরণার প্রমাণস্বরূপ তাঁরা ডিভিডেণ্ড চান না।

সমিতির সভা ডেকে বীরেশ এই প্রস্তাব পেশ ক'রে বললে এই পঁচিশ হাজার টাকা যদি আমরা গ্রহণ করি তবে গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হয়, কারণ আমাদের হাতে বিস্তর কাজের জন্য টাকা নেই। কিন্তু সমিতির গঠনতন্ত্রে আছে পাঁচশো টাকার শেয়ার যিনি কিনবেন তিনি একজন ডিরেক্টর হ'তে পারেন। কিন্তু তারা কে? পঁচিশ হাজার টাকা যাঁরা দেবেন তাঁরা ধনিক সম্প্রদায়, তাঁদের শোষণ নীতির সঙ্গে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা নেই, তাঁদের শোষণের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিরূপ সম্প্রদায়কে আন্দোলনের পথ বন্ধ করতে হবে, তাই তাঁদের এই উদারতা। আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এসে চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে চাইছে, এইটিই তাঁদের পক্ষে ভয় ও ক্ষতির কারণ।

শেয়ার-হোল্ডারদের পক্ষ থেকে সেইদিনই বীরেশ উত্তর লিখে পাঠালো, —"আপনাদের সহৃদয় প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। সমবায়-সমিতি টাকা গ্রহণ ক'রে আপনাদিগকে সুদ দিবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আপনারা যদি শেয়ার কেনেন তবে তাহা নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কিনিতে হইবে। আমাদের সমিতির পরবর্তী অধিবেশনের এইরূপ একটি প্রস্তাব আসিবার সম্ভাবনা আছে যে, বর্তমানে যাঁহারা ডিরেক্টর এবং চেয়ারম্যান আছেন, তাঁহাদের কার্যকাল দশ বৎসরের অধিক স্থায়ী হইবে না এবং বর্তমান শেয়ার-হোল্ডারদের ভোট লইয়া উক্ত ডিরেক্টরগণকে মনোনীত করিতে হইবে। ডিরেক্টরগণ চেয়ারম্যানকে মনোনীত করিবেন।"

এর পরে একটি কঠিন সংগ্রামে বীরেশকে অবতীর্ণ হ'তে হ'লো। তাদের সমবায়-সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে পূর্বোক্ত প্রস্তাবটি সহজে পাস হয়ে গেল। জীবনবাবু গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে চিনির মালিকদের নিঃস্বার্থ সেবা ও আদর্শের বাণী প্রচার করা সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পারলো না। এই গ্রাম এতকাল ধ'রে অসাড় ও জীবনীশক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, প্রাণস্পন্দন

কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি, আজ নতুন মানুষদের আবির্ভাবের সঙ্গে নতুন জোয়ার এসে সমস্ত গ্রাম প্লাবিত করছে ; তাদের বহুকালের সঞ্চিত তৃষ্ণার জল এখন প্রাণের পদার্থে পরিপূর্ণ।

কিন্তু এর পরে যে-সংগ্রাম সুরু হ'লো এ গ্রামে, তার চেহারা অসাধারণ। বর্তমানে তাদের সমবায়-সমিতির বিস্তৃতি কম নয়। জেলা-কর্তৃপক্ষ তাঁদের গোপন রিপোর্ট দাখিল ক'রে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছেন, এর ভিতরে যদি রাজনীতিক রহস্য কিছু না থাকে তবেই এই প্রতিষ্ঠান এই জেলার পক্ষে একদা গৌরবের বস্তু হয়ে উঠতে পারবে। কর্তৃপক্ষের এই রিপোর্ট দাখিল করার সংবাদ বীরেশ তার লোক মারফত জানতে পেরেছিল, সুতরাং তার দিক থেকেও সতর্ককার অন্ত ছিল না। অনিল সেন এবং তাঁর সরকারী সহকর্মীদের কাছে ছিল বীরেশের নিত্য আনাগোনা। দেবীপুরের থানায় গিয়ে দারোগা ও জমাদারকে সে সমবায়-সমিতির সভ্য করেছে, ডাকঘরের ডাকবাবু এবং দূরের স্টেশনেব মাস্টারমশাই কেউই তার হাত থেকে রেহাই পাননি। সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে সে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জানিয়ে এসেছে, যদি আগামী মাসে আপনি অন্তত দশটি শেয়ার না কেনেন তবে আপনার নামে টাকা জমা দিয়ে আমিই কিনতে বাধ্য হবো। ম্যাজিস্ট্রেট তার প্রস্পেক্টাস ও কার্যপদ্ধতি দেখে সানন্দে দশখানা শেয়ার কিনেছেন।

রজনী এক্ষেত্রে নির্বিরোধী। ব্যবসার উন্নতির দিক ছাড়া আর কোনো-দিকে তার তেমন আগ্রহ নেই। সে মাল বিক্রি বোঝে, আমদানী-রপ্তানির সূক্ষ্ম কলাকৌশল তার আয়ত্তের মধ্যে। বীরেশের সব কাজেই তার সায় আছে, কিন্তু নিজে দোকান ছেড়ে সে যদি প্রচারকাযে যায়, তবে তাদের ব্যবসা এবং অর্থের উৎস শুকিয়ে যেতে পারে। তা'ছাড়া রজনীর উচ্চাভিলাষের একটা সীমানা আছে। সে চোখ রেখেছে ভাগ্যের উন্নতির দিকে,—যেমন ক'রেই হোক, যে কোনো জায়গায় নতিস্বীকার ক'রে স্তাবকতা ক'রে নির্বিঘ্নে ন্যায় ও ধর্মের পথে অর্থের মালিক হয়ে উঠতে। তার মনের কাঁটা সেই দিকেই নির্দিষ্ট আছে যেদিক দিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে কলকাতায় গিয়ে বসবে। সে হিসাবী ও বিষয়ী।

দোকানে ব'সে সে একদিন বললে, সমুদ্রে গর্জন শুনতে পাচ্ছিস ?

বীরেশ বললে, পাচ্ছি। পর্বতপ্রমাণ একটা ঢেউ।

কতদিন দেশ ছাড়া হয়েছি মনে আছে ?

হ্যাঁ রে প্রায় তিন বছর।

রজনী বললে, কে জানে আবার তিন বছর পরে একটা দুর্দিনের ছায়া হয়ত নেমে এসেছে!

কেন?—বীরেশ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, তোর এ কথার মানে কী?

চিন্তিত কণ্ঠে রজনী বললে, চিনির মালিকদের সঙ্গে কি আমরা পেরে উঠবো? তাদের লাখ টাকা, তারা ঘুষ দিয়ে তোমার ডিরেক্টরদের তিন পুরুষকে কিনে ফেলবে। শুনছি, জেলার হাকিম আর পুলিশের লোক তাদের দলে,—গ্রামের লোক কি তাদের চটাবে?

বীরেশ প্রশ্ন করলো, তুই কী বলতে চাস্?

আমি বলি এ যুদ্ধে কাজ নেই, জীবনবাবুর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করো।

কিন্তু এর মানে জানিস্? সন্ধি করার অর্থ ওদের করতলগত হওয়া, ওদের সর্বাঙ্গীণ অধিকারকে স্বীকার ক'রে নেওয়া।

রজনী বললে, তাতে আমাদের ক্ষতি কী? আমাদের কারবার এখন জমে উঠেছে।

বীরেশ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, এই সিদ্ধান্তের ফল আমাদের নৈতিক অবনতি। যদি সমবায়-সমিতিতে ওদের অধিকার কায়েমী হয়, ব্যাঙ্কও ওদের হাতে গিয়ে পড়বে,—তখন গ্রামের লোক আর বাধা দিতে পারবে না। গ্রামের জনসাধারণ আমাদের বিশ্বাস ক'রে উঁচু আসনে বসিয়েছে, কিন্তু আমাদের চিত্তদৌর্বল্য প্রকাশ পেলে এতদিনের সমস্ত চেষ্টা চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়বে, চিনিওয়ালাদের খেয়ালে আমাদের চলতে হবে।

রজনী চিন্তিত মনে চুপ ক'রে রইলো। বীরেশ বলতে লাগলো, লাখ লাখ টাকা যাদের আছে তারা ঘুষ খাইয়ে এক-আধবার কাজ হাসিল করতে পারে, কিন্তু টাকায় মানুষকে জয় করা যায় না—

কিন্তু টাকায় শাসন করা যায়।

যায়, কিন্তু চিরকাল নয়। যত বড় শক্তিই হোক, মানুষের শুভেচ্ছা তার চাইই,—এটা রাজনীতির প্রথম পাঠ। চিনির মালিকদের গোড়াকার কথা তাদের স্বার্থ, লোকের কল্যাণ নয়। টাকার শক্তি বাইরের, সে কারণে সে ঘুষ খাইয়ে চলে, কিন্তু মানুষের পথ দিয়ে যে শক্তি আহরণ করা যায়, সে বার বার হয়ত হারে, কিন্তু চিরকালই সে নিজের তেজে উঠে দাঁড়ায়।—বীরেশ তার স্বভাব-উত্তেজনায় বলতে লাগলো, এ যুদ্ধে আমাদের নামতেই হবে রজনী, এতে আমাদের সম্মান, দেশের সম্মান, আবহমান কালের গণতান্ত্রিক সর্বসাধারণের সম্মান—সমস্ত জড়িত! চেষ্টা ক'রে তিন বছর এগিয়ে এসেছি, বহুদিন নিরাশ্রয়

আর উপবাসের মধ্যে ভবিষ্যতের উপাদান সংগ্রহ করেছি, এই যুদ্ধেই আমাদের বড় পরীক্ষা।

রজনী বললে, কিন্তু যদি হেরে যাই ?

বীরেশ বললে, হারলে আমাদের চলবে না, সেজন্য ওকথা ভাববোও না। একদিকে শক্তিকে প্রকাশ করবো, অন্যদিকে করতলগত করবো ক্ষমতা। ক্ষমতার জন্য আমাদের অন্ধ হ'তে হবে, নিষ্ঠুর হ'তে হবে, ক্ষমতার জন্য বিরোধীদলকে ধ্বংস করতে হলেও পিছপা হবো না।

এর মানে কী বীরেশ ?

এর মানে এই,—আমরা আদর্শবাদী। লোক-কল্যাণ, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য আর অর্থের উন্নতি, সকলের সমান অধিকার, ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা, শোষণের হাত থেকে গরীবকে বাঁচানো,—এই আমাদের মানে।···বীরেশ অসীম উৎসাহে বলতে লাগলো, শহরকে এনে প্রতিষ্ঠা করবো এই গ্রামে, আনবো উদার চরিত্রের সভ্যতা, আনবো পৃথিবীর সংস্কৃতি, আনবো বিজ্ঞানের দিগ্বিজয়ী উপাদান! কিন্তু তার আগে? তার আগে ভিক্ষা নয়, সন্ধি নয়, স্তাবকতাও নয়,—কঠিন, নির্মম ক্ষমতা, সেই দয়াহীন অজস্র ক্ষমতা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষের সকল ভালো কাজে প্রয়োগ করতে হবে। চারিদিকের তামসিক জড়ত্বকে চূর্ণ করতে হবে দেবতাদের সকল স্নেহহীন মারণাস্ত্র দিয়ে। ক্ষমতাকে আমি চাই হাতের মুঠোর মধ্যে, শক্তিকে স্তূপাকার করতে চাই বারুদের মতন······

বীরেশের চোখ দুটো রাঙা হয়ে দপ্‌ দপ্‌ করতে লাগলো।

রজনী সবিনয়ে বললে, এটা তোর নেশা, বীরেশ।

বীরেশ বললে, প্রার্থনা করি এই নেশায় যেন অন্ধ হই। এই নেশায় গ্রামকে যেন অভিভূত করতে পারি। এই নেশায় মত্ত হয়ে তারা যেন সব ভালো কাজের দিকে ক্ষিপ্ত ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। তুই দোকান নিয়ে ব'সে থাক্, আমাকে ছেড়ে দে। এই দ্বন্দ্বে সমস্ত জেলাকে আলোড়িত ক'রে তুলবো। —এই ব'লে সে বেরিয়ে চ'লে গেল।

সমিতির পক্ষ থেকে তিন সপ্তাহ পরে একটি নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হ'লো, সেই তারিখে শেয়ার-হোল্ডাররা ভোট দিয়ে ডিরেক্টরগণকে নির্বাচিত করবেন। যাঁরা নতুন ডিরেক্টর হ'তে চান তাঁরা যথাসময়ে টাকা জমা দিয়ে নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। সমিতির ব্যাঙ্কে বহু টাকা জমা পড়লো, এবং নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল, চিনির মালিকরা তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষায় এই টাকা অক্লেশে খরচ করছেন। বীরেশ ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত ক'রে দেখলো

সমিতির শেয়ার-হোল্ডারদের সংখ্যা প্রায় তেরো শত। জীবনবাবুর লোকেরা ইতিমধ্যেই মহকুমার গ্রামে গ্রামে প্রচার কার্যে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের দৈনিক ভাতা অজস্র পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। তারা আগে থেকেই নৌকা ও গোরুর গাড়িগুলি রিজার্ভ ক'রে রেখেছে যাতে বীরেশের দল সেগুলি ব্যবহার করতে না পারে।

অনুশীলা একদিন প্রশ্ন করলো, ওদের বক্তব্যটা কী?

বীরেশ বলল, ওরা এই কথা বলছে, চিনির কল দেশীয় শিল্প। দেশের টাকা, দেশের মজুরি। এর উন্নতি মানেই জেলার উন্নতি, চাষীদের উন্নতি; এর মালিকরা সকলেই দেশের বরেণ্য জাতীয় নেতা।

আপনাদের বিরুদ্ধে কী বলেছে?

বলছে, আমরা ভূঁইফোড়, জাতীগোত্রহীন। সরকারী মহলে আমাদের আনাগোনা, পুলিশ আর হাকিমের দল আমাদের টাকা আত্মসাৎ ক'রে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কাছে চালান দিচ্ছে! আমরা জাতিদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের দল। আর যারা মুসলমান গ্রামবাসী, তাদের কাছে বলছে, আমরা হিন্দুসভার লোক, আমরা মুসলমানদের সর্বস্বান্ত ক'রে তাদের ওপর উৎপীড়ন করবার চেষ্টা করছি। মুসলমান্ চাষীরা যে টাকা নিয়মিত দাদন পায়, আমরা সেটা বন্ধ ক'রে তাদের শুকিয়ে মারবার চেষ্টায় আছি। ওরা কলকাতা থেকে কয়েকজন মৌলভীকে আনিয়েছে।

কিন্তু জীবনবাবু ত' আর মুসলমান নন।

তিনি হিন্দুও নন্।

অনুশীলা হেসে বললে, তার মানে?

বীরেশ বললে, যারা ধনতান্ত্রিক তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, তাদের কোনো জাত নেই, তারা শুধু এজেন্ট। পৃথিবীতে প্রকাণ্ড যাদের কারবার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান যারা চালায়—তারা কেবল চেক সই ক'রে বক্তৃতা দেয় আর স্ফূর্তি করে। কিন্তু এই সর্বনেশে এজেন্টরাই ধনীদের কারবার চালায়, ম্যানেজারি করে, ডিরেক্টর হয়, শোষণ আর উৎপীড়ন করে, মনুষ্যত্বের সকল বিধানের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাদেরই পায়ে থেঁৎলায় যারা জীবিকার জন্যে এদের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়। জীবনবাবু সেই দলের একটি সরীসৃপ!

অনুশীলা বললে, এ অবস্থায় আমাদের এখন কর্তব্য কী?

বীরেশ বললে, সরল সত্য আর কল্যাণের আদর্শ প্রচার ক'রে আমরা গ্রামবাসীকে জয় করতে চাই।

কিন্তু এ যে নির্বাচনের ব্যাপার, এখানে যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা-ই উচিত।

উচিত নয়, মিসেস্ সেন। মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে উচ্ছেদ করবো না, সত্যের অন্তর্নিহিত তেজ অসীম,—তাকে বরং নির্মমভাবে প্রয়োগ করতে রাজী আছি। দুই মিথ্যার দ্বন্দ্বে একজন জিতবেই, কিন্তু দেশবাসী বিজয়ী আর পরাজিতকে সমানভাবে ঘৃণা করবে, নির্বাচন-দ্বন্দ্বের এইটিই বড় শিক্ষা। আর গণতন্ত্রের আদর্শ মার খাচ্ছে ধনীদেরই চক্রান্তে, কারণ তারা জনসাধারণের ভিতরকার পাশব শক্তিকে খুঁচিয়ে বীভৎস ক'রে তুলতে চায় এই ভোট আর ইলেক্‌শন নিয়ে। জোচ্চুরি, ঘুষ, প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা, গণিকাবৃত্তি—এরাই হ'লো ধণতন্ত্রের ভিত্তি, এই প্রবৃত্তিগুলোই জনসেবার ছদ্মবেশ ধ'রে বড় বড় শ্লোগান্ নিয়ে ইলেক্‌শনে নামে, সরলহৃদয় জনসাধারণ লুব্ধ হয়ে এর অপেক্ষাও বীভৎস দুর্নীতির 'বোগী' নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করে! পাপের একটা নিজস্ব সৃষ্টি-শক্তি আমরা দেখি, সে হচ্ছে তার আত্মস্ফীতি,—পুণ্যবানকেও সে রক্তপান করায়, তাকে হিংস্র আর অমানুষ ক'রে তোলে। কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শ ত' তা নয়, সে নিজের সত্যে উজ্জ্বল, নিজের পুণ্যে সে সক্রিয়। সকল মানুষকে সমান অধিকার দেওয়া, সকল মানুষকে সমানভাবে আহার দেওয়া, আর প্রতিপালন করা এটা ত' গণতন্ত্রের সস্তা বুলি, এ বুলি অনুযায়ী ধনতন্ত্রও চলে—তার বহু প্রমাণ আছে, কিন্তু গণতন্ত্রের কথা তা' নয়, তারা বলে,—সকল মানুষকে সমান অধিকার দেওয়ার চেয়েও বড় জিনিস দেবো, সকল মানুষকেই বড় ক'রে তুলবো, তারা পৃথিবীর সকল ভালো কাজের উপযোগী মহৎ হয়ে উঠতে পারে—এমনভাবে প্রতিপালন করবো। তাই যে দেশেই গণতন্ত্র উঠে দাঁড়াতে চায়, ওরা বলে এনার্কিজম, আপরাইজিং মিউটিনি, ডিসওবিডিয়েন্স, ওরা ল অ্যাণ্ড অর্ডারের ঢাল-তরোয়াল নিয়ে ছুটে আসে! কারণ, যে রাজত্বে ওদের বাস করা অভ্যাস যেখানে গণতন্ত্রের এই মহৎ আদর্শ নেই, তাই গণ-দেবতার এই আবির্ভাবকে ওরা নাম দিয়েছে অরাজকতা।

অনিলবাবু বললেন, কিন্তু এই সব কথা প্রচার করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, মিস্টার চৌধুরী।

বীরেশ হেসে বললে, তা জানি, সাম্যবাদ আমি প্রচার করছিনে। আপনাদের চর আছে আশেপাশে। তা ছাড়া, এ সব গ্রামের লোককে অল্প সময়ে বোঝানও যাবে না।

হাকিম বললেন, কিন্তু আপনার ওই সরল সত্য আর কল্যাণের আদর্শ কী ভাবে প্রচার করবেন?

অনুশীলা জবাব দিল, তুমি ত' দেখেছ ওঁরা কত কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করেছেন—স্কুল, লাইব্রেরী, টাউনহল, রেডিও, সিনেমা, ব্যাঙ্ক—এতগুলো স্কীম

ওঁরা প্রস্তুত করেছেন,—এ গাঁয়ে এগুলো ত' কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। এই সব নিয়ে ওঁরা প্রচারকার্যে নামবেন।

অনিলবাবু বললেন, ক্যাপিটালিস্টদের কথা ত' তুমি জানো। তারা স্বার্থ-রক্ষার জন্য তিন মাসের মধ্যে এগুলো তৈরি ক'রে দিতে প্রস্তুত, অথচ ওঁরা এগুলো একে একে শেষ করতে পাঁচ বছর লাগবে, গ্রামবাসী কাদের বেশী বিশ্বাস করবে বলো দেখি?

অনুশীলা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বীরেশের দিকে তাকালো। বীরেশ বললে, তার জন্যে ভয় নেই। একটার প্রতিষ্ঠা ব্যবসায়ীর স্বার্থের ওপর, অন্যটার প্রতিষ্ঠা দেশসেবার আদর্শে—এইটাই সবাইকে বুঝিয়ে দেবো। আমাদের গতি দ্রুত নয়, মৃদু—কিন্তু দৃঢ়। ওরা সাধারণ প্রতিষ্ঠান খাড়া করবে বাইরে থেকে ওপর দিয়ে এসে, আর আমাদের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান দেশের হৃদয়ের পথ দিয়ে সহজে আত্মপ্রকাশ করবে! সার্কাস পার্টি বাইরে থেকে জমি ভাড়া ক'রে আমোদ বিলোয়, ম্যাজিক দেখায় কিন্তু তাদের হুল্লোড়ে আনন্দ নেই, মাধুর্য নেই। আমাদের এক একটি প্রতিষ্ঠান হবে গ্রামবাসীর শুভ ইচ্ছা আর বুদ্ধির স্বরূপ, মায়ের সঙ্গে যেমন সন্তানের সম্পর্ক তেমনি প্রতি প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুতন্ত্রের যোগ থাকবে গ্রামের নাড়ীর সঙ্গে। আমরা সবাইকে চীৎকার ক'রে পথের ধারে ডেকে কাঙালী-ভোজন করাবো না, সবাইকে অভ্যর্থনা ক'রে ডেকে বন্ধুর মতন ঘরে তুলবো···

আদর্শবাদীর উজ্জ্বল মুখের আভায় অনুশীলা মুগ্ধ হয়ে কতক্ষণ কী দেখছিল সেই জানে। ফস্ ক'রে ব'লে উঠলো, আমিও যাবো।

হাকিম বললেন, কোথায় যাবে তুমি?

আমি বীরেশবাবুদের প্রচারকার্যে যাবো গ্রামে গ্রামে।

কিন্তু,···তুমি যে হাকিমের স্ত্রী?

অনুশীলা সুন্দর হাসি হাসলো। বললে, মায়ের সেবায় যাবো, স্বামীমশাই কি বাধা দেবেন?

বীরেশ বললে, আপনার এই উৎসাহই আমাদের যথেষ্ট, কিন্তু এ কাজ আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, মিসেস্ সেন। চৈত্রমাসের রোদ, জল জলাশয় শুকিয়ে গেছে, গোরুর গাড়িতে সারাদিন থাকা, আহার আশ্রয় অনিশ্চিত,—আপনি বরং—

পরীক্ষা করছেন, কেমন? কিন্তু হাকিমের হুকুম যেমন নড়ে না, হাকিমের স্ত্রীর সিদ্ধান্তও তেমনি অটল। সরকারমশাই আর পাইকরা আমার সঙ্গে থাকবে।

অনিলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, তোমার যাওয়ার অর্থ জানো, আমার সামাজিক অবস্থাটা কল্পনা করতে পারো?

পারি—অনুশীলা বললে, মফঃস্বলের হাকিমের স্ত্রীরা অদ্ভুত জীব। স্বামীর বেতনের ওপর তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, গোপনে নতুন নতুন শাড়ির অর্ডার পাঠানো, অনধিকার রাজনীতি-চর্চা, দম্ভে আর 'স্ববারিতে' রোমাঞ্চ হয়ে ক্ষুদে হাকিম অথবা বড় চাকুরেদের স্ত্রীর সঙ্গে উঁচুস্বরে কথা ব'লে তাদের ধন্য করা। ওসব ত' দেখলুম গো, আর কেন? "নেটিভ গ্রামের রাস্তাঘাট নেই, তাই আমাদের মোটর কেনা হচ্ছে না, উনি ভীষণ সেন্‌সিটিভ, আমার ব্লাডপ্রেসার এত হাই, উইমেন্স জার্নলগুলোয় আজকাল ভারী বাজে লেখা বেরোয়, টেগোরের লেটেস্ট বই—" এসব নিয়ে ত' অনেক আদিখ্যেতা করা গেল, এবার 'মাস্'-এর সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় হ'লে মন্দ কি?—আমি যাবো, তুমি ব্যবস্থা ক'রে দাও। ওরা হয়ত তোমার আড়ালে একটু বলবে, এটা হাকিমের বউয়ের একটা ভালগার মুড—কিন্তু তাতে অনেক কাজ হবে।

অনিলবাবু মুখে হাসি টিপে বললেন, কী কাজ হবে শুনি?

অনুশীলা বললে, দেশের লোককে চেনো না? তারা কলিযুগের শেষ কল্পনা ক'রে বলবে, গাঁয়ে রণরঙ্গিণীর আবির্ভাব হয়েছে, মা মা—রক্ষা করো—ব'লে তারা লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!"

অনিলবাবু আর বীরেশ দু'জনেই হেসে উঠলো।

সেইদিনই সকলের নিষেধ অমান্য ক'রে অনুশীলা যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। হাকিমের স্ত্রীর সম্বন্ধে শঙ্কা আছে, সুতরাং গোরুর গাড়ি আর নৌকার অভাব হ'লো না। দেবীপুরের চারিদিকে এই সংবাদ রটে গেল। রণ-দামামার শব্দে সমগ্র জেলা মুখর হয়ে উঠলো!

ছয়

একমাস পরে আবার ধীরে ধীরে যবনিকা উঠলো।

শেষ বসন্তকালের আতপ্ত বাতাস মধ্যাহ্নের প্রান্তরের উপর দিয়ে বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে। আকাশ পাণ্ডুর ধূসর, মেঘের চিহ্ন কোথাও নেই। ঝড়ের পরে সমস্তটাই যেন অবসন্ন, কেবল চারিদিকে তার ছিন্ন চূর্ণ ভগ্ন খণ্ডগুলি বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

খোলা জানালার বাইরে চেয়ে একান্ত শ্রান্ত মনে বীরেশ নীরবে বসেছিল।

তাদের এই বাড়ি গ্রামের একবারে প্রান্তে, দূরের কাছারির সাড়াশব্দ স্তিমিত হয়ে এত দূরে আসে না। এদিকের খবর নেবার প্রয়োজন কারো নেই। এ বাড়িটা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ভূতপূর্ব সমবায়-সমিতি গোটা চারেক মাটির ঘর তৈরি করে; শালের খুঁটি আর খড় ছাড়া এ বাড়ির কোনো মূলধন নেই। নির্মাণের মজুরি শোধ করবার আগেই সমিতি ইহলীলা সংবরণ করে, মজুররা এসে এর দরজা, জানালা, কাঠের মাচা ইত্যাদি খুলে নিয়ে পালায়। এমনি অবস্থায় একদিন হাকিমের আগ্রহ ও উৎসাহে বীরেশরা এখানে আশ্রয় পায়। সে অনেক দিনের কথা হ'লো বৈকি!

আজকে নতুন ক'রে এই গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা একবার জেনে নেওয়া দরকার। প্রথম থেকে তার উৎসাহ ছিল, আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু কুটনীতিকে সে মূলনীতি ব'লে স্বীকার করতে পারেনি। বৃহৎ ক্ষমতাকে যারা আয়ত্ত করে তারা যে কেবল আদর্শবাদী তাই নয়, তারা বৈষয়িক চক্রান্তকে আদর্শের ভিত্তি ক'রে তোলে। পৃথিবীতে সকল আদর্শবাদ-ই মার খায়, কারণ তাদের বাস্তব ভিত্তি পাকা নয়! আদর্শবাদ হ'লো আকাশ-প্রদীপ, সে স্বপ্ন-প্রয়াণ; কল্পনাকে সে অতখানি মনোহর করে বলেই অতখানি ফাঁকা। বারে বারে মন ভোলাতে চায় বলেই মিথ্যার ফাঁকিতে সে ভরা। ক্ষমতা বাইরে থেকে আসে না, করুণা ক'রে কেউ আরোপ করে না—ক্ষমতার উদ্ভব হয় ভিতর থেকে, নিচের থেকে।

ঝড় একটা তাদের জীবনের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল। কিন্তু তাদের প্রকাণ্ড পরিকল্পনা এবং কর্মসূচীর মধ্যে যেন কোথায় একটা ভুল থেকে গেছে। অনুশীলা অতখানি বুদ্ধিমতী কিন্তু এ-ভুল সেও আবিষ্কার করতে পারেনি। অথচ নারীর অত্যাশ্চর্য উৎসাহ সে প্রকাশ করেছে বিশ্বস্তভাবে। সে হাকিমের স্ত্রী, তার সামাজিক সম্মান, এই গ্রামে তার প্রতিপত্তি—সমস্তই বিপন্ন ক'রে সে বেরিয়ে পড়েছিল। ভুল সে করেনি, আকস্মিক উচ্ছ্বাসের উদ্গিরণে সে গ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েনি, ফাঁকা আদর্শের চোরাবালির উপর প্রসাদ নির্মাণ করতে সে ছোটেনি—কিন্তু তাদের দলের মূল কর্মনীতির ভিতরে যে ত্রুটি ছিল, ভাবপ্রবণতার মোহাঞ্জন তাদের চোখে না থাকলে সেই ত্রুটি তারা অপসারিত করতে পারতো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ শ্রীকৃষ্ণ কূটকৌশল অবলম্বন করেছিলেন অসত্য আর অন্যায়কে বিনাশ করার জন্য। লোক-কল্যাণের মহৎ স্বপ্নে একদিকে তিনি ছিলেন যেমন আদর্শবাদী, কূটচক্রান্তজাল বিস্তার ক'রে শত্রুকে বিনষ্ট করতেও তিনি তেমনি ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী। অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নাম হ'লো ধর্মযুদ্ধ। যুদ্ধের ব্যাপারে ধর্ম এবং ন্যায়পরায়ণতা

পাণ্ডবগণের পক্ষে না থাকা সত্ত্বেও ধর্মযুদ্ধ নাম দিয়ে এটা চ'লে গেল। উদ্দেশ্য মহৎ এবং হিতকর হ'লে মিথ্যার সাহায্যে মিথ্যাকে নষ্ট করা অন্যায় নয়। বড় রাজনীতির মূলমন্ত্রই এখানে। কিছু সততা আর ন্যায়পরায়ণতার দম্ভ ছিল বীরেশের মনে, চারিদিকের মিথ্যা এবং সংশয়ে রুদ্ধশ্বাস হওয়ার ফলে তার এই অভিযানকে সে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রাচীনকালে তপোবনে ধ্যানাসনে ব'সে থাকতেন মুনি, তাঁর আসনের চারিদিকে প্রেত-পিশাচ আর রাক্ষসের তাণ্ডবলীলা চলতো। কিন্তু মুনির সত্য তপস্যায় একসময়ে বশীভূত হয়ে তারা হয় আত্মসমর্পণ করতো, নচেৎ পালিয়ে যেত প্রাণভয়ে। বীরেশ মনে করেছিল, নির্মল সততা সে চারিদিকের দৈন্য, সংশয়, কলহ, ইতরতা আর স্বার্থপরতাকে পরাজিত ক'রে সার্থক হবে।

অনুশীলার কথাটা সে ভোলেনি। অনুশীলা আগে থেকেই বলেছিল,—সে কি বীরেশবাবু, এ যে নির্বাচনের ব্যাপার, এখানে যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই উচিত। কথাটা সামান্য, কিন্তু এই সামান্য কথাটাই তার পিছনে গত একমাস কাল যেন নিয়তির মতো ধাওয়া করেছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে সে জানে। সেও একজন আইনজ্ঞ, কূটকৌশল প্রয়োগে সেও কারো অপেক্ষা কম নয়। কিন্তু তবু, অনুশোচনা তার নেই। নির্বাচনের কুৎসিত কোলাহলের মধ্যে বিজয়ী আর পরাজিত সমানভাবেই ঘৃণিত, তবু এরই মধ্যে সান্ত্বনা রইলো তাদের অভিযানের পথে কলঙ্কের দাগ নেই। তারা পরাজিত হয়েছে বটে; কিন্তু নিজেদের কাছে তারা ছোট হয়নি।

আজ দুপুরে তার কিছু হিসাব-পত্রের কাজ ছিল। একটি সপ্তাহ সে আর ঘর থেকে বেরোয়নি। জনসাধারণের কাছে যে প্রতিষ্ঠা সে গত তিন বৎসরে অর্জন করেছিল, এই নির্বাচনের পরাজয়ে সেটুকু তার ধূলিসাৎ হয়েছে! দশজন প্রার্থীর মধ্যে ছয়টি আসন তার হাতছাড়া হয়েছে, মাত্র চারটি তার দখলে। তার দলের সংখ্যা কম, এবং এই চারজনের মধ্যেও কেউ কেউ তার হাতছাড়া হ'তে পারে এমন আশঙ্কাও আছে। হিসাব-নিকাশের কাগজপত্র ওলটাতেও সে শঙ্কিত হচ্ছে। সমবায়-সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে সে নির্বাচনের খরচ জুগিয়ে এসেছে, তাদের দোকানের সংরক্ষিত তহবিলেও ঘাটতি পড়েছে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ নির্বাচনের পরাজয়ের পর দেখা যাচ্ছে তাদের মাথার উপর প্রকাণ্ড ঋণভার। এবং এই দেনা শোধ না করলে তহবিল তছরুপের দায়ে তাকে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হ'তে হবে। টাকার পরিমাণ অনেক। এই টাকার সংস্থান তার কোথাও নেই। বীরেশ মনে মনে দিশেহারা ও ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

এমন সময় রজনী এসে ঘরে ঢুকলো। চোখে মুখে তার অতিশয় ক্লান্তি আর অবসাদ, তার ভাবভঙ্গীতে বিশেষ বিরক্তি। ঘরে ঢুকে জামাটা কোনোমতে খুলে শুয়ে পড়লো। বললে, উঃ কী রোদ, সব জ্ব'লে পুড়ে গেল। আর ভালো লাগে না।

বীরেশ কথার জবাব দিল না। নির্বাচনে হেরে যাবার পর একসপ্তাহ রজনীর সঙ্গে তার কথাবার্তাই হয়নি। রজনী বলেছিল, এ দ্বন্দ্বে নেমে কাজ নেই। আমরা ব্যবসাটা ফলাও ক'রে তুলি। আগে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হোক, টাকা পয়সা জমুক। টাকায় পৃথিবী কেনা যায়, এ ত' সামান্য ইলেক্‌শন্!—তার কথা ফলেছে। কেবল হার হয়নি, দোকানও ডুবেছে। পাওনাদারাদের কিস্তি শোধ করা যায়নি, তারা মালপত্র দেওয়া বন্ধ করেছে। টাকার সংস্থান আর কোথাও নেই। এতদিন সংগ্রাম ক'রে যে ব্যবসাটি দাঁড় করানো গিয়েছিল, যার উপর ভিত্তি ক'রে তাদের আশা, আশ্বাস আর উচ্চাভিলাষ গ'ড়ে উঠেছে, সেটুকু আজ চূর্ণ বিচূর্ণ। অথচ এই দুর্ভাগ্যের জন্য রজনী দায়ী নয়। জলে, ঝড়ে, রোদে এই দীর্ঘ তিন বৎসর কাল তারই পরিশ্রমে, তারই একাগ্রতায়, তারই একান্ত উৎসাহে যে কারবার দাঁড়িয়ে উঠতে পেরেছিল, বীরেশের একটা সামান্য খেয়ালে, তার অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর একটা প্রবৃত্তির তাড়নায়, অপমানে লজ্জায়, আঘাতে রজনীর সেই তপস্যার প্রাসাদ আজ ভেঙে পড়লো। জীবনে সুযোগ বড় বেশী সংখ্যায় আসে না। বন্যার মতো স্বভাব নিয়ে সে আসে। যদি তার জল সময় মতো ধ'রে রাখতে পারা যায় তবেই ভালো, নচেৎ ফসল ফলাবার মাঠ শূন্যই প'ড়ে থাকে।

বীরেশ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো,—পোস্ট-অফিসে আজ খোঁজ করেছিলি, ..?

শুষ্ককণ্ঠে রজনী জবাব দিল, হ্যাঁ।

বীরেশ আশা ক'রে রইলো, সম্পূর্ণ কথাটা রজনী ক্রমশ বলবে। কিন্তু তার কাছ থেকে আর কোনো সাড়া এলো না। অনেকক্ষণ পরে বীরেশ পুনরায় প্রশ্ন করলো, ক্যালকাটা ট্রেডিংয়ের টাকা কি এসে পৌছয়নি রে?

রজনী এইবার সমগ্র পৃথিবীর উপর বিতৃষ্ণা ও বিরক্ত হয়ে বললে, না, টাকা তারা আর পাঠাবে না। নতুন মাল হাতে না পেলে বাকী টাকা তারা আর দেবে না। ইচ্ছে হয় নালিশ করো।

বীরেশের কাছে জবাব না পেয়ে পুনরায় রজনী বললে, এদিকে ত' বেতওয়ালারা আর জোলারা আমাদের একঘরে করেছে! ইলেক্‌শনে হেরে যাবার ফলাফল এবার ফলেছে। তখন বলেছিলুম···

তখন কী বলেছিল সে-কথাটা নিজেও সে আর উল্লেখ করলো না, চুপ ক'রে গেল। বীরেশ তেমনি শান্ত এবং মৃদুকণ্ঠে পুনরায় বললে, সিটি অর্ডার সাপ্লাই কী বলে?

সিটি অর্ডার সাপ্লাই? তারা টাকাও দিয়েছে, মাল নেওয়াও বন্ধ করেছে। টাকা তুমি নিজের হাতেই খরচ করেছ ইলেক্‌শনের হুজুগে—মনে নেই? উত্তেজনার মুখে তুমি ত' যথাসর্বস্ব তলিয়ে দিয়েছ। রজনী তাকে অনেকটা যেন ধমক দিল।

বীরেশ বললে, সবই সত্যি। আপাতত উপায় কী তাই বল। দেনার জন্যে নালিশ করলে ত' ভীষণ কেলেঙ্কারী। সুগার মিলের কর্তারা ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জব্দ করতে পারে।

রজনী বললে, আমাদের দলের যারা রিটার্নিড্ হয়েছে তারা বড় বড় গেঁয়ো নেতা, অর্থাৎ ভাড়ে মা ভবানী! তারা সাচ্চা লোক হ'তে পারে, কিন্তু পেটে ভাত নেই, তুমি যাদের বেছে বেছে খাড়া করেছ তারা সবাই এই। সুগার মিলের কর্তারা কেবল সুযোগ বুঝে জব্দই করবে না, কেবল গ্রাম ছাড়া-ই করবে না,—জেলে এবার পাঠিয়ে জানাবে যে সবলের সঙ্গে দুর্বলের কী তফাত।

বীরেশ কিছুক্ষণ পরে বললে, বাবার কাছে টাকা চেয়ে আর একবার লিখবো?

রজনী বললে, সেবারের চিঠি কি ভুলে গেছ? তুমি তাঁর ত্যজ্যপুত্র, এবারে চিঠি দিলে তিনি জবাবও দেবেন না। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে অপমানিত হয়ে ফিরতে হবে। তাঁর 'আপরাইটনেস্' স্নেহে অন্ধ হবে না, মনে রেখো।

কথাটা সত্য, নিষ্ঠুর হ'লেও সত্য। জীবনে সে আর কোনোদিন সে-পথ মাড়াতে পারবে না! বাবা তাঁর দানপত্র ক'রে কোথায় গেছেন, অথবা কোথায় তিনি আছেন তাও বীরেশের জানা নেই। আত্মীয়-পরিজন সম্পর্কে আর কারো কাছেই সে কোনোকালে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বীরেশ স্তব্ধ হয়ে রইলো অনেকক্ষণ। পরে বললে,—যদি নলিনীকে সব কথা জানাই?

রজনী বললে, আমাকে রাগিয়ো না। তোমার অভাবের খবর পেয়ে নলিনী একদিন হাজার টাকা অর্থাৎ তার যথাসর্বস্ব পাঠিয়ে দিয়েছিল। তোমার জন্যে সে বিয়ে করেনি, তোমার জন্যে সে গৃহত্যাগ ক'রে কোন্ বিদেশে গিয়ে সামান্য মাস্টারী ক'রে দিন চালাচ্ছে। যথেষ্ট শাস্তি মানুষ হয়ে তোমার জন্যে সে মাথায় তুলে নিয়েছে। আজ এত টাকা তার কাছে তুমি চাইবে কোন্ লজ্জায়, সে দেবেই বা কোথা থেকে?—অসম্ভব, আর কোথাও কিছু নেই!! —এই ব'লে উত্তেজনায় উঠে রজনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে

চারিদিক থেকে যেন তার উপরেই বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিকে অভাব, রিক্ততা,—যতদূর দৃষ্টি আর কল্পনা যায়, শূন্য নগ্ন মরুভূমি যেন ধূ ধূ করছে। নেই, নেই, নেই……

কিন্তু দিগন্তব্যাপী এই নিদারুণ শূন্যতার দিকে চেয়ে নলিনীর কথাই বেশি ক'রে মনে পড়ছে। বহুদিন তার খোঁজখবর আসেনি। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন কাজে ঢুকে সে জানাবে বলেছিল, হয়ত জানাতে ভুলে গেছে! হয়ত প্রয়োজন মনে করেনি। অভিমানে আজ কিছু করা চলবে না, অভিমানের অতীত তপস্যায় নলিনী নীরব। কোনোদিন হয়ত নিজেকে সে প্রকাশ করবে না। যে ভালোবাসা পরম শ্রদ্ধা আর সম্মানে রূপান্তরিত, সেই ভালোবাসা নিয়ে নলিনী চ'লে গেছে বৈরাগিনী হয়ে। নলিনী অভিমান জানায়নি, অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে যায়নি। তার দাবি উগ্র নয়, আক্রমণশীল নয়। পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পথ অবরোধ করেনি, পথে টেনেও নামায়নি। মুখ বুজে চ'লে গেছে কোনো প্রার্থনা না রেখে, কোনো পরিচয় না দিয়ে!

বিবাহ সে করেছে সত্য, কিন্তু সেই তথাকথিত স্ত্রীর সম্বন্ধে তার চেতনা অথবা অনুভূতি কিছু নেই। সে যেন কোন্ কল্পান্তরবাসিনী নারী। তার সঙ্গে আত্মীয়তা নেই, প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখে সুখে বীরেশ তাকে কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু আজ এই দুর্দিনে ত' নলিনীকেই কেবল মনে পড়ছে! আগেকার একটা প্রকাণ্ড পরিব্যাপ্ত জীবন, সে-জীবন নলিনীর জ্যোতির্ময়তার পরিমণ্ডলে অনেকটা যেন মহিমান্বিত ছিল! প্রণয় সেখানে বড় কথা ছিল না, কারণ সর্বপ্রকার প্রণয়ের যে মূলীভূত কারণ, সেই কেন্দ্রে দু'জনেই ছিল যথেষ্ট পরিমাণে নির্বিকার। গোপন সুড়ঙ্গ পথ ধ'রে তাদের সেই সাথীত্ব আত্ম-তৃপ্তির লালাসিক্ত পথে ছুটতে ছুটতে নিজেদের পরিশ্রান্ত করেনি, তারা ছিল সজাগ, ছিল সহজ। পরিবার ও পরিজনের মধ্যে সকলের কাছেই সুপ্রচারিত সেই সাথীত্ব ছিল অতি মধুর, অতি স্বাস্থ্যকর। নিজেদের তারা কেবল প্রচারই করে নি, প্রকাশও করেছিল। একথা তারা সর্বপ্রকার আচরণের দ্বারা জানিয়ে এসেছে, নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে আর যাই থাক, তস্করবৃত্তি নেই। যে আলাপ তারা করেছে সকলের মাঝখানে ব'সে সেই আলাপই করেছে তারা কলকাতার নির্জন পার্কের বেঞ্চে আসন নিয়ে। গোপন যেটুকু ছিল, সেটুকু সরীসৃপ-সুলভ অবলেহী বৃত্তি বশত না, সে আবরণটুকু নিষ্কলুষ মাধুর্যে ভরা। আজ, দুর্যোগে আর অবমাননার মধ্যে নলিনী তার প্রাণ-প্রাচুর্যভরা উৎসাহ নিয়ে উপস্থিত নেই, বীরেশের শরীরের একটা প্রধান অঙ্গ যেন অসাড়, দুর্ভার। দুর্দিনের দুশ্চিন্তা অপেক্ষা সেই বেদনার অনুভূতিই তার কাছে যেন প্রবল হয়ে দেখা দিল।

আর একজন রয়েছে তার অতি নিকটে। এত নিকটে এবং এমন ভাবে তাকে আবৃত ক'রে রয়েছে যে, বীরেশের যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। অত্যন্ত সঙ্গোপনে তার কথা না ভাবলে তাকে জানা যায় না। একটি কথার অগণ্য অর্থ, একটি চাহনির অসংখ্য ব্যাখ্যা, এবং একটি ভঙ্গীর অজস্র ভাষা… অনুশীলার কথা ভাবছে সে! উজ্জ্বল হাসিতে সে যেন জ্বলন্ত, জাদুকরী আভায় সে যেন শ্রোতাকে অভিভূত আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, শ্রুতিমান অপেক্ষা দৃশ্যমানতায় বীরেশ যেন সেখানে স্তব্ধ হয়ে থাকে। রজনী জানে না, অনিল বোঝে না, কিন্তু সকলের মাঝখানে ব'সে কেমন যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্রে অনুশীলা তার কাছে আপন হৃদয়ের সংবাদ পাঠায়। তার অঙ্গুলি সঞ্চালনে, তার লঘু পদশব্দে, তার চূর্ণ হাসির আওয়াজে যে ভাষা জেগে ওঠে, সে যেন টেলিগ্রাফের শব্দ-উৎপাদনের মতো।…সকলের কাছে যা অপরিজ্ঞাত থেকে যায়, বীরেশের কাছে তা যেন পরিপূর্ণ অর্থ বহন ক'রে আনে। বীরেশ ভীত হয়ে ওঠে তার সান্নিধ্যে।

ভীত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। অনুশীলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে প্রশ্রয়ের স্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কে আসে। সেই স্ফুলিঙ্গ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রচণ্ড প্রতিরোধ-শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি বীরেশের আছে। কিন্তু সেই শক্তি সকল সময়ে তার থাকে না। অথচ এর রহস্য আগে তার জানা ছিল না।—মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি নয়, নলিনীকেই সে কেবল জানে। কিশোরকাল থেকে নলিনীকে সে জানে সহচারিণী,—নলিনী তার বন্ধু, নলিনী তার আপন আত্মারই অখণ্ড প্রতিরূপ। কিন্তু এ-মেয়ে নলিনীর জাতি হ'তে উদ্ভূত নয়, এ বিদেশিনী, অপরিচিতা। পিরামিড্ দেখলে যে বিস্ময়, চীনের জীবন্ত ড্রাগন সহসা পথের মাঝখানে এসে দাঁড়ালে যে আবির্ভাব,—এ যেন তাই। অনাত্মীয়া মহিলা যারা, তাদের অনেকের সঙ্গেই বীরেশের কুটুম্বিতা ঘটেছে। তাদের সঙ্গে বীরেশ সম্পর্ক পাতিয়ে এসেছে সহজে, স্বচ্ছন্দে; সংশয়ের কুশাঙ্কুর কোথাও ফোটেনি। কিন্তু অনুশীলা হ'লো পৃথিবীর আদিম নারীজাতির একটি খণ্ডাংশ। চিরকাল ধ'রে পুরুষের কল্পকামনাকে যারা আলোড়িত করেছে, অনুশীলা তাদেরই দলে! অনুশীলা সেই আবহমানকালের পরস্ত্রী।

দুই বন্ধুতে তারা একদা যে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেছিল, সেই ঘটনা চতুর্থ বৎসরে এসে পৌঁছলো। জয় আর পরাজয়ের ভিতর দিয়ে এই দীর্ঘকালটা হ'লো একটা বিস্তৃত নাটক। কত সংঘাত, কত ধূলিসাৎ, কত আশা আনন্দ বেদনা উত্তেজনায় বিপ্লব-সংঘর্ষ তাদের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল। কত ভাঙন, কত

নির্মাণ, কত অশ্রুর অব্যক্ত ভাষা, কত বা ক্ষণিক আনন্দের নিঃশব্দ আলোড়ন! তার এই দীর্ঘদিনের কল্পনায় নিঃশব্দ অনুপ্রাণনা যুগিয়েছে নলিনী আর বাস্তব জীবনের সংগ্রামে সংঘাতে প্রবল উৎসাহ যুগিয়েছে অনুশীলা। তাদের এই বৃহৎ নাটকে পাত্রের সংখ্যা যত বেশিই হোক, নায়িকার সংখ্যা মাত্র একটি। তারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে, তারই নিষ্কম্প নির্দেশে সমস্তটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে,— বীরেশ যেন সেই দৃশ্য আজ স্পষ্ট দেখতে পেলো। সে দেখেছে সামান্যর জন্য অনুশীলার কী অসাধারণ অধ্যবসায়, স্ব-মত প্রতিষ্ঠার জন্য কী প্রচণ্ড সংগ্রাম, বিরোধীকে দলিত করার জন্য কী অদ্ভুত চক্রান্তজাল! দুই শিক্ষিত চোখের তারায় একদিকে যেমন বিদ্যুজ্জ্বালা ঝলকিত হয়ে ওঠে আক্রোশে, তেমনি করুণ মৃৎপ্রদীপের আলোও উদ্‌ভাসিত হয় মধুর বন্ধুতায়।

সহসা তার চমক ভাঙলো বাইরে থেকে কার পায়ের শব্দে। আড়ৎদারদের আজকে টাকা দেবার কথা ছিল, সেই কথাটা বীরেশের মনে প'ড়ে গেল। সে সজাগ হয়ে উঠে বসলো।

আরে মথুরানাথ যে? এসো, এসো—কী খবর? বুড়ো মানুষ এত রোদে কি বেরোতে আছে? ব'সো, ঠাণ্ডা হও।

মথুরানাথ ঘরে ঢুকে ঠাণ্ডা মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে বললে, আর বাবু, এ বছর বৃষ্টি নেই, সব জ্ব'লে পুড়ে গেল। না খেয়ে মরবে সবাই।

তারপর? তুমি আছ কেমন মথুরানাথ?

আপনারই দয়া, বড়বাবু। পেটে ভাত দুটো দিচ্ছি সে আপনারই ইচ্ছে। বড়বাবু, আপনার দেনা যে এইভাবে শোধ করতে হবে, আগে জানলে,—মথুরা আপনার পায়ের লোক, পায়ের তলাতেই থাকবে। কিন্তু ওদের কোনোকালে ভালো হবে না—

তার অশ্রু-গদগদ কথায় বীরেশ বললে, কী হয়েছে মথুরা, কোনো খবর আছে?

কপালের ঘাম আর চোখের জল মথুরা একসঙ্গেই মুছে ফেললো, তারপর তার ছেঁড়া ছিটের কোটের ভিতরকার পকেট থেকে একখানা বড় খামসুদ্ধ চিঠি বের ক'রে নিঃশব্দে বীরেশের হাতে তুলে দিল।

চিঠি খুলে বীরেশ পড়ছে দেখে মথুরানাথ পুনরায় বললে, আমাকে দিয়ে এত পাপ করিয়ে নিল; এ অধর্ম আমার সইবে না, বড়বাবু, আমার যেন সর্বনাশ হয়।

চিঠি পড়া শেষ ক'রে বীরেশ একবার বিবর্ণমুখে তার দিকে তাকালো, তারপর সহসা এদিক ওদিক চেয়ে যেন কাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু রজনীর

ভরসা করা বৃথা, তার হাতেও এর কোনো প্রতিবিধান নেই। চিঠিখানা পুনরায় বন্ধ ক'রে সে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো।

বড়বাবু ?

গলা ঝাড়া দিয়ে বীরেশ বললে, কী বলো ?

আমার কোনো অপরাধ নেই, বড়বাবু।

না হে মথুরা, তুমি কেন অপরাধী হবে ? গলা পরিষ্কার ক'রে বীরেশ বলতে লাগলো, এ বাড়ি থেকে ওরা আমাদের নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দিতে পারে, কারণ এ বাড়ি সমবায়-সমিতির সম্পত্তি। ওদের দল এখন ভারি, আমরা হ'টে যেতে বাধ্য। সাত দিন সময়ও দিতে চায় না। আমাদের হাত থেকে কাগজ-পত্র, ব্যাঙ্কের বই, যা কিছু অধিকার আর দায়িত্ব—সবই ওরা আইনের বলে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের ঘাড়ে প্রকাণ্ড দেনা, যদি শোধ করতে না পারি, জেল খাটতে হবে। কিন্তু কি জানো মথুরা, আমাদের এই গ্রাম আর এই জেলা ছেড়ে চ'লে যেতে হয়—নইলে আর উপায় নেই ! আমাদের তাড়াবার এমন সুযোগ আর ওরা পাবে না।

আপনারা যাবেন কেন বড়বাবু ?

আমাদের থাকার আর জায়গা নেই যে হে ? তুমি ত' জানো মানুষের দাম কম, যে-আসনে সে বসে আসনটারই দাম বেশি। আমরা পোজিশন্ হারিয়েছি, আমরা এখন বেড়াল-কুকুরের বেশী কিছু নই···আচ্ছা, তুমি এখন যাও ! ওদের ব'লো, আইন অমান্য আমরা করবো না। এ বাড়ি যথাসময়ে ছেড়ে দিয়ে যাবো।

তার পায়ের ধুলো নিয়ে চোখের জল মুছে মথুরানাথ উঠে চ'লে গেল।

এর পরে ওদের জীবনে আবার একটা বিপ্লব ঘটলো।

কী যেন কাজকর্মে রজনী দুদিন মহা ব্যস্ত। তার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলবার অবকাশও সে দেয় না। বাইরে-বাইরে বৈষয়িক ব্যাপারে সে সারাদিন কাটায়। স্নানাহারের সময়ও তার নেই। এদিকে এ বাড়ি ছেড়ে না দিলেই নয়। তিন দিনের মেয়াদ তাদের উত্তীর্ণ হ'তে চললো। সেদিন যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য বীরেশের রজনীর জন্য উন্মুখ হয়ে বসেছিল।

ভোরের দিকে রজনী বেরিয়ে গিয়েছিল।—প্রায় ন'টা নাগাত সে ফিরলো। কিন্তু সঙ্গে তার সেই পুরনো গাড়োয়ানের সেই ভাঙা গাড়িখানা। গাড়ি এসে একেবারে দরজার ধারে দাঁড়ালো।

শশব্যস্তে ঘরে এসে রজনী খবর দিল, বীরেশ, একবার বাইরে আয় রে। মা, দিদি, ভগ্নীপতি সবাই এসেছেন।

তাই নাকি ?—ব'লে বীরেশ দ্রুতপদে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

একজন বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা এবং তাঁর সঙ্গে কন্যা ও জামাতা। সঙ্গে চার পাঁচ বছরের একটি বালক। বীরেশ হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে সকলেরই পায়ের ধুলো নিল। বললে, মাসিমা, দিদি, জামাইবাবু—আপনারা সবাই এলেন! কী ভাগ্য আমাদের ?

মাসিমা আশীর্বাদ ক'রে বললেন, ভারি খুশী হলুম তোমাকে দেখে। কেমন আছ তুমি ?—কিন্তু বাবা, হাতে ক'রে সব গড়লে, আবার নিজের হাতেই কি সব ভাঙতে হয় ?

বীরেশ হক্‌চকিয়ে এদিকে ওদিকে একবার তাকালো। কথাটা সে বুঝতে পারেনি। দিদি, জামাইবাবু এবং রজনী—সকলেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মাসিমা বললেন, অল্প বয়স কি না, মন তোমার এলোমেলো। তা' বেশ, তুমি যা বুদ্ধিমান ছেলে, এবার থেকে সব পারবে। বড়মানুষের ঘরে তোমার জন্ম, তুমি একাই একশো।

দুর্বোধ্য তাঁর ভাষা! কিন্তু তবু তাঁদের নির্লিপ্ত আচরণে এবং নীরস কণ্ঠস্বরে বীরেশের মন কেমন যেন সংশয়ে আর দ্বন্দ্বে দুলতে লাগলো। কিন্তু চিত্তবিকার গভীর ভাবে তাকে কোনোদিন আচ্ছন্ন করেনি। নিজের চমক নিজেই সহসা ভেঙে দিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে বললে, আসুন মাসিমা, আসুন আপনারা সবাই ভেতরে,—আজ কী যে আনন্দের কথা বলতে পারি নে। আগে এসে বিশ্রাম করুন আপনারা, পরে খুব গল্প করা যাবে।

পাগল ছেলে!—মাসিমা হাসিমুখে বললেন, এসেছি যখন তখন কি আর ফিরে যাবো বাবা। এই তোমার কাছাকাছি থাকবো,—ওরে রজনী, গাড়ি যেন চ'লে যায় না। জিনিসপত্রগুলো তোর কোন্ ঘরে আছে বল্ দিকি রে ?

কিন্তু রজনী বাইরে থেকে কোনো সাড়াশব্দ দিল না, ঘোড়ার গাড়ির পাশে নিজেকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে তার দিদির সঙ্গে কী যেন কথাবার্তা বলতে লাগলো।

বীরেশ বললে, আপনারা কি এখুনি চ'লে যাবেন, মাসিমা ?

যাবো আর কোথায় বাবা, তোমাদের এই গ্রামেই থাকতে এলুম কিছুদিন। হরিহর চক্রবর্তীকে জানো ত' ? তার ওখানেই যাচ্ছি। তোমার কাছেই রইলুম, ভয় কি ?

রজনী কি আপনাদের সঙ্গে যাবে ?

মাসিমা বললেন, হ্যাঁ বাবা, ও এখন থেকে আমারই কাছে থাকবে। তুমি কিছু মনে ক'রো না, অনেক করেছ তুমি ওর জন্যে। ওরই ভাগ্য খারাপ, নইলে তোমার এমন কেন হবে, বাবা?—কই, ললিত কোথায় গেল? এদিকে একবার এসো বাবা, ললিত। ওকে চেনো ত'? আমার জামাই।

ললিত এসে দাঁড়ালেন বিশ্বস্ত কুকুরটির মতো।

শাশুড়ী বললেন, সময় ত' নেই, কথাটা এখনই সেরে নাও। তোমার ওই দোকান আর কারবারের কথা হচ্ছিল। ওটা কি বাবা তোমাদের দু'জনের নামেই আছে?

ললিত প্রশ্ন করলেন, আপনারা কি সমান অংশীদার!

বীরেশ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডকুমেণ্ট একটা আছে ত'? রেজেস্ট্রি হয়েছিল?

না, দরকার হয়নি। টাকাকড়ি সমস্তই আমার আমানত করা, তবে রজনী অর্ধেক ভাগ পাবে এই কথা আছে।

ললিত হেসে বললেন, কিন্তু ধরুন, ভবিষ্যতে যদি একটা—অবশ্য যদি সত্যকার বন্ধুত্ব হয় তবে কোনোদিন বিবাদ না বাধতেও পারে। কিন্তু কি জানেন, এসব বিষয়ে পাকাপাকি একটা বন্দোবস্ত থাকলে ভবিষ্যতে কোনো পক্ষেরই আর দুশ্চিন্তা থাকে না। আপনি ত' নিজেই ওকালতি পাস করেছেন, আপনাকে বলাই বাহুল্য!

বীরেশ বললে, আপনারা কী চান বলুন?

শাশুড়ী এবার আসল কথাটাই পেড়ে ব'লে ফেললেন, আমি বলি বাবা, আধাআধি বক্‌রার আগে তোমাদের লেখাপড়াটা হয়ে যাক্।

হাসি মুখে বীরেশ এবার বললে, আধাআধি বক্‌রা ত' হবে মাসিমা, কিন্তু এ কারবারে আধাআধি টাকা রজনী দেয়নি। সমস্ত টাকা আর সমস্ত দায়িত্বই আমার। এ যাবৎ সমস্ত দেনা আর সব বিপদই আমার উপর দিয়ে গেছে। রজনী বরাবর তার পারিশ্রমিক নিয়ে এসেছে, আমি আজ পর্যন্ত একটি কানাকড়িও নিজের জন্যে খরচ করিনি। এই কারবারের এক পাই অংশেও তার অধিকার নেই,—সমস্তটা আমারই সৃষ্টি।

কথাগুলি সত্য, সেই কারণেই কটু, রূঢ়। ভিতরে ভিতরে তার সমগ্র হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু বাইরে তার গলার আওয়াজ লেশমাত্রও অশান্ত অথবা অভদ্র হয়নি। একদিকে শাশুড়ী, অন্যদিকে জামাতা—উভয়েই নিরুত্তর বিহ্বলতায় তার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে সহসা তীব্র জলন্ত হাসি হেসে মাসিমা বললেন, তুমি উকিল বটে বাবা,—যা মনে করেছিলুম তুমি

ত' তা নাও? তা'হলে রজনী আমার সব দিক থেকেই ফাঁকি পড়লো, কেমন বীরেশ?

তাঁর বিষাক্ত, তীক্ষ্ণ এবং অবমাননাকর মন্তব্যে বীরেশ কোনো জবাব দিল না। কেবল মুখ ফিরিয়ে বললে, তা'হলে এ অবস্থায় কী করা যায় ললিতবাবু?

ললিত বললেন, আপনি যা বলছেন তাই যদি সত্য হয়, তবে রজনী ত' কিছুই পেতে পারে না।

এইটেই সত্য, রজনীও জানে—আপনারাও হয়ত জানেন।

শাশুড়ী রুদ্ধ আক্রোশে ব'লে উঠলেন, তা'হলে তুমি ত' আমার ছেলের চারটে বছর মাটি ক'রে দিলে, বাবা। তুমি নিজেও নষ্ট হ'লে, ওকেও মাথা তুলতে দিলে না। বাপ বোধ হয় এইজন্যেই তোমাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়েছিল!

বীরেশ একবার স্তব্ধ চক্ষে তাঁর দিকে তাকালো। একটা প্রকাণ্ড অসংযত উক্তি তার মুখের আগায় এসে পড়েছিল। কিন্তু নিজেকে সবলে সংযত ক'রে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরে এসে সে ডাকলো, রজনী? এদিকে আয় একবার।

গুরুগম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। এ গলার আওয়াজ বন্ধুর নয়, সহকর্মীর নয়,—এ কণ্ঠ অভিভাবকের। এ আহ্বান অমান্য করার সাধ্য রজনীর ছিল না। ভীরু এবং অনুগত সেবকের মতো সে কাছে এসে দাঁড়ালো। বীরেশ সহসা হাসিমুখে তার কাঁধে হাত রেখে বললে, তুই যে আমাকে ছেড়ে যেতে চাস আগে জানাস নি কেন রে? বেশ, যেখানেই থাকিস্ মন দিয়ে কাজ করবি। আমাদের কারবারের অবস্থা খুবই ভালো, তবে টাকাকড়ি আপাতত আট্‌কা পড়েছে বটে। তুই ত' জানিস্, শীগ্‌গিরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শাশুড়ী ও জামাই পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরেশ পুনরায় বললে, মাসিমা রাগ করছেন, আমি নাকি তোর ভবিষ্যতের কোনো ব্যবস্থা করিনি। আমার সাধ্য খুবই কম। তবে তুই এই কারবারের জন্যে অনেক পরিশ্রম করেছিস। আমি আজ থেকে এ কারবার তোর হাতেই ছেড়ে দিলুম, তোকেই দান করলুম। ললিতবাবু, আপনি আসছে সোমবারে রজনীকে নিয়ে কাছারিতে আসবেন, আমি ওর নামে ডকুমেণ্ট তৈরি ক'রে দেবো,—যা রে রজনী, তোর জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে নে।

তিন বছরে আসবাবপত্র কিছু কিছু জমেছিল বৈকি! কিন্তু নিজের জন্য

কিছু রাখতে বীরেশের একেবারেই রুচি হ'লো না। সে প্রায় জোর-জবরদস্তি ক'রে রজনীর সঙ্গে সমস্তই গাড়িতে তুলে দিল।

শাশুড়ী ও জামাতা বিহ্বল বিস্ময়ে কেমন যেন নির্বোধ ও নির্বাক হয়ে গাড়িতে উঠলেন। দিদির চোখে মুখে ছিল বিমূঢ়তা। রজনী ফিরে এসে কাতর কণ্ঠে একবার বিদায় নেবার চেষ্টা করতেই বীরেশ তাকে ধ'রে গাড়িতে তুলে দিয়ে বললে, এখানেই ত' রইলুম রে, আবার দেখা হবে। কাজ-কারবার মন দিয়ে চালাস্।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ঘরে ফিরে এসে ক্ষুধার্ত শ্রান্ত বীরেশ জানালার ধারে ব'সে পড়লো। এদিকের পল্লীটা নির্জন, শূন্য ঘর দুটো খাঁ খাঁ করছে। আজ থেকে সে সম্পূর্ণ একা।

তাদের উভয়েরই ভাগ্যসূত্র একত্রেই গ্রথিত হয়েছিল বটে, কিন্তু বড় দুর্দিনেই রজনীটা আজ তাকে ছেড়ে গেল!

রিক্ত ও নিঃস্ব ঘরখানার মেঝের উপর ঠাণ্ডায় সে একসময় বড় ক্লান্তিতে শুয়ে চোখ বুজলো। নিজেকে অনেকদিন পরে কেমন যেন পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত, পদাহত মনে হ'তে লাগলো। পিতার সঙ্গে মতভেদ হয়ে সে যেদিন সব ছেড়ে চ'লে আসে, পথে পথে যেদিন ঘুরতে হয়, যেদিন ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্ন ছিল না,—সেদিন নিজেকে এত নিরুপায় মনে হয়নি। যাকে বিয়ে ক'রেও সে স্ত্রী বলতে পারেনি, এবং যে-নলিনীকে কাছে না পেয়ে তার চিরজীবন বিপন্ন হয়েছে—তাদের জন্যেও এত বেদনা তার বুকে বাজেনি। যে সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে এই কয় বছর উত্তীর্ণ হয়ে এলো, দীর্ঘরাত্রির যে দুশ্চিন্তা, অশান্তি, চিত্তক্ষোভ আর অপরিমেয় দুর্দশাভোগের মধ্যে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল,—সে সব কিছুই তার অধ্যবসায়কে নির্জীব করতে পারেনি, তার উৎসাহ এবং উদ্যম ছিল অনির্বাণ। কিন্তু রাজদ্বারে, দুর্গমে, বিপদে, অসম্মানের ভিতরে যে বন্ধু ছিল তার নিত্যসহচর, দিনে দিনে যার সঙ্গে ঘটেছিল অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা, আজ তার এই অদ্ভুত আচরণ বীরেশ বিমূঢ় বিস্ময়ে অনুভব করতে লাগলো। আক্রোশ তার হ'লো না, অভিমান তার মনে জমলো না—কেমন যেন একটা বিয়োগবেদনায় তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের একটা রন্ধ্র টন্‌টন্ করতে লাগলো।

তবু রজনীর অপরাধ কিছু নেই। যে কোনো ব্যক্তিকে তার বিশেষ পরিপ্রেক্ষণে বিচার না করলে এমন ঘটনাই ঘটে থাকে। রজনী বারংবার জানিয়েছে তার বেরিয়ে আসা জীবিকার অন্বেষণে। সে স্বার্থবাদী, সে অর্থ চায়—যশ চায়

না ; সে প্রতিষ্ঠা চায়, প্রতিপত্তি চায় না। কাজ-কারবারের পথটা সুগম হ'লেই সে তুষ্ট, ক্ষমতা আহরণের দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। স্বচ্ছন্দ গৃহসুখের দিকে তার ঝোঁক, নিভৃত আত্মকেন্দ্রিক জীবন তার প্রিয়, নির্ঝঞ্ঝাট আহার-বিহার, আর নির্ভুল ব্যক্তিগত তৃপ্তিই তার কাম্য। বড় আদর্শের ধার সে কোনোদিনই ধারে না, গ্রামের উন্নতির জন্য দুঃখ বরদাস্ত করতে সে প্রস্তুত নয়, প্রকাণ্ড ক্ষমতাকে আয়ত্ত ক'রে জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করা তার ধারণাতীত, সর্বব্যাপী দেশসেবার দায়িত্ব নিয়ে বহু মানুষের নেতৃত্ব করা সে কল্পনাও করে না। আজ যদি সে বীরেশকে ত্যাগ ক'রে একান্তে গিয়ে নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা পায় তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। যারা সংসারী, যারা গৃহগতপ্রাণ, বিপদের মাঝখানে জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মহৎ দুঃসাহস যাদের নেই, তারা রজনীর এই বিষয়বুদ্ধি দেখলে খুশী হবে! তার আচরণে কোথাও ত্রুটি খুঁজে পাবে না। আদর্শবাদীর রঙীন স্বপ্নে তারা না পায় মুক্তি, না পায় আশ্বাস। রজনী আর যাই করুক ভুল করেনি, আর যাই হোক নিষ্ফল আইডিয়ায় মোহগ্রস্ত হয়নি। গৃহস্থ-জীবনের পক্ষে সে সত্যই উপযোগী।

পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে সূর্য অস্তে নামলো। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। বীরেশের চমক ভাঙলো।

কাল সকালে তাকে সকলের সামনে এই ঘর খালি ক'রে দিতে হবে, সমিতির কর্তাদের এই নির্দেশ। অধিকার বজায় রেখে গায়ের জোরে সে এখানে থাকতে পারতো, কিন্তু বিবাদের প্রতি তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা! নিজের শক্তিকে সে ভিতরে উপলব্ধি করে, সেই শক্তি তাকে কাজের দিকে ভবিষ্যতের পথে ঠেলে নিয়ে যায়, বাইরের ধ্বংসাত্মিক মত্ততায় তার রুচি নেই। ছেড়ে যখন সে দেবেই, তখন আজই তার চ'লে যাওয়া ভালো। বীরেশ গা ঝাড়া দিয়ে সোৎসাহে উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে বেরিয়ে কাছারির পথে কিছুদূর গিয়ে সে একটা লোককে ধ'রে আনলো। আসবাবপত্র, বাসনকোসন—যা কিছু ছিল প্রায় সবই সে রজনীর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সে নিজের বাক্স আর সামান্য বিছানাটা লোকটার মাথায় তুলে দিয়ে পথে এসে নামলো। তিন বছর আগেও সে এই গ্রামে এসেছিল ঠিক এমনিই রিক্ত অবস্থায়। আজ আবার সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। কেবল তফাত এই, সেদিন সে ছিল নির্বিঘ্ন, আজ তার মাথার 'পরে প্রকাণ্ড ঋণের ভার,—এই গুরুদায়িত্ব ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই।

তাঁতীবৌ-এর দরজার কাছে সে যখন এসে দাঁড়ালো তখন প্রায় সন্ধ্যা।

এই বাড়িতে সাড়া দিয়ে প্রবেশ করার প্রয়োজন তার নেই, এই ঘর তার মাতৃমন্দির। বাক্স বিছানা নিজের হাতে নিয়ে দুটো পয়সা লোকটাকে মজুরি দিয়ে সে সটান ভিতরে ঢুকে গেল। জোলা ঘরে নেই। এই সময়টায় এদের কাজ বেশি হয়, কর্তা বোধ হয় সেই তদ্বিরেই বেরিয়েছে।

ভিতরে এসে বীরেশ ডাকলো,—মা!

সাড়া না পেয়ে দাওয়া পেরিয়ে উঠানের কাছে আসতেই যে-দৃশ্য বীরেশের চোখে পড়লো তা'তে দ্বিতীয়বার সে আর সাড়া দিল না। মুন্নি আর রহমানের সমাধির উপর একরাশ জুঁইফুল ছড়িয়ে তাঁতীবৌ তার ওপর নত হয়ে রয়েছে। বোঝা গেল, করুণ ভাবাবেশের জন্যই বীরেশের গলার আওয়াজ সে শুনতে পায়নি। বীরেশ সেখানেই নিঃশব্দে দাঁড়ালো।

কিছুক্ষণ পরে তাঁতীবৌর সম্বিৎ ফিরলো। জলভরা চোখে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলো বীরেশকে। যে সন্তানের বিয়োগ-বেদনায় তার মাতৃ-হৃদয় থেকে রক্ত ক্ষরিত হচ্ছিল তার সেই সন্তানই যেন ভিন্ন রূপে তার সুমুখে হাজির। হাসিমুখে সে বললে, ওমা, এসেছ বাবা, আমি ভাবি আমার রহমন বুঝি ডাকলো মাটির তলা থেকে ?···এসো বাবা, এসো! মাকে বুঝি এতদিনে মনে পড়লো ?

বীরেশ বললে, সন্তান ক্ষমা পাবে জেনেই ভুলেছিলুম মা। কোথাও যদি না পাই, সবাই যদি ছেড়ে যায়, আমি জানি এই তীর্থ আমার ঘুচবে না।—বলতে বলতে তার গলাটা যেন ধ'রে এলো।

তাঁতীবৌ অতশত বোঝে না। সে কাছে এসে বললে, কই হরিকে দেখলুম, হর কোথায় গেল ? রজনী কই বাবা তোমার সঙ্গে ?

আজ সে আসেনি, মা।

কেন ?

সে এতদিনে তার জায়গা পেয়েছে।···তার মা, তার বোন তার সবাই। তারা গেছে ও গাঁয়ে হরিহর চক্রবর্তীর বাড়ি।

তাঁতীবৌ অশিক্ষিত হোক, অজ্ঞান নয়। চক্ষের নিমেষে সে যেন কী আবিষ্কার করলো। তারপর কাছে এসে হেঁট হয়ে বীরেশের মুখখানা দেখে বললে, হুঁ, নাওয়া খাওয়া হয়নি দেখছি সারাদিন। সে গেছে মা বোনের সঙ্গে, আর ওখানে তোমার জায়গা হয়নি! তা'হলে আবার সেই আগেকার অবস্থাই হয়েছে!

হয়ত তার চেয়েও খারাপ, মা।

তা ত' বটেই, অমন বন্ধু পর হয়ে গেল!—আমি কোথায় মনে করছি,

আমার ছেলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। অতটা গা করিনি। আহা বাছারে!
—ভয় কি, এ তোমারই ঘরদোর বাবা, তোমার সব আমি ক'রে দেবো।—
এসো তোমার ঘরে। চট্‌ ক'রে একটা ডুব দিয়ে এসে তোমার রান্নার ব্যবস্থা ক'রে দিই।

তাঁতীবৌ স্নান ক'রে এসে ভিজা কাপড়ে রান্নার আয়োজন করতে লাগলো; কাঠ ধরালো, চাল-ডাল ধুয়ে আনলো, আলো জ্বাললো।

একসময়ে চুপি চুপি বললে, কত্তা বাড়ি নেই, দেখতে পেলে আবার বলবে: মাগীর আমার মাথা খারাপ হয়েছে। কিছু নয়, বাবা,—চারটি ফুল তুলে এনে মুন্নি আর রহমনের মাটির ওপর দিচ্ছিলুম। আজকের এই তারিখেই ওরা মরে ওলাউঠোয়। তাদের কথা ভাবছিলুম বলেই ত' তুমি এলে।··· তাঁতী বৌর চোখ দুটো আবার ঝাপসা হয়ে এলো।

বিহ্বল শ্রদ্ধায় বীরেশ নত হয়ে রইলো। তার সব ব্যথা, সকল অভিমান যেন নারীর কয়েকটি কথায় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। রজনী সম্বন্ধে তার ক্ষোভের আর লেশ রইলো না।

উনুনে কাঠ ধরিয়ে দিতেই সে বললে, তাঁতীমা—মায়ের কাছে ছেলের কি কোনো জাত আছে? আজ থেকে তোমার হাতে একমুঠো ভাত না খেলে আমার যে খাওয়াই হবে না!

তাঁতীবৌ মুখ তুলে তার প্রতি তাকালো। বললে,···আমি যে মোছলমান, বাবা।

মুসলমান মেয়েরা কি সন্তানের মা নয়?

তাঁতীবৌ কী যেন ভাবতে লাগলো। তারপর বললে, কত্তা বাড়ি নেই,··· জিজ্ঞেস করতুম।

তা'হলে আমি অপেক্ষা করি, মা?

তাঁতীবৌর হাত পা যেন অবশ হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, কিন্তু আমার যে পাপ হবে, বাবা। জেনে শুনে ত' আমি কখনো পাপ কাজ করিনি।

বীরেশ বললে, মুসলমানের ধর্মে কি একে পাপ বলে? বোধহয় বলে না। তোমার কি এই বিশ্বাস, আমাকে হাতে ক'রে দুটি খেতে দিলে তোমার পাপ হবে?

দেখতে দখতে তাঁতীবৌর মুখখানা প্রভাত আকাশের মতো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এলো। সে ব'লে উঠলো, না, তা হবে কেন? দিচ্ছি বাবা তোমাকে বেঁধে বেড়ে।

এই ব'লে উদ্দীপ্ত উৎসাহে কোমর বেঁধে সে কাজে নামলো।

তিনটি সপ্তাহ কেটে গেল। এই সময়টায় বীরেশ নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করেছে। অতীত জীবন মন থেকে সে মুছে দিল। এখনকার হিসাব-নিকাশ বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে। ইতিমধ্যে রজনীর নামে কারবার সে লিখে দিয়েছে। মুনাফার ভাগ রজনীর, দেনার ভার তার। এটা হঠাৎ বিসদৃশ পরার্থপরতা ব'লে মনে হ'তে পারে, অনেকেই বলবে স্বার্থত্যাগের বাড়াবাড়ি, কিন্তু এই নীতিই বীরেশ মেনে এসেছে। আবার সে দল গড়বে, আবার সে বক্তৃতা দেবে, গ্রামবাসীদের ওপর বিশ্বাস সে হারায়নি। দল গ'ড়ে বর্তমান সমিতির কর্তাদের ওপর কাজের চাপ দিতে হবে, শোষণনীতিকে যতদূর সম্ভব শায়েস্তা রাখা দরকার। চাষীরা এইসময় আবার দাদন নিচ্ছে, অতিরিক্ত সুদের চাপ তাদের ওপর না পড়ে। গ্রামের সংস্কারে আজও কর্তারা হাত দেয়নি। নির্বাচনের পর দু'মাস প্রায় কেটে গেল। কর্তৃপক্ষ যদি চুক্তিভঙ্গ করে তবে গ্রামের চাষীদের মধ্যে আবার অসন্তোষ সৃষ্টির সম্ভাবনা। বীরেশ যেন অনেকটা আশান্বিত হ'তে লাগলো।

সেদিন একটা ছুটির বার। আগের রাত্রে অনেক পরিশ্রম ক'রে পরের দিন সমবায়-সমিতির বিশেষ অধিবেশনের জন্য বীরেশ একটি প্রস্তাব রচনা করেছিল। অপর পক্ষের দল ভারি, তার প্রস্তাব না'কচ হ'তে পারে, কিংবা সংশোধন প্রস্তাবে তাকে কোনঠাসাও করতে পারে—সকল দিক বিবেচনা ক'রে বীরেশ অনেক মাথা খাটিয়ে খসড়া রচনা করেছিল।

তাঁতীবৌ আর কর্তার সঙ্গে কথাবার্তা সেরে সে কাজে যাবে এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এলো,—বড়বাবু আছেন নাকি ?

আছি, কে তুমি ?—বীরেশ সাড়া দিল।

হাকিমসাহেবের ওখান থেকে এসেছি, একবার দয়া ক'রে বাইরে আসবেন, বড়বাবু ?

বীরেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে গিয়েই বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সামনেই সর্বাভরণা সালঙ্কারা হাকিমের মহামান্যা স্ত্রী!

হাসিমুখে অনুশীলা বললে, থাক,—আর আগ্ বাড়িয়ে এসে খাতির ক'রে কাজ নেই। সব বোঝা গেছে!

বীরেশ বললে, সে কি—এখানে—আপনি ? এমন সময় ?

অনুশীলা বললে, কোনো অন্যায় হয়নি, আমার খুশি।—দেখি আপনার ঘর কোনটা ? চলুন, একটু ব'সে যাই। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে।

পশ্চিমের ঘরখানা বীরেশের। ভিতরে সেই প্রকাণ্ড খড়ের গাদা। পাশেই

কেরোসিন কাঠের একখানা নড়বড়ে তক্তা। তাঁতীবৌ তার কাঁথা-পত্র আর ভাঙা কলসীগুলো এ ঘরেই রাখে। ঘরের দক্ষিণ দিকের চালা ফুটো; নিচের দিকে ছেঁচাবাঁশের দেয়ালে অনেকটা ফাঁকা হয়ে ভেঙে গেছে। এইটুকুর মধ্যেই বীরেশের লেখাপড়া আর বসবাসের সরঞ্জাম।

ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে অনুশীলা উচ্চ দীর্ঘ কলকণ্ঠে হেসে উঠলো। তারপর, হাকিমের স্ত্রীর পক্ষে যা নীতিবিরুদ্ধ ও বেমানান, যার নাম বালিকা-সুলভ চটুলতা, অনুশীলা তাই ক'রে বসলো। ছ'মাস পরে বীরেশের দেখা পেয়ে এবং হাতের কাছে বৃহৎ খড়ের গাদা দেখে তার শৈশবের স্বভাব-লঘুতা আবার ফিরে এলো। কাপড়চোপড়, সাজগোছ, প্রসাধন, দৃষ্টি-শোভনতা কিছুই সে মানলো না। উল্লাসের আতিশয্যে সপ্তবিংশতিবর্ষীয়া রাজপুরুষের স্ত্রী অনুশীলা সহসা লাফ দিয়ে খড়ের গাদার উপর উঠতে গিয়ে আঁটিসুদ্ধ পিছলে গড়িয়ে মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে একটা অতি হাস্যকর কাণ্ড বাধিয়ে বসলো।

এমনই আকস্মিক, এমনই অপ্রত্যাশিত যে, বীরেশ কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত বিমূঢ় অবস্থায় থেকে নিজেও সহসা হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে, আপনি ত' ভারি অদ্ভুত ছেলেমানুষ, মিসেস্ সেন?

ধুলোবালি ঝেড়ে হাসিমুখে অনুশীলা বললে, খড়ের গাদায় আমরা ছোট-বেলায় লুকোচুরি খেলতুম।—কী আমোদ, কী নিবিড় নেশা সেই ছোটবেলার।

উল্লাস যেন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে তার সর্বাঙ্গে।

এবার শুনি। বলুন, আপনার দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের কারণ কি? না শুনে এক পা-ও নড়বো না।

বীরেশ বললে, দাঁড়ান। আগে আপনার ডিগবাজি খাওয়াটা একটু হজম ক'রে নিই।...উঃ, কী দুরন্ত আপনি! যদি কোথাও চোট লেগে যেতো?

বেশ হেতো। কপাল ফুটো হোতো। রক্তটা নিজে দেখতুম, আপনাকেও দেখাতুম। আপনি হায় হায় করলে আরো তৃপ্তি পেতুম।—আপনার আক্কেল-বিবেচনা একটুও নেই। মানুষের জীবনে হারজিত ঘটলে এই ভাবেই বুঝি তারা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায়?—অনুশীলা ভীষণ অভিযোগ জানালো।

বীরেশ বললে, সত্যিই তাই। আপনার কাছে লজ্জাতেই আমি মুখ দেখাতে পারিনি। চিরকালের লজ্জা।

কিন্তু ভেবে দেখেছেন, এ আপনার লজ্জা নয়, গৌরব?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বীরেশ তার দিকে তাকালো।

অনুশীলা বললে, মেয়েমানুষ হয়ে বড় বড় কথা বললে আপনাদের মতন

অ্যান্টিফেমিনিস্টরা হাসাহাসি করবে, এ আমি জানি। কিন্তু এ ত' আপনি জানেন, সত্য আর ন্যায় চিরকাল বর্বরদের হাতে মার খায়। রাবণ একদিন স্বর্গের দেবতাদের বন্দী করেছিল, হিট্‌লার একদিন সারা ইউরোপ জয় ক'রে বেড়িয়েছে। এমন হয়; ধর্মের মধ্যেও গ্লানি ঢোকে, দুর্বলতা দেখা যায়। অসুরদলের অত্যাচার সৃষ্টি হয় কল্যাণের যজ্ঞকেই বিশুদ্ধ ক'রে তুলতে। কুরুবংশের জন্ম হয়েছিল পুরানো ধর্মকে নষ্ট ক'রে নতুন ধর্ম-সৃষ্টিতে সাহায্য করতে। আপনি মার খেয়েছেন, কারণ সত্য আর ন্যায়বিচার আপনার হাতে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চায়। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন বারে বারে মার খেয়েছে অন্যদিকে তাঁরই সত্য জ্ব'লে উঠেছে চারিদিকে দপ্‌ দপ্‌ ক'রে। আজ আপনিও যদি মুখ লুকিয়ে বেড়ান, এরা তবে কার মুখ চেয়ে বাঁচে, বীরেশবাবু ?

বীরেশ বললে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আপনার উপমা ত' খাটলো না মিসেস্ সেন ? যাদের টাকা আছে, জমি আছে তারাই এখন পৃথিবীর সর্বত্র মালিক। তারা নীচ জাত হ'লেও ব্রাহ্মণ, অসভ্য হ'লেও দেবতা। আমার নিজের এক ছটাক জমি নেই, হাতে টাকা নেই, দল ভারী নয়, প্রতিপত্তি যা ছিল নষ্ট হয়ে গেছে। পৃথিবীতে বহু আদর্শবাদী এমনি ক'রে মার খেয়ে গেছে, তারা বার বার মাথা তুলতে গিয়েও হার মেনেছে। বিশ্বজগতের এই হ'লো একটা সর্বব্যাপী নিয়ম, মানুষেরই পায়ের তলায় বড় বড় সভ্যতা বড় বড় কল্যাণ দলিত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ তার বিদ্যা, তার প্রজ্ঞা, তার মননশীলতা নিয়ে মাথা উঁচু করতে গেছে, আর অসুরশক্তি রাজসিকতার ছদ্মবেশ ধ'রে এসে ব্রাহ্মণের কাল্‌চারকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে !

অনুশীলা বললে, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি, কিন্তু আপনার কথা স্বীকারও করবো না। ক্লান্ত সভ্যতার কত আলো যুগে যুগে নিভে গেছে, কিন্তু আবার এসেছে নবীন। আমি হিন্দুর মেয়ে, জন্মতত্ত্ব আর মৃত্যুরহস্য দুই-ই মানি। সংহার আর সৃষ্টির নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতি বারে বারে নতুন হয়ে দেখা দিচ্ছে, সেখানে কিছুই ব'সে নেই, কিন্তু ক্লান্ত নয়। আপনি হাতে ক'রে যা গড়েছেন তা যদি ধ্বংস হয়, ভয় কি ? কিন্তু আপনার বাসনা আর আপনার স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যা ফুটলো, আপনার সেই ব্যক্তি-পরিচয় পেয়েই মানুষ নিত্যকাল তৃপ্ত। স্বয়ং ভগবান যে ধর্মরাজ্য আমাদের দেশে সৃষ্টি করেছিলেন তাও ভেঙেছে, রামরাজ্যও গুঁড়ো হয়ে গেছে।···যে দিল্লীশ্বর ছিলেন জগদীশ্বরের প্রতীক, আজ দিল্লীর পথের ধুলোতেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু তবু র'য়ে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ আর রাজা রামচন্দ্র, সম্রাট্ অশোক আর সম্রাট্ আকবর। আপনার টাকাকড়ি জমিজমা, সহায়-সম্বল কিছু নেই বলছেন ?—কিন্তু পৃথিবীতে বড়

প্রতিভা-ই বড় দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হয়ে গেছে। আপনার হৃদয় আছে, আদর্শ আছে, বিদ্যা আর প্রতিভা আছে, তাই আপনার এই খড়ো চালার মধ্যে ছুটে এসেছি, সারা পৃথিবীই ছুটে আসবে আপনার এই দরজায়। আপনি কোটিপতি কিংবা চিনির কলের মালিক হ'লে আপনাকে গ্রাহ্য করতুম না।

বীরেশ জবাব দিল না, চুপ ক'রে রইলো।

অনুশীলা পুনরায় বললে, পরাজয় কেবল আপনার নয়, এই দুর্ভাগা গ্রামেরও এই কথাটা বুঝতে পারলেই আপনি উঠে দাঁড়াতেন। আপনার আশ্রয় কেড়ে নিয়েছে, মাথায় আপনার প্রকাণ্ড ঋণভার, একমাত্র বন্ধু আপনাকে অগাধ জলে ভাসিয়ে স'রে পড়েছে, আপনার অন্নসংস্থান অবধি নেই—এই ত' আপনার সকলের বড় সুযোগ, বীরেশবাবু? আপনার মতন এমন সৌভাগ্য পৃথিবীতে ক'জনের হয়। নিজেকে প্রবল নাড়া দিয়ে এবার আলোড়িত ক'রে তুলুন। আপনার সামনে ঝড়, দুর্যোগ, বিপদ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা—এই হ'লো আপনার সম্বল, এদের নিয়ে আপনার যাত্রা। আমরা কেউ আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো না, বিপদের অংশ নেবো না, উৎসাহ আর সান্ত্বনা আপনার জন্যে নয়, আজ থেকে আপনার আত্মশক্তির উদ্বোধন হোক।

সমস্যা ও অসুবিধা যে সত্যকার কোথায় বীরেশ তা জানে। বললে, মানুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা খুব কঠিন কাজ নয় মিসেস্ সেন?

অনুশীলা আহত দীপ্ত কণ্ঠে বললে, জানি, কিন্তু পুরুষকে উত্তেজিত করতেই আমি এসেছি। মাটি গরম হয় না, পাথরই তেতে আগুন হয়ে ওঠে। মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু কাজে করা খুব কঠিন বলেই ত' এসেছি আপনার কাছে। কঠিন ব্রত আপনাকে নিতে হবে কঠিনতর তপস্যায়। এই নিরুপায় গ্রাম আমার মুখ দিয়ে আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছে।

বীরেশ বললে, আমার লোকেরা আবার মাথা তুলবে এমন কোনো সুযোগ ওরা রাখেনি। ইতিমধ্যেই কো-অপারেটিভের টাকা চিনির কলে খাটিয়ে ওরা প্রত্যেক শেয়ারের ওপর বেশী ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করেছে। দেনায় চিরকাল ডুবে থাকতে চাষীদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা যে কোনো উপায়ে সচ্ছল অবস্থায় থাকতে পেলেই খুশী। তার ফল কি হয়েছে জানেন? বহু সম্পত্তি উঠেছে নিলামে, ওরা সেগুলো কিনে খাস ক'রে নিয়েছে। একদিন যারা জমির মালিক ছিল, আজ তারা সেই জমির মজুর মাত্র। মিসেস্ সেন, এর মধ্যে আদর্শবাদের স্থান কোথাও নেই, এখানে কেবল দরকার শারীরিক বলপ্রয়োগ। বন্ধুর মতন যারা পাশে ব'সে আছে, যারা টাকা দিচ্ছে, যারা নিজেদের

শ্রমিকের বন্ধু ব'লে জানাচ্ছে, তারা সকলের বড় শত্রু। শোষণ করার পথ ওদের বহুবিধ,—অক্টোপাসের মতো। এক হাতে ওরা খাওয়ায়, কিন্তু বহু হাতে ওরা রক্ত শোষণ করে। চাষীদের কতকগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন মিটিয়ে ওরা সমস্ত ধন-সম্পদ চালান দিচ্ছে বাইরে,—এর প্রতিরোধ নেই।

অনুশীলা বললে, সত্যিই কি নেই?

আছে।—বীরেশ বললে, আপনার মন আবেগমুখী, নইলে বলতুম আছে। যুগে যুগে প্রতারিত, বঞ্চিত আর উৎপীড়িতের দল যেভাবে এর প্রতিকার করেছে, যেভাবে নিরন্ন আর অপমানিত জনতার হিংস্র ব্যবস্থায় এই স্ফীতকায় অনাচার আর প্রবল অন্যায়ের অপমৃত্যু ঘটেছে—তার কথা আপনাকে বলতে পারতুম। অর্থাৎ কি জানেন, নতুন সভ্যতা-সৃষ্টির আগে আগে চলে প্রকাণ্ড ধ্বংস, সংহারের তাড়নায় স্তূপাকার জঞ্জাল-জটলা মুছে চ'লে যায়—সেই বিপ্লব কল্যাণের পথ ধ'রে চলে। হয়ত আসবে সেই ভাঙনের দিন!

অনুশীলা বললে, আপনি আনতে পারেন সেই দিন?

বোধ হয় পারি নে। বিপ্লবের দরকার হয়ত ছিল, কিন্তু বিপ্লব আমি আনতে চাইনি। এই গ্রামে যারা আছে তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়, তারা হাড়-পাঁজরা বের করা এক অদ্ভুত জীব; এদের আগে মানুষ করতে না পারলে এরা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারবে না। তাই ঠিক করেছি, আগে এদের লেখাপড়া শেখাবো। এরা দারিদ্র্য চিনুক, এদের অবিচার-বোধ আসুক, নিজের দেশকে জানুক, প্রথম পাঠ আগে শেষ হোক।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সমিতির অধিবেশনে আজ তাকে প্রস্তাব উপস্থিত করতেই হবে। যত বড় নিরাশার কারণ থাকুক না কেন, চারিদিক থেকে কর্তব্যেরই আহ্বান আসছে।—বীরেশ বললে চলুন, আজ আবার একটা মিটিং আছে।

অনুশীলা বললে, কালকের খবর আপনি তবে জানেন না! মিটিং যে নেই এ কথা জেনেই তবে এসেছি।

মিটিং নেই? কেন?

কর্তারা সদরে যাবেন, জেলা হাকিমের ওখানে লাঞ্চে নেমন্তন্ন। সকালে উঠে মিস্টার সেন আগেই গেছেন। আমি এখন একা, নিতান্ত বেকার।

হাসি মুখে বীরেশ বললে, তা' হলে বাঁধা গোরু ছাড়া পেয়েছেন বলুন?

অনেকটা তাই বটে।—অনুশীলা থমকে একটু পরে বললে, কিন্তু যা ভেবে এলুম, তা হ'লো না। আশা করিনি আপনার কাছে ব্যর্থ হবো। এবার দেখছি নতুন 'হিরোর' সন্ধান করতে হবে। পরাজয়ের শোধ না তুললে চোখে

ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই।—আপনার অপরাধ কি, আপনিও ত' সেই বাঙালী! ...হাউইয়ের মতন জ্ব'লে উঠে ছাই হয়ে মিলিয়ে যান!

অনুশীলা মাথা নত ক'রে নিল। চাপা উত্তেজনায় তার মুখ চোখ রাঙা। প্রথম আসা থেকেই তার ভাবভঙ্গীতে কেমন যেন অস্থির অস্বস্তি—ধৈর্য ধরার তার অবকাশ নেই, উপদেশ অথবা যুক্তি শোনার অভিরুচি নেই। আপন কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত উল্কার মতো সে যেন ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে। তার ভিতরে যেন বিষক্রিয়া ঘটছে।

বীরেশ বললে,—বেশ, আপনি ঠিক কী চান, বলুন মিসেস্ সেন?

অদ্ভুত একটা আবেষ্টন বটে! ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রশ্ন নেই, আতিথেয়তা অথবা আসনের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই,—খড়ো চালার মধ্যে ব'সে অনাত্মীয় নরনারীর অসম্ভব জল্পনা-কল্পনা! তাঁতীবৌ একবার উঁকি মেবে অতি সন্তর্পণে দেখে গেল, হয়ত তার আল্লার উদ্দেশ্যে আর একবাব প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা কবলো, এ সৌভাগ্য যেন আরো কিচ্ছুক্ষণ স্থায়ী হয়। কর্তা পা টিপে টিপে ঘবে এসেছে, পা টিপে টিপে স্নানাহাব করেছে, এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের চিহ্নস্বরূপ নিজের অস্তিত্ব লোপ করার জন্য পা টিপে টিপেই নিজের ঘরটিতে দস্তুর মতো ঢুকে নিঃসাড়ে প'ড়ে রয়েছে।

জৈষ্ঠ্যের রৌদ্রের তাতে অনুশীলার সুন্দর মুখ রক্তাভ হযে উঠেছে।

অস্নাত রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে গত রাত্রির প্রসাধনের মৃদুমদিব সৌবভ তখনো নিঃশেষ হয়নি। কপালে চুলের গোডায আব গলায় ঘামের ধারা নেমেছে। সন্তানের মা সে আজও হযনি, তরবারির ফলকের মতো কঠিন তার দেহের বাঁধন। বীরেশ তার দিকে একবার তাকিযে মাথা নত ক'রে নিল।

অনুশীলা বললে, মিস্টার সেন একদিন আপনার কাছে একটা প্রস্তাব করেছিলেন, সেদিন সে কথা আপনার কানে যায়নি। আমিও আজ সেই কথা আপনাকে বলবো। আপনি একেবারে রিক্ত হননি।

মুখ তুলে বীরেশ বললে, কী বলুন ত'?

আমার আদেশ, আপনাকে আর একটা দুরন্ত জীবনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে হবে। বীরেশবাবু, আমার স্বামী হলেন সরকারী কর্মচারী, বাঁধা নিয়ম আর ব্যবস্থার পাকা রাস্তায় তাঁর প্রত্যেকটা দিন ছক-কাটা। আজ থেকে ছ'মাস পরে তিনি কী করবেন আমি জানি, দশ বছর বাদে আমরা কী ভাবে থাকবো তাও নির্দিষ্ট। কিন্তু আপনি নতুন, আপনি বিচিত্র। আপনার দাসত্ব নেই, ভীষণ একটা মুক্তিতে আপনি ভয়ঙ্কর! আপনার কাজে নেমে আমি ভয়ানক

মার খেলুম। আপনার সেই পরাজয়ের গ্লানি আপনার সাহায্যেই মুছে ফেলতে চাই। আমি সাহায্য করবো আপনাকে,—প্রকাণ্ড প্রচণ্ড শক্তি আপনার মধ্যে সঞ্চার করবো। আমার হাতে আপনি নিষ্ঠুর অস্ত্র হয়ে উঠবেন। আর সেই অস্ত্রে চূর্ণ ক'রে দেবো ওদের ষড়যন্ত্র !

বীরেশ বললে, বলুন, কী করতে হবে আমাকে ?

অনুশীলা বললে, আসুন তবে আমার সঙ্গে।

কোথায় যাবো ?

যেখানে আমি পাঠাবো।—অন্যায়ের পথও যদি হয়, প্রতিবাদ করবেন না। আপনাব শক্তি আর সাধ্যকে চিনি, সুতরাং আমাকে বিশ্বাস করুন। আসুন —ব'লে অনুশীলা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

রহস্যময়ীর নির্দেশের কোনো প্রতিবাদ বীরেশের মুখে এলো না। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, এত রোদে যেতে আপনার কষ্ট হবে না ?

সঙ্গে পাল্‌কি আছে, আসুন।

এমন সময় তাঁতীবৌ গুড়ি-গুড়ি এসে সহসা ঘরেব চৌকাঠে মাথা বেখে উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ! শশবাস্তে বীবেশ বললে, ওকি হ'লো তোমার তাঁতী-মা ?

কান্না আর থামে না।

হাকিমের স্ত্রী এসব ব্যাপাবে অভিজ্ঞ। চট্‌ ক রে অনুশীলা এগিয়ে এসে তাঁতীবৌব হাত ধ'রে তুললো। বললে, খুব খুশী হয়েছি, খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম। কই, কী আনবে আনো, খেয়ে যাই।

তাঁতীবৌ উঠে আনন্দে গদগদ হয়ে তাব ঘবেব দিকে চ'লে গেল। অনুশীলা বললে, বুঝতে পাবেননি ত' ? ওরা কেঁদে আনন্দ প্রকাশ করে, মনে করে সব সময়েই বুঝি ওরা অপরাধী। ওদের ঘরে কিছু খেয়ে গেলে তবেই ওদের ভয় কাটে।

দু'খানি থালায় কয়েকখানি বাতাসা আর এক ঘটি জল এনে তাঁতীবৌ হাজির করলো। বাতাসা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে অনুশীলা আর বীরেশ জল পান করলো। তাঁতীবৌ আর একবাব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো।

যাবার সময় তাঁতীবৌর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে অনুশীলা বললে, আর একদিন এসে গল্প ক'রে যাবো, কেমন তাঁতীমা ? আজ তবে চললুম।

ওরা চ'লে গেল। তাঁতীবৌ পথেব ধারে দাঁড়িয়ে আঁচলে আনন্দাশ্রু মুছে বিড় বিড় ক'রে বললে,·· আমার মুন্নি আর রহমন !

মাথার উপরে মাঠের প্রচণ্ড রোদ। এ বছরে এখনও বৃষ্টির চিহ্নমাত্র

নেই। রোদের তাতে মাঠের বীজ পর্যন্ত জ্ব'লে গেছে। ইতিমধ্যেই এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের রব উঠেছে। অথচ গত বছরে অতি-বৃষ্টির ধাক্কা এখনো কেউ সামলে উঠতে পারেনি। গ্রামের দুর্দিনের চেহারা কেমন, সে অভিজ্ঞতা বীরেশের হয়েছিল।

সমস্ত পথটা অভিভূতের মতো বীরেশ চললো। মাঝে মাঝে ঘুর্ণী হাওয়ায় ধুলো উড়ে চলেছে, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। চুম্বকশক্তির গল্প সে শুনেছে। ডুবো জাহাজকে অগাধ সমুদ্রের নিচে থেকে চুম্বকের দ্বারা কেমন টেনে আনা হয়, সে সংবাদও তার জানা ছিল। অনুশীলার ব্যক্তিত্ব তাকে আবৃত ক'রে আচ্ছন্ন ক'রে টেনে নিয়ে চললো আপন খেয়ালের পথে। উদ্দেশ্য একটা আছে, কিন্তু সেটা এখনও প্রকাশ পায়নি। এ নলিনী নয় যে, অন্যের রুচি আর স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। নলিনী হ'লে তার বিপদে আর দুঃখে অংশ গ্রহণ করতো, কল্যাণহস্ত প্রসারিত ক'রে সেবা করার জন্যে ব'সে থাকতো; তার নিরাশায়, তার লাঞ্ছনায়, তার বেদনায় গোপনে অশ্রুপাত করতো এবং তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য টেনে বার করতো মহাকবিদের কাব্য-গ্রন্থ। তার ছিল মধুর কবিতা-রস-কল্পনা, ছিল তার মধ্যে বেদনা-ব্যাকুল সঙ্গীত, ছিল অনন্ত সৌরনক্ষত্রলোকের স্বপ্ন-রচনা। নলিনী দেখায় ফুলের সৌন্দর্য, অনুশীলা ফলের অজস্রতা। নলিনী তার করুণ মধুর গানে জীবনে বৈরাগ্য আনে, অনুশীলা রণদামামার শব্দ তুলে যুদ্ধযাত্রার পথ দেখায়। নলিনী ঘরে ডেকে আনে কল্যাণীর করুণ সেবায়, অনুশীলা ঘর থেকে টেনে আনে, অনাবিষ্কৃত দুর্গমের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নলিনী হ'লো মলিন শান্ত সন্ধ্যাতারকা, অনুশীলা হ'লো চঞ্চল উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড! একজন হ'লো মধুর বিরতি' আর একজন প্রবল অগ্রগতি।

বাংলোয় তারা যখন এসে পৌঁছলো, তখন বেলা দুটো বাজে। পালকি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে অনুশীলা এসে নিজের হাতে ড্রয়িংরুমে বেতের চেয়ার এগিয়ে দিল। অনিল তখনও আসেননি। জানালা দরজা সকাল থেকে বন্ধ ছিল; ড্রয়িংরুমের ভিতরটা স্নিগ্ধ শীতল। এ বাড়িতে বীরেশ অতি প্রিয়, আজ দু'মাস পরে তাকে পুনরায় আসতে দেখে পাচক, বেয়ারা, আয়া— সকলের মুখই হাসিখুশী। বীরেশ এসে কেদারায় বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা গিয়ে সোৎসাহে টানাপাখা টানতে লাগলো। মিষ্ট মধুর হাওয়ায় পরিশ্রান্ত বীরেশ চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে আরাম ক'রে বসলো। এ বাড়ি তার নিতান্তই পরিচিত।

নিজের হাতে অনুশীলা তরমুজের শরবৎ তৈরি ক'রে আনলো। মাথায় ঘোমটা আর পায়ে জুতো নেই, এমন অবস্থায় সে আর কারো কাছেই আসতো না। হাকিমের স্ত্রী ব'লে আর যেন চেনা যায় না; বেণী দুলিয়ে সে কুমারী হরিণীর মতো লঘু বিসর্পিত গতিতে বেরিয়ে এলো। বীরেশের হাতে গেলাস দিয়ে সে তার পাশে ব'সে পড়লো ঝুপ ক'রে। বললে খেয়ে দেখুন ত', বোধ হয় ভালো হয়নি। মুখে খুব বক্তৃতা দিতে পারি—কিন্তু আমি একেবারে নভিস। আমার জল কিন্তু খুব ঠাণ্ডা, বরফের মধ্যে কলসী বসানো থাকে।···ওকি, হাসছেন যে।

পাচক আর এক গ্লাস শরবৎ এনে অনুশীলার হাতে দিয়ে গেল।

বীরেশ বললে, জল আপনার ঠাণ্ডা, কিন্তু রক্তটা ভারি গরম! গত চার বছরে ভাবতেই পারিনি যে, আপনি একজন পাকা বক্তা। এই দেখুন, সকালে আমার মনে যে নিরাশা ছিল, এখন যেন সেই মেঘ কেটে গেছে। অন্তত মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠে বসতে পেরেছি মনে হচ্ছে। শাস্ত্রে বলে, মেয়েরা শক্তি।···এবার থেকে শাস্ত্রে বিশ্বাস করতে হবে দেখছি।

হয়েছে, থামুন।—অনুশীলা বললে, চার বছর ধ'রে আপনি আমাকে গ্রাহ্যও করেননি, আমলও দেননি। আপনার মুখে স্তুতিবাদ শুনলে আমার ভয় করে।

ভয়! কেন?

মেয়েদের স্তুতিবাদ যারা করে তারা কবি। তারা অলস। তারা ফুরফুরে হাওয়ায় কবিতা খুঁজে বেড়ায়, কাজ করে না। আপনি বরং অ্যান্টি-ফেমিনিস্ট থাকুন তাতে বেশী কাজ হবে।

হাসিমুখে বীরেশ বললে, বেশ ত' এবারে কাজের কথাই বলুন। দেখা যাক, নিয়ো-ফেমিনিস্ট হয়েও আমার দ্বারা কাজ হয় কি না।

হবে নিশ্চয়ই—দাঁড়ান্, আগে আপনার স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিই।—এই ব'লে হেসে সমস্ত ঘরের হাওয়া তরঙ্গদোলায় দুলিয়ে অনুশীলা চ'লে গেল।

এর কতক্ষণ পরে দু'জনে স্নান ক'রে মাথা আঁচড়ে এসে খাবার টেবিলে বসবে, এমন সময় হাকিমসাহেব সহসা এসে হাজির হলেন। আনন্দে কলরব ক'রে উঠে তিনি বললেন, তপস্যা ক'রেও যাকে দু'মাস পাওয়া যায়নি, সে একেবারে এসে ট্রেসপাস ক'রে বসলো, এ ত' সহজ কথা নয়। কোন্ মন্ত্রের গুণ?

হাসিমুখে বীরেশ অনুশীলাকে দেখিয়ে বললে, বুঝতেই পারছেন।

অনুশীলা বললে, আজকাল মন্ত্রের আর দরকার নেই। তুড়ি দিলেই আসে

এখনকার ছেলেরা। দু'মাস খবর নিইনি, আজ ঘুষ দেবার লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছি।

অনিলবাবু বললেন, আনতে পেরেছ তা'হলে বলো?

না এসে যাবেন কোথায়? তাঁতীবৌ কো-অপারেটিভ সায়েন্স বোঝে না, তাঁতী-কর্তা ইকনমিক্স পড়েনি। এক মাত্র বন্ধু—শ্রীমান্ রজনী,—সেও পালিয়েছে আইডিয়ালিজ্‌মের দাপটে; গাঁয়ের লোক র‍্যাশন্যাল নয়,—এ অবস্থায় মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে?

বীরেশ হাসিমুখে বললে, হয়েছে আপনার? এবার কিন্তু আমার পালা। আমি না হয় বেকার, না হয় একঘরে। আর আপনি? সকালবেলায় স্বামী রায় লিখতে ব্যস্ত, পাচক রান্না করে,—আপনার কোনো কাজ নেই। বাজে নভেল প'ড়ে আপনার দুপুরবেলা কাটে না। বিকেলে স্বামী আসেন বটে, কিন্তু তারপরে আছে ওঁর ক্লাব। আপনার ফ্যাশন-সেণ্টর নেই, সিনেমা নেই,—সম্প্রতি আবার আপনি আন্‌পপুলার—আপনার নিজের কী নিয়ে কাটে বলুন ত'? একটি সঙ্গী নেই, একা বেকার থাকার কোনো অবলম্বন নেই। সুতরাং আমাকে ধ'রে এনেছেন আপনি নিজেরই দরকারে।

তাদের বিবাদ অনিলবাবু মিটিয়ে দিলেন। বললেন, আর কিছু নয়, তোমাদের দু'জনের জন্যেই দুঃখিত। বুঝতে পারা যাচ্ছে দু'জনেই বেকার এবং একজনকে নইলে আর একজনের চলা কঠিন।

চাকর এসে অনিলের হাতের কাছে শরবতের গ্লাস রেখে চ'লে গেল। অনুশীলা বললে, অতএব হে কর্মবীর, এবার ভোজনপর্ব আরম্ভ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন। বেশ, সবই আমার দোষ, আমারই সব প্রয়োজন, অপরাধও যা কিছু সব আমার। বাংলাদেশে মেয়ে হয়ে জন্মেছি, এর চেয়ে অন্যায় আর কী হ'তে পারে?

তথাস্তু।—ব'লে হাসিমুখে বীরেশ খেতে ব'সে গেল।

আজ অনিলের আনন্দের আতিশয্য অল্প নয়। শরবতের গ্লাসে দুই চুমুক দিয়ে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বললেন, যাই বলো না ভাই বীরেশ, দেশের লোকের কাছে হেরে গিয়ে তুমি রাগটা তুললে আমাদের ওপর; এ অঞ্চলে দু'মাস তুমি পদার্পণ করোনি!

প্রায় চার বছর হ'তে চললো, অনিলবাবু কোনোদিন বীরেশকে তুমি ব'লে ডাকেননি। আজ সহসা নিকট-সম্পর্কের এই সম্ভাষণ শুনে সে একটু সচকিত হ'লো। কিন্তু এমনি আকস্মিক ও এমনি সহজ যে, কিছু মনে করবার অবকাশ রইলো না। তার মুখের চেহারায় অনুশীলা তৎক্ষণাৎ সেটা অনুভব করতে

পারলো, একটু অস্বস্তিবোধ করলো, কিন্তু গায়ে না মেখে সে মাথা নিচু ক'রেই খেতে লাগলো। এ বাড়িতে বীরেশের আসন লঘু নয়, এখানে বন্ধুত্ব অপেক্ষা সম্মানের আসনই প্রধান।

বীরেশ বললে, মন্দ কী, অজ্ঞাতবাস করলে যদি শক্তি সংগ্রহ করা যায়, আপত্তি নেই ত' ?

অনিল বললেন, বেশ, তাহ'লে আশা করছি ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্রটা মন্দ জমবে না। তোমার প্ল্যানটা কেমন হবে, একটু বর্ণনা করো শুনি।

অনুশীলা আসল কথাটা এইবার পাড়লো। মুখ তুলে বললে, সেই জন্যেই ওঁকে এখানে ধ'রে আনা। উনি নতুন কাজে নামতে চান্, আমরা যেন ওঁকে সব রকমে সাহায্য করতে পারি।—এই দেশ ছেড়ে উনি কোথাও যেতে রাজী নন্।—আমরাই বা ওঁকে যেতে দেবো কেন ?

অনিল বললেন, কিন্তু আমাদের যদি বদ্‌লি হয়ে যেতে হয় কোথাও ?

সে পরের কথা। যদি যাই, জেনে যাবো এই গ্রামের মাটি আমাদেরই। যেখানে কাজ করেছি, যেখানে ব'সে স্বপ্ন দেখেছি, যে মাটি আমাদের কাঁদিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে, সেই মাটিই আমাদের মাতৃভূমি। যাক্—বদলি হ'লেও এ গ্রাম আমাদেরই থাকবে।—অনুশীলা বলতে লাগলো,—সুতরাং এই অঞ্চলেই বীরেশবাবুর কর্মক্ষেত্র, ওঁর ভাগ্য এখানেই বাঁধা। তুমি চাও না হাকিম, ওঁর উন্নতি হোক ?

স্ত্রীর মুখে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখে অনিল সহসা হেসে উঠলেন,—কী আশ্চর্য, কোনোদিন কি তোমার মনে হয়নি যে আমি ওঁর উন্নতিই চাই ?

বীরেশ উসখুস ক'রে কী যেন বলতে গেল, অনুশীলা বাধা দিয়ে বললে, চুপ করুন আপনি—আচ্ছা, উন্নতিই যদি তুমি চাও, এই দু'মাস তবে ওঁকে ডাকলে না কেন ?

অনিল বললেন, তুমি ত' দেখি দুমুখো সাপ! আমি ওঁকে ডাকবো ওঁর উন্নতি ক'রে দেবার জন্যে ? আমি কি বীরেশের অভিভাবক ? এ যুক্তি কেবল বাঙালী মেয়ের মুখেই শোভা পায়। হাকিম মুখভরা হাসি হাসতে লাগলেন।

বীরেশের মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠলো। গত চার বছরে এই ক্ষুদ্র পরিবারটির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আর অন্তরঙ্গতা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য জনৈকা অনাত্মীয়া নারী স্বামীর কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে এ অভিনব বটে! এই আগ্রহাতিশয্য পুরুষের পক্ষে লজ্জার বিষয়, বলাই বাহুল্য। তার নিজের শক্তির উপর তার বিশ্বাস অপরিসীম, কিন্তু এই নারী সেই বিশ্বাসের মূলকে যেন শিথিল ক'রে দিচ্ছে।

অনিল বললেন, তুমি ত' জানো অনু, অযোগ্যের আর অলসের স্থান কোথাও নেই। আমাদের স্বভাবের মধ্যে আছে আদিম দুর্বলতা। সহজে কার্যোদ্ধার, পরিশ্রমে ফাঁকি, কৌশলে বাজিমাৎ—এই সব হ'লো আমাদের প্রিয়। আমরা কাজ করিনে, অধিকার দখল করতে ভয় পাই, আমাদের অক্ষমতা ডিঙিয়ে যদি কেউ ভাগ্য ফেরায় আমরা তাকে ঈর্ষা করি। আমরা মাস্টারি ফলিয়ে বেড়াই, যদি কেউ আমাদের বিদ্যেবুদ্ধির অসারতা দেখিয়ে দেয়, আমাদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগে, তাকে তেড়ে মারতে যাই। আজ সমস্ত দেশ যখন সত্যি সত্যি শিক্ষায় আর সভ্যতায় আমাদের চেয়ে এগিয়ে চলেছে, আমাদের আহত আত্মাভিমান আর অপমানজনক অযোগ্যতা আর কিছু না পেরে তাদের গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারছে, আর নিজেরই নির্লজ্জ ঈর্ষাকে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে চেঁচাচ্ছে—প্রাদেশিক বিদ্বেষ। তুমি ত' দেখতে পাচ্ছ কোথাও সৎবুদ্ধি নেই, কল্যাণচিন্তা নেই, প্রাণকে বড় ক'রে তোলবার কোনো স্বপ্ন নেই,—আমাদের সকলের মধ্যে নৈরাশ্যের কালোছায়া। আমি যদি বীরেশকে ডেকে তার উন্নতি আর ভবিষ্যতের কথা বলতে যেতুম, সেটা বাঙালী গোয়েন্দাপনার গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতা ব'লে মনে হোতো। আমি ওকে হাত ধ'রে কাজ করাবো তবে উনি করবেন—এ কোনোকালে সম্ভব হয়? বিলেত থেকে বছরে কুড়ি হাজার ছেলে-মেয়ে পালিয়ে যায়, তারা জগতের নানা দেশে ছড়িয়ে প'ড়ে কাজ করে—একদিন স্বদেশে ফিরে আসে বিজয়ীর বেশে। যারা সত্যি কাজ করে তারা সুপারিশের অপেক্ষা রাখে না, লাঠি ধ'রেও হাঁটে না। যাই হোক, আজ আমি কথা দিচ্ছি, বীরেশ যদি কোনো কাজ আরম্ভ করে, আমি সেই কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

আহারাদির পরেও টেব্‌ল ছেড়ে উঠবার উৎসাহ তাদের দেখা গেল না। ড্রয়িংরুমের ঘড়িতে বেলা চারটে বাজলো।

অনুশীলা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে,—শুনেছ, বীরেশবাবু নাকি একটা শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে আজকাল ব্যস্ত। আমের আঁটি পুঁতে গাছ গজিয়ে বোল ধরিয়ে ফল পাকিয়ে রস খাইয়ে তবে উনি ছাড়বেন।

তার বলার ভঙ্গীতে বীরেশ আর অনিলবাবু হেসে উঠলেন। বীরেশ বললে, মন্দ কী—মূল ধ'রে চিকিৎসা।

অনুশীলা বললে, কিন্তু আঁটি পেলেন কোথায়? শুনুন, আঁটিটাই হ'লো শক্তি। সেই শক্তি আপনার হাতে না এলে না হবে শিক্ষাপ্রচার, না হবে গ্রামের কাজ। যে ব্যবস্থা আপনার জন্যে করা হয়েছে তারই জন্যে আপনাকে ডেকে আনা। আমার ভাই ললিতবাবু কিছুকাল আগে ফিজিক্‌স্ আর

কেমিস্ট্রিতে বিলেতী টাইটেল এনেছেন। তিনি মেটারলজি আর মিনারালজিতে একজন এক্সপার্ট। তিনি স্থচিত্রার ওপারে চন্দন পাহাড়ের জঙ্গলে কাজ করতে চান, তার সঙ্গে আপনাকে কাজে নামানো হবে। রাজী আছেন ত'?

বীরেশ মুখ তুলে তাকালো। বললে, অনেকদিন আগে আপনারা না একবার বলেছিলেন এই কথা?

হ্যাঁ অনেকদিন আগে, যখন আপনি এই গ্রামে প্রথম এসেছিলেন।

অনিলবাবু বললেন, চন্দন পাহাড়ের জঙ্গলটা কোনো জমিদারের অধীন নয়, গভর্ণমেণ্টের খাস। মাইলের পর মাইল জঙ্গল আর পাহাড়, আগে জন্তু-জানোয়ার বহু ছিল, এখনও কিছু আছে। ওখানকার জঙ্গলে একরকম বাষ্প তৈরি হয়, সেটা নাকি বিষাক্ত। হরিণ, শূয়োর, এরা টেঁকতে পারে না। ছোট ছোট নালা আছে, সেগুলো বর্ষায় নদীর মতন হয়, আর তার জল থেকে তেল, ধাতু, গ্যাস—বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব হয়। অনেকে সন্দেহ করে, পাঁচ হাজার বছর আগে ওখানে ছোটখাটো একটা ভল্‌কানো ছিল। লোহার ওর্‌স্‌, তামার ইন্‌গ্রেডিয়েণ্ট এবং আরো যেন কী কী—এসব পাওয়া যায়। সব দিক ভেবে দেখলে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেক আছে।

বীরেশ বললে, ললিতবাবু ওখানে কী কাজে নামতে চান?

প্রথমটা তিনি রিসার্চ করবেন কিছুদিন। তারপর কাজে নামতে চেষ্টা করবেন।

গভর্ণমেণ্ট রাজী হবেন কেন?

অনুশীলা বললে, গভর্ণমেণ্ট মানে অনিল সেন, আর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। যদি অনিল সেন চেষ্টা-চরিত্র করেন তাহ'লে কালেক্টর বাধা দেবেন না ব'লেই বিশ্বাস।

অনিলবাবু হেসে বললেন, না গো না, সরকারী কর্মচারী ব'লে অনিল সেন একেবারে অমানুষ নয়। তোমার ভায়ের ভাগ্য যদি ফেরে আমার চেষ্টায়, তবে আমিও ত' কমিশন কিছু পাবো। কিন্তু ললিতের টাকা কোথায়? গভর্ণমেণ্টের হাত থেকে ইজারা নিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ করতে গেলে প্রথমেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা দরকার। তার চিঠিতে বুঝলুম, তার হাতে টাকা নেই।

অনুশীলা বললে, বেশ ত' বীরেশবাবুর হাতে হাজার কয়েক টাকা আছে আমি জানি, তাই নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দাও?

বীরেশ হতবুদ্ধির মতো এই বিচিত্র স্ত্রীলোকটির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। সে একেবারে নিঃস্ব, একটি কানাকড়িও তার হাতে নেই। এই কল্পনাপ্রসূত হাজার কয়েক টাকার কথায় সে ভাবলো,—এ বুঝি অনুশীলার

পরিহাস। কিন্তু পরিহাস তার মুখে চোখে নেই। মুখ তার কেবল গম্ভীর নয়, প্রখর বিষয়বুদ্ধি আর দায়িত্ববোধে সে-মুখ চিন্তাপ্রবণ। কিন্তু যা সত্যি নয়, যা ভিত্তিহীন, তার প্রতিবাদ করার জন্য বীরেশ উন্মুখ হয়ে উঠতেই অনুশীলা তাকে থামিয়ে দিল। বললে, আগে স্বামীস্ত্রীর কথা হোক, তারপর আপনার বক্তব্য শুনবো!

বীরেশ নির্বোধের মতো থেমে গেল।

অনিলবাবু বললেন, তোমার বাবার সম্পত্তির এখনো ভাগ হয়নি। কোম্পানীর কাগজ যা কেনা আছে তা এখন বিক্রি করা চলছে না। তা ছাড়া পাঁচ ভায়ের মেজাজ পাঁচ রকমের। ললিতের অংশের টাকাকড়ি এখন অগাধ জলে। অথচ, এদিকে বীরেশের নামে গভর্ণমেণ্ট লীজ দেবে না, ওকে সন্দেহ করে। আমার নিজের নামেও হবে না, আমি সরকারী লোক। বীরেশ যদি ললিতের নামে বেনামী কারবার করে তাহ'লে ললিতের অন্য ভাইরা একদিন এই কারবারের উপর দাবী জানাতে পারে; কারণ, বিষয় এখনো ভাগ হয়নি। রজনী বীরেশকে ছেড়ে গেছে, তাকেও আর বিশ্বাস করা চলবে না। সুতরাং বাধা অনেক।

টেব্‌ল ছেড়ে অনুশীলা উঠে দাঁড়ালো। বললে, কিন্তু তবু এই কাজ আরম্ভ করতে হবে হাকিম। পৃথিবীসুদ্ধ এসে যদি পথ আটকে দাঁড়ায়, পৃথিবীকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা পুরুষ হয়ে পথ দেখতে পাও না, আমি মেয়ে হয়ে সহজ বুদ্ধিতেই পথ চিনতে পারছি।

তোমার পথ যদি সুগম না হয়?

তাহ'লে দুর্গমেই যেতে হবে।...বীরেশের দিকে আঙুল দেখিয়ে অনুশীলা বললে, এই শক্তিকে তুমি বসিয়ে রাখতে চাও, হাকিম? সাত সমুদ্র যে জয় করতে পারে, তাকে খেয়া নৌকো চালাতে হ'লে ক্ষতি কার? তোমার, আমার, সারা দেশের। ওর সামনেই বলব তোষামোদের কথা। রাজার মতো প্রজা পালন করতে যার জন্ম, সে এই গ্রামে ব'সে গোরু চরাবে?...অসম্ভব। তোমরা কাজে যদি না নামো, আমি নামবো, আজ থেকে। মেয়ের আঁচল ধ'রে থাকবে তোমরা,—এই হ'লো এত বড় বাঙালী জাতির পরিণাম? পুরুষের পায়ে হাত বুলিয়ে পরাশ্রিতের মতন থাকবো এই কি আমাদের নিয়তি?...অসম্ভব। আমরা বহুকাল ধ'রে নিচে নেমেছি, তোমাদেরও টেনে নামিয়েছি অগাধ নিচে। মা হয়ে বেঁধে রেখেছি, বোন হয়ে পথ আগলেছি, স্ত্রী হয়ে প'ড়ে কেঁদেছি, তাই তোমাদের এই নিষ্ক্রিয়তা...এই অবরোধ ভেঙ্গে দাও। সুচিত্রা পার হ'তে গিয়ে যদি নৌকা না পাই,...আমি সাঁতরে যাবো ওপারে। যদি

দিনের আলোয় লোকে যেতে না দেয়,…রাত্রে পালিয়ে যাবো ঘর ছেড়ে। তুমি জানো না হাকিম, কী অপমান এই দেহের কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠেছে, কী লজ্জার পাঁকে ভ'রে উঠেছে এই দেহের ঘট।—একদিন অহঙ্কার ক'রে বীরেশবাবুর কাজে বেরিয়ে পড়েছিলুম, মনে করেছিলুম মায়ের হুকুম সবাই মানবে, মায়ের পতাকার নিচে সবাই বুঝি এসে জড়ো হবে। কিন্তু তা হয়নি, মায়ের প্রভাব ধ্বংস হয়ে গেছে, মায়ের দাম ফুরিয়ে গেছে। কেন জানো? আমরা নিজের মর্যাদা রাখিনি, কেবল অজ্ঞান আর মিথ্যার ধোঁকায় ভুলিয়েছি তোমাদের। অন্ধ বাৎসল্যে তোমাদের মুগ্ধ করেছি, স্নেহের প্রশ্রয়ে তোমরা হয়ে উঠেছ কাপুরুষ! দেশের সাহিত্য, দেশের শিক্ষা, দেশের সমাজ—সর্বত্র এই নিষ্ফল মাতৃত্বের অত্যাচার। আজ অপমান ক'রে তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার জন্য জ্বালা আছে, কিন্তু বেদনা নেই। তাদের অসম্মান করার ভেতর দিয়ে নিজের ফাঁকিই আমি ধ'রে ফেলেছি। এবার সব ভেঙ্গে দাও, সব ব্যবস্থা উল্‌টে দাও।—আজ থেকে নতুন ক'রে আবার সব সৃষ্টি হোক।

অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে জ্বলতে অনুশীলা অন্দরমহলের দিকে চ'লে গেল।

বিমূঢ় বিস্ময়ে স্তব্ধ অভিভূতের ন্যায় বীরেশ কতক্ষণ ব'সে রইলো তার নিজের জ্ঞান ছিল না। সহসা বাইরে আকাশে নববর্ষার গুরু গুরু ঘন ঘোষণায় তার চমক ভাঙলো। অনিলবাবু তাঁর পেশকারের আহ্বানে কতক্ষণ আগে ওদিককার মহলে লাইব্রেরী ঘরে চ'লে গেছেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণে কালো মেঘের অন্ধকার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়া তার চিন্তান্বিত ক্লান্ত ললাটের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। গা ঝাড়া দিয়ে সে উঠবে। এমন সময় ছায়াচারিণীর মতো অনুশীলা এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে কাছে এসে দাঁড়ালো। পেয়ালাটা টেব্‌লের ওপর রেখে সে বললে, আপনার কী বলবার আছে বলুন?

তার চোখে মুখে আগেকার সেই বিদ্যুদ্দাহ আর নেই। যেন অতি কোমল, যেন ওই দূরের জলভারানত মেঘের মতোই স্নিগ্ধ সকরুণ। বীরেশ মুখ তুলে এই আশ্চর্য নারীর অপরূপ লাবণ্যের দিকে কিয়ৎক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর নিজের সলজ্জ মুখ নত ক'রে সঙ্কিত কণ্ঠে বললে, কিছু বলবার নেই মিসেস্ সেন।

অনুশীলা বললে, টাকা আপনার নিশ্চয়ই আছে। হাকিম একটা ইন্‌সিয়োর করেছিলেন, তার দরুন হাজার তেরো টাকা আমার আছে, সেই টাকায় আপনি কাজ আরম্ভ করবেন, জমির লীজ আমি নেবো নিজের নামে। তারপর আপনার নামে ট্রান্সফার ক'রে দেবো।

সবিস্ময়ে বীরেশ বললে, আপনার সহোদর ভাইকে বাদ দেবেন ?

ছোড়দা হবেন আপনার কোম্পানীর সায়েন্টিস্ট্।

কিন্তু এতে আপনার স্বামী অবশ্যই আপত্তি করবেন।

আমার স্বামীকে আপনি এখনও চেনেননি, মিস্টার চৌধুরী।

বীরেশ বললে, কিন্তু সহোদর ভায়ের স্বার্থ আপনি আমার জন্যে বলি দেবেন ?

আপনি বুঝি আর একবার সুখ্যাতি শুনতে চান ? তবে শুনুন।—অনুশীলা বললে, ছোড়দা ভালো ছেলে, উচ্চশিক্ষিত কেরিয়রিস্ট,—কিন্তু প্রতিভা নয়। প্রতিভা যদি নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে অন্যের কিছু ক্ষতিও করে, সেও সইবে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় প'ড়ে প্রতিভার অপমৃত্যু সইবে না। এ কাজে আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আর স্বাতন্ত্র্য থাকুক এই আমি চাই।

উচ্ছ্বসিত বীরেশ এইবার সহসা জড়িত ভগ্নকণ্ঠে ব'লে উঠলো, আপনার এই ঋণ—এই কৃতজ্ঞতা শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মিসেস্ সেন।

খুবই সম্ভব,—অনুশীলা এদিক ওদিক চেয়ে বললে, হাকিম তখন আপনাকে তুমি ব'লে ডাকছিলেন, আমিও যদি সেই সম্ভাষণ নিয়ে কাছে আসি, সে অধিকার তুমি দেবে ? তুমি ত' আমার চেয়ে বয়সে খুব বেশী বড় নও, বীরেশ ?—এই ব'লে কম্পিত ডান হাতখানা বাড়িয়ে সে বীরেশের মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে লাগলো।

উদ্গত স্নেহাশ্রুতে বীরেশের মুগ্ধ দুই চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এলো। নত মস্তকে সে বললে, তুমি অন্যের স্ত্রী, তোমার কতটুকু অধিকার আমি জানি নে। বয়সে হয়ত আমি কিছু বড়, কিন্তু তোমার মহিমা আর উদারতার কাছে আমি আজ অনেক ছোট হয়ে গেলুম, অনুশীলা।

প্রাঙ্গণে প্রান্তরে তখন নববর্ষার ঝরো ঝরো ধারা নেমেছে।

সাত

উদ্যোগপর্বের প্রথম বছরে অনিল সেনকে যথেষ্ট সাহায্য করতে হয়েছিল। অনুশীলা রইলো স্বামীর পাশে পাশে। অবস্থা-বৈগুণ্য সে স্বীকার করেনি। গভর্ণমেন্টের দলিলপত্র তৈরির ব্যাপারে নিজের নামটাই সর্বত্র চালিয়েছে। স্বামী হলেন হাকিম, একটা মহকুমার কর্তা—এমন স্বামীকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার ক'রে নেওয়া অনুশীলার পক্ষে কঠিন হয়নি। আইন-কানুনের সূক্ষ্ম চেহারা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তার নেই, সে বুঝতেও চায় না—কিন্তু

নিজের স্বার্থটা ষোলো আনা বোঝে। টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সে পালন করেছে বর্ণে বর্ণে, কিন্তু সাধারণ মেয়ের মতো তার মন ভাবাবিল নয়, অন্ধের মতো টাকা ঢেলে দিয়ে বীরেশকে সে মুগ্ধ করতে চায়নি। ভেবে চিন্তে হিসাব নিকাশ ক'রে স্বামীর সঙ্গে সকল প্রকার আলাপ আলোচনার পর বীরেশকে সে কারবারে নামিয়েছে। সেই কারণে কারবারের বনিয়াদটা হয়েছে পাকা। বাঙালীসুলভ অস্থিরমতির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের চোরাবালির ওপর বীরেশের কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেবীপুর গ্রামে তাদের যে পরাজয় ঘটেছে, ভবিষ্যতে সেই প্রকার ব্যর্থতার কোনো সম্ভাবনা থাকে, এমন কোনো ছিদ্র, এমন কিছু দুর্বলতা অনুশীলা রাখেনি। স্বামীর দুই জন বিশেষ উকিল বন্ধু এবং বীরেশকে সামনে রেখে এর পাকা অবস্থা ক'রে রেখেছে। যেমন তেমন ক'রে গাছ পুতলে ফুল ফোটে না; ফুলগাছে ফুল একদিন অবশ্যই ফুটবে, কিন্তু গাছ পোতার কাজটা ভালো হওয়া চাই। অনুশীলার লক্ষ্য ছিল সারবান মৃত্তিকার দিকে। উপযুক্ত জল সেচনে সে-মৃত্তিকা প্রাণীণ রসে ফলবতী হবে কি না, এই হিসাবটা সে নির্ভুল ক'রে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি উত্তীর্ণ হ'তে চললো। প্রথম বছরের খরচের মাত্রাটা ছিল অনেক বেশি। কারণ আয়োজন ও প্রতিষ্ঠার খরচ প্রথম দিকে কম নয়। অনুশীলা এ তথ্য জানে। কাজ কিছু হয়েছে বটে, তবে বাণিজ্য হয়নি। নদীর এপার থেকে ওপারের কাজের পরিচালনা সে লক্ষ্য করেছে। একটা আধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষাগার এবং তার সঙ্গে কর্মীদের একটা বাংলো নির্মিত হয়েছে। সেখানে বীরেশের সঙ্গে থাকে ললিত আর দু'চার জন সহকর্মী। কুলীকামিনদের একটা চালা নির্মাণেরও কাজ চলেছে। দূরের গ্রাম থেকে তারা যাওয়া আসা করে।

গত বছর এমন দিনে এখান থেকে অনিলের বদলি হয়ে যাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু নানারূপ সুপারিশ আর আনাগোনার পর আর একটা টার্ম তার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। এতে অনুশীলারই হাত ছিল। সে গিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ইংরেজী ভাষায় দরবার করেছে। স্বামী ছিল তার পিছনে পিছনে। চিনির মালিকরা যথেষ্ট কারসাজি করা সত্ত্বেও অনুশীলার অভিপ্রায় সার্থক হয়েছিল। এ গ্রামের যারা গায়েপড়া অভিভাবক, তারা অনিল সেনকে বদলি হ'তে দেখলে সুখী হয়। নির্বাচন সংগ্রামে হাকিমের স্ত্রীর কার্যকলাপ তারা আজো ভোলেনি! শত্রুর জড় না মারলে তাদের দুর্ভাবনা ঘুচবে না। যাই হোক, এ ক্ষেত্রে অনুশীলাই জয়লাভ ক'রে এসেছে।

মাঝখানের কয়েক মাস এই মহকুমায় বড়ই দুঃসময় গিয়েছে। অনাবৃষ্টির

ফলস্বরূপ এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। যথেষ্ট পরিমাণে আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও চাষীরা চিনি-ব্যবসায়ীর ব্যবহারে ও আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। দাদনের হার এ বছর কমেছে, কিন্তু সুদ বেড়েছে। গ্রামে রাস্তা কেটে লোক-ভোলানো হয়েছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার পর থেকে রাস্তা নির্মাণের কাজ বন্ধ। ফর্দ বাড়াবার দরকার নেই, কিন্তু জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে চিনিওয়ালারা কাজের লোক বটে, কিন্তু তারা গরীবের আত্মীয় নয়। বীরেশের দলের জন্য একটা চাপা সমবেদনা যেন আশপাশের সমস্ত গ্রামেই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। গ্রামবাসীদের দুর্দশায় অনুশীলা কেমন এক প্রকার কুটীল আনন্দে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ভাবলো ওষুধ ধরেছে।

এমন দিনে হঠাৎ একদিন রজনী এসে অনিল সেনের বাংলোয় দেখা দিল। এ-বাড়িতে সে অপরিচিত নয়।—আরদালি তাকে চিনতে পেরে ভিতরে গিয়ে খবর দিল। —অনুশীলা তার নাম শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কিন্তু আত্মসংবরণ ক'রে চাকরকে বললে, বলো গে, হুজুর এখন আদালতে, এখন ত' দেখা হবে না।

আরদালি বাইরে গিয়ে আবার ফিরে এলো। বললে, তিনি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।

আমার সঙ্গে?—বিরক্তিতে অনুশীলা কঠিন হয়ে উঠলো। কিন্তু বাড়িতে এসেছে ভদ্রলোক, অশোভন রূঢ়তায় ফেরত দেওয়া একটু কঠিন! অতিশয় অনিচ্ছায় ইংরেজী বইখানা একপাশে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে এলো।

তাকে দেখে রজনী বললে, নমস্কার। কেমন আছেন?

মুখখানা মেঘের মতো ক'রে অনুশীলা বললে, ভালো না থাকলে আমাদের চলবে না। বসুন।

রজনী বললে, হাকিম আছেন আদালতে আমি জানি। আমি সুবিধাবাদী লোক, সেইজন্যেই গা ঢাকা দিয়ে আপনার কাছেই আবেদন নিয়ে এসেছি।

আপনাকে মনে করিয়ে দিতে এসেছি যে, আমি আজো সেই বিশ্বাসঘাতকই আছি, আজও আপনাদের উপকারের দেনা শোধ করবার উৎসাহ আমার নেই!

এই বলতে এলেন নাকি?

না, দু'একটা কথা আরো আছে। আমি সেই মায়েরই সন্তান, যারা সন্তানের বাঁচবার উপায় রাখে না, অথচ পরমায়ুর জন্যে পাঁচুঠাকুরের দোরে মানত করে, যারা ছেলের কল্যাণ করতে গিয়ে কালীঘাটে দুটি ক'রে নিরপরাধ পাঁঠার প্রাণ বলি দেয়।

অনুশীলা একখানা চেয়ার টেনে ব'সে বললে, আপনার আসার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারছি নে, রজনীবাবু।

রজনী বললে, আমিও ঠিক বুঝিনি, মিসেস্ সেন। তবে ক'দিন থেকেই মনে হচ্ছিল, যাঁর টেবিলে ব'সে অতি দুর্দিনে অন্নগ্রহণ করেছি তাঁর কাছে মনে প্রাণে ক্ষমা চাইলে হয়ত আমি আবার নিজের উন্নতি করতেও পারতুম।

অনুশীলা এইবার তার আপাদমস্তক তাকালো। হাকিমের বাড়ি আসবার জন্য সবচেয়ে ভালো জামা-কাপড়ই সে প'রে এসেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ধোপদস্ত ধুতি আর পাঞ্জাবি যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও জরা ও দৈন্যের পরিচয় দিচ্ছে। এবং সহসা তার পায়ের দিকে নজর পড়তেই অনুশীলা দেখলো, তার নগ্ন দু'খানা পা বহু দূর থেকে হেঁটে আসার জন্য ধুলোয় কাদায় একেবারে বিবর্ণ।

অনুশীলা বললে, আপনার কাজ-কারবারের খবর কী?

হাসিমুখে রজনী বললে, খবর যে কুশল নয় তা আমার চেহারাতেই মালুম। তবে এদেশে সব চেয়ে সুসাধ্য যে কাজ অর্থাৎ বিবাহ, সেটি আমি আগেই সেরে রেখেছি। কিন্তু এতেই একটা বিপদ ঘটলো, মিসেস সেন। এক সতীন ঘরে আসতেই আর এক সতীন গৃহত্যাগ ক'রে গেলেন, আমি পড়লুম অগাধ জলে।

অনুশীলাকে পুনরায় ঘৃণা ও বিরক্তি দমন করতে হ'লো। সে বললে, আপনার বুঝি আগেও এক স্ত্রী ছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিলেন বটে, তবে তিনি অশরীরী। শাস্ত্রে তাঁকে বলে, ধনলক্ষ্মী। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন যারা বলে, তারা বাতুল। অর্থ ভাগ্যটা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে, এবং দুর্বুদ্ধিটাকেই কাজে খাটানো যায়। একদিন দুর্বুদ্ধির গুণেই ত' বীরেশকে পথে বসিয়ে ভাগ্যটা ফিরিয়েছিলুম।

অনুশীলা বললে, আপনি এখন কী চান বলুন?

রজনী সবিনয়ে বললে, আপনি কিছু প্রসন্ন হ'লে বলতে পারতুম, আপনার আশীর্বাদ চাই। কিন্তু বোধ হয় আর কিছু পাবার অধিকার নেই। কারবার আমার ডুবে গেছে। এর কারণ, আমার চেষ্টা ছিল, কিন্তু মস্তিষ্ক ছিল না। মস্তিষ্কটা বীরেশের সঙ্গেই চ'লে গেছে। ছ'বছর আগে এ-গ্রামে যেদিন যে-অবস্থায় ভাগ্য অন্বেষণে এসেছিলুম, আজ আবার সেই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। সেদিন বীরেশের সঙ্গে উপবাস করেছি, আজ সস্ত্রীক উপবাস করতে হবে। সেদিন আপনাদের কাছে ক্রেডিট ছিল, আজ সে মূলধনও নেই।

কিন্তু তার দুঃখের কাহিনী শোনবার জন্য অনুশীলা একটুও প্রস্তুত নয়।

তার মুখে বীরেশের নাম উচ্চারণও অনুশীলার কাছে কেমন একটা অসহনীয় যন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছিল। সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, আচ্ছা, আমি চললুম, আমার স্বামী যখন থাকবেন, সেই সময় আপনি—

কিন্তু কাজ যে আমার বাকি রইলো, মিসেস্ সেন ?—রজনী সহসা ব্যাকুল হয়ে বললে, আশীর্বাদ ভিক্ষে করতে এসেছিলুম আপনার কাছে, কিন্তু—

অনুশীলা এবার ফেটে উঠলো। বললে, রজনীবাবু, বারবার আশীর্বাদ চেয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমার আশীর্বাদের দামও নেই, আর আশীর্বাদ করার বয়সও নয়। আপনার বন্ধুকে অতি দুঃসময়ে আপনি ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন এই কেবল জানি। ক্ষমা যদি চাইতে হয় তাঁর কাছেই চাইবেন। বরং আমাকেই আপনি ক্ষমা করবেন, কারণ আপনি আজ যত সাধুতারই পরিচয় দিন—আপনাকে অকৃতজ্ঞ ব'লে যে বিশ্বাস আমার হয়েছে, সেই বিশ্বাস আমার কোনোদিনও যাবে না। আপনাকে দেখেই জেনেছি যে, আপনি সর্বস্বান্ত। কিন্তু সত্যিই বলছি আপনাকে, আপনার সম্বন্ধে আমার মন একটুও টলবে না।

রজনীর মুখ চোখ অপমানে রাঙা হয়ে উঠলো। বললে, যদি সমস্ত জীবন ধ'রে আমি প্রায়শ্চিত্ত করি, মিসেস্ সেন ?

সে-খবর রাখবো না। তবে আশা করব, প্রায়শ্চিত্তে আপনার নিজেরই উপকার হবে।

রজনী উঠে দাঁড়ালো। বললে, মিসেস্ সেন, একদিন যে সম্মান আপনাকে করেছিলুম, আপনার আজকের আচরণের পরেও সেই সম্মান আমার অক্ষুণ্ণ থাকবে। আপনি একরোখা, তাই আপনি আপরাইট্, সোজা মানুষ ব'লেই আপনার পথ বাঁকা। বীরেশের কাছে মুখ দেখাবার উপায় আমার নেই। তবু মনে করেছিলুম, যদি আপনার সুপারিশ সংগ্রহ করতে পারি, আর একবার তার কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো। কিন্তু তা হ'লো নাঃ আমি কলকাতাতেই চ'লে যাচ্ছি, এদিকে আর আমার অন্ন নেই। তবে বলা রইলো, যদি কোনোদিন আপনাদের কোনো উপকারে আসতে পারি, তাহ'লে আমার গৌরবই বাড়বে।

অনুশীলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক পা গিয়ে রজনী আবার ফিরে দাঁড়ালো। বললে, আমিই না হয় অপরাধী, কিন্তু আমার স্ত্রী নিরপরাধ—তিনি আমাকে জোর ক'রে পাঠিয়েছিলেন আপনার কাছে। বীরেশ একদিন তার স্ত্রীকে বিনা দোষে ত্যাগ করেছিল, কিন্তু আমি স্ত্রীর জন্যে ভিক্ষে করতেও দুঃখিত হবো না! নমস্কার।

বীরেশ যে বিবাহিত, এই অদ্ভুত সংবাদ গত ছয় বছরের মধ্যেও অনুশীলার কানে ওঠেনি। সহসা তার সমস্ত কাঠিন্য আর দৃঢ়তার উপরে রজনী যেন ফুৎকার দিয়ে সবটা নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। চেয়ারখানা টেনে অনুশীলা তার অবশ অচেতন দেহটাকে কোনোমতে বসালো। রজনীকে আর একবার চেঁচিয়ে তার ডাকতে ইচ্ছা হ'লো, কিন্তু তার গলা যেন ভিতর থেকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। স্তব্ধ, আহত, অপমানিত মুখে সে নীরবে ব'সে রইলো। প্রাঙ্গণ পার হয়ে রজনী পথে নেমে মাঠ পেরিয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সমস্তটাই রহস্যময়, সমস্ত যেন সংশয় ও সন্দেহে কুয়াশাচ্ছন্ন। বীরেশকে সে জেনে এসেছে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে,—তার অতীত জীবনকে সে জানতে চায়নি। তার প্রতিভা, তার কর্মশক্তি, তার অম্লান অধ্যবসায়,—তার স্বভাবের সৌকুমার্য, তার বিদ্যা ও বুদ্ধির আভিজাত্যময় সম্ভ্রম,—কোথাও ত্রুটি নেই। অভাবে, বিপদে, দুঃখে, হতাশায়, বেদনায়,—বীরেশের সকল অবস্থাই সে জানে। দৈন্য-দারিদ্র্যের মধ্যেও নির্লিপ্ত সে—রাজপুত্র পথের ভিখারী হ'লেও তাকে চিনতে ভুল হয় না; মণিরত্ন পঙ্কিল হ'লেও তার দাম কমে না। কিন্তু আজকের এই সংবাদের জন্য অনুশীলা প্রস্তুত ছিল না! এ সংবাদ আঘাত ক'রে গেল তার মর্মমূলে। যাকে একান্ত ক'রে কাছে পাওয়া, সে একান্ত দূরের মানুষ—এমন সন্দেহ করার অবকাশ তার ছিল কোথায়? একান্ত ক'রে অনুশীলা যাকে বিশ্বাস করেছে, সে যে একান্ত ভাবেই আত্মগোপন ক'রে রইলো,—এ কথা কি তার স্বপ্নেরও গোচর ছিল?

রজনী এসেছিল এক কাজে, ব'লে গেল অন্য কথা। যেন সে এক প্রকার অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বীরেশের স্ত্রীর সংবাদটা দিয়ে গেল। তার বলার হয়ত প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু অনুশীলার যে শোনার প্রয়োজন ছিল,—রজনী এ কথা অনুভব করেছে। গত ছ'বছরের ইতিহাস রজনীর সবটা জানা নেই। নির্বাচন-যুদ্ধে রজনী ছিল নির্লিপ্ত, তার কাজ-কারবার নিয়ে ব্যস্ত। প্রথম থেকেই সকল কাজে ও কথায় নিরুৎসাহ ছিল ব'লেই তাকে বাদ দিয়ে ব্যাপারটা চলেছিল। সেই সময়টায় বীরেশের সঙ্গে অনুশীলার ক্রমবর্ধমান অন্তরঙ্গতার আনুপূর্বিক কাহিনী রজনীর জানা নেই। তারপরে রজনী বন্ধুকে ছেড়ে একদিন চ'লে গেল।

কিন্তু গত ছ'বছরের ইতিহাস অনুশীলা ছাড়া আর কে জানে?

বীজ পড়ে মৃত্তিকার নিচে, একটা প্রচণ্ড রোমাঞ্চময় বেদনা মৃত্তিকার রহস্য-পাথারের স্তরে স্তরে নিঃশব্দে আলোড়িত হ'তে থাকে; একদিন কেঁদে কেঁদে উঠে দাঁড়ায় অঙ্কুর, জেগে ওঠে প্রাণস্পন্দন। এই ত' গত ক'বছরের অপ্রকাশিত

কাহিনী! উপরতলায় অনুশীলা প্রখর বক্তৃতা দিয়ে বীরেশের প্রতিভায় জীবন সঞ্চার করেছে। তাকে তাতিয়েছে, মাতিয়েছে,—তাকে স্থির থাকতে দেয়নি কোনো বিশ্রামের মধ্যে। তাকে আঘাত করেছে, বিদ্ধ করেছে, বিপর্যস্ত করেছে, চৌম্বকশক্তির আকর্ষণে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। নিস্তব্ধ রাত্রির নিঃশব্দ মুহূর্তগুলি স্বামীর পাশে থেকেও সে ঐ ছন্নছাড়া প্রতিভার ভবিষ্যৎ কল্যাণ-স্বপ্নে ব্যয় করেছে। স্বামী বিস্মিত হয়েছে অপর পুরুষের উন্নতির প্রতি আসক্তি দেখে। অনেক সময়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার এই অহেতুক অধ্যবসায় লক্ষ্য ক'রে। অবশেষে একদিন সে ঝাঁপ দিল নির্বাচন-সংগ্রামে। সে এক চৈত্র মাসের রোদ, জল জলাশয় শুষ্ক, আকাশ কাংস্যবর্ণ, পথে পথে অনাহার, পদে পদে বাধা। সেদিন অনেক স্থলে হাকিমের স্ত্রীর সম্মান রক্ষা হয়নি। অনেকে হেসেছে, উপেক্ষা ও বিদ্রূপ করেছে। সেদিন কি সে গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষার জন্য স্বামীর সুনিশ্চিত পদমর্যাদা আর পর্যাপ্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছিল? পরাজয়ের অসম্মান বহন করেছিল সে কার জন্য? প্রতিভাকে কর্মশক্তিতে বিকশিত ক'রে তোলার অজুহাতে স্বামীকে ভুলিয়ে অত টাকা সে বার করেছিল কার সেবায়?···

কিন্তু উপরতলার অজস্র কাহিনী বাদ দিলে নিচের দিকে যে বস্তু থাকে তার মাধুর্য অনুশীলার নিজস্ব। আত্মবিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার আশ্চর্য রূপ। তার স্বামী তার কাছে কম নয়। বিদ্যায়, বিবেচনায়, উদার স্বভাবে, সুশ্রী চেহারায়, অটুট স্বাস্থ্যে অনিলকে স্বামীভাবে পাওয়া গৌরবের কথা, এতে অনুশীলার কোথাও সংশয় নেই। হাকিম হিসাবে তার চেহারায় অনেকেই একটা কর্তব্যবোধের কাঠিন্য দেখতে পায়, রাগ করলে তার চোখ দুটো রাঙা হয়ে ওঠে। তার ছাঁটা চুল আর ছাঁটা গোঁফে একটা তেজস্বী দৃঢ়তা দেখে অনেকেই তাকে নিষ্ঠুর প্রকৃতি ব'লে ভুল করে। কিন্তু তার আসল পরিচয় আদালতের বাইরে। কেউ কোনোদিন তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। কেউ কোনোদিন সামাজিক জীবনে আঘাত পেয়ে যায়নি। স্ত্রীর প্রতি তার প্রণয়ের উচ্ছ্বাস নেই, তপস্বীর মতো সকল সময়েই নীরব, সাদর অভ্যর্থনায় কোথাও তার বিন্দুমাত্র ফাঁকি নেই। স্বামীকে স্বপ্নেও যদি প্রতারণা করা যায়, তবে তার অপেক্ষা আত্মঅপমান আর কিছুতেই ঘটবে না। স্বামী তার অভিভাবক নয়, স্বামীকে নিয়ে তার কোনো ভয় নেই, স্বামীকে প্রতারণা করার কোনো হেতু তার নেই। স্বামী তার বন্ধু, স্বামী তার পরমাত্মীয়। স্বামীর যোগ্যতা আর ভালোবাসা আর উদার পরিহাস-বুদ্ধির কাছে সহস্র বীরেশও ম্লান। অনুশীলা এ কথা বিশ্বাস করে।

কিন্তু তবু একটা কথা থেকে যায়। তার একমনস্কতার ভাঙন ধরেছিল কেন? এক মন কেন হয় খণ্ড খণ্ড? এ এক জীবনের অভিশম্পাৎ সন্দেহ নেই। তাম্র রেশমের গোছার মতো রাশি রাশি এলোমেলো বীরেশের মাথার চুল হাওয়ায় ওড়ে…তার যত্ন নেই, তার বিন্যাস নেই,—মনে হয় আশ্বিনের আকাশ থেকে বুঝি নেমে আসে ওর মাথার উপরে শ্বেতপারাবত। চোখ দুটোয় বিশ্বের অসীম উদাস স্বপ্নচ্ছায়া। তার মন্থর অবসন্ন ক্লান্তির পাশে থাকে যেন প্রবল শক্তির একটা সৃজন-যন্ত্র। তার কালো দীর্ঘায়ত নির্বাক চাহনির ভিতর অন্ধকার রাত্রি যেন আপন প্রাণের মায়া বুনে চলে। সংসারে সে অযোগ্য, কর্ত্তব্যে সে অপটু, হৃদয়াবেগ প্রকাশে সে অক্ষম, কিন্তু তার কণ্ঠে, সুগৌর বিস্তৃত বক্ষপটে, তার দুই দীর্ঘ বাহুর বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে যেন একটা বিপুল প্রজ্ঞাশীলতা সংহত হয়ে রয়েছে। তুষারমৌলী মহাদেবতার মতো সে অচঞ্চল, কিন্তু ভিতর থেকে শক্তি স্ফুরিত হ'লে সে সর্বজয়ী দুরন্তপনায় মানুষের আতঙ্ক সৃষ্টি করে, তার কাছে এলে হৃদ্‌কম্প হয়, তবু তাকে খুঁচিয়ে জাগাতে ভালো লাগে, উদ্দীপ্ত ক'রে তুললে প্রাণ উল্লসিত হয়ে ওঠে!

অনিল অযোগ্য নয়, বীরেশ অপদার্থ নয়, নিজেও সে অর্বাচীন নয়। যে অসামাজিক এবং অবৈধ আসক্তি স্ত্রীজাতিকে একটা অবাস্তব, রসকল্পনার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে,—সত্য বলতে কি, অনুশীলা সে কথা কল্পনাও করে না। সে বালিকা নয়, সোনার হরিণের আকর্ষণে নিজের গণ্ডী ভেঙে মেয়েরা কোথায় গিয়ে পৌছয়—সংসারে এ সকল ঘটনার সংবাদ সে জানে। আধুনিক কালে ব্যাভিচারিণীদের একটা সুলভ খ্যাতি উন্নাসিক সমাজে পাওয়া যায়, কিন্তু খ্যাতির আবরণের নিচে যে ঈর্ষা আর চৌর্যবৃত্তি, যে সংশয় আর অশ্রদ্ধা, যে চিত্তমালিন্য আর আত্মসম্ভ্রমহানি সে তার কলেজী বন্ধু-মহলের আশেপাশে দেখে এসেছে, সে বড় ঘৃণ্য। কিন্তু তবু আজ বীরেশের বিবাহের সংবাদ শুনে তার মনে হচ্ছে, তার ছয় বছরের পরিশ্রম আর উদ্দীপনা সমস্তই ব্যর্থ। সে যেন কেমন মিথ্যার পিছনে ছুটেছিল! সেই বস্তুর জন্যই সে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, যার ওপর তার কোনো দখল নেই।

সহসা পায়ের শব্দে তার অবিরাম মনোবিকারের স্রোত ঝপ্‌ ক'রে থেমে পাক খেয়ে উঠলো। হেমন্তের অবসন্ন বেলা। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিককার কৃষ্ণচূড়ায় ক্লান্ত রোদ এরই মধ্যে বিদায় নিতে চাইছে। শস্য-বোঝাই একখানা গোরুর গাড়ি একটু আগেই ধুলো উড়িয়ে গেছে, তার চাকার আর্তনাদ তখনও ধূলিজালের ভিতর দিয়ে কানে আসছিল।

বারান্দার উপরে অনিল উঠে এলো। পেশকারের সঙ্গে পাইক কাগজপত্র

নিয়ে লাইব্রেরীর দিকে চ'লে গেল। চাকর এসে তার হাত থেকে নিল টুপি আর ছড়ি। অনিল পূর্বদিকের বারান্দা পেরিয়ে এদিকে এসে রজনীর পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় ব'সে পড়লো।

এখানে চুপচাপ ব'সে যে?

অমুশীলা এতক্ষণে কথা কইলো। বললে, এই একটু রোদ পোয়াচ্ছিলুম।

অনিল বললে, কিন্তু রানীসাহেবা আজ এত আনমনা কেন? আবার কোন্ ফিকিরে আছ শুনি?

আমি বুঝি ফিকির খুঁজেই বেড়াই?

হাসিমুখে অনিল বললে, আশ্চর্য নয়! আবার ত' গ্রামে সাড়া প'ড়ে গেছে, তোমরা নাকি আবার একটা ভীষণ ফাইট্ দেবে। এবার কার ওপর আক্রমণ?

যদি বলি তোমার ওপর?

বেচারী আমি! অনিল বললে, রক্ষে কর দেবী; সাতে নেই পাঁচে নেই, অম্বলে নেই, ঝোলে নেই। হাকিমী করি, খাই-দাই-বেড়াই। আমার ওপর আক্রমণ চালালে একটুও ডিফেণ্ড করব না,—তখুনি সারেণ্ডার করব। বলবো, যো হুকুম রানীসাহেবা। এখন শুনি, তোমার মেজাজ শরিফ্ নয় কেন? ওদিকের খবর কিছু এসেছে নাকি?

কোন্ দিকের?—অমুশীলা যেন বুঝতেই পারেনি।

শ্রীমান্ বীরেশ আর ললিত। যাক্—ছোকরা দু'জন এতদিনে একটা কূলকিনারা পেয়েছে। দু'বছর ধ'রে খুব খেটেছে, কী বলো? টাটা থেকে একটা ভালো অর্ডার পেয়েছে, হাজার-পঞ্চাশেক টাকা। একটা ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গেও ওদের নতুন অর্ডারের কথাবার্তা চলেছে।—কই, এমন একটা সুসংবাদ দিলুম, তোমার মুখে চোখে কোনো সাড়া নেই কেন?

অমুশীলা বললে, রুচি নেই।

হেতু?

বৈরাগ্য।

অহেতুক?

অমুশীলা ম্লান হাসি হাসলো। বললে, বেল পাকলে কাকের কী?

অনিল বললে, কিন্তু কারবারটা যে তোমার নামে গো? ওরা পাবে কমিশন, তুমি পাবে লাভের অঙ্ক!

না, চাইনে আমি কিছু—অমুশীলার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপলো। বললে, তুমি থাকলেই আমার সব রইলো।

অনিল তার মুখের দিকে তাকালো। বললে, একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! তুমি উৎসাহ হারালে ও বেচারীরা যে দ'মে যাবে গো। ওদের গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নিয়ো না।

অনুশীলা আত্মসংবরণ ক'রে বললে, ওরা পুরুষ, এবার নিজের পথ ওরা নিজেরাই বুঝে নিতে পারবে। আমরা আর এখন থেকে ওদের নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবো না। যথেষ্ট হয়েছে।

হাসতে হাসতে অনিল উঠে দাঁড়ালো। তারপর স্ত্রীর কাছে এগিয়ে তার গালের ওপর হাতখানা বুলিয়ে বললে, আচ্ছা তাই হবে, এসো। আজ আমিই তোমাকে চা ক'রে খাওয়াবো।

স্ত্রীর কোমরে হাতখানা জড়িয়ে সাদর স্নেহে অনিল তাকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

কী করো গো, চাকর-বাকররা দেখতে পাবে যে!

অনিল বললে, মন্দ কি, দেখলে উৎসাহ বোধ করবে।

অনুশীলা স্বচ্ছ হাসিমুখে বললে,—বলবে, হাকিমের কীর্তি!

কিন্তু এ কথাও বলতে পারে, রানীসাহেবার বিরহ ঘুচলো!

চায়ের আসরে ব'সে অনুশীলা বললে, আজ রজনী এসেছিল দুপুরবেলায়।

তাই নাকি? ছোকরা সাহস করলো, এখানে আবার আসতে? কী করে আজকাল?

ওর কাজ-কারবার সব নষ্ট হয়ে গেছে। এসেছিল অপরাধের ক্ষমা চাইতে।

অনিল বললে, আর কী উদ্দেশ্য?

যদি আর একটা কিছু সুবিধে হয়।

হ'লো কিছু?

অনুশীলা হাসলো। বললে, ভারি অসভ্য তুমি। তুমি না হাকিম?

টোস্টে কামড় দিয়ে অনিল বললে, হয়ত অসভ্য না হ'লে হাকিম হওয়া যায় না।

না, তা নয়। হাকিম না হ'লে অসভ্য হওয়া যায় না।

স্পর্ধা তোমার! সরকারী কর্মচারী কি কখনও অসভ্য হয়?

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অনুশীলা বললে, অসভ্য মানেই সরকারী কর্মচারী।

ব্যস্, এখানেই থামো। অনিল বললে, আর টুঁ শব্দ করলেই কিন্তু রাজদ্রোহ!

জানি গো জানি, তোমাদের সিডিশনের আইন বেলুনের মতন যত খুশি ফোলানো যায়।

নিশ্চয়ই। তার কারণ দেশটা অনেক বড়, একে আয়ত্তে আনতে গেলে আইনের ব্যাপকতা থাকা চাই।—তারপর, রজনী আর কী বললে, শুনি?

বললে, বিয়ে করেছে।

যাক্ এতদিনে তা হ'লে ভদ্রলোক হ'লো।

অনুশীলা বললে, বিয়ে যারা করেনি তারা বুঝি ভদ্রলোক নয়?

না। তারা গোঁয়ার। এই যেমন তোমার বীরেশ। আচ্ছা, বলো দেখি লোকটার কি কোনো 'সেন্স অব হিউমার' আছে? কেবল কাজ, কেবল ব্যস্ততা, কেবল আইডিয়ালিজম্। নিজের কাজকে ও দেশের কাজ মনে করে, দেশের কাজকে মনে করে নিজের। ওর হাসবার সময় নেই, গান-বাজনার দিকে ঝোঁক নেই, মেয়েছেলের দিকে নজর নেই, ওর সঙ্গে আমার কথা কইতেই ভয় করে। বিয়ে করলে এই দোষ ঘটতো না, একটু মধুর রস আসতো মনে, অন্তত আর কিছু না হোক্, মাত্রাজ্ঞান আসতো। মহাদেবের রুক্ষ জটার ভিতর থেকে যখন জাহ্নবীর ধারা নামলো, তখন তিনি হলেন রসময়। আগে ছিলেন সন্ন্যাসী, এখন হলেন শিব।···তোমার বীরেশের একটা বিয়ে ঘটিয়ে দাও দেখি অনু?

অনুশীলা স্তব্ধ হয়ে শুনলো স্বামীর কথা। তারপর বললে, বীরেশ যে বিবাহিত তা বুঝি তুমি জানো না?

তাই নাকি?···বিয়ে করেছে? কদ্দিন?

এখানে আসবার আগে।

কই, আমাদের বলেনি ত'?···বেশ, বেশ, তাহ'লে মন্দ নয়। ওই জন্যেই বোধ হয় ছোকরার এত উৎসাহ কাজকর্মে। তুমি শুনলে কোত্থেকে?

বীরেশের মুখ থেকে যে শোনেনি, এ কথা স্বামীর কাছে প্রকাশ করতে অনুশীলার বাধলো। বীরেশের গোপন কাহিনী রক্ষার পাত্রী সে নয়, এ যেন তার কাছে একটা ভয়ানক অপমানের কথা মনে হ'লো। সে কেবল বললে, শুনেছি আমি।

অনিল বললে, আমাদের এতদিন বলেনি কেন? আর কিছু না হোক্ একটা উপহারও পাঠাতে পারতুম। যাক্, শুনে খুশী হলুম। ছোকরার তাহ'লে এখনো আশা আছে। বিয়ের কথা যখন বলেনি, তাহ'লে একটা কিছু গোলযোগ ঘটিয়ে এসেছে, কী বলো?

জানিনে, পরের কথায় আমাদের কী দরকার?

কিন্তু পর ব'লে তুমি ত' মনে করোনি?

পর পরই, তাকে আপন মনে করা ভুল।

অনিল বললে, কিন্তু তুমি ত' বলতে, পর যখন আপনার হয়, তখন আত্মীয়ের চেয়ে আপন।

অনুশীলা হাসিমুখে বললে, মানুষ নিজের মতামত বার বার বদলায় বলেই মানুষ বুদ্ধিজীবী!

তা বটে! যাকৃগে, এ প্রসঙ্গ আমাদের নাড়াচাড়া করবার দরকার নেই। —ওঃ, ভালো কথা মনে পড়েছে। বলতে বলতে অনিল ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো—ভালো কথা! আজ টিফিনরুমে ঢুকতেই আরদালি একখানা চিঠি আমার হাতে দিল! বোধ হয় তোমার ওখান থেকে—এই যে, দেখো ত'? তোমারই নামে।

পকেট থেকে একখানা খাম বার ক'রে অনিল স্ত্রীর হাতে দিল।

চিঠিখানা নিয়ে খুলে অনুশীলা পড়তে লাগলো।

কি গো, তোমার বাপের বাড়ির নাকি?

না, এ আমার বন্ধুর।

চা খাওয়া শেষ ক'রে অনিল লাইব্রেরী ঘরের দিকে চ'লে গেল। অনুশীলা সেইখানে ব'সে একমনে পড়তে লাগলো তার চিঠি :

ভাই অনুশীলা,

গত সাত আট বছর তোর কোনো খবর জানতুম না। আমার চিঠি প'ড়ে খুব অবাক হবি বেশ বুঝতে পারছি। তুই বিয়ে করেছিস, কে যেন বলেছিল। কিন্তু তুই যে হাকিমের বউ তা জানতুম না। আমার মামীমার কাকার কাছে শুনলুম তুই এখন দেবীপুরে। আমি মাস্টারি ছেড়ে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি। প্রথমে যাবো খাঁনপুরে দাদামশায়ের ওখানে। শুনলুম, তোদের দেবীপুরের পাশেই খাঁনপুর। যদি তোর সঙ্গে এক-আধদিন আড্ডা দিতে ইচ্ছে করে তাহ'লে কি হাকিমের হুকুম নিতে হবে? তোর সঙ্গে সেই কলেজের দিনগুলো মনে পড়ে। কত কাণ্ডই করা গেছে! তুই আই-এ পাস ক'রে পালালি অন্য কলেজে, আর আমি বি-এ দিয়ে গেলুম পোস্ট-গ্রাজুয়েটে। শুনলে সুখী হবি, আমি আজও বিয়ে করার সময় পাইনি, বোধ হয় ওটা আর হয়ে উঠবে না মনে হচ্ছে। মণ্টেসরী পাস করতে একবার ইতালী যেতে পারি। দেখা হ'লে খুব গল্প করা যাবে। চিঠির উত্তর দিস। ত্রিশের ওপরে এসে পৌছেছি, তবু তোর কথা মনে ক'রে আবার যেন দশ বছর আগেকার জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

ভালোবাসা নিস। হাকিমকে নমস্কার জানাচ্ছি। তোর ওপর হাকিমী চিকিৎসা কেমন চলেছে? ইতি—বাঁকিপুর, ডিসেম্বর ১১। তোদের সেই

নলিনী

আট

আগে নাম ছিল পাথরচাকী, এখন তার নতুন নামকরণ হ'লো নবনগর! চন্দন পাহাড়ের কোলে ছিল ছোট একখানা গ্রাম, দু'চার ঘর চাষী, নমঃশূদ্র আর সাঁওতাল সেখানে থাকতো। আগে শীতের দিনে সুচিত্রার তট ঘেঁসে একদল বেদে আর বেদেনী এসে তাদের তাঁবু ফেলতো, কিন্তু গ্রামে আহারাদির কোনো ব্যবস্থা হয় না দেখে তারা আর এ-অঞ্চলে আসে না। মাঝখানে এদিকে একটা বন্য জ্বর দেখা দিয়েছিল।

সুতরাং সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেবার পর আজকাল নবনগরের সীমানা পুরনো গ্রাম পেরিয়ে এগিয়ে এসেছে একেবারে সুচিত্রার তীরে। এখন নদীর কোলে বাঁধানো ঘাট, আর সেই ঘাট থেকে উঠলে রাঙা কাঁকরের সুন্দর ছায়াবহুল পথ সোজা নতুন কুঠিবাড়ি পেরিয়ে পশ্চিম দিকে চ'লে গেছে। আগে চন্দন পাহাড়ের চারিদিকে ছিল বন-জঙ্গল, নাবাল জমি, খাল, জন্তু-জানোয়ারদের স্বাধীন চলাফেরার জায়গা, সে জায়গা এখন আর চেনবার উপায় নেই। আজকাল সেখানে কারখানা, অফিসঘর, পাওয়ার হাউস, পরীক্ষাগার, জলাধার, ছোট তিন চারটে ব্যারাক, কুলীধাওড়া—বহু প্রকার ব্যবস্থায় আগেকার সেই দুর্গম বন্য অঞ্চল ভ'রে গেছে। এখানে সেখানে হাট বসে, দোকান-পাটে খদ্দের জমে যায়। সন্ধ্যা আসন্ন হ'লেই নবনগরের পথঘাট ইলেকট্রিকের আলোয় হাসতে থাকে। চারদিকের অন্ধকার দৈত্যপুরীর মাঝখানে এই ক্ষুদ্র নবনগর যেন কিশোরী বালিকার মতো প্রাণ-চেতনায় চঞ্চল। দু'তিন বছরের মধ্যে এর এত উন্নতি দেখে আশেপাশের গ্রাম একেবারে বিস্ময়বিহ্বল।

দেবীপুরে যা সম্ভব হয়নি, নবনগরে তা' সার্থক হয়েছে। এখানে সমবায়-সমিতি নেই বটে, তবে কর্মচারী আর শ্রমিকদের জন্য একটি ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে। চাষবাসে মন্দা পড়ার জন্য অনেক চাষী এপারে এসে নবনগরের কাজে লেগে গেছে। কোনো দল লোহা গলাবার কারখানায়, কোনো দল পাওয়ার হাউসে, কোনো দল বা জলাধারের হেপাজতে নিযুক্ত। অফিস চালাবার কাজে জন কয়েক যুবক কলকাতা থেকে এসে বীরেশের কাছে পরীক্ষা দিয়ে তবে এখানে নিযুক্ত হয়েছে। তাদের অনেকের চেষ্টায় একটি প্রাইমারী আর একটি মাধ্যমিক শিক্ষালয় গ'ড়ে উঠেছে। কাজ সৃষ্টির মালিক বীরেশ,

নিয়ন্ত্রণও করবে সে, কিন্তু পরিচালনা করবে অপরে। সম্প্রতি একটা হাসপাতাল আর কুটিরশিল্প-শিক্ষালয়ের কাজ চলেছে পুরোদমে।

কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণের পাশে একটা লাইব্রেরীর কাজ আরম্ভ হয়েছে। তারই তদ্বিরের জন্য বীরেশ তার প্রিয় ছড়িটা হাতে নিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুখে তার একটা পাইপ। এটা তার নতুন সখ। পাইপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে।

গুপ্তসাহেব, কী ভাবছ বলো ত'?

ললিত তার ফাইল থেকে মুখ তুলে বললে, ঠিক বলেছেন, ফাইলের দিকে আমার চোখ ছিল না। আপনার কথাই ভাবছিলুম দাদা।

আমার কথা?—পাইপ থেকে মুখ সরিয়ে বীরেশ বললে, যাক্, পৃথিবীতে একটা মানুষও পাওয়া গেল, যে আমার কথা ভাবে। কী ভাবছো?

ভাবছি—ললিত বললে, এত বড় একটা নগর যে লোকটা গ'ড়ে তুললো নিজের ব্রেনের জোরে, তার দিকে চাইবার কেউ নেই। আপনার উদ্দেশ্য সফল হ'তে চলেছে, নবনগর এখন উন্নতির পথে,—ত' আপনার শরীর এত কাহিল হচ্ছে কেন, দাদা?

পাইপটা দেখিয়ে বীরেশ বললে, এই ত' তার ওষুধ হে। একলা থাকার এত ভালো ওষুধ আর নেই।—এই যে, বিজনকুমার, কী মতলব নিয়ে আবার এলে?

একটি ছোকরা একটা ফাইল নিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়ালো। বললে, এই চিঠিটায় একটা সই ক'রে দিন দয়া ক'রে।

বীরেশ তার চিঠিতে সই ক'রে দিয়ে বললে, ব্যালান্স-শীটের একটা কপি আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো।...হ্যাঁ, ফ্লিট্এর অর্ডার আজ পাঠানো চাই।

ললিত বললে, মশা তাড়াবার ব্যবস্থা আমি করছি, দেখুন না বিলেত থেকে আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো আসতে আর দেরি নেই।

বীরেশ বললে, তোমাদের কোয়ার্টারে কারো জ্বর হয়নি ত'?

বিজন হেসে বললে, যে ব্যবস্থা আপনি করেছেন, কারো মাথাটিও ধরে না।

জল কেমন খাচ্ছ?

খুব ভালো। নমস্কার।—ব'লে বিজন খুশী মুখে চ'লে গেল।

বীরেশ বললে, এদের মাইনে বাড়াবার কী ব্যবস্থা করছো হে।

ললিত বললে, দাঁড়ান দাদা, এই হাফ-ইয়ারলির ক্লোজিংটা আগে হোক। আমার মনে হচ্ছে, মজুরদের অ্যাভারেজ ওয়েজেস্ কিছু বাড়াতে পারবো। নিচের বনেদটা শক্ত হোক, তারপর এরা ত' আছেই।

বাঃ তুমি দেখি একজন পাকা ম্যাগনেট্ হয়ে উঠলে। আমি যদি কিছু কাল বাণপ্রস্থ নিই, চালাতে পারবে ত' ?

ললিত হেসে বললে, জানি একটা পরীক্ষায় আপনি আমাকে ফেলতে চান। কিন্তু বিলেতী আবহাওয়ায় অতদিন থেকে এসেছি, জেনে এসেছি ডিসিপ্লিন্, ফিরে এসে থেকেছি অতদিন বেকার,—তারপর সত্যকার হাতেখড়ি হ'লো আপনার কাছে। আশা ক'রে আছি, আপনার ছায়াতেই বরাবর থাকবো। যন্ত্রটা যত ভালোই হোক, বিদ্যুৎশক্তি না থাকলে সে অনড়, আপনি হলেন লাইফ্‌ফোর্স।—পাগল হয়েছেন? কোথাও আপনার যাওয়া হবে না।

বীরেশ বললে, নাঃ তুমি একেবারে নিরামিষ। বিলেত যাওয়াটাই তোমার ব্যর্থ। লোকে সেখান থেকে সাহেব হয়ে আসে, কিন্তু তুমি এলে মাছ-মাংস ছেড়ে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে। বিলেতের ওপর শ্রদ্ধা ক'মে গেল।

মুহূর্তের জন্য ললিতের মুখে একটি রঙীন আভাস খেলে গেল। নতমস্তকে সে একপ্রকার সুকুমার হাসি হাসলো। বললে, বিলেতের ওপর আপনার শ্রদ্ধা না কমে এই আমি চাই। কারণ, আমি সেখান থেকে সাহেব হয়েই ফিরে এসেছি, এখানে এসে 'নেটিভদের'ও ঘৃণা করেছি অনেকদিন। কিন্তু—

কিন্তু কী হে?

ঢোঁক গিলে মুখখানা কোনোমতে লুকিয়ে ললিত বললে, কিন্তু হঠাৎ একদিন একজনের প্রভাবে আমার সব বদলে গেল। নিজের চেহারাটা দেখলে এখন হাসি পায়।

মাথার টুপিটা ভালো ক'রে বসিয়ে বুট-সুদ্ধ একটা পা চেয়ারের উপর তুলে পাইপটা মুখে দিয়ে বীরেশ বললে, সে আবার কী হে? এমন পরশ-পাথর পেলে কোথায়? নাঃ, বছরখানেক থেকেই মনে হচ্ছে তোমার ওপর একটা ভূত চেপে রয়েছে। ব্যাপারটা কী বলো ত'? You are getting mysteriously romantic!—ওই যে ব্যানার্জি আসছে এদিকে। আমি ততক্ষণ পাওয়ার-হাউস থেকে ঘুরে আসি। তুমি মিস্ত্রিদের কাজের দিকে চোখ রেখো।

বীরেশের পথের দিকে ললিত চেয়ে রইলো।

তিন বছর সে ঠিক এমনি ক'রেই বীরেশকে দেখে আসছে। ওর রোগ নেই, নিরুৎসাহ নেই, মনোবিকার নেই,—কেমন যেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। ভালো-বাসা বোঝে না, স্নেহে বশীভূত হয় না—কেমন যেন একটা বন্য জানোয়ারের

মতো ওর অদ্ভুত শ্রমশক্তি। নিজের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাখে, আর সেই আগুন থেকে সকলকে আলোক বিতরণ করে। প্রকাণ্ড এই প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছে সে নিশ্চিত সাফল্যের দিকে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নির্দয়ভাবে সে উদাসীন। জীবনের অপরাহ্ণকাল তার ঘনিয়ে এলো, কিন্তু কোনোদিন আনন্দের অন্বেষণে সে কোথাও ভ্রূক্ষেপ করেনি। কী তার পরিচয়, কোন্ বংশের সন্তান, সংসারে তার কে আছে আর কে নেই,—এ সকল প্রশ্ন তাকে করাও একেবারে মিথ্যা। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সে মালিক, সহস্র সহস্র টাকা সে প্রতিদিন নিয়ন্ত্রণ করে, প্রবল তার ক্ষমতা, প্রবলতর তার প্রতিপত্তি,—কিন্তু নিজের জন্য খরচ তার নেই! সামান্য তার জীবনযাত্রা, নগণ্য তার গৃহসজ্জা,—রাশভারী মানুষ সে নয়। নেপথ্যে নির্লিপ্তভাবে থেকে সে নির্মাণ করেছে এই নগর, সকলের অলক্ষ্যে থেকে সকলকে সে শাসন করছে। বাধা যেখানে পেয়েছে—কেবলমাত্র সেইখানে গিয়ে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় সে বাধা চূর্ণ করেছে। তিন বছরেই এটা সম্ভব হ'লো। প্রথম এসে দেখা গিয়েছিল একটা দুর্গম বনময় উপত্যকা,—নিকটে সাপ ও জানোয়ারে পরিপূর্ণ পার্বত্য অঞ্চল,—সেখানে ভয় ও নিরাশার বাসা ছাড়া আর কিছু ছিল না। একদিন সহসা বন্য জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক প্রাচীন পরিত্যক্ত মন্দিরে আশ্রয় পাওয়া গেল। শেষ বর্ষাকালের ভয়াবহ দুর্যোগে তখন এখানে থাকা কেবল এক উন্মাদ প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। তারপর বহুকষ্টে, বহু সাধ্য-সাধনার পর লড়াই বাধলো স্থানীয় এক জংলী জমিদারের সঙ্গে। তখন লোকবল নেই, ধনবল সামান্য,—যে কয়জন বিশ্বস্ত লোক পাওয়া গিয়েছিল, তাদের মধ্যে সেই জমিদার অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললো। কিন্তু বীরেশ জন্মেছিল শাসন করতে, মানুষের কল্যাণ করতে। আর সেই কল্যাণ করতে গিয়ে কেমন ক'রে নিষ্ঠুর হ'তে হয় সে জানে।—সুচিত্রার তীরে তখন এসে তাঁবু পেতেছিল একদল বেদে। তাদের কাছে অস্ত্র সংগ্রহ করা হ'লো। সে নিজে যেতে পারলো না, কিন্তু দেবীপুর থেকে গোপনে আনা আটজন চাষীকে নিয়ে বীরেশ চললো এক অন্ধকার রাত্রে···কোথায় কী কাজে গেল, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও জানা যায়নি, তবে সেই রাত্রেরই শেষ দিকে সেই আটজন চাষীকে আবার নৌকায় তুলে গ্রাম পার ক'রে দিয়ে আসা হয়েছিল।···এই ঘটনার পরের দিন জমিদার এবং তার অনুচরদের লাস অবশ্য আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে রেল-স্টেশন নেই, থানা নেই, কোনো জনবহুল গ্রাম নেই, যানবাহন স্বপ্নেরও অগোচর। সুতরাং স্থানীয় চৌকিদার আটদিন ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে জেলা পুলিশে খবর দেয়। তদন্ত একটা অবশ্যই হয়েছিল, বীরেশের নামও যেন কারা

করেছিল—কিন্তু সাক্ষ্য-সাবুদের ব্যাপারটা ছিল নির্ভুল কৌশলের চিহ্ন। তা ছাড়া বীরেশের সঙ্গে তখন সরকারী যোগাযোগ এত বেশি যে, তাকে সন্দেহ ক'রে টানাটানি করা অসম্ভব। এটা হত্যাকাণ্ড, ললিত জানে; এটা যে বীভৎস নিষ্ঠুরতা একথা সবাই স্বীকার করবে। কিন্তু তবু এই নির্দয় পুরুষকে শ্রদ্ধা না ক'রে উপায় নেই। সিদ্ধির জন্য, বহু-জীবনের সার্থকতার জন্য গ'ড়ে তোলার প্রথম দিকে আলস্য ও জড়তাকে সে হৃদয়হীনের মতো আঘাত করেছে, অযোগ্যতাকে সে কঠিনভাবে বিতাড়িত করেছে, স্বার্থপরতাকে রুদ্রের মতো সংহার করেছে; বিবেচনা করেনি কোথাও, কোথাও দুর্বল দাক্ষিণ্যকে প্রশ্রয় দেয়নি। নিজের ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিকাশের জন্য সে যেন একটা সর্বব্যাপী আয়োজন ক'রে চলেছে।···তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

মাঝখানে ললিতের একবার কেবল সংশয় জেগেছিল। সেটা তারও জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই। তারা পুরনো পাথরচাকী থেকে তেরো মাইল দূরে একটা সরকারী ডাক-বাংলোয় গিয়ে উঠেছে। কুলীকামিনরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাকা পথ কাটতে কাটতে চলেছে। কনট্রাক্টররা আনাগোনা করছে। কখনো নৌকায়, কখনো বা গোরুর গাড়িতে খোয়া-সুরকি ইট আনা হচ্ছে। দিবারাত্র কাজের চাপে কারো বিশ্রাম নেবার সময় নেই। বীরেশ আর সে পরিদর্শনে খুব ব্যস্ত।

ক'দিন থেকেই কর্মীমজুর আর গ্রাম্য কনট্রাক্টরদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। তারা আহার পায়, মজুরি পায়, বিশ্রাম পায়, তবু কেমন-কেমন ভাব। শেষকালে বীরেশ নিজেই একদিন সমস্যার মীমাংসা ক'রে দিল।

মেয়েরা এসেছিল জঙ্গল পেরিয়ে কোন্ দূরের পাহাড়ী গ্রাম থেকে। দু'মাস একমাস থাকে,—মোটামুটি মজুরি নিয়ে একদিন তারা দেশে ফিরে যায়। আবার নতুন দল আসে। এদিকে জমাদার, ঠিকাদার, মজুর, মিস্ত্রি কনট্রাক্টর—তারা আসে অন্য পর্যায় থেকে। মেয়েরা থাকে প্রধানত বীরেশ আর ললিতের তদারকে। পুরুষের ধাওড়া অন্যত্র। বীরেশ একদা সহসা তার এই বিধি-নিষেধ তুলে নিল!

ললিত ভীত বিবর্ণ মুখে বললে, করলেন কি আপনি?

বীরেশ বললে, কেন, কঠিন ত' নয় কেবল মুখের কথামাত্র।

উত্তপ্তকণ্ঠে ললিত বললে, ওই জানোয়ারদের প্রবৃত্তির রাশ খুলে দিলেন?

হাসিমুখে বীরেশ শান্ত কণ্ঠে বললে, পাশব বৃত্তি উভয়ের মধ্যেই আছে, ললিত।

কিন্তু মেয়েদের সম্ভ্রম আর কর্মশক্তিকে ওরা যে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে, দাদা?

প্রথমটা দেবে, কিন্তু সে ঝড় থামলে উভয়েই শান্ত হবে,—ওদের পরিশ্রমে উৎসাহ আসবে। উপবাস করতে করতে স্ত্রী-পুরুষ উন্মত্ত হয়, জানো ত'?

ললিত বললে, স্ত্রীলোককে আপনি ক্ষুধার খাদ্য মনে করেন?

বীরেশ বললে, পুরুষও ত' মেয়েদের ক্ষুধার খাদ্য, ললিত?

আপনি কি তবে চরিত্র, নৈতিক শুচিতা, মেয়েদের সতীত্ব—এসব কিছুই মানেন না?

বীরেশ হেসে বললে, সেটা সমাজ-ধর্মে, কর্মজীবনে নয়। জীবন হ'লো একটা প্রকাণ্ড রণক্ষেত্র,—এ কেবল ভাঙাগড়ার খেলা! বড় বড় দেশের গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময় কী করে, মনে ক'রে দেখো। স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, বুদ্ধি উৎসাহ আর সংবৃত্তিকে নির্মল রাখার কাজে তারা একে কিছুকাল আলগা ক'রে দেয়। স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমহানি করার জন্য যে গভর্ণমেণ্ট অপরাধীকে কঠিন সাজা দেয়, সেই গভর্ণমেণ্টই আবার দরকার হ'লে 'ফিল্ড-ব্রথেল্' সৃষ্টি করে; সৈন্য-শিবিরে নার্সদের নিয়ে যাবার সুবিধা দেয়। ভয় পেয়ো না, সংস্কারমুক্ত হয়ে জীবনের দিকে চেয়ে দেখো। ক্ষুধার খাদ্য দিয়ে চলো, তোমার কর্মীদল সুস্থ হোক, উৎসাহিত হোক।

কিন্তু এর ফলাফল?

বেশ ত' সে-ব্যবস্থাও তুমি করবে, সেই হবে তোমার পক্ষে মানুষের কাজ, সেই হবে নতুন কাঠামোয় নতুন সমাজসৃষ্টি। তার দায়িত্ব তোমার।

কিন্তু ওদের পারিবারিক জীবন যদি নষ্ট হয়ে যায়?

বীরেশ বললে, তাহ'লে ওরা নতুন পরিবার সৃষ্টি করবে, তুমিই হবে তার অভিভাবক। তোমার হাতে রাষ্ট্রশক্তি, তোমার পরিচালনা, তোমারই নিয়ন্ত্রণে তারা বাঁচবে। আগে জীবন, পরে সমাজ, আগে সংগ্রাম, পরে শান্তি।

ললিত তার মুখের দৃঢ় কাঠিন্যের দিকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো। পরে বললে, আপনার কাছে স্ত্রীলোকের কোনো দাম নেই? তারা কি কেবলমাত্র ইট-পাটকেল? স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা, দয়া—এসব কি আপনি কিছুই গ্রাহ্য করেন না?

বীরেশ হেসে উঠলো। তারপর বললে, সত্যি বলবো?

বলুন, নির্ভুলভাবে সহজ বিশ্বাসে বলুন, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি আপনার সঠিক পরিচয় পাবার জন্যে।

তার পিঠের উপর হাত রেখে বীরেশ বললে, প্রত্যেকটিরই দাম আছে। কিন্তু ওরা পিছন থেকে টানে, এগিয়ে যেতে দেয় না। ওদের দলিত ক'রে না গেলে মানুষের বড় কাজে হাত দেবে কী ক'রে? শৃঙ্খল যদি পায়ে বাজে,

মুক্তির দুরন্ত ঝড়ে পাখা মেলবে কী ক'রে? স্নেহে যদি অন্ধ হও, ভালোবাসার আঁচল ধ'রে যদি কাঁদতে ব'সে যাও, তবে এই দুর্ভাগা জাতের উপায় কী হবে? …স্নেহ, মায়া, দয়া—বিশ্রামের দিনে ওগুলো ভালোও লাগে, একটু একটু নেশাও ধরে—কিন্তু এক একটা মানুষের কাছে ওদের দাম ফুরিয়ে যায়, এক একজন দুর্গমের যাত্রীর কাছে ওরা প্রশ্রয় পায় না—বুঝলে হে?

ললিত বললে, আপনার এসব কথার দাম যেন একদিন বুঝতে পারি বীরেশদা। আপনার কথাতেও আমার নেশা লাগছে, কিন্তু সংশয় আমার কাটলো না।—এই ব'লে সে সেদিন ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ হয়ে অন্যত্র চ'লে গিয়েছিল।

কথাটা মিথ্যে নয়, ললিতের বিলাত যাওয়াটাই ব্যর্থ। এই অভিশপ্ত অশ্রদ্ধা আর মানবাত্মার উৎপীড়নের যুগে সে এখনো মনুষ্যত্বের দাম কষতে বসে; অন্যায় দেখলে শিউরে ওঠে; মানুষের দুঃখ দেখলে ব্যথিত হয়। সে এখনো বুঝতে পারেনি পৃথিবীকে প্রতিপালন আর পাপমুক্ত করার দায়িত্ব যাদের হাতে—তারাই আনছে দিকে দিকে ধ্বংস, দিকে দিকে ইতর স্বার্থপরতার সংঘর্ষ। রাজসিক সংস্থার মধ্যে ললিত মানুষ, তামসিক আকাশে সে নিয়ে এসেছে নিশ্বাস,—অথচ এমন সাত্ত্বিক বিকার তার হ'লো কেমন ক'রে—কৌতূহলের বিষয় বৈকি!…তার নিজের স্বীকারোক্তি, কার যেন প্রভাবে তার পরিবর্তন ঘটেছে! বিলেত-ফেরতা যুবককে দলছাড়া করে—কেমন মানুষ সে? গৃহী লোক হঠাৎ গেরুয়া চড়িয়ে নিরামিষভোজী হয়—কোন্ সন্ন্যাসীর মন্ত্রে?

সেদিন ল্যাবরেটরিতে ঢুকে বীরেশ একটু বিস্মিত হ'লো। এই কক্ষের অধিনায়ক হ'লো ললিত। সেদিন সকাল সকাল ছুটি হওয়ায় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্রা চ'লে গেছে। ঘরের ভিতরে সর্বত্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আর অসংখ্য কাঁচের শিশি আর টিউবের ভিড়। এই পরীক্ষাগার নির্মাণ করতে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সেই ল্যাবরেটরির অসমাপ্ত কাজ ফেলে এক কোনে ছোট টেবলটির কাছে ব'সে ললিত লেখাপড়ায় একেবারে তন্ময়। এটা পাঠাগার নয় সবাই জানে—অথচ তার এই একান্তে আত্মগোপন ক'রে থাকাও কিছু বিসদৃশ বৈকি!

এমনি তন্ময় যে, বীরেশ এগিয়ে এসে কাছাকাছি দাঁড়ালো, ললিত বুঝতে পারেনি। মনটা তার এখনো কৌমার্য প্রভাবে কোমল, সেজন্য তার একাগ্রতাটাও সুকুমার।

কী হে, সবাইকে লুকিয়ে পাড়া ছেড়ে, কাজকর্ম ছেড়ে, এমন কী রাজকার্যে ব্যস্ত বলো ত'?

চমকে উঠে ললিত সলজ্জভাবে বললে, না, এমনি, একখানা চিঠি লিখছি।

চিঠি ত' আমরাও লিখি হে, কিন্তু তার জন্যে ত' রামগিরি পর্বতের নির্জন আর নিভৃত চূড়া দরকার হয় না!

ললিত হেসে উঠলো। বললে, মেঘদূত হ'লো কবিতা, এটা কিন্তু গদ্য স্যার!

বীরেশ বললে, গদ্য-কবিতাও ত' হ'তে পারে, ভাই। বেশ ত' কী রকম সাহিত্য-রচনা করলে একটু শোনাও একটুখানি মৌতাত হোক।

রক্তাভ মুখে ললিত বললে, আমাকে কি আপনি আত্মহত্যা করতে বলেন?

কেন?…হঠাৎ?

এখানা চিঠি। যে লিখছে, আর যাকে লেখা হচ্ছে, তাদের একান্ত ব্যক্তিগত।

বীরেশ বললে, প্রেমপত্র নাকি?

ছি ছি,—ললিত বললে, কী যে আপনি বলেন! একটু মন দিয়ে চিঠিখানা লিখছি, এই যা।

হাসিমুখে বীরেশ বললে, আচ্ছা, আচ্ছা,—লেখো, আমি যাচ্ছি আমাদের কোয়ার্টারে। কাল রবিবার, একটু বিশ্রাম পাওয়া যাবে।—এই ব'লে সে বেরিয়ে গেল। তার বয়স হয়েছে, দুচার গাছা চুলেও পাক ধরেছে,—এমন একটা অনাবশ্যক কৌতূহলের জন্য সে একটু লজ্জিত হ'লো বৈকি!

কোয়ার্টারে এসে পায়ের জুতোটা ছেড়ে সে সটান তার বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কেমন একটা নিষ্ফল অভিমান ভিতর থেকে তার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো। অনেক বছর চ'লে গেছে, আজকে সে আর ঠিক বুঝতে পারে না—তাকে সবাই ত্যাগ করেছে, অথবা সে নিজেই সব ছেড়ে দিয়েছে! ললিতকে যা নিয়ে আজ পরিহাস করছে, একদিন সেও ত' এই হাস্যকর মনোবৃত্তিতে জড়িত ছিল। সেদিন নিজেকে সে বুঝতে পারেনি, বয়সে ছিল তরুণ, কিন্তু আজ ললিতের ভিতর নিজের অতীতকে সে অনুভব করতে পারছে। হয়ত সে অর্বাচীন ছিল, কিন্তু নারী সম্পর্কে বিদ্রূপ কটাক্ষ করবার অধিকার আর যারই থাকুক, তার নেই। নারীর কাছ থেকে সে পেয়েছে অনেক, সে-পাওয়ার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, তার প্রাপ্তিটা বরাবরই অপ্রত্যাশিত, অনাহুত। মানুষ হয়েছে সে রাঙাদিদির স্নেহচ্ছায়ায়, তার শৈশবের সঙ্গী ছিল মেয়েরা। তাদের সঙ্গে হেসেছে, কেঁদেছে, বিবাদ করেছে। তার তরুণ জীবন থেকে আরম্ভ হ'লো নলিনীর সঙ্গে সাহচর্য। সে ইতিহাস যদি অতঃপর অপ্রকাশিত থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু তার জীবন যে আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়েছে

সে-কথা অস্বীকার করবে কে ?···কে অস্বীকার করবে তার চরম দুর্দশার দিনে অন্ন দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, অপত্যস্নেহ দিয়েছে ওই মুসলমানী তাঁতীবৌ ? তারপর,—তার জীবনের এই যে বিরাট কীর্তি,—এর সৃজনমন্ত্র কার কাছে পাওয়া ? সেও ওই নদীর ওপারে তার রহস্যময় কুয়াশায় বীরেশকে আবৃত ক'রে রেখেছে। কী যে সম্পর্ক তার অনুশীলার সঙ্গে, সম্ভবত উভয়েই জানে না। হয়ত নির্দিষ্ট তার নিরীথ কিছু নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই, শ্রেণীবিভাগ নেই—তাই হয়ত এত কৌতুক, এত সংশয় আর কৌতূহল—এত হৃদয়াবেগ আর চৌম্বক শক্তির খেলা। অনুশীলা নইলে তার স্থান ছিল কোথায় ? সে ত' কেবল টাকা দেয়নি, কেবল একাগ্র পরিশ্রম আর উৎসাহেই তাকে সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি—সে তার অদ্ভুত আহ্লাদিনী শক্তিতে তাকে সকল দুর্গমে, সমস্ত বিপদে, সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। বারে বারে পরাজয়ে তার পৌরুষে ধরেছিল ভাঙন।···বার বার মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সে ক্লান্তিতে —কিন্তু অনুশীলা তার প্রতিভাকে খুঁচিয়ে যেন সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে তুলেছে। নারীর কাছে কৃতজ্ঞতা তার অপরিসীম, তাদের নিয়ে পরিহাস করবার অধিকার ত' তার নেই···

ছুটির দিনটায় বীরেশ প্রায় সময়েই একা থাকে। সেদিন হিসাবপত্র কিংবা লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে সে বিশেষ মন দিতে চায় না। কিন্তু একা থাকলেও এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সম্পর্কে কিছু একটা পরিকল্পনা নিয়ে সে ছুটির দিনটা কাটিয়ে দেয়। ললিতের নিজের একখানা মোটরবাইক আছে, সেখানা হাঁকিয়ে জেলার বড় শহর পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ে। এখানকার লাইব্রেরীটাকে বেশ একটা পাঠচক্র ক'রে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টায় সে থাকে। শীঘ্রই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এসে এই লাইব্রেরীর উদ্বোধন করবেন। সম্প্রতি নবনগরের প্রধান কর্মীদের নিয়ে একটি পৌরসভা গঠনের আয়োজন চলছে।

কিন্তু গল্পগুজব আর কথাবার্তায় সেদিন শীতের অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেল! আজকে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব হ'লো না। দু'জনে বেড়াতে বেড়াতে সুচিত্রার তীর অবধি এসে পৌছলো। তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলছে। ওপারে বহুদূর দেখা যায়, সেদিকের গ্রাম ও প্রান্তর শীতের অস্পষ্ট হিমাচ্ছন্ন কুয়াশার অন্ধকার হয়ে আসতে আর বেশী বিলম্ব নেই। ওপরের দিকে তাকালে বীরেশ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

অনেক দিন হ'লো বটে—বীরেশ বললে, অনেকদিন ওখানে যাওয়া হয়নি। কী বলো ?

ললিত বললে, উদ্বেগের আর কী কারণ আছে, স্যার? আপনি ত' অসুর টাকা সুদ-সুদ্ধ ফেরত দিয়েছেন।

বীরেশ হাসিমুখে বললে, তা বটে! তবে কি জানো, মাঝে মাঝে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এলে মেয়েদের মন একটু খুশী থাকে হে। কই, তোমার ভগ্নীর চিঠিপত্রও ত' অনেকদিন আসে না। ব্যাপার কী বলো ত'?

ও চিরকালই একটু মাথা-পাগলা। যাকে বলে মুডি। এখন চিঠি বন্ধ, কিন্তু চিঠি চললে রোজ একখানা।

তা দেখেছি বটে।

মা বাবা আদর দিয়েই ওর মাথাটি খেয়ে গেছেন। দেখেননি, বুড়ো বয়সে আজো কেমন ক'রে ঝগড়া করে আমার সঙ্গে? আমাকে একটুও মানে না। ওকে বিলেত নিয়ে যাওয়া হয়নি, তাই ওর রাগ।

বীরেশ বললে, তোমাদের সংসারে এখন কে কে আছেন?

ললিত বললে, আছেন সবাই, কেবল বিশেষ প্রয়োজনীয় দু'জন নেই,—মা আর বাবা।

তোমরা ত' পাঁচ ভাই শুনেছি, বিয়ে করেছেন ক'জন?

সকলেই, কেবল আমি বাদে।

হেসে বীরেশ বললে, তুমি হঠাৎ বাদ পড়লে কেন? তুমি ত' জানো বাংলাদেশে বিয়ে কেউ করে না, বিয়ে হয়! তোমার বিয়ে হয়নি কেন?

ললিত একবার তার মুখের দিকে তাকালো। একটা প্রশ্ন চট্ ক'রে তার মুখে এসে পড়েছিল, কিন্তু বীরেশের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে তার বয়সোচিত কুণ্ঠা ছিল—সুতরাং সে আত্মদমন ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিল।

শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। বনময় নদীর তীরে শীত বেশি, সুতরাং এরই মধ্যে নবনগরের ঘাটগুলি নির্জন হয়ে গেছে। সামনের ঘাটে তাদের নিজেদের নৌকাটি বাঁধা। বড়বাবু এবং ছোটবাবু অনেক দিন পরে নদীর তীরে এসেছেন, অতএব আশেপাশে দু'একজন ছায়াচারী তাবেদার যে নেই তা নয়। তারা হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে, ডাক শুনলেই এগিয়ে আসবে।

কিন্তু বাবুদের দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বরং বীরেশ ও ললিত নিজেরাই সিঁড়ি দিয়ে নেমে নৌকায় গিয়ে উঠলো। তখন একটি লোক—লোকটি নৌকার রক্ষী, ছুটে এসে নৌকার শিকল খুলে দিল, এবং তার পিছনে পিছনে দ্বিতীয় ব্যক্তি দুখানা দাঁড় এনে নৌকায় তুলে দিল। বীরেশ বললে, তোরা যা, আমরা নিজেরাই চালিয়ে নিয়ে যাবো।

মাথার উপরে হিমগদগদ জ্যোৎস্না, শীতের বাতাস কনকনে। অদূরে চন্দন পাহাড়ের ছায়া নেমে এসেছে সুচিত্রার বুকের উপর। নদীতে কোনো তরঙ্গ অথবা আন্দোলন নেই, একান্তভাবে কান পেতে থাকলে ভিতরের একটা অস্পষ্ট প্রাণ-কল্লোল শোনা যায়। ললিত বিলাতে ক্যাম্‌-এ নৌকা চালনা করতো, সে নিজে তার সুদক্ষ দুই হাতে দুখানা দাঁড় ধ'রে উত্তর দিকে ধীরে ধীরে নৌকা বেয়ে চললো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। রাতটি যে আজকে মধুর, সন্দেহ নেই। নদী প্রশস্ত নয়, দুইপারে ছোট ছোট শালের জঙ্গল, ধান কাটা মাঠ, মাঝে মাঝে কৃষ্ণচূড়ার ঝোপ, উঁচুনীচু ডাঙ্গা,—প্রায় সবই দেখা যায়। কিছুদূর গেলে একটা খাঁড়ি নদী থেকে বেরিয়ে গর্দানবন্ধীর জঙ্গলের দিকে চ'লে গেছে। আগে সারকিট্ হাউস থেকে সরকারী কর্মচারীরা ওদিকে শিকারে যেতো। খাঁড়ির মুখে এখনো অনেক সময় জানোয়ার পাওয়া যায়।

তুমি যে সেই সন্ন্যাসীর পাল্লায় প'ড়ে বোষ্টোম হ'লে, সে ব্যাপারটা কেমনতরো, হে?

সন্ন্যাসী?—ললিত সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালো!—সন্ন্যাসী আবার কী?

বীরেশ বললে, হ্যাঁ গো, সেই যে তোমাকে মাছ-মাংস ছাড়ালো, খদ্দর ধরালো, দীক্ষা দিল—লোকটা কি তান্ত্রিক নাকি, ললিত?

দাঁড় বাইতে বাইতে ললিত বললে, তান্ত্রিক হয়ত হ'তে পারে, কিন্তু সন্ন্যাসী ত' নয়, দাদা।

বেশ ত' না হয় গৃহীই হ'লো। আজকাল বর্ণচোরা সন্ন্যাসীর অভাব কী? কেউ মাথা কামায়, কেউ বা চুল রাখে। কেউ কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, কেউ বা কামিনীদের সম্পর্কে উৎসাহী। কারো তপস্যা শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনে, কেউ বা ভোগস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সাধনায় বসে। তুমি কোন্ দলে?

কোনো দলেই নয়।

তাহ'লে ত' আরো বিপদ। তুমিই একটা দল এবং বলা বাহুল্য, তোমার দল গজালে আধ্যাত্মিক দলাদলির পরিমাণই বাড়বে। ঈশ্বর কোথায় রইলেন তার ঠিক নেই, কিন্তু সন্ন্যাসীরা রইলো তার পথ আগলে।

ললিত হেসে উঠলো। বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, চৌধুরী সাহেব। আমার দল দলাদলি কিছুই নেই। ঈশ্বরের ছায়াও মাড়াইনে, মন্ত্র আর দীক্ষা আমাকে কেউ দেয়নি, কোনো সন্ন্যাসীকেও আমি জানি নে। আমি বর্তমান জীবনে জানি দু'জনকে। একজন আপনি, এবং আর একজন—

আর একজনটি কোন্ দুর্ভাগা শুনি?

আপনি ত' শোনবার জন্য উৎসুক নন্!

তা নই অবশ্য।—বীরেশ বললে, তবে কি জানো, তুমি আমার সত্যই প্রিয়। সত্যি বলতে কি, রজনী যাবার পর থেকে আমার হাত ভেঙে গিয়েছিল। তুমি এসে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছ। অপর ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি কৌতূহল বড়ই অশোভন, কিন্তু ভালোবাসা যেখানে আছে, আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হ'তে সেখানে ভালোই লাগে।

ললিত বললে, আপনার সম্বন্ধে ত' এতদিন আপনি কিছুই বলেননি।

বলবার ত' কিছু নেই ভাই। আমি গৃহত্যাগী মানুষ। মা নেই, বাবা আছেন। তারপর আমি এতকাল জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। বাকিটা ত' তুমি দেখতে পাচ্ছ।

আপনি ত' বলেননি, আপনি বিবাহিত কি না।

বীরেশ হেসে উঠলো—বললে, ভুলেই গিয়েছিলুম বটে! বলতে আপত্তি নেই—বলবার উৎসাহও অবশ্য নেই—তবে হ্যাঁ, মালাবদল একটা এককালে আমার হয়েছিল বটে!

ললিত সবিস্ময়ে বললে, আপনার এ কথার মানে? স্ত্রী কোথায় আপনার?

জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট না দেখা গেলেও একটা ঈষৎ অপরাধের ছায়া বীরেশের মুখে ভেসে উঠলো। কিন্তু সহজ কণ্ঠে সে বললে, সে জবাব তোমাকে সঠিক দেওয়া কঠিন, ললিত।

ললিত বললে, আপনার সঙ্গে কি তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই?

না।...তাঁকে মনেও নেই। খবরও আমি রাখি নে।

ললিত চুপ ক'রে গেল! অনেকদূর তারা এসে পড়লেও আরো এগিয়ে চললো। উপরে তারকা-খচিত আকাশ, কোথায় কোন্ গাছে যেন পেচকের কণ্ঠস্বর জেগে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। পকেট থেকে পাইপ বার ক'রে জ্বালিয়ে বীরেশ একসময় বললে, যাক্‌গে—তোমার আধ্যাত্মিক রূপান্তরের কাহিনীটা এবার শুনি, বলো ত'?

ললিত দাঁড় টানা থামিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, সেটা সামান্যই, মিস্টার চৌধুরী।

বীরেশ বললে, গাছের বীজটাও সামান্য, কিন্তু তার থেকেই বনস্পতির সৃষ্টি।

ললিত বললে, আপনাকে বলবার দোষে যদি অন্যায় ক'রে ফেলি?

অন্যায় কিসের?

মনস্তত্ত্বে বলে, আমাদের সুপ্ত কামনা মিথ্যার উপরে রং ফলিয়ে তাকে সত্য ক'রে তুলতে চায়। আমার ভুল যদি আমি বুঝতে না পেরে থাকি, দাদা?

বীরেশ বললে, তুমি কি নিজেকে বিচার করোনি?

ললিত বললে, করেছি, কিন্তু মনের নাগাল কি আপনিই পেয়েছেন? এমন যদি হয়, যাঁকে বড় ক'রে তুলতে যাবো, বলবার দোষে তিনি যদি ছোট হয়ে যান? প্রতিমাকে আমরা সবাই পূজো করি, কিন্তু কুসংস্কারের বেড়াজালে ঘিরে তাঁকে হেয় ক'রে তুলি—সে কথা আমরা নিজেরা বুঝতে পারি নে, এই দুঃখ!

পাইপটা একবার টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বীরেশ বললে, তোমার মেজাজটা রোমান্টিক, সেই কারণে হয় ফাঁপিয়ে রঙীন ক'রে পুজো করতে চাও, আর নয়ত' নামিয়ে দিতে চাও রসাতলে। দুটোই মিথ্যে। নির্ভুল দৃষ্টিতে সবাইকে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে পারাই হ'লো পূজা ও শ্রদ্ধার প্রথম বনেদ। মনের অতল তল অবধি পরিশুদ্ধ না থাকলে তুমি সংস্কারমুক্ত র‍্যাশন্যাল্ মন পাবে কোথায়? মানুষের সত্যকারের দাম কষতে পারার অভাবেই ত' আজ দিকে দিকে অশান্তি আর হানাহানি। অর্থাৎ বলতে চাই, সত্য বিচারের গুণেই মানুষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্যের চোখে, নিন্দায় অথবা সুখ্যাতিতে নয়।

সত্য বিচারের ত' কোনো নিরীখ নেই, দাদা?

বীরেশ হেসে বললে, সেই কারণেই ত' প্রতিভার ওপর আমাদের এত শ্রদ্ধা। তারা আনে নির্ভুল দৃষ্টি, তাদের সেই তৃতীয় নয়নে ধরা পড়ে তোমার সত্য পরিচয়, তোমার প্রকৃত স্বভাব। আমি জানি তুমি কী বলবে, ললিত। কার কথা বলতে চাও, হয়ত তাও খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। তাই তোমাকে এসব ব'লে রাখলুম।

জানেন আপনি?

হয়ত ত' জানি নে, আমার আন্দাজ মাত্র। কিন্তু তোমার কাছে জীবন এখনো রহস্যময়, এখনো জটিল, তাই তুমি জানতে চাও, জানাতে চাও। তোমার মনের স্বাচ্ছন্দ্য আর শুচিতা এখনও সুকুমার অবস্থায় রয়েছে।

সলজ্জ কণ্ঠে ললিত বললে, আপনার আন্দাজটা কী, আগে তাই বলুন।

বীরেশ হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে, শেষ পর্যন্ত আমার গোয়েন্দা-গিরি তুমি ধ'রে ফেলতে চাও? কিন্তু তুমিই ত' খাল কেটে কুমির নিয়ে গিয়েছিলে।

হাসিমুখে ললিত বললে, কি রকম?

বীরেশ বললে, সেদিন তোমার ঘরে চা খেতে গেলুম, তখনো আমার মন নিষ্পাপ। তুমি কী যেন কাজে একবারটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে। তখন পড়ন্ত রোদের আলো। চেয়ে চেয়ে দেখলুম, তোমার রুমালে, তোয়ালে

আর বালিশের ওয়াড়ে লাল সুতোয় একটি নামেরই ছড়াছড়ি। নামটি হ'লো আনন্দময়ী!

স্তব্ধ বিস্ময়ে একটি মুহূর্ত কাটিয়ে ললিত আবার দাঁড় টানতে লাগলো। তাকে বহুক্ষণ অবধি নিরুত্তর দেখে বীরেশ একসময় বললে, কি হে, আন্দাজটা কি মাঠে মারা গেল নাকি?

গেলে ভালোই হ'তো, দাদা।

কেন?

এতক্ষণ পরে ললিত নৌকার মুখ ফিরিয়ে দিল। অল্প স্রোতের টানে নৌকা ধীরে ধীরে চললো। এতক্ষণ দাঁড়ের ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ ছিল; এখন সম্পূর্ণ নিঝুম হয়ে গেল। সম্মুখে জ্যোৎস্না কত আঁকাবাঁকা নদীপথ অপরূপ এক মায়াজালে কেমন একটি স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছে। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ললিত বললে, আপনার শোনবার আগ্রহ দেখে আমি ভীত হচ্ছি, তাঁর বিষয়ে বলাটা আমার পক্ষে একটা সমস্যা বিশেষ। কারণ একে যদি কেউ পরিহাস ক'রে প্রণয়কাহিনী বলে, তাহ'লে আমি খুবই আহত হই।

বীরেশ বললে, মেয়েটি কেমন?

ললিত বললে, মেয়েটি না বলাই ভালো, কারণ তিনি প্রায় আমার সমবয়সী, আজো তিনি বিবাহ করেননি। তাঁর চেহারা কেমন, এ আলোচনা করা আমার পক্ষে অশোভন। তবে তাঁর সুশ্রী চেহারা দেখলে অনেকেরই মনে হবে, বাংলাদেশে জন্মানো তাঁর পক্ষে আকস্মিক। তাঁর দেহের বাঁধন আর মনের কাঠিন্য বাংলাদেশের নরম মাটিতে খাপ খায় না।

কঠিন কেন বলচ?

কঠিন এই কারণে যে, কোনো চিত্তবৃত্তির উচ্ছ্বাস তিনি বরদাস্ত করেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি বি-এ পাস করেছেন কিন্তু শিক্ষিত হ'লেও, স্ত্রীলোক হ'লেও তাঁর প্রকৃতিতে কেমন যেমন একটা রুক্ষতা—যেন মরুভূমির একটা অংশ।···অনেকবার মনে করেছি এটা তাঁর আত্মনিগ্রহের ফল। স্ত্রীলোক যথা সময়ে সংসারী না হ'লে তাঁর স্বভাবের বিকৃতি ঘটে, কিন্তু সে-ভুল বার বার আমার ভেঙে গেছে।

বিয়ে তিনি এতদিন করেননি কেন?

ললিত বললে, সময় পাননি, অন্তত, এই তাঁর অভিমত। সংসার-ধর্ম পালন করতে গেলে সময়ের একটা বাজে খরচ আছে, সে সময় তাঁর হাতে নেই। অনেক সময় মনে করেছি, এটা প্যাথলজি, মরবিডিটি, অসুস্থ চিত্তের বিকৃতি। মনে করেছি চিকিৎসাবিজ্ঞানে হয়ত একেই বলে ফ্রিজিড অথবা

যৌনরহিত অবস্থা। কিন্তু প্রত্যেক দিনের সংস্পর্শে এসে দেখেছি, আমারই সব ভুল।

তোমার সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক?

যেমন সম্পর্ক দুই ব্যবসাদারের। কত জিনিস আমাকে দিয়েছেন উপহার, কত গল্প করেছেন আমার সঙ্গে রাতের পর রাত জেগে, কত দেশ বেড়িয়েছেন আমার সঙ্গে কত আনন্দে,—কিন্তু সেইখানেই শেষ, তার জের টানা নেই কোথাও। অথচ দেখেছি অন্যের দুঃখে তাঁর হৃদয়ের কী ভাঙন, স্নেহ দয়া ভালোবাসার কী আশ্চর্য প্রকাশ—আর কিছু না হোক, এমন ধার্মিক মেয়ে আমি দেখিনি।

বীরেশ বললে, এই ত' তোমার অতিশয়োক্তি আরম্ভ হ'লো, ললিত।

ললিত বললে, হয়ত হ'লো। অহংকার ক'রে বলতে পারি, এ অবস্থায় পড়লে সকলেরই হ'তো। পথ থেকে যিনি আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সোনার খনির সন্ধান দিয়েছেন তাঁর প্রতি অতিশয়োক্তি যুক্তিহীন নয়।

তা হ'লে আমি যা ভাবছি তাই সত্যি বলো?

ললিত বললে, হয়ত আমিও যা ভাবছি তাও মিথ্যে।

তুমি নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছ, ললিত।

ঠাট্টা করবেন না। স্তবগান সব সময় ভালোবাসার পথ ধ'রে চলে না। আমার ভালোবাসার সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য কখনো দেখিনি।

বীরেশ বললে, তাহ'লে এমন হ'তে পারে তুমিই উন্মাদ, কিন্তু তাঁর মন রয়েছে অন্যত্র। তুমি তাকে বুঝতে পারোনি।

ললিত বললে, মিস্টার চৌধুরী, আপনার কথা সত্য হ'লে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম। তাঁর মন অন্যত্র বটে তবে পুরুষের দিকে নয়, মানুষের পথে। সংসারে তাঁর ভালোবাসার কোনো নির্দিষ্ট মানুষ থাকলে একটা সান্ত্বনা থাকতো এই যে, আনন্দময়ীর জীবন ব্যর্থ যায়নি, কোথাও তিনি একটা যথার্থ বস্তু খুঁজে পেয়েছেন।

তার কণ্ঠে আবেগ লক্ষ্য করে বীরেশ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে গেল। ললিতের বয়স এখনো কম, আবেগ-প্রবণতা তার পক্ষে স্বাভাবিক। অস্বীকার করছে সে আসল বস্তুকে, কিন্তু রঙে রসে উচ্ছ্বসিত তার কণ্ঠস্বরে নির্ভুল মনোভাবই ব্যক্ত হচ্ছে। হৃদয় তার আজও কোমল, আজও তার উৎস শুকিয়ে ওঠেনি। বীরেশ আনন্দই বোধ করতে লাগলো।

তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'লো কেমন ক'রে?

ললিত বললে, আমার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর আগ্রহে। বিলেত থেকে

ফিরে নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—এমন দিনে দর্শন পেলুম তাঁর। দেশের কাজ কাকে বলে আমি জানতুম না। মানুষের ভালো করার দাম যে কিছু আছে এও আমি বুঝতুম না। কিন্তু সেদিন এসবের মানে খুঁজে পেলুম।

তিনি কি স্বদেশী নেত্রী?

নেত্রীর চেয়ে বোধ হয় কর্মী বলা যেতে পারে। মস্ত বড় সম্পত্তির তিনি মালিক। মা নেই তাঁর, বাবা আছেন, তিনি সদাশিব। আনন্দময়ী নিজেই বিষয় কর্মের তদারক করেন। কয়েকটা মেয়েদের প্রতিষ্ঠান তিনি গ'ড়ে তুলেছেন নিজের খরচে। আমার হাতে ছেড়ে দিলেন তাদের পরিচালনার ভার। আজও সেগুলো ভালোই চলচে।

বীরেশ বললে, তুমি সে সব ছেড়ে তবে এখানে এলে কেন?

ললিত বললে, সেগুলো মেয়েদের কাজ, আমার নয়। আনন্দময়ী যেদিন বুঝলেন, আমার বিদ্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্র, সেদিন তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

হাসিমুখে বীরেশ বললে, তোমার কাছে কাজ আদায় ক'রে তোমাকে পথে ভাসিয়ে দিলেন?

ভাসিয়ে ত' দেননি। ভাসিয়ে তিনি দিতে পারেন না।

তবে?

ললিত চুপ ক'রে গেল। বীরেশ কৌতুক ক'রে বললে, তবে তোমাকে সরিয়ে রাখার অর্থ?

ললিত বললে, আপনাকে তাহ'লে খুলেই বলি, দাদা। কোনো কোনো মেয়ের আচরণে তিনি বড়ই বিরক্তবোধ করেছেন। তাঁর ধারণা,—ললিত হেসে উঠলো—তাঁর বিশ্বাস, কোনো কোনো মেয়ে আমাকে নষ্ট করতে পারে। এটা অবশ্যই তাঁর ভুল।

বীরেশ একবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। তারপর বললে, যাক্ বাঁচলুম। এতক্ষণে একটা সূত্র পাওয়া গেল।…তাই বলো, আমি এতক্ষণে প্রায় অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলুম। তিনি তবে আজগুবি কিছু একটা নন। নারীধর্ম যথেষ্টই প্রবল।

ললিতও হাসলো। হেসে বললে, আপনার টিপ্পনী গায়ে বড় বাজে।

বেশ ত' তোমাকে তিনি যদি আগলে রাখতে চান তবে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থাই তিনি ক'রে ফেলুন না? এতে আর দোষ কি? পাত্র হিসেবে তোমার যোগ্যতা ত' কম নয়।

ললিত বললে, একথা ভাবলে কিন্তু আমার পাপ হবে। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎকে যিনি নূতন আদর্শে গ'ড়ে তুলেছেন, তাঁকে আমি শ্রদ্ধাই করি। এদিক থেকে তাঁকে আমি ভাবিনি।

এটা তোমার কম্‌প্লেক্স, ললিত।

কেমন ক'রে হবে? আমি ত' সে চোখে তাঁকে দেখিনি।

বীরেশ বললে, সেটা তোমার চোখের দোষ। তোমার সঙ্গে বয়সে বাধে না, সমাজনীতিতে আটকায় না, যোগ্যতায় তুমি খাটো নয়, সম্পর্কের দিক থেকে স্বাধীনতা রয়েছে, ভালোবাসা রয়েছে একান্ত—এমন মিলন দুর্লভ। হয় তোমাদের মধ্যে ভং আছে, নয়ত অসুখ আছে, নয়ত বা আসলে কিছু ফাঁকি আছে।

ললিত বললে, বেশ ত' তিনি হয়ত নবনগরের দিকে শীঘ্রই আসতে পারেন, তাঁর বাবার কাছে প্রস্তাব আপনি করুন!

এলে নিশ্চয়ই করবো তোমাকে কথা দিলুম। কিন্তু তিনি আসছেন কেন?

ললিত বললে, আসবার কথা তিনিই জানিয়েছেন। এদিকে আমরা যে সব প্রাইমারী শিক্ষার কেন্দ্রগুলো খুলছি তিনি যদি এসে সেগুলোর ভার নেন, আপত্তি কি?

বীরেশ বললে, আপত্তি একটুও না।

গতকালও তাঁর চিঠি পেয়েছি।—ললিত হেসে বললে, অবশ্য চিঠিপত্র আপনাকে দেখাতে আমি রাজী নই—

না হে না, খোঁজখবর নিলুম ব'লে চিঠিও কি পড়বো? তা পড়তে যাবো কেন?

ললিত বললে, এদিকের জলহাওয়াও ভালো, তাঁর পক্ষে অসুবিধে হবে না। এ অঞ্চলে মেয়েদের তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের নিয়ে কাজ করতে চান। একটা মাত্র কাজ নিয়ে তিনি থাকতে চান না—নতুন নতুন প্ল্যান্ ছাড়া তার সময়ই কাটে না। যদি আপনি কখনো তাঁকে দেখেন, দেখবেন তিনি আপনারই একটা নারী-সংস্করণ! তফাত এই, আপনি যেমন বিরাট প্রতিভা, তিনি তেমন বিপুল কর্মশক্তি।

নৌকা তাদের ঘাটের কাছে প্রায় এসে গেছে। বীরেশ বললে, তুমি আমাকে এমন ভাবে সুখ্যাতির ঘুষ খাইয়ে রাখলে যে, তাঁকে প্রশংসা না করার আর পথ রইলো না।

উত্তেজিত হয়ে ললিত বললে, নাঃ, আপনি আমাকে একটুও বিশ্বাস করেন না দেখছি।

করি হে করি—বীরেশ বললে, হয়ত তুমি বুঝবে না ভাই, তোমাকেই আজ একান্তভাবে বিশ্বাস করি।—কিন্তু কি জানো? নিরাশাবাদ আমি প্রচার করবো না, আমি ক্ষমতা আর প্রতিভার ভক্ত—তবে এই বিশ্বাস আমার এতদিনে ভেঙেছে যে, ক্ষমতার সঙ্গে শান্তিও দরকার। আমি বুঝতে পারছি, যত বড় ভালোবাসাই হোক, তার ক্ষয় আছে, বিচ্ছেদ আছে, তার বিস্মৃতি আছে। আজ তোমার কাহিনী শুনে নষ্ট বিশ্বাস যদি ফিরে পাই খুশী হবো। কায়মনোবাক্যে যদি তুমি আর আনন্দময়ী সুখী হও, হয়ত আমি শান্তি পেতে পারি। কারণ এটা জানবো, অনুকূল অবস্থাতে অন্তত দুটো জীবন সার্থক হতে পেরেছে। শক্তিই বলো আর প্রতিভাই বলো—এরা যতই স্ফীত হয়ে উঠুক না কেন, শান্তিকে আয়ত্ত করবার সাধ্য এদের নেই। শান্তি হ'লো মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম প্রকাশ—শক্তি আর প্রতিভা তার পদানত। প্রায় দশ বছর হ'তে চললো, একদিন মনে করেছিলুম, বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষকে শাসন করবো, প্রকাণ্ড সম্পদ সৃষ্টি ক'রে একটা দানবীয় সাম্রাজ্য চালনা কববো, আমার হাতে নতুন সমাজ-শৃঙ্খলার পত্তন হবে, দেশের কাছে চূড়ান্ত সম্মান আদায় ক'রে নেবো। কিন্তু সেদিন অন্য দিকটা ভাবিনি। ভাবিনি যে, নিজেই পুড়ে-পুড়ে ছারখার হ'তে পারি।

নৌকা ঘাটে রইলো। ওরা দু'জন ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে পথ ধ'রে চললো, রাত তখন প্রায় দশটা বাজে। আকাশে আর কুয়াশা নেই। পশ্চিমে পাহাড়ের পিছন দিকে চাঁদ নেমে গেছে। মৃদু জ্যোৎস্নার আলোয় কাঁকর-পাথরের পথে মস্ মস্ শব্দ ক'রে দু'জনে বাসার দিকে চললো।

সে রাত্রে অনেকদিন পরে আবার যেন একটা অহেতুক অবসাদে চারিদিক থেকে বীরেশকে ঘিরে দাঁড়ালো। এটা নতুন নয়। বহুদিন অন্তর হঠাৎ এক একবার যেন তার প্রাণের দিগন্ত থেকে একখণ্ড অন্ধ মেঘ মাথা তুলে সমগ্র আকাশকে ভারাক্রান্ত করতে চায়। সংশয় ও নিরাশায় যেন সে অবসন্ন হয়ে আসে। বাইরে যেমন প্রবল শক্তির খেলা খেলছে, ভিতরে তেমনি সংগ্রাম চালিয়েছে এই অশরীরী প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে। আজ রাত্রে বহুদিন পরে বন্ধ ঘরের ভিতরে ক্লান্ত আলোর নিচে সেই প্রেতছায়া তার দিকে হাত বাড়ালো। হয়ত সে ক্ষুধার খাদ্য চায়, হয়ত সে চায় হিসাব নিকাশ, হয়ত বা সে আবার নিয়ে যেতে চায় নিরাশার অন্ধগুহায়। আত্মনিগ্রহ সে করেছে সন্দেহ নেই, নিজেকে অস্বীকার করেছে, ভাগ্যলিপিকে মুছে দিয়ে নতুন ভাগ্য রচনা করেছে। কিন্তু হৃদয় তার এমন ভয়ানক ভাবে নির্দয় হয়ে উঠলো কেন?···কেন গেল সব শুকিয়ে?···সে কি ত্যাগ করলো সবাইকে, কিংবা

সবাই গেল তাকে ছেড়ে দূরে? তবে ক্ষমতার অধিকারী সে হ'তে পারলো কোথায়? শুধু সম্পদের মূল্য কী, যদি সে মানুষের শান্তি আনতে না পারে? কেবলমাত্র ক্ষমতার অর্থ কী, যদি মানুষের উপর প্রভুত্ব সে না করতে পারে?

অথচ এর বেশী কিছু নয়। সে তার বাধাকে চূর্ণ করলো, শত্রুকে খুন করলো, নতুন নগর সৃষ্টি করলো, প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হ'লো, জয় ক'রে বেড়ালো সর্বত্র—কিন্তু এদের সার্থকতা কোথায়? কোথায় গেলে তাদের পাওয়া যাবে যাদের জন্য তার সমগ্র সত্তা ভিখারীর মতো অঞ্জলি পেতে রয়েছে?... দেখতে দেখতে তার যৌবনকাল পেরিয়ে গেল। তার বয়সের উপর এলো প্রৌঢ়ত্ব ঘনিয়ে—বন্য জন্তু যেমন চুপি চুপি শিকারকে অনুসরণ ক'রে আসে। যে কঠোর সংযম আর কৃচ্ছ্রসাধনকে সে অস্ত্র হিসাবে তার কর্মজীবনে ব্যবহার করে এসেছে, তারা যেন বিদ্রোহী সেনাদলের মতো মাঝপথে এসে আর হুকুম মানতে চায় না। নিগ্রহ-জর্জর, বঞ্চিত, তৃষিত,—তারা ফিরে দাঁড়িয়ে পাওনা চুকিয়ে নিতে চায়।

দূরের মন্দিরে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বেজে গেল। শীতকাতর অসাড় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মন্দিরের সেই মন্থর ঘণ্টার ডিং ডিং আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে এলো। পূজারী আছেন, সেবাইৎ আছেন। সেখানে বারোয়ারীতলা, নাটমন্দির, যাত্রাতলা—কিছুই অভাব নেই। একটি বিশাল পদ্মের উপর সমগ্র মন্দিরটি দণ্ডায়মান। জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না এই মন্দিরের ইতিহাস। বোধহয় রজনী জানতো, কারণ একমাত্র সে দেখেছিল নলিনীর কাছে তার লেখা চিঠি। এ মন্দিরের নাম পদ্মাসনা, মনে মনে নলিনীর নামেই উৎসর্গ করা।—আজ সে কোথায় আছে কোনো সংবাদ নেই। নিজের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় সে মঞ্চ থেকে আত্মলোপ করেছে......সে আজ কতদিন হ'লো! আত্মসম্মান আর পারস্পরিক কল্যাণবোধকে সে ভালোবাসার উপরে ঠাঁই দিয়েছে। মর্মে মর্মে দগ্ধ হয়ে তার মৃত্যু ঘটবে, বরং সেও ভালো—কিন্তু নিজের অস্তিত্ব ঘোষণার জন্য সে চীৎকার ক'রে এগিয়ে আসবে না। আত্মগোপন করবে সে করুণ বেদনায়, কিন্তু আত্মপ্রকাশ ক'রে সে দুঃখ দিতে চাইবে না। তাই মন্দিরের নাম পদ্মাসনা বটে—ভিতরে কোনো দেবীমূর্তি নেই। অপর কোনো মূর্তিই সেখানে মানাবে না।

আলোটা নিবিয়ে শোবার আয়োজন করতে গিয়ে সহসা একখানা চিঠি তার চোখে পড়লো। চিঠিখানা হাতে নিয়েই সে বুঝতে পারলো এ চিঠি কার। উপরে ডাকের ছাপ নেই, খামখানা রঙীন, সুগন্ধী। মেয়েলী হাতের ছোট ছোট সযত্ন ইংরাজী হরফ। চিঠিখানা খুলে বীরেশ পড়তে লাগলো।

"প্রিয়,

চিঠিখানা গোপন। পাছে আর কারো হাতে পড়ে তাই লোক মারফত পাঠাচ্ছি। আজ কয়েকদিন আমি শয্যাগত, নইলে নিজেই গিয়ে তোমাকে ধরে আনতুম। ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। মিঃ সেনের বদলি হওয়াটা স্থগিত ছিল, কিন্তু সরকারী প্রস্তাব আবার এসেছে। হয়ত শীঘ্রই আমাদের দেবীপুর ছেড়ে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে একটা অতিশয় বিবাদ আছে, দেখা হ'লে বলব। তোমার লেখাপড়ার ব্যাপারটা আমি সেরে দিতে চাই, আর দেরী কেন? দেবীপুর সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আছে, তুমি এলে সে আলোচনা করা যাবে।

এমন ভাগ্য আমার নয় যে, না ডাকলে তোমার দেখা পাবো। অনাহূত চিঠি তোমার আসবে সে কল্পনাও আমি করি নে—সুতরাং তোমার ওপর রাগ ক'রে তোমারই পায়ের কাছে হাত বাড়ালুম। ইতি,

বিড়ম্বিতা

অনুশীলা"

চিঠিখানা বন্ধ ক'রে চোখ বুজে বীরেশ বিছানায় প'ড়ে রইলো। তার অবসাদ আর চিত্তবিকারকে একটা প্রবল নাড়ায় আন্দোলিত ক'রে এই চিঠিখানা যেন তাকে আবার সজাগ ক'রে তুললো। রাত্রে আজ আর ঘুম হবে না।

নয়

দেবীপুরের ঘাটে এসে নামতে প্রায় দশটা বাজলো। ছুটি তার পাওনাই ছিল, এখন সে নিজের ছুটি নিজেই মঞ্জুর ক'রে এলো। গত তিন চার বছরে বেশীদিনের জন্য নবনগর ত্যাগ ক'রে বাইরে থাকা সম্ভব ছিল না। এখন আর সে অবস্থা নেই; কিছুকাল গায়ে হাওয়া লাগালে কোথাও অসুবিধা ঘটবে না। সেক্রেটারী, ম্যানেজার এবং আর কয়েকজন কর্মচারীকে নিয়ে ললিত কাজ চালাতে পারবে। যন্ত্রটা এখন তার অন্তর্নিহিত তেজেই প্রাণশক্তি উদ্ভাবন করবে, কেবল সেটাকে সক্রিয় রাখার জন্য তেল যোগালেই চলবে। আর কোনো ভয় নেই।

নিজের বজরা ক'রেই বীরেশ ঘাটে এসে নামলো। কোনো কারণ নেই, তবু তার মনে যেন কয়েকটা তরঙ্গের আলোড়ন জাগতে লাগলো। এখানে তার আসন গৌরবের—গ্লানির নয়—তার কীর্তিকলাপের যশ কেবলমাত্র বিরোধী দলের চক্রান্তে চাপা পড়লেও সামান্য ফুৎকারেই জানা যায়, সে-যশ

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো। তবু শঙ্কায়, সন্দেহে, আর একটা অজানা দুর্ভাবনায় সমগ্র দেবীপুরটাই যেন তার কাছে একটা সমস্যার মতোই হয়ে রয়েছে। বেদনার কাহিনী এখানে যত বড়ই হোক, আনন্দের স্মৃতিও কম নয়। যার সহায়তায় তার কর্মজীবন গ'ড়ে উঠেছে সেই নারীর কাছে তার কৃতজ্ঞতা হিমালয়ের মতোই বিরাট, একদিন তারই ইচ্ছা অনিচ্ছায় তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল—এ সবই সত্য, কিন্তু সেই ঋণ শোধ করার দিন তার ঘনিয়ে এসেছে। দিনে দিনে সেই নারীর সঙ্গে তার এমন একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে, যেটা সমস্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বাইরে। সেটাকে নির্ভুল ভাবে বিচার ক'রে দেখার মতো সাহস ও শক্তি তার হয়নি, সেই কারণে বারে বারে ওটাকে এড়িয়ে গিয়েই স্বস্তিলাভ করেছে, ওটাকে নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করতেও সে কুণ্ঠিত হয়েছে। আজ দেবীপুরে পদার্পণ ক'রে সেই চিন্তাটাই তাকে আচ্ছন্ন করলো।

আবার কোনো নূতন সমস্যার সূচনা অথবা কোনো অনির্দিষ্ট পরিণামের সঙ্কেত,—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তার পা দুখানাও যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে এলো।

ঘাট থেকে একজন লোক তার সুটকেশ ও বিছানা ব'য়ে নিয়ে এলো। কাঁচা রাস্তাটাকে পাকা করার জন্যে সেই সে-বছরে একটা চেষ্টা হয়েছিল। রাস্তাটা কাটাই আছে, কিন্তু পাকা হয়নি। সেই উঁচু-নীচু ভাঙ্গাচোরা পথ ধ'রে বীরেশ সটান এসে অনিল সেনের বাংলোর কাছে দাঁড়ালো। কুকুরটা তাকে দেখে দৌড়তে দৌড়তে এসে ল্যাজ নেড়ে গা ঘ'ষে অভ্যর্থনা জানালো। বীরেশ হেঁট হয়ে তার পিঠ চাপড়ে বললে, গায়ের গন্ধে ঠিক বুঝতে পেরেছিস দেখছি।

কুকুরটা আবার তীরবেগে বাংলোর দিকে ফিরে ছুটলো। ভিতর থেকে হাকিমের বেয়ারা আর বরকন্দাজ হাসিমুখে বেরিয়ে এসে দীর্ঘ সেলাম জানালো। তারপর নৌকার লোকের কাছ থেকে ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে ভিতরে চললো। বীরেশ ভিতরে যাবার আগে বললে, ওরে কাল তুই একবার খবর নিয়ে যাস—হয়ত আমি ফিরে যেতে পারি।

লোকটা করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে আবার ঘাটের পথ ধ'রে চ'লে গেল। বীরেশের দাঁড়াবার সময় নেই। চিঠিখানা পেয়ে তার উদ্বেগ ছিল যথেষ্ট, সে তাড়াতাড়ি গিয়ে অনুশীলার ঘরে ঢুকলো।

দুর্বল শরীরটাকে একটু ছড়িয়ে অনুশীলা একখানা ইজিচেয়ারে বসেছিল। হাতে তার একখানা পশমের কাজ কিন্তু রুগ্ণদেহের ক্লান্তিতে সেলাইটা হাতের মধ্যেই রেখে সে চোখ বুজেছিল, সহসা জুতোর মস্ মস্ শব্দে সে চোখ মেলে তাকালো।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে বীরেশ কাছে এলো। বললে, এসব কী লিখেছ? কী হয়েছে তোমার, অনু?

অনুশীলা একটু চঞ্চল হয়ে উঠতে গেল। বীরেশ বললে, থাক্, থাক্, এই যে—এই চেয়ারে বসছি। কী অসুখ করেছিল তোমার শুনি?

একটু হেসে অনুশীলা বললে, শোনবার মতন অসুখ যদি না হয়ে থাকে?

না, না—ওসব কথা শুনবো না। পনেরো দিন ধ'রে ভুগছো অথচ আমাকে জানাওনি। কী অসুখ? কেবল জ্বরই ত', না আর কিছু?

অনুশীলা বললে, জরা!

থামো। আমরা সব বুড়ো হ'তে চললুম, মাথার চুল পাকলো,—আর তোমার হবে জরা?

পুরুষেরা ত' বুড়ো হয় না, তারা বড় হয়।

বুড়ো হয় বুঝি মেয়েরা? বেশ বলছ যা হোক। কই হাকিম বুঝি আদালতে? বাঃ স্ত্রীর অসুখের জন্যে বুঝি মাসখানেক ছুটিও নিতে নেই!—বীরেশ উদ্দীপ্ত হয়ে অনুশীলাকে উৎসাহিত করতে লাগলো।

অনুশীলা তার কোট-প্যান্ট-টুপি নেক্‌টাইর দিয়ে চেয়ে চেয়ে একসময় মুখ টিপে বললে, এবার কী ব'লে ডাকবো? চৌধুরীসাহেব?

হাসিমুখে বীরেশ বললে, সে ত' সবাই বলে!

আমিও ত' তাদের মধ্যে একজন। পায়ে ধ'রে না ডাকলে যে খোঁজখবর নেয় না, তাকে ত' খাতির ক'রেই চলা উচিত মিস্টার চৌধুরী!

বীরেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, তুমি ত' জানো আমি কত ঋণী তোমার কাছে। অনেক সময় নিজের আগ্রহে খোঁজ-খবর নিতে ইচ্ছে হ'লেও আমাকে চুপ ক'রে থাকতে হয়!…আচ্ছা থাক্, তোমার চিকিৎসার কথা একটু বলো।—কী কাহিল তুমি হয়ে গেছ, বুঝতে পারো?

অনুশীলা হেসে বললে, কাহিল হতেই চাইছিলুম। প্রাণ-পদার্থ একটু কমলে হয়ত এ যাত্রা বাঁচতে পারি।

কেন?

বুঝতে দেরি লাগে কেন? তপস্যা করলে তবেই শরীরটা একটু হাল্‌কা হয়!

বীরেশ একবার তার মুখের দিকে তাকালো, তারপর উচ্চকণ্ঠে হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললে, যাক্ বাঁচলুম। অসুখটা তাহ'লে মনে? তাহ'লে সারতে দেরি লাগবে না!

অনুশীলাও হাসলো, কিন্তু আগেকার মতো সে হাসিতে জ্যোতির্ময়

উচ্ছলতা নেই,—কেমন যেন ক্লান্তির। বললে, কি জানি, হয়ত মনেরই অসুখ। মনের অসুখ যদি হয়, মনের মতন ওষুধ না হ'লে ত' আর সারবে না। তুমি ত' আর তার সন্ধান দিতে পারো না!

বীরেশ বললে, অমন অসুখ হওয়াটাও ত' বিচিত্র! তুমি দুঃখের মধ্যে নেই, অভাবগ্রস্ত নও, তুমি কোথাও ব্যর্থ হওনি, আশাভঙ্গের মনস্তাপ নেই—হাসিমুখে সে বললে, তোমার ত' কোনো অসুখই হবার কথা নয়, অনু।

অনুশীলা তার দুই চোখ নত করে' ধীরে ধীরে পশমের সেলাইটা দুই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। কথাটা শুনে সে সুখী হয়নি, বেশ বোঝা গেল। প্রচ্ছন্ন একটা অভিমান তার মুখের উপর কেমন যেন মেঘের ছায়া বিস্তার ক'রে রইলো। বীরেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল।

তোমার চিকিৎসার ভার কার ওপর দিয়েছ?

অনুশীলা মৃদু নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, সিভিল সার্জন এসেছিলেন, তাঁর ওষুধ কল্‌কাতা থেকে আনা হ'লো, তাই চলছে।

কী বলেন তিনি?

স্নায়ুতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা। অবশ্য বলেছেন, ভয়ের কারণ নেই।

বীরেশ বললে, দুর্ভাবনার কোনো কারণ আছে?

অনুশীলা এবার হাসলো। বললে, সে-কথা তিনি কিছু বলেননি বটে, তবে আমি জানি,—আছে।

অর্থাৎ?

তুমি ত' সে-কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত নও!

বীরেশ একটু থতিয়ে বললে, আক্রমণ করছ কেন অনু?

অনুশীলা বললে, এইটেই আমার রোগ।—ব'লে সে থেমে গেল।

বীরেশ পুনরায় বললে, আমার মনে হয়, অনেকদিন এই পল্লীগ্রামে থাকার ফলে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। তোমার জায়গা বদল করা দরকার।

হঠাৎ অনুশীলার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হ'য়ে উঠলো। বললে, এবার আমি দেশছাড়া হই, এই বোধহয় তুমি চাও?

বীরেশ স্তব্ধ চোখে তার দিকে তাকালো।

অনুশীলা বললে, কোনো কাজ তোমার বাকি নেই, সুযোগ-সুবিধে সব তুমি পেয়ে গেছ। ওপরে উঠতে পেরেছ বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে। এখন অনিল সেন আর তার স্ত্রীকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে খুবই সুবিধে। সাক্ষীসাবুদ আর কোথাও রইলো না। মই বেয়ে ওপরে উঠে সিঁড়িটাতে পা দিয়ে সবাই ফেলে দিতে চায়।

আমার সম্বন্ধে এই কি তোমার ধারণা অনু ?

এর চেয়েও খারাপ ধারণা মিস্টার চৌধুরী !

কিন্তু তোমাদের প্রতি আমি ত' স্বপ্নেও কোনো অবিচার করিনি !

অবিচার করলে খুশী হতুম, কারণ তা নিয়ে বিবাদ করা চলতো। তুমি উপেক্ষা করেছ।

কোনো চাঞ্চল্য বীরেশ প্রকাশ করলো না। কেবল বললে, উপেক্ষা তোমাদের করার সাধ্য আমার নেই। ইষ্টমন্ত্র থাকে মনে মনে, সেটা চীৎকার ক'রে সবাইকে জানানোটা অশাস্ত্রীয়।

তোমার আচরণে তা প্রকাশ পায় না, বীরেশ।

যদি আমার আচরণে সে কথা এতদিন প্রকাশ না পেয়ে থাকে তবে আমার মাথার মুকুট তুমি খুলে নাও !···

অনুশীলা চুপ ক'রে রইলো। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, হয়ত এবারের এই দেখাশোনাই শেষ এমন হ'তে পারে, তোমাদের শান্তিভঙ্গ করতে আর কোনোদিন আসবো না। আমাদের এখান থেকে বদলি করার জন্য বার বার তাগিদ আসছে। আমি সেইজন্যেই বলেছিলুম,—কিন্তু তুমি একবারও এসে দাঁড়ালে না।

বীরেশ বললে, বদলি যদি করে, তোমাদের ত' যেতেই হবে! সরকারী চাকরীর এই ত' ব্যবস্থা।

না, আমি যেতুম না, যাবার ইচ্ছে ছিল না—অনুশীলা বললে, দেবীপুর ছেড়ে যাবো এমন কল্পনা কোনোদিন করিনি। সরকারী চাকরিতে বদলি হয়ে বেড়াতে হয় জানি, কিন্তু মনে করেছিলুম দেবীপুরে একটা স্থায়ী বাসা বেঁধে রাখবো। এ গ্রামের জন্য আমরা অনেক পরিশ্রম করেছি।

বীরেশ বললে, এ গ্রামে যদি জায়গা না থাকে ?

অনুশীলা তার অনুযোগের আসল কাহিনী বিস্তার ক'রে বললে, এটা পুরুষের কথা নয়, নিরাশার কথা। নবনগর সৃষ্টি ক'রে তুমি খুশী, দেবীপুর তোমার কাছে অবহেলার বস্তু। এতেই বোঝা যায় তুমি এর আত্মীয় নও, প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্য হিসেবে তুমি একে ব্যবহার করতে চেয়েছিলে,—কিন্তু আমল পাওনি। আজ প্রায় সাত বছর হ'তে চললো, তুমি নবনগরে গিয়েছ, কিন্তু আমি ব'সে আছি এই গ্রামকে নিয়ে—যেমন মা ব'সে থাকে রুগ্‌ণ সন্তানকে কোলে ক'রে। সেদিন তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি, মিস্টার চৌধুরী। আমি মনে করেছিলুম, নবনগর হবে তোমার হাতের অস্ত্র, সেই অস্ত্রের শক্তিতে তুমি এসে এই গ্রামকে অধিকার করবে, আমার পরাজয়ের জ্বালা

জুড়োবে। কিন্তু তুমি আসোনি, এক উন্নতি থেকে আর এক উন্নতিতে তুমি লাফিয়ে উঠেছ; আর আমি নীচের তলায় হা প্রত্যাশায় ব'সে আছি। তোমার মুকুট খুলে নেবার দরকার আমার নেই—কিন্তু যাবার সময় আমি জানিয়ে যাচ্ছি, তুমি সার্থক হওনি, তোমার সেই পরাজয়ের প্রতিকার আজও হয়নি। —এই ব'লে সে পশমের সেলাইটা রেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ধীরে ধীরে আলমারী থেকে একখানা দলিল বার ক'রে নিয়ে এলো।

বীরেশ বললে,—কী ওটা?

এটা রেজেস্টারী করা তোমার নামে। নবনগরের জমি আমার নামে ইজারা নেওয়া ছিল, এখন তোমার নামে উনি ক'রে দিয়েছেন··।

স্তব্ধ হয়ে বীরেশ তার দিকে তাকালো। তারপর বললে, তুমি কি কোনো সম্পর্কই রাখতে চাও না।

অল্প পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় অনুশীলা হাঁপিয়ে উঠেছিল। উত্তর দিতে গিয়ে তার গলার আওয়াজ কেঁপে উঠলো।···বললে, ছোড়দাকে এনেছিলুম তোমার কাছে।···একটা অনুরোধ রইলো···সে যেন জলে না পড়ে।···তোমার হাতে তার ভবিষ্যতের ভার রইলো।

ইজিচেয়ারে ব'সে অনুশীলা আবার গা এলিয়ে দিল। এমন চেহারায় এর আগে তাকে দেখা যায়নি। আগে তার প্রাণের উত্তাপ ফুটতো চোখে মুখে, উত্তেজনায় দুই গালের উপর রক্তাভাস জাগতো। চোখে ছিল চঞ্চলতা, ভঙ্গিতে পুরুষের বুকের রক্ত আলোড়িত হ'তে পারতো। কিন্তু আজকে আর সেই বসন্ত সমারোহ যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অশোক আর পলাশের রঙ নিংড়ে গেরুয়া উঠেছে অনুশীলার অঙ্গে, মন্দারের মালা নেই গলায়—তার বদলে রুদ্রাক্ষের লহরী। একদিন তার আনন্দের বন্যায় দুকূল আকুল হ'তে পারতো, কিন্তু আজ যেন এই বৈরাগিনী বৈশাখের শুষ্ক নদীর চড়ায় ব'সে ভৈরবের মন্ত্র জপছে। একদিন দীপমালা জ্বালিয়ে উৎসব করতে বসেছিল, আজ যেন আগুন জ্বালিয়ে চারিদিকে সে দগ্ধ করতে বসে।··অনুশীলাকে আজ বড় বিচিত্র মনে হ'লো।

বীরেশ বললে, তুমি কি এই জন্যেই আমাকে চিঠি লিখে ডেকেছিলে?

অনুশীলা বললে, এইজন্যে না ডাকলে তুমি ত' আসতে না?

বীরেশের কণ্ঠস্বর এবার কাঁপলো। বললে, তুমি যদি চ'লে যাও—তবে দেবীপুরে আর ত' কোনো আকর্ষণ থাকতে পারে না, অনুশীলা?

রোগা মুখের রক্তাভাস তখনো অনুশীলার মুখ থেকে একেবারে মিলোয়নি। ম্লান হাসি হেসে সে কেবল বললে, যদি বদলি করে, যেতে হবেই। দেবীপুরের

কিছু ক'রে যেতে পারলুম না এই দুঃখ রইলো। আমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয়ে গেল।

কিন্তু তার সময় ত' এখনো যায়নি!

আমরা থাকতে হ'তে পারলো না!

বীরেশ বললে, বেশ ত', তোমার স্থায়ী বাস এখানে বেঁধে দিচ্ছি—তুমি থাকো। যতদিন তোমার প্রতিজ্ঞা সার্থক না হয় ততদিন—

বাধা দিয়ে অনুশীলা বললে, ছেলেমানুষী প্রস্তাব! স্বামী যাবেন অন্যত্র, আর আমি থাকবো এই পাড়াগাঁয়ের এককোণে ঘর বেঁধে।—হেসে সে বললে, কী ভাগ্যি, আর কিছু বলোনি!

বেশ, তা হ'লে চলো সবাই যাই নবনগরে। একদিন আবার ফিরে এসে এই দেবীপুর অধিকার করবো। এখানে কতকগুলো জটিল ব্যাপার আছে, সেগুলোরও ত' একটা প্রতিকার হওয়া দরকার!

অনুশীলা বললে, মিস্টার সেন রাজী হবেন কেন? স্ত্রীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু কাছছাড়া তিনি নাও করতে পারেন!

বীরেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। স্ত্রী স্বামীর কাছছাড়া হয়ে থাকবে এ প্রস্তাব সে করেনি।—সে বললে, একদিন তোমারই সাহায্যে পাহাড় আর জঙ্গল কাটতে গিয়েছিলুম। তোমারই জন্য নবনগরের সৃষ্টি, তোমারই টাকায় তার পত্তন। আমি ক্ষমতার ভক্ত সন্দেহ নেই—আর এও সত্যি যে, আমার কাছে দেবীপুর আর নবনগর একই কথা। দেশকে ভালোবাসার মানে যদি হয় দেবীপুরের মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকা, তবে আমি অবশ্যই দেশদ্রোহী। প্রত্যেকের উন্নতি হ'লেই দেশের উন্নতি—এই আমি মনে করি। দেবীপুরে আমার জায়গা হয়নি, দেবীপুরের উন্নতি আমি করতে পারিনি, তার জন্যে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নেই—আমি নিজের কল্পনাকে অনেকটা প্রকাশ করতে পেরেছি নবনগরে; সেই আমার দেশ। কিন্তু আজ যদি তুমি মনে করো আমি ব্যর্থ হয়েছি, তাহ'লে আমি নবনগর ত্যাগ ক'রে চলে এসে নিঃসম্বল হয়ে এই গ্রামে এসে দাঁড়াতে প্রস্তুত। আবার আমি চেষ্টা করতে পারি, যুদ্ধ করতে পারি—আবার আমি নতুন ক'রে কাজের কথা ভাবতে পারি। তোমার হাতে আমার ভাগ্য তৈরী হ'লো, অথচ তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবে—এই অভিসম্পাত কিছুতেই সইতে পারবো না!···তুমি সব ফিরিয়ে নাও!

বক্তৃতা সে দিয়ে চলেছে, কিন্তু শ্রোত্রীর অন্যমনস্কতা সে লক্ষ্য করেনি। অনুশীলার উৎসুক দুই চোখ ছিল তার দিকে। আজ অনেককাল পরে পাওয়া

বীরেশের এই সান্নিধ্য। শরীর অসুস্থ, কিন্তু অনুশীলার উদগ্র তৃষিত মন যেন আজকের এই সান্নিধ্যটুকুকে একান্ত বাসনায় অন্তরে অন্তরে লেহন করছে। বিবাদ বিতর্কের অন্তরালে নারীর মন পরিপ্লাবিত হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধায় আর স্নেহের রসে। একসময়ে মোহ-সঞ্চারিত চক্ষু সে বীরেশের মুখের উপর থেকে নামিয়ে নিল।

পাচক এসে একবার খবর দিয়ে গেল, আহার প্রস্তুত, কিন্তু অতিথিকে সমাদর করবার উদ্বেগ অনুশীলার দেখা গেল না। সর্বপ্রকার অভিমান আর চিত্তবিক্ষোভের অন্তরাল থেকে অনুশীলা যেন চুপি চুপি দেখতে লাগলো শীতের অবসন্ন জড়তার উপর দিয়ে মৃদু পদভরে ঋতুরাজ আজ আবির্ভূত হ'লো তার উত্তরীয় উড়িয়ে। চিঠিতে সে যাকে 'প্রিয়' ব'লে সম্বোধন করেছে, সে কোনো প্রকারে সেই সম্বোধনের অযোগ্য নয়। চোখে, মুখে, ভঙ্গিতে, ব্যবহারে কোথাও কৃত্রিমতার বিন্দুমাত্রও সঙ্কেত নেই। নবনগর ত্যাগ ক'রে আজ আবার নিঃসম্বল হয়ে সে এই গ্রামে এসে দাঁড়াতে পারে—এই কথায় তার কোথাও মিথ্যা আস্ফালন অথবা ক্ষণ-উত্তেজনার মনোবিকার নেই, সত্যের তেজ আর অন্তরের ওজঃশক্তিতে তার প্রত্যেকটি উক্তি মর্মমূলকে বিদ্ধ করে। প্রশস্ত কপাল তার আজো ভ্রূরেখাহীন, দুই চোখে প্রতিভার সেই প্রগাঢ় গভীর ছায়া, মুখে কোথাও অন্তিম যৌবনের একটিও রেখাপাত নেই—তারুণ্যের গর্ব আজো সে করতে পারে। অনুশীলার মনে পড়লো নিজের কথা। সে যে এই শূন্য দেবীপুরের মাঠের মাঝখানে নিঃশব্দ তপস্যায় ব'সে ব'সে শ্রান্ত অধীর হয়ে উঠেছে—এ কথা কিছুতেই যেন গোপন রাখা চলছে না। শরীর তার সুস্থ নয়, মনের উপরে আলস্য ও ক্লান্তির ছায়া,—কিন্তু তবু, এতদিন পরে যাকে একান্ত কাছে পাওয়া গেল, তারই যোগ্য সমাদর করতে তার মন ক্ষণে ক্ষণে যে লালায়িত হয়ে উঠেছে, এও ত' সেই চিরকালীন রহস্য!...ভয় নেই তার মনে, লজ্জা নেই নিজের আচরণে,—একথা সে জানে অহেতুক দুর্নীতির চোরাবালির উপর তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে নেই। স্বামী তার বর্তমান, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আজো অটুট, আজো স্বামীর তুচ্ছতম ভালোমন্দ আর সুখদুঃখ তার প্রাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়ানো,—তবু বীরেশের সঙ্গে তার বন্ধন ঠিক এই। এর বেশী নয়, এর কম নয়,—এর নিচের তলায় আত্ম-প্রবঞ্চনা লুকিয়ে রেখে উপরতলায় মধুর আবরণ দিয়ে স্বামীকে সে প্রতারিত করতে চায় না।

একটা চাপা ছোট নিশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সচেতন হয়ে উঠলো। তার অসংবৃত কল্পনা যে কতদূর এগিয়ে গেছে নিজেও সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে আবার একটু হাসলো! বললে, ফিরিয়ে নেবার অধিকার আমার কই?

কিছু টাকা অবশ্য গোড়ায় আমি দিয়েছিলুম। সুদে আসলে সে টাকা ফেরতও পেয়েছি। এখন ত' সবই তোমার।

বীরেশ বললে, আমি তোমাদের প্রতারণা ক'রে এসেছি এই বদনামই বা কেন সইবো, অনুশীলা?

রজনীর কথাটা অনুশীলার মনে পড়লো। কী যেন একটা কথা তার মুখের আগায় এসেছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে সে বললে, প্রতারণা যদি কেউ করে তার প্রতিবিধান করতে যাবো না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি, সেইটিই আসল কথা। তুমি যদি আমাকে মনে মনে ঠকাও, সেটা আমার কাছে খুব বড় নয়।

বীরেশ বললে, তোমার এই কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এতক্ষণ অনেক কথা কাটাকাটি করা গেল, কিন্তু মনে হচ্ছে প্রকৃত ব্যাপারটা তুমি এখনো খুলে বলোনি।

অনুশীলা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। বললে, চলো, খাবার দিয়েছে ওরা। আমার এখন খাওয়া নিষেধ, তোমার কাছে বসবো, চলো।

ওঠবার লক্ষণ বীরেশের দেখা গেল না। সে যেন ঈষৎ অভিমানের স্বরে বললে, খাওয়াটা বড় কথা নয়, অনুশীলা। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমাদের সকলের মনে যদি কোনো মালিন্য স্পর্শ করে তাহ'লে তার চেয়ে আর শোচনীয় কিছু হ'তে পারে না। যতক্ষণ না জানতে পারবো তুমি সেই আগেকার মতনই আছো, ততক্ষণ আমার মনে স্বস্তি নেই। অনেক খেয়েছি তোমার এখানে দু'দিন যদি না খাই ত' ক্ষতি নেই। তোমাকে দেখে যেতে পারলুম এই অনেক। পৃথিবীতে নকল বস্তুর আদর অনেক বেশি, মুখোশ না পরলে মানুষের সমাজে ঠাঁই নেই, তোমার সাধুতা যদি কোনো কারণে মার খায় তাহ'লে আমাকে ক্ষমা করো।

বীরেশ লক্ষ্য করেনি তার দুটি মাত্র কথায় অনুশীলার আয়ত দুটি চোখ কেটে জল এসে পড়েছে। সেই অশ্রু চাপতে না পেরে অনুশীলা তার দুর্বল দেহ টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বীরেশ ব'সে রইলো তার পথের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে।

কতক্ষণ ব'সে রইলো কী ভাবনায়, তার নিজেরই যেন চেতনা নেই। এক সময় পাচক আবার তাকে ডাকতে এলো। বীরেশ প্রশ্ন করলো, মা কোথায় রে?

পাচক বললে, মা টেবিলে ব'সে আছেন।

সাহেব আজ কখন বেরিয়েছেন?

সাহেব? তিনি ত' দু'দিন বাড়ি নেই।

কোথায় গেছেন ?

তিনি গেছেন সদরে। আজ আসবার কথা।

ওঃ তাই নাকি ?—গা ঝাড়া দিয়ে বীরেশ উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু একটা কথা তার মনে প'ড়ে গেল! অনুশীলা তাকে চিঠি পাঠিয়েছিল, অনিলের অনুপস্থিতিতে। সমস্ত ব্যাপারটার গতি কোন্ দিকে একথা মনে করতেই বীরেশের পা দুটো যেন অবশ হয়ে এলো। তার জন্য এই পরিবারে যদি কোনো চিত্ত-বিপর্যয় ঘটে তবে সে বড় শোচনীয়। সে কী করবে, কী ভাবে চলবে, কেমন ক'রে সমস্ত ব্যাপারটার সমন্বয় ঘটাবে—এই সমস্যায় সে যেন সহসা দিশাহারার মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো।

খাবার টেবিলের কাছে এসে সে অনুশীলার পাশেই ব'সে পড়লো। আশপাশে ঠাকুর, চাকর, এরা সব রয়েছে। যদি কারো কাছে কোনো সংশয় প্রকাশ পায় তবে লজ্জায় মাথা হেঁট হবে। অথচ আবহাওয়াটা যে একটা হৃদয়ের আলোড়নে আর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ভারাক্রান্ত, এও হয়ত ওদের কাছে অজানা নেই। বীরেশ কণ্টকিত হয়ে উঠলো। আজ অনুশীলা সত্যই যদি সতর্ক না হয় তাহ'লে হয়ত এ বাড়িতে তার এই শেষ আবির্ভাব।···সে পুরুষ, নারীর সম্ভ্রমরক্ষার ভার তারই হাতে।

কই, তুমি ত' বলোনি যে, মিস্টার সেন দু'দিন বাড়ি নেই ?

রাঙা দুই চোখ ফিরিয়ে অনুশীলা বললে, আজ হয়ত আসতে পারেন।

তোমার চোখে জল কেন অনুশীলা ?

অনুশীলা বললে, মেয়েদের চোখের জল ত' তোমার ভালোই লাগে।

বীরেশ এবার হেসে উঠলো—সকালবেলা যে আজ কার মুখ দেখে উঠেছি ঠিক নেই। দেবী আজ কিছুতেই প্রসন্ন হচ্ছেন না। কই, আমার জন্যে কারো চোখে জল পড়েছে, মনে ত' পড়ে না।

ভেবে দেখো দেখি।

ভেবে দেখতে হবে কেন ? চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে অবশ্য আশান্বিত হবারই কথা। এর বেশী ভাববার ত' কিছু নেই।

মুখ তুলে অনুশীলা বললে, তুমি নির্দয় নয় জানি, কিন্তু তোমার নির্দয়তা কখন যে কী ভাবে প্রকাশ পায় তা তুমিও জানো না।

খেতে খেতে বীরেশ হেসে বললে, পৃথিবীর সব মেয়েই ত' পুরুষকে চিরকাল নির্দয় ব'লে এসেছে। নতুন ত' নয়।

নতুন নয়, অতি প্রাচীন! তোমরা যে চিরদিনই মেয়েদের ভুলিয়ে অনাচার ক'রে এসেছো, ঠিক তারই মতো প্রাচীন।

বীরেশ বললে, আমাদের ত' দাঁড়াবার সময় নেই, আমরা এগিয়ে চলি। পুরুষ মানুষ পিছন দিকে চাইলে আর সে অগ্রসর হ'তে পারে না। পৃথিবী সৃষ্টির ভার তাদের হাতে, দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের কেমন ক'রে চলবে? তুমিই ত' একদিন বলেছিলে, স্নেহ-মমতাটা হ'লো ধোঁয়ার মতন, সেই ধোঁয়া পথ ভোলায়।

অনুশীলা বললে, আর একটা কথা ছিল, সেদিন বলা হয়নি তোমাকে। স্নেহমমতার প্রশ্ন নয়, সেটা বিচারবুদ্ধির কথা। প্রতিভা যতই বড় হোক, সে জন্মায় মেয়েমানুষের কোলে। সুতরাং একটা ঋণ তার শোধ করতেই হয়, সেইটেই মনুষ্যত্ব। বাঙালীর ছেলেদের অবনতির মূলে অন্ধ মাতৃস্নেহ অনেকখানি কাজ করেছে জানি, কিন্তু পুরুষের কাজ হ'লো উঁচু আদর্শ আর মডেল সৃষ্টি ক'রে তোলা; তুমি তা করোনি বীরেশ, মেয়েমানুষের অবস্থা দেখে তোমার মমত্ববোধ জাগেনি, তাকে নির্মম ভাবে দূরে সরিয়ে দিয়ে তুমি নিজের পথ পরিষ্কার করেছ।

মুখ তুলে বীরেশ বললে, কি রকম?

অনুশীলা বললে, ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙালী মেয়েই সব চেয়ে দুর্বল। অন্য প্রদেশে অশিক্ষা আছে, কিন্তু এখানে অশিক্ষা আর রুগ্‌ণতা দুই-ই। এত দুর্বল আর এত নিরুপায় ব'লেই এরা পুরুষের কোঁচার খুঁট না ধ'রে এক পা চলতে পারে না। এদের খাওয়া নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, সাহস নেই—কিন্তু তুমি সেই দুর্গম দুর্দশা থেকে টেনে না তুলে জঞ্জালের মতো উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলে। এটা বীরত্ব অথবা প্রতিভার পথ নয়, এর মধ্যে অন্তর্নিহিত অপৌরুষ ভিন্ন আর কিছু নেই।

এতক্ষণে বীরেশ একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। বললে, এসব অভিযোগ তুমি কোথা থেকে তৈরী করলে, অনুশীলা?

অনুশীলার দুর্বল চেহারাও দপ্‌দপ্‌ করছিল। সে বললে, আগে তুমি খেয়ে নাও, তারপর জানাবো এ-অভিযোগ কেবল আমার সৃষ্টি নয়।

মানে?

তার মুখের দিকে চেয়ে অনুশীলা বললে, তোমার জীবনে কি এই ঘটনা নেই?

আমার জীবনে?—বীরেশ বললে, কই মনেও ত' পড়ে না। আশ্চর্য তোমার আবিষ্কার!

অনুশীলা বললে, তবে কেন তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে এসেছিলে?

স্ত্রী!...পলকের জন্য বীরেশ স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর মাথা নত ক'রে

সে যেমন খাচ্ছিল, ঠিক তেম্‌নি ভাবেই খেয়ে যেতে লাগলো। ভ্রূক্ষেপ করলো না।

কই, উত্তর দিচ্ছ না যে?

উত্তর দেবার কিছু নেই।

কেন, বিয়ে তুমি করোনি?

বীরেশ বললে, বিয়ে যদি ক'রে থাকি—স্ত্রীকে আমি জানিও নে, চিনিও নে।

কিন্তু বিয়ে ত' করেছিলে?

অনেকে তাই বলে বটে।—এই ব'লে নিশ্চিন্ত মনে সে খেয়ে যেতে লাগলো। তার মুখের চেহারায় লজ্জা ত' দূরের কথা, কেমন একটা কৌতুকের আভাসই দেখা যাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে।

যে-দাহটা দীর্ঘকাল ধ'রে অনুশীলার মনে রি রি করছিল, সেটাকে যে হাল্‌কা হাওয়ায় বীরেশ এমন ক'রে নিবিয়ে দেবে অনুশীলা কল্পনাও করেনি। বহুরাত্রির বিনিদ্র বেদনায় খণ্ড ক্ষুদ্র ইতিহাসগুলি তার মনে প'ড়ে গেল। নিজেকে সে এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছিল, বড় প্রতিভার সঙ্গে হয়ত জড়ানো থাকে ছোট ছোট ক্ষুদ্রতা ছোটখাটো দৈন্য। সেই প্রতিভা থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় জনসাধারণের চক্ষু এতই ধাঁধিয়ে থাকে যে, তার চিত্ত-দারিদ্র্যের ছোট ছোট কলঙ্কগুলি আর কারো চোখে পড়ে না। কিন্তু সেটা সান্ত্বনা মাত্র। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে কলঙ্কবিন্দুগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বড় প্রতিভাকে মহৎ মানুষ বলতে মুখে বাধে। এই কারণে অনুশীলা সান্ত্বনা পায়নি। বীরেশ যে তাকে এতকাল ধ'রে কেবল প্রতারণা ক'রে এসেছে সেই কারণেই তার বেদনা নয়, কিন্তু প্রতিভা ব'লে যাকে সে জেনে এসেছে, সে যে একজন একান্ত অনুরাগীর কাছে ছোট হয়ে গেল, এ জন্যেও তার নিভৃতে চোখের জল পড়েছিল।

অনুশীলা বললে, তোমাকে এত বিশ্বাস করি, কিন্তু এ কথাটা তুমি বলোনি কেন?

বীরেশ হেসে বললে, ভুলে গিয়েছিলুম।

বিয়ের কথা ভুলে গিয়েছিলে? তুমি বুঝি আজকাল ছেলে-ভুলিয়ে বেড়াও, বীরেশ?

আহারাদি শেষ ক'রে একটা বর্মা চুরুট ধরিয়ে বীরেশ বললে, তোমার কাছে আমার নিজের কোনো কথা গোপন করেছি এটা শোনাও আমার পক্ষে পাপ। কিন্তু মন দিয়ে শোনো, অনুশীলা—এ বিয়ে আমার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে ব'লেই এর কথা আমি ভুলে যাই। যদি আমি একথা নিয়ে নানা

জায়গায় অস্বীকারও ক'রে বেড়াই তাহ'লেও তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আজ আমি তার অস্তিত্বও স্বীকার করব না—মনে, প্রাণে, কল্পনায় কোথাও নয়। তুমি জেনে রেখো, সেটা ক'দিন আগেকার এক রাত্রির একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্ন,··· ঘুম ভাঙার পর সে-দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে গেছে, তার চেহারাও সঠিক স্মরণ নেই।

একটা সুদূর নিরাশার আভাসে বীরেশের কণ্ঠস্বর যেন সহসা শুকিয়ে উঠলো। সদ্য আহার শেষ করেছে সে, কিন্তু হঠাৎ অনুশীলার মনে হ'লো, বহু দিনকার উপবাসে সে যেন শীর্ণ; তার কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে যেন অঙ্গারের দগ্ধাবশেষ ভস্ম ধূলিরাশি বেরিয়ে এলো। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, এসো ঘরে যাই।

ঘরে এসে নিজে সে বসলো বিছানায়, আর বীরেশ বসলো তারই পরিত্যক্ত ইজিচেয়ারটায়। আগে অনুশীলা মনে করতো, বীরেশ এসে পড়েছে যেন একটা উল্কাপিণ্ডের মতো,—তার আসা আর যাওয়ার দুই দিকের পথই অন্ধকার। কিন্তু এ মানুষ যেন একটা বিস্তৃত মহানদ, কত দূর দূরান্তর থেকে এসেছে কত কাহিনী বুনে বুনে, কত পথ বেয়ে একে যেতে হবে কোন্ অকূলের দিকে,—পথের দুই ধারে রেখে যাবে কেবল বিবিধ কর্মজীবনের কত কাহিনী!

স্তব্ধ হয়ে দু'জনে কতক্ষণ ব'সে রইলো। এই নৈঃশব্দের দুই পারে যেন দুটি মনোজগৎ আপন আপন ভাঙা-গড়ার প্রহেলিকা সৃষ্টি ক'রে চলেছিল। চাকর এসে একসময় তাদের ঘরের পর্দা টেনে দিয়ে চ'লে গেল। শীতের অপরাহ্ণের বাতাস বাইরের গাছপালায় শর্ শর্ শব্দে ব'য়ে চলেছে। ক্লান্ত রৌদ্রে অজানা অনামা পাখীর কলকণ্ঠ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

মৃদুকণ্ঠে অনুশীলা বললে, প্রকাণ্ড একটা নালিশ তোমার বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু আজ আর নেই। তবু একটা কথা থেকে যায়, স্ত্রীকে তুমি নিলে না কেন? তার কি কোনো অপরাধ ছিল?

বিন্দুমাত্র না—বরং একটি দিন আড়াল থেকে তাঁর স্বভাবের দৃঢ়তাই আমি অনুভব করেছি। চোখে তাঁকে স্পষ্ট ক'রে দেখিনি, কিন্তু মনে পড়লে সম্মানবোধ আসে।

বিস্মিত অনুশীলা তার চোখের দিকে তাকালো। বলবে, তবে? কোথায় তিনি এখন?

চুরুট টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বীরেশ বললে, দশ বছর হ'লো খোঁজ পাইনি, খোঁজ করিও নি। আর তা ছাড়া···

উৎসুক আগ্রহে অনুশীলা প্রশ্ন করলো,—তা ছাড়া, কী?

হাসি এলো বীরেশের মুখে। বললে, রক্তের মধ্যে সেদিন যে উত্তাপ ছিল, আজ শেষ যৌবনে তার চিহ্নও খুঁজে পাইনে।

বিছানা থেকে ঝুঁকে অনুশীলা তার কাছে এগিয়ে এলো। বললে, সমস্তটা জটিল মনে হচ্ছে। সব খুলে তুমি বলো, বীরেশ।

বীরেশ বললে, তোমার আগ্রহ দেখে আমার হাসি পায়। স্ত্রী এবং বিবাহ—এ দুটোকেই আমি স্বীকার করিনি। এর কারণ হ'লো, বাবার আদেশ পালন ক'রে মাথায় আমি টোপর তুলেছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁর সঙ্গে মত ও আদর্শ বিরোধের জন্য আমি সমস্তই ত্যাগ ক'রে এসেছিলুম।

কিন্তু, এত বড় আদর্শবাদী হয়ে তুমি একটি নিরাপরাধ মেয়েকে অকূলে ভাসিয়ে দিলে? তুমি এত লোকের জীবন-মরণের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছ স্বেচ্ছায়,—আর যেখানে তোমার সত্যকার মনুষ্যত্বের পরীক্ষা, সেখানেই তুমি সব জলাঞ্জলি দিয়ে এলে?

বীরেশ বললে, তুমি মনে করেছ আমি অপরাধী। একবিন্দুও নয়। প্রাচীন মতবাদ শাসন করবে নব্য-জীবনযাত্রার ধারাকে, এত বড় দাসত্ব আমি স্বীকার করবো না। পল্লীগ্রামের একটি নিরাপরাধ মেয়ের জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে ওটা প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থার আর একটা বলি। বাবা আমাকে তৈরী করেছেন আধুনিক কালের প্রতিনিধি, আর আমার জীবনসঙ্গিনীকে তুলে আনবেন একটা পুরনো আমলের পরিবার আর সমাজ থেকে—এ অসম্ভব? আমি যখন অনেকদূর এগিয়ে গেছি, তখন আবার আমাকে গ্রাম্য সংস্কারের মধ্যে টানতে যাওয়া একটা অহেতুক বাতুলতা। এ কথার তুমি জবাব দাও অনুশীলা।

অনুশীলা বললে, তুমি তখন শিশু ছিলে না, মালা গলায় পরেছিলে!

হ্যাঁ পিতৃঋণ শোধ করেছি।

কিন্তু পরের কর্তব্য?

দশ বছরে দিনে দিনে সকল প্রকার কর্তব্যের মৃত্যু ঘটেছে। তোমাকে যে কোনো কথা বলিনি, সে কেবল এই কারণে।—বীরেশ বললে, ক্ষমা তোমার কাছে চাইবো না, অনুশীলা। পুরনো জীবনকে চিতায় তুলে দিয়ে চ'লে এসেছি নতুন জীবনে। আমার আপন নেই, আত্মীয় নেই, পিছন দিকে চাওয়া নেই,—জীবনের অন্দরমহলটায় তালাচাবি লাগিয়ে বাইরের ঘরটাই খুলে রেখেছি, এখানে পথের মানুষ নিয়ে আসুক পথের হাওয়া, বিশ্বের সংবাদ।

অনুশীলা বললে, আর কোনোদিন এ নিয়ে তোমার কাছে আলোচনা করবো না। কিন্তু একটা কথা জানতে চাই—যদি আমি কোনোদিক থেকে চেষ্টা করি তুমি কি রাজী হবে। আজ দশ বছর পরে তোমারও ত' মনের গতি অন্যদিকে ফিরতে পারে!

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বীরেশ তার দিকে তাকালো।

অনুশীলা বললে, আমাদের চ'লে যাবার সময় হ'লো। এতদিন পরে যাবার সময় যদি দেখে যাই,—তোমার কাছে দাঁড়াবার কেউ নেই, তাহ'লে চোখের আড়ালে গিয়ে ত' নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না।

বলো তোমার কী হুকুম?

আমার হুকুম ত' তুমি মানবে না। আমি যদি এ কথা বলি, আমি নিজে তোমার বাবার কাছে যাবো,—নিজে যাবো তাঁর কাছে, তোমারই জন্যে যিনি মাথায় সিঁদুর নিয়েছিলেন; আমি যাবো তোমার সেই অতীত জীবন আবিষ্কার করতে,—যে জীবনে তোমার শ্রী ছিল, ছন্দ ছিল,...তাহ'লে কি তুমি রাজী হবে?

বীরেশ বললে, না।

কেন?

যে বিচ্ছেদ প্রকৃত, তার সমাধান নেই। এ ত' আর ভুল বোঝাবুঝি নয়, মনোমালিন্যও নয়,—এ হ'লো সেই বিরোধ, যার জন্যে মানুষ যুগে যুগে ঘর ছেড়েছে; সেই বিপুল বিরোধের একটি নমুনা, যার জন্যে নতুন সভ্যতা আর নবযুগের সৃষ্টি। দুই নদীর মধ্যে সেই বিরোধ, যার জন্য তারা দুই শাখায় দুই পথে ব'য়ে যায়।...সে চেষ্টা করলে তুমি ব্যর্থ হবে, অনুশীলা।

অনুশীলার চোখে জল এসে পড়লো। রুদ্ধ উত্তপ্ত কণ্ঠে সে বললে, কিন্তু না করলে তুমিও যে ব্যর্থ হবে।

কোথায় ব্যর্থ হলুম?...বীরেশ বললে, সবাইকে নিজের কাছে টানতে গেলুম, সে কি ব্যর্থ হবো ব'লে? নিজের পরিবারকে হারিয়েছি, বাইরে এসে পেয়েছি বৃহৎ পরিবার। কোথায় পেতুম তোমাকে, কোথায় থাকতো ললিত আর মিস্টার সেন কোথায় পেতুম তাঁতীবৌকে? ব্যর্থ কিছু নয়, ব্যর্থ কিছু যায় না।

অনুশীলা বললে, দেবীপুর আর নবনগর তোমার ত' চরম সান্ত্বনা নয়!

না। কারণ, আরো চাই। ক্ষমতা থেকে ক্ষমতায়, নতুন থেকে নতুনে। নিজেকে পুড়িয়ে যদি আলো বিস্তার করতে পারি, মন্দ কি? নিজেকে নষ্ট ক'রে যদি আরো প্রকাণ্ড সৃষ্টির কাজে লাগি, সে-ই ত' সকলের সান্ত্বনা। বীরেশ বলতে লাগলো, শেষজীবনে স্নেহ, মোহ, বন্ধন নয়, বরং চাইছি একটা নির্দয় কর্মজীবন—যা যন্ত্রণায়, ঝঞ্ঝনায়, বিক্ষোভে, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে আমাকে আলোড়িত ক'রে রাখতে পারবে। শান্তি আমি চাই নে, আরাম আমার জন্যে নয়—দুঃখে আর দুর্গমে, নিরাশায় আর নির্যাতনে আমার নিত্যজীবন যেন তরঙ্গে তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হ'তে থাকে। তুমি এখান থেকে চ'লে যাবে, জানি

প্রথমে সইতে পারবো না, কিন্তু জানি এও একদিন সয়ে যাবে। তোমাকে সব ফিরিয়ে দিতে চাইছিলুম এ আমার মিথ্যে আস্ফালন নয়, কারণ সর্ব-প্রকারে মুক্তি না ঘটলে আর নতুন হাওয়া ঢুকবে না ভিতরে।—ভূগোলে দেখা যায়, শূন্যলোকে যেখানে বাতাস নেই, সেখানেই ঝড়ের বেগ বেশি। ভয়ানক গুমোটের পরেই বিপুল বর্ষণ।

অনুশীলা বললে, তুমি কি আবার অন্য কোথাও যাবে স্থির করেছ?

বীরেশ বললে, স্থির করিনি, কিন্তু সুবিধে পেলেই যাবো। নিজের শক্তিকে চিনতে দেরি লাগে, কিন্তু চিনতে পারলে আর ভয় নেই। মাথা তোলবার পথ আমি জানতে পেরেছি, ব্যর্থ যদি কোথাও হই—দুঃখ করবো না, বারে বারে সাফল্যের চেষ্টাই করবো। আর কিছু না হোক, মাথা হেঁট করে কাঁদতে বসবো না। তার সঙ্গে এও জানি, তোমার দেখা যদি আর কোনোদিন না পাই—নতুন কোনো অনুশীলা এসে দাঁড়াবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে। তোমাকে যদি সত্যকার আপন জেনে থাকি, তবে পৃথিবীর যে কোনো অনুশীলার মধ্যে খুঁজে পাবো। এই হ'লো আমার সব শেষের সান্ত্বনা।—এই ব'লে সে উঠে দাঁড়ালো।

বিছানা থেকে নেমে অনুশীলা বললে, কোথা যাও?

আজকের মতো যাই।

রুদ্ধ অশ্রু অনুশীলার দুই চোখ ভেঙে নামলো। বীরেশের হাতখানা কঠিন মুঠিতে ধ'রে সে বললে, তোমাকে কোথাও রেখে আমার স্বস্তি নেই, তা জানো?

ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে বীরেশ দাঁড়ালো। তারপর সস্নেহে অনুশীলাকে ধ'রে বিছানায় বসিয়ে বললে, রোগা শরীরে এ তোমার সইবে না, অনু। আমার নামে সব লিখে দিয়ে তুমিই ত' চ'লে যাচ্ছ, তবে আবার কান্না কেন?

দুই হাতে মুখ ঢেকে অনুশীলা বললে, না, কোথাও আমার যাবার ইচ্ছে নেই!…আমি ছাড়তে পারবো না তোমাকে, আমি ছাড়তে চাই নে অনিলকে। তুমি কেবল আমার চারিদিকে ঘিরে থাকো। যেখানেই যাও তুমি ডাক দিও আমাকে, সব ছেড়ে গিয়ে দাঁড়াবো তোমার পাশে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বীরেশ বললে, কিন্তু এসব কথা বলতে নেই যে অনুশীলা।

বলতে আছে, নিশ্চয় আছে, আজ সব মুখোশ খুলে পড়ুক। যা বলেছি এতক্ষণ সব মিছে, কোনো রাক্ষসীর হাতেই তোমাকে তুলে দিতে পারবো না।…আমি যাবো তোমার সঙ্গে, আমাকে নিয়ে চলো।

কোথায় যাবে?

যেখানে হোক, যে দেশে হোক। তোমার পালাবার সব পথ আমি আগলে থাকবো!—অনুশীলার আর্তস্বর যেন আর বাঁধ মানছিল না।

হাসিমুখে বীরেশ বললে, আচ্ছা যেয়ো, এখন একটু বিশ্রাম করো। রোগা শরীরকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছো। আচ্ছা, এই আমি আবার বসলুম। ছি, অমন ক'রে কাঁদতে নেই অনুশীলা।

অনুশীলা চোখের জল মুছে স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। কিন্তু বীরেশ পুনরায় ইজিচেয়ারে পা এলিয়ে ব'সে একবার চুরুটটা টানতেই বাইরে খট খট ক'রে কার যেন জুতোর শব্দ হ'লো। সজাগ ও সতর্ক হয়ে অনুশীলা একটু স'রে বসলো।

মিস্টার সেন ব'লেই মনে হ'লো। জুতোর গোড়ালির শব্দটা একবার যেন অন্য দিকে, কিন্তু সেদিক থেকে ঘুরে আবার স্পষ্ট হয়ে এইদিকেই আসতে লাগলো। বীরেশ সোজা হয়ে সহজ ভাবে ব'সে অনিলকে আজ নূতন ক'রে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হ'লো।

কিন্তু অভ্যাগত যিনি, তিনি আর যাই হোন, পুরুষ নন। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই বীরেশ সাগ্রহ দৃষ্টি তুলে হঠাৎ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো, —নলিনী! তার অসাড় দুইটি চোখ অপলক স্তব্ধতায় নিশ্চল হয়ে রইলো।

প্রায় দশ বছর পরে তাকে চিনতে হয়ত নলিনীর একটু দেরিই হয়ে থাকবে। কিন্তু আজ এইখানে ব'সে কয়েকটি অভাবনীয় মুহূর্তের বিমূঢ় দিবা-স্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে বীরেশ ঠিক বুঝতেই পারলো না তার শরীরের মধ্যে কী একটা আন্দোলন,—আনন্দে, না বিহ্বলতায়, না বেদনায়, না বিস্ময়ে, না ভয়ে —কোন্ বস্তুতে তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে এসেছে। অবশ দুই আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুরুটটা যে কখন প'ড়ে গেছে সে তা বুঝতেই পারলো না।

কি রে অনুশীলা, আজ কেমন মনে হচ্ছে ভাই শরীরটা?

এমনি, খুব ভালো নয়। এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,—ইনি—

নলিনী হেসে উঠলো। বললে, বেশ আছিস যা হোক।—ওকি, চিনতে বুঝি পারোনি? একেবারে সাহেব হয়ে গেছো মনে হচ্ছে।—এই ব'লে সে এগিয়ে এসে বীরেশের জুতোর দুই কোণ থেকে ধুলো তুলে নিয়ে মাথায় দিল।

ক্লিষ্টকণ্ঠে বীরেশ কী যেন বলতে গেল, কিন্তু কিছুতেই তার মুখ দিয়ে কথা ফুটলো না।

অভিভূত বিস্ময়ে অনুশীলা বললে, এর মানে?

মানে ছাই।—নলিনী বললে, আমরা যে উভয়ের আত্মীয় তা বুঝি জানিস নে? ওঁর বাবা আমার সম্পর্কে মেসোমশাই।

এতদিন বলিসনি কেন? এতদিন ধ'রে তোর সঙ্গে এত কথা হ'লো!— অপ্রতিভ মুখে অনুশীলা অভিযোগ জানালো।

কলকণ্ঠে নলিনী হেসে উঠলো। বললে কেমন ক'রে বলবো? বীরেশের সুখ্যাতিতে তুই এমনিই উন্মাদ যে বলবার সময়ও পাইনি। তা ছাড়া, রঙের গোলাম চেপে রাখলে খেলাটা ত' জমে ভালো।

গা এবং গলা ঝাড়া দিয়ে বীরেশ এইবার সাহস ক'রে প্রশ্ন করলে, কতদিন এদিকে এসেছ তুমি, নলিনী?

আমি?—মুখ ফিরিয়ে নলিনী আর একবার তাকে পলকের জন্য দেখে নিল। তারপর বললে, এসেছি খানপুরে মাসিমার বাবার ওখানে। তা' প্রায় মাস দুই হ'তে গেল বৈকি!

আড়ষ্ট বীরেশ অলক্ষ্যে একবার অনুশীলার দিকে তাকিয়ে বললে, এতদিন এসেছ, অথচ আমাকে একটা খবর দাওনি—

নলিনী তার সমস্ত প্রকার মনোভাব দমন ক'রে হাসিমুখে বললে, তোমার শত্রু জীবনবাবুর দুর্গে আমি বন্দী, তাই খবর দিতে সাহস করিনি।

দশ

কয়েকটি মুহূর্তব্যাপী বিপুল স্তব্ধতার মধ্যে তিন জনে যেন নিঃসাড় হয়ে ব'সে রইলো। গভীর লজ্জা আর অনুশোচনায় অনুশীলার মাথা ধীরে ধীরে নত হয়ে এলো। বীরেশের সম্পর্কে তার নিজের প্রগাঢ় অনুরাগ সে এতদূর অবধি উচ্ছ্বসিত ভাষায় নলিনীর কাছে প্রকাশ ক'রে এসেছে যে, আজ আর ফিরে দাঁড়াবার কোন উপায় নেই। নলিনী তার সহপাঠিনী বন্ধু, আবাল্যের সঙ্গী, তার স্বভাব ও চরিত্রের অলিগলি নলিনীর স্পষ্ট জানা আছে--সুতরাং নলিনীরও কিছু বুঝতে বাকি নেই। লজ্জা কেবল নয়, আশঙ্কায় যেন সহসা অনুশীলার মন অভিভূত ও আড়ষ্ট হয়ে এলো। সে নিজে অনর্গল স্বীকারোক্তি ক'রে গেছে, অনুরাগের আতিশয্য অনেক স্থলেই সংযত ছিল না,- কিন্তু অপর পক্ষে বীরেশের এই আত্মীয়া নিঃশব্দে মনে মনে ছি ছি করেছে, ধিক্কার দিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে,—কিন্তু প্রতিবাদ একদিনও করেনি। নলিনীর এই আত্মগোপন করার পরিহাসবুদ্ধি খুব বড় অপরাধ নয়, বন্ধুমহলে এমন ঘ'টেই থাকে, কিন্তু অপরাধ তার নিজের। আজ আবার যেন নতুন ক'রে তার মনে হ'লো, সে অপরের স্ত্রী, সে তার সীমানা ছাড়িয়ে, বিচার-বুদ্ধি আর সামাজিক নীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে একটা অশোভন, অসঙ্গত, অন্যায় ও অপমানজনক অবস্থার মধ্যে নিজেকে

ইতরভাবে টেনে এনেছে। তার লালাসক্তি প্রবৃত্তির লেলিহান লালসার চেহারা নন্দিনীর আর কোথাও জানতে বাকি নেই। প্রিয়সখি আর সঙ্গিনীর কাছে যে অনুরাগ ছিল সৌন্দর্য আর মাধুর্যে ভরা আজ আত্মীয়তাবন্ধন-আবিষ্কারের মধ্যে এসে সে বস্তু যেন নীরস, বিবর্ণ ও পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। একটু আগে, নলিনী আসবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, অদূরবর্তী ওই পুরুষের হাত ধ'রে সে সাশ্রুনেত্রে উন্মাদিনীর মতো তার প্রণয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে, এমন কথাও বলেছে যা পৃথিবীর কোনো সমাজ, কোনো সভ্যতা, কোনো শিক্ষাধারাই কখনো বরদাস্ত করেনি, সেই কথা মনে ক'রে অনুশীলা অন্তরে অন্তরে মর্মান্তিক ধিক্কারে নিজেকে হিংস্র সর্পিনীর মতো দংশন করতে লাগলো।

এই কষ্টদায়ক নীরবতার মধ্যে বীরেশই আগে কথা আরম্ভ করলো। বললে, জীবনবাবু যে মাসিমার বাবা, এতো আমি আগে জানতুম না!

অলক্ষ্যে একবার অনুশীলার দিকে চেয়ে নলিনী হেসে উঠলো। বললে, আগে ত' তুমি অনেক কিছুই জানতে না! জীবনবাবুর সঙ্গে ত' শুনলুম তোমাদের মস্ত বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে। কে হারলো আর কে জিতলো বলো দেখি?

বীরেশ বললে, যুদ্ধ স্থগিত আছে, এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

নলিনী বললে, বেশ, খুব বাহাদুর তোমরা। অনেকদিন হ'লো, আর যুদ্ধ ক'রে কাজ নেই। এবার শান্তিজল ছিটিয়ে দাও। আমি সব শুনেছি।

বীরেশ হেসে বললে, তুমি বুঝি এলে এবার শান্তির অগ্রদূত হয়ে? জীবনবাবু বখ্‌শিস করেছেন?

হাসিমুখে নলিনী বললে, বখ্‌শিস? তবেই হয়েছে। জীবনে আসল পাওনাই পেলুম না, তার ওপর আবার উপরি!

পাওনা ত' কেউ হাতে তুলে দেয় না নলিনী, আদায় ক'রে নিতে হয়।

মেয়েমানুষ,—তাই বোধ হয় পারিনি। নলিনী বললে, প'ড়ে প'ড়ে মার খেতেই শিখেছি, দাবী প্রতিষ্ঠা করার জোর পাইনি।...কি রে অনুশীলা, সেই থেকে মাথা হেঁট ক'রে রইলি যে?

মুখ তুলে অনুশীলা বললে, তোর কথাই ভাবছি। এমনভাবে বোকা বানালি যে প্রায় শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে।

বীরেশ কিছুই বুঝতে পারলো না। কেবল উপস্থিত দুই নারীর মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে যে কটাক্ষ-বিনিময় হয়ে গেল, সেইদিকে একবার তাকিয়ে সে মাথা নিচু ক'রে রইলো। যে অসঙ্গত প্রণয়োচ্ছ্বাস একটু আগে এই নির্জন ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে অনুশীলা তার কাছে নিবেদন ক'রে ফেলেছে, তারই একটা

বিসদৃশ রেশ তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছিল। সমস্তটাই যেন কেমন শ্রীহীন অলজ্জায় ভরা,…যেন সাময়িক চিত্তবিকারের অশোভন একটা অভিব্যক্তি। আজ নলিনীর উপস্থিতিতে সেটা যেন আরো মলিন হয়ে দেখা দিল।

নলিনী হেসে উঠলো। বললে, লজ্জা কি রে, এমন ত' হয়েই থাকে। কথা দিচ্ছি, তোর কোনো ভয় নেই।

আজ এতকাল পরে নলিনীকে সহসা অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় স্থানে আবিষ্কার ক'রে বীরেশের হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে মুখর ও অনর্গল হয়ে উঠতে চাইছিল, কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়, এখানে ভয়ানক বাধা। যে-অনুশীলা তার সর্বপ্রকার বিষয়কর্মের সহকর্মিনী, আজ সে-যেন পর্বত-প্রমাণ বাধা হয়ে তার আনন্দের পথ অবরোধ ক'রে দাঁড়ালো। বীরেশ মনে মনে জানে, নলিনীর সম্পর্কে তার কোনো চিত্তদৌর্বল্য অনুশীলা মার্জনা করবে না, কোনো পক্ষপাতিত্বকেই সে উদারভাবে বিচার করতে চাইবে না। আজ নলিনী ব'লে নয়, কিন্তু প্রায় দশ বৎসর কাল যে-অবরোধের ভিতরে অনুশীলা তাকে আটক ক'রে রেখেছে, সেখানে কোনো দ্বিতীয় নারীর সমাবেশ নেই, তার ত্রিসীমানায় কারো আসা সম্ভব হয়নি। আজ নলিনীর সঙ্গে তার পূর্ব অন্তরঙ্গতার কাহিনী যদি অনুশীলার কাছে প্রকাশ পায়, তবে তার রোগা শরীরে এ-আঘাত কিছুতেই বরদাস্ত হবে না, একটা অমঙ্গল কিছু ঘ'টে যেতে পারে। অনুশীলার কয়েকটি কথাই সে কেবল মনে মনে আড়ষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলো…'কোনো রাক্ষসীর হাতেই তোমাকে তুলে দিতে পারবো না'!…

নলিনী বললে, তোমার দেবীপুরের কাহিনী অনুর কাছে জানলুম, নবনগরের কাহিনীও শুনেছি। চেহারায় দেখছি তুমি সাহেব, পাচ হাজার লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু, এ সমস্তই আমার এই বান্ধবীর কল্যাণে তা মনে আছে ত'?

বীরেশ হেসে বললে, আছে বৈকি, তার জন্যে মাথা বিক্রিও ক'রে রেখেছি। এবার তোমার কাহিনী শুনি।

এবার অনুশীলা কথা বললে। সম্ভাষণটা বদলে দিল চক্ষের পলকে। বললে, আত্মীয়স্বজনের প্রতি আর আপনার একটুও টান নেই। নলিনীর কাহিনী শুনে আপনার লাভ?

বীরেশ তার মুখের দিকে তাকালো। বললে, লাভ?—নলিনী লাভ-লোকসানের বাইরে।

আচ্ছা হয়েছে।—নলিনী চোখ পাকিয়ে বললে, সামনে এসেছি তাই এমন উদ্বেগ। খোঁজ-খবর ত' রাখোনি এতকাল! এতক্ষণ এসেছি, একবার বাড়ির কথাটাও জিজ্ঞেস করলে না। কী নিষ্ঠুর!

বীরেশ একটা নিশ্বাস ফেললো। বয়সের রেখা পড়েছে নলিনীর চোখের কোণে আর কপালে। তার গায়ের রঙে যৌবনকালের সেই আশ্চর্য আভার পরিবর্তে এসেছে কেমন একটা মসৃণ বিবর্ণতা। আগেকার সেই সুকুমার রক্তরাগ আর যেন খুঁজে পাওয়া যায় না, যৌবন-সীমান্তকালের চেহারায় দেখা যায়, অবসন্ন জাহ্নবী প্রবাহের স্তিমিত গৈরিক আভা, তা'তে আর চাঞ্চল্য নেই, নব নব তরঙ্গদলের আর কথা বলতে পারলো না।

নলিনী বললে, আচ্ছা আমিই বলছি, শোনো। আমি বিদেশে চাকরি করতে গিয়েছিলুম, তুমি জানো। সেখান থেকেই মাসিমার চিঠিতে একদিন জানতে পারি তোমার রাঙাদিদি মারা গেছেন। তার পরেই মাসিমা বিধবা হলেন।

বীরেশ স্তব্ধ হয়ে রইলো।

তোমাদের বাড়ি জমি ইত্যাদি সমস্তই বিক্রি হয়ে গেছে। সেখানে এখন গেলে নাকি আর কিছু চিনতে পারা যায় না। তার ওপর দিয়ে নতুন রাস্তা হয়েছে।

বাবা কোথায় ?

নলিনী বললে, মেসোমশাই ? ঠিক জানি নে। একবার শুনেছিলাম, তিনি রাজমহলের ওদিকে কোন্ পাহাড়ের ধারে ছোট একটা বাড়ি নিয়ে চ'লে গেছেন, কিন্তু তারপরে অবশ্য শুনেছি তিনি কলকাতায়ই আছেন, তবে কী যেন একটা ঠিকানায়—শহরের দক্ষিণ দিকে। অনেক কাল হ'লো তাঁকে আমি দেখিনি। সমস্তই যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে।

এর পরেই যে-প্রশ্নটা আসে সেটা খুবই স্বাভাবিক। অনুশীলা তাকালো নলিনীর দিকে, নলিনী এবার চেয়ে দেখলো বীরেশের মুখের প্রতি, সে-মুখে উদ্বেগের আভাস মাত্র নেই। বিগত জীবনের কথাই কেবল তোলাপাড়া ক'রে বীরেশ নিঃশব্দ নতমস্তকে চুপ ক'রে রইলো। পিতার ইতিবৃত্ত নতুন ক'রে জানবার কৌতূহলও আজ তার কাছে যেন অতি বিসদৃশ মনে হ'তে লাগলো।

কিন্তু তিনজনের মধ্যে অনুশীলাই তার ঔৎসুক্য দমন করতে পারলো না। সে প্রশ্ন করলো,—আচ্ছা নলিনী···

নলিনী মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

তুই ত' সব কথাতেই আমাকে ফাঁকি দিয়েছিস। শুনেছি বীরেশবাবু বিয়ে করেছিলেন, সেদিকের কোনো খবর নেই ?

প্রশ্নটার মধ্যে অনুশীলার নিজেরই লজ্জা থাকা উচিত ছিল। নলিনী তার দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু তার উত্তর দেবার আগেই বীরেশ ইজিচেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এটা আমার না শুনলেও চলবে, নলিনী।—এই ব'লে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু, সন্দেহ নেই। নলিনী কেবল বললে, শুনতে ও চায় না, কারণ ওর শোনবার দরকার নেই। হয়ত আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটাও বীরেশ পছন্দ করেনি। ওর সব চেয়ে বড় ব্যথার ইতিহাস আমি জানি ব'লেই ও মনে করে।

উৎসুক হয়ে অনুশীলা বললে, স্ত্রীকে ত্যাগ করার কি আর কোনো কারণ ছিল ?

আমি কিছুই জানি নে, ভাই।

অনুশীলা বললে, অপরাধ হয়ত আমারই নলিনী। তোকে ত' বলতে কিছু বাকি রাখিনি, সবই বলেছি। হয়ত আমি স'রে গেলেই সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যায় !

নলিনী চুপ ক'রে রইলো। অনুশীলা বলতে লাগলো, আগে জানতুম না, জানলুম অনেক পরে। উনি তোমার আত্মীয়। দীর্ঘ দশ বছর সত্যিই আমি ওঁকে চোখে চোখে রেখেছি। হয়ত অন্যায় করেছি, হয়ত করিনি, হয়ত তোরা এই দুর্নীতির জন্যে সবাই ছি-ছি করবি। কিন্তু আমি জানি, ওঁর মধ্যে শক্তিও কিছু যুগিয়েছি। বীরেশবাবুর সমস্ত কাজের মধ্যে যত দুঃখ আর দুর্দশা ছিল—আমিও তার কিছু কিছু অংশ নিয়েছি, এই আমার সান্ত্বনা, নলিনী।—বলতে বলতে বলতে তার চোখে জল এলো।

নলিনী প্রশ্ন করলো,—দাদা কি তোদের সম্পর্ক কিছুই জানেন না ?

লজ্জায় যেন অনুশীলার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। সে ধীরে ধীরে বললে, আমি কোনো নোংরা কাজ করতে পারি, এ তিনি বিশ্বাস করেন না। স্বামীকে আমি কোনোদিনই বঞ্চনা করিনি, ভাই। প্রত্যক্ষেও নয়, অপ্রকাশ্যেও নয়।

এ তুই কী বলছিস, অনু ? মেয়েমানুষের স্বভাবের গঠনে ত' একথা বলে না ? লক্ষ্যবস্তু দ্বিধা-বিভক্ত হ'লেই মেয়েদের বড় দুর্দিন, তারা পথ হারায়। শক্তির বিভিন্ন রূপ হ'তে পারে ; কেউ দুর্গা, কেউ কালী, কেউ অন্নপূর্ণা, কেউ বা জগদ্ধাত্রী,—কিন্তু সকলের লক্ষ্য বস্তু একই, সেই মহাদেব। প্রকাশ ভিন্ন, কিন্তু স্বভাব বিভিন্ন নয়। এটাকে কেউ নীতি-প্রচার বললে ভুল হবে, এটা মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কথা। একই সময় একই কালে একই ব্যবস্থার মধ্যে দুই প্রণয়ী মেয়েদের ধাতে নেই,—অন্তর্চেতনায় পক্ষপাতিত্ব কিছু থাকবেই। দেবী দ্রৌপদী যদি এমন কথা বলতেন, পাঁচজন স্বামীর প্রতি তাঁর সমাদর একই প্রকার, তবে তিনি আত্ম-প্রতারণার পাপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তেন, কিন্তু তা তিনি

হননি! একক অনুরাগই তাঁর জীবনকে অবশেষে সার্থক করেছিল। সত্য বলতে গিয়ে স্বর্গের লোভও তিনি ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু মিথ্যা ব'লে নারীজাতিকে তিনি অবমানিত করেননি। তালিকা বাড়াতে পারি অনু— কিন্তু থাক্, সত্যের মূলনীতি জানলেই যথেষ্ট, বিতর্কের কোনো দরকার নেই।··· তোর কি আবার জ্বর এলো নাকি রে?

কম্বলখানা গায়ের উপর তুলে নিয়ে অনুশীলা শুয়ে রইলো। শীতের বাতাসে তার চোখের কোণে অশ্রুর বিন্দু ধীরে ধীরে শুকিয়ে এলো। সে বললে, এই সময়েই ত' রোজ জ্বর আসে। শীত করছে একটু একটু।

কাসিটা কি একটুও কমেনি?

ঠিক বোঝা যায় না। ইন্‌জেক্‌শন্ চলছে।

নলিনী বললে, তুই অমন কথা কদাচ ভাবিস নে আমি তোকে নিরুৎসাহ করছি। তোকে সংপথে ফিরিয়ে আনাও আমার কাজ নয়। সংসারে ভালোবাসা বড় দুর্লভ ভাই, তাকে বাঁচিয়ে রাখা আরও কঠিন। বীরেশের এই উন্নতির মূলে তোরই সাধনা, তোরই উৎসাহ দেখছি। পুরুষরা হচ্ছে একটি বিরাট যন্ত্রশালার আধার, কিন্তু মেয়েরা তার পিছনে বিদ্যুৎশক্তি। আমি জানি তোর মনের কথা, আমি জানি তোর তপস্যার কাহিনী। এতে তোর লজ্জা বিন্দুমাত্রও কোথাও নেই। আমি কেবল বলছিলুম, নিজেকে না জানার গুণে নিজেদেরই অনেক সময়ে আমরা প্রবঞ্চনা করি। স্বামীকে ঠকিয়ে লুকিয়ে যারা ব্যাভিচার করে তাদের কথা আমি বলছি নে, কিন্তু আমি বলছি, পূজোটা ভালোবাসা নয়, শ্রদ্ধা-সম্মানকে প্রেমও বলে না।

অনুশীলা হাসিমুখে বললে, তুই কি ক'রে জানলি?

আমি!—নলিনী বললে, বোধহয় পাইনি ব'লেই জানি। যা পাওয়া যায় না তাই বড় হয়ে থাকে কল্পনায়, যা পাওয়া গেছে তা মুছে যায়।

এত ত' কবিত্ব!

না, মানুষের স্বভাবের ক্ষুধা। ঈশ্বরকে পাই নে, তাই সে বস্তু এত বড়; ভালোবাসা পাইনি, তাই ওটা এত সুন্দর, মনের মতন জীবন পাইনি তাই তার জন্যে এত ক্ষুধা। এ একা আমার নয়, সব মানুষের মনের কথা।

নলিনীর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠলো।

সাগ্রহে অনুশীলা বললে, তুই অনেক বদ্‌লেছিস।

হাসিমুখে নলিনী বললে, তোদের দেখার দোষ, এক তিলও আমি বদ্‌লাইনি। অদ্ভুত একটা শিক্ষাধারার মধ্যে তুই, আমি, বীরেশ—আর সবাই মানুষ। সন্দেহ করতে শিখেছি, অশ্রদ্ধা করতে জেনেছি,—কিন্তু বিশ্বাস করতে

যেন ভয় পাই। মানুষকে আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, কারণ নিজের ওপরেও আর শ্রদ্ধা নেই, সম্মান নেই। নৈরাশ্যবাদ আমাদের জীবনের মূলে কেন বাসা বাঁধলো, আজো বুঝতে পারিনি। ছাত্রীজীবনে গা ঢেলে দিয়েছিলুম একটা অদ্ভুত বিকারের আবহাওয়ায়। মানুষকে করবো বিদ্রূপ, সভ্যতাকে করবো ব্যঙ্গ-মিশ্রিত সন্দেহ, অস্তিত্ববাদকে ঘৃণা করবো, চরিত্রের কোনো নীতি মানবো না; পৃথিবীর সভ্যতায় আর বিজ্ঞানের, দর্শনের, ইতিহাসের—সমাজের সর্ববিষয়ে সকল ক্ষেত্রে সংশয়ের প্রশ্ন জেগেছে,—জড়বাদের পায়ের তলায় মানবতা দলিত হচ্ছে,—এই হ'লো মোট কথা। যন্ত্রসভ্যতার চরম পরিণতি হ'লো স্বার্থ আর লোভের সংঘাতে, মানুষের বহুযুগের পরিশ্রম ব্যর্থ হ'লো অকল্যাণে, ঈশ্বর উৎপীড়িত হচ্ছে মানুষের বুকের মধ্যে—আমাদের বাঁচবার আর কোনো মাল-মসলা নেই। সুতরাং গাল দিয়ে বেড়াচ্ছি এই অভিশপ্ত বিংশ শতাব্দীকে।

অনুশীলা বললে, আরও অনেক নালিশ আছে, নলিনী।

জানি।—নলিনী বললে, কিন্তু মোটামুটি এই। মেয়ে ইস্কুলে চাকরি করতুম, সে কাজ ছেড়ে দিলুম কেন? নিজের শিক্ষায় সন্দেহ সেই কারণে। যা শিখেছি তা না শিখলেও চলতো, এই কথাই ভাবতে বসেছি। সমস্ত নালিশ যদি তুলে নিই, কী থাকে? শরীরে যদি জ্বরের উত্তাপ বাড়ে, নানা উপসর্গ আসে। জ্বর ছাড়লে অপরিসীম স্বস্তি, কোনো নালিশ নেই। সেই বীজাণু ঢুকছে আমাদের মনে, তাই এত অসুখ। এ যুগে মনোবিকারই সর্বনাশের মূল, —এর চিকিৎসার ভার নেবে কে? আজকে বিপুল শক্তিতে নবনগর সৃষ্টি করো, কাল আবার ভেঙে পড়বে। এক সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলো, কাল তার পতন। বস্তুর স্তূপ যত পর্বত-প্রমাণই হোক, তার প্রাণ নেই। সেই অখণ্ড অনন্ত নির্মল প্রাণ-সঞ্চারের দায়িত্ব আজ কে নিতে পারে? মানুষের সমস্ত সৃষ্টি আজ অপসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ালো কেন?...ক্ষমতার লোভ, অর্থের লোভ, প্রভুত্বের লোভ, সাম্রাজ্যের লোভ—কেন এত লোভের ছড়াছড়ি? এর কারণ, মানুষ নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে জাগিয়ে তুলতে ভুলে গেছে; মুখোশ-পরা মহত্ত্বের অনুকরণ ক'রে যারা বড় হয়ে চলেছে, তাদেরই নকলে ভরে গেছে দেশদেশান্তর। চেয়ে দেখো - চাতুরী পাচ্ছে রাজ্যপাট, ইতরবৃত্তির নাম রাজনীতি, উন্মত্ত ধর্মান্ধতার নাম ধর্ম, উচ্ছৃঙ্খলতার নাম স্বাধীনতা, আত্মঘাতী দুষ্কৃতির নাম পৌরুষ—এরা জায়গা জুড়ে রয়েছে, পথ কোথাও নেই।—মেয়ে-মানুষ হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি দশ বছর, এর সমাধান খুঁজে পাই নে। জাতের জন্যে ভাবছি নে, ভাবছি নিজের অধঃপতন। স্বাধীনতার বুলি, পাণ্ডিত্যের বুলি,

মহত্ত্ব আর উপদেশের বুলি—সবই শুনলুম, কিন্তু মন ভরলো না। তাই ত' খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হয়ত এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতেই মূলমন্ত্র পেয়ে যেতে পারি।

নলিনী থামলো। বাইরে অপরাহ্ণের রোদ রাঙা হয়ে এসেছে। শীত-শেষের বেলাটুকু যাই-যাই করছে! নলিনী যা বলতে চাইলো তা যেন তার বলা হ'ল না, আসল কথার গোড়ায় এসে তাকে থেমে যেতে হ'লো। অনিলের সনির্বন্ধ অনুরোধে আজ হঠাৎ সে এসে পড়েছে, কিন্তু তার আসাটা অনুশীলার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়েছে নিশ্চয়ই। অথচ খানপুরে আজ আর ফিরে যাওয়া চলে না, সন্ধ্যা আসন্ন। গাড়োয়ান তাকে পৌঁছে দিয়ে আগেই চ'লে গেছে।

দাদার আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন রে?

অনুশীলা বললে, অনেক রকম কাজ নিয়ে গেছেন। তা ছাড়া, হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে একটা রিপোর্ট আনতে হবে।

বদ্‌লি হবার নতুন কোনো চিঠি এসেছে?

আসেনি বটে, তবে এবার আর বদ্‌লি না ক'রে বোধ হয় ছাড়বে না।

তাহ'লে ত' মুস্কিল!—ব'লে নলিনী অল্প একটু হাসলো। পুনরায় বললে দেবীপুর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হবে ত'?

অনুশীলা বললে, না হ'লে চলবে কেন রে?

কিন্তু ছাড়বার কথা উঠতেই ত' তোর জ্বর এসেছে।

অনুশীলা হেসে উঠলো; তার হাসির চেহারায় নলিনীর মুখে চোখে কী রেখা যে ফুটলো, তা আর সে লক্ষ্য করলো না।

হাসি থামিয়ে সহসা একসময়ে অনুশীলা বললে, আচ্ছা নলিনী, সত্যি কথা বলবি একটা?

বলবো।

বীরেশবাবু স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন কেন?

স্ত্রী ওর যোগ্য ব'লে মনে করেনি।

যোগ্য ক'রে তোলেননি কেন? তিনি ত' সবই পারেন।

নলিনীকে আবার আত্মদমন করতে হ'লো। বললে, সব উনি পারেন না। রুচিও ছিল না।

কেন? মন বুঝি অন্য কোথাও ছিল?

নলিনী হেসে ফেললো। বললে, হ্যাঁ তোর দিকে।

কিন্তু অনুশীলা তার হাসিতে যোগ দিল না। চুপ ক'রে থেকে একসময়ে বললে, বোঝা যায় না কিছু, উনি অদ্ভুত। মানুষের দিকে চোখ পড়লো না, মন রইলো কাজের দিকে।...বোঝা গেল না কিছু।

এবার নলিনীর পালা। কপালের রুক্ষ চুলের ঝলক ডান হাতে সরিয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করলো, এবার আমার কাছে একটা সত্যি কথা বল। গোপন করবি নে কিন্তু।

অনুশীলা মৃদুকণ্ঠে বললে, যা সব চেয়ে গোপন, তাও ত' তোর কাছে গোপন করিনি ভাই।

নলিনী বললে, আচ্ছা, দাদার দিক থেকে কি তুই কোনো অবিচার পেয়েছিস?

অনুশীলা বললে, একটুও না। সুবিধা মতো স্বামীর সুখ্যাতি করা মেয়েদের অভ্যাস। কিন্তু তুই ত' প্রায় দু'মাস হ'লো দেখছিস, ওঁর আচরণে কোনো অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিস?

মোটেই না। স্নেহের অবতার বললেও কম বলা হ'লো। তবে কেন তোর এই দুরারোগ্য ব্যাধি?—নলিনী হেসে বললে।

ক্লান্তকণ্ঠে অনুশীলা বললে, অনুরাগ ভিন্ন প্রতিভার দাম আর কী দিয়ে শোধ করবো বল্ ত'? হয়ত তোদের সঙ্গে আমার মিলবে না, আমার চোখ আলাদা। কিন্তু চন্দ্রের সঙ্গে সাগরের জোয়ারের সম্পর্ক ঘোচাবে কে? তার যোগাযোগ শূন্যে। সমাজনীতির কথা পাড়ো, সতীধর্মের কথা বলো, মাথা হেঁট ক'রে মেনে নেবো,—কিন্তু যে-যন্ত্রণা ফুল ফোটায়, যে-বিক্ষোভ সমুদ্রের ঢেউয়ে,—সে ত' স্বভাবের নিয়ম, নলিনী?

কিন্তু পরিণাম?

মরীচিকা!—অনুশীলা নিশ্বাস ফেলে বললে।

আজ যদি তুই বদ্‌লি হয়ে যাস, স্বামী ছাড়া ত' আর কেউ সঙ্গে থাকবে না? শূন্যের যোগাযোগ শূন্যেই ত' মিলিয়ে যাবে!

হাসিমুখে অনুশীলা বললে, এত হিসেব কি আগে করেছিলুম?

কিন্তু এবার? হিসেব না ক'রে অন্ধতায় গা ভাসাবি, সে মেয়ে ত' তুই নয়!—নলিনী বললে, আবার বলছি, এ আমার নীতি-উপদেশ নয়, আমি তোর সমস্যাকে দেখছি নানাদিক থেকে। তোর ঘরেও যদি আনন্দ চ'লে যায়, পথেও যদি স্বস্তি না পাস,—থাকবি কোন্ চুলোয়?—রোমান্সের বয়স তোর নয়, এখন ফুলের চেয়ে ফলের দিকে টান। বসন্ত পেরিয়ে এসেছে বর্ষায়,—গন্ধের চেয়ে স্বাদের দিকে ঝোঁক বেশি। খোসার রঙে এখন আর মন ভুলবে না, শাঁসের রসে রসনা মাতবে।

জ্বরের উত্তাপে অনুশীলার চোখ দুটো রাঙা। কিন্তু তবুও তার কলকণ্ঠের হাসিতে আনন্দের স্রাব ফেনিয়ে উঠলো। বললে, পোড়ারমুখী, বিয়ে করার

পর আমার না হয় পতন হয়েছে, কিন্তু বিয়ে না ক'রে যে তুই গোল্লায় গেছিস। কোথায় তোর কে আছে বল্ সত্যি ক'রে, এখনি শাঁখ বাজিয়ে মঙ্গলঘট বসাই। বল্ হতভাগী।

নিজের বুকের উপর আঙ্গুল ডুবিয়ে নলিনী হাসি মুখে বললে, আছে বৈকি এখানে কেউ একটা। 'আমারো ভাগ্যে ঘটেনি, ঘটেনি সকলি ফাঁকি!'

কৌতুক ঔৎসুক্যে অনুশীলা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললে, সত্যি ভাই বল, এখন কেউ কোথাও নেই। কথা দিচ্ছি, বলবো না কাউকে।

আচ্ছা বলছি।—ব'লে—নলিনী গুছিয়ে বসলো। তারপর বললে, প্রথমেই ব'লে রাখি, বয়সে সে আমার চেয়ে ছোট।

ওমা, সে কি রে! সমবয়সীও নয়?

না। কারণ, সব শাস্ত্রেই দেখা গেছে তার বয়স একটুও বাড়ে না। ভদ্রলোকের তিনটি দোষ আছে। প্রথম, জাতে একটু নীচু; দ্বিতীয়, একটু নির্বোধ, তৃতীয় স্বভাব-চরিত্রের কিছু দোষ।

মানে?

মানে, ওদিকটা বড় আল্‌গা।

কিন্তু তার জন্যে তোর মাথা খারাপ হ'লো কেন?

নলিনী বললে, অনেকেরই হয়েছে, আমার একার নয়। একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী কত যে চোখের জল ফেললো তার জন্যে, তার সীমা নেই। লোকটির দুই বিবাহিত স্ত্রী, দুই সংসার। তবুও বাইরের মেয়েদের দলে তার ভয়ানক খ্যাতি।

কী করে ভদ্রলোক?

কিছুই না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

অনুশীলা বললে, তবে এমন কী গুণ পেলি তোরা তার মধ্যে?—রূপবান বুঝি খুব?

এমন কিছু নয়, গায়ের রং ত' ময়লা।

খুব লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান?

না, মেয়েলি ছাঁদের চেহারা। কেবল চোখ দুটো ভালো, হাসিটা সুন্দর।—নলিনী হাসতে লাগলো।

মুখের একটা শব্দ ক'রে অনুশীলা বললে, তোরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, তাই রুচিবোধ নেই। যে বর্ণনা দিলি, তা'তে ভদ্র মনে আঘাত লাগে। বুঝেছি তোর অবস্থা। এই বেলা পেন্‌সন্ পাওয়া কোনো বুড়োকে বিয়ে ক'রে ফেল্, তাতেও কাজ দেবে। দুই স্ত্রী থাকতেও হ্যাংলার মতন ছুটেছিস তার পেছনে, তোদের মরণ নেই!

নলিনী বললে, কিন্তু তা'কে দেখলে তুইও মরতিস্‌ !

না দেখেই ঘেন্নায় মরছি। দূর হ পোড়ামুখী !—ব'লে অনুশীলা কম্বল টেনে পাশ ফিরে শুলো। সমস্ত মুখ ভ'রে নিঃশব্দ কৌতুকে নলিনী ব'সে হাসতে লাগলো।

পাশ ফিরেই অনুশীলা বলতে লাগলো, তোর মতন বুড়ী কুমারীর মুখে দর্শন-শাস্ত্র শুনেই তখন বুঝেছি, তোর আর কোনো আশা নেই। তোদের আত্মনিগ্রহের পরিণামই হ'লো তোদের মুখে ঘন ঘন নীতি-উপদেশের বুলি। মনে মনে পাঁক ঘাটছিস, মুখে ছড়াচ্ছিস আতর—তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে, তোর এমন লখিন্দরটির নাম কী শুনি ?

নাম ?—নলিনী ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, নামটা অবশ্য সেকেলে। নাম হ'লো, সর্বেশ্বর ঘটক !

স্তব্ধ চক্ষে অনুশীলা তার দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকালো। তারপর বললে, ঘটকটি থাকে কোথায় ?

বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ আর গলার স্বর শুনে দু'জনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। তারপরই নলিনী চেয়ার ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ওই দাদা আসছেন।—ব'লে সে অনুশীলার কাছে স'রে গিয়ে সহসা বললে, ওরে ডাইনী, থাকে কোথায় জানিস নে ? থাকে এই বৃন্দাবনে।—এই ব'লে নিজেরই বক্ষস্থল দেখিয়ে নলিনী হাসতে হাসতে পাশের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু বীরেশ আর নলিনীকে নিয়ে অনিল যখন এসে ঢুকলো, তখন কাসতে কাসতে মুখ চোখ রাঙা ক'রে অনুশীলা উঠে বসতে চেষ্টা করছে—নলিনী তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধ'রে পাশে বসলো। এই দৃশ্যটা বীরেশ আগে দেখেনি,—এমন অসুস্থ কণ্ঠস্বর শুনে সে একটু ভীতও হ'লো। বললে, অসুখটা কী সেন সাহেব ?

কাগজপত্র ও রকমারী ওষুধের বাক্সটা টেবিলের ওপর রেখে অনিল বললেন, এখনও সঠিক বলা যায় না হে।···ওই দেখ না আমার বোনটির মুখখানি,—বুঝতে পারো, ওর অসুখটা কোথায় ?—

অনুশীলাকে শুইয়ে নলিনী হাসিমুখে বললে, আপনি আগে অনুকে সারিয়ে তুলুন দেখি, তারপর আমাদের ভূত ছাড়াবেন।

কেমন একটা অস্বস্তিতে বীরেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে, মিস্টার সেন, বুঝতে পারছি নে কিছু। প্রায় ছ'মাস বাদে এলুম। এমন কী হ'লো আপনার স্ত্রীর যার জন্যে এত চিকিৎসার ব্যবস্থা ; এমন কী হ'লো আপনার, যার জন্যে আপনার অতগুলো মাথার চুল পাকলো !

মিস্টার সেন ওষুধ ঢেলে স্ত্রীর মুখে দিয়ে ক্লান্ত হাসি হাসলেন। বললেন, চল্লিশ কবে পেরিয়ে গেছে, তুমি বোধ হয় খবর রাখোনি ··কি নলিনী, মুখ লুকোলে যে? সেদিন দু'জনে ব'সে যে বয়সের হিসেব করলুম?

বীরেশ বললে, কিন্তু অসুখের কথা আপনি আমাকে একবারও জানাননি, সেনসাহেব। আমি পর সন্দেহ নেই, কিন্তু একেবারেই যে নিস্পর, সে-কথাও আপনি জানিয়ে দিলেন এবার।

থামো হে, ভাবালু বালক!—ব'লে অনিল সস্নেহে বীরেশের পিঠের উপর হাত ঠুকলেন! বললেন, হৈ চৈ ক'রে সবাইকে ডাকলে কি আর অসুখ সারে? ললিতকেও ডাকতে পারতুম, কিন্তু কী হবে? মনে করেছিলুম, শেষকালটা তোমার নবনগরে গিয়েই বাসা বাঁধবো, তাতে বিধি বাম! খবর নেবো ব'লেই খবর দিইনি।

বীরেশ বললে, আপনাকে নাকি শীগ্‌গিরই বদলি হ'তে হবে?

হ্যাঁ, আজ একেবারে অর্ডার নিয়ে এলুম। আগামী বৃহস্পতিবারের বারবেলা এই গ্রামের মায়া কাটাতে হবে! যেতে হবে অনেক দূর, খুলনায়।

স্ত্রীর ব্যবস্থা কী করছেন?

বিপজ্জনক প্রশ্ন বটে।—অনিল হাসিমুখে বললেন, উনিও পতির অনুগামিনী হবেন!

সেখানে রীতিমতো চিকিৎসা চলবে ত'?

নলিনী কথার জবাব দিল। বললে, ডাক্তার যদি বলে তবে নবনগরের হাসপাতালে রাখলে কেমন হয়, দাদা?

সচকিত বিবর্ণ মুখে বীরেশ নলিনীর দিকে তাকালো।

অনিল বললেন, কি হে, প্রস্তাবটা কেমন লাগে? আরে এত নার্ভাস হ'চ্ছ কেন, ভাই? এইটুকু অসুখে এত দুর্ভাবনা? বীরেশ বোধ হয় এই ক'মাসে সাইকো-প্যাথলজি ডেভেলপ্‌ করেছে, কী বলো অনুশীলা?

অনুশীলা শীর্ণ হাসিমুখে বললে, আর ওঁকে ক্ষেপিয়ো না তুমি। কী কুলগ্নেই দেখা হয়েছিল তোমাদের দু'জনে!

বাস্তবিক!—অনিল বললেন, নলিনী, তুমি বোধ হয় শোনোনি, ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয় মারপিটের মধ্যে। আমি তখন পরিপূর্ণ হাকিম, দিলুম বন্ধুকে হাজতে। গ্রামে আর দেশে সে কী থ্রীল্‌!

নলিনী হাসিমুখে বললে, শুনেছি সব অমুর কাছে।

বীরেশ বললে, সেই সময়ে আপনি প্রশ্রয় না দিলেই ভালো করতেন, মিস্টার সেন। ব'লে সে মুখ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার যাওয়াটা অবশ্যই নাটকীয়। কিন্তু তার শেষ কথাটায় অনুশীলাও যেমন স্তব্ধ হয়ে গেল, তেমনি অনিলও হতচকিত হয়ে একসময় প্রশ্ন করলো, নলিনী, তুমি বীরেশকে জানো চিরকাল, কী হ'লো ওর বলো ত' ?

নলিনী বললে, দাদা, আপনাদের দু'জনের জন্যেই ওর যা কিছু, ওর সৌভাগ্যের মূলে আপনারাই। অনুশীলার অসুখ দেখে সকাল থেকেই ওর মেজাজ গেছে খারাপ হয়ে। ওর ধারণা, স্ত্রীর প্রতি আপনি যথেষ্ট যত্ন নেননি।

তাই নাকি ?—তা হ'লে এক কাজ করো। চট্ ক'রে তুমি একটু চা খাইয়ে দাও। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'লে বুঝিয়ে সব বলব। বড় প্রতিভা কিনা, কথায় কথায় মেজাজ বদলায় !

নলিনী হেসে উঠলো।

আর শোনো।—অনিল বললেন, প্রতিভাকে যারা সক্রিয় রেখেছিল ব'লে তুমি জেনেছ, তাদেরও একটু চায়ের প্রসাদ দিয়ো, বোন !

যে আজ্ঞে !—ব'লে নলিনী উঠে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে। দক্ষিণ বারান্দায় নিজের নির্দিষ্ট ঘরের বিছানার উপর বীরেশ নিঃশব্দে বসেছিল। ট্রাউজার ছেড়ে ধুতি পরেছে, গায়ে জড়ানো একখানা পশমী কাশ্মীরী আলোয়ান। এ ঘরটি অনুশীলা নিজের হাতে ঝাড়ে মোছে, অতিথির জন্যে সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সাজিয়ে রাখে। বীরেশ না থাকলে তালাচাবি পড়ে. দ্বিতীয় মানুষ এ ঘরে ঢোকে না।

কতক্ষণ সে বসেছিল, একসময়ে পায়ের শব্দে সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে নলিনী এসে ঢুকে বললে, দাদা বললেন চা খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করো তুমি।

বীরেশ বললে, এই বুঝি তোমার প্রথম সম্ভাষণ ?-ওকি, চা রেখে পালাচ্ছ যে ?

নলিনী দাঁড়ালো। বললে, কথা বলতে ভয় করে যে তোমার সঙ্গে।

ভয় ! আমার কাছে ? বীরেশ বললে, দশ বছর পরে এই বুঝি পুরস্কার ?

নলিনী চেয়ারে বসলো। তারপর পেয়ালাটাকে বীরেশের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললে, বোধ হয় তুমি ভাবতেই পারোনি, এখানে আমার সঙ্গে দেখা হতে পারে ?

হ্যাঁ স্বপ্নেরও অগোচর। সেই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা—বর্ষার দিনে, রজনী ছিল সঙ্গে। মনে পড়ে ?

খুব কি ছেলেমানুষ ছিলুম তখন !

বীরেশ বললে, বোধ হয় ছেলেমানুষ ছিলে না। বরং আজ আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভয় করে, এইটিই ছেলেমানুষি, কিন্তু দু'মাস হ'তে চললো তুমি এসেছ, অথচ আমি খবর পেলুম না!

নলিনী বললে, খবর দিলে হ'ত কী?

বীরেশ চুপ ক'রে রইলো। বিস্মিত হ'লো, অথবা ব্যথিত হ'লো, ঠিক বোঝা গেল না। নতমস্তকে সে একসময় বললে, জানি নে কী মনে ক'রে খবর দাওনি, হয়ত তোমার দিক থেকে কোনো দরকারও ছিল না।

নলিনী বললে, অনেককাল থেকে দুর্ভাবনা ছিল, এসে তার থেকে মুক্তি পেলুম।

কিসের দুর্ভাবনা?

আর কিছু নয়। বিদেশ-বিভূঁয়ে একটা মানুষ চ'লে গেল, তার পরিণামটা কী দাঁড়ালো তাই ভাবতুম। এবার থেকে আর কিছুই না হোক, নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে যেতে পারবো।

আর কোনো প্রশ্ন করতে বীরেশের মুখে বাধলো। নলিনী এতকাল কোথায় ছিল, অথবা এরপর যাবেই বা কোথায়, সে-কথা আজকে জানার ঔৎসুক্য অত্যন্ত অশোভন। এতকাল একটা দুস্তর জীবন যাপন করার পথে হৃদয়কে সে কোথাও মোহগ্রস্ত হতে দেয়নি, চিত্তবৃত্তির সমস্ত ধারাগুলোকে কর্মকাণ্ডের দিকে একমুখীন ক'রে রেখেছিল। আজকে নলিনী,···যে নলিনী তার সমগ্র সত্তার মূলকেন্দ্রে ব'সে তার অধ্যবসায়ের উৎসব অফুরন্ত ক'রে রেখেছে,· সে যদি বৈরাগ্য প্রকাশ করে—অভিযোগ করা চলবে না। তার জীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টা এখনও বাকি, সেটা অশ্রুর অধ্যায়। পুরুষ হ'লেও সে জানে, কোথাও যেন তার একটা প্রকাণ্ড ঋণ জমে উঠেছে, চোখের জল ছাড়া সে-ঋণ পরিশোধ করার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। নলিনী যদি যায়, বাধা দেওয়া কিছুতেই চলবে না,—তাকে ধরে রাখার জন্য এতদিন পরে সহসা আগ্রহের আতিশয্যও হবে নিতান্তই বেমানান। তার চেয়ে বরং নলিনীর নামে উৎসর্গীকৃত পদ্মাসনার মন্দির নিয়েই সে খুশী থাকবে··

চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল?

এই যে—ব'লে গা ঝাড়া দিয়ে বীরেশ চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিল। তারপর হেসে বললে, জীবনবাবুদের ওখানে আমার নামে দুর্নাম শুনেছ ত'? প্রথম দিকে আমি অবশ্য ওদের খুবই নাড়া দিয়েছিলুম। ঘাড়ে ভূত চেপেছিল, গ্রামের লোকদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবো,—ভূতটা এতদিনে ছেড়েছে।

ছাড়েনি।—নলিনীও হেসে বললে, সেই ভূতের দৌরাত্ম্যেই ত' পেত্নীরা পালাতে বাধ্য হ'লো!

পেত্নী আবার কারা?—বীরেশ প্রশ্ন করলো।

নলিনী খুব হাসতে লাগলো। হাসি থামিয়ে একসময়ে বললে, তোমাকে জানিয়ে রাখি, জীবনবাবুর সঙ্গে কলের মালিকদের একটা বিশ্রী বিবাদ হওয়ায় উনি সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। উনি জানতেন না যে, ওঁর মেয়ের ননদের ছেলে তুমি। উনি খুবই অনুতপ্ত। এমন কথাও আমাকে বলেছেন, বীরেশ যদি আবার দেবীপুরে কাজ করতে নামে, আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও তাকে সব রকমে সাহায্য করবো। মালিকদের জব্দ করার সব কলকাঠি নাকি ওঁর হাতে।

বীরেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উৎসাহিত হয়ে সে বললে, আমি দেখা করব তাঁর সঙ্গে। অনুশীলা জানে এ খবর?

না।

তাড়াতাড়ি পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললে, আমি ব'লে আসি অনুশীলাকে,—এ খবরটা পেলে ওর অসুখও কমে যাবে।

তার অতি ব্যস্ততা লক্ষ্য ক'রে নলিনী বললে, এখন থাক্, দরকার হ'লে এ খবর আমিই দিতে পারবো।

বাইরে থেকে অনিল সাড়া দিলেন,—আসতে পারি কি?

নলিনী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে হাসিমুখে অনিলকে ভিতরে নিয়ে এলো। বীরেশ বললে, বসুন, চা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়েছি, এবার শুনি মিসেসের অবস্থা।

অনিল বললেন, আজ ভারি আনন্দের দিন, তোমরা সবাই আমার কাছে। তাঁর কণ্ঠের করুণ গাম্ভীর্যে ঘরের আবহাওয়াটা যেন একটি মুহূর্তেই সহসা ম্লান হয়ে উঠলো। তিনি সস্নেহে নলিনীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, এদের নিয়ে অনেক বিপদ আপদ গেছে, বুঝলে ভাই নলিনী! কিন্তু তবু এতকাল এদের আনন্দ-কলরবে আমার গ্রাম্য-নিকেতন মুখর হয়েছিল। এগারো বছর কাটালুম এই মহকুমায়, একই জায়গায় একই হাকিমের এতদিন থাকা বোধ হয় সরকারী কর্মচারীদের ইতিহাসে নেই। আমার শুভার্থীদের সংখ্যা জগতে বড় কম। ভাই, মা, বাপ কেউ নেই। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে একেবারে বঞ্চিত করেননি। বীরেশকে পেয়েছিলুম সহোদর, তোমাকে শেষকালে কুড়িয়ে পেলুম সহোদরা। আমার যিনি স্ত্রী, তিনি আমার বারো বছরের ছোট। বিপদে আপদে, প্রবাসে, দুর্গমে তিনি আমার সঙ্গিনী। সন্তান তাঁর হ'লো না; জানি সন্তানের ক্ষুধায় তাঁর বুভুক্ষু মন বহু কান্না কেঁদেছে; বহু বিষয়ে লিপ্ত থেকে তিনি সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন। কিন্তু এবার হয়ত ..

অনিলকুমারের গলা ধ'রে এলো। নলিনী সাশ্রুনেত্রে বললে, রোগ কি কারো হয় না, দাদা ?

হয় বৈকি ভাই। কিন্তু মানুষের সঙ্গ যখন একান্ত দরকার, তখনই যে তোমাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে নলিনী ?—এই সপ্তাহেই আমাদের চ'লে যেতে হবে।

বীরেশ বললে, সহোদর ব'লে যাকে স্বীকার করলেন, সে আপনাদের ছাড়বে কেন ? আমার কি কোনো শক্তি নেই আপনার দুঃসময়ে এসে দাঁড়াবার ?

আছে বৈকি ভাই।—অনিল বললেন, তুমি আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়েছ, এও জানি তুমি অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারো আমাদের জন্যে। তবু তাকে নিঃসঙ্গ নিরিবিলি থাকতে হবে, ডাক্তারের এই হ'লো উপদেশ।

ললিতকে কি পাঠিয়ে দেবো ?

না ভাই, তারও দরকার হবে না। অসুখটা যে ভালো নয়, মোটামুটি এই পর্যন্তই কেবল বলতে পারি। অবশ্যই এটা আমার দুর্ভাগ্য, আত্মীয়স্বজন কাউকে কাছে রাখা সম্ভব হ'লো না।—একটু থেমে অনিল পুনরায় বললেন, খুলনায় যাচ্ছি, কিন্তু সম্ভবত সেখান থেকে ছুটি নিতে হবে। হয়তো দূরদেশে কোনো নদীর ধারে গিয়ে আবার বাসা বাঁধবো।

নলিনী উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে চোখের জল মুছে সে অনিলের ঘরে ঢুকে দেখলো, অনুশীলা নিঃসাড়ে প'ড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে সে কপালে হাত রেখে দেখলো, অন্যদিনের মতো আজো তার জ্বর এসেছে। দিনের বেলায় বিশেষ জ্বর থাকে না, কিন্তু সন্ধ্যার দিক থেকে একটু বাড়ে। দেড়মাসের মধ্যে তার চেহারার বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে।

এ কি, কাঁদছিস অনু ?—জেগে ছিলি এতক্ষণ ?

অনুশীলা ভগ্নকণ্ঠে বললে, কাঁদলে ত' অসুখ সারে না ভাই !

নলিনী কাছে ব'সে বললে, অসুখের জন্য কাঁদবি, এত ছেলেমানুষ তুই ত' নয় অনু। তবু তোকে ব'লে রাখছি তোর চোখের জল যাতে না পড়ে তার চেষ্টা আমি করবো।

ম্লান হেসে অনুশীলা বললে, এর মানে জানিস ?

জানি।

পারবি ?

আত্মসংবরণ ক'রে নলিনী বললে, কেমন ক'রে পারবো তা জানি নে। তবে তোর চ'লে যাবার সময়ে এ কথা না বললে চলবে কেন, ভাই ?

অনুশীলা কিয়ৎক্ষণ থামলো। তারপর মুখখানা ফিরিয়ে ঘরের ভিতর এদিক ওদিক দেখে মৃদুকণ্ঠে বললে, ওকে চা দিয়েছিস?

বীরেশকে? হ্যাঁ।

কিছু বললে?

নলিনী চুপ ক'রে রইলো। উত্তর না পেয়ে এই নিঃসন্দিগ্ধা নারী সরল বিশ্বাসে বললে, ওর মনের চেহারা কেবল আমিই জানি রে। আঘাত যখন খায় চুপ ক'রে থাকে, ব্যথা যখন পায় একলা ভাবতে বসে। দশ বছর ধ'রে দেখলুম অদ্ভুত সংযম, আশ্চর্য শক্তি। কত খুঁচিয়েছি, কত মাতিয়েছি—কিন্তু দেখেছি স্তব্ধ সমুদ্র। হয়ত ও অত বড় নয়, অত বিরাট নয়,—কিন্তু মন দিয়ে ওর মন্দির গড়েছি আমার মনে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো।

নিশ্চল হয়ে নলিনী বসেছিল।

অনুশীলা বলতে লাগলো, আজ সময় হয়েছে ওর চ'লে যাবার, বিদায় নেবার···ওকে···ওকে চলে যেতে বল্ ভাই···হোক্ অন্ধকার রাত, ও যেন আর না থাকে। সকালবেলায় দেখলে আবার ভুলে যাবো, আবার হয়তো ভুল করবো!

নলিনী বললে, কেন যেতে বলছিস এত তাড়াতাড়ি?

একবার নিশ্বাস নিয়ে অনুশীলা বললে, দলিলখানা দেবার জন্য ওকে আনিয়েছিলুম, আমার শেষ প্রণাম ওকে জানানো হয়েছে।

মনে মনে নলিনী চমকে উঠলো। কিন্তু মৃদু আলোয় তার মুখের চেহারা লক্ষ্য না ক'রে এই অন্তর্দৃষ্টিহীনা নারী বলতে লাগলো, কী চোখ, প্রতিভায় ধক্-ধক্ করছে; কী আশ্চর্য রূপ—কাছে এসে দাঁড়ালে গায়ে আলো পড়ে।···কিন্তু রাখতে আর পারলুম না নলিনী। আজ স্বামীর অধিকার সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে চাই···আমি জানি উনি আজকাল কী চাইছেন—

দাদা কি কিছু বলেছেন?

বলেননি, কিন্তু প্রকাশ করছেন। ব্যথা দিতে চান না, কেবল ভদ্রভাবে স'রে যেতে চান।—হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতে লাগলো, মাঝে মাঝে ভয়ানক বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করে,···ইচ্ছে করে বুকের আগুনে সব পুড়িয়ে দিই···কিন্তু এ-ই বা মন্দ কি! ভালো যাকে লাগলো, নাই বা পেলুম তাকে। পথের ধুলোয় কুড়িয়ে পেয়েছিলুম কোহিনুর, মুকুটে সে স্থান পেলো, এই ত' আনন্দ!

অধীর ঔৎসুক্য দমন করা সত্ত্বেও নলিনীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, তোর এত যে ভালোবাসা, বীরেশ কি তার কোনো প্রতিদান দিতে পারলো না? ঠিক ক'রে বল্ ত' আমাকে?

অন্ধ অশ্রুজলের মধ্যে অনুশীলা একবার উপর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর গভীর মৃদুস্বরে বললে, কি জানি ভাই, একথা ত' ভাবিনি। পূজোই করেছি, প্রসাদ চাইনি। হয়ত পাবার লোভ মনে মনে ছিল, কিন্তু দেবার লোভে অন্ধের মতো হাতড়েছি। মন যদি না পেয়ে থাকি দুর্ভাগ্য—কিন্তু সর্বস্বান্ত হ'তে পেরেছি এই ত' আনন্দ! তুই একটি কাজ কর ভাই, উনি চাইছেন—বীরেশকে তুই সরিয়ে দে।

নলিনী বললে, তোকে এ অবস্থায় দেখে সে যদি না যেতে চায়?

না না—অনুশীলা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, যেমন ক'রে পারিস ভাই, ওকে সরিয়ে দে। উনি চান না, আমি বীরেশের মুখ দেখে বিদায় নিই। এই ব'লে সে থেমে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত নম্র হাসি হেসে পুনরায় বললে, ওর চাহনির মধ্যে হয়তো বিষ আছে, দেখলে আমার মনে বিষক্রিয়া শুরু হয়।

অনুশীলা চুপ করলো। নিজের মনে সে যেন ডুব দিল। নলিনী আর তাকে কোনো প্রশ্ন করলো না, কেবল একসময়ে তার আড়ষ্ট অবশ দেহটাকে নাড়া দিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিষক্রিয়া যে তারও ভিতর শুরু হয়েছে, একথা অনুশীলা জানতে পারলো না। দাদার কাছে ঘুণাক্ষরেও এই অদ্ভুত কাহিনীর আভাস প্রকাশ করা চলবে না; তাঁর অবশিষ্ট জীবন বিষময় হয়ে উঠবে। বীরেশকে আঘাত দেওয়া চলবে না, কারণ এই বিপথগামিনী রোগীর ভালোবাসা অসম্মানিত হ'তে পারে। তার নিজের মানসিক চেহারাও ব্যক্ত করা অসম্ভব; এখানে তার আত্মসম্মান বহু প্রকারে লিপ্ত। আর কিছু না হোক, তার আচরণে অথবা ভঙ্গিতে অনুশীলা বিন্দুমাত্র বেদনা বোধ করতে পারে, এমন কাজ সে করবে না।

কিন্তু রাত্রি অন্ধকার নয়। বাইরে এসে মাঠের মাঝখানে নলিনী এগিয়ে এলো। বোধ করি পূর্ণিমার ঠিক পরেরই কোনো একটা তিথি। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সীমানার পারে সমগ্র পল্লীপ্রান্তর জ্যোৎস্নায় পুলকিত। শীতের আড়ষ্ট জড়তার উপর দিয়ে শূন্যলোকে আসন্ন বসন্তের একটা মুখচোরা সংবাদ যেন আনাগোনা করছে। বাইরের হাল্কা বাতাসে তার জটিল চিন্তার উপরে স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিল। এক এক পা ক'রে সে এগিয়ে চললো।

সে অনুশীলা নয়। বীরেশকে দেখলে তার মনে বিষক্রিয়া শুরু হয় না—না দেখলে জগৎসংসার শূন্যতায় ভ'রে ওঠে না। কলেজী জীবন যাপন করলেও নিতান্তই সে বাঙালী ঘরের মেয়ে, অতিশয় প্রাণের উত্তাপ নিয়ে সে ঘর করে না। বিবাহ সে করেনি, কিন্তু ব্যর্থও হয়নি। দাবী হয়ত তার ছিল, কিন্তু

কলরব তুলে সে দাবী প্রতিষ্ঠা করতে ছোটেনি। বীরেশ যেদিন বিবাহ করলো, সে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল; যেদিন দরকার হ'লো, নিঃশব্দে দূরে স'রে গেল। অভিমান কিছু সে রাখেনি, বিরোধ বাধায়নি, দূরে চ'লে যাওয়াই ছিল তার স্বভাবের মস্ত বড় দিক—তার প্রসাদগুণ, সে শান্তিবাদিনী। সেদিন পারিবারিক ঝাপটার ভিতর থেকে বেরিয়ে বীরেশের হাত ধ'রে চ'লে গেলে নাটকটা জমতো বটে, কিন্তু আত্মপরতার অপবাদে তার মাথা হেঁট হ'তো। বিদেশ থেকে চিঠিপত্র চালাচালির মারফতে বীরেশের মন নিয়ে টানাটানি সে করেনি। বৃহৎ মুক্তির মধ্যে নিজেকে সে ডুবিয়ে বসেছিল; তার শুভবুদ্ধি কোনো সুযোগ-সুবিধাকেই প্রশ্রয় দেয়নি। আজ অনুশীলার মধ্যে নিজের সর্বনাশের চেহারা দেখেও সে একবিন্দু টলেনি। অথচ প্রায় গত দুমাস ধ'রে অনুশীলার স্বীকারোক্তি শুনে শুনে প্রবল বিদ্রোহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। আতিশয্যের ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভ থেকে প্রসন্ন চিত্তবৃত্তিকে বাঁচিয়ে চলার নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষা সে পার হয়ে এলো এই সান্ত্বনায় যে, নিচেকার সমুদ্র উত্তাড়িত তরঙ্গভঙ্গে যতই আন্দোলিত হোক, উপরের ধ্রুবতারা চিরদিনই অচপল, দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে চিরদিনই সে পথ নির্দেশ করে।

দশবছর পরে আজ বীরেশের সঙ্গে দেখা—নলিনীর দুই কান ভ'রে এই কথাটি গুঞ্জন করতে লাগলো। পুরাতন এক একটি মধুর স্মৃতির দিন সে জপের মালার মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উপভোগ করেছে। নগরের কত রহস্যময় পথে-পল্লীতে আজো দু'জনের কত পদচিহ্ন প'ড়ে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কত সন্ধ্যার অন্ধকার, কত মধ্যাহ্নের দীপ্ত আকাশ আদর্শবাদীর স্বপ্নে থরো-থরো হয়েছিল। নিভৃত সান্নিধ্যের রোমাঞ্চ-কল্পনাই ছিল প্রধান, ওর পরে যে আবার দৈহিক মিলনের কথা ওঠে, এ কথা উভয়েরই জানা ছিল না। ওটা অনভিজাত মনোবৃত্তির কথা, ওটাকে নিয়ে নীচ জাতিরা কারবার করে, ভদ্রসমাজে দেহের স্থান নেই। রস-সাহিত্য দেহের মিলনের অনেক কথা তারা পড়েছিল, কিন্তু সাহিত্যলোক থেকে বাস্তব জীবনের উদাহরণে তারা কোনোদিন উঠে আসেনি। শেষকালে জৈবশাস্ত্র আলোচনা করতে গিয়ে নলিনী যেদিন আসল কথাটা আবিষ্কার ক'রে বসলো, সেদিন একলা ঘরে ব'সে তার কী অশ্রুপাত! কিন্তু ওই পর্যন্ত, তারপর ঘটনাচক্রে দুর্ভাবনাটা শূন্যে মিলিয়ে গেল। মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠকাল নাকি যৌবনযুগ, কিন্তু সেই চেতনায় তার আগুন লাগলো না কোনোদিন! জাগ্রত চক্ষেই দীর্ঘপথ সে পার হয়ে এলো। শরীর-বিজ্ঞান নিয়ে তার কখনো অশান্তি ঘটলো না।

কিন্তু এদেশে সে এলো কী জন্য? এখানে গোরুর গাড়ির চাকার নিচে

প্রাচীন পল্লীপথ সভ্যতার ক্ষুধায় আর্তনাদ করে, এখানে নাগরিক জীবনের কোনো উপকরণ নেই। অনাড়ম্বর কেবল নয়, নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা। নগরের জীবন আলোড়িত, উৎক্ষিপ্ত, বিপর্যস্ত; বিপুল প্রাণসমুদ্র ফেনায়িত, দ্রুততায়, ব্যস্ততায়, চলাচলে, কোলাহলে সেখানে নিত্য অবিশ্রান্ত অশান্তি। কোনো এক যন্ত্র-জাদুকর অলক্ষ্যে ব'সে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর ক্ষুধিত চিত্তবৃত্তির লোলুপ জিহ্বার কাছে অগণ্য আকর্ষণ সৃষ্টি ক'রে চলেছে। যেন কোন্ প্রকাণ্ড জুয়ারীর মেলার চারিদিকে মুহুর্মুহু অসংখ্য ভাগ্যপরীক্ষার মাতামাতি, কিন্তু এখানে অন্য চেহারা। এখানকার প্রশান্ত দিগন্তভরা আকাশে উঠে এসে দাঁড়ায় সন্ধ্যাতারকা; সারা দিনমান ঝরাপাতার ঝরো ঝরো মর্মর। কোন্ একটি মানুষ কোন্ পথ ধ'রে কত দূর প্রান্তর পার হয়ে যায়—তার ব্যস্ততা কিছু নেই। রাখালিয়া গান ভেসে আসে মধ্যাহ্ন রৌদ্রের পথে,—যেন ওর মধ্যে কত অশ্রুর অশ্রুত ইতিহাস। ঘাটে বাঁধা থাকে নৌকা, মাঠে গোরু চরে, ছোলার চারায় ফুলের কোরক দেখা দেয় ধীরে ধীরে, ফসল-কাটা মাঠের পথ ধ'রে বোঝা মাথায় নিয়ে চলে পসারী,—এরা সব যে কোন্ আবহমান কালের অব্যক্ত সঙ্গীতের সুরে ভরা, যেন ওরা সবাই দিনমানের পটে কোন্ অজ্ঞাত অর্থের তুলি বুলিয়ে চলেছে। কী যে মধুর বেদনার চিহ্ন জাগে রৌদ্র দীপ্ত আকাশে, কী যে আনন্দের যন্ত্রণা, সুখের কান্না কেঁদে ওঠে মলিন জ্যোৎস্নায়, সে নলিনী দেখেছে। একটি অনামা পাখী আকাশ মুখর ক'রে চ'লে যায় শূন্যে—কী অর্থে সে কাঁদায় দিগন্ত, তাই কেবল একান্ত মনে শুয়ে শুয়ে ভাবা, কেবল উড়ো চিন্তার এলোমেলো জাল বোনা, শুধু নিমেষ-নিহত চক্ষের কোণ বেয়ে অকারণ আতপ্ত অশ্রু বেয়ে পড়া। মিথ্যা নয়,—সে এসেছিল প্রিয়-সান্নিধ্যে অতীত আনন্দের দিনগুলি আর একবার স্মরণ ক'রে যেতে; হারানো-বেদনার সুর, হারানো স্বপ্ন, হারানো অতীত,—একবার ওদের যবনিকা তুলে ধ'রে দেখে নেওয়া বুক ভ'রে। কিন্তু সার্থক হ'তে পারলো না তার আশা, চিত্তক্ষোভ আর অশান্তির ঝড়ঝঞ্ঝায় পাক খেয়ে সে ব্যর্থ হ'লো,—তাকে আবার নিঃশব্দেই ফিরে যেতে হবে।···কোথায় যাবে একথা তার জানা নেই, আবার কোন্ দেশের কোন্ নিভৃত কোণে গিয়ে সে অস্থায়ী বাসা বাঁধবে তাও অস্পষ্ট,—তবু যেতে তাকে হবে। কাজ একটা কোথাও খুঁজে নেবে বিদেশে গিয়ে; বৈরাগিণীর জপের মালা আবার তুলে নেবে হাতে। বয়সের সীমান্তে সে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, দূরের দৃষ্টি ভীষণ হ'তে তার আর দেরি নেই।

···কে, দাদা নাকি, কোথায় চললেন?

অদূরগামী ছায়ামূর্তি জ্যোৎস্নায় থমকে দাঁড়ালো। বললে, আমি বীরেশ, …তুমি এদিকে যে?

ওঃ তুমি!—নলিনীর নিশ্বাসটা নামলো—বললে, এমনি একটু বেড়াচ্ছি।—কোথায় চললে?

বীরেশ বললে, চাকরটা ব্যাগ নিয়ে গেছে ঘাটে, আমি নবনগর চললুম। নৌকায় যাবো।—তুমি এখানে ক'দিন আছো?

নলিনী বললে, কালকেই যাবো মনে করেছি। প্রায়ই অমুর কাছে আসতুম। কিন্তু দাদারা ত' যাবেন, আর আসবার দরকার হবে না।

বীরেশ বললে,--নলিনী, জানতে পারলুম এঁদের সঙ্গে আর আমার দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভালো। অবশ্য এতে আমার দুঃখ করা উচিত নয়। তবে কি জানো, মিসেস্ সেনের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম, তাঁর সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি খুবই অশান্তিতে থাকবো।…তুমি কি জীবনবাবুর ওখানে এখন থাকবে কিছুদিন?

নলিনী বললে, পরের বাড়ি, বেশিদিন থাকা অসুবিধে।

এর পরে যাবে কোন দিকে?

একটি মুহূর্ত নলিনী চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, তুমি এত ক'রে জানতে চাইছ কেন? এতদিন ত' জানতে চাওনি?

বীরেশ বললে, নালিশ অবশ্য তুমি করতে পারো, তবে তোমার সম্বন্ধে দুর্ভাবনা কোনোদিন আমার ছিল না। আজও নেই।

হাসিমুখে নলিনী বললে, নেই কেন শুনি?

জানতে কিছু চেয়ো না নলিনী, কেবল বুঝে নাও। আজ খুবই আঘাত নিয়ে যাচ্ছি, অত্যন্ত অভাবনীয় ঘটনা সব ঘ'টে গেল।—বীরেশ বললে, আমার ইচ্ছে মিস্টার সেনরা চ'লে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাকো, রোগা মানুষের অনেকটা সাহায্য হবে।

কিন্তু এঁরা যখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থাকতে চান, তখন ত' আমাদের উদ্বেগের কারণ নেই!

তোমার থাকারও দরকার কি ওঁরা মনে করবেন না?

নলিনী বললে, সেটা কাল সকালে বুঝতে পারবো।

বীরেশ কয়েক পা এগিয়ে বললে, ঘাট অবধি যাবে তুমি? ফেরবার পথে চাকরের সঙ্গে আসতে পারবে।

নলিনী হেসে বললে, একদিন বর্ষার জলে তুমি বিদায় নিয়েছিলে, আজ আবার নদীর জলে চ'লে যাচ্ছ। এ মন্দ নয়! বাকি রইলো চোখের জল।

বীরেশ বললে, মনে পড়ে না আর সেকালের কথা। সহজে সব ভুলে যাই ব'লেই আজো নিজেকে সুস্থ রাখতে পারি।

মনে না পড়ায় কিন্তু বিপদ আছে।

কেন ?

নলিনী আবার হাসলো। বললে, মনে না পড়লে তোমার সঙ্গে এভাবে দেখা হবার অধিকার খুঁজে পাই নে। পেছনের শক্তিটাই সামনের দিকে ঠেলে।

বীরেশ বললে, তুমি একদিন অতি দুঃসময়ে এক হাজার টাকা পাঠিয়েছিলে মনে পড়ে ?

পড়ে।

সে-টাকা শোধ করিনি, কারণ তার দাম অনেক। কিন্তু নবনগরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছি তোমার নামে,—নাম পদ্মাসনা !

বিস্মিত হয়ে নলিনী বললে,—আমার নামে !

হ্যাঁ, তোমার নামে। কারণ দ্বিতীয় নাম আর কিছু আমার নেই। চলতে চলতে বীরেশ বললে, কারো কারো সঙ্গে স্নেহ-ভালোবাসায় আমি জড়িত তুমি বুঝতেই পেরেছ, কিন্তু তুমি সেখান থেকে অনেক দূরে···হ্যাঁ, বয়স হয়েছে, এখন হৃদয়দেবতা বড় বেমানান। কিন্তু মরুভূমি মরুভূমিই থেকে গেছে নলিনী, সৌভাগ্য সাগরের তরঙ্গ কোনো ফসলই সেখানে ফলায়নি, এই কথাটা জানিয়েই আজকের মতো তোমার কাছে বিদায় নিতে চাই।

নলিনী চুপ ক'রে রইলো। বীরেশ বলতে লাগলো, দশ বছর ধ'রে প্রকাণ্ড অভিশাপ নিয়ে বেড়াচ্ছি অকারণে, জীবনের সবচেয়ে বড় দিকটাই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

নলিনী বললে, কিন্তু অভিশাপ অকারণ ত' নয় !

অকারণ বৈকি ! তোমরা যাকে স্ত্রী ব'লে চালাতে চাও, আমি জানি তাকে বিয়েই করিনি। অথচ পারি আমি সব সামাজিক নীতি ভেঙ্গে দিতে ; নিজের চরিত্রকে আজও আমি চূর্ণ ক'রে দিতে পারি দুর্নীতি আর বিপ্লবের নেশায়।

ঘাটের কাছাকাছি তারা এসে পৌছুলো। নলিনী বললে, আচ্ছা, একটি কথা তুমি বলবে আমায় স্পষ্ট ক'রে ?

মুখ ফিরিয়ে বীরেশ বললে, অবশ্যই, বলো।

তুমি কি অনুর ওপর কিছু অবিচার করেছ ?

অবিচার !—মিসেস্ সেনের ওপর ? কিছুমাত্র না।

সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে আরো দু-একটা অধীর প্রশ্ন নলিনীর মুখের কাছে এসেও

মিলিয়ে গেল। বীরেশ বললে, উনি আমার অতিশয় স্নেহের পাত্রী। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলুম না, শেষকালে বোধহয় অনুশীলা ভুল ক'রেই থাকবে। হয়তো এই পর্যন্তই সীমারেখা নলিনী। এরপর হয়তো মিস্টার সেনের ওপরই কিছু অবিচার হ'তে পারতো। কিন্তু তা হ'তে দেবো না, নলিনী। কারণ তাঁর কাছে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। আমি জানি, বোধ হয় এই প্রশ্নই তোমাকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। আমি জানি, কী উদ্বেগ নিয়ে তোমার দেবীপুরে আসা।

নলিনীর চোখে জল এলো। বললে, এরপর যেখানেই যাই, পা আমার টলবে না বীরেশ।—পাওনা কিছু নেই, দেনাও কিছু থাকা বে-আইনী। তবু মনের স্বস্তিতে যেন কিছুদিন থেকে ঘুন ধ'রে গিয়েছিল।

বীরেশ সাগ্রহে বললে, তুমি যাবে নবনগরে আমার সঙ্গে?

না।

কেন? কেন যাবে না তুমি?

সেখানে আমার মন্দিরই থাক্, আমার ঠাঁই নেই। যার শক্তিতে তুমি সৃষ্টি করেছ নবনগর, যার জন্যে মাথায় তোমার মুকুট উঠেছে, সেই অভাগীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতাও কম নয়, বীরেশ।—বলতে বলতে ঝর ঝর ক'রে নলিনীর চোখে জলের ধারা নামলো।

আচ্ছা, থাক্ থাক্। এবার আমি যাই।—ব'লে বীরেশ দ্রুতপদে নৌকায় গিয়ে উঠলো। তারপর ভগ্নকণ্ঠে হেঁকে বললে, ওরে রামু, পিসিমাকে সাবধানে বাড়ি নিয়ে যা।

এগারো

নবনগরে বীরেশের বাড়িটি নতুন পদ্ধতিতে তৈরী। নিচের দিকটা পাকা গাঁথুনি, কিন্তু উপরের অংশটা সম্পূর্ণ কাঠের আয়তন। এ বাড়ির কল্পনাটা বীরেশের নয়, ললিতের। ললিত অনেকদিন ছিল বিলাতে। সে দেশের পল্লীগ্রামের মধ্যযুগীয় বাংলোর ছাঁচটা সে তুলে এনেছিল। দোতলার মেঝে, দেয়াল, আচ্ছাদন—সমস্তই কাঠের। এদিকটা পার্বত্য অঞ্চল ব'লে শীত বেশী,—কাঠের বাড়িতে ঠাণ্ডা আটকানো নাকি অনেক সহজ। তাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড দক্ষিণমুখী প্রাঙ্গণ। পাহাড়ী গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা আর চম্পায় সে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ। বাইরে থেকে অভ্যাগতরা এলে এ-বাড়ির নিজস্ব নির্মাণ-কৌশল তাদের চোখে পড়বেই। থমকে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, বাংলাদেশে

এমন মৌলিক পদ্ধতির বাসভবন অভিনব। ললিত উপরতলার চৌহদ্দিঘেরা বারান্দায় পুষ্পলতার প্রচুর সমাবেশ ক'রে রেখেছে। বারান্দায় দাঁড়ালে উদার দৃষ্টি চ'লে যায় পার্বত্যপল্লী ছাড়িয়ে দূর শস্যপ্রান্তরে, সেখান থেকে পূর্বদক্ষিণ দিগন্তরেখায়—যেদিকে বালু-কিরণলেখাঙ্কিত সুচিত্রার আঁকা-বাঁকা গতি রহস্যময় ইসারার পথে মিলিয়ে গেছে। পশ্চিমে দেখা যায় নবনগরের বিপুল ঐশ্বর্যের দৃশ্যাবলী, পৌরসভার প্রাসাদ, পূর্তবিভাগ, সমবায় সমিতি, বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক,—ইত্যাদি বহু প্রকার জন-প্রতিষ্ঠান। উত্তরে দূরে যন্ত্রপাতির কারখানা, হাট-বাজার, আদালত, থানা, ওষধি-পরীক্ষাগার, শ্রমিক নরনারীর সারিবদ্ধ আবাস। পূর্বদিকে নদীর ধার অবধি ফুলের বাগান-ঘেরা নিরিবিলি সুন্দর ছোট ছোট রাঙামাটির পথ। চারদিক থেকে সমস্ত পথগুলি নগরের নাভিকেন্দ্রে যেখানে মিলেছে, সেই সংযোগস্থলে বিশাল মন্দির 'পদ্মাসনা'। সেখানে প্রায়ই যাত্রাগান, কথকতা ও কীর্তন ইত্যাদির আসর বসে। সন্ধ্যার সময় মন্দিরে মঙ্গল-আরতির ঘণ্টা বাজে। নদীর ওপারে যখন প্রত্যূষে সূর্যোদয় হয়, তার প্রথম রক্তিম রশ্মি নিদ্রিত নবনগরের উপর দিয়ে এসে পদ্মাসনার শিরশ্চুম্বন করে। সেই দৃশ্য দেখার জন্য প্রতিদিন প্রভাতে বীরেশ গিয়ে জানলায় দাঁড়ায়—এই নিয়ম সে পালন ক'রে আসছে অনেকদিন থেকে। একটি দিনও ব্যত্যয় হয়নি, উৎসাহও কমেনি।

মনোবিকার তার ঘটেছে অনেকবার, কিন্তু কখনো প্রশ্ন জাগেনি তার মনে। একথা সে ভাবেনি, এ সমস্তর অর্থ কী! আজ মধ্যাহ্নের দীপ্ত ধূসর আকাশ মনে মনে অসংখ্যবার সে পরিক্রমা ক'রে চলেছে, কেবল প্রশ্নের জবাবটি হাতড়ে ফিরেছে। হাতে তার সেই দলিল, এই দলিলটি কয়েকদিন সে পড়বার অবসর পায়নি। অনুশীলার নামে ছিল নবনগরের জমির ইজারা নেওয়া, আজ নিঃস্বার্থভাবে তাকে দান ক'রে হস্তান্তর ক'রে দেওয়া হয়েছে। সে এখন আর একমাত্র প্রতিনিধি নয়, সম্পূর্ণ মালিক। এমন ব্যবস্থাও করা আছে যে, ভবিষ্যতে এ নিয়ে কোনোদিন আইনের তর্কও উঠবে না। এই দানের মধ্যে ললিতের উল্লেখ কোথাও নেই, অর্থাৎ বীরেশের বেতনভোগী সহকর্মী ভিন্ন সে আর কিছুই নয়। সহোদর ভাইকে অনুশীলা সম্পূর্ণ দয়ার পাত্র হিসেবে বীরেশের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেছে। অথচ এটা শোভন নয়, সঙ্গতও নয়।···দলিলটা পড়তে পড়তে সে অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল সুচিত্রার দিকে চেয়ে—ওরই জলধারা বেয়ে দক্ষিণপথে গেলে কোনো একখানে দেবীপুরের ঘাট। সেই অপরিচিত ঘাটে বীরেশ আর কোনোদিন নামবে না।···যার হাতে ভাগ্যলক্ষ্মীর অকৃপণ প্রসাদ সে পেলো, তার কাছে গিয়ে দেখা দেবার অধিকার সে হারালো। অপরাধের জন্য নয়,

অপরাধী হয়ে ওঠার সম্ভাবনায়। কেউ যদি এই মুহূর্তে এসে তাকে প্রশ্ন করে, অনুশীলার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?—সে জবাব দেবে—ভালোবাসার। তার জবাবে অস্পষ্টতা কিছু নেই, অস্পষ্টতা আছে মানুষের সমাজব্যবস্থায়। সে জানে ভালোবাসার মূল সংজ্ঞা দ্বিধাবিভক্ত নয়, কেবল পাত্রভেদে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা। অনুশীলাকে সে ভালোবাসে; তার চঞ্চল চোখে, চপল মনে, উদ্দাম আচরণে, প্রবল প্রাণধারায় প্রচণ্ড প্রবাহে সে একদা পেয়েছিল অপরিসীম অনুপ্রেরণা। কী প্রচণ্ড সংগ্রাম করলো আত্মপ্রকাশ করবার, কিন্তু তা'তে ব্যর্থ হ'লো ব'লেই রুগ্‌ণ হ'লো। শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ বাইরের দিকে হ'লো না, তাই ভিতরে ভিতরে সেই পিঞ্জরাবদ্ধ শক্তি নিজেকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লেগেছে। এই হ'লো অনুশীলার প্রাণের বিচিত্র নিয়ম। সে যেন একটা সংহত বিদ্যুৎশক্তি, যদি তাকে কাজ লাগানো না যায় তবে নিজেকে দগ্ধ করতে, নষ্ট করতে, তার কুণ্ঠা নেই। সে ভালোবেসেছে, কারণ ফুলের স্বভাব গন্ধ বিলোবার,—লোহার কৌটায় বন্ধ ক'রে রাখলেও গন্ধ বিলিয়েই সে শুকিয়ে মরে। তাকে নিন্দা করো, দুর্নীতি বলো, অসামাজিক মনে করো,—কিন্তু ভালোবাসার একমাত্র পরিণাম যে দুর্নীতি নয়, একথা বিশ্বাস করলো না কেউ। অনুশীলা হ'তে পারতো বীর-প্রসবিনী জননী, হ'তে পারতো সুভদ্রার মতো ভগ্নী, হ'তে পারতো রণরঙ্গিণী বীরাঙ্গনা,—কিন্তু ভাগ্যের চক্রান্তে হ'লো রুগ্‌ণ, প্রকাণ্ড মৃত্যুর তপস্যায় ব'সে নিজের চারিদিকে বিধিনিষেধের আবরণ তাকে টেনে দিতে হ'লো। আজ নলিনী উপস্থিত থাকলে বীরেশ সহজে বলতে পারতো,—অনুশীলাকে সে ভালোবাসে। অনিলের স্ত্রী মনে ক'রে নিঃসঙ্কোচেই সে ভালোবাসে। অনিল জানুক, নির্ভুলভাবে জানুক, তার স্ত্রীর মূল্য কত বড়—স্ত্রীকে সে সম্মান করুক, কারণ সেই নারীর করতলে বাইরের শ্রদ্ধা, বাইরের সম্মান, বাইরের ভালোবাসা এসে পৌঁছয়। অথচ এই মনোভাবের বিশ্লেষণ তার কাছে অস্পষ্ট নয়। অনুশীলাকে সে ভালোবাসে, এর চেয়ে বড় কথা, এর চেয়ে সত্য কথা আর কিছু নেই। ঈর্ষা দিয়ে একে অপমানিত করা সম্ভব নয়, সমাজনীতি দিয়ে একে বন্দী করা সহজ নয়, একে অস্বীকার করলে মানুষের সমগ্র প্রাণধর্মই কলঙ্কিত হবে। সমগ্র নবনগরে, সমস্ত মানুষের সমাজে ঘোষণা ক'রেও সে বলতে পারে—অনুশীলাকে সে ভালোবাসে। নদী সৃষ্টি করে জনপদ রুক্ষ প্রান্তরকে করে শস্যশালী, পিপাসার্তের তৃষ্ণা সে নিবারণ করে,—সুতরাং নদীকে কে না ভালোবাসে?···কে না ভালোবাসে জীবনদায়িনী জগদ্ধাত্রী প্রকৃতিকে? কে না ভালোবাসবে অনুশীলাকে?··এই বীর্যবতী রমণী তার তরবারির ফলকের খোঁচায় জাগিয়ে তুলেছে বীরেশের আত্মশক্তি, আবিষ্কার

করেছে তার গুপ্ত প্রতিভা, মাতিয়ে তুলেছে তার কর্মোৎসাহ। মানুষের বন্যা চলেছে পৃথিবী ভ'রে, জন্মমৃত্যুর নিত্য আবর্তনে সৃষ্টি ও সংহারের খেলা চলেছে, —সেই বন্যার স্রোতের ভিতর থেকে একদা ওই অনুশীলাই তাকে চিনে বা'র ক'রে কপালে জয়তিলক এঁকে দিয়ে বলেছিল,—প্রতিভা! সে যে প্রতিভা, একথা শুনে বীরেশ সেদিন চম্‌কে ওঠে, সে যে অমৃতের পুত্র এ কথায় সে অভিভূত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।···তার সেবা আর সৃষ্টির জন্য বিশ্বসংসার মৌন অধীর আগ্রহে চারিদিকে প্রতীক্ষা করছে, ওই নারীর কাছে এই মহামন্ত্র শুনে বুকের ভিতরকার রক্তোল্লাস অসহনীয় যন্ত্রণায় সেদিন আত্মপ্রকাশ করতে চায়। ক্ষমতার ক্ষুধা ছিল আবাল্য তার মনে, অনুশীলা সেই ক্ষমতা হাতে এনে দিল। ঘুমন্ত পরাভূত পৌরষকে রমণীর সহজাত মাদক জারকে উত্তেজিত উন্মত্ত ক'রে ওই অনুশীলা একদিন মানুষের বৃহৎ কল্যাণের আশায় তাকে দুঃখে আর দুর্গমে ঠেলে দেয়। অনুশীলাকে ভালোবেসে সেদিন থেকে সে সার্থক হ'তে পেরেছিল।

নীচের বারান্দায় ললিতের গলার আওয়াজ শোনা যেতেই তার চমক ভাঙলো। অলস হয়ে সে ব'সে রয়েছে অনেকক্ষণ, আজকে কাজকর্মের দিকে তার বিশেষ মনোযোগ নেই। সামনে দলিলখানা খোলা পড়েছিল, সেখানা মুড়ে সে চোখের কাছ থেকে সরিয়ে রাখলো। ললিতের চোখে এখানা পড়া খুবই বেদনাদায়ক হ'তে পারে।

বীরেশের মহল আলাদা, এদিকে ললিত ভিন্ন বিশেষ আর কারো আসবার হুকুম নেই। দর্শনার্থীরা নিচে আপিসে এসে অপেক্ষা করে। এ মহল জনহীন, রূপকথার রাজপুরীর মতো। প্রতি ঘরে আসবাব আর সাজসজ্জা ঠাসাঠাসি, কিন্তু মানুষ কোথাও নেই। অপরিমেয় ঐশ্বর্যময় প্রেতপুরীর ভিতরে বীরেশ থাকে একা।

নিজের মহল পেরিয়ে এদিকে এসে বারান্দা পার হয়ে ললিত বীরেশের সামনের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ব'সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এতক্ষণ পরে একটা চুরুট ধরিয়ে বীরেশ বললে, তিন-চারদিন তুমি নেই, তাই ভাবছিলুম। কাল বুঝি আর আসা হয়ে উঠলো না?

ললিত বললে, অত গণ্ডগোল, অত লগেজ সামলানো, তারপর রোগীর তদ্বির, চারদিকের দেনা-পাওনা মিটোনো,—এই সব সারতে গিয়ে কাল আসাই হ'লো না। তারপর ভাবলুম, অনুশীলার এই অবস্থা, দ্বিতীয় আত্মীয় কেউ নেই,—আমার চ'লে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। ওদের জিনিসপত্র সবই রেখে গেছে, ওরা চ'লে গেল আজ সকালে।···কিন্তু রোগী সঙ্গে নিয়ে সাহেব কতদূর কী করবেন, বুঝতে পারলুম না।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন, ভাই?

মাথা হেঁট ক'রে ললিত বললে, না,—সে আর হ'লো কই!

কেন?

মাথা তুলে সে বললে, কি জানেন দাদা, সে অনেক কথা, অনেককালের কাহিনী।...তবে এইটুকু বলতে পারি, ভগ্নীপতি কখনোই আপনার হয় না।

বীরেশ বললে, কিন্তু ভগ্নী ত' আপনার!

জানি, কিন্তু ভগ্নী আর বিবাহিত ভগ্নী—এ দুটি বস্তু আলাদা। এ নিয়ে অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। এই দেখুন না, এত বড় বিপদ, কিন্তু কেউ এসে মাথা দিয়ে দাঁড়ালো না। কেন দাঁড়ালো না বলুন ত', সবই ওদের নিজেদের দোষ!...যাক্‌গে সে আলোচনা।

চুরুটে টান দিয়ে বীরেশ বললে, তাহ'লে এবার সত্যিই ওঁরা দেবীপুর ছেড়ে গেলেন, কেমন?—বাড়িটা কি খালিই প'ড়ে থাকবে?

আবার নতুন হাকিম কেউ আসবে নিশ্চয়ই।

তোমার ভগ্নীর অবস্থা কেমন দেখলে হে?

ভালো না।—ব'লে ললিত একটু থামলো। তারপর বললে, পরশু দিন রাত আটটা নাগাৎ খুব রক্তবমি হ'লো!

রক্তবমি!...

হ্যাঁ, অবস্থা ভালো না। মাঝখানে প্লুরিসি হয়েছিল, তার থেকেই ডেভেলপ্ করে। তবে একটু আশার কথা এই, আপাতত একটা লাঙ্ অ্যাফেক্টেড্।

বীরেশ চুরুটে একটা টান দিল।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তারপর ললিতই একসময় বললে ভালো কথা—নলিনীদেবীর সেদিন যাওয়া হয়নি। আজ সকালে তিনি খানপুর গেলেন। আপনাকে বলতে বললেন, তিনি দু'এক দিনের মধ্যেই কলকাতা রওনা হবেন। তারপর যাবেন উড়িষ্যার দিকে কী যেন একটা কাজের সন্ধানে। আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন।

বারান্দা পেরিয়ে একজন চাপরাশী একতাড়া ফাইল নিয়ে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো। একটা ফাইল তুলে নিয়ে কলমটা খুলে ললিত তাড়াতাড়ি কয়েকটা সই ক'রে দিল। সেগুলো আবার গুছিয়ে নিয়ে যাবার সময় চাপরাশী বললে, নিচে ঘোষসাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আচ্ছা, তুই যা।

বীরেশ ধীরে ধীরে বললে, রক্তবমি হ'লো,—কই, আগে ত' এসব অসুখের কথা জানা যায়নি, ললিত?

ললিত বললে, অনুশীলার স্বাস্থ্য চিরকালই ভালো। মা বলতেন, পাথরকুচি। ভয়ানক দুরন্ত আর অবাধ্য ছিল। মার খেলে কিংবা প'ড়ে গিয়ে মাথা ফাটলেও কাঁদতো না। ছেলে আর মেয়ের দল ওকে ভয় করতো। একবার একটা ছানা বেড়ালকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছুরি দিয়ে কুচি-কুচি ক'রে কেটেছিল,—চিরকালই ও ভারি নিষ্ঠুর! বাড়ির কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর মিল ছিল না, একেবারে আলাদা প্রকৃতি! এই দেখুন না, আমার কপালে আজো কাটার দাগ,—একটা সাঁড়াশির খোঁচা মেরেছিল।—হ্যাঁ, অসুখ-বিসুখ ওর কোনোকালেই হয়নি, দাদা। এত ভালো স্বাস্থ্য ব'লেই হয়ত এত বড় রোগে পড়েছে।

চুরুটটা মুখে দিয়ে দূরে সুচিত্রার সর্পিল প্রবাহের দিকে চেয়ে বীরেশ কেবল বললে, হুঁ, কিন্তু রক্তবমি, আশ্চর্য!

আপনি বসুন, আমি আসছি।—ব'লে একসময় উঠে ললিত বারান্দা পার হয়ে নিচের দিকে চ'লে গেল।

মিনিট দশেক পরে আবার সে যখন ফিরে এলো, বীরেশ তখনও নিশ্চল পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। হয়ত ললিতের পায়ের শব্দও তার কানে ওঠে নি। তাকে ডাকা উচিত কি না ললিত একবার ভাবলো, কিন্তু কর্তব্যের দিকে তার একটু তাড়া ছিল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে সে বললে, মিস্টার ঘোষ আবার এসেছেন, দাদা—

মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বীরেশ বললে, মিস্টার ঘোষ,—মানে, কে মিস্টার ঘোষ?

প্রকাশ ঘোষের কথা বলছি। ক'দিন থেকেই উনি হাঁটাহাঁটি করছেন। বলছেন, অন্যায় করেছি, ক্ষমা চাইছি, আর এমন কাজ হবে না—কোম্পানীর সমস্ত ক্ষতিপূরণ করতে রাজী।

সহসা বীরেশের সমস্ত মুখখানা রুদ্ধ আক্রোশে আর ঘৃণায় দপ্ দপ্ ক'রে উঠলো।

ললিত পুনরায় বললে, ভদ্রলোক খুবই অনুতপ্ত মনে হচ্ছে। বলছেন, আমাকে বরং মাস তিনেক সস্‌পেণ্ড্ করা হোক, কিন্তু চাকরিটা না চ'লে যায়। স্ত্রীপুত্র নিয়ে এ বাজারে—'

অসম্ভব, ব'লে দাওগে ললিত।—বীরেশের কণ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে উঠলো, জোচ্চুরির জায়গা নবনগরে নেই, এর ভিত্তি সাধুতার ওপর। আণ্ডাররেট্ দিয়ে মারজিন্‌টা উনি গিলছেন অনেকদিন থেকে। ধরা পড়বার আগে অনুতাপ হয়নি। ব'লে দাওগে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। অসম্ভব, অসম্ভব!

এক বিন্দু অন্যায় ঢুকলে বহু কল্যাণ নষ্ট হয়···ওঁকে আজই চ'লে যেতে বলো এই নবনগর ছেড়ে।

কিন্তু—

হ্যাঁ, আজই। এই বেলাটুকুর মধ্যে। ব'লে উঠে বীরেশ নিজের মহলে বিশ্রাম নিতে চ'লে গেল।

কেমন যেন একটা নিষ্ফল আক্রোশ আর প্রচণ্ড অভিমান তার ভিতরে ভিতরে পুঞ্জীভূত হয়ে নিজেকেই আঘাত ক'রে ফিরতে লাগলো। বেদনা বোধ করা দূরে থাক্, ওর বিপরীত প্রকৃতিটাই যেন তরঙ্গের মতো আছাড় খেয়ে তার ভিতরে ফিরছিল।

দুর্বল হ'লে আজকে তার আর কিছুতেই চলবে না। যারা ন্যায়, ধর্ম, সুবিচার ও কল্যাণ সৃষ্টি করার কাজে নিযুক্ত, যারা বহু মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছে, তাদের পক্ষে নারীসুলভ দাক্ষিণ্য আর সস্তা হৃদয়াবেগ বেমানান। শক্তির অধিকারী সে, সম্পদের শাসনকর্তা, তার হুকুমে চলছে এই ঐশ্বর্যশালী নগর,—তার দয়া, তার কৃপা, তার বৈষ্ণবী মায়া,—এগুলো অশোভন। অনেকদিন নিজেকে সে কঠোরভাবে অনুভব করেনি, অনেকদিন সে জানাতে পারেনি সে আছে,—নিষ্ঠুরভাবে প্রচণ্ডভাবে সে আছে; মাঝে মাঝে তার প্রবল অস্তিত্বটা দৃঢ় ও নির্মমভাবে না জানালে চারদিকের লৌহশৃঙ্খল যেন আলগা হয়ে যায়।

বিশ্রামের পরিবর্তে বীরেশ কঠিন পদক্ষেপে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো।

উত্তর দিকে নদীর তটের কাছাকাছি কয়েকশত বিঘা জমি আগাছার জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে অনেকদিন থেকে পড়েছিল। বীরেশের লোভ ছিল অনেকদিন থেকে, তবে জমিদারের সঙ্গে বিরোধিতার জন্য জঙ্গলটা আয়ত্ত করতে না পেরে সে আর উচ্চবাচ্য করেনি। সম্প্রতি লাটের খাজনার দায়ে সেটা নিলামে ওঠায় সরকারী তরফ থেকেই তার কাছে সংবাদ আসে। উৎসাহ খুব বেশি না থাকলেও চক্ষুলজ্জার দায়ে সে গিয়ে নিতান্ত সামান্য টাকার নিলাম ধরে। জমিটা ব্যাঙ্কের নামেই তাকে খরিদ করতে হ'লো।

কাজ সেরে ফিরতেই সন্ধ্যা। ব্যাঙ্ক আর সমবায়ের কর্মচারীরা তার সঙ্গে ছিল। সমস্তদিন পরিশ্রম আর নিলামের হাঁকডাক গেছে। একটু নিরিবিলি নদীর ধারে না বেড়িয়ে তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছে হ'লো না···দারোয়ান আর চাপরাশীদের সঙ্গে সে কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে বললে,—আপনারা যান, আমি নদীর ধার দিয়ে ফিরবো।

তার মনোবিকলনের সংবাদ নাকি সম্প্রতি অনেকেই জানতো। অলক্ষ্যে কর্মচারীরা একবার চোখ মটকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলো। একজন ঠোঁট ওল্‌টালো। পরে তাদেরই মধ্যে একজন বললে, যে আজ্ঞে, স্যার। নমস্কার জানিয়ে তারা সবিনয়ে বিদায় নিয়ে গেল বটে, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে একজন আর একজনের কানে কানে বললে, যত বড়ই হও, ডুবে ডুবে জল খেতেই হবে।

একজন বললে, রাত আটটার পরে নৌকা চ'ড়ে যায়, আবার ভোর রাত্রে ফিরে আসে। ভয়ানক বর্ণচোরা। ছোটসাহেবের সামনে একদিন মদ খেয়ে ভীষণ মাতলামি করছিল, জানেন বিপিনবাবু?

কে বললে?

নৌকার মাঝিটা নাকি বলছিল প্রকাশ ঘোষকে।

প্রকাশ ঘোষটার চাকরি গেল বটে, কিন্তু সে ছাড়বার ছেলে নয়। এরই মধ্যে নানা খবর রটাচ্ছে। লোকটা বেশ জানে, এদেশে চরিত্রের বদনাম রট্‌লে যত বড় সমাজহিতৈষীই হও, আর মাথা তোলার সাধ্য থাকবে না। দুর্নীতির দাগ নিয়ে এদেশে পাত্তা পাওয়া বড় কঠিন বাবা! তুমি ত' বীরেশ চৌধুরী, কালকের ছেলে; অত বড় ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী অমল মিত্তির,—তাকেও দেশের লোক বরদাস্ত করলো না। যাই বলো, আমরা অনেকদিন পর্যন্ত লোকটাকে চরিত্রবান ব'লে মনে করতুম, নয়?

তাদের আলাপ কানে শোনবার উপায় বীরেশের ছিল না! নবনগরে তার সম্পর্কে কোনো সমালোচনা হয়, অথবা তার কোনো নিন্দা রটে, একথা সে জানতো না। সারাদিন পরে একটু ছাড়া পেয়ে ধীরে ধীরে সে চললো নদীর দিকে। বসন্তকালের সমাগম হয়েছে শূন্যলোকে। অদূরে কৃষ্ণচূড়ায় কচি কচি ফুলের আভাস দেখা যাচ্ছে। বাতাসে শৈত্য অপেক্ষা মধুরতার আমেজ পাওয়া যায়। দূর পশ্চিম দিগন্তে দিনান্তের রাঙা দাগ মিলিয়ে আসছে, সন্ধ্যাতারাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। সুচিত্রার জলে অল্প অল্প অন্ধকারের ছায়া পড়েছে।

গত কয়েকদিন তার খুবই মনোবিকার আর মানসিক অবসাদ গেছে। বয়স তার হ'লো বৈকি! দেখতে দেখতে চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশে এসে সে দাঁড়ালো। এখন একটু নিরিবিলি বিশ্রাম, একটু নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য, একটুখানি আনন্দের আয়োজন,—এ তার ভালো লাগে বৈকি! কিছুকাল থেকেই নতুন কিছু সৃষ্টির উদ্যম তার কমেছে, সুচিত্রার মতো প্রবাহ যেন শীর্ণ হয়ে এসেছে, কেমন একটি মধুর ক্লান্তির ছায়া নামছে ধীরে ধীরে তার মনে। দীর্ঘকাল পরে মাত্র সেদিন নলিনীর সঙ্গে তার দেখা। নলিনীর ললাটে, চোখের কোলে আর

মুখের চেহারায় সে দেখে এসেছে যৌবনপ্রান্তরেখা। কিন্তু কী দীপ্তি তার চোখে, কী অপরূপ ব্যঞ্জনা তার প্রসন্ন আচরণে; কী নিবিড় শুচিতায়, কী করুণ মমতায় তার দৃষ্টি ভরা! নলিনী আসতে চাইলো না তার সঙ্গে নবনগরে, এখানে তার স্থান নেই। এখানকার ঐশ্বর্য সম্পদ সৃষ্টি অনুশীলার অনুগ্রহে, নলিনী তার সহপাঠিনী বান্ধবীর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতে চায় না। সহজাত কৃতজ্ঞতাবোধের জন্য নলিনী আবার সব ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। হয়ত আর দেখাও হবে না কোনোদিন,—কিন্তু তবু আত্মীয়তা আর পুরাতন বন্ধুত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে সে চাইলো না। এ নলিনীর অন্যায়, সে কিছু দৃঢ় হ'লে বীরেশ অনেক আগেই বেঁচে যেতো, বহু বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেতো। বীরেশ জানে, তার জীবনের সকল প্রকার উত্থান পতনের মূলে রয়েছে নলিনীর আত্মগোপনশীল আচরণ। আজ বসন্ত-সন্ধ্যায় দক্ষিণ সমীরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বহুদূরতটপ্রান্ত-বাহিনী সুচিত্রার দিকে চেয়ে নলিনীর প্রতি বড় অভিমান তার বুকের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে উঠলো। এতকাল পরে আবার এত নিরাশার মধ্যে তাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়া নলিনীর উচিত হয়নি। সমাজ-ব্যবস্থার পায়ের তলায় আত্মবলি দিতে হবে আর কতদিন? অসার্থক ভালোবাসা আর কতদিন কেঁদে কেঁদে বেড়াবে পথে পথে? মানবতার সর্বোত্তম প্রসাদগুণ কি এমনি ক'রেই উদ্‌ভ্রান্ত চক্রবাকের মতো অন্তহীন বেদনায় চিরদিন শূন্যে বেড়াবে ঘুরে ঘুরে?

সারাটা দিন কাজকর্মের মধ্যেও আজ তার প্রায় একাই থাকতে হয়েছে। ভাগ্যক্রমে কর্মজীবনে সে কোনো মায়া-মমতার স্পর্শ পায়নি। সেই কারণে তার ক্লান্তিহীন অধ্যবসায় কেবল কাজের স্তূপই বিরাটাকার ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। আজ সমস্ত দিন তার সঙ্গে ললিতের একপ্রকার দেখাই হয়নি। প্রকাশ ঘোষকে তার চাকরিতে পুনর্বহাল না করার জন্য ললিতের কিছু আঘাত লেগেছে সন্দেহ নেই, কারণ ললিত প্রকাশের যোগ্যতাকে স্বীকার করতো। কিন্তু আজ সারাদিন ললিতের সঙ্গে দেখা না হওয়ার অন্য কারণ ছিল। আনন্দময়ী নামক যে মহিলার আলোচনায় আর স্তুতিবাদে সে মুখর, আজ সেই মহিলার নাকি নবনগরে পদার্পণ করার কথা। এখান থেকে রেলস্টেশন প্রায় সাত মাইল; কিন্তু সাত মাইলের ভিতরে প্রায় দশটি সম্মান-তোরণ নির্মাণ ক'রে আনন্দময়ীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আনার কথা। তিনি একা নন্, সঙ্গে প্রায় পঁচিশ ত্রিশটি মেয়ে তাঁর সহকর্মী,—এ ছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ লটবহর। নবনগর থেকে পাচ ছয়খানি মোটর, গোরুর গাড়ি, একদল কুলি, পাল্‌কি, অভ্যর্থনা সমিতির একদল স্ত্রী-পুরুষ,—এমন কি মন্দিরের পুরোহিত মহাশয় অবধি ললিতের সঙ্গে গেছেন।

আনন্দময়ীর সঙ্গে আসবেন তাঁর সেক্রেটারী, তাঁর চাকর-বাকরের দল, তাঁর দপ্তর, অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ। আগামী কোনো একটা তারিখে এই নগরের পৌরসভার পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মানপত্র দেওয়া হবে। তিনি নবযুগের সর্বপ্রধানা মহিলানেত্রী,—কাগজে পত্রে বীরেশ তার সম্বন্ধে কয়েকবার স্তুতিবাদ লক্ষ্য করেছে। ললিত সোৎসাহে তাকে জানিয়ে রেখেছে, এখানকার প্রাথমিক শিক্ষা আর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য যে সমিতি গঠন করা হবে, তার সুনিয়ন্ত্রিত কার্যপদ্ধতির পরিকল্পনা রচনা ক'রে দেবেন আনন্দময়ী। এর আগে বাংলার বহু গ্রামে গিয়ে তিনি মেয়েদের নানাপ্রকার অর্থকরী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছেন। সুতরাং তাঁর কাজের প্রতি প্রথম সম্মানস্বরূপ ললিত তাঁকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেবার জন্য ইতিমধ্যে বেশ মোটামুটি চাঁদে তুলে রেখেছে। অর্থাৎ চাঁদার মোটা অংশটা নিজের বেতন থেকেই গোপনে দিয়ে রেখেছে। আসবার সময় হাটতলার কাছে বীরেশ নিজের চোখে দেখে এলো, বড় একটা আটচালা বাঁধার কাজ চলছে; সেখানে একটা প্রদর্শনী বসাচ্ছে ললিত, এবং তার উদ্বোধন করবেন শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী। নবনগরের ময়দানের প্রান্তে এক বক্তৃতামঞ্চ তৈরি হয়েছে, সেখানে ভদ্রমহিলা নাকি বক্তৃতা করবেন। সহজেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর নামে এ অঞ্চলে একটা সাড়া জেগেছে। কিন্তু ললিতের এই প্রকার উৎসাহ ও কর্মতৎপরতার মূলে কী বস্তুটি যে লুক্কায়িত সেটি জানতে বীরেশের বাকি নেই। সে গোপন করেনি, এটা আনন্দের কথা। ললিত বিলাতফেরতা, কিন্তু চরিত্রবান। মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রমের মূল্য সে জানে। আনন্দময়ীর সঙ্গে সে একটি উচ্চস্তরের প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ, এটা গৌরবের কথা, লজ্জার কথা নয়। একটি নারীর স্নেহ ও চরিত্রমাধুর্য তার সকল কাজ, সকল চিন্তা, সমস্ত উদ্দীপনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, এটা পুরুষের পক্ষে দুর্লভ। উভয়ের ভালোবাসা এমন কোনো স্তরে আজো নামেনি, যেখানে ব্যক্তিগত ভালো-মন্দ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না; ললিত তাঁকে ভয় করে, সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, তপস্যা করে। চিঠিতে উপদেশ পায়, সেই অনুযায়ী নিজেকে চালায়।—বীরেশ কথা দিয়েছে, উভয়ের বিবাহের ঘটকালি সে করবে। না করবার হেতু নেই; একজন অপরের অযোগ্য নয়। এই বিবাহ সম্ভব ক'রে তোলা হবে তার পক্ষে মস্ত বড় কীর্তি। বীরেশ তার জীবনের বড় কাজ অনেক করেছে, কিন্তু মধুর কাজ তার তালিকায় একটিও নেই।—হয়ত এর জন্যে এখানে ললিতের নিন্দা রটতে পারে, হয়ত সংবাদপত্রগুলোয় মহিলানেত্রী আনন্দময়ীর প্রণয় ও পরিণয় নিয়ে ঠাট্টা তামাশা হ'তে পারে। কিন্তু দুটি একাগ্র

প্রাণ যদি বিবাহের দ্বারা সার্থক হয়ে দেশের বৃহৎ প্রয়োজনে নামে, তবে কেবল তারা দু'জনেই নয়, —বীরেশের পক্ষেও যেন পরম সান্ত্বনা।

চলতে চলতে থমকে একবার দাঁড়িয়ে সে আবার বাসার পথ ধরলো। উৎসাহিত বোধ করছে অনেকদিন পরে। সে নিজের ভাঙ্গাগড়া আর ভাগ্য-বিপর্যয় নিয়েই ব্যস্ত, অন্যের দিকে তাকাবার রুচি তার এতদিন জাগেনি। পৃথিবী অনেক বড়, তাকে বাদ দিয়েও এই বিশ্বভুবন অতি বৃহৎ। দিকে দিকে লোকযাত্রা চলেছে অবিশ্রান্ত; আশা ও নিরাশা, সুখ ও দুঃখের অনন্ত আবর্ত রচনা ক'রে চলেছে এই চলমান সংসার,—ব্যক্তির কথা এখানে কোথাও বড় নয়। নিজের জন্য ভাবলো সে বহুকাল, নিজের দিকে চেয়ে রইলো সে অনেক দিন, নিজেরই অসমাপ্ত একটা চিত্র রচনা করলো সে এই নবনগরে। কিন্তু এখন অন্যের জন্য ভাববার বয়স তার হয়েছে; অন্যের ভিতর দিয়ে নিজেকে একবার নতুন ক'রে দেখবার তার ইচ্ছা জেগেছে। আজ ললিতকে সে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করবে আনন্দময়ীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। এটা শুধু বিবাহের ঘটকালী নয়, এটাও তার একটা বিপুল রচনা, একটা বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ,—এ বিবাহে তারও সার্থকতা অসামান্য। তার এই অসমাপ্ত কীর্তি-সম্ভারের মধ্যে কোথাও এতদিন ছন্দ ছিল না, এই দুই নরনারীর মিলনে তার সকল কীর্তি সুষমায় ভ'রে উঠবে,—ঐক্যে আর সঙ্গতিতে পূর্ণতা লাভ করবে।

পথ নিরিবিলি, জনবিরল। এ পাড়ায় কয়েকজন মহাজন এসে কয়েকটা ধান আর পাটের গদি নির্মাণ করেছে। সন্ধ্যার পরে আর তাদের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সহসা ওদেরই একটা আড়ৎদারের ঘর থেকে একটা তুমুল তর্কের আওয়াজ শুনে বীরেশের যেন চমক ভাঙলো। তার নিজের নামটা যে এই আড়ৎদারের ঘরে এমন একটা ঝড় তুলতে পারে, এ সংবাদ আগে তার জানা ছিল না! পথের একপাশে সে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ালো।

কথাবার্তায় জানা গেল গ্রামবাসী, ব্যবসায়ী, মাঝি-মাল্লা আর শ্রমিক সর্দারদের এটা একটা আড্ডা। আরো দু'চারজন, যাদের তর্কবিতর্কে জানা যায় তারা স্থানীয় কারখানার ফোরম্যান্ অথবা সমবায়-সমিতির মাঝারি কর্মী। মাঝে মাঝে বীরেশের নামটা অর্থাৎ বড়সাহেবের কথা নিয়ে তাদের ভিতরে একটা তুমুল বাক্‌যুদ্ধ চলছে! অনেকটা কৌতুকের বিষয় বৈকি! কিন্তু শুনতে শুনতে সহসা প্রকাশ ঘোষের নাম ও তার গলার আওয়াজ পেয়ে বীরেশ উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

আলাপটা অভিনব। একজন খেয়ালী লোকের হুকুমে এখানকার চারিদিকে নাকি অত্যাচার চলছে। সেই লোকটির যে এজেন্ট অর্থাৎ ললিত,

—সে এই অত্যাচার ও অনাচারের একজন দোসর। এই প্রকাণ্ড শহর আর কলকারখানা, ব্যাঙ্ক আর সমিতি, পৌরসভা আর হাসপাতাল—ইত্যাদি সমস্তই পরের টাকায় আর পরের পরিশ্রমে তৈরী। যারা সত্যকার কর্মী, তারা এখানে বঞ্চিত আর প্রতারিত। স্বয়ং বড়সাহেব একজন মাতাল আর চরিত্রহীন,—দেবীপুরের হাকিমের স্ত্রীর সঙ্গে তার ব্যাভিচারের কাহিনী কারো অজানা নেই। সেই অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের টাকায় বড়সাহেব এখানে এসে বড়মানষী ফলিয়েছেন, এখানকার জংলী জমিদারকে খুন ক'রে দেবীপুরের অনুগ্রহে অব্যাহতি লাভ করেছেন। ছোটসাহেব অর্থাৎ ললিতকে তিনি টাকা খাইয়ে বশীভূত ক'রে রেখেছেন,—ভগ্নীর ব্যভিচারের ব্যাপারে সে যাতে বিদ্রোহ না করে। এ অঞ্চলের পাহাড়ী গ্রাম থেকে বহু জংলী বাসিন্দাদের ঘর জ্বালিয়ে বড়সাহেব উৎখাত করেছেন। এর কারণ সবাই জানে। গ্রামের মেয়েদের ধ'রে এনে ছোটসাহেব আর বড়সাহেব তাদের সম্ভ্রমহানি করতে চান, কিন্তু পুরুষরা বাধা দিত ব'লেই তাদের ঘরদোর জ্বালিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে।

সেই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে প্রকাশ ঘোষের কণ্ঠস্বর বীরেশের কানে এলো।·· বিক্রির টাকা তিনি নিজের নামে কলকাতার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছেন, এর প্রমাণ আছে। মহাজনদের কাছে অতিরিক্ত কর আদায় ক'রে তিনি দেশের কাজ-কারবার নষ্ট করতে চান। এ ছাড়া মজুরদের রোজ কমানো, কন্‌ট্রাক্‌টার দের টাকা ফাঁকি দেওয়া, দেশী শিল্পের গলা টিপে মাড়োয়ারীদের কাছে ঘুষ খেয়ে তাদের বাণিজ্য ফলাও ক'রে তোলা—এসব খবর কে না রাখে? নবনগরের জনসাধারণ ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে,—একদিন সামান্য সংঘর্ষেই আগুন জ্ব'লে উঠতে পারে। সরকারী লোক আর পুলিশ বিভাগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে দেশের লোককে এই ভাবে বঞ্চিত আর প্রতারিত করা কতদিন চলবে?

তোমরা সবাই শুনেছ হে, আজ কে এয়েছেন এই শহরে? তাঁর নাম আনন্দময়ী,—মস্ত বড় নাম। আমরা জনাদশেক চুপি চুপি আজ দুপুরবেলায় গিয়েছিলুম তাঁর ওখানে দেখা করতে। ছোটসাহেব ত' কাছেই ঘেঁসতে দেয় না। বলে, ওঁর পরিশ্রম সহ্য হবে না, শরীর ভালো নয়। শেষকালে মহিলাটি আমাদের ডেকে পাঠালেন। কী চমৎকার চেহারা, বয়স তেমন বেশি নয়, কিন্তু সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণা! আমরা প্রণাম ক'রে নবনগরের সকলের নালিশ জানিয়ে বললাম, মা আপনি যদি এসেছেন এদেশে, তবে এই বড়সাহেবের অনাচার থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। এখানে অরাজকতা, এখানে ধর্ম

নেই, মনুষ্যত্ব নেই, এখানে ন্যায়বিচার নেই। বুঝলে ভাইরা, এই সব তাঁকে বুঝিয়ে বললাম।

কী বললেন তিনি ?

তিনি হাসলেন। হেসে বললেন, আপনারা এ সব সহ্য করেন কেন ? বললাম—কী করব মা, আমরা নিরুপায়। অসন্তোষের কথা বড়সাহেব জানতে পারলে আমাদের গুম ক'রে দেবে। ভদ্দরলোকের পোশাকে ওরা সেই পুরনো ডাকাতের দল। ওরা না পারে, হেন পাপই নেই। তিনি বললেন, পাপকে আপনারাই ত' বাড়তে দেন, নইলে তার সাধ্য কি ? পুরুষ মানুষ অন্যায় স'য়ে নালিশ জানায় না, তারা অন্যায়ের উচ্ছেদ করে। আমরা ব'লে এলুম, মা, কিছুকাল আপনি থাকুন এখানে। আমাদের শক্তি দিন, আমরা প্রতিশোধ নেবো। তিনি বললেন সবাই মিলে রাখলে থাকবো বৈকি। আমি ত' আপনাদেরই সেবা করতে এসেছি।—নবনগরে এতদিনে অসুরদলনী দুর্গার আবির্ভাব হ'লো, বুঝলে ? ব'লে রাখলাম, সহ্য আমরা করবো না, যারা আমাদের সর্বনাশ করছে সরাবো।

সমস্ত ব্যাপারটায় কৌতুক যথেষ্টই ছিল। পরিহাসবোধের অভাব বীরেশের ঘটেনি। কিন্তু বিস্ময় তার কম নয়। কত অদ্ভুত আজগুবী অভিযোগ তার নামে চলছে, এ খবর সে রাখেনি। তার আড়ালে তার কাজের সমালোচনা হয়, তার নিন্দে রটে,—এ তার স্বপ্নেরও অগোচর। সে মদ্যাসক্ত, ব্যাভিচারী,—এ সংবাদ অভিনব সন্দেহ নেই। মদ্যপান পাপ, ব্যাভিচার সকল সময়েই ঘৃণ্য এ মত সে পোষণ করে না, কিন্তু তার নিজের আসক্তি নেই, এই যা। কোনো গ্রামে গিয়ে সে মেয়েদের সম্ভ্রমহানি করেনি, তার হুকুমে কারো ঘর জ্বলেনি, অকারণে সে কারো প্রতি অত্যাচার করেনি, অথচ এই হাস্যকর জনরব রটলো তার নামে !

বাসায় ফিরে একাকী অন্ধকার বারান্দায় ব'সে সে ভাবতে লাগলো, শক্তি আর ক্ষমতার সে ভক্ত এই তার মস্ত বড় অপরাধ। সে ভিক্ষা করেনি, কাজ করেছে; কাঁদেনি, দাবি জানিয়েছে; দুর্ভাগ্যের পায়ের তলায় দলিত হয়নি, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে,—সুতরাং সে অনাচারী।...বাধাকে সে নির্মূল করেছে, মধুর শাঠ্য আর ইতর ভালোমানুষীকে সে নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে,—সুতরাং সে পাপী। প্রভুত্বের একটা প্রবল ক্ষমতাকে সে আয়ত্ত করেছে সন্দেহ নেই, অর্থ ও সম্পদের বিরাট একটা স্তূপ সে সৃষ্টি করেছে,—সবাই জানে, বহু মানুষকে শাসন ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সে রুদ্রের বরলাভ করেছে,—নিজেও সে একথা অনুভব করে।—কিন্তু তার নিজের জন্য কতটুকু ?

পঙ্গপালের মতো জনসাধারণের জনতায় সে যে নিজেকে হারিয়ে তুচ্ছ হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে জীবনযাত্রা পালন করতে পারেনি, সেইটিই ত' তার গৌরব। কল্যাণকে সে জানে, মহৎ কর্মসৃষ্টির পদ্ধতিকে সে বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করেছে, মানুষের প্রতি অনুরাগের আদর্শকে সে সার্থক ক'রে তোলার চেষ্টা করেছে। সভ্যতার নব পত্তন, নতুন উপনিবেশ রচনা করতে এসে সে তার প্রাণশক্তি প্রকাশ করতে পেরেছে। আজ জনকয়েক অসন্তুষ্ট আর স্বার্থবাদীর নিন্দা রটনায় তাকে আসুরিক শক্তির আধার ব'লে মনে করতে হবে?···জনসাধারণের জন্য সুলভ নিষ্ফল কান্না কাঁদলেই কি সে রাতারাতি গণদেবতা হয়ে উঠতে পারতো?···অথচ এই নবনগরে কতটুকুই বা তার নিজস্ব! বাইরের সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য তার বাসার নিচে দারোয়ান চাকর থাকে, তাদের অফিসের সুসজ্জিত বিপুল আসবাবপত্র তাদের সম্মান আর আভিজাত্যের পরিচয় দেয়; তাদের যান-বাহন, লোক-লস্কর,—সমস্তটাই তাদের অসামান্য প্রতিষ্ঠার পরিচয়। কিন্তু অন্দরমহলে তার নিজস্ব কী রয়েছে? বিলাস-বৈভবে তার কোনো আসক্তি নেই; দু' চারটা চুরুট ভিন্ন তার ঘরে অপব্যয়ের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। একবেলা সে খায় একমুঠো ভাত; আমিষ খাওয়া সে এক প্রকার ত্যাগ করছে। পোশাক-আসাক ললিতের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। একটি টাকাও সে হাতে স্পর্শ করে না, একটি কানাকড়িও তার নামে কোথাও জমা নেই! সঙ্গে তার কোনো পরিবার নেই, বন্ধু-স্বজন নেই, মাসোহারা পাবার লোক নেই। অনুশীলার দেওয়া লেপ-কম্বল, আর একটা বালিশ,—এ ছাড়া দীর্ঘ দশ বছরে তার আর কোনো বিছানা জোটেনি। ঘরে তার আলমারি নেই, সিন্দুক নেই, গৃহসজ্জা নেই, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ নেই। সে কেবল হুকুম করে, নিয়ন্ত্রিত করে, শাসন-শৃঙ্খলায় সে কেবল এই নগরের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে ছন্দোবদ্ধ ক'রে রাখে,—এই তার প্রধান কাজ। সমগ্র নগরের নাভিকেন্দ্রে সে ব'সে থাকে একা। সবাই যখন নিদ্রিত, সে তখন অন্ধকার রাত্রে কাল-প্রহরীর মতো চোখ বুজে নিঃসঙ্গ ব'সে জপের মালা ঘুরিয়ে চলে। তার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, কোনো ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা নেই। সে কেবল প্রভু,—নির্দয় নির্মম নির্লিপ্ত নিয়ন্তা। নিদ্রাহীন নিশীথ রাত্রে সে নিঃসম্বল ব'সে ব'সে মানুষের সৌভাগ্যের স্বপ্নজাল বোনে। সংসারে এই তার একমাত্র কাজ। এই তার আজীবনের তপস্যা—এই নগর থেকে সে তাড়িয়েছে বহুকালের কুনীতি, বহু কুসংস্কার আর অশিক্ষা, বহুযুগের তামসিক জড়তা আর আলস্য। অপরাধ অবশ্য সে করেছে, কারণ দয়া সে কোথাও করেনি, কৃপা ক'রে কোথাও সে অযোগ্যতাকে প্রশ্রয় দেয়নি, অন্ধ ভালোবাসায়

সে মূঢ় পশু-প্রকৃতি-জনসাধারণকে গণদেবতা ব'লে লোকসমাজে তুলে ধরেনি। সে এনেছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়ু, তেজস্বিতা, সৃষ্টিশক্তি, আত্মবিশ্বাস।—আগে এই অঞ্চলের নাম ছিল পাথরচাকী, চারদিকে ছিল অরণ্য, ভূতের বাসা,—দুর্গম, দুরারোহ গ্রাম; আরণ্যক জমিদার আর তস্করের উৎপাতে চারদিকে ছিল সন্ত্রাস। ঝোপে-ঝাড়ে, বাঁশবনে, শালের জঙ্গলে জানোয়ার আর সাপের উৎপাত—কেউ কোনোকালে এদিকে আসেনি। তার মস্ত বড় অপরাধ—সে এনেছে বিজ্ঞান, এনেছে সভ্যতা, এনেছে কর্মী-মানুষের দল। সব চিত্তবিলাসীরা সুলভ অশ্রুপাত ক'রে দরিদ্র-নারায়ণের জন্য হা-হুতাশ করে, যারা কাজ করে না, কেবল কথার ব্যবসা করে, তারা গণতন্ত্রের চল্‌তি বুলিতে মোহগ্রস্ত হয়ে কেবল নিষ্ক্রিয় বক্তৃতায় দরিদ্রের মন ভোলায়, সাম্যবাদের চটকদার ব্যাখ্যায় যারা অশিক্ষিত জনসাধারণকে বিত্তশালীদের বিপক্ষে ঘৃণায় ঈর্ষায় লালসায় আক্রোশে উন্মত্ত ক'রে তোলে, সৃষ্টিশক্তিহীন বিপ্লববাদের দিকে উত্তেজিত করে, এই নবনগর থেকে বীরেশ তাদের বিতাড়িত করেছে···এই তার বিরুদ্ধে মস্ত বড় অভিযোগ! কিন্তু কে না জানে, পৃথিবীর কোনো উন্নতি, কোনো সভ্যতা, কোনো মহান্ সৃষ্টি, কোনো মহৎ আন্দোলন—জনসাধারণের দ্বারা সম্ভব হয়নি; একক ব্যক্তির প্রতিভা, এককের অধিনায়কত্ব, এককের বিরাট পরিকল্পনাতেই সমস্ত সম্ভব হয়েছে। কে না জানে, জনসাধারণ চিরদিন মজুর আর মূঢ়, চিরদিনই নির্বোধ আর আত্মস্বাতন্ত্র্যহীন, আবহমান কাল থেকেই তারা এককের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। প্রভুশক্তি তাদের ক্রীতদাসের মতো লালন করে; সকল কালের রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই তারা কেবল জড়বস্তুর মতো কেনা-বেচার সামগ্রী। এই মূঢ়মতি জনসাধারণ একথা ভুলে গেছে যে, তাদের জন্যই একদিন তাকে কঠোর জীবন যাপন করতে হয়েছিল, তাদের জন্যই তার উপবাস, তাদের জন্যই উৎপীড়ন সহ্য করা। তাদের জন্যই আশ্রয়হীন হয়ে বীরেশ পথে পথে ঘুরেছিল রাজদ্বারে লাঞ্ছনা সয়েছিল, পরের আশ্রয়ে অন্নভিক্ষা করেছিল; দারিদ্র্যে, দুর্দশায়, বেদনায় তাকে অতি ক্ষুদ্র হয়ে থাকতে হয়েছিল। সেদিনকার সেই নিরাশা আর অবমানিত জীবনের মধ্যে ব'সে জনকল্যাণের মহামন্ত্র সে লাভ করেছে ওই ব্যভিচারিণী অনুশীলার অপূর্ব মহত্ত্বের ছায়ায়। আজ কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীলা আনন্দময়ীর চটকদার স্বদেশীপনার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পশুর দল লালাসিক্ত রসনায় আস্ফালন করছে। সেই দুর্ভাগার পাল জানে না অসতী অনুশীলার চর্বিত অন্নের অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খেয়েই ওদের মুখে এই নৈতিক বুলি! জনসাধারণের শ্রদ্ধা আর অশ্রদ্ধার চোরাবালির ওপর সে তার ভাগ্যের প্রাসাদ নির্মাণ করেনি, সে জানে, এই

পশুর দলকে ভোলাতে দু'চার টুকরো বাসি হাড়ের টুকরো ছড়িয়ে দিলেই যথেষ্ট।

পায়চারি করতে করতে বীরেশ ভাবলো, যে অধ্যবসায়ে সে সৃষ্টি করতে পেরেছিল এই নবনগর, সেই অধ্যবসায়ের বিপরীত শক্তিতে একে ধ্বংস করতে তার কুণ্ঠা নেই। এই নগরের কণ্ঠরোধ ক'রে দিতে পারে সে কাল প্রভাতেই। লোক-কল্যাণের ভিত্তিমূলকে যারা ক্ষয় করবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে, তাদের দলকে নির্মূল করতে পারে সে তার একটিমাত্র হুকুমে। ক্ষমতার সে অধিকারী, শক্তির সে সংহত কেন্দ্র, প্রভুত্ব আর প্রতিপত্তির সে মূলাধার। হত্যা আর মৃত্যুতে তার ভয় নেই, নগরব্যাপী শ্মশানচিতা রচনা করতে তার সঙ্কোচ নেই, আপন কঠিন রথচক্রের নিচে নিন্দাভাষীদের দলিত ও মথিত করতে তার বিন্দুমাত্র বেদনাবোধ নেই!···সৃষ্টি করতে সে জানে, সুতরাং ধ্বংসবিপ্লবে সে নিঃশঙ্ক।···কিন্তু তাই যদি হয় তবে এবার জনসাধারণের মৃত্যুর তীর্থক্ষেত্রে গণদেবতার নূতন মন্দির গ'ড়ে উঠুক।

বারো

দূরে মন্দিরের ঘণ্টা বাজলো—ডিং ডং, ডিং ডং ··

বীরেশ চোখ খুলে তাকালো। জানালার বাইরে প্রভাতের আকাশে জ্যোতির্ময়ের সোনার অঙ্কন তার চোখে পড়লো। এত প্রত্যুষে কোনোদিন মন্দিরেব ঘণ্টা বাজে না। দূর থেকে দূরে সেই করুণ গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি কেমন যেন বেদনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে চলেছে। খোলা জানালায় মুখ বাড়িয়ে সে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

শিশিরবিন্দুভরা স্বল্প কুয়াশাচ্ছন্ন বসন্তের প্রভাত। অদূরে পলাশের ডালে ডালে কয়েকটা শ্যামাপাখীর প্রভাতী কীর্তনের সভা বসেছে। একই পাখীর কণ্ঠে বিভিন্ন কাকলীতে এদিককার সমগ্র পল্লীটাই যেন মুখর। উপর আকাশেব ফিকা নীল রংয়ের সরোবরে হাঁসের দলের মতো ছোট ছোট মেঘ ভেসে চলেছে। বাতাস মৃদু, স্নিগ্ধ।

বহুদূর অবধি বীরেশ চেয়ে রইলো। কী অমৃত ভরা এই প্রভাত! বাতায়নের ভিতর দিয়ে সমস্ত নবনগরের ছবিটি সে যেন আঁকতে লাগলো তাব সমগ্র সত্তা দিয়ে। পদ্মাসনার চূড়া স্পর্শ করেছে সুচিত্রার ওপার থেকে প্রথম গৈরিক অরুণলেখন। তারই পাশ দিয়ে মাথায় বোঝা নিয়ে এরই মধ্যে চলেছে পশারীর দল। টাউনহলের মাথার উপরে গোলাকার ঘড়িটা অস্পষ্টভাবে দেখা

যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে সারিবদ্ধ বিলাতী টাইলে-ছাওয়া রাঙা বাংলো,—তাদের সীমানার বাগানে অজস্র মরশুমী ফুল ফুটে উঠেছে। পূর্ত বিদ্যালয়ের সুদৃশ্য প্রাঙ্গণে ফোয়ারা থেকে জলধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হাসপাতালের উপরতলাকার বৃহৎ কাঁচের শার্সির উপরে সূর্যরশ্মি ঝলমল করছিল। ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায়, শস্যহীন প্রান্তর, তারই পাশে পাশে আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ চ'লে গেছে দৃশ্য-লোকের সীমানা পেরিয়ে নিরুদ্দেশ রহস্যের দিকে। বীরেশ তার ব্যথিত ক্লিষ্ট প্রাণ সেই দিকে প্রসারিত ক'রে মনে মনে কেবল ভাবতে লাগলো,—এই অনবদ্য অভিব্যক্তি, এ সব তারই সৃষ্টি ; তারই প্রাণের বিভিন্ন প্রকাশ। আজ সে নিন্দিত,—কিন্তু এই নগরের বিচিত্র শোভা তারই রচনা, কেবলমাত্র তারই কল্পনা। হয়তো এই সংসারে তার ত্রুটি-বিচ্যুতির অন্ত নেই, কিন্তু তবু মানুষের বসতি সে রচনা করেছে একান্ত মমতায়, হয়তো এই দৃশ্যমান মহানগর তার আত্মতৃপ্তি আর আত্মবিলাসেরই একটা বাহ্যিক রূপ, কিন্তু জনসাধারণ তার এই শিল্পসৃষ্টিতে উপকৃত ও আনন্দিত। অনুশীলা একদিন তাকে বলেছিল,—তুমি বড় প্রতিভা, তোমার সেই মহৎ সম্ভাবনার উদ্দেশ্যে এখন থেকেই প্রণাম জানাই। তুমি সাগরের মতো সুন্দর, তোমার বিক্ষুব্ধ বিরাটত্বের প্রতি প্রণাম জানাই। আজ অনুশীলা বহুদূরে অজানা কোন্ দেশে নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় শুয়ে চেয়ে রয়েছে পথের দিকে,—সে একদিন প্রতিভার বিরাটত্বই কল্পনা করেছিল কিন্তু বিকাশ দেখে যেতে পারলো না। তার শক্তি ছিল অনড়, উৎস ছিল রুদ্ধ,—কিন্তু সেদিনকার নিষ্ক্রিয়তাকে সচল করেছিল যে আত্মাশক্তি, প্রতিভাকে অগ্নিময় ক'রে তুলেছিল যে, অগ্নিরূপিনী,—সেই অসামান্যা নারীকে আজ প্রতিভার অপেক্ষাও বড় বলতে তার কুণ্ঠা নেই···সে ছিল দাহ্য, অনুশীলা দাহিকা।

পায়ের শব্দ শুনে বীরেশ ফিরে তাকালো। এক পেয়ালা চা নিয়ে চাকর এসে ঘরে ঢুকলো। সে এসে রোজই বড়সাহেবের ঘুম ভাঙায়, আজ সে দেখলো অভিনব দৃশ্য।

বীরেশ জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁ রে লোকনাথ, এত ভোরে আজ হঠাৎ রাস্তায় রাস্তায় গানের দল বেরিয়েছে কেন রে? ব্যাপার কী?

লোকনাথ একটু তটস্থ হয়ে বললে, ছোটসাহেব এই ব্যবস্থা করেছেন।

গানের ব্যবস্থা? কেন?

আনন্দময়ী মা এসেছেন, তাই ছোটসাহেব তাঁর জন্যে সবাইকে ব'লে আজ সকাল থেকে···

সকাল থেকে বুঝি তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল রাত থেকেই শহরের সব বাড়িঘর সাজাবার ব্যবস্থা চলছে।—খুব নামজাদা মেয়েছেলে কিনা? আজ রাত থাকতে সব ঝাড়ুদাররা কাজে লেগেছে, গাঁ থেকে সব মেয়েপুরুষেরা আসছে, খুব বড় মেলা বসবে। মন্দিরে আজ হৈ চৈ কাণ্ড।

বীরেশ বললে মন্দিরে আবার কি?

লোকনাথ বললে, আজ দুপুরবেলায় মন্দিরে আনন্দময়ী মা সকলের কাছে দর্শন দেবেন। মেয়েদের কাছে তিনি ভাগবতের কথা শোনাবেন।

বটে! ধর্মশাস্ত্র নিয়েও বুঝি তিনি আলোচনা করেন? কেমন চেহারা রে?

একটুখানি হাত কচ্‌লে লোকনাথ বললে, তা আর বলবেন না, বাবু। সাক্ষাৎ প্রতিমা।

দেখেছিস তুই?

আজ্ঞে—স্বপ্নে দেখেছি! একেবারে জাগ্রত দেবী!

বীরেশ তার মুখের দিকে তাকালো। বললে, ধন্য তোরা, এরই মধ্যে বুঝি দেবীর আসনে বসিয়েছিস?

হ্যাঁ বাবু, ছোটসাহেব বলেন··

ছোটসাহেব কী বলেন তা আমি জানি, তুই থাম্।

তার স্মিতমুখ দেখে লোকনাথ একটু আস্কারা পেয়ে গেল। বললে, বাবু বলবেন দয়া ক'রে? এত যে মেয়ের নাম, এত টাকা,—সে মেয়ে তিনবার জেল খাটলো কেন?

বীরেশ হেসে বললে, ওরে গাধা, স্বদেশী মেয়ে যে। দেশের কথা বলতে গেলেই সরকারের বিরুদ্ধে কথা এসে পড়ে। তার জন্যেই জেল খাটতে হয়, বুঝলি?

চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে লোকনাথ বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই দ্রুতপদে ললিত এসে তার ঘরে ঢুকলো। লোকনাথের চোখে এতক্ষণ যা পড়েনি, তাই দেখে সহসা ললিত একটু অবাক হয়ে গেল। বললে, দাদা, আপনার ঘরে যে এখনো আলো জ্বলছে?

চায়ের পেয়ালায় সামান্য এক চুমুক দিয়ে বীরেশ সেটা রেখে দিয়ে চুপ ক'রে বিছানায় বসেছিল। বললে, হ্যাঁ, ওটা আর কাল রাত্তে নেবানো হয় নি।···বসো।

আলোটা নিবিয়ে ললিত একখানা চেয়ার টেনে ব'সে বললে, রাত্রের খাবারটাও আপনি খাননি দেখছি। মুখচোখের কী চেহারা আপনার হয়েছে, একবার দেখেছেন?

বীরেশ একটু হাসলো। বললে, এখানকার লোকদের মনের চেহারার চেয়েও খারাপ ?

তার জাগরণক্লান্ত মুখের মলিন ক্লিষ্ট হাসি দেখে ললিত বিস্ময় বোধ করলো। বীরেশের কথার স্পষ্ট অর্থ বোঝা গেল না, কিন্তু তার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন অভিযোগের করুণ ঝঙ্কারটা তার কানে বাজলো। ললিত একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, দুদিন আপনার কাছে আসবার সময় পাইনি, নিশ্চয় আপনি রাগ করেছেন ?

না, ললিত। কিন্তু আমি ভাবছি—কিছুকালের জন্য তোমরা আমাকে ছুটি দাও। বিশ্রাম অনেকদিন নেওয়া হয়নি, এবার একটু,—আর তুমি ত' আজকাল বেশ ভালোই কাজকর্ম চালাতে পারো হে।

ললিত বললে, হ্যাঁ তা পারি। কিছুকাল কেন, দীর্ঘকালও পারি। ছুটিও আপনাকে দেবো, তবে চোখের আড়ালে যেতে দেবো না—তারপরেই কি মনে ক'রে সে বললে, অনুশীলা নিজের দোষে অসুখ বাধিয়েছে, সেই দুর্ভাবনায় আপনি যদি ভেঙে পড়েন, আমাদের চলবে কেন ?

কথাটায় বীরেশ কেমন একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো, কিন্তু নিজেকে দমন ক'রে সে বললে, তোমাদের চলবে, এই কথাই ত' নবনগরে শুনতে পাই। পথে ঘাটে সবাই ত' বলছে, আমাকে আর দরকার নেই। গুটিপোকার কাছে রেশম পাওয়া গেছে, সুতরাং ওটার আর দাম নেই।

ললিত অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো। বীরেশের চোখের কোণে কালি, দাড়িগোঁফ কামায়নি দুদিন, চেহারা শুষ্ক, রোগা মুখে কেমন যেন বিক্ষোভ আর নিরাসক্তির ছায়া। তার বিছানার পাশে গোটাদশেক আধপোড়া বর্মাচুরুটের একটা পাত্র। এই ভগ্নাবশেষ চুরুটগুলিতেই যেন দীর্ঘরাত্রির নিঃসঙ্গ মনোবিকারের কাহিনী জ'মে রয়েছে।—ললিত বললে, একথা কারা বলছে দাদা ?

বীরেশ একটু হাসলো! বললে, আমার চরিত্রের কলঙ্ক রটাচ্ছে যারা—তারাই।

আপনার চরিত্রের কলঙ্ক ? কানে শুনেছেন আপনি ?

কানেই শুনেছি ভাই। একজনের নয়, বহুবচনের।

অসম্ভব। ব'লে অস্থির হয়ে ললিত উঠে দাঁড়ালো। বললে, তাই যদি হয় তবে আপনি অনুমতি দিন, আমার ক্ষমতা আমি প্রয়োগ করি। বিরূপ-শক্তির কণ্ঠরোধ করতে আমাকে একটুও বেগ পেতে হবে না। অন্যায় আর নিন্দা যেখানে বাসা বেধেছে, আমি সেই বাসা ভেঙে দেবো।···আপনার কলঙ্ক!

আপনার নিন্দা!—এখন আমি বুঝতে পারছি কারা এর দলপতি। আপনি দেখুন, সাতদিনের মধ্যে চন্দন পাহাড় থেকে আরম্ভ ক'রে সুচিত্রার তীর পর্যন্ত সমস্ত শহরকে আমি শায়েস্তা ক'রে দিচ্ছি।

বীরেশ বললে, বৃথাই তোমার উত্তেজনা, ললিত। নিন্দা আর কলঙ্কের গলা টিপতে পারবে, কিন্তু আমাকে যদি নবনগরের লোক না চায়, তুমি কী করতে পারো?

আমি?—ললিত উচ্চকণ্ঠে বললে, আমি নবনগরকে জনহীন ক'রে দেবো, —নতুন ক'রে আবার মানুষের দল আনবো। আপনাকে যারা না চায়, তারা এ দেশ থেকে চ'লে যাক্, নবনগরে তাদের জায়গা নেই।

কিন্তু এ দেশ ত' আমার নয়, তাদেরই।

তাদের নয় মিস্টার চৌধুরী। এ আমাদের দেশ। এর মাটির তলা থেকে সোনা তুলেছি, এর শ্রী আর স্বাস্থ্য ফিরিয়েছি, জঙ্গল কেটে নগর বসিয়েছি, এখানকার মন্দিরে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করেছি,—এ মাটি আমাদেরই শাসন, আমাদেরই প্রভুত্ব আমাদেরই ক্ষমতা এখানে চলবে চিরকাল। যারা অন্য কথা কইবে, যারা কেবল পাকা ফলের উপর দাবি জানাবে আর নিন্দা-কলঙ্ক রটিয়ে আমাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে চাইবে, তারা শত্রু।...সেই শত্রুকে আমি নির্মূল করতে চললুম।—এই ব'লে দ্রুতপদে ললিত বেরিয়ে যাচ্ছিল, সহসা বাইরে কা'দের দেখে সে আত্মসংবরণ ক'রে আবার ভিতরে এসে দাঁড়ালো।

দুটি মহিলা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে অসঙ্কোচে ভিতরে এলেন। তাঁদের পরিচ্ছন্ন মুখে সপ্রতিভ হাসি। নমস্কার জানিয়ে একজন বললেন আপনার কাছেই এসেছি, ললিতবাবু।

দু'জনের মধ্যে একজন অবশ্যই আনন্দময়ী, এই মনে ক'রে বীরেশ একটু সচকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু সহসা ললিত বললে, দাদা, এঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। এঁর নাম সন্ধ্যামণি দেবী আর ইনি সুচরিতা রায়। আনন্দময়ীর সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, এঁরা তাঁদের মধ্যে দু'জন কর্মী!

নমস্কার বিনিময় হয়ে গেল।

বীরেশ হাসিমুখে বললে, আদর যত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছে না ত' আপনাদের? আমি নিজে বিশেষ কিছু—

না না, একটুও না। কী চমৎকার শহর গড়েছেন আপনি। দুদিন ধ'রে ঘুরে ঘুরে আমরা দেখছি।

কই, আপনাদের নেত্রীকে দেখছি নে কেন?

এই যে, তিনি একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন।—ব'লে খামে বন্ধ করা একখানা পত্র সুচরিতা ললিতের হাতে দিলেন।

আচ্ছা আমরা এখন যাই।—ব'লে আর একবার নমস্কার জানিয়ে মহিলা দুটি সমস্ত ঘরে একটি শুচিস্মিত বাতাস তুলিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

উত্তেজনায় তখনও ললিতের মুখে চোখে কিছু চাঞ্চল্য ছিল। ঘরে ঢোকবার আগে সন্ধ্যামণি আর সুচরিতার কানে কথাগুলো গেছে কিনা সহসা একথা আর সে ভেবে উঠতে পারলো না। একটা নিষ্ঠুর কর্তব্যের দিকে তার মন ছুটেছে,—এ নগরের অধিনায়ক আর অভিভাবকের অপমান কোনোমতে সে সইবে না। তার শাসন-শৃঙ্খলার মধ্যে মানবতার অংশটাই ছিল প্রবল, কিন্তু এবার কঠোরতা প্রকাশ করার সময় এসেছে।

খামখানা ছিঁড়ে চিঠি খুলে সে পড়তে লাগলো। আনন্দময়ীর হাতের লেখার অস্পষ্টতা কোথাও কিছু নেই; পরিচ্ছন্ন বক্তব্যটুকু ভিন্ন নিষ্প্রয়োজনীয় একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু চিঠিখানা পড়তে পড়তে তার মুখের চেহারা এমনি বিবর্ণ, নিরুৎসাহ হয়ে এলো যে, কিছুতেই সে আর আত্মগোপন করতে পারলো না। সেখানা হাতে নিয়ে সে পুনরায় চেয়ারের উপর ব'সে চাপা নিশ্বাস ফেললো। আহত মুখখানা তার কালো হয়ে এলো।

বীরেশ বললে,—বসলে যে? দুঃসংবাদ নাকি?

ঢোঁক গিলে ললিত বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ সকালে আপনার এই ঘরে তাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলুম, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু তিনি যে এভাবে জবাব দেবেন, আশা করিনি।

বীরেশ তার দুরবস্থা দেখে একটু যেন কৌতুকবোধ করলো। বললে, তাঁর বক্তব্যটা কী?

চিঠিটাই প'ড়ে আপনাকে শোনাই।—ব'লে ললিত আরম্ভ করলো—

ললিতবাবু,

সকালে আমার যাওয়া হ'লো না। যাওয়া হবে কি না বলতে পারি নে। নবনগর সম্পর্কে যে সব নির্ভরযোগ্য তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি, সেগুলো নিয়ে আপনার বড়সাহেবের কাছে, আলোচনা উঠবেই জানি, কিন্তু আমার মুখ থেকে অবশ্যম্ভাবী মন্তব্যগুলো তাঁর পক্ষে রুচিকর হবে না, এই আশঙ্কায় আলাপ করাটা স্থগিত রাখলুম।

ইতি—আনন্দময়ী

বীরেশ বললে, বুঝতে কিছুই বাকি নেই বোধ হয়? কী বলো হে

এই ব'লে সে একটু হাসলো। কিন্তু সে-হাসি পলকের জন্য, তারপর গম্ভীর মুখে নিজেই সে মাথা নত করলো।

ললিত বললে, কিন্তু অবাক হচ্ছি দাদা, এমন কী কারণ ঘটতে পারে এই অল্প সময়টুকুতে···কই, কিছুই ত' তিনি আমাকে বলেননি! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি নে···

বীরেশ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো। তারপর মুখ তুলে বললে, তুমি কি আমার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেছিলে ওঁর কাছে?

বিন্দুমাত্র না। চিঠিপত্রেও কোনোদিন কোনো কারণে আপনার নামটি অবধি উল্লেখ করিনি। আমি এখানে চাকরি করি, এখানকার 'কলোনি'তে আমি বহু কাজের ভার নিয়েছি, এই শুধু জানতেন। নবনগরের সর্বপ্রধান কর্তা হলেন আমার বড়সাহেব, এই সংবাদ কাল সকালে মাত্র তাঁকে জানিয়েছি। তিনি আপনার নামও জানতেন না, আপনার কোনো খবরও রাখতেন না। জানি শত্রুপক্ষ গিয়ে তাঁর কান ভারী করেছে,—কিন্তু আশ্চর্য, মানুষের নিন্দা রটনায় তিনি ত' কোনোদিন কারো ওপর অবিচার করেননি। এ তিনি কী করলেন? ললিতের কণ্ঠস্বরে করুণ অভিযোগ ফুটে উঠলো।

একটা ফাইল হাতে নিয়ে চাপরাশী এসে ঢুকে সেলাম জানালো। ফাইলটা হাতে নিয়ে ললিত উল্টে দেখলো, কনট্রাক্ট্ লেখবার খানকয়েক আদালতের স্ট্যাম্পযুক্ত ডেমি কাগজ। ফাইলটা রেখে দিয়ে সে বললে, যাও।

চাপরাশী চ'লে গেল।

হাসিমুখে বীরেশ বললে তোমার বান্ধবীটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আমার কমলো না ললিত, বরং বেড়েই গেল। এমন নির্ভীক আত্মস্বাতন্ত্র্য সম্মানের যোগ্য। কিন্তু মনে রেখো ললিত, তিনি এখানকার সম্মানীয় অতিথি, তাঁর প্রতি যেন তোমার আচরণের ত্রুটি একটুও না প্রকাশ পায়। বাস্তবিক, মেয়েটি অসাধারণ বটে!

কিন্তু শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার রহস্যময় রীতিতে শ্রোতার মুখে যে-স্বস্তির ছায়া একটি মুহূর্তে জেগে উঠেই আবার পলকের মধ্যে মিলিয়ে গেল, সেই অনির্বচনীয় দৃশ্যটুকু বীরেশের চোখে পড়লো না।

বীরেশ বললে, খ্যাতি আর অখ্যাতিতে মিলিয়ে আমার ব্যক্তিত্বের একটা মোহ যে আছে, এ আমি নিজেই জানি, ললিত। কিন্তু সেই মোহকে সহজে যিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, তাঁর প্রশংসাই আমি করি। এমন দৃঢ়তা আর স্বকীয়তা বাংলাদেশের যে কোনো মেয়ের পক্ষেই দুর্লভ! তোমার বান্ধবীর নামের চটকে আমি ভুলিনি, তিনি নেত্রীই হোন্ আর দেশসেবিকাই হোন,—আমার পক্ষে ঔৎসুক্য কম। তবে একথা বলতে পারি, তোমার মতো স্বভাবনম্র

যুবকের সঙ্গে তাঁর মত দৃঢ়চেতা মেয়ের মিলন ঘটলে তোমাদের জীবন খুবই সুন্দর হবে।

দীর্ঘকাল দু'জনে নিঃশব্দে ব'সে রইলো। নগরের পথের মাঝে জনতার কলরোল এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে আনন্দময়ীর নামযুক্ত জয়ধ্বনি দু'জনেরই কানে এসে বাজতে লাগলো। কিন্তু উভয়ের দিক থেকে কোনো ঔৎসুক্য কোনো চাঞ্চল্যই দেখা গেল না। মাঝখানে চাকর এসে ঘরটা ঝেড়ে মুছে সমস্ত জানালাগুলো খুলে দিয়ে টেবিলের উপর ফুলদানিতে ফুলের গোছা রেখে চ'লে গেল। এ সময়ে এমন নিষ্ক্রিয় ব'সে থাকার কথা নয়, অগণ্য কর্তব্য ললিতকে চারদিক থেকে আহ্বান করছে। নিচের তলায় লোকজনের কোলাহল শোনা যাচ্ছে; আপিস বসেছে। বেলা দশটা বাজে।

চাপরাশীর পিছনে পিছনে একটি ছোকরা উঠে এলো। ছোকরা ললিতের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, নাম সমীর। তাকে দেখে ললিত ব'লে উঠলো,—ব'লে ত' দিয়েছি তোমাদের আজ হাফ-হলি ডে। আসছে কাল সম্পূর্ণ-ই ছুটি।

সমীর বললে, সে-জন্যে নয় স্যার—একটা খবর আপনাকে দিতে এলাম—আজকের পাবলিক মিটিংয়ের ব্যাপার—

ভেতরে এসো।

চাপরাশী চ'লে গেল। ঘরের ভিতরে সমীর এসে দাঁড়ালো। বড়সাহেবের ঘরে ঢোকার মতো বুকের পাটা অনেকেরই নেই; এটা দুর্লভ সুযোগ ব'লে অনেকে মনে করে। ছোকরাটি প্রথমে একটু থতিয়ে গেল।

মিটিংয়ের কী ব্যাপার শুনি?

সমীর একবার বড়সাহেবের দিকে তাকালো। বীরেশের চোখ দুটো দীর্ঘায়ত, নিষ্কম্প,—কপিশবর্ণের ঔজ্জ্বল্যকে সেই দৃষ্টি যেন অনেকটা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই কপিশচক্ষুর ভিতর দিয়ে প্রাণের যে লৌহ কঠিন দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, তার দিকে মুখ তুলে কথা বলার যথেষ্ট দুঃসাহসের দরকার। ছেলেটি বললে—আমরা ক'জন ভোর থেকেই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু নবনগরের সর্বত্রই একটা অশান্তি দেখা যাচ্ছে। তারা বলছে, এ সভা কর্তৃপক্ষের নয়, জনসাধারণের। আনন্দময়ী এখানে এসেছেন বড়সাহেব কিংবা ছোটসাহেবের অতিথি হয়ে নয়—তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি, ওরা সবাই গিয়ে আনন্দময়ীর বাসা ঘিরে রয়েছে।

ওরা কে?

প্রকাশ ঘোষের দল, তারিণী তলাপাত্রের দল, তারপর—

তারপর কী ?—ললিত উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করলে।—তারা কী বলে ?

সমীর থতমত খেয়ে বললে, মিউনিসিপ্যালিটির আপিস, হাসপাতাল আর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা, ইনস্যুরেন্সের কেরানিরা,—এরা সবাই আজ দুদিন থেকে চন্দনপাহাড়ের গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রায় দশ-হাজার লোক যোগাড় করেছে।···তারা মিটিং ভাঙতে পারে।

তারা বলছে—ব'লে সমীর একবার অলক্ষ্যে বড়সাহেবের দিকে তাকিয়ে কিছু সাহস সঞ্চয় করলো। তারপর বললে, তারা বলছে বড়সাহেবের দল নিজেদের প্রচারকার্য করিয়ে নিতে চান। তারা তা হ'তে দেবে না।··· স্যার, আমাদের ভলান্টিয়ারের দলকে তারা ভয় দেখিয়ে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছে।

মিছে কথা!—ব'লে ললিত চীৎকার ক'রে অগ্নিশিখার মতো উঠে দাঁড়ালো।

বীরেশ এইবার কথা বললে,—আচ্ছা সব ত' শুনলুম। কিন্তু আনন্দময়ীর মনোভাবটা কী, তোমরা খোঁজ নিয়েছ ?

সমীর বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা জানতে পেরেছি। তিনি বলেন, তিনি বিশেষ কোনো দলের মুখপাত্রী নন্, তিনি জনসাধারণের, তিনি গণতন্ত্রের আন্দোলনের পক্ষপাতী।· এবার আমি যাই, স্যার—ব'লে নমস্কার ক'রে সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিশ্বাস ফেলে হাসিমুখে বীরেশ বললে, সমস্যা আমার নয় ললিত, সমস্যা তোমার। তুমি বোধ হয় আগে বুঝতে পারোনি, সুলভ খ্যাতির মোহে তোমার আনন্দময়ীরও মাথা খারাপ হ'তে পারে। এ ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর অথবা তাঁর ওই জনসাধারণের সঙ্গে বিরোধ বাধলো, বেশ বুঝতে পারছি। তবে আমি তাতে ভয় পাই নে, দুঃখবোধও করি নে। কিন্তু তুমি একটা বিশ্রী দ্বন্দ্বের মধ্যে প'ড়ে গেলে। একদিকে তোমার হাতে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষার ভার, আর একদিকে তোমার আনন্দময়ীর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব—

বাইরে কী একটা গোলমাল শুনে বীরেশ এবার নিজেই উঠে একবার পায়চারি ক'রে এলো। দক্ষিণ পথের প্রান্ত বেয়ে চারণের দল তখনও সাম্যবাদী গান গেয়ে গেয়ে চলেছে। গানের সুরটির মধ্যে মাধুর্য সঞ্চার ক'রে যথেষ্ট শ্রুতিমধুর করবার চাতুরী আছে, শুনলে মন মোহগ্রস্ত হয়—কিন্তু তার বিষয়বস্তু হ'লো কিষাণ মজদুর জাগো, জাগো, ধনিকদের উচ্ছেদ করো—ইত্যাদি। বীরেশের মনে প'ড়ে গেল বহুকাল আগে চিনির কলের মালিকদের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে সেও একদিন গণতন্ত্রের জয়ঘোষণা করতো। সেদিন ধনপতিদের বিরুদ্ধে কী

রাগ তার! অনুশীলা আর অনিলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী আগুন-ছোটানো বক্তৃতাই সে দিয়েছিল। কিন্তু আজ এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে তার বলতে ইচ্ছা হ'লো, ওরে মূর্খ জনসাধারণ, পৃথিবীর বড় বড় গণতন্ত্রের যারা নিয়ন্তা, তারা রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে আর অকর্মণ্য বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় না,—তারা কাজ করে। কেবল তাই নয়, তারা ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করে, তাদের প্রকাণ্ড সৃষ্টিরচনা, তারা বিপুল অর্থ আর ঐশ্বর্যের জমিদার। তোদের জয়ঘোষণা যারা করে, তারা আত্মকল্পিত রচনাকে সফল করার জন্য তোদেরকে বাহনের মতো ব্যবহার ক'রে নেয়, এই মাত্র। তোদের মুখে তারা বুলি দেয়, তোদের নাচায় কাঁদায়, দরকার হ'লে তোদের মার খাওয়ায়, অসুবিধায় পড়লে তোদেরই বলি দেয়। বিপুল কোলাহল জাগিয়ে তুললেও তোরা মূঢ়, মূক, প্রাণহীন অকর্মণ্য।

বারান্দা থেকে বীরেশ ফিরে এলো। বললে, তোমাকে কী উপদেশ দিলে সব দিক রক্ষা হবে, জানি নে ললিত। তবে এবার আমার নির্দেশ তোমাকে দেবো।…নবনগরের সর্বত্র ঘোষণা ক'রে দাও, আজ থেকে আমার এই এলাকায় সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা সমস্তই বন্ধ।

ললিত ভীত কণ্ঠে ঢোঁক গিললো। বললে, কী বলছেন আপনি? ওরা যে বিপ্লব বাধাবে?

দেখতে চাই সেই বিপ্লবের চেহারা! তুমি যাও, সব আয়োজন বন্ধ করো, পদ্মাসনার মন্দিরের দরজায় চাবিতালা লাগিয়ে আমাকে চাবি এনে দাও।

কিন্তু দাদা, একবার ভেবে দেখুন—

বীরেশ বললে, ভেবেই দেখছি ভাই। টেলিফোন ক'রে আমি হেড কোয়ার্টার্স থেকে এখুনি পুলিশ ফৌজ আনাচ্ছি, ভয় নেই।—হ্যাঁ, আজ বিকেলবেলার মধ্যে দেখতে চাই, প্রকাশ ঘোষ আর তারিণী তলাপাত্রকে এই নগর থেকে পাইকদের সাহায্যে অন্তত ত্রিশ মাইল দূরে নির্বাসিত করা হয়েছে। ওদের পরিবারকে নৌকায় চাপিয়ে এ অঞ্চল থেকে সরিয়ে দাও। আর যারা দল পাকাচ্ছে, তাদের ওপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তুমি করবে।… নবনগর যদি জনহীন হয়, পরোয়া করবো না। যাও ললিত—

কিন্তু যদি গোলমাল বাধে?

তার দায়িত্ব আমার, পুলিশের।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে ললিত বললে, কিন্তু আনন্দময়ী যদি…

থমকে বীরেশ দাঁড়ালো। বললে, হ্যাঁ, আনন্দময়ীর সম্মানরক্ষার সর্বপ্রকার

দায়িত্ব তুমি নেবে।...কিন্তু আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, দরকার হ'লে একথা তাঁকে তুমি জানিয়ো। বাইরে গিয়ে এখানকার আইন আর শৃঙ্খলার বিপক্ষে তিনি যদি দাঁড়ান, আপত্তি নেই,—তবে নবনগরের মাটির ওপর পা রেখে নবনগরের বিরুদ্ধে তাঁকে কথা বলতে দেবো না,—তাঁকে অবিলম্বে এ দেশ ত্যাগ করতে হবে।

ভীতকণ্ঠে ললিত প্রশ্ন করলো,—যদি আপত্তি করেন ?

আইন আর শৃঙ্খলা তাঁর আপত্তির চেয়ে অনেক বড়। যাও আমি এখনি ফোন্ করছি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পুলিশের দল আসবে। তাদের তাঁবু ফেলার ব্যবস্থাও তুমি করবে।—ব'লে বীরেশ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে একদা প্রলয় কাল ঘনিয়ে এসেছিল। সেই দুর্জয় ক্ষমতার প্রয়োগে ভয় অপেক্ষাও ভীষণ চেহারা ফুটে উঠলো নবনগরে।—পুরুষের ভিতরে ছিলেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তিনি সৃষ্টি করেছিলেন; শ্রীবিষ্ণু হয়ে তিনি করেছিলেন পালন, আজ বীরেশের ভিতর থেকে জেগে উঠলেন মহেশ্বর —কাল জটারাশিতে নবনগরের দিগন্ত ভরে নামলেন সংহারলীলায়। ভয়ঙ্করের কী বিচিত্র বেশ, মহিমান্বিত নিষ্ঠুরতার কী আশ্চর্য প্রকাশ! আজ পদতল-বাসিনী সেই অনুশীলা কাছে নেই, প্রতিভার পূজারিণীর স্তবগান আজ নীরব।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সংসারে মহিমা কে বোঝে কতটুকু ?

সমগ্র নগরের কণ্ঠরোধ করতে বিলম্ব হ'লো না, দম আটকে যেন চারিদিক নীল হয়ে উঠলো। গুর্খার দল, সমবায়-সমিতির ভোজপুরী দল, আর একদল জংলী সর্দারকে পিঞ্জরমুক্ত ব্যাঘ্রের মতো চারিদিকে ছেড়ে দেওয়া হ'লো!—তারা কর্তব্য জানে, কৃপা জানে না। প্রথমেই আনন্দময়ীর বাসা তারা অবরোধ ক'রে রইলো, সেখানে অপর কারো প্রবেশ নিষেধ। তারপর দেখতে দেখতে প্রকাশ ঘোষ আর তারিণী তলাপাত্রের সুব্যবস্থা হয়ে গেল। নগরের সর্বত্র একটা আতঙ্কের ছায়া নামলো,—ঘরে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ হ'তে লাগলো। কোথায় গেল চারণের গান, কোথায় শোভাযাত্রা আর সভার আয়োজন! মাঝে মাঝে কেবল আহতের ক্ষণিক আর্তচীৎকার কানে আসে,—তারপর আবার স্তব্ধতা! কেবল নিঃশব্দে হাসপাতালের কোনো কোনো কক্ষ আহত ব্যক্তির সংখ্যায় ভরতে লাগলো। ওদিকে চন্দন-পাহাড় থেকে কয়েক মাইল দূরে এক লৌহসার-রক্ষার প্রাচীরবেষ্টিত আড়তে মাত্র জনপঞ্চাশেক দলপতিকে নির্বাসিত করা হ'লো। পাইকদের প্রহারে তাদের মধ্যে অনেকে এখনও অচেতন। রুদ্র তাঁর নিজের তাণ্ডবের নেশায় রক্তচক্ষু।

পুলিশ ফৌজ এসে পৌঁছেছে, তাদের নায়ক এসে বীরেশের সঙ্গে সাদর করমর্দন ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে গেছেন। বীরেশ তাঁকে চা-পানে আপ্যায়িত ক'রে দিয়েছে।

অপরাহ্ণ সন্ধ্যার দিকে আসন্ন। নগরের সর্বত্র দীপমালা জ্ব'লে উঠেছে। তারা যেন নিঃসঙ্গ প্রেতদৃষ্টির মতো ভয়াল ও দীপ্ত। আলো আছে, উৎসব কোথাও নেই। উপবাসী সর্বহারার ন্যায় পথঘাট, জনহীন, কোলাহলহীন। একা এই নগর যেন শ্মশানপ্রান্তে কাঁদতে বসেছে। বসন্ত বাতাস কেবল করুণ নিশ্বাসে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে সুচিত্রার কুলুকুলু কান্নার উপর দিয়ে। আকণ্ঠ বেদনায় চারিদিক রুদ্ধশ্বাস,—স্তব্ধ।

তিনমহলা বাগানবাড়ির দোতলার প্রকাণ্ড বারান্দায় বীরেশ একা পায়চারি ক'রে চলেছে। নিচে পাইক আছে কয়েকজন, সমীর আছে আলো জ্বেলে অফিস ঘরে। সকাল থেকে ললিতের আর কোনো উদ্দেশ নেই। বড়সাহেবের আদেশ পালন করেছে সে বর্ণে বর্ণে!

যে কোনো জরুরী অবস্থার জন্য বীরেশ প্রস্তুত। কিন্তু তবু স্বল্প আলোয় নিজের ছায়া দেখে নিজেই সে চমকে উঠে কেন :···এ ছায়া তার নয়, অন্যের। তার সকল কীর্তির ভগ্নাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে কে যেন তাকে অগণ্য প্রশ্ন ক'রে চলেছে। পক্ষীশাবকদের মতো তারই বুকের মধ্যে যেন স্তূপাকার প্রশ্নের ঝটাপটি চলেছে। এর মধ্যে কল্যাণ কোথায়? তার শক্তি আর ক্ষমতার এ কি বীভৎস পরিণাম? এ আজ সে কোথায় এসে দাঁড়ালো? এ লজ্জা সে লুকোবে কোথায়? কিন্তু দেয়ালে-দেয়ালে, কক্ষে কক্ষে কোথাও তার প্রশ্নের উত্তর নেই। আজ কোথায় তারা, যারা তার বিপুল ক্ষমতার এই মহিমান্বিত অধঃপতন দেখে কাঁদতে বসবে? আজ তার সাফল্যের চেহারা অপূর্ব, তার ক্ষমতা আর প্রভুত্বের এই আশ্চর্য প্রকাশ যে-কোনো পুরুষের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু। অত্যন্ত সামান্য, অত্যন্ত নগণ্য এক নিঃসম্বল পলাতক অবস্থা থেকে শক্তি আর প্রতিপত্তির শিখরে সে উঠেছে। সে ভয় করে না কলঙ্ক আর অপবাদ, গ্রাহ্য করে না অখ্যাতি আর ঈর্ষা, পরোয়া করে না বিরোধী দলের কোনো চক্রান্ত। তাকে নিচে নামাবার, দাবিয়ে রাখার, পরাজিত করার ক্ষমতা আর কারো হাতে নেই।—সম্পদ আর শক্তি—এই দুই দুর্লভ বস্তু তার করতলগত। তাকে দেশদ্রোহী বলো, অনাচারী বলো, লুণ্ঠনকারী বলো—বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। ক্ষমতাবান শক্তের প্রতি মানুষের সহজাত ঈর্ষা আছে, সে জানে,—জাতীয়তা আর গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ওরা সেই ঈর্ষাকে গোপন করে; মানবপ্রীতির নাম দিয়ে বঞ্চিত আর ব্যর্থের দল নিষ্ফল চিত্তক্ষোভকে চেপে রাখে।

কিন্তু তবু ওই স্তিমিত প্রদীপের আলোয় দেয়ালের ছায়া বলে অন্য কথা। কী ছিল তার নীল রক্তে? প্রভুত্ব-পিপাসা, অথবা লোক-কল্যাণ? এই কি সেই কল্যাণ? এই কি তার পথ? সম্পদ আর ক্ষমতাকে সে আয়ত্ত করলো,—তার সর্বশেষ পরিণাম কি মানুষের কণ্ঠরোধ? কী চেয়েছিল সে, কী জন্যে তার জীবনব্যাপী সংগ্রাম, তার এই মরণান্তক অধ্যবসায়?…

সংশয় জাগলো তার মনে,—বিপুল বিশ্বব্যাপী সংশয়। আলো কোথাও নেই, কিন্তু কোথায় তা'র পথ। সৃষ্টি করেছে সে বিরাট, কিন্তু এই বিরাটের শেষ, অর্থ? কোথায় গেল তার অস্তিত্বের অর্থ? দুঃখে, দুর্দশায়, বেদনায় যুদ্ধ করেছে সে অবিশ্রান্ত, কিন্তু তার সকল কর্ম, সব অধ্যবসায়ের এই বীভৎস পরিণতি সে ত' কল্পনা করেনি কোনোদিন। দিগন্ত-প্রসারিত তামসী অন্ধকারের দিকে চেয়ে বীরেশ অধীর প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলো তার সেই অগ্নিক্ষরা তরুণ যৌবনের স্মৃতিবিন্দুগুলি। সেই ভাবনাহীন দায়িত্ববোধহীন দিনগুলি। সেই নির্মল, নিষ্কলঙ্ক জীবনের আনন্দময় মুহূর্তগুলি। আজ রাত্রে তার জীবনের এই পরম জিজ্ঞাসার সন্ধিক্ষণে তার কাছে কেউ নেই, কে ব'লে দেবে তার কোন্ পথ? কোন্ পথে পাওয়া যাবে পরমার্থ, পাওয়া যাবে খুঁজে তার পরম তৃপ্তির সন্ধান! যা কিছু রচনা সে করেছে, সব ব্যর্থ মিথ্যা অসার,—মানুষের কল্যাণ-পদার্থ এর মধ্যে কোথাও নেই। মহাকবি হ'তে সে চেয়েছিল, হয়ে উঠলো মহাদানব। বাল্মীকি হ'তে পারলো না, হ'লো দস্যু রত্নাকর। সমুদ্র মন্থন ক'রে সে অমৃত ভাণ্ডার তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আকণ্ঠ ভ'রে উঠলো হলাহলে।

পায়ের শব্দে বীরেশের চমক ভাঙলো। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে,—কে?

আমি সমীর। আপনার নামে একখানা তার এসেছে এই মাত্র।

রেখে দাও আমার টেব্‌লে।

ঘরে ঢুকে টেব্‌লের ওপর টেলিগ্রামটি রেখে দিয়ে সমীর আবার নিচে নেমে গেল।

মনোবিকারের মোহে বীরেশের চোখ দুটো আচ্ছন্ন, তন্দ্রায় নিমীলিত। একটা অভিনব যন্ত্রণায় সে যেন জর্জর। দেহে কিংবা মনে, স্নায়ুতন্ত্রে কিংবা রক্ত সঞ্চালনে সে যন্ত্রণা যে কোথায়, তার সংজ্ঞা নেই। তবু যে-সীমানার ভিতরে আবদ্ধ সে,—তাকে চূর্ণ ক'রে ছিন্নভিন্ন ক'রে অবারিত মুক্তির পিপাসায় সে যেন অধীর হয়ে উঠেছে। নিজেকে আঘাত ক'রে, ক্ষতবিক্ষত ক'রে দংশন ক'রে সে চায় একটু নিবিড় স্বস্তি। সে পেয়েছে অনেক,—অনেক যশ, অনেক ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা, অনেক প্রতিপত্তি আর প্রতিষ্ঠা, কিন্তু পায়নি অমৃত।

অমৃতের ক্ষুধায় সে হা হা করছে। বহুকাল থেকে সে কল্পনা করেছিল একটু মধুর বিশ্রাম, ছোট একখানি পর্ণকুটীর, তার লতামালঞ্চের ফুলে ফুলে মৃদু গুঞ্জরণ, দক্ষিণের একটুখানি দাক্ষিণ্য। মৃত্তিকার কণায় খুঁজে পাবে সে সান্ত্বনা, পাখীর কলগানে আর আকাশের তারায় আর মধ্যাহ্নের প্রহর গোণায় সে পাবে অপরূপ সঙ্গীতের সংবাদ। কোনো ঝঞ্ঝা, কোনো বিক্ষোভ—দাহন, জনতার কোনো কল-কোলাহল—তার সেই কুটীর-প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌছবে না। অমৃতের সন্ধান আছে সেই জীবনে, যেখানে মানুষের সমাজ নেই, কল্যাণ-প্রচেষ্টায় হুড়োহুড়ি নেই, যেখানে ভয়-ভাবনা, নিরাশা ব্যর্থতা ঘৃণা ও ক্ষোভ নেই, যেখানে ক্ষমতার দানবীয় মূর্তি আর বঞ্চিতের পরশ্রীকাতরতা নেই, অপবাদ যেখানে পৌছয় না, যেখানে মহত্বের মূল্য ঘৃণা আর ঈর্ষার কষ্টিপাথরে কষা হয় না,—সেই অমৃতময় জীবনে। সে জীবন এই নবনগর ছাড়িয়ে, সুচিত্রা পেরিয়ে, দিগন্ত অতিক্রম ক'রে,—সে কোথায় কত দূরে, বীরেশের জানা নেই। আজ তারই হৃদয়ের দানববৃত্তি যখন চারিদিকে বর্বর চক্রান্ত-জাল বিস্তার ক'রে নিরস্ত্র ও নিরুপায় বিরূপের দলকে নির্মমভাবে পদদলিত করেছে, তখন সেই হৃদয়ের দেবপ্রকৃতি আপন সর্বাঙ্গে উৎপীড়িতের রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নগুলি অনুভব ক'রে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে ভাবতে লাগলো,—এ পথ তার নয়, তার পথ অমৃতের। অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সে এতদিন যা পেয়েছে, এ আসল বস্তু নয়,—এর থেকে নিজেকে অতিক্রম করাই তার সাধনা। অমৃতের অফুরন্ত পিপাসা তার মনে, কিন্তু নিঃস্ব নিরবলম্ব না হ'লে সে অমৃত কি পাওয়া যাবে খুঁজে?

ঘরে এসে আলোটা উজ্জ্বল ক'রে বীরেশ কতকগুলি কাগজ আর স্ট্যাম্প নিয়ে কী যেন মনোযোগ দিয়ে লিখতে লাগলো। টেবিলের একপাশে টেলিগ্রামের মোড়ক প'ড়ে রইলো, তার খোলার সময় নেই। লিখলো সে অনেকক্ষণ, কী যে লিখলো সে-ই জানে। রাত্রি সম্পূর্ণ নিঃসাড়,—পেচকের আওয়াজ ভিন্ন আর কোথাও কিছু শোনা যায় না। বড় একখানা আবেদন-পত্রের মতো অজস্র লেখা সে লিখে গেল একান্ত মনোযোগে।

দরজার বাইরে সহসা পায়ের শব্দ শুনে সে মুখ তুললো। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে সেই অলৌকিক শব্দটুকু আবার যেন পলকে স্তব্ধ হয়ে গেল। বাড়িটা তার প্রহরীবেষ্টিত হ'লেও রাত্রির অন্ধকারে গোপনচারী শত্রুর আবির্ভাব অসম্ভব নয়। বীরেশ সতর্ক হয়ে সাড়া দিল, কে?···সমীর?

সাড়া দিল না কেউ। কিন্তু পরমুহূর্তেই লঘুপদসঞ্চারে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালো একটি স্ত্রীলোক। ধূসর আবরণে সর্বাঙ্গ ঢাকা; চোখে মুখে উদ্বেগ

থাকলেও সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিঃসঙ্কোচ। কিন্তু তার রূপলাবণ্যরাশির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বীরেশ বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে গেল।

নমস্কার। আমাকে বোধ হয় চিনতে পারেননি, আমি আনন্দময়ী! সকালে আপনার এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণেই হয়ে ওঠেনি।—আপনি হয়ত বিরক্ত হলেন, কিন্তু একটু আলাপ করতে পারি কি?

বীরেশের মুখে কোনো কথা ফুটলো না, কেবল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

চেয়ারটা টেনে আনন্দময়ী টেবিলের কাছেই এসে বসলেন। রাত অনেক,—হয়ত দুটো কি তিনটে, তবু বিরক্ত করতে এলুম আপনাকে। আমি একা আসি নি, ললিত নিচে ব'সে আছেন। ললিতকে আপনি খুব ভালোবাসেন, জানি।—এই ব'লে সরু চুড়ি-পরা ডান হাতে কপালের একঝলক চুল ঘোমটার মধ্যে সরিয়ে দিয়ে সপ্রতিভ ভাবে তিনি বসলেন।

গলা পরিষ্কার ক'রে বীরেশ এতক্ষণ পরে গলার আওয়াজ বার করতে পারলো। বললে,—এমন সময়ে আপনি এলেন?

আনন্দময়ী একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, বিশেষ জরুরী কাজ, বুঝতেই পারছেন। আমি নিরুপায় হয়ে এসেছি আপনার কাছে। এত রাতে আসা হয়ত অশোভন হ'লো।

তাঁর আত্মসমর্পণের ভাব দেখে বীরেশ খানিকটা যেন আত্মস্থ হ'লো। বললে, আপনার সঙ্গে পরিচয় কখনো হয়নি, তবে ললিতের কাছে আপনার অনেক স্তুতিবাদ শুনেছি। সে বলে, আপনি নাকি মহীয়সী দেশনেত্রী! হয়ত সত্যি, হয়ত বা অতিশয়োক্তি,—আমি জানিনে—কিন্তু অভিযোগ বিচার না ক'রে আমার প্রতি আপনি যে মন্তব্য করেছেন, সেটা বিচিত্র বটে!

আনন্দময়ী কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। দেখুন ধারণা জিনিসটা অদ্ভুত, সে কোনো যুক্তিতর্ক মেনে চলে না। সবাই একজনকে মন্দ বলে, নিন্দা করে,—হয়ত তার সত্য প্রমাণও দেয়, কিন্তু আমার যদি ধারণা হয়, সে ভালো লোক,—আমি নাচার। বিশ্বাসের কাছে কোনো যুক্তিতর্ক খাটে না।

যাকগে।—বীরেশ বললে, বলুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?

আনন্দময়ী বললেন, অনেকের ধারণা আমি এখানে অতিথি হয়ে এসেছি, সেটা সত্যি নয়। আমি এসেছি ভ্রমণে; কাগজে পড়েছিলুম এই কলোনির ইতিহাস, অনেকদিন থেকেই দেখার সাধ ছিল। মনে করেছিলুম এখানকার আদর্শ থেকে নিজে কিছু নতুন কাজের সন্ধান পাবো, কিন্তু আড়ম্বরই চোখে পড়লো, প্রাণের চেহারা দেখতে পেলুম না।···আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি।

বীরেশ বললে, আপনার সমালোচনা শুনে আমার লাভ নেই। যা সাধ্য

তা করেছি, যা পারিনি তার জন্যে লজ্জিত নই। তবু আপনাদের জানাই, সমালোচনা অপেক্ষা সহানুভূতিই বড়। আপনি ব্যর্থ হয়ে চ'লে যাচ্ছেন কেন আমি জানিনে। অথচ আপনার রুচি অনুযায়ী আমি এই নগরকে ঢেলে সাজাবো, এ উৎসাহও আমারও নেই।

আনন্দময়ী একটু হাসলেন। কিন্তু তাঁর হাসির অর্থটা সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে বীরেশ যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। সকালবেলা এই নারীই তার পুরুষের মর্যাদায় আঘাত করেছিল। মেয়েদের কাছে কোনোদিন অনাদর সে সহ্য করেনি, সেই ক্ষত থেকে রক্তের দাগ তার এখনো শুকোয়নি।

আনন্দময়ী আস্তে আস্তে বললেন, কাল এই নগরে একটা বিশেষ উৎসব আরম্ভ হবার কথা ছিল—

হ্যাঁ, আপনারই আগমন উপলক্ষে—বীরেশ বললে, আমিও খুব উৎসাহ বোধ করেছিলুম, কিন্তু আপনার জনকয়েক চাটুকারের উৎপাতে আমাকে সব বন্ধ করতে হয়েছে।—এই ব'লে সে প্রবল উত্তেজনা দমন ক'রে একটা চুরুট ধরালো।

আনন্দময়ী বললেন, তারা এখানকারই লোক, আমার চাটুকার নয়। আপনি তাদের আয়ত্ত করতে পারেননি, সে অপরাধ কি আমার? আমি এখানে নতুন এসেছি।

বেশ, আপনি কী চান্ বলুন?

আমি?—হাসিমুখে আনন্দময়ী মাথা নত করলেন। পুনর্ব্বায় বললেন, কিছু চাইতে আমি আসিনি। কেবল চাটুকারদের তরফ থেকে আপনাকে বলতে এসেছি, তারা অপরাধী নয়, তারা অন্যায় শাস্তি পেয়েছে।

বীরেশ বললে, সে-বিচার আমার আর ললিতের—আর কারো নয়। নবনগরের চৌহদ্দির মধ্যে অন্যায় কোথাও নেই, এইটুকু আপনারা জেনে যান।

আনন্দময়ী বললেন, সেইটুকুই এর বিপদ। অন্যায় আর শৃঙ্খলা নিয়ে যারা কারবার করে, তারা হৃদয়ের মূল্য দেয় না। জনসাধারণের অসন্তোষকে যারা গলা টিপে মারতে চায়, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ করে। দূষিত বায়ুর পথ রোধ করতে নেই, সেই অস্বাস্থ্যই একদিন সকল প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে।—আপনার এই দণ্ডনীতি আপনি প্রত্যাহার করুন, বীরেশবাবু।

বীরেশ চুপ ক'রে শুনলো তাঁর কথা। পরে বললে, নীতি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে প্রস্তুত নই। কেবল বলি, উপরতলার এই অসন্তোষটাই কৃত্রিম। মানবতার আদর্শের ওপর এই 'কলোনি'র ভিত্তি, সস্তা গণতন্ত্রের ঝুটো ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান আমরা করিনে, কাজ করি আমরা। আপনার

নির্বোধ চাটুকাররা বোঝেনি মানুষের সকল কীর্তিই বাইরের লোকের জন্যে। একজন রচনা করে, পাঁচজনে তার ভাগ পায়। ক্ষুধার খাদ্য দেবো না, এতবড় অমানুষ আমি নই, কিন্তু দুষ্ট ক্ষুধাকে প্রশ্রয় দিয়ে এই নগরে অস্বাস্থ্য আনবো, এ নির্বুদ্ধিতা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

তাই ব'লে আপনি অত্যাচার করবেন তাদের ওপর ?

তাঁর গলার আওয়াজে বীরেশ আঘাত খেয়ে উষ্ণ হয়ে উঠলো। চুরুটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে বললে, আপনার উত্তেজনার কারণ আছে বৈকি !···সন্দেহ নেই, আপনার আগামী কালের পাওনা প্রশস্তিটা মাঠে মারা গেল !

আনন্দময়ী আহত হলেন না, কিন্তু শান্তকণ্ঠে বললেন, যেদিন আপনি এই নগর তৈরি করেছিলেন সেদিন আপনার আত্মবিশ্বাস ছিল, সাধারণের ওপর মমতা ছিল। কিন্তু হয়ত এখন আপনার সেই বস্তু নেই। নীরো একদিন ক্ষমতায় অন্ধ হয়েছিল, আপনি ত' জানেন। ক্ষমতাকে হারাবার একটা ভয়ানক আতঙ্ক ছিল তার মনে, তার পায়ের তলাকার মাটি আলগা হয়েছিল।·· আর প্রশস্তি ? প্রশস্তি ত' কেবল স্তবগান নয়, তার মধ্যে আছে দুর্লভ স্নেহ। প্রশস্তিকে অগ্রাহ্য করা পৌরুষ হ'তে পারে, কিন্তু তা'তে গৌরব নেই। একদিন এই প্রশস্তিই ত' আপনাকে এই নগর সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছিল !

আপনি কী ক'রে জানলেন ?

ললিতের মুখে শুনেছি।—চঞ্চল হবেন না, বসুন। আমি প্রকাণ্ড নালিশ নিয়ে আপনাকে বলতে এসেছি, আপনি আগাগোড়া ভুল ক'রে এসেছেন। মানুষের জন্য আপনি কিছুই করেননি, করেছেন নিজেকে খুশী করাব জন্যে। আপনি ক্ষমতাবান, লোকে জেনেছে। দুর্বলের কাছে কেউ প্রত্যাশা করে না,—তারা দাবি জানাবে আপনার কাছে। কিন্তু আত্মপরতায় আপনি এতই অভ্যস্ত যে, অন্ধের মতো আঘাত করেছেন আপনি তাদের, যাদের নিরুপায় অসন্তোষ ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই।—এই ব'লে আনন্দময়ী বীরেশের দিকে তাকালেন।

বীরেশ বললে, কৌতুক বোধ করছি আপনার উপদেশে।

না।—আনন্দময়ী বললেন, কৌতুকের আড়ালে আপনি আত্মগোপন করেছেন, বীরেশবাবু।

তাঁর এই অশোভন উক্তিতে বীরেশ অধীর হয়ে উঠলো। কিন্তু গভীর রাত্রে একটি নারীর প্রতি অসম্মানসূচক কোনো উক্তি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কেবল বললে,—আমাকে উপদেশ দেওয়া ছাড়া আপনি আর কোন্ কাজে

এসেছেন, এখনো কিন্তু জানতে পারিনি। দয়া ক'রে আপনার বক্তব্য বলুন। আপনাকে আগে কখনো দেখিনি, অথচ প্রথম সাক্ষাতে এমন একটা অপ্রীতিকর আলাপ হবে আমি আশাও করিনি। আপনাকে সময় দিচ্ছি—আপনার বক্তব্য শেষ করুন, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

আনন্দময়ী সবিনয়ে বললেন, জানেন ত', মেয়েরা একটু অনধিকার চর্চা করতে ভালোবাসে? আপনি যদি দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেন আমি রাগ করবো না। আমি ত' জানি আপনার আত্মাভিমান ঐ চন্দনপাহাড়ের চেয়েও উঁচু!

মূঢ় দৃষ্টিতে বীরেশ তার দিকে চেয়ে রইলো।···অদ্ভুত নারী বটে! এ মেয়ে অনুশীলা নয়, নলিনী নয়,—এ মেয়ে হাসি মুখে আঘাত করে, সচেতন হয়ে বিদ্রূপ করে, গায়ে প'ড়ে উপদেশ শোনায়। রাত্রির অন্ধকারে একা ব'সে নির্ভয় ও নিঃসঙ্কোচভাবে পুরুষকে উত্যক্ত করতে এর কোনো কুণ্ঠা নেই, সম্মান খোয়াবার আশঙ্কা নেই।

বীরেশ বললে, দেখুন, আপনি ললিতের বিশেষ প্রিয়। এ রকম ভাবে অন্যের সঙ্গে আলাপ করাটা তার পক্ষে প্রীতিকর না হ'তে পারে। আমি বরং কাল সকালে ললিতের মুখ থেকে আপরার বক্তব্য শুনবো।

আনন্দময়ী বললেন, কিন্তু আমাকে তাড়াবার জন্যে আপনি অমন ব্যস্ত হবেন না। নিজের মর্যাদা রাখতে আমি জানি, আপনার কোনো আশঙ্কা নেই। আপনার পরিচয় বাইরে আমি পেয়েছি, দেখতে এসেছি আপনার জীবনযাত্রা। বাইরেটা রঙীন ক'রে রেখেছেন, কারণ ভেতরটা আপনার ফাঁপা।···বলুন ত', আপনি কোথাও কিছু পেলেন না কেন?

অস্থির কণ্ঠে বীরেশ ব'লে উঠলো, আপনি কেন এসব আলোচনা করতে চান?

করলে একটু খুশী হই। আপনি এত বড়, অথচ এমন নিরম্বু উপবাসী!—আনন্দময়ী হাসিমুখে বললেন, কোন্ বইতে পড়েছিলুম, জালের পিছনে রয়েছেন রাজা, আর সামনে সোনার একটা গোলকধাঁধা। রাজা আত্মঅহমিকা আর অজ্ঞানের জন্যে জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারেন না,—সম্পদ আর শক্তি তাঁর পক্ষে অভিশাপ। আপনিও তাই। বিপুল প্রভুত্ব আর সম্পদের বোঝা নিয়ে আপনি কী ক্লান্ত! অথচ অজ্ঞান আপনাকে পথ আগলে রেখেছে!

বীরেশ এবার নিজেই উঠে দাঁড়ালো,—দেখুন, তত্ত্বকথা শুনেছি ঢের—আপনি বরং···

বসুন।—ব'লে মৃদু উচ্চকণ্ঠে সহসা আনন্দময়ী তাকে তিরস্কার করলেন,—

স্ত্রীলোকের অর্থ সাহায্য যার সৌভাগ্যের মূল ভিত্তি, স্ত্রীলোকের প্রতি তার এই কৃত্রিম অবহেলা বেমানান।···বসুন আপনি।

স্তব্ধ ক্রোধে বীরেশের দাম্ভিক দুটো চোখ দপ্ দপ্ ক'রে উঠলো।

আনন্দময়ী উষ্ণতর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, শিক্ষিত আপনি, অথচ বিদ্যার বিন্দুমাত্র আপনার মধ্যে নেই। প্রতিভা আপনি, অথচ মনুষ্যত্বের আদিম মহিমা কা'কে বলে আপনি এতটুকু জানেন না। মানুষের দাম কষেছেন আপনি আইন আর শৃঙ্খলার মানদণ্ডে। দয়া, বিবেচনা, ভালোবাসা, মানবতা, এরা আপনার জীবনে অবমানিত। অতিশয় অহমিকায় নিজেকে অতি মূল্যবান, অতিরিক্ত বৃহৎ মনে ক'রে আপনি পাগলের মতো ঘুরেছেন। আপনার রঙীন ফানুসে একটি সরলা মেয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে আপনাকে দেবতা ব'লে ঠাওরালো, অথচ তারই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে নিয়ে আপনার পৌরুষের বড়াই!···তার ভালোবাসার প্রতিদান দেবার সাহস আপনার হ'লো না। একটি কুমারী মেয়ে তার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য নিয়ে আপনার কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল, সংসার রচনার সুখকল্পনা জলাঞ্জলি দিল,—সমাজনীতির ভয়ে আপনি পল্লীগুহায় এসে জন্তুর মতন আশ্রয় নিলেন।··পৌরুষ! পৌরুষের অভিনয় চলেছে আপনার জীবনে, এই অভিনয়ের তলায় রয়েছে মেয়েলি ভীরুতা, অকর্মণ্যের আত্মপ্রসাদ, কাপুরুষের আস্ফালন···

কম্পিত কণ্ঠে বীরেশ বললে,—তারপর?

বাইরে রাত্রির দিকে চেয়ে আনন্দময়ী বললেন, বক্তব্য প্রকাশ করতে আমি আসিনি, এসেছি আপনার বিচার করতে। আপনার ইতিহাস অনাচার, গ্লানি আর অন্যায়ে পূর্ণ। পৌরাণিক যুগে রাবণ ছিলেন ত্রিভুবনবিজয়ী। কিন্তু চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীর অপমান, উৎপীড়ন—এই ছিল তাঁর রীতি। মন্দোদরীর অত বড় মহিমা অন্ধের মত তিনি উপেক্ষা করেছিলেন।·· আর আপনি? আপনার বিবাহটা কী? একটা বীভৎস বর্বরতা ছাড়া আর কিছু? ··এক নাবালিকা সরল-প্রকৃতির মেয়েকে পায়ে থেঁৎলে এসেছিলেন···কেন জানেন? বাবার সঙ্গে আদর্শ-বিরোধ নয়, নলিনীর সঙ্গে প্রণয়াবেশের জন্যও নয়, চটকদার শিক্ষার অভাব ছিল সেই মেয়ের মধ্যে। আপনার নির্লজ্জ অযোগ্যতা তাকে দীর্ঘ আটদিন ধ'রে উৎপীড়ন করেছে, আপনার কাপুরুষোচিত অহমিকা সেই মেয়েকে ঘরের মধ্যে পুরে দিনের পর দিন অসম্মান করেছে।—কিন্তু রাঙাদিদির উপদেশ শুনে নতুন বরের পায়ের তলায় প'ড়ে বাঙালী মেয়ে হয়েও সেদিন সে কাঁদেনি, সেদিন থেকে পুরুষকে সে ঘৃণা করতে শিখলো—

সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বীরেশ জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, আপনি জানলেন কেমন ক'রে এত কথা···

লোকমুখে শুনিনি।—আনন্দময়ী সহসা তার অস্বাভাবিক হিংস্র দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে বললেন, সেই কাপুরুষের জীবনচরিত আমার এই সর্বাঙ্গের ওপরেই লেখা—এই বুকের ওপর দিয়েই তার লোহার রথের চাকা চ'লে গেছে।

উন্মাদের মত বীরেশ চেঁচিয়ে উঠলো, এর মানে কী? কে—কে আপনি? ···কে?

এর মানে আনন্দময়ী আমি নই, আমি সেই লীলাবতী। অনেকে বলে, আপনার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। আমি বলি, লীলাবতী মরেছে, অপমৃত্যু তার কপালে লেখা ছিল। আমি উঠে এসেছি তারই শ্মশান-চিতার ছাই মেখে।—আনন্দয়ী সহসা আত্মসংবরণ ক'রে বললেন থাক্, মেয়েমানুষ, তাই চোখে জল আসে। এবার আমার বক্তব্য বলি। শুনুন, কোনো অজুহাত আমি শুনবো না, এই নগরের অধিকার আমাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে,—এটা ভিক্ষা নয়, বিচারকের আদেশ।

বিদীর্ণ করুণ উর্ধ্বশ্বাসে বীরেশ ব'লে উঠলো, আচ্ছা,—আচ্ছা দেবো। এবার চিনতে পেরেছি আপনাকে—

আনন্দময়ী বললেন, কেবল তাই নয়, এর সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হবে জনসাধারণের নামে—

রুদ্ধস্বরে বীরেশ জবাব দিল, দেবো—

বেশ, এবার একটি ভিক্ষা চাইবো, আদেশ নয়। এ দুর্ভাগা দেশে সেই আইন নেই, যে আইনের অভাবে এ দেশের বহু মেয়ের জীবন ব্যর্থ। আমাকে সেই অধিকার লিখে দিতে হবে, যাতে আমি প্রকাশ করতে পারি,—আমি অবিবাহিত; আমার ওপর কোনো দাবি নেই।

হত্যার অপরাধীর মতো বীরেশ নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো।—বললে, তাও দেবো।

হ্যাঁ, এবার শেষ আদেশ—ব'লে আনন্দময়ী টেলিগ্রামটি হাতে তুলে নিলেন। বললেন, এর মধ্যে যে খবর আছে, আমি জানি; ডাকঘরের গোয়েন্দা আমাকে জানিয়েছে। পুরীতে অনুশীলার অন্তিম অবস্থা, অনিলবাবু আপনাকে যেতে লিখেছেন অবিলম্বে। এই মুহূর্তে আপনাকে পুরী রওনা হ'তে হবে। আর—হ্যাঁ, আর এক কথা। যে অন্যায়-অত্যাচার আপনি ক'রে গেলেন, এর শাস্তিস্বরূপ জীবনে আর আপনি কোনোদিন নবনগরে পা দেবেন না।

বীরেশ দ্রুতপদে টেব্‌ল ও আলমারি খুলে জিনিসপত্র ওলোট-পালট ক'রে

রাশীকৃত কাগজপত্র নেড়ে-চেড়ে কী যেন পকেটে পুরছে, এমন সময়ে লীলাবতী উঠে দাঁড়ালো। বললে, থাক্ কিছু নেবেন না সঙ্গে, টাকাকড়িতে আপনার দরকার নেই, সামান্য গাড়িভাড়া নিয়ে এখনই চ'লে যান—

প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত প্রত্যেকটি আদেশ পালন ক'রে উন্মত্তের ন্যায় বীরেশ দরজা দিয়ে পালাবে, এমন সময় ললিত এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে বললে, কোথা যান এত রাতে? বাইরে যে শত্রু থাকতে পারে, দাদা!

না, আর কোনো শত্রু নেই ললিত, পথ ছাড়ো।

লীলাবতী উচ্চ দীর্ঘ কণ্ঠে হেসে উঠে বললে, হুকুম পেয়েছি ললিতবাবু, সকাল হ'লেই ঘোষণা করবেন,—উৎসব ঠিকই হবে, বন্দীরাও ছাড়া পেয়ে যাবে।

দাদা!

একটি পলকের জন্যে বীরেশ থককে দাঁড়ালো। বললে, আর কোনো প্রশ্ন ক'রো না ভাই। আমাকে এখনই পুরী রওনা হ'তে হবে। একটা দলিল রেখে গেলুম তোমার নামে, আমার অনুপস্থিতিতে কলোনির ভার নেবে তুমি। আর, আর আমি খুব খুশীই হবো, যদি তোমরা দুজনে·· থাক্, আসতে হবে না সঙ্গে, আমি একাই যেতে পারবো।

স্তম্ভিত ও নির্বাক দুটি নরনারীকে একটা অত্যন্ত অভাবনীয় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে বীরেশ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তারপর দ্রুতপদে প্রহরীদের চোখের উপর দিয়ে প্রাঙ্গণ পার হয়ে পথে নেমে শেষরাত্রির অন্ধকারে সুচিত্রার দিকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অন্ধের মতো ছুটে চললো।

শত্রু, মিত্র, উৎপীড়িত, উপকৃত—সমস্ত সমাজ ও মানুষের দল, সমগ্র নবনগর যেন পিছন থেকে তাড়না ক'রে অপমান ও আঘাত ক'রে তাকে একখানা নৌকায় এনে চাপিয়ে দিল, এবং তারপর কাছি খুলে জলের স্রোতে নৌকাটা যখন ছিট্‌কে গেল, মনে হ'লো তার প্রিয় নবনগরের তট তাকে পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দিল।

রাত্রিশেষে দুই তট অন্ধকার, অন্ধ অশ্রুর ভিতর দিয়ে আকাশের তারকার দল দেখা গেল না। কেবল ধীরে ধীরে নবনগরের দীপমালা ঝাপসা হয়ে একসময়ে নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে প'ড়ে রইলো তার প্রকাণ্ড অধ্যবসায়, আর তপস্যার ইতিহাসের জটিল গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন ক'রে তার নৌকা চললো অকূল অথৈ অন্ধকারের দিকে ছুটে। সে ব্যর্থ হয়ে গেল!

তেরো

পুরীর বাড়িটি ছোট, সমুদ্রের পাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একান্ত একা। বাগানের বেড়ার ঠিক নিচে বিস্তৃত বালুবেলা, সেখানে সারা দিনমান ধ'রে অশ্রান্ত তরঙ্গরাশি বিপুল আস্ফালনে আছাড় খেয়ে পড়ছে,—তার ক্লান্তি নেই, অবধি নেই। স্বর্গদ্বারের পথ দিয়ে এ বাড়িটা কাছেই পড়ে।

বাড়িটা নোনাধরা। কাঠামোটা কঠিন বটে, কিন্তু সাগরের লবণাক্ত বাতাসে জানালা দরজা দেওয়াল, সমস্তই যেন জরার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সজীবতার অতিশয় অভাব। প্রাঙ্গণে এককালে একটি ফুলের বাগান ছিল বৈকি। এখনো কোনো লতা আর চারার ডালে শীর্ণকায় শুষ্ক চন্দ্রমল্লিকা আর গাঁদার চিহ্ন পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় বীজ ফেলা, মাটিও কোদলানো, কিন্তু অঙ্কুর আজো গজাতে পারলো না। সৌন্দর্য-বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মৃত্যুর গোপন নিঃশব্দ লেহনে তাদের প্রাণ শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আকণ্ঠ বেদনায় যেন ছোট বাড়িটার দম আটকে রয়েছে।

উপরের সিঁড়ি থেকে চাকর একটা যন্ত্রপাতির ব্যাগ নিয়ে নেমে এলো, এবং তারই পিছনে পিছনে ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে এলো অনিল। আগেকার সদানন্দ সেই হাকিম অনিল নয়, এ যেন কোন্ ক্লান্ত অবসন্ন এক জরাগ্রস্ত প্রৌঢ় অনিলবাবু। গায়ে আধময়লা গেঞ্জি, খালি পা। অনিল ডাকিল,—ডাক্তারবাবু!

তার কণ্ঠ অসংযত নয়, কিন্তু অকম্প কারুণ্যে এক প্রকার অস্বাভাবিক জড়তায় যেন ভগ্ন। ডাক্তারবাবু নতমস্তকে চ'লে যাচ্ছি[illegible] [illegible]র দাঁড়িয়ে বললেন,—হ্যাঁ, বলুন।

আজ অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে আপনার?

খুব চমৎকার। এমন সহজ সুন্দর জ্ঞান আর সূক্ষ্ম স্মৃতিশক্তি অল্প রোগীরই দেখেছি মিস্টার সেন। কিন্তু উত্তেজনা যেন না আসে মনে, এইটুকু লক্ষ্য রাখবেন। কথা বলতে দেবেন, বন্ধ রাখবেন না।—আচ্ছা ওঁর বিছানার পাশে তিন চার দিন থেকে যিনি ব'সে রয়েছেন, উনি কে?

অনিল বললে, উনি আমার আত্মীয়া-ভগ্নী, নলিনী। আমার স্ত্রী সম্প্রতি ওঁকে আনিয়েছেন।—মেয়েটি অতি চমৎকার নার্সিং করে।

অদ্ভুত সেবা দেখলুম—ডাক্তারবাবু বললেন, ওঁকে বলবেন, রোগীর মন ভুলিয়ে রাখতে। উনি জগন্নাথদেবের সেই উপকথাটি এমন সুন্দর ক'রে

শোনালেন,—সেই যে নীলমাধবের গল্প,···অতি সুন্দর। বুঝলেন মিস্টার সেন, সেবা জিনিসটা রোগীর আয়ু বাড়িয়ে দেয়।

অনিল একটু অস্বস্তিবোধ করলো, আমি জানতে চাইছি. ডাক্তারবাবু—রোগীর বর্তমান অবস্থা।

ডাক্তারবাবু ফিরে দাঁড়ালেন,—রোগীর অবস্থা? আপনি ত' উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মিস্টার সেন,—আপনি ত' জানেন, পৃথিবীর কোনো চিকিৎসা-শাস্ত্রেই এই মারাত্মক ব্যাধির কোনো সার্থক ওষুধ আজো আবিষ্কৃত হয়নি!

অনিল নিরুপায় অবসন্ন চোখে তাঁর দিকে তাকালো।

বাগানের প্রান্তে এসে গাড়িতে ওঠবার আগে ডাক্তারবাবু বললেন, আমার কি মনে হয় জানেন, পৃথিবীর কোন ভীষণতম বিষ—তা সে কোনো জানোয়ারেরই হোক অথবা বন্য ওষধিরই হোক,—একদিন হঠাৎ সেই বিষ থেকে উঠে আসবে মৃতসঞ্জীবনী। হয়ত মানুষের সমাজ সেই দুর্লভ বস্তুটি একদিন আবিষ্কার ক'রে এই ভয়াবহ শত্রুকে তাড়াতে পারবে।—হ্যাঁ, আর একটি কাজ আপনি করবেন। রোগী খুবই দুর্বল কিনা, আপনি একটু আড়ালে-আবডালে থাকবেন,—কেননা আপনাকে কাছে দেখলে একটা 'ইমোশনাল ওয়েভ' আসতে পারে।—এই ব'লে তিনি গাড়িতে উঠলেন।

ভীত কণ্ঠে অনিল প্রশ্ন করলো, তবে কি স্পেশাল ট্রেনে ওঁকে আজই কল্‌কাতায় নিয়ে যাবো?

গাড়ির ভিতর থেকে ম্লান হাসি হেসে ডাক্তার বললেন,—শান্ত হোন, মিস্টার সেন। রোগী এখন 'সিঙ্ক' করতে শুরু করেছে। নাড়াচাড়া আর চলবে না।

আপনি কি আসবেন আবার এখনি?

আমার আসা-যাওয়াটা বড় কথা নয়,—আপনি রোগীর সংবাদ রাখুন।—

ডাক্তারবাবু তাঁর নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে চ'লে গেলেন।

দোতলার দক্ষিণপূর্ব কোনের ঘরটির সমস্ত জানালাগুলি খোলা। ঘরের ভিতরে-বাইরে সাগরের ঝড়ো হাওয়া অবিশ্রান্ত হু হু ক'রে বইছে। একদিকে দেখা যায় তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিগন্তহীন নীলাভ জলরাশির উপরে পড়েছে সূর্যকরজাল, অন্যদিকে বহুদূর প্রসারী শস্যহীন প্রান্তর, তারই ভিতর দিয়ে কনার্কের আঁকাবাঁকা পথরেখা। ওদিকে গগনচুম্বী জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া। মাঝে মাঝে টিয়া আর চন্দনার কলকণ্ঠ দূর আকাশে এক একবার আওয়াজ দিয়ে মিলিয়ে চলেছে। ঘাটে বাঁধা জেলেদের নৌকা, আশে পাশে উলঙ্গ নুলিয়া বালকের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। আজকাল যাত্রীর সমাগম কম, বেলাভূমিতে এখন আর তেমন জনতা চোখে পড়ে না।

ঘরের মধ্যে সামান্য পরিচ্ছন্ন আসবাব সজ্জা। কাপড় চোপড় রাখলে বাতাসে এলোমেলো হয়ে যায়,—সেজন্য রোগীর প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়া আর বিশেষ কিছু এ ঘরে নেই। একপাশে টেব্‌লের ওপর একরাশ ফুলের গোছা একটি পাত্রে সব সময় মজুত থাকে। এদিকে নানাবিধ ঔষধপত্র আর আহারের সরঞ্জাম। একটি পাত্রে কিছু ফল।

বাতাসের একটা ঝলকে অনুশীলার যোগনিদ্রার চমক ভাঙলো। নিমীলিত চোখ তুলে মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, নলিনী!

নলিনী তার জরামলিন বিশীর্ণ রোগাতুর মুখের উপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললে, চুপ কর ভাই,—জানি তুই কী বলবি। ওসব কথা এখন ভাবতে নেই, বোন।

অনুশীলা চুপ ক'রে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বললে, আমাদের কলেজের কমন্‌রুমে একটা ছবি ছিল, মনে পড়ে।—নীলকণ্ঠনাথের জটারাশি। ওই সমুদ্র দেখলে আজো সেটা মনে পড়ে। উপরে ঢেউ,—কী বিক্ষোভ; নিচেটা শান্ত, যেন তপস্বী প্রতিভা।

এখন কেমন আছিস রে?

খুব ভালো। আশা নেই কোথাও কিছু, তাই এত সুন্দর।—অনুশীলা ক্লান্ত মন্থর কণ্ঠে বললে, কেবল চেয়ে থাকা রোদের দিকে, কেবল ঢেউ গোনা,—মধুর লাগছে রে। বল্ ত' রে নলিনী, সেই কবিতাটা?

নলিনী তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে বললে, আমি মাস্টারি ক'রে খাই, কবিতা কি মনে থাকে রে?

বল্ ভাই লক্ষ্মী সোনা—একবারটি বল্?—

নলিনী অগত্যা মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করতে বাধ্য হ'লো—

"ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা,
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল সেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ অঙ্গন,
উষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ! বন্ধ ক'রো না পাখা।"

শীর্ণ দুই হাত অতি কষ্টে তুলে যুক্তকরে অনুশীলা চোখ বুজে একটি প্রণাম জানালো। চোখের কোণ বেয়ে নামলো অশ্রু।

পিছন দিকের দরজা দিয়ে অনিল একবার এসে দাঁড়ালো নিঃশব্দ অলক্ষ্যে। মুখ তুলে নলিনী কী যেন ইঙ্গিত ক'রে তার দাদাকে কী জানালো,—অনিল আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল নতমুখে। ওধারের ঘরগুলিতে দিদি, একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ও অনিলের জনৈক মাসতুতো ভাই এসে রয়েছেন কয়েকদিন ধ'রে সকালে তাঁরা গিয়েছিলেন মন্দিরে, এতক্ষণে ফিরলেন। এ-ঘরে তাঁরা কেউই বড় একটা আসেন না, ব্যাধির ছোঁয়াচ মারাত্মক,—সুতরাং মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে সজল চক্ষে সান্ত্বনা দিয়ে যান! নলিনী ভয় রাখে না মনে,—সে নিঃসঙ্কোচে ব'সে থাকে তার প্রিয় বান্ধবীর কাছে,—ব'সে থাকে বীরেশের অতন্দ্র প্রতিনিধির মতো।

আধঘণ্টা পরে নলিনী রোগীকে ঔষধ ও আহার দিল। এইটুকুতেই যেন অনুশীলার আপ্রাণ পরিশ্রম হয়েছে। তার চোখে-মুখে পড়েছে গভীর কালো ছায়া। উদ্বিগ্ন দৃষ্টি এদিক-ওদিক ফিরিয়ে হাঁপিয়ে সে বললে, আসেনি?···

এইবার আসবে, ভাই।

আসবে, আসবে, শুধু শুনছি,—আসবে,—কিন্তু 'তার' করা হয়নি, আসবে কেমন ক'রে, নলিনী?

নলিনী মাথার দিব্য দিয়ে তাকে বলেছে, যথাসময়ে 'তার' করা হয়েছে, অবশ্যই সে আসবে। কিন্তু অধীর প্রত্যাশা অনুশীলা আর যেন সামলাতে পারছিল না। পুনরায় ক্লান্ত-শান্ত হাসিমুখে সে বললে, চিনতে পারবে না আমাকে, এইটুকুই সান্ত্বনা।···আচ্ছা, নলিনী?

কেন রে?

না দেখা পর্যন্ত কোনোমতে বাঁচা যায় না?

ওকি কথা ভাই? এমন কী হয়েছে তোর যে, বাঁচবি নে?

অনুশীলা বললে, কোথাও না বাঁচি, বাঁচবো তার মনে। আঃ কী যেন হয়ে গেল!···সে আবার চোখ বুজলো!

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় অস্পষ্টস্বরে বললে, ভুল আমি করিনি, কেন জানিস? কেউ নিন্দে করলো না,···কোথাও কলঙ্কের দাগ দেখিনি,—এই ত' আমার সকলের বড় সান্ত্বনা! আচ্ছা নলিনী, বলতে পারিস এর উত্তর মিলবে কতদিনে?···এ কি অন্যায়?

হেঁট হয়ে নলিনী বললে, কোনো অন্যায় ত' তুই করিসনি।

হয়ত করেছি, হয়ত করিনি। কিন্তু মেয়েমানুষের জীবনে এ আবার কী? ···এ কী কথা ভাবলুম, যার মানে খুঁজে পেলুম না?···এ কী কাজ করলুম, যার কোনো সুফল নেই?

আজ এসব কথা কেন ভাবছিস, অনু ?

ভাববার আর সময় নেই, তাই ভেবে নিচ্ছি, ভাই।...কী অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখছি ঐ সাগরের বুকের ওপর।...কী নীল, কী নিবিড়, বল্ ত'? আলো আর ছায়ার বিরাট মূর্তি,—আচ্ছা হরিহরের ছবি মনে পড়ে রে?...আমার দুই কল্পনা এক হয়ে মিশেছে ওই মূর্তিতে, নলিনী!...আমার জীবন-মরণ একাকার হয়ে গেল ওই সাগরের বিরাট বিক্ষুব্ধ প্রতিভায়।...কী অপরূপ দৃশ্য দেখছি শুয়ে শুয়ে সারাদিন।

বেশ, এবার তবে একটু ঘুমো, দেখি।

হ্যাঁ, অনেক বড় ঘুম ঘুমোবো এবার!...নলিনী, আমি অজ্ঞান নই রে।... চেয়ে ছাখ্, কী নীল চারিদিকে!...শাদা পায়রা উড়িয়ে দিলুম আকাশে,... তারা ছুটলো দূর থেকে সংবাদ নিয়ে। আশা আর কোথাও নেই, তাই ত' এত আনন্দ, তাই আজ এমন নিবিড় স্বস্তি।...নলিনী, আর ঘুমোতে বলিস নে ভাই।...কই আসেনি এখনও রে ?

নলিনী কণ্টকিত হয়ে বললে, এই এলো ব'লে।

এলে তুই আমাকে একটু ধরিস ভাই, একটা ভয়ানক কাঁপুনি ধরবে কিনা, সামলাতে পারবো না।...ততক্ষণে আমার চোখ ঝাপ্সা হবে না ত'?—কিছু যেন ছোঁয় না ভাই এ ঘরে,—তবু, তবু আর একটু আছে আসতে বলিস। একটু থেকে অনুশীলা পুনরায় বললে, আচ্ছা নলিনী—এ বাড়িতে আমার কথা কেউ শোনে না ত'?...কেউ কিছু মনে করে না ?

কিন্তু উত্তর না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে ধীরে ধীরে সে চোখ বুজলো। নলিনী তার চোখের কোণের অশ্রু মুছিয়ে দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে রোগীর অবস্থার বৈলক্ষণ্য দেখে অনিল আবার ডাক্তারকে খবর দিতে বাধ্য হ'লো।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারসাহেব আবার এসে হাজির হলেন। তাঁর হাতে নতুন আর কোনো চিকিৎসা ছিল না। তিনি অক্সিজেন প্রয়োগ করলেন। অচেতন স্ত্রীর কাছে অনিল ব'সে রইলো। নলিনী একবার উঠে বাইরে গেল।

বারান্দায় ঝুঁকে ব্যাকুল হয়ে সে তাকালো পথের দিকে। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে অবারিত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র থৈ থৈ করছে দিগন্তরেখা অবধি। কান্না এলো তার চোখে। রোগীকে কথা দিয়েছিল সে, বীরেশকে আনিয়ে দেবে একবার। কিন্তু যথাসময়ে সংবাদ হয়ত গিয়ে পৌঁছয়নি। বহুদূর থেকে তাকে আসতে হবে; কলকাতা হয়ে না এলে উপায় নেই। হয়ত অনিলের শেষকালকার উপেক্ষা সে ভোলেনি, আসতে সে রাজী নয়। পাছে নিজে না এসে ললিতকে পাঠায়, এই

ভয়ে নলিনী কণ্টকিত হয়ে রইলো। কিন্তু আজ তার নিজের সম্মানও যেন অনেকটা বিপন্ন ব'লে মনে হ'লো। একজনের অন্তিমশয্যার শেষ আবেদন সে যদি রক্ষা করতে না পারে, তবে তারও মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। কাল রাত্রে অনুশীলা বলেছিল,—যদি না আসে তবে বলিস ভাই, প্রতিভার পায়ের কাছে এই শেষ প্রণাম রেখে গেলুম। জানি, ভালো সে আমাকে বাসতে পারেনি, আমি অন্যের। কিন্তু তাকে ভাই, দুঃখ রেখে যাইনি তার জন্যে, আমি তার সেবায় লাগতে পেরেছিলুম, এই সৌভাগ্যের পাথেয় নিয়েই চললুম।

নলিনী বলেছিল, সে কি এত বড় শ্রদ্ধার যোগ্য, অনুশীলা?

শ্রদ্ধার চেয়েও সে বড়, নলিনী। সে যে কত বড়, আমার মতন মন না পেলে তোরা বুঝবি নে।···এত নির্দয়, এত উদাসীন, তাই এতখানি শ্রদ্ধার যোগ্য।···যদি তার আসার আগে মরি, তবে ওই সমুদ্রের ধারে আমার চিতা রচনা করিস,—ওই বিরাটের পায়ের কাছে আমি জ্বলে জ্বলে ছাই হ'তে চাই। আর—আর বলিস তাকে, আমার শিয়রে ওই চন্দ্রমল্লিকা আর রজনীগন্ধার গোছা,—ওই আমার শেষ দান সে যেন নিয়ে যায়। ওই ফুল তার বড় প্রিয়। ···আর কিছু দেবার আমার নেই।

তুই ত' অনেক দিয়েছিস তাকে, অনু?

কিছু না, কিছু না,—তাতে ছিল স্বার্থের দাগ আর প্রবৃত্তির কালিমাখানো, —সে-দাগ তাকে মলিন করেছে। ঘুষ দিয়ে তাঁকে বাধতে চেয়েছিলুম, তাই সে-সবই ব্যর্থ। পুরুষ খুশী হয়েছিল অর্থ পেয়ে, কিন্তু দেবতা খুশী হয়নি ওই সামান্য নৈবেদ্যে। আজ সার্থক নৈবেদ্য সাজাবার সময় হ'লো, নলিনী,—ওই সমুদ্রের চড়ায়। ওইখানে, ওই বালুরাশির মধ্যে মিলিয়ে থাকুক আমার অস্থির চূর্ণ অবশেষ,—ওর ওপর যদি সেই নির্দয় দেবতার পায়ের দাগ পড়ে, তবে আমি ধন্য,··যদি না পড়ে তবে তারই প্রতিভার মতো যা বিশাল, সেই সাগর-তরঙ্গের ঢেউ আমাকে ধুয়ে নিয়ে যাক্ তার গর্ভে।··জীবনে যার সার্থকতা হ'লো না, মরণে তার এই সান্ত্বনা, মন্দ কী?

নলিনী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো। এখানে তার নিজের কোনো বক্তব্য নেই, সমালোচনা নেই, এ বস্তু ভালো কিংবা মন্দ—এও তার বিচার্য নয়। বাল্যকাল থেকে নিজে সে নৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ,—সুতরাং তার কাছে এই ঘটনা আগাগোড়াই অভিনব। কেবল তার কানে বাজতে লাগলো অনুশীলার অপরূপ উক্তিটি,—নলিনী, আমার দুই কল্পনা এক হয়ে মিশেছে ওই হরিহরের মূর্তিতে,—ওই আলো আর ছায়ার রহস্যে। মানুষের কাছে আমার ভালোবাসা, দেবতার পায়ে আমার নৈবেদ্য। প্রতিভার পাদ্য-অর্ঘ্যই আমার জীবন!

অক্সিজেন্ প্রয়োগ ক'রে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি আর রোগীকে রাখা গেল না, এবং তার পরে সংসারে নিত্য প্রতি পলকে যা ঘটে তাই ঘটলো। অনুশীলার হৃদ্‌স্পন্দন চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। বাড়িময় এক ঝলক কান্নার আওয়াজ উঠে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে এলো।

সাগরের উপরে সন্ধ্যার ছায়া নামছে। রক্তবর্ণ সূর্য নেমেছেন দিগন্তরেখায়। চিতার সর্বশেষ অগ্নি-আভা ওরই মতো রাঙা। হু হু শব্দে বাতাস সেই চিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুৎকার দিয়ে অনেকক্ষণ অবধি সেই শিখাকে জাগিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই অঙ্গারও একসময়ে মলিন ও বিবর্ণ হয়ে এলো।

বালুচড়ার একধারে মেয়েরা ব'সে হা-হুতাশ করছিলেন। ওধারে পাড়ের কাছে বালুর উপর হেলান দিয়ে পরিশ্রান্ত অনিল একা দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের সর্পিল ফেনা তার পায়ের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল।

বীরেশ যে ঊর্ধ্বশ্বাসে কখন কোন্ সময় এসে পৌছেছে এবং কখনই বা অনিলের পায়ের কাছে ব'সে কথাবার্তা শেষ ক'রে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, নলিনী অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্য করেনি। কিন্তু একসময় মুখ ফিরিয়ে বীরেশকে দেখে সে সচকিত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গিয়ে উভয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। বীরেশ মুখ তুললো, আচ্ছন্নের মতো প্রশ্ন করলো, তুমি এলে কবে ?

এই পাঁচ ছ' দিন। কিন্তু তুমি কি কিছুতেই আসতে পারলে না সকালের দিকে ?—বলতে বলতে নলিনী কেঁদে ফেললে।

অদূরে চিতাভস্মের অবশেষ-চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে বীরেশ বললে, টেলিগ্রামটা হাতে পড়ে শেষরাত্রে, তখনই বেরিয়ে আসি, কিন্তু কলকাতায় পৌছবার আগেই পুরীর গাড়ি ছেড়ে দেয়। তারপর দুখানা প্যাসেঞ্জারে অদলবদল ক'রে আসতে হ'লো।—সময় থাকতে পৌছতে পারলুম না, এ আমারই দুর্ভাগ্য।

ক্লান্তকণ্ঠে অনিল বললে, কেঁদো না, নলিনী ভাই।

নলিনী সহসা আঁচলে মুখ ঢেকে সেখান থেকে চ'লে গেল।

কর্তব্য তখনো কিছু-কিছু বাকি। অবসাদ আর জড়তা কাটিয়ে একসময়ে অনুশীলার শেষকৃত্য সমাপ্ত ক'রে অনিল বাড়ি ফিরলো। তারপর ঘরে গিয়ে অন্ধকারে তার বিছানায় শুয়ে প'ড়ে রইলো। শোকাচ্ছন্ন পরিবারে আর কারো সাড়াশব্দ ছিল না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে নলিনী এসে ঘরে ঢুকে ডাকলো,—দাদা জেগে আছেন ?

কী ভাই ?—অনিল শুয়ে শুয়েই মাথা তুললো।

অসুখ নেই, আমারও দরকার ফুরিয়েছে, এবার আমি চললুম, দাদা। আমার গাড়ির সময় হয়েছে।

এত রাত্রেই যাবে, নলিনী?

হ্যাঁ, এখুনি যাবো।···মধ্যে মাঝে আপনার চিঠিপত্র পাবো ত' দাদা?

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত। তারপর অতি ক্লিষ্টকণ্ঠে অনিল জবাব দিল, পাবে ভাই।

অনিলের পায়ের ধুলো নিয়ে নলিনী মুখে আঁচল চেপে বেরিয়ে চ'লে গেল। সত্য বলতে কি, এই শ্বাসরোধী আবহাওয়ায় সে অধীর হয়ে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি নিচে এসে বাগান পেরিয়ে সে পথে নেমে চললো। ছোট সুটকেসটি তার সম্বল,—সঙ্গে আর কিছু নেই। সেইটি কেবল নিল হাতে ঝুলিয়ে।

বালুর চড়ায় বীরেশ পরিশ্রান্ত ভাবে শুয়েছিল! আকাশে তারকার লিখনে সে যেন পাঠ করছিল তার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবিপর্যয়ের কাহিনী। অদূরে চিতার চিহ্ন অবধি সমুদ্রের সফেন তরঙ্গে ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। ওখানকার বালুর গর্ভে অনুশীলার অস্থিচূর্ণাবশেষ আছে কি না, জানবার উৎসাহ আর নেই।

শুক্লা জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের চারিদিকে তরঙ্গে তরঙ্গে লক্ষ মণিমাণিক্য দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, বালুর সুবিস্তৃত প্রান্তর চন্দ্রালোকে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

নলিনী সুটকেসটি হাতে নিয়ে এসে বীরেশের কাছে দাঁড়ালো। তারপর গায়ের চাদরের ভিতর থেকে তিনদিনের বাসী চন্দ্রমল্লিকা আর রজনীগন্ধার গোছা বা'র ক'রে বললে, হাত পেতে তুমি নাও, বীরেশ,—এই তোমার পায়ে তার শেষ প্রণামের অর্ঘ্য।

বীরেশ হাত বাড়িয়ে নিল ফুলের গোছা।

নলিনী বললে, শেষকালে সে খুব ব্যথা পেয়ে গেছে, তুমি আসতে পারোনি ব'লে। হতভাগী বড় কাতর হয়ে অপেক্ষা করেছিল। পায়ের ধুলোর আশায় কী যুদ্ধ করেছে মৃত্যুর সঙ্গে, সে আমি ব'সে ব'সে দেখলুম!

প্রকাণ্ড তরঙ্গ বিশাল উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লো বালুচড়ার উপরে। তারপর বিপুল নিশ্বাস ফেলে আবার মিলিয়ে গেল।

বীরেশ মুখ তুলে তাকালো অর্থহীন দৃষ্টিতে।

সুটকেশটা রেখে নলিনী হেঁট হয়ে সেই জ্যোৎস্নালোকে বীরেশের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, তুমি কোন্‌দিকে যাবে আমি জানি না, কিন্তু আমার আর সময় নেই,—এই গাড়িতেই আমাকে ফিরতে হবে।

এতক্ষণ পরে বীরেশ যেন আচ্ছন্নের মতো কথা বললে,—কোথা যাবে তুমি?

যাবো চাকরিস্থলে। আর আমার ছুটি নেই।—তুমি কি থাকবে এখন পুরীতে?

না।—ব'লে বীরেশ উঠে বসলো। বললে, এখনি আমি যাবো, কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যে যেতে হবে নলিনী।

তোমার সঙ্গে? কোথায় যাবো?

বীরেশের গলাটা ধ'রে এসেছিল। গাঢ়স্বরে সে বললে, আমার সঙ্গে যাবে তুমি সেই গ্রামে, যে-গ্রামের মাটিতে ওই অভাগী তার প্রাণের সমস্ত মমতা ছড়িয়ে রেখে এসেছে। সেই দুর্গম দরিদ্র গ্রাম, সেই বাংলো, সেই তাঁতীপাড়ার কুঁড়ে ঘর,—সেখানে আমরা আবার ফিরে যাবো, আবার নতুন ক'রে তুলে নেবো অনুশীলার অসমাপ্ত কাজের ভার! সেই সংগ্রাম, কলহ, মনোমালিন্য, দারিদ্র্য আর বেদনা—আবার সব তুলে নেবো! আবার নগর বসাবো সেই অন্ধকার পল্লীপথে—কিন্তু এবার তুমি থাকবে আমার সঙ্গে, নলিনী।

নলিনী বললে, তোমার কথায় কোনোদিন আমি প্রতিবাদ করিনি,—কিন্তু আজ করবো। যা সহজ নয়, স্বচ্ছন্দ নয়, তা আমি পারবো না, বীরেশ। তোমার স্ত্রী জীবিত, আমি তোমার সঙ্গিনী হব কেমন ক'রে? বাঙ্গালী মেয়ের দুর্ভাগ্য নানাপ্রকারে আমি দেখেছি। আমার হাতে তাদের পীড়ন আমার সইবে না।

বীরেশ বললে, কিন্তু সেই লীলাবতীর মৃত্যু হয়েছে, নলিনী।—হ্যাঁ, মৃত্যু বৈ কি! তবে তার নবজন্মও আমি দেখে এলুম। দেখে আনন্দিত।

বীরেশ বলতে লাগলো, আমার স্ত্রী ব'লে যাকে তোমরা জানতে সে নেই; আমার কীর্তি বলে যে নবনগরকে তোমরা জানতে, তাও আর নেই। আমার অহঙ্কার, আমার ক্ষমতা, আমার প্রভুত্ব—তারাও নিশ্চিহ্ন। এর কারণ কি, জানো নলিনী?

নলিনী তার চিন্তিত মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলো। বীরেশ বললে, এর কারণ তুমি।...কাজ করেছি কম নয়, কিন্তু তার মধ্যে না ছিল যোগসূত্র, না ছিল ঐক্য। প্রতিদিন বুঝতে পারতুম, তোমার কাছে ছিল তার মূলমন্ত্র, তুমি বাঁচাতে পারতে আমার সেই উন্নতির ধারাবাহিকতা।

নলিনী বললে, আমার অধিকার ছিল কোথায়, বীরেশ?

ছিল, খুঁজে পাওনি। আজ সেই সহজ স্বচ্ছন্দ অধিকার হাতে ক'রে তোমাকে তুলে দিতে চাই। জানি আমি, জানি তোমার অভিমান আর

বৈরাগ্যের মূল কারণ, জানি তোমার পথে-পথে বেড়ানোর প্রকৃত রহস্য ;—কিন্তু আজ সকল প্রশ্ন আর সংশয়ের সমাপ্তি ঘটুক, নলিনী। একথা যেন আজ থেকে নির্বিকার চিত্তে জানতে পারি, স্ত্রীর চেয়েও তোমার বড় পরিচয় আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত, তুমি আমার সহধর্মিণী, জীবনসঙ্গিনী।

কিন্তু···নলিনীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো।

উৎসুক দৃষ্টি তুলে বীরেশ বললে, সংশয় রেখো না মনে। আমি আশাবাদী, নব নব জন্মে বিশ্বাসী। চলো, ফিরে যাই আবার তোমার-আমার সেই অতীত জীবনে·· সেই প্রথম তারুণ্যে রক্তরাঙা স্বপ্ন রচনায় ; মাঝখানের এই বিক্ষোভের ইতিহাসটা মুছে যাক্, নলিনী। জানি, সেই বয়সটা পেরিয়ে এসেছি, আজ কেবল মাত্র হৃদয়াবেগের প্লাবনে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না, তুমি এসে দাঁড়িয়েছ যৌবনকালের প্রান্তসীমায়। সুতরাং রঙেরও নেশা নয়, রসেরও পিপাসা নয়, আজ কেবল জীবনকে অগ্রগতিশীল করার জন্য প্রখর বিচারবুদ্ধিকেই প্রকাশ করতে হবে।

নলিনী বললে, কিন্তু নতুন ক'রে আবার কি তুমি সব আরম্ভ করতে পারবে ?

চন্দ্রালোকে সমুদ্রের অস্পষ্ট দিগন্তের দিকে চেয়ে বীরেশ বললে, অহঙ্কারের ফাঁদে আর পা বাড়াবো না। আমি নয়, তুমিও নয়, আর পাঁচ জনে। তারা সবাই এসে জড়ো হবে, সকলের হাতে সৃষ্টি, সবাই নেবে বিশ্বরচনার ভার। তাদের মাঝখানে থাকতে চাই আমরা অখ্যাত হয়ে, নগণ্য হয়ে—সেখানে ব্যক্তিত্ব, আত্মাভিমান, সেখানে প্রভুত্ব আর একনায়কত্ব কিছু থাকবে না। থাকবো পাতার কুটীরে, তাঁতীমার কুঁড়েঘরের পাশে,—সেই হবে আমাদের তীর্থ। এক একখানি পাথর আনবো কুড়িয়ে, সবাই মিলে পাথরের পর পাথর সাজিয়ে গ'ড়ে তুলবো জনমন্দির।

বালুবেলায় যতদূর দৃষ্টি চলে জনমানব কোথাও নেই। কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে নলিনী বীরেশের হাত ধ'রে বললে, ওঠো।

বীরেশ উঠে দাঁড়ালো। নলিনী তাকে জড়িয়ে ধ'রে বুকের মধ্যে মাথা রেখে বললে, এ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়ই আমার মনে ওঠেনি, তাই ঘুরেছিলুম পথে পথে। তোমার বনস্পতির মধ্যে এতকাল পরে বাসা পেলুম, এই ছিল আমার সাধনা।

বীরেশ তাকে নিবিড় আলিঙ্গন ক'রে সজল কণ্ঠে কেবল বললে, আমিও এতকাল পরে সার্থক হলুম নলিনী।

দেবতাত্মা হিমালয়

(ভ্রমণকাহিনী)

[প্রথম খণ্ড]

(রচনাকাল ১৯৫৪-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)

স্বর্গতা জননী
বিশ্বেশ্বরী দেবী
স্মরণে—

—সুচীপত্র—

ব্রহ্মপুরা গাড়োয়াল	...	১	দ্রোণভূমি দেরাদুন	...	৭
উত্তর পশ্চিম সীমান্তের হিমালয়		২	হিমাচল শিমলা ও কিন্নরক্ষেত্র		৮
মায়াপুরী হরিদ্বার	...	৩	পার্বত্য আসাম	..	৯
গুহাতীর্থ অমরনাথ	...	৪	কালিম্পঙ	...	১০
পাঞ্জাবের হিমালয়	...	৫	বৌদ্ধ সিকিম	...	১১
নেপাল ও পশুপতিনাথ	...	৬	দার্জিলিং	...	১২

প্রায় দেড় হাজার বছর হ'তে চললো—

সিংহাসন থেকে নেমে এসে সম্রাট হর্ষবর্ধন অভিবাদন করলেন পরিব্রাজক হুয়েন সাংকে,—মহাত্মন্, বিদায় নেবার আগে এই অখণ্ড সমগ্র মহা-ভারত আপনার আশীর্বাদ কামনা করে।

প্রণত বিনয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ হুয়েন সাং জবাব দিলেন, এই যোগাসীন ধ্যান-নিমীলিত প্রাচীন ভারতের আশীর্বাদ আমিও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, রাজন্। ভূ-স্বর্গময় এই ভারত। হিমালয়ের এই ব্রহ্মপুরায় দাঁড়িয়ে বারম্বার আমি সেই ভূ-স্বর্গলোক দর্শন করেছি।

ভারতের প্রাচীন আর্যসভ্যতার আদি মন্ত্র লাভ করেছিল এই ব্রহ্মপুরা। হাজার হাজার বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই ব্রহ্মপুরার পথ দিয়ে গেছে মুনি ঋষি যোগী সন্ন্যাসী পরিব্রাজক আর পর্যটক। হিমালয়ের এই দুস্তর ও দুরারোহ পর্বতের প্রান্তে কোনো এক নির্ঝরিণী-তীরস্থিত তপোবনে ব'সে মহামুনি বেদব্যাস রচনা করেছিলেন শিবপুরাণ তথা কেদারখণ্ড। অন্যান্য পুরাণেও এই ব্রহ্মপুরাকে বলা হয়েছে ভূস্বর্গ। মহাকবি কালিদাস এই ব্রহ্মপুরাকে বলেছিলেন স্বপ্নপুরী। সমগ্র মহাভারতের বিরাট কাহিনী এই ব্রহ্মপুরায় ব'সে লেখা হয়েছিল। বৈদিক ভারতের কল্পে, সনাতন ভারতের পর্বে, বৌদ্ধভারতের কালে, ঐতিহাসিক ভারতের যুগে যুগে,—মৌর্য সাম্রাজ্যের অশোক, তারপর সমুদ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতির রাজত্বকাল—ইতিহাসের সেই গৌরব-মহিমার কালে ব্রহ্মপুরা ছিল ঋষিগণের তপস্যালোক, আনন্দ ও শান্তির লীলাক্ষেত্র। এই পথ ধ'রে পঞ্চপাণ্ডব একদা ব্রহ্মলোকের দিকে যাত্রা করেছিলেন, সেই কারণে এই মহাভারতীয় ভূখণ্ডের আদি নাম হোলো ব্রহ্মপুরা। এই ব্রহ্মপুরার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে গোমুখী-নিঃস্রাবিত জননী জাহ্নবী, গেছে দেবলোক-প্রবাহিনী অলকানন্দা, গেছে ব্রহ্মলোকবিধৌতা মন্দাকিনী। এখানকার সূর্যকরোজ্জ্বল তুষার-কিরীট হিমালয়ের প্রথম স্তর হোলো ব্রহ্মলোক—পৃথিবীর থেকে অনেক দূর; তা'র নীচে যেখানে শিবলিঙ্গ পর্বতমালার দুরতিক্রম্য স্তর, সেটি দেবলোক, দেবগণের বিচরণ-ক্ষেত্র। ভাগীরথী যেখানে উপলাহতা উর্মিমুখরা হয়ে ঋষিকুলের আশ্রমসীমান্তে বয়ে চলেছেন—সেই স্তরটিকে চিরদিন ঋষিরা ব'লে এসেছেন তপোলোক। তা'র নীচে যেখানে দিগন্তপরিব্যাপ্ত হিমালয়ের পাদমূল, যে-স্তর হলো অরণ্যময়—যেখানে গঙ্গা প্রসারিত—তার নাম হোলো মর্ত্যলোক, সেখানে নর-বানর, পশুপক্ষী কীট-

পতঙ্গর অবারিত লীলাভূমি। সেই ভূভাগে নেমে গঙ্গা উপত্যকার নাম হয়েছে গঙ্গাবতরণ; গঙ্গা সেখানে জীবলোকে অবতরণ করেছেন। তিনি নেমেছেন আর্যাবর্ত প্রতিপালনে। ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে!

আমার প্রথম তারুণ্য তা'র চোখে মেলেছিল ব্রহ্মপুরার ওই শিবলিঙ্গ পর্বতমালার নীচে গঙ্গাবতরণের প্রান্তে। বত্রিশ বছর আগে সেদিন প্রথম হিমালয়ের পাদমূল স্পর্শ করি। কিন্তু সেই হাজার-হাজার বছর আগেকার ব্রহ্মপুরা এখন আর নেই, আছে তা'র স্থলবর্তী একটি নাম—গাড়োয়াল। মাত্র চারশো বছর আগে রাজা অজয়পাল সমগ্র ব্রহ্মপুরার বাহান্নটি দুর্গ একত্র ক'রে এর নামকরণ করেছিলেন গড়বাল। অর্থাৎ দুর্গপ্রধান। সেদিন চোখ মেলেছিলুম, কিন্তু কিছু দেখিনি। আবিষ্কার করেছিলুম নতুনকে, বিচিত্রকে, ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিমাকে,—তার দৃষ্টি ছিল নিমেষ-নিহত, একাগ্র। শুধু দেখে এসেছিলুম তা'র নীল-ধারা,—এক রহস্য থেকে ভিন্ন রহস্যলোকের ভিতর দিয়ে কোন্ পর্বতমালার তলা দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সেদিন আমার মন বাঙ্ময় ছিল না; তাই আস্বাদ আর উপলব্ধির পথ দিয়ে ক্ষুধাতুর প্রাণ কেবল আপন খাদ্য সংগ্রহ ক'রে ফিরেছিল। তবু তা'র মধ্যেও উপলব্ধি অপেক্ষা আবিষ্কারের চেষ্টা ছিল প্রধান।

তারপর কতবার গেছি ওই ব্রহ্মপুরার প্রান্তসীমায়, ওই গাড়োয়ালের পাহাড়তলীর নীচে নীচে, নীলধারার তীরে তীরে, ওর বনে-বনান্তরে, গিরি-গুহালোকে, ওর মনোরম বসন্তশোভার ভিতর দিয়ে, ওর উন্মাদিনী নির্ঝরিণীর প্রস্তরসঙ্কুল তটে তটে। কত মধ্যাহ্নের একান্ত ভাবনা, কত প্রভাতের নিঃসঙ্গ নির্জনতা—আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্বাক্ষর রেখে গেছে ওর ওই সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে, এখানে ওখানে, মন্দিরে, তপোবনে, উপত্যকায়, আর গভীর গহ্বরে। আজ তাদের ইতিহাস আর মনে নেই। কিন্তু ওখানে আমি বার বার দেখতে চেয়েছি যা দৃষ্টিগোচর হয় না, ভাবতে চেয়েছি যা ভাবনাতীত, জানতে চেয়েছি যা জ্ঞানের সীমানার মধ্যে নেই। বিজন ভীষণ গিরিগহ্বরের নীচে শিলাতলে গিয়ে নিঃসঙ্গ বসেছি, দেখেছি কতবার বসন্তশোভা কলস্বনা দিশাহারা স্রোতস্বিনীর এপাশে ওপাশে, তারপরে সহসা কোথাও তৃণগুল্মশৈবালে আকীর্ণ অন্ধকার গুহাগর্ভের দিকে চেয়ে ছমছমিয়ে এসেছে সর্বশরীর, আবার ফিরে এসেছি ভয়ে ভয়ে। হয়ত ওদের মধ্যে ছিল ভয়াল ময়াল, কিংবা কোনো অনাবিষ্কৃত অতিকায় জন্তু, কিংবা কোনো অটল অচল যোগতন্দ্রাচ্ছন্নমহাঋষি, জটাজটিল ধ্যানমৌন মহাস্থবির। হায় হায় ক'রে উঠেছে প্রাণ, হায় হায় করেছে সমগ্র জীবন। কিন্তু তারপর আবার গিয়েছি নিজের পথ দিয়ে। মনে হয়েছে

আমার পিছু নিয়েছে সেই হাজার হাজার বছর আগেকার অশরীরী ছায়ামূর্তির দল। তা'রা শুনতে চেয়েছে আমার মধ্যে তাদের পায়ের শব্দ, তা'রা দেখতে চেয়েছে আমার মধ্যে তাদের প্রকাশ, জানাতে চেয়েছে আমার মধ্যে দিয়ে তাদের আশীর্বাদ। অবশেষে ছায়ামূর্তিরা বিলীন হয়েছে যেন আমার এই কায়া-মূর্তিরই মধ্যে।

গাড়োয়ালের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ সামান্য নয়। যোশীমঠ থেকে তা'র আভাস পাওয়া যায়, হনুমান চটি ছাড়ালে তা'র পরিচয় মেলে। মেয়ে-পুরুষের চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখতে দেখতে যায় বদলে। গৃহপালিত পশুদের আকারেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন নেপালে, যেমন পূর্ব কাশ্মীরে, যেমন সমগ্র সিকিম ও ভূটানে,—তেমনি উত্তর-পূর্ব গাড়োয়াল যেখানে মিলেছে তিব্বতের পাহাড়ে, সেখানে তা'র ছোঁওয়া-ছুঁয়ি কিছু বেশী। সেখানে আচার-আচরণ, সামাজিক প্রথাদি, আচ্ছাদন-পরিচ্ছদেই যে কেবল তিব্বতকে এড়ানো যায়নি তা নয়,—তিব্বতের প্রবল প্রভাব পড়েছে হিমালয়ের বহু মন্দিরে ও স্থাপত্যে। যোশীমঠ বলো, উখীমঠ বলো, কেদার ও বদরিনাথের মন্দির বলো,—তিব্বতের গুম্ফা ও মন্দিরের যে সমস্ত স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় আছে, তাদেরই প্রভাব পড়েছে এই সব মন্দিরে। কাশ্মীরের লাডাকে এই কথা, কুলু উপত্যকার উত্তর প্রান্তে এই চেহারা, কিন্নরদেশে এই অভিব্যক্তি, উত্তর আলমোড়াতেও এবই পুনরাবৃত্তি। তুর্কীস্তান ও পামীরের মালভূমি থেকে যাদের আসতে দেখেছি, যে সকল হূনজাতির লোককে একদা দেখেছি ঝিলম্ নদী ও সিন্ধুনদের তীর ধ'রে এসে সীমান্তে পৌঁছেছে—তারাও এই শাক্ত-শৈব-বৌদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে আজও এড়াতে পারেনি। তিব্বতী অথবা কোন বড় গুম্ফায় ঢুকে দেখো, সেখানে শক্তিরূপিণী মহাকালী রয়েছেন হয়ত ভিন্ন নামে, এবং হিমালয়ের নানা মন্দিরে প্রবেশ ক'রে দেখো, বৌদ্ধ-প্রভাবের কী চমৎকার পরিণতি! ভারতের সঙ্গে পশ্চিম তিব্বত একাকার।

এই গাড়োয়ালের সমগ্র উত্তর সীমানাকে তিব্বত, কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশের থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে শতদ্রু নদী। মানস সরোবর থেকে নেমে কৈলাশ পর্বতের পাদমূল বেয়ে অনধ্যুষিত গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে শতদ্রু নদী চলে গেছে তিব্বত পেরিয়ে গাড়োয়ালের উত্তর দিয়ে উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে। যেমন কাশ্মীরের অন্তর্গত পহলগাঁওর নীলগঙ্গা। এদের মূলধারাকে কি কেউ অনুসরণ করেছে? শত সহস্র গিরি-নদী নির্ঝরিণী, শত সহস্র শাখা-প্রশাখায় কোন্ পথ দিয়ে কোথায় এদেরকে নিয়ে চলেছে কেউ কি জানে? এদের এপারে-ওপারে এমন অনেক অনাবিষ্কৃত গিরিসঙ্কটসঙ্কুল ভূভাগ রয়েছে যেখানে

আজও কোনো মানুষের পায়ের দাগ পড়েনি। জন্তু সেখানে জন্মায় না; কীটপতঙ্গ সরীসৃপ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই নিষ্প্রাণ তৃণতরুলতাহীন অসাড় পার্বত্যলোকের নির্জনতা বিভীষিকার মতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি কতদিন!

কিন্তু গাড়োয়ালে এর কিছু ব্যতিক্রম। একটি পর্বত ছাড়িয়ে অন্য পর্বত অতিক্রম করো, এক চূড়া থেকে অন্য চূড়ায়—রুক্ষতা নেই কোথাও। তুষারের সমান্তরাল বাদ দাও,—শুধু চেয়ে থাকো সমগ্র ব্রহ্মপুরার দিকে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ঘননীলের আভা, চারিদিকে সবুজের সমারোহ। যত চাও নদী, যত চাও জলধারা, যত তাকাও এখানে-ওখানে,—পুষ্পস্তবকাবনম্রা! পৃথিবীর সব ফুল এখানে ফোটে স্তবকে স্তবকে। যেখানে যাও, যেদিকে চাও,—তপোবন! ওই যেখানে বাঁকা আলো পড়েছে গুহার পাশ দিয়ে লতাবিতানের ছায়ার তলায় ঝরনার ঠিক ধারেই,—ওখানে উদ্বেলিত হচ্ছে করুণ কবিতার ব্যঞ্জনা! ওই ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত নিকুঞ্জে বাকি জীবন কাটানো যায় বৈকি! তুমি তৃষ্ণার্ত হয়ে চলেছ, পথের কোন একটি বাঁক ঘুরেই তোমার কানে পৌঁছবে জলধারার মৃদু কলতান। রঙ্গীন পাখায় প্রজাপতিরা ছেয়ে ফেলেছে উপত্যকা, রক্তরঙ্গীন আপেল আর আনার বিরাট পাহাড়ের গাত্রদেশকে রক্তপ্লাবিত করেছে—তুমি দেখে নাও পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। পাখিদের দিকে দেখো,—যাদের দেখোনি তুমি কোনোদিন, যাদের বর্ণসুষমা তোমার কল্পনাকে নিয়ে যাবে নন্দনকাননে,—চোখ ভ'রে তাদের দেখে নাও। চেয়ে থাকো সুনীলনয়না নদীর দিকে,—অনন্ত উদার গগনলোকের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে যার জলরাশিতে। সে রোমাঞ্চ-কৌতুক তোমার পক্ষে অবিস্মরণীয়। উত্তুঙ্গ পর্বতের চূড়ায় ওঠো,—চূড়া থেকে চূড়ায়,—চিরতুষারমণ্ডিত ত্রিশূল পর্বত আর নয়নাভিরাম নন্দাদেবীর শোভা তোমাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবে। চেয়ে থাকো পিন্দার হিমবাহের দিকে, চেয়ে দেখো নন্দকোট। ওখান থেকে নেমে এসেছে পিন্দার গঙ্গা, যেমন এসেছে রামগঙ্গা গাড়োয়াল থেকে আলমোড়ায়। তোমার দুটি অপলক চোখ।

গাড়োয়ালের প্রকৃত রূপ হোলো গাঙ্গেয়। উত্তর ব্রহ্মপুরায় গোমুখ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি জানি। কিন্তু জানা গেল কি কোথা থেকে এলো অলকানন্দা আর সরস্বতী? জেনেছি কি ধবলীগঙ্গার জন্মস্থল? সহজে কিছু জানা যায় না! কিন্তু অসংখ্য নামে অগণ্য জলস্রোত পরিণামে গিয়ে মিলেছে গঙ্গায়,—যে-গঙ্গাকে আমরা জেনেছি হরিদ্বারে চণ্ডীপাহাড়ের পাদমূলে। মনে প'ড়ে গেল চণ্ডীর পাহাড়তলীকে—শিবলিঙ্গ পর্বতমালার পাদমূলে। দেরাদুন

উপত্যকার সীমানা। হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল ঘন অন্ধকার অরণ্যলোক চ'লে গেছে যতদূর দৃষ্টি যায়। উপরের চূড়ায় রয়েছেন চণ্ডী অসুরনাশিনী। নদীর এপারে শিবপূজায় ব্যস্ত হরিদ্বার, ওপারে চলেছে শক্তিপূজা! কনখলে যাবার পথে মায়াবতীর পাশ দিয়ে গঙ্গার মূলধারার তীরে তীরে পথ। আশ্চর্য, এই নদীর উপরে দাঁড়ালে উত্তর দিগন্তে সোজা দেখা যায় তুষারমৌলী বদরিনাথের পর্বত-চূড়া—আকাশপথে হয়ত পঞ্চাশ মাইলের বেশী নয়। এই গঙ্গার দুই তীরভূমি থেকে তুলেছি কত বিচিত্রবর্ণের নুড়ি,—নিটোল মসৃণ মোলায়েম পাথরের টুক্‌রো। হরিদ্রাভ, রক্তিম, নীল, সবুজ, লোহিতনীলাভ, কৃষ্ণ,—আরো কত রং। নুড়ি তুলেছি অনেক, হিমালয়ের নানা অঞ্চলে। নুড়ি তুলেছি রং-পো আর রায়ডাক আর রংগীত আর তিস্তার তীরে তীরে—যেখান দিয়ে পথ হারিয়ে গেছে সিকিমে ভূটানে আর নাথু-লা গিরিসঙ্কটে, নুড়ি তুলেছি ব্রহ্মপুত্রে আর বাগমতীতে, গোমতী আর কৌশিকের তটে তটে, নুড়ি তুলেছি শারদায় আর সরযূতে, নুড়ি তুলেছি বিতস্তায় বিপাশায় আর চন্দ্রভাগায়। অজানা অনামা নদীর উৎস অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল চিরকালের জন্য, শুধু তাদের থেকে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ালুম।

নদী পার হয়ে গেছে চণ্ডীপাহাড়ের পথ। কতকটা চড়াই। এপার থেকে দেখতে অনেক চড়াই— ওপারে গিয়ে কিছুদূর উঠলে অতটা আর মনে হয় না। পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণে নদী,—আর সব দিক ঘন অরণ্যে নিবিড়। চড়াই পথে বাঁহাতি কালীর মন্দির,—যতদূর মনে পড়ে, ওর নাম দক্ষিণকালী। মন্দির প্রাচীন,—যেমন গাড়োয়ালের বহু শত মন্দিরই প্রাচীন। মন্দিরের পূজাও অকিঞ্চনের। শৈব হরিদ্বার কেড়ে নেয় সব উপচার, কালী আর চণ্ডীর জন্য থাকে সামান্য। এখানে বিধি হোলো বলিদান। পাকদণ্ডী পথ বেয়ে উঠতে থাকলে অবশেষে পাওয়া যায় চণ্ডীর মন্দির। লোহার রেলিং ঘেরা প্রদক্ষিণকরা বারান্দা। ভিতরে চণ্ডীর মূর্তি। উনি আনন্দ পান অসুরের হিংসায়, দংষ্ট্রায়, নখরে, রক্তপিপাসায়। সমগ্র সৃষ্টি ওঁর সংহারের লীলাক্ষেত্র। দুষ্কৃতের বিনাশ, অকল্যাণের ধ্বংস,—এই ওঁর মন্ত্র। উনি ভৈরবী—ভীরুতার বৈরী। ভয় হোলো মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, তাই উনি ভয়নাশিনী। উনি ভয়ভীষণা, তাই অভয়মন্ত্র দান করেন।

পথ ভুলে নেমেছি পশ্চিম দিকে। কিন্তু সেই পথে পাওয়া গেল তাদের, যারা গুহাবাসী সাধু। ওরা চিরকাল থাকে এই হিমালয়ে—সংসার থেকে দূরে যেখানে জনসমাগম নেই, প্রত্যহের জীবনসমস্যায় ওরা আলোড়িত নয়। ওরা কি খায়, কে ওদেরকে খাওয়ায়, সব খবর রাখিনে। ওরা জানে সূর্যের উত্তরায়ণ

আর দক্ষিণায়নের কাল, ওরা জানে চান্দ্রমাসের নির্ভুল হিসাব। গ্রহ নক্ষত্র শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ গণনা ক'রে ওরা জানতে পারে, কবে কোথায় ওদেরকে যেতে হবে। ওরা বুঝতে পারে কবে প্রয়াগ-ত্রিবেণীর সঙ্গমে কিংবা পঞ্চবটীতে পূর্ণ-কুম্ভের মেলা, বুঝতে পারে ঝুলন পূর্ণিমায় কবে তুষারতীর্থ অমরনাথের পূর্ণাঙ্গ দর্শন। শিবরাত্রিতে পশুপতিনাথ, অক্ষয়তৃতীয়ায় বদরিনারায়ণ, কবে অর্ধোদয় যোগ, কবে সূর্যগ্রহণ! ওরা পথে-পথে খায় আর ঘুমোয়, পথে-পথে ওদের জীবন-মৃত্যুর খেলা,—ওরা উলঙ্গ দরিদ্র সর্বত্যাগী স্নেহমোহমুক্ত অদ্বৈতবাদীর দল,—কিন্তু ওরা বেঁধে রেখেছে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের ঐক্যসংহতিকে। ওরা ধ'রে রেখেছে সন্ন্যাসী যোগী ভারতের আবহমানকালের ধর্মসংস্কৃতিকে। ওরা ওই ভস্মমাখা নগ্নদেহে যখন ব্রহ্মপুরার পাহাড়ে-পর্বতে শীতাতপসংস্কারবর্জিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন বুঝতে পারিনে ওরা কোন্ অঞ্চলের, কোন্ জাতির, কোন্ সমাজের, কোন্ ধরনের। বুঝতে পারিনে ওরা আর্য কি অনার্য, মঙ্গোল কি দ্রাবিড়, মারাঠা কি তিব্বতী। ওদের কোনো জাত নেই, ওরা সন্ন্যাসী; ওদের কোনো ধর্ম নেই,—ওরা হোলো বিশ্বদার্শনিক। গুহমুখে ওদেরকে কখনো দেখেছি আত্মনিমজ্জিত, তুষারপ্রান্তরে কখনো দেখেছি ওরা আপন মনে বসেছে জপে, কখনো দেখেছি, এই ব্রহ্মপুরার পাহাড়তলীর কোনো প্রাচীন অশ্বত্থের তলায় নিষ্কাম ব্রত নিয়ে আপন মনে প'ড়ে আছে মাসের পর মাস, কখনো বা কোথাও তাকিয়ে রয়েছে আপন মনে অপলক চক্ষে। কাছে গিয়েছি, বসেছি, গাঁজা টিপে ছিলিম সাজিয়ে পাশে রেখেছি, ভাঙ বেটে গুলী পাকিয়ে দিয়েছি, আটা মেখে রুটি সেঁকে বসেছি,—কিন্তু দিনের পর দিন গেছে, কোনটাই ওরা স্পর্শ করেনি। পা ছুঁইনি ভয়ে, পাছে লাথি মারে, গা ছুঁইনি, পাছে কামড়ায়; অন্যমনস্ক হইনি, পাছে হঠাৎ আক্রমণ করে। তারপর একদিন গিয়ে দেখি, সব ফেলে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে! কিন্তু এই ব্রহ্মপুরা, এই গাড়োয়াল,—এ অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও ওরা স্থির থাকতে চায় না। এখানে ওরা সংখ্যায় বেশী, এখানকার পাহাড়-পর্বতেই ওদের অবিশ্রান্ত আনাগোনা। পাঠান মোগল ইংরেজ,—কারো আমলে কেউ ওদের ঘাঁটায়নি, ওদের তপোভঙ্গ করতে সাহস করেনি। অমন যে গোঁড়া মুসলমান সম্রাট ঔরঙ্গজেব, তিনিও গুরু রামরায়কে এই ব্রহ্মপুরার উত্তরে মোহন গিরিসঙ্কটে একটি সন্ন্যাস আশ্রম নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন।

সাধুদের আশ্রম-সীমানা ছেড়ে নামলুম নদীর বালুভূমে। কিন্তু অপরাহ্ণে সেই অরণ্য-সীমান্তে বালুপথের ওপর ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন দেখে গা ছমছম ক'রে উঠলো। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই। বাঘের পায়ের দাগগুলি অতি স্পষ্ট।

হয়ে চ'লে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সম্ভবত একটু আগেই গেছে। সুতরাং বিভ্রান্ত দ্রুতপদে অরণ্যের বাঁক পেরিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে গেলুম।

রাজা অজয়পালের মৃত্যুর পর থেকে ব্রহ্মপুরা তা'র স্বাতন্ত্র্যগৌরবে ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে থাকে। গাড়োয়ালীরা প্রধানত হোলো 'ছত্রী' ব্রাহ্মণ,—ওরা স্বপাক ভিন্ন অপরের হাতে খাদ্য গ্রহণ করে না। যেমন কাশ্মীরের দেহাতী সরল মুসলমান সম্প্রদায়। তা'রা ভয় পায় পাছে কাশ্মীরী পণ্ডিতের রান্না কিছু খেলে তাদের জাত যায়। কিন্তু কৌতুকের কথা এই, কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকরা কাশ্মীরী মুসলমানকে পাচক ও পরিচারক রাখে। যে কোনো হিন্দু ও পাঞ্জাবী হোটেলে মুসলমান পাচক ও ভৃত্য—এতে কারো কোনো আপত্তি ওঠে না। যে কোনো উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের ঘরে কাশ্মীরী পণ্ডিতরা কাজ করে,—কোনো আপত্তি করে না। সে যাই হোক, ক্ষাত্র-ব্রাহ্মণ ব'লেই গাড়োয়ালীরা ব্রহ্মপুরার নাম বদলে একদা ক্ষাত্রপুরা নামকরণ করে। বিচ্ছিন্ন ও বহুখণ্ডিত ব্রহ্মপুরাকে সংহত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত ক'রে রাজা অজয়পালই নূতন নাম প্রবর্তন করেন—গড়বাল। রাজা অজয়পালের গোষ্ঠী এই চন্দ্রবংশীয় রাজারাই তখন কুর্মাঞ্চল অর্থাৎ আধুনিক কুমায়ুনের প্রবল প্রতাপান্বিত অধিপতি। এর পর সুসমৃদ্ধ গাড়োয়ালের চেহারা দেখে হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্যও ধীরে ধীরে গড়বালের প্রতি ঈর্ষান্বিত হোলো। ক্রমে ভূস্বর্গ গড়বালকে কুক্ষিগত করার জন্য তিব্বতী লামারা তৎপর হতে লাগলো। ভারতে তখন মোগল সাম্রাজ্য চারিদিকে আপন আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু এই পার্বত্য রাজ্যের দিকে পাঠান অথবা মোগলেরা কেউই হাত বাড়াতে সাহস করেনি। তখন হিমালয়ের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের রাজনীতিক যোগাযোগ ছিল কম, সেদিন আজকের মতো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কথা ওঠেনি। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাবর শাহ থেকে উনিশ শতাব্দীর বাহাদুর শাহ পর্যন্ত হিমালয়কে নিয়ে বিশেষ কেউই মাথা ঘামাননি। কেবল তাঁরা পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব রেখেই চলেছিলেন।

ইতিহাস বলতে আমি বসিনি। কারণ এতে আছে অনেক ফাঁকি, অনেক কারচুপি এবং বহুরকমের পক্ষপাতিত্ব। বলা বাহুল্য, ইংরেজের লেখা ইতিহাসেই সবচেয়ে বেশী হেরফের, কেননা এগুলোর মধ্য থেকে সূক্ষ্মতম মিথ্যার অদৃশ্য জাল বোনা। স্থূল কথাটা সহজে বলে না ইংরেজ। উনিশ শতাব্দীর প্রথমে গুর্খারা যখন গড়বাল আক্রমণ করে, এবং রাজা প্রদ্যুম্নশাহকে দেরাদুনে এসে হত্যা করে—তখন ইংরেজ গিয়েছিল গড়বালকে সাহায্য করতে। গুর্খারা

পরাজিত হলো, কিন্তু ইংরেজ পেয়ে গেল পূর্ব গাড়োয়াল। টেহরী গাড়োয়াল রইলো পশ্চিমে টেহরী রাজধানীকে কেন্দ্র করে। মেহলচৌরী হলো সেই টেহরী ও ব্রিটিশ গাড়োয়ালের সেদিনের সীমানা। লর্ড লান্সডাউনের নামে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য শহর তৈরী হোলো হিমালয়ে—সেখানে বসানো হোলো গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট্। লান্সডাউনের কথা পরে বলবো।

এই ব্রহ্মপুরার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে গেছে চারটি প্রধান তীর্থপথ। কেদারনাথ, বদরিনাথ এবং উত্তরকাশী হয়ে যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর পথ। নদীমাতৃক হোলো ভারত। নদী তা'র জননী। তিনি জলদান করেন ভারতকে। জল মানেই জীবন। সমগ্র অখণ্ড ভারতের জীবন-সূত্র এসেছে হিমালয়ের থেকে। আচার্য শঙ্কর তাই একদা এসেছিলেন এই উত্তরধামে, এই ব্রহ্মপুরায়। ব্রহ্মলোকে থেমে যে নদী প্রথম দেবলোকে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই সন্ধিস্থলে আচার্য প্রতিষ্ঠা করেছেন দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতীক্ দেবাদিদেবের মন্দির, পাশে বসিয়েছেন পার্বতীকে। নদী হোলো পার্বতী, মহাদেবের জটা হোলো চূড়া। ওই জলধারারার প্রবাহে নেমে এসেছে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভারতের দর্শন ও যোগ, ভারতের প্রসন্ন শান্তি ও ত্যাগধর্ম। যাঁরা চিরদিন ভারতের এই সংস্কৃতি, দর্শন, যোগ ও ত্যাগধর্মকে ধারণ করেছেন, বহন করেছেন, প্রচার করেছেন,—তাঁরা মন্ত্র নিয়েছেন ওই ব্রহ্মপুরা থেকে। তাঁরা একদা বৃক্ষবল্কল ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করেছিলেন গৈরিক বাস। সেই গৈরিক বর্ণের পরিচ্ছদ আজও রয়েছে অম্লান। ঋষিকুলে যাও, গুরুকুলে যাওঁ, যাও কনখলে আর লালতারবাগে, যাও হৃষিকেশে কিংবা দেবপ্রয়াগে, যাও যোশীমঠে কিংবা উত্তরকাশীতে,—দেখবে বিচিত্র এই ভারত ছিল তোমার কাছে অনাবিষ্কৃত! দেখবে নিজের আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কার বিচার ন্যায়নীতি—যা কিছু নিয়ে তুমি একটা নিজস্ব মনোবৃত্তি গ'ড়ে তুলেছ,—এখানে এসে তা'র ব্যাখ্যা যাচ্ছে বদলে। যদি তুমি সত্য ভারতবাসী হও, যদি এ দেশের সংস্কৃতির কণামাত্রের সঙ্গে তোমার আপন মানবতার তিলমাত্র সনাক্তিকরণ থাকে, তবে তুমি কেবল বদ্‌লাবে শুধু নয়,—তোমার ইচ্ছা অভিরুচি সংস্কার অভ্যাস আদর্শ, এমনকি তোমার প্রকৃতিগত পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। হিমালয়ের হাওয়ায় তুমি হারিয়ে গেছ।

পথ অনেক দূর, অনেক দুরারোহ। তা হোক, হৃষীকেশ থেকে চলো, ধীরে ধীরে চলো, চলো নদী পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, উপত্যকা ছাড়িয়ে,—চলো দূর থেকে দূরে। পিছন দিকে একবার তাকাও। চেয়ে দেখো পিছনে, কখন ফেলে এসেছ তোমার স্বকীয়তা, তোমার স্নেহমোহবন্ধন, তোমার প্রত্যহ-

জীবনের কতশত তুচ্ছ ভগ্নাংশ। তুমি ইচ্ছা-অনিচ্ছার অতীত—পথের অচ্ছেদ্য টান তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কথা ব'লো না একটিও, জানতে চেয়ো না কিছু,—ধীরে ধীরে ওই হিমালয় তোমার চোখের সামনে নিজেকে প্রতিভাত করবে। প্রলয়পয়োধিজলে এই বিশ্বসৃষ্টি হোলো একটি মহাপদ্মপুষ্প। সেই পদ্ম বিকশিত হয়েছে সত্যনারায়ণ সূর্যের কিরণসম্পাতের দিকে। হিমালয় তেমনি তা'র সমগ্র আর্যাবর্তজোড়া বিশাল পদ্মকোরককে একেকটি দল মেলে শতদলে বিকশিত করবে তোমার বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিপথে।

দূর থেকে দূরে যাও। নরেন্দ্রনগর থেকে টেহ্‌রী, কিংবা দেবপ্রয়াগ থেকে। যদি 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী' ভাগীরথীকে চাও, তবে দেবপ্রয়াগ থেকে ধরো। টেহ্‌রী ছাড়াও, তারপর ডুণ্ডাগাঁও আর উত্তরকাশীর পথে চলো। যদি যমুনোত্তরী যাও তবে সোজা উত্তরে; গঙ্গোত্তরী যদি যাও—তবে ওই পূর্বপথ। পূর্ব থেকে উত্তর। ভাগীরথী তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন তুমি যতদূরে যাবে,-যেখানে যাবে। হিমবাহ আছে আরো উত্তরে, আছে বিজন ভীষণ তুষার-প্রান্তর—আছে দেবাদিদেবের হিমজটা যার ভিতর দিয়ে জাহ্নবীর ধারা গোমুখের দিকে হারিয়ে গেছে। অবশেষে তুমি বিশ্রাম নাও গঙ্গোত্তরীতে গঙ্গামন্দিরে। চেয়ে থাকো গঙ্গার আদি আর অন্তে—গোমুখ থেকে গঙ্গা-সাগর,—প্রায় দু'হাজার মাইল, দেখবে পৃথিবীর কোথাও কোনো জাতির কোনো সংস্কৃতির একটিমাত্র নদীকে এমন ক'রে জাতির প্রত্যেকটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। কন্যাকুমারীতে যাও, যাও মাদুরায় আর রামেশ্বরমে, যাও আবু পাহাড়ে আর দ্বারকায়, যাও জগন্নাথে কিংবা পঞ্চবটীতে,—সেখানে তোমার শেষ পুণ্যলাভ ঘটবে গঙ্গাজল দানে। এই গাঙ্গেয় সভ্যতা বিশাল ও বিচিত্র ভারতকে সর্বকালজয়ী বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

দেবপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ—অলকানন্দা থেকে মন্দাকিনী। চারিদিকে কেবল 'গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী'। নীচে নীচে তা'র বনস্পতির পথ, সুশ্যাম বনানী অনন্ত লতাবিতানে ছাওয়া। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গুপ্তকাশী, তারপর গৌরীকুণ্ড হয়ে তুষাররাজ্য কেদারনাথ। ফিরবার পথে উখীমঠ চামোলী হয়ে যোশীমঠ,—যোশীমঠ থেকে নেমে বিষ্ণুগঙ্গা পেরিয়ে সোজা বদরিনাথ। সোজা, তবু অত সোজা নয়। ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ, ছিন্ন-ভিন্ন মলিন পরিচ্ছদ,—আড়ষ্ট আর অবসন্ন, শ্রমমালিন্যঢাকা পাণ্ডুর দেহ! কিন্তু ওটাই হোলো পুরস্কার। ওই চিরদরিদ্র হতমান অন্নবস্ত্রহীন গাড়োয়ালীদের সঙ্গে নিজেকে মেলানো; ওই সর্বহারা মানহারা জনতার মধ্যে আত্ম-পরিচয়হীন হয়ে থাকা,—তবেই ব্রহ্মপুরার সত্য পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগের দুই বিরাট কাহিনী এই ব্রহ্মপুরায় এসে মিলেছে। সমগ্র ভারতে ছড়ানো রামায়ণ আর মহাভারত। হিমালয়ে এসে মিলেছে সেই দুই ধারা। লঙ্কায় রাবণকে বধ করা হলো সত্য, কিন্তু এই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত কি নেই? ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যু হয়েছে দশরথের, কিন্তু পিতৃপুরুষের তর্পণ যে বাকি। রাজা রামচন্দ্র পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করলেন দেবপ্রয়াগে। লছমনঝুলার কাছে ব'সে চার ভাই মিলে মহাদেবের নিকট পূজা নিবেদন করলেন। এপারে তাই বিশ্বেশ্বর, ওপারে নীলকণ্ঠ। চারটি ভাইকে কেন্দ্র ক'রে চারটি স্মৃতিফলক—তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হলো চারটি মন্দির। তবে রামচন্দ্রের মন্দিরটি স্থাপিত দেবপ্রয়াগে। সম্ভবত ভারতের আর কোনো অঞ্চলে এমন শত সহস্র পার্বত্য ও সুপ্রাচীন মন্দির আর কোথাও নেই,—যেমন আছে এই গাড়োয়ালে। অজস্র জলধারা, অফুরন্ত অরণ্যলোক, অটুট স্বাস্থ্যশ্রী, অসংখ্য উপত্যকা,—তা'র সঙ্গে ধবল তুষারের দৃশ্য, নীলাভনয়না গিরিনদী, বনরাজির শ্যামবসন্তশোভা, গিরিশৃঙ্গতলে উপলখণ্ডময় নদীসঙ্গমের উদার বিস্তার, এবং তারই তীরে তীরে মেঘখণ্ড দলের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম,—আর উপরে অনন্ত গগনে মহামৌন শান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে ওঙ্কার ধ্বনিত হচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মপুরার শত সহস্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে!

পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের আমলে ব্রহ্মপুরার সীমানা কতদূর অবধি প্রসারিত ছিল, সে খোঁজ এখন আর কেউ নেয় না। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তখনও পৌরাণিক ব্রহ্মপুরা ঐতিহাসিক গাড়োয়ালে এসে পৌঁছয়নি। অথচ সমগ্র পশ্চিম তিব্বত ভারতেরই একটা অংশ, এটি ঐতিহাসিক সত্য। ধর্মাচরণে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক রীতি ও অভ্যাসে—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কম। এটা অস্পষ্ট নয় যে, তখনকার ব্রহ্মপুরার সীমানার মধ্যে ছিল কৈলাশ পর্বতমালা ও তার শিখরচূড়া এবং তার সঙ্গে মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদ। গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার জন্য ভগীরথ শিবের তপস্যা করতে গিয়েছিলেন কৈলাশে—এই পৌরাণিক গল্পের ভিতরে যে সকল আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্ ভুল বার করতে চান, তাঁরাও কি ভ্রান্ত নন? তারা বলেন, গাড়োয়ালের আধুনিক সীমানাস্থিত গোমুখে যখন গঙ্গা প্রথম দৃশ্যমান হয়, সেইটিই হলো গঙ্গার প্রথম জন্ম! এটা ভুল। গঙ্গার উৎপত্তি নির্ভুলভাবে যেখান থেকে হচ্ছে, অর্থাৎ বিগলিত তুষারস্তর যেখানে প্রথম তারল্যে পরিণত হচ্ছে,—সেই নিশ্চিত ভূভাগটি যে কৈলাশ গিরিশ্রেণীর মধ্যে নয়, এর নিঃসংশয় প্রমাণ কারো হাতে নেই। কেদারনাথ ও বদরিনাথের চূড়ার পিছনে তিনটি বিরাট গিরিশিখর

দণ্ডায়মান। শ্বেতবরুণ, শিবলিঙ্গ এবং সুমেরু। এই পর্বতচূড়াদলের কেন্দ্রে গোমুখ থেকে নিঃস্রাবিত গঙ্গার শোভা পৃথিবীর যে কোনো দেশের বিজ্ঞানীদের কাছেও পরম বিস্ময়কর। কিন্তু এই সকল শিখরদেশের উপর দিয়ে যে হিমবাহ স্তরে স্তরে শত শত বর্গ-মাইলব্যাপী প্রসারিত রয়েছে, তার সেই জটিল তলপথের সন্ধান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভূতত্ত্ববিদরা এখানেই নিরস্ত হয়ে বলেছেন যে, গঙ্গার উৎপত্তি গাড়োয়াল সীমানার মধ্যেই। বাল্মীকি বলেছেন, বেগবতী ভাগীরথীর খরতর প্রবাহ লক্ষ্য করে কৈলাশপতির টনক নড়ে। যদি অবাধ মুক্তির পথে এই 'উন্মাদিনী দিশাহারাকে' ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে কুলনাশিনীর হাতে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আকাশের দেবতারা ভয়ে কম্পমান, সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়! কিন্তু সত্যই ইন্দ্রের ঐরাবত যখন ভেসে গেল, তখন দেবাদিদেব কৈলাশপতি আর স্থির থাকতে পারলেন না। গঙ্গাকে সংহত করে তিনি তাঁর জটিল জটারাশির মধ্যে উদ্দামিনীকে ধারণ করলেন। সেই জটারাশির মধ্যে গঙ্গা হারালেন তাঁর পথ। গোমুখের উত্তরভাগে তুষার-চূড়াগুলির পার্বত্য জটিলতাকে মহাদেবের জটাজটিলতা মনে করলে ভুল হবে না। তুষার নদী ও হিমবাহস্তরের ফাঁকে ফাঁকে ঘনকৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরচূড়ারা মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে। যেমন সুদূর দক্ষিণে মৈনাক পর্বতশ্রেণী সাগর-লহরীর ভিতর থেকে মাথা তুলেছে সেতুবন্ধের সমুদ্রপ্রণালীতে, ঠিক এখানেও তেমনি,—তুষারশুভ্র হিমসায়রের অন্তহীন দিকদিগন্তের ভিতর থেকে কালো পাথরের চূড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। এখানকার তুষার-তলপথের সঙ্গে কৈলাশ পর্বতমালার যোগাযোগ অদৃশ্য, কিন্তু অস্পষ্ট নয়। ভূতত্ত্ববিদের হিসাব থেকেই ধরে নেওয়া যায়, কোনো এককালের প্রলয়ে অর্থাৎ হিমালয়ের অন্তরতলের ভয়াবহ কাঁপনে উপরস্থ পার্বত্যলোকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে! সেই বিপর্যয়ে পাহাড় হয় স্থানচ্যুত, বিদীর্ণ হয় পার্বত্যপ্রকৃতি, নদীনালা তাদের আপন পথ সৃষ্টি করে এবং বন্দিনী ভাগীরথী গঙ্গোত্তরী হিমবাহের বিচিত্র জটিলতা অতিক্রম করে গোমুখ থেকে ছুটে নেমে আসেন নীচের দিকে। সুতরাং এখন গঙ্গার প্রথম প্রকাশ গাড়োয়ালে। কিন্তু এই গাড়োয়ালের উত্তর সীমানা থেকে যেমন উত্তরকাশীর পথ ধরে নেমে এসেছেন ভগবতী গঙ্গা, তেমনি একই অঞ্চল থেকে অলকানন্দা চলে গিয়েছেন বদরিকাশ্রমের দিকে। তারপর যোশীমঠের নীচে ধবলীগঙ্গার সঙ্গে মিলেছেন। গঙ্গোত্তরীর দিকে গঙ্গার সঙ্গে যে নদীর প্রথম যোগ হয়েছে, তার নাম কেদারগঙ্গা,—এ নদীর উৎপত্তি কেদারনাথ পর্বতের মধ্যে।

দেবতাত্মা হিমালয়ের সমস্ত কাহিনী ও পরিচয়ের সঙ্গে ভাগীরথীর ইতিহাস

আগাগোড়া বিজড়িত। যে হেতু গঙ্গার মূলধারা হিমালয়ের হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত, এবং এর জলধারার চিরস্থায়ী সরবরাহ নিশ্চিত,—সেই কারণে ভাগীরথীর তীরভূমিতে গ'ড়ে উঠেছিল ভারতের প্রথম সভ্যতা। ভারতসংস্কৃতির প্রথম মন্ত্র হলো গঙ্গার মন্ত্র। প্রথম মন্দির উঠেছিল গঙ্গার কূলে, প্রথম জনপদ সৃষ্টি হয়েছিল গঙ্গার তটে। সহস্রধারা চারিদিক থেকে নেমে এসে গঙ্গায় মিলে যেমন তাকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছে, তেমনি গঙ্গাকে কেন্দ্র করে ভারত-সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সহস্রধারা চলে গিয়েছে নানা দিকে। সগর রাজবংশের ষাটহাজার সন্তানের ভস্মীভূত দেহ গঙ্গার পুণ্যস্পর্শে জীবনলাভ করেছিল, একথা সেদিনের মতো আজকেও সত্য। কেননা, প্রকৃতির কোনো যাদুমন্ত্রবলে যদি আজ গঙ্গার ধারা ব্রহ্মপুরার কোথাও হঠাৎ শুকিয়ে যায়, তবে ভারতের দশ কোটিরও বেশী নরনারীর জীবন বিপন্ন হবে। গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই উত্তর ভারতের যত প্রাকৃতিক সম্পদ, গঙ্গাই হলো উত্তর ভারতবাসীর জীবনের মূলমন্ত্র। গঙ্গা মানে মর্ত্যগামিনী—যিনি গতিশীলা। গতি মানেই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু!

জনৈক বিদেশী পর্যটকের কয়েকটি কথা এই সূত্রে মনে পড়েছে। তিনি গঙ্গা প্রসঙ্গে বলেছেন, "পৃথিবীতে নদীর সংখ্যা কম নয়। দু' হাজার থেকে চার হাজার মাইল লম্বা নদী কয়েকটি আছে বৈকি। আমেরিকায় মিসিসিপি, রাশিয়ায় লেনা, চীনে ইয়াং-সি-কিয়াং, দক্ষিণ আমেরিকায় আমেজন, মিশরে নাইল,—এরা কোটি কোটি মানুষের জন্য ফসল ফলায়, জীবন দান করে, মানুষের ঐহিক উন্নতির পথে এসব নদী প্রধান সহায়! কিন্তু গঙ্গার উদ্দেশে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের কোটি কোটি নরনারী তাদের প্রতিদিনকার জীবনে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে থাকে, তার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও নেই। স্তবস্তুতি, পূজা, প্রীতি, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, ভক্তি ও অনুরাগ,—মানুষের হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রতি সময়ে একটি নদীর প্রতি নিবেদিত হচ্ছে, এই বিচিত্র দৃশ্য বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে যিনি না দেখেছেন, তিনি বিশাল ভারতের মহাজনতাকে কোনদিনই চিনতে পারবেন না!" গঙ্গাকে বলা হয় পতিতপাবনী এবং সর্বপাপনাশিনী! পর্যটক মশায় এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "এ কথাগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। গঙ্গার জলে এমন সব ধাতব পদার্থ মিশ্রিত যে, এর জলধারা কখনও দোষদুষ্ট হয় না, অথবা এর জল দীর্ঘকাল কোনো পাত্রে জমা রাখলে কোনো কীট জন্মে না। গঙ্গায় অবগাহন-স্নান করলে শরীরে চর্মরোগ আসে না এবং ব্যাধিবিকার নষ্ট হয়,—মন প্রফুল্লিত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, অবগাহনের পর সর্বক্ষণ নিজেকে পবিত্র বলে মনে

হতে থাকে। গঙ্গায় কোনো মালিন্য দাঁড়ায় না, এবং মড়ক ও মহামারীর বিপজ্জনক বীজাণুকে অতি অল্প সময়ে এর জল নষ্ট করে দেয়। যোগে, পার্বণে, গ্রহণে, পুণ্যতিথিতে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি নদীতে অবগাহন-স্নানের মধ্যেই করযোড়ে দাঁড়িয়ে প্রভাতসূর্যকে বন্দনা করছে,—এ কাজটিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কেননা দেহের প্রতি লোমকূপের দ্বারা একদিকে তারা গ্রহণ করছে ধাতবপদার্থমিশ্রিত প্রবহমান জল, অন্য দিকে দুই চোখের একাগ্র দৃষ্টির দ্বারা সূর্যের রঞ্জনরশ্মি। ভারতের সমস্ত শাস্ত্রানুশাসন ও ধর্মানুষ্ঠান পর্যালোচনা করলে বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা স্পষ্টতই চোখে পড়ে!”

গঙ্গার পথই হলো ব্রহ্মপুরার পথ। হিমালয়ের ‘মহাভারতীয়’ গিরিমালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূভাগ হলো ব্রহ্মপুরা। ভারতের অধ্যাত্ম সংস্কৃতির মুকুটমণি হলো ব্রহ্মপুরা,—কোনো সন্দেহ নেই। সমগ্র হিমালয়ে আছে অনেক পর্বতচূড়া, অনেক তুষারকিরীট, কিন্তু ব্রহ্মপুরার গিরিশৃঙ্গমালার মতো পূজা পায় না কেউ। অমন যে গৌরীশৃঙ্গ আর গৌরীশঙ্কর, অমন যে ধবলগিরি আর কাঞ্চনজঙ্ঘা, অমরাবতীর তীরে অমন যে ভৈরবঘাটের নয়নবিমোহন চূড়া, অমন যে ধবলাধার আর নাঙ্গা আর হরমুখ, ওরা ওদের সমস্ত অমর্ত্যমহিমা সত্ত্বেও কেমন যেন অনাদরে পড়ে রইলো এখানে ওখানে। কৃষ্ণগিরির দিকে তাকালো না কেউ, পীর পাঞ্জাল সরে রইলো উপেক্ষিত হয়ে, কোথায় রইলো কোলাহাই আর শেষনাগের হিমবাহ তাদের অভ্রভেদী গৌরব নিয়ে,—কিন্তু সবাই চললো গঙ্গার ধারে ধারে। ব্রহ্মপুরার শিরা উপশিরায় গঙ্গা, শাখা-প্রশাখায় গঙ্গা। প্রতি মানুষের কণ্ঠে, প্রতি জপের মন্ত্রে গঙ্গা। ভক্তির পিছনে আছে কৃতজ্ঞতাবোধ, অনুরাগের পিছনে আছে আনন্দ। গঙ্গার জলে জীবনধারণ করি তাই গঙ্গা পূজ্য; মেঘের বৃষ্টি থেকে খাদ্যলাভ করি, তাই আকাশ সুন্দর; হিমালয় গিরিশ্রেণী দেশের প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করে, তাই হিমালয় আরাধ্য। উপকার পাই বলেই ভক্তি করি, সঞ্জীবনী রস পাই বলেই ভালোবাসি। আপাতদৃষ্টিতে যেটি অহেতুক, পিছনে হয়ত তার বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। গঙ্গার মতো প্রাণদায়িনী নদী আছে বলেই ব্রহ্মপুরা স্বর্গসুষমামণ্ডিত। নচেৎ গঙ্গাহীন গাড়োয়াল মানুষকে কোনোদিন আকর্ষণ করতো না।

ব্রহ্মপুরার মতো হিমালয়ের আর কোনো অঞ্চল ভারতবাসীর কাছে এত প্রিয় নয়, তাই তীর্থযাত্রীদলের কলকণ্ঠে ব্রহ্মপুরা নিত্য মুখরিত। গৌরীশৃঙ্গ মানুষের দৈহিক বিক্রমকে আহ্বান করে, কিন্তু সেখানে তীর্থযাত্রীর আকর্ষণ নেই। নেপালে আছেন ভদ্রকালী আর গুহ্যেশ্বরী মন্দির,—পীঠস্থান, সন্দেহ

নেই। কিন্তু সেটি একান্ন পীঠের অন্যতম, তার বেশী কিছু নয়। আছেন পশুপতিনাথ, কিন্তু তিনি ব্রহ্মপুরার তুলনায় আধুনিক। কাশ্মীরে আছে গুহাতীর্থ অমরনাথ, কিন্তু এই তীর্থস্থানের বয়স কমবেশী, চারশো বছর মাত্র। পাঞ্জাব হিমালয়ের কাংড়ায় আছেন বজ্রেশ্বর, আর কিছুদূর গিয়ে জ্বালামুখীতে কালীধর পাহাড়ের উপরে দেবী জ্বালামুখী অম্বিকা এবং উন্মত্ত ভৈরবের মন্দির, কিংবা ধবলাধার গিরিশ্রেণীর ক্রোড়শৈলে বাণগঙ্গার উপরে বৈজনাথের বিশাল মন্দির,—এরা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আকর্ষণ কম। নদীর বহুমুখী ধারা এদের আশেপাশে নেই, স্থানীয় অঞ্চল ছেড়ে তাই বাইরের দিকে এদের যোগাযোগ সামান্যই। হিমালয়ের গিরিজটলা পেরিয়ে বহু দুর্গম অঞ্চলে আছে অগণ্য দেবস্থান, কিন্তু মানুষের কল্যাণকল্পনাকে তারা এমন একান্ত নিবিড়ভাবে অনুপ্রাণিত করে না—যেমন করে গঙ্গাবিধৌত ব্রহ্মপুরা। সেই কারণে আচার্য শঙ্করের অধ্যাত্ম প্রতিভা তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করে এখানে। দেড় হাজার বছর হতে চললো তিনি গিয়েছিলেন উত্তর-ধামে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরায়, কিন্তু তাঁর যাবার বহু আগে,—তার তারিখও নেই, নিরীখও নেই—এই গঙ্গাপথ ধরে গিয়েছে ভারতের জনতা যুগযুগান্তকাল ধরে। শুধু প্রস্তরমন্দির তীর্থ নয়, কারণ সে হলো মানুষের তৈরি। নিজের হাতে মানুষ মন্দির বানায়, নিজের হাতে ছেনি দিয়ে কেটে মানুষ মনের মতন বিগ্রহ তৈরি করে,—আবার তারই নীচে ঠোকে নিজের মাথা। মন্দিরটা তীর্থ নয়, এমন কি দেবদর্শনও নয়। কেননা সংখ্যাতীত দেবমন্দির ত' হাতের কাছেই রয়েছে! কলকাতা অঞ্চলে অন্তত পাঁচ শো দেবমন্দির দাঁড়িয়ে, কিন্তু কে রাখছে তাদের হিসেব? কাশীতে যাও,—সেখানে তো পথেঘাটে; অসতর্ক পা বাড়ালে শিবের গায়ে হোঁচট খেতে হয়! যেখানে খুশি, যে কোনো প্রদেশে। করাচীতে যাও, যাও গোয়াতে, পণ্ডিচেরীতে, শ্রীলঙ্কায়, চট্টগ্রামে,—কোথায় নেই দেবমন্দির? তবু ভারতের লোক যুগে যুগে বলে এসেছে ব্রহ্মপুরার তুলনা নেই ভূ-ভারতে! মন্দির নয়, পথই হোলো তীর্থ, এবং সেটি হলো গঙ্গাবতরণের পথ। পথ ফুরোলেই তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ, অর্থাৎ পূর্ণযাত্রা। মন্দির নয়, দেবতা নয়, তীর্থপরিক্রমা। গঙ্গাপথে যাবো, দেখবো তার উৎপত্তি ব্রহ্মলোকের গিরিসঙ্কটে এবং গঙ্গাকে অনুসরণ করে যাবো যতদূর তার গতি,—এরই নাম তীর্থ পরিক্রমা। এই আনন্দলাভের নাম দেওয়া হয়েছে ভগবদ্‌ভক্তি, এই গঙ্গাপথকে বলা হয়েছে তীর্থযাত্রা! কিন্তু পথের সঙ্কেত কই? হৃদয়ানু-রাগকে প্রকাশ করবো কোন্ কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে? তীর্থযাত্রার প্রতীক কই? তখন বানানো হলো মন্দির! বিষ্ণু হলেন সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তাঁকে রাখো

শীর্ষস্থানে,—তাঁর সঙ্গে গঙ্গাকে জড়িয়ে নাম রাখো বিষ্ণুগঙ্গা। একই ধারা, কিন্তু উত্তরাপথে তাঁর নাম হয়েছে অলকানন্দা। স্বর্গলোকের সমস্ত হাস্যোচ্ছলতা এনেছেন তিনি, এসেছেন উদ্দাম আনন্দে। পলকে পলকে নীলনয়নার অপরূপ নগ্নশোভা ঢাকা পড়ছে আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশিতে। হঠাৎ আবার কোথাও তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন—শত শত বৈদূর্যমণির বিচ্ছুরিত জ্যোতির্ময়তা নিয়ে,—এপাশে-ওপাশে উপবন আর তপোবন, শত বরনের গোলাপ আর মল্লিকার সুগন্ধে আবেশ লেগেছে তাঁর নয়নের নীলাভায়। কিন্তু সে ক্ষণকাল—তারপর আবার গিরিসঙ্কটের পঞ্জরাস্থি ভেদ করে তিনি চলেছেন মর্ত্য অমরাবতীর আশে-পাশে—যেখানকার চন্দ্রহসিত মায়াকাননে নেমে আসে অলকাপুরীর অপ্সরীরা যৌবন-উৎসবে।

দেবতাত্মা হিমালয়ের রহস্যলোকে এই অলকাপুরীর দর্শনপিপাসায় ছোটে মর্ত্যবাসী তীর্থযাত্রীরা। দুস্তর চড়াই পথে বুক ফেটে মরেছে কত মানুষ, নিঃশ্বাসের বায়ু খুঁজে না পেয়ে মরেছে, অভ্রভেদী গিরিচূড়ার সঙ্কীর্ণ সঙ্কটে পদস্খলন ঘটে মরেছে কত লোক, তুষার-ঝটিকায় আহত-প্রতিহত হয়ে মরেছে, ব্যাধি-পথশ্রম-উপবাস সইতে না পেরেও মরেছে কত শত,—ইতিহাসে তার হিসাব নেই কোথাও। বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি, বিষধর ভীষণ সর্প ক্ষমা করেনি, তুষারদংশনে ক্ষত-বিক্ষত দেহের অবসান,—তবু কোনোকালের মানুষকে স্থির থাকতে দেয়নি ওই ব্রহ্মপুরার গঙ্গাপথ। গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে যেমন চলেছে উন্মাদিনী গঙ্গার দুরন্ত জলধারা, তেমনি চলেছে তার পাশে-পাশে দুর্বার গতিতে তীর্থযাত্রী দলের অজেয় প্রাণধারা। সুখ দুঃখ স্নেহ মোহ বেদনা দয়া প্রীতি,—ওরাও চলেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে। চারিদিকে অনন্ত মহামৌন গিরিশৃঙ্গশ্রেণী,—নীচের দিকে তীর্থযাত্রী দলের কলমুখরতায় যেন তার নীরবতা আরও গভীর। কখনও ঝড়ে, বর্ষায়, ঠাণ্ডায়, ঝঞ্ঝায়, মহাসূর্যের অগ্নিস্রাবী প্রখরতায় তারা উদ্‌ভ্রান্ত; আবার কখনো বা ঋতুরাজের নবঘনশ্যাম বসন্ত সমারোহের মাঝখানে তারা দিগ্‌ভ্রান্ত।

ওদের ওই আনন্দ-বেদনার তরঙ্গদোলায় আমিও নিজেকে বার বার মিলিয়ে দিয়েছি। 'কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায় ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়!' ওদের মধ্যে আমি। ওদের আনন্দে, ওদের বেদনায় আমি। ওরা দুই পায়ের যন্ত্রণায় কাঁদতে বসলে আমার চোখে জল আসে; নিঃশ্বাস টানতে না পারলে আমার নিজের দম আটকে যায়। ওরা শত সহস্র, ওরা প্রতি বছরের প্রতি ঋতুর,—কিন্তু ওরা যতকাল ধরে এসেছে এই পথে, আমার ধারা-বাহিক হৃদয়ও এসেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে, এসেছে আমার প্রাণ যুগ থেকে যুগে,

কল্প থেকে কল্পান্তে। ওরা সবাই আমারই অভিব্যক্তি, আমারই ইচ্ছা, আমারই একাগ্রতা। আমি এক, কিন্তু আমি বহু ওদের মধ্যে। একোঽহম্ বহুস্যাম্। আমি ওদের সঙ্গে অভিন্ন, অচ্ছেদ্য। ওদের সবাইকে মিলিয়ে আমারই জীবনের ব্যাখ্যা।

পিছনে গগনচুম্বী মহাহিমবন্তের অসংখ্য শিখরচূড়া, পুরাণে তা'রা কেউ নাম নিয়েছে কনককান্ত, মণিরত্নাভ, শোণিতশিখর, কেউ বা নাম পেয়েছে স্ফটিকপর্বত। ওদের নাম শুনে এক আবিষ্কার থেকে ভিন্ন আবিষ্কারে যেতে চেয়েছি কতবার। দুই চোখে দুই বাসনার প্রদীপ জ্বেলে জানতে গিয়েছি কোথায় সেই প্রাচীন হৈমবতের হারানো গিরিচূড়া,—একদা যাদের নাম ছিল কদম্ব-কুক্কুট, গোতম আর বাসব, শ্যামাঙ্গ আর শোভিতা! তা'রা আজও আছে, কিন্তু ভিন্ন নামে। ওদের অন্ধকার গুহাতলে আজও হয়ত সেই সেকালের বন্যশিকড়বিচ্ছুরিত দ্যুতি-শিখা জ্বলে,—যার হিরণ্য আভায় প্রাচীন হিমালয়ের সিংহশিকারী কিরাতের দল আর যক্ষ-রাক্ষসরা লুক্কায়িত রাখতো তাদের চীরবাসা অর্ধনগ্না রমণীগণকে! তুষারাচ্ছন্ন কৈলাশ আর মন্দারের প্রত্যন্তদেশে সেই 'অনবতপ্তার' জলরাশি,—পরবর্তী যুগে যার নাম হয়েছে মানস-সরোবর,—তুষারের পটভূমিতে যার হৃদয়ের উপর আজও ফোটে শ্বেত ও রক্তকমল। ওই গন্ধমাদন আর চিত্রকূটের আশেপাশে—ওই যে-অঞ্চলকে সেকালে বলা হোতো কিন্নরখণ্ড,—আজও কি সেখানে কলহাস্যমুখরিতা নিরাবরণা মোহিনীদের কণ্ঠস্বরে গুহাবাসী পশুরাজ সিংহ উচ্চকিত হয়? সর্বনাশিনী উর্বশী-মেনকারা কি আজও সুমেরুশিখরের আশেপাশে বিশ্বামিত্রদের তপোবনে খুঁজে বেড়ায়?

কিন্তু ব্রহ্মপুরার পথে চলে আজ তীর্থযাত্রীরা। পিপাসার্ত, ক্লান্ত-কাতর, স্বপ্নাবিষ্টচক্ষু,—উৎকণ্ঠ কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব। পিপীলিকাশ্রেণীর মতো তা'রা চলে,—যেন চিরকাল ধ'রে চলেছে। মুখ ফিরিয়ে নাও, আবার ফিরে তাকাও,—তা'রা চলেছে, কিন্তু যেন চলছে না; গতিশীল, কিন্তু গতিবেগ যেন নেই। তা'রা কখনও ভাগীরথী তীরে, কখনও অলকানন্দায়, কখন মন্দাকিনী আর বিষ্ণুগঙ্গায়, কখনও পিন্দারে আর নায়ারে, কখনও বা মূলগঙ্গায় আর নীলধারায়। বিরাটের পটভূমিকায় চলতে চলতে কতবার শুনেছি ওদের জীবনের ছোট ছোট ইতিহাস। সামনে ওদের নন্দাদেবী আর দ্রোণগিরির বিশাল চূড়া; ত্রিশূল আর নীলকণ্ঠ, বন্দরপঞ্চ ও শ্রীকান্ত অনন্ত গিরিশৃঙ্গমালা ওদের চারিদিকে, কিন্তু পিছন থেকে মাঝে মাঝে ওদের মোহবন্ধনের সূত্রে টান

পড়েছে। কেউ হারানো সুখের স্মৃতি এসেছে খুঁজতে, কেউ এসেছে জীবনের জ্বালা জুড়োতে। হয়ত দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে স্বামী, সুতরাং প্রথম স্ত্রী চলেছে তীর্থে। সন্তানের অভাবে সম্পত্তি যায় রসাতলে, মস্ত জমিদার চলেছে সন্তানকামনায়। সংসারের কোনো আখড়ায় ঠাঁই হয়নি, গোঁসাইজী চলেছে বৈষ্ণবীকে সঙ্গে নিয়ে! একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে, অশ্রুশিক্তা জননী চলেছে তার সমস্ত বেদনাকে সমগ্র হিমালয়ে প্রসারিত ক'রে দিতে। বিশ্বাসঘাতিনী নারীর মোহ ত্যাগ ক'রে ব্যর্থ প্রেমিক চলেছে দূর থেকে দূরান্তরে। সংশয়াচ্ছন্ন দার্শনিক চলেছে আত্মশুদ্ধির কামনায়। বৈরাগী চলেছে আত্মতাড়নায়। ওদের সঙ্গে চলেছে ভ্রাম্যমাণ, ব্যবসায়ী, ফকির, আতুর, বায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোক, নিষ্ঠাবতী গৃহিণী, নায়ক আর নায়িকা, পাঞ্জাবী আর দক্ষিণী, গুজরাটী আর মারাঠী, সাধু আর সন্ন্যাসী। কেউ ফেলে এসেছে ঘরকন্না, কেউ ভেঙে এসেছে অবরোধ, কেউ ছেড়ে এসেছে আরামের শয্যা, কেউ বা ছিঁড়ে এসেছে মোহবন্ধন।

ঐতিহাসিক যুগ ঠিক কবে থেকে ধরা উচিত আমি বলতে পারিনে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখছি, ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে ব্রহ্মপুরাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। একথা আমরা ভুলতে বসেছি যে, আধুনিক পাঞ্জাবের একটি অংশ, সমগ্র গাড়োয়াল সাহারানপুরের একটি অংশ, দ্রোণাচাযভূমি (আধুনিক দেরাদুন), কুর্মাঞ্চল (আধুনিক কুমায়ুন), সমগ্র পশ্চিম তিব্বত এবং পশ্চিম নেপাল—এই সম্মিলিত ভূভাগ নিয়ে ছিল ব্রহ্মপুরা। ইতিহাসের কোনো তারিখ নেই, শ্রুতি আর স্মৃতির অতীত, কেউ জানে না কবে বিশাল ভারতের রাষ্ট্রসংহতি এবং ঐক্যের সাধনা এই ব্রহ্মপুরায় প্রথম শুরু হয়। কেউ জানে না কবে এই ব্রহ্মপুরার প্রান্তে বসে মহাকবি ব্যাস সমগ্র বেদশাস্ত্রকে চার অংশে ভাগ করেছিলেন। তারপর ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখি, দক্ষিণ ভারত এসে প্রাধান্য নিয়েছে ব্রহ্মপুরার উত্তরাপথে। আজ সমগ্র গাড়োয়ালে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ পার্বত্য মন্দিরে দেখি, পূজারী, মহন্ত ও রাওল —প্রায় সকলেই পুরুষপরম্পরায় দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ। এর কারণ খুঁজতে গেলে বহু শতাব্দী পিছনে চ'লে যেতে হয়। সে যুগ হোলো বৌদ্ধ ভারতের সঙ্গে সনাতনীদের অধ্যাত্মবাদ-সঙ্ঘর্ষের যুগ। বৌদ্ধ যুগের জয়যাত্রা ঘটেছিল সমগ্র হিমাচলের স্তরে স্তরে। তারা তাদের চিহ্ন রেখে গেছে মঠে মন্দিরে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে। তারা জয় করতে করতে চ'লে গেছে হিমালয়ের পরপারে সমগ্র তিব্বতে, চীনদেশে, মঙ্গোলিয়ায় এবং জাপানে। আজও হিমালয়ের বহু অঞ্চলে—যেমন কাশ্মীরে, লাডাখে, কাংড়া-কুলুতে, পূর্ব পাঞ্জাবে, উত্তর

গাড়োয়ালে ও কুমায়ুনে, সমগ্র নেপালে, সিকিম, ভূটান ও উত্তর আসামের কোনো কোনো অঞ্চলে—কী দেখি? কী দেখি নাগা পর্বতে, লুসাই পাহাড়ে, মণিপুর অঞ্চলের পরপারে, ব্রহ্মদেশে এবং সিয়ামে-কম্বোজে-যেদিকে হিমালয়ের শিরাশিকড় নেমে গিয়েছে? এই হিমালয়কে কেন্দ্র ক'রেই প্রাচ্যবিজয়ী বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রা। দেখতে পাই হিমালয় এবং তিব্বত-অতিক্রান্ত মঙ্গোলীয় স্থাপত্যের সংখ্যাতীত কীর্তিকলাপ। যে-মন্দির এবং স্থাপত্য দেখি আমরা যোশীমঠে, বদরিকাশ্রমে, ত্রিযুগীনারায়ণে এবং আরো বহু স্থানে—তাদের সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্যের মিল অতি কম। যা দেখা আমাদের অভ্যাস তা আমরা দেখিনে। লাডাখের সঙ্গে সিকিমের মিল দেখি, যোশীমঠের সঙ্গে মিল দেখি তিব্বতের বৌদ্ধ গুম্ফার, মানস সরোবরের পথে খেচরনাথের সঙ্গে মিল দেখি উখীমঠের। এই বৌদ্ধ এবং মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যরেখা চলেছে শত সহস্র মাইল। এই রেখা পশ্চিম তিব্বত ছেড়েও গেছে আরো উত্তরে কৃষ্ণগিরি অর্থাৎ কারাকোরাম ছাড়িয়ে পামীর গিলগিট হিন্দুকুশ আফগানিস্তান ও পারস্য দেশ অবধি। দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, আর্য, তুর্ক, ইরানী, এদের উপর দিয়ে একে একে চলেছে বৌদ্ধের জয়যাত্রা। কিন্তু একদা এই ব্রহ্মপুরায় সমস্ত প্রকার ধর্মমতের পরীক্ষা চলে। শৈব শাক্ত জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব—সমস্ত। গুরু নানক, কবির, মহাবীর, রামানুজ, শঙ্কর, দীপঙ্কর, তুকারাম, কেউ বাদ যায়নি। ব্রহ্মপুরা হোলো সেই আদিম কষ্টিপাথর, যেখানে যুগে যুগে হিন্দু জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অধ্যাত্মদর্শন, ধর্মমত ও বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষা হয়ে এসেছে। রামায়ণের সংস্কৃতি এসে এই ব্রহ্মপুরাকে অধিকার করতে চেয়েছে—রামপুর, রামওয়াড়া, রামগঙ্গা, হনুমানচটির রাম মন্দির, অগস্ত্য মুনি, রামনগর, লছমনঝুলা, ভরত ও মুনি-কি-রেতীর তপোবনস্থিত শত্রুঘ্ন মন্দির তা'র প্রমাণ। তারপর এসেছে মহাভারত। হরিদ্বারের ভীমগোড়া থেকে তা'র আরম্ভ। দ্রোণভূমি তা'র পাশে। এগিয়ে গেলে ব্যাসগুহা ও গঙ্গা। মন্দাকিনীর ধারে ভীম সেন ও বলরাম এবং উখীমঠ। বিষ্ণুপ্রয়াগের পরে পাণ্ডুকেশ্বর। পিন্দার ও অলকানন্দায় কর্ণপ্রয়াগ। তারপর বদরিনাথ ছেড়ে স্বর্গারোহণী পথ। এছাড়া কেদারখণ্ড ও শিবপুরাণের আগাগোড়া আধিপত্য। বৌদ্ধযুগে এসে প্রাধান্য লাভ করেছে ব্রহ্মপুরার একটি অতি দুস্তর পার্বত্য অঞ্চল। হরিদ্বার থেকে তা'র আরম্ভ। কেদারনাথে যাবার পথে বাঁ দিকে গুপ্তকাশী এবং ডানদিকে মন্দাকিনীর পারে উখীমঠ। এদেরই কেন্দ্র করে নালাচটি ও বেথুয়া চটির চারিদিকে এককালে বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধস্তূপ এবং বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। এখানকার প্রসিদ্ধ জয়স্তম্ভের সঙ্গে বৌদ্ধস্তূপের সৌসাদৃশ্য দেখলে

থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, স্বয়ং বদরিনাথ অঞ্চল ছিল বৌদ্ধপ্রধান।

কিন্তু আমার জ্ঞান ও বিদ্যা সামান্য। আমি কেবল দেখে বেড়িয়েছি, কিন্তু বিচার করিনি। বর্ণনা করেছি বার বার, কিন্তু বিশ্লেষণ করিনি। একালে ব্রহ্মপুরার সীমানা সঙ্কীর্ণ হয়েছে; তা'র নাম বদলে রাখা হয়েছে গাড়োয়াল। কিন্তু তবু তা'র প্রাচীন প্রকৃতি আজও হারায়নি। এই ব্রহ্মপুরায় এলে, এর তীর্থপথে অভিযান করলে, এর দুর্গম পার্বত্য চড়াই আর উৎরাইতে পা বাড়ালে—কেউ আর কারো অপরিচিত থাকে না। একজন যেন আরেকজনের কতকালের বন্ধু। একই শিক্ষা, একই সংস্কৃতি, একই ভাবনা নিয়ে সবাই চলে। হাজার হাজার নরনারী—যারা তীর্থযাত্রী, সবাইকে মিলিয়ে একই পরিবার। পুরুষের আড়ষ্টতা নেই, মেয়েদের পর্দা নেই, যৌবনের লজ্জাজড়তা নেই। একই আহার, একই স্থানে চালার তলায় রাত্রিবাস, একই পথে সকলের মিলন। হাসি তামাসা ও আনন্দের একই বিষয়, একই দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা ও কায়ক্লেশে প্রত্যেক পরস্পর অপরিচিত যাত্রীর সমবেদনা জ্ঞাপন। পদে পদে পথে পথে দেখেছি হৃদয়ের সুর দিয়ে মেলানো পাঞ্জাব আর বাঙলা, বিহারী আর মারাঠী, তামিলী আর আসামী, সিন্ধী আর মাদ্রাজী। কী আশ্চর্য ঐক্য সমগ্র ভারতের! মন্ত্র, বিদ্যা, পূজা, প্রণাম, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, আচার ও ব্যবহার,—আশ্চর্য সমন্বয়। যার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই, তার কাছে সাহায্য পাচ্ছি পরমাত্মীয়ের মতো। যার সঙ্গে কখনো কথা বলতে ভরসা হতো না রেলগাড়ির কামরায়, এখানে তাদের মধ্যে গায়েপড়া গলাগলি। হোক সম্পূর্ণ অপরিচিত, কি মেয়ে কি পুরুষ,—একজন অবলীলাক্রমে আরেক-জনের হাত ধরে এগোয়, কষ্টের সময় জলপান করায়, রান্নায় সাহায্য করে, শয়নের জন্য শয্যা বিছিয়ে দেয়। কেউ কারোকে চেনে না, এক মিনিটেরও পরিচয় নেই, একজনের ভাষা অন্য জন জানে না, কিন্তু পরমাশ্চর্য নদীমেখলী পার্বত্য-শোভার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে গেল দুই অপরিচিত মেয়ে আর পুরুষ, পথশ্রমের মধ্যেও হাসি ফুটলো দুজনের মুখে, সাঙ্কেতিক ভাষায় কুশল-বার্তা বিনিময় হলো। তারপর ওই বিশাল পটভূমির নীচে দাঁড়িয়ে দুজনের ক্ষণকালের বন্ধুত্ব চিরকালের নিবিড় স্পর্শ রেখে চ'লে গেল।

কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের কৃষ্ণগিরি, দ্বারকা থেকে ব্রহ্মদেশ, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অখণ্ড ভারতের যে ক্ষুদ্র মহাদেশ; তা'রা গিয়ে পৌঁছয় ওই গঙ্গাপথে, ওই ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালে। সকল মত সকল পথ মিলেছে ওখানকার ওই মন্দিরে আর তপোবনে, ওই গঙ্গা ভাগীরথী অলকানন্দা মন্দাকিনীর কূলে

কূলে। দেবতাত্মা হিমালয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা পূজ্য এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বন্যশোভাময় ভূভাগ হলো এই অবিভক্ত গাড়োয়াল। বহুকালের প্রচারকার্যের দ্বারা কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ ব'লে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। কিন্তু দুই চোখ মেলে যারা কাশ্মীর এবং গাড়োয়ালকে বিচার করেছে, তা'রা জানে, গাড়োয়ালে অসংখ্য ভূস্বর্গের ছড়াছড়ি। বহির্ভারতীয় পর্যটকরা কাশ্মীরে গিয়ে সুইজারল্যাণ্ড অথবা আলপাইন আবহাওয়াকে খুঁজে পায় তাই তা'রা কাশ্মীরের সুখ্যাতিতে শতমুখ। কিন্তু কাশ্মীরী হিমালয়ে দেবতাত্মার স্বাদ কম। কৌতুকে আনন্দ-পরিভ্রমণে, সুযোগ সুবিধায়, বিলাসে ও ব্যসনে—কাশ্মীর আধুনিক ভ্রাম্যমানদের কাছে অতীব আরামদায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু গাঙ্গেয় ব্রহ্মপুরায় প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে আজও আধুনিক কালের বিজ্ঞান-সভ্যতা আত্মশ্লাঘা প্রচার করে না। এ যেন অনন্তকালের আধুনিক, লক্ষ লক্ষ বছরেরও বেশী আধুনিক, এক খণ্ড অনন্তকালকে যেন এ আপন সর্বাঙ্গে ধ'রে রেখেছে। এখানে এলে চোখে পড়বে ভারতের মৌলিক প্রতিভা, ভারতের আদি সংস্কৃতি, ভারতের সর্বকাল-জয়ী সংহতি মন্ত্র। এখানে সুখ নেই, আছে আনন্দ। আরাম নেই, আছে অনন্ত মধুর অবকাশ। পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার নেই, আছে বিদুরের খুদ। কাশ্মীর হলো কোটপ্যাণ্ট; ব্রহ্মপুরা হলো গেরুয়া। গেরুয়া নিয়ে কাশ্মীরে গেলে সেখানকার লোকে একটু অবাক হয়; কোটপ্যাণ্ট প'রে সাহেব সেজে ব্রহ্মপুরায় এলে নিজেকে বেমানান মনে হ'তে থাকে। ওখানে ভোগ, এখানে ত্যাগ। ওখানে ধনাঢ্যতার প্রাধান্য, এখানে নিঃস্বতার গৌরব। সর্বত্যাগী সাধুরা যাতে সর্বনীতিভ্রষ্ট ভিখারীতে পরিণত না হয়, সেজন্য এই ব্রহ্মপুরাতেই পুরুষশ্রেষ্ঠ 'কালী কম্বলী বাবার' আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি এখানে দেখেছিলেন জীব মাত্রই শিব, নর মাত্রই নারায়ণ। গোমুখী গঙ্গোত্তরী উত্তরকাশী অন্নপূর্ণা বৃদ্ধ কেদার ভৈরবনাথ কিংবা অসি-বরুণা-ভাগীরথী সঙ্গমে, সর্বত্র ওই একই কথা কেদারনাথে, বদরিনাথে, তুঙ্গনাথে, ত্রিযুগীনাথে কিংবা কমলেশ্বরে, গোপেশ্বরে, পাণ্ডুকেশ্বরে—একই পাথরের মন্দির সর্বত্র। কিন্তু প্রতি মন্দিরের বেদীমূলে নিত্য প্রণাম নিবেদন করছে যুগে যুগে ভারতের মহাজনতা!

॥ ২ ॥

আসামের পূর্ব প্রান্তে গিয়ে দেবতাত্মা হিমালয়ের জটা স্তরে স্তরে যেমন খুলে ঝুলে পড়েছে দক্ষিণে—যেমন সে-অঞ্চলে তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা পাট-

কাই, লুসাই, গারো, নাগা, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া—ইত্যাদি নামে পরিচিত, তেমনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারতেও হিমালয়ের জটিল জটারাশি নেমে এসেছে হিন্দুকুশের দক্ষিণ ভূভাগে। তারা নানা পর্বতমালার নানান শ্রেণীতে এবং বিভিন্ন নামে আমাদের কাছে পরিচিত। যেমন চিত্রলের শস্যশ্যামল এবং সুশোভাসম্পন্ন সুন্দর উপত্যকার কাছে কোহিস্তান ও কাফ্রিস্তান, পঞ্চশির ও সফেদকো,—তারপর পাঘমান, টোচিখেল, মীরনশা,—এবং তারপর পর্বতের নানা শাখা চলে গিয়েছে সুলেমান পর্বতমালার দিকে। এরা সুপ্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুকুশ এবং হিন্দুরাজ পর্বতমালার শাখা-প্রশাখা রূপেই পরিচিত। ভারত সীমান্তে এরা চিরকালই প্রায় অচিহ্নিত রয়ে গেছে এবং কাশ্মীর প্রদেশের সীমানারেখা নিয়ে ভারতবর্ষও শত শত বছরের মধ্যে কখনও মাথা ঘামায়নি। একথা বেলুচিস্তানে, গিলগিটে, পামীরে, সমগ্র কাশ্মীরে এবং আসামের দিকে চীন ও ব্রহ্মের সীমানাতেও সত্য। যা চলে এসেছে এতকাল, তাই চলছে। আজও তিব্বত-ভারত সীমানা, গিলগিট সীমানা, হিন্দুকুশ-কাশ্মীর সীমানা, ভূটান-তিব্বত সীমানা,—এরা খুব স্পষ্ট নয়। এরা রাষ্ট্রীয় কারণে কোনোদিন সমস্যাসঙ্কুল ছিল না বলেই ভারতবর্ষ এতকাল উদাসীন ছিল। একথা বহু জায়গায় প্রমাণসিদ্ধ হয়ে আছে যে, সমগ্র হিমালয় তা'র শাখাপ্রশাখা নিয়ে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। কিন্তু বিভ্রাট বেধে রয়েছে সংখ্যাতীত উপত্যকা এবং অধিত্যকার সমষ্টি নিয়ে। যারা বলে, ধর্ম-বিশ্বাস থেকে রাষ্ট্রসীমানার উৎপত্তি তারা নিতান্ত ভুল বলে না। ধর্মানুষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদ এবং ক্রিয়াপ্রক্রিয়া থেকে সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-বিচার বদলাতে থাকে। যেমন বৌদ্ধ তিব্বত ও শৈব ভারতের মধ্যে পার্থক্য; যেমন তুর্ক-ইরানীর সঙ্গে আর্যজাতির প্রভেদ। এই প্রভেদ থেকেই ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছে রাষ্ট্রসীমা। কেউ এসে জায়গা পেয়েছিল হিমালয়ের উপত্যকায়, কেউ দখল করেছিল অধিত্যকাভূমি। এইভাবেই পরস্পর আপন আপন অধি-কারের সীমানা প্রসারিত করে এসেছে, এবং এই সীমানা থেকেই অচিহ্নিত রাষ্ট্রসীমানা স্থির হয়ে এসেছে এতদিন। পশ্চিম তিব্বতের একটা অংশের উপর ভারতের অধিকার কবে থেকে ঘুচল, এটা এ যুগের গবেষণার বিষয় বৈকি। চিত্রলরাজ্যের সঙ্গে কাশ্মীরের বিচ্ছেদ কবে এবং কা'র জন্য ঘটলো, এ প্রশ্ন কেউ আর করতে চায় না।

গান্ধার থেকে যদি কান্দাহার হয়ে থাকে, এবং পুস্ত ভাষার প্রথম পাঠ যদি এসে থাকে সংস্কৃত ভাষা থেকে তবে ভারতের সাংস্কৃতিক সীমানা আফগানিস্তান অবধি প্রসারিত সন্দেহ কি! কে না জানে গান্ধার প্রসারিত ছিল পারস্যের

আংশিক ভূভাগ অবধি,—আফগানিস্তানের জন্ম এই ত' সেদিন! যেমন একদা সিন্ধু ওরকে হিন্দুদেশের সীমানা প্রসারিত ছিল দক্ষিণ পারস্য অবধি। আর হিমালয়কে কেন্দ্র করেই ত' ভারত সভ্যতার বিস্তার! হিমালয় থেকে নেমে এসেছে নদী, আর সেই নদীর ধারার সঙ্গে আর্য-সংস্কৃতি। ইদানীং এই সংস্কৃতির এক প্রান্ত বেষ্টন ক'রে আছে সিন্ধুনদ, অন্যপ্রান্ত ব্রহ্মপুত্র নদ। ওদেরই আশে পাশে নেমে এসেছে পূর্ব-পশ্চিম হিমালয়ের শাখা-প্রশাখা।

পেশাওয়ার রওনা হবার সময় এই মানচিত্রটা ছিল আমার মনে। আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের প্রান্ত দেখে আসা। জানি লক্ষ্যটা অস্পষ্ট, এবং অনিশ্চিতও বটে। কিন্তু উদ্দীপনাটা ত' অনিশ্চিত নয়। হিমালয়ের জটা-জটিলতা তার অন্তহীন পর্বতমালার ভিতর দিয়ে কতদূর অবধি প্রসারিত, এটা জানা মন্দ কি! হিন্দুকুশের নানা স্তর, চিত্রলের স্বপ্নরাজ্য, কারাকোরাম গিরিশৃঙ্গদলের মধ্যে অসংখ্য নিরুদ্দেশ মন্দির ও গুম্ফা, অগণিত ইতিহাসের 'অর্থলুপ্ত অবশেষ'—এরা যদি নিরন্তর আকর্ষণ করতে থাকে, তবে কেনই বা উদ্দীপনা খুঁজে পাব না। তা ছাড়া হিমালয় সম্বন্ধে আমার আন্তরিক অধ্যবসায়টা হলো সহজাত। শৈশবে রূপকথার রাজপুত্রের গল্প যখন শুনতুম, তার মধ্যে হিমালয়ের নামটা শুনতে পেতুম না। ওটা আমার মনে থাকতো উহ্য একটা প্রশ্নের আকারে। গল্পটার প্রধান বক্তব্য, রাজপুত্র ঘোড়ায় চ'ড়ে চলেছে, কটিবন্ধে তার তরবারি। কত প্রান্তর, কত অরণ্য, কত নদ ও নদী,—এমন কি সাত সমুদ্র এবং তেরোটি নদী পার হয়ে সাতশো রাক্ষসীর দেশ—রাজপুত্র সমস্তই অতিক্রম করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বুঝলুম, রূপকথায় সবই আছে, নেই কেবল হিমালয়! না থাকার কারণ আছে বৈকি। বাঙ্গালীর পরিকল্পনা এক বস্তু, কায়িক শক্তি ভিন্নপ্রকার।

রাত আন্দাজ ন'টার সময় রাওয়ালপিণ্ডি ছাউনী স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লো পেশাওয়ারের দিকে। সেদিন কনকনে শীতের রাত। অজানা দেশ, অজানা পার্বত্য-পথ উত্তর অঞ্চলে প্রসারিত। সে যাই হোক, গাড়ি ছাড়লো বটে, কিন্তু যেন চলতেই চায় না। ক্লান্ত চাকায় এরই মধ্যে তার ঘুম জড়িয়ে এসেছে। বাইরে কিছু দেখা যায় না, কৃষ্ণকায়া রাত্রি যেন অন্ধের মতো চোখ বুজে রয়েছে। গাড়ির নীচে চাকার ঘন-ঘর্ষণ কান পেতে শুনলে দুর্ভাবনার সঙ্কেত আনে। বিশালকায় তুর্ক-ইরানী জাতির আফ্রীদীরা যখন লাল টসটসে আপেল চিবোয়, তখন তাদের দুই চোয়ালের ঝকঝকে দাঁতের পাটির ঘর্ষণে এমনি আওয়াজ বেরোতে থাকে। কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে আমার মতো নাবালক বাঙালীর ভয় করে। সেই রাত্রে গাড়ির মধ্যে যে দু-চারজন সহযাত্রী

আমার সঙ্গে চলেছে, তা'রা যে আমার এই ভারতবর্ষেরই মানুষ, তা জানি বৈকি। কিন্তু তবুও তারা অজানা। আমার ধ্যানধারণা চিন্তা অভ্যাস— আমার কোনটার সঙ্গেই তাদের মেলাতে পারিনে। ওদের গায়ের গন্ধে আর ওদের নিশ্বাসে যেন পাই এ-অঞ্চলের রহস্য-ইতিহাস। শক, হুন, তুর্কী-তাতার, এমন কি গ্রীকবিজয়ের কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে নাদির শা, চেঙ্গিস খাঁ কিম্বা গজনীর মামুদকে। দেহ যেমন বিরাট, তেমনি আশ্চর্য টানা চোখ, সেই চোখে অনেক সময়েই সুর্মা-টানা। ছাঁটা দাড়িতে প্রায়ই মেহেদির রং করা, ছাঁটা গোঁফ ধারালো ছুরির ফলার মতো। বাহু যেমন দীর্ঘ তেমনি কঠিন এবং তার অগ্রভাগের আঙ্গুলগুলো দেখলে ভয় করে। সত্যি কথা বলতে কি, ভয় চলে আমার সঙ্গে সঙ্গে। নতুন জায়গার নামে আমি ভয় পাই। কিন্তু ভয়ের থেকেই আমার সমস্ত উদ্দীপনার জন্ম। সেই তন্দ্রাস্তিমিতগতি ট্রেনের মধ্যে ব'সে আমার সর্বশরীরে শীতের যে কাঁপন থরথর করছিল, সেটার সমস্তটা ঠাণ্ডার থেকে নয়, ভয়ের থেকেও। দুপাশের ঘন অন্ধকারের মতোই আমার যাত্রা-পথটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভরা। গাড়ির ভিতরের আলোটা দুর্ভাগ্যবশত নিষ্প্রভ বলেই সমস্তটা যেন সংশয়াচ্ছন্ন। তার ওপর দেওয়ালে পড়েছে এই দানবীয় দেহগুলির ছায়া। ওদের প্রত্যেকের পাশে এক একটি গড়গড়া। তামাকু সেবনের আয়োজন ওদের সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। কিন্তু তার বড় বড় চিমটাগুলি লোহার শিকলে বাঁধা থাকে এবং তাদের ধারালো ছুঁচলো ফলা-গুলির দিকে তাকালে মাঝে মাঝে গলা শুকিয়ে ওঠে।

তবু আমাকে যেতে হবে, এই হলো আমার নিয়তির নির্দেশ। কাফ্রিস্তানের সঙ্গে কোহিস্তান কোথায় কোন্ পাহাড়ে মিলেছে, এ আমার দেখা চাই বৈকি। আমার ছোটবেলাকার সেই ভূগোলে পড়া কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী গিলগিটের উত্তর দিয়ে এসে কোথায় মিলেছে হিন্দুকুশ পর্বতমালার সঙ্গে সেই দৃশ্য না দেখলে আমার চলবে কেন? ওদেরই দক্ষিণ ভূভাগ দিয়ে এসেছে সিন্ধুনদ। কৈলাশ পর্বতমালার থেকে যাত্রা করেছে সিন্ধু, তারপর গিরিগুহাতলের ভিতরে হারিয়ে গিয়ে আবার ছুটেছে লাডাকের আশেপাশে, তারপর গিয়েছে উত্তুঙ্গ নাঙ্গা পর্বতের তলা দিয়ে গিলগিটে—যেখান থেকে বহুদূর উত্তরে চোখে পড়ে রুশ রাজ্য, আর দক্ষিণে ভারত—সেখান থেকে হুনজা আর দক্ষিণ পামীর হয়ে এসেছে হাজরা জেলায়—তারপরে এই আমি যে পথ দিয়ে চলেছি অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

তক্ষশীলায় নামবার কথা ছিল। ওখান থেকে হাভেলিয়ান এবং আবোট্টাবাদ যাবার সুবিধা আছে। একথা মনে আছে, তক্ষশীলার যাদুঘরের দায়িত্ব নিয়ে

যিনি আছেন তিনি বাঙালী। মোট দুই ঘর বাঙালী আছেন তক্ষশীলায়। কিন্তু আগে থেকে খবর পাঠানো হয়নি বলেই নামা হল না। তক্ষশীলা থেকে ট্রেন আবার চললো আটক-এর উদ্দেশে। আটক-এর আগে পড়বে ক্যাম্বেলপুর। ক্যাম্বেলপুর থেকে পশ্চিমে যাওয়া যায় কোহাট এবং দক্ষিণে সোজা সিন্ধুনদের তীরে তীরে সমগ্র পাঞ্জাব সীমান্ত পেরিয়ে মুলতান বাহ্বালপুর রাজ্য ছাড়িয়ে সিন্ধুদেশে। কিন্তু আমার দরকার ছিল হিমালয়ের শাখাপ্রশাখাকে জানা। এ দৃশ্য চোখে দেখে আসা দরকার যে, হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম মিলিয়ে পূর্ব আফগানিস্তান পযন্ত যে বিরাট ভূভাগ—হাজার বছর আগে জয়পাল রাজবংশ ছিল তার অধিপতি। আমার খুঁজে বেড়ানো দরকার কোহিস্তান আর হিন্দুকুশ জুড়ে হিমালয়ের গুহা-গহ্বরের আশেপাশে, কাবুল আর কুনার নদীর তীরে তীরে সেকালের রাজবংশের অগণিত নরকঙ্কাল বালু-কাঁকর-পাথরের তলায় আজও চাপা প'ড়ে রয়েছে। কৌতূহল আমাকে নিয়ে গেছে একপথ থেকে অন্যপথে চিরদিন!

সুতরাং অনিশ্চিত, এবং অনিশ্চিত ব'লেই আশঙ্কা। ক্যাম্বেলপুর অবধি গাড়ি থামবে, তারপর গভীর রাত্রে কোথাও এ গাড়ি থামবার হুকুম নেই। নিতান্ত দরকার যদি থাকে এবং বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত হয়, তবেই রাত্রের দিকে এ লাইনে স্ত্রীলোকের ভ্রমণ সম্ভব। তাও বলা আছে, সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে অক্ষম। লোভ এবং নষ্টামির কথা এখানে আসে না, এটাও এক ধরনের প্রয়োজনের কথা। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব আফগানিস্তান অবধি পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম। যাদের ঘরে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু বেশী, তারাই নাকি সমাজে অভিজাত ব'লে পরিচিত। ওরা অমিতশক্তিশালী ইংরেজের জগৎজোড়া সামরিক আয়োজনের কাছে কোনদিন বশ্যতা স্বীকার করলো না, কিন্তু একটি দরিদ্র ও গৃহকর্মনিপুণা হরিণ-নয়নার মধুর শাসনের কাছে ওরা চিরকাল ক্রীতদাস হয়ে রইলো। ওরা যখন লুট করে, তখন সকলের আগে আনে মেয়ে। স্বভাবে ওরা লক্ষ্মীছাড়া ব'লেই কারো সুখের ঘর ওদের চোখে কিছুতেই সয় না। তাই ওরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের আক্রমণ ক'রে সকলের আগে তাদের ঘরকন্না জ্বালিয়ে দেয় এবং মেয়েছেলেকে লুট ক'রে এনে তার পায়ের তলায় প'ড়ে ভালোবাসার জন্য মাথা কুটতে থাকে। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মারী পাহাড়ের পথে যাবার সময় দেখেছিলুম একটি কটাক্ষহানা যুবতীকে তুষ্ট করার জন্য অন্তত একশত পুরুষের চোখে মুখে কী উৎকণ্ঠা। মোটর ড্রাইভার ভাড়া নেয়নি, পথের দোকানদার বিনামূল্যে খাবার জুগিয়েছে, ভিখারী আনন্দে গান শুনিয়েছে, কুলিরা তার

মোট বয়ে দিয়েছে, কিছু সেবা তার করতে পারলে সবাই যেন পরম কৃতার্থ। দেশে মেয়ে নেই। মেয়েকে তাদের বড় দরকার।

মধ্যরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠলো। আবছায়া মলিন আলো, হিম-কুয়াশায় বাইরের সমস্তটাই অস্পষ্ট। কিন্তু সেই অস্পষ্টতার মধ্যেই ছায়ামূর্তিরা চোখে পড়ে। বালু আর পাথরের উষর পাহাড়ের শ্রেণী—জনপদের চিহ্ন কোথাও নেই। পাহাড়ে পাহাড়ে কোন ফলন নেই, কোথাও নেই স্নেহের ছায়া। জল, মাটি, আশা, আশ্বাস—কোথাও কিছু চোখে পড়ে না। কাঁটা-লতা আর বনখেজুরের ঝোপ-ঝাড়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত চোখ আবার নিজের কাছেই ফিরে আসে। কে জানে, আজ হয়ত সে-অঞ্চলের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

ক্যাম্বেলপুর থেকে গাড়ি ছেড়ে গেল আটক-এর দিকে। এটা গোরা ছাউনি,—কিন্তু অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না। কান সজাগ থাকলেই শোনা যায় অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনা, গুলী-বারুদের বাক্স টানাটানি। অথবা তামাকের গড়গড়ার সঙ্গে লোহার শিকলে বাঁধা চিমটার আওয়াজ। এমন একটা গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, যেটা হিন্দুস্থানবাসীদের কাছে অপরিচিত; যে-গন্ধটা ওদের তামাকে, স্বভাবে, বন্যতায়, হিংস্রতায় এবং পার্বত্য রুক্ষতায় মিলে মিশে রয়েছে। আমরা আটকের দিকে এগিয়ে এসেছি, এর পরেই সিন্ধুনদের পুল। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডির ব্রাউনলো স্ট্রীটের সেই মেস-বাড়ির আড্ডা এবং অতঃপর সেই ওয়েস্ট-রীজের কাছে থাকাকালে শুনে এসেছি, এ অঞ্চলের সীমানাটা কেবল যে অনিয়ন্ত্রিত তাই নয়, অচিহ্নিতও বটে। কোহিস্তানের পর্বতমালার নীচে দিয়ে সশস্ত্র আফ্রীদীরা কাবুল নদী পেরিয়ে আটক পুলের আশেপাশে নাকি লুণ্ঠন করতে আসে। ইতিহাস বলে, ঠিক এইখানে পৌঁছে একদা গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। আফ্রীদীরা লুট করে ট্রেন, শস্যক্ষেত্র, অস্ত্রশস্ত্র, ধনরত্ন এবং পরিশেষে স্ত্রীলোক—যদি হাতের কাছে পায়। গুহাগহ্বরে ওরা থাকে লুকিয়ে, থাকে কাঁটা-ঝোপের আশেপাশে —সেখান থেকে রাইফেল ছোড়ে এবং কে না জানে, লক্ষ্য তাদের অব্যর্থ। একশো বছর ধ'রে ওরা হায়রান করে এসেছে ইংরেজকে—কামান, বিমান, বোমা-বন্দুককে ওরা থোড়াই কেয়ার করেছে। ওদের কাছে মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি—এসব তুচ্ছ। নিত্য অশান্তি আর আক্রমণ ওদের গা-সওয়া। প্রকৃতির কাঠিন্য ওরা এনেছে হিমালয়ের পাথরের থেকে, স্বভাবের রুক্ষতা পেয়েছে উষর ধূসর কঙ্করপ্রান্তরের উত্তরাধিকারসূত্রে থেকে। ওরা মার খেয়ে হয় মরেছে, নয়ত পালিয়েছে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি। ওরা গুলী করেছে সহোদরকে, সন্তানকে, পিতাকে, কিন্তু স্বাধীনতার মর্যাদাবোধ ছাড়েনি, উচ্ছৃঙ্খলতার মধুর

আস্বাদ ছেড়ে ভদ্র-সভ্যতার আশেপাশে মুষ্টিভিক্ষার জন্য হাত পেতে বেড়ায়নি। ওরা চিরকাল ধ'রে শুনে এসেছে ওরা বর্বর, ওরা নির্দয়, ওরা সভ্য-সমাজের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়, ওদের কোন সমাজ নেই, কোন সংস্কৃতি নেই। এই অপযশের কালিমা ওরা এতকাল ধ'রে বহন করে এসেছে, কিন্তু তবু ইংরেজের কাছে ওরা আত্মবিক্রয় করেনি। ভয় থেকে অশ্রদ্ধার জন্ম—কে না জানে। একজন ইংরেজ টমি একজন দীর্ঘকায় আফ্রীদীর পাশে দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপে। এত ক্ষুদ্র, এত সামান্য তার কাছে। ইংরেজ ওদেরকে ভয় করতো বলেই অশ্রদ্ধেয় প্রচারকার্য করে বেড়াত। আফগানীদের সঙ্গে ওদের বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে এবং সীমান্ত পাহারা দেবার কূটনীতিক কারণে ইংরেজ ওদের মাঝখানে টেনে দিল ডুরাণ্ড লাইন। কিন্তু তাতে রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক—কোন বিচ্ছেদই ঘটতে পারলো না। লাণ্ডিকোটালের সরাইখানায় যদি আজও একজন আফগানী এসে দাঁড়ায়, তবে সে আপন মানুষকেই খুঁজে পায়, পরদেশী সে নয়। যেমন আজ কলকাতার মানুষ র‍্যাডক্লিফ লাইন পেরিয়ে ঢাকায় গিয়ে দাঁড়ালে নিজের মানুষকেই চিনতে পারে। স্বজনবিচ্ছেদ সাধনের এই কুকীর্তি ইংরেজের পক্ষে নতুন নয়। আয়ার্ল্যাণ্ডে, প্যালেস্টাইনে, সুয়েজে, বোর্নিয়োতে, কোরিয়ায় এবং আরো বহু জায়গায়—যেখানে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ওপর সূর্য কখনো অস্ত যেত না।

গা ছমছম করতে লাগলো, যখন চেয়ে দেখলুম ক্যাম্বেলপুরের পর থেকে আমার কামরায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। সিন্ধুনদের পুল পেরিয়ে গাড়ি চললো পশ্চিমের দিকে। পিছন থেকে ক্ষয়-ক্ষত ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় পাহাড়ে পাহাড়ে একপ্রকার মালিন্য ফুটে উঠেছে, যেটাকে স্বপ্ন-নিমীলিত ভাব বললে ভুল হবে, ওটা যেন একপ্রকার মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। হিমালয়ের আর কোথাও এমন নির্জীব অসাড়তা আমার চোখে পড়েনি। পার্বত্যপ্রকৃতির এমন একটা কুটিল বিদ্বেষ এবং হিংস্র ভ্রুকুটি অন্য কোথাও সহসা দেখাও যায় না। আমার ক্লান্তি ছিল অজস্র, যত ঘুম যেখানে আছে, আমাকে ঘিরে ধরছিল। কিন্তু ঘুম এলেই দুর্ভাবনা আসে সঙ্গে। নিদ্রা মানেই ত' পরনির্ভরতা, যাকে বলে আত্মবিলোপ। নিজের উপরে দখল রাখার জন্যই জেগে থাকা চাই। সুতরাং চোখ দুটো আমাকে বড় বড় ক'রে সমস্ত হিমাচ্ছন্ন রাতটা জেগে থাকতে হলো। জানলার বাইরে একাগ্র চোখে তাকিয়ে বাইরে ওই হিমাদ্রী রাত্রির মৃত্যুমলিন যে চেহারাটা নিষ্প্রাণ পার্বত্য প্রান্তরের উপর দিয়ে দেখে যেতে পারলুম,—কে জানে, আর কোনদিন হয়ত এই অবাস্তব দৃশ্যটা আমার চোখে পড়বে না।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর আন্দাজ সময়ে নওশেরা পেরিয়ে গাড়ি চললো। সেই তেমনি অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা তেমনি ভীতি উৎপাদন করে। হয়ত শীর্ণ দুর্বোধ্য কারো কণ্ঠস্বরের ভগ্নাংশ, স্বল্পান্ধকারে কোন অতিকায় ছায়ামূর্তির আনাগোনা, জুতোর নীচেকার লোহার নালের চকিত ঘর্ষণ,—তারপর সব চুপ। দূরের থেকে গার্ডের বাঁশি এবং তারপরে আবার বীভৎস এঞ্জিনের আওয়াজ দিয়ে ট্রেনের প্রবল একটা ঝাঁকুনি। গাড়ি ধীরে ধীরে চলে।

ভাবতে ভালো লাগছে, মহাভারতের গান্ধার রাজ্য অতিক্রম ক'রে চলছি। চন্দ্রবংশীয়দের সেই রাজত্বকাল,—যখন তাদের রাজধানীর নাম ছিল পুরুষপুর, অর্থাৎ আধুনিক পেশাওয়ার। তার পর এখানে এসে দাঁড়ায় বৌদ্ধসভ্যতা; অসংখ্য বৌদ্ধশাস্ত্রকারের পুণ্য জন্মভূমি। পুরুষপুর ছিল আর্যাবর্ত ও বৌদ্ধ সভ্যতার লীলানিকেতন। শত শত বৌদ্ধমঠ ও দেউল একদা এই ভূভাগকে তীর্থস্থানে পরিণত করেছিল। গ্রীক-বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রথম জন্ম হয় এ অঞ্চলে,—ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রথম জন্মভূমি এই গান্ধার।

পেশাওয়ার গোরা ছাউনীতে গাড়ি যখন এসে পৌছলো, তখন ভোর হয়েছে। উষার প্রথম পাণ্ডুরেখাটা আমার চোখে পড়েনি। চোখ বুজে আমার ক্ষুধার্ত মন ছুটে চ'লে গিয়েছিল দেড় হাজার মাইল দূরে—যেখানে আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় চৌধুরীদের বাড়ির একজোড়া নারকেল গাছ, তার নীচে শিউলীর ঝাড়। প্রভাতের প্রথম আলো ওদেরই ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়। আশ্চর্য, পথে নামলে ঘর আমাকে টানে; ঘরে গিয়ে ঢুকলে পথের আনন্দ আমাকে স্থির থাকতে দেয় না।

ঠাণ্ডা জড়িয়ে ধরেছে। বুঝতে পারি ওভারকোটের নীচে একটা পুল-ওভার থাকলে এখানে কাজ দিত। পা দুখানা শীতে আড়ষ্ট হয়ে জমে গেছে, কিছুক্ষণ চলাফেরা না করলে শরীরে উত্তাপ আসবে না। অনেক চেষ্টায় সকলের আগে এক বাটি চা সংগ্রহ করা গেল। গোরা-ছাউনী স্টেশন কিছু ভদ্র, সিটি স্টেশন যেমন নোংরা, তেমনি ময়লা মানুষের ভিড়। এখানে পুলিস সাহেব আছেন তিনি বাঙালী, তাঁর ছেলের সঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডিতে কাটিয়েছি কিছুদিন। তাছাড়া আছেন একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী ডাক্তার—তিনি বিশেষ অতিথিসেবাপরায়ণ। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ। তাঁর প্রভাব, প্রতাপ এবং প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলে সর্বজনবিদিত। সৈন্যবিভাগে এবং সামরিক হিসাব বিভাগে কিছু কিছু বাঙালী অনেককাল অবধি ছিলেন এবং তাঁদের ঘিরেই গোরা-ছাউনীর আশেপাশে 'বাবুমহাল্লা' গ'ড়ে ওঠে। বাবু মানেই বাঙালী, আর বাঙালী সমাজের পাশেই থাকে একটি ক'রে কালীবাড়ি। লাহোর

রাওয়ালপিণ্ডি পেশাওয়ার অমৃতসর—কালীবাড়ি কোথায় নেই ? পরে জানতে পারি এই কালীবাড়ীগুলির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হলেন চব্বিশ পরগনা নিবাসী স্বর্গত দিগম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সেসব প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ত আজও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাতে কালী আর বাঙালী দুটোর একটাও আছে কিনা জানিনে। বাঙালী হিন্দুর নামে একটি রাস্তা ছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে,—শশিভূষণ চ্যাটার্জি স্ট্রীট। এই শশিভূষণ ছিলেন ওখানকার সামরিক হিসাব-দপ্তরের অন্যতম প্রধান কর্মচারী। তাঁর বাড়ি ছিল হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালীতে। আরো ছিল নানাবিধ প্রতিষ্ঠান,—স্কুল, পাঠশালা, নাট্যসমিতি, প্রসূতিসদন। শিবের মন্দির, কোথাও জলাশয়, কোথাও বা দাতব্য ঔষধালয়। আজও কি তারা আছে ? কে জানে ! পশ্চিম পাঞ্জাবে বাঙালী হিন্দুর নানা কেন্দ্র ছিল, ছিল নানা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা—,আজ কি তাদের কোন চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে ?

ছাউনী আর সিটি—দুই স্টেশনে আকাশপাতাল তফাৎ। একটি বিলেতী, অপরটি দেশী। একটি পাশ্চাত্য, অন্যটি প্রাচ্য। পাহাড়ী জাত একটু এড়াটে, অপরিচ্ছন্ন—কে না জানে ! আর পাহাড় মানেই শীতপ্রধান মুলুক। ময়লা ছেঁড়া জামা, ময়লা হাত-পা, ময়লা মুখ আর মাথা,—সমগ্র হিমালয় দেখো, এর ব্যতিক্রম নেই। আসামের পাহাড়ে যে চেহারা, গাড়োয়ালের পার্বত্যপথেও তাই। কুমায়ুনের মানুষের শরীরে যে মালিন্য, কাশ্মীরের লাডাখের পথেও সেই একই অপরিচ্ছন্নতা। দেহ বলিষ্ঠ, শক্তি অমেয়, পরিশ্রম করে জন্তুর মতো; কিন্তু চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের ছাপ সর্বাঙ্গে। সমতলভূমিতে নেমে আসতে পাহাড়ীদের ভয় করে, ঘন বায়ুস্তরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে গিয়ে তাদের দম আটকে মরার ভয়। মুসৌরীতে আমার এক পাচক ছিল, নাম গোবর্ধন সিং। চমৎকার রান্না করতো। তাকে বললুম, কলকাতায় তুমি চলো, কোনো ভাবনা থাকবে না। গোবর্ধনের বাড়ি হলো দেবপ্রয়াগের দিকে, মুসৌরী থেকে পাহাড়ী পথে গেলে চারদিন পৌঁছতে লাগে। গোবর্ধন আমার প্রস্তাব শুনে জবাব দিল, হাজার টাকা বেতন পেলেও সে 'গর্মি মুলুকে' যাবে না। পেশাওয়ারে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করো, তোরা যাবি বাঙলাদেশে ? ওরা একবাক্যে জবাব দেবে—না ! গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তাপে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সুলেমান পর্বতের পূর্ব-প্রান্ত, সমগ্র সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানের বালু আর পাথরের দিকচিহ্নহীন মরুপ্রান্তর জলেপুড়ে যায়,—কিন্তু সন্ধ্যার পরে ঠাণ্ডা,—এমন ঠাণ্ডা যে, কাঁপুনি ধরে যায়। এই ঠাণ্ডা আর লঘু বায়ুস্তর ওদেরকে সঞ্জীবিত করে রাখে। ওরা কষ্ট পায়, কিন্তু হাঁপায় না। শীতের রাত্রের ঠাণ্ডায় গাছের পাখি, মাঠের

জন্তু এবং ঘরের মানুষ জ'মে মরে যায়, কিন্তু তবু তা'রা 'গর্মি মুলুকে' আসবে না।

সকালের রোদ উঠলো। স্টেশনের বাইরে এসে বহুদূর পর্যন্ত ভাঙাচোরা পেশাওয়ার শহর চোখে পড়ে। হঠাৎ বদলে গেছে সব। পশ্চিম পাঞ্জাবের সঙ্গে সীমান্তের কোন মিল নেই। সমস্ত হিন্দুস্তান একদিকে, ওরা একদিকে। ওরা সিন্ধুনদের ওপারকে বলে হিন্দুস্তান। হাজার হাজার বছর ধ'রেই একথা ব'লে আসছে, আজ নতুন নয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানরাও ওদের কাছে ভিন্‌দেশী, নাড়ির যোগ কোথাও কিছু নেই। পাকিস্তানের মুসলমানরা ওদের কাছে হিন্দুস্তানী। তা'রা দুশমন, তা'রা ওদের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে। পেশাওয়ারে নামবামাত্র এসব কথা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। ওদের চোখে মুখে সন্দেহ, কেমন যেন ব্যঙ্গ-কৌতুকের ভাব, কেমন যেন অসহযোগী মনোবৃত্তি। কাফিখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ওদের ভ্রূভঙ্গীতে উপেক্ষা এবং বৈরীভাব ফুটতে থাকে, খাবারের দোকান কোথায় জানতে চাইলে কেউ ব'লে দেয় না। টাঙ্গাওয়ালাকে দাঁড়াতে বললে সে কথা না শুনে ঘোড়া হাঁকিয়ে দেয়। পুলিসকে কিছু প্রশ্ন করলে সে বিরক্তিবোধ করে। আমরা হিন্দুস্তানী, হিন্দু অথবা মুসলমান যেই হই, আমরা হলুম ওদের দুশমন। স্টেশনের বাইরে এসে একজন হিন্দুস্তানী মুসলমানকে এদিককার তথ্য জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, স্টেশন থেকে এই যে সড়ক গিয়ে মিশেছে খাজুড়ীর মাঠের পথে, তার এপাশে ওপাশে যাবেন না,—ওটা সরকারী এলাকার বাইরে। অর্থাৎ কলকাতার চৌরঙ্গী হলো অধিকৃত এলাকা, কিন্তু গড়ের মাঠের দিকে এক পা বাড়ালেই আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা! রেলপথ আর মোটরপথ আমার—মাঠের পথ অন্যের। তিনি বললেন, ওরা অসভ্য আফ্রিদী, ওদের বিশ্বাস করবেন না।

কথাটা শুনে ঈষৎ গা ছমছমিয়ে উঠলো বৈকি। প্রতি পদক্ষেপ সংশয়ে ভরে উঠলো। জীবন এখানে অনিশ্চিত। উটের ক্যারাভান্ আসছে,—ঘেরাটোপের বাইরে ও ভিতরে একেকজনের হাতে রাইফেল। কুলির হাতে রাইফেল, হোটেলওয়ালার হাতে, মেষপালকের হাতেও। পথের উপরে ঘোড়া আর উট চ'রে বেড়াচ্ছে, ঘন লোমযুক্ত দুম্বা আর মোরগ,—পথে পথে যাযাবরী ঘরকন্না পেতেছে তুর্ক-ইরানীর দল। কোন কোন মেয়ের সর্বাঙ্গে কালো আল্‌খাল্লা, মুখখানা ছাড়া দেহের আর কোন বাঁক নজরে পড়ে না। ওদের মাঝখানে সুর্মাটানা কাবুলিরা এসে অনায়াসে মিশে গেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে রাইফেল অথবা দু'নলা বন্দুক। ওরা মুরগী ধরে এবং নখের আঁচড় দিয়ে মুরগী ছাড়ায়;

বাছুর কাটে 'চাকু' দিয়ে। দাঁত দিয়ে ছাড়ায় ওপরের ছাল, তারপর সেই কাঁচা মাংস নিজের ঝুলিতে রুটির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে উটের পিঠে চড়ে বসে। চললো এক দেশ থেকে আরেক দেশে। চললো হিন্দুকুশ ছাড়িয়ে সেই পামীর আর কারাকোরাম পেরিয়ে ইয়ারখন্দ আর খোটান নদী ডিঙ্গিয়ে সোজা মধ্য-এশিয়ার তাক্‌লা-মাকানের পথ ধ'রে মঙ্গোলিয়ার দিকে। আর নয়ত বা চললো জালালাবাদের পথ ধ'রে হেলমন্দ নদী পেরিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে একেবারে সেই মাঝিয়ারি শরিশ। পাহাড়তলীর পাথরের হুড়ি ভরা দুর্গম বালুপথ পেলে ওরা খুশী—কেননা অমন রাস্তায় দুশো-চারশো মাইল পথ চড়াই-উৎরাইতে হেঁটে যাওয়া ওদের কাছে দিনাহুদৈনিক অভ্যাসের সামিল। শুধু মরুভূমিতে ওরা একটু বিব্রত। সেই কারণে যানবাহন হিসাবে উট হলো ওদের কাছে মূল্যবান। উট তাই সম্পদ। উটের সংখ্যা যার বেশী, সে হলো বড় কারবারী। হাজার দেড় হাজার মাইল চললো উটের ক্যারাভান্—সার গেঁথে চললো অসংখ্য উট, তাদের পিঠে রয়েছে শত শত মণ জন্তুর লোম, তামাক, লৌহজাত সামগ্রী, হিং, জন্তুর চামড়া, শুক্‌নো মাংস, দামী দামী পাখি, তুলা ও পাটজাত সামগ্রী এবং আরও অনেক রকম। নদীর ধার যদি পায়, তবে চামড়ায় বেঁধে পানীয় জল নিয়ে যায় উটের পিঠে চড়িয়ে, সেই জল বিক্রি করে নির্জলা অঞ্চলে। এই জীবনযাপন করছে ওরা পাহাড়ে-পাহাড়ে আর বালুভূমে যুগযুগান্তর অনাদি-অন্তহীন কাল। অরুচি নেই, ওঠবার চেষ্টা নেই, উন্নতির আয়োজন নেই। কাঁটা খেজুরের ঝোপজঙ্গল পথে-পথে ওরা পায়, তারই আশেপাশে রাত্রিবাস, তারই আনচে-কানাচে দিনযাত্রা। এর বাইরে ওরা জীবনকে দেখেনি।

পেশাওয়ার থেকে রেলপথ চ'লে গেছে খাইবার গিরিসঙ্কটের গহনলোকে। মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল আঁকাবাঁকা রেলপথ। ঠিক মনে নেই, সম্ভবত ষাট সত্তরটি টানেল্ পড়ে সেই পথে। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। এদের জরীপের ভার ছিল বাঙালীর ওপর; বাঙালী ইঞ্জিনীয়রের পরিচালনায় সুড়ঙ্গপথগুলি কাটা হয়। প্রায় সমস্তই বাঙালীর হাতের তৈরী। যখন ঘুমিয়েছিল আর্যাবর্ত আর দাক্ষিণাত্য, তখন বাঙালী যায় এগিয়ে বৃহত্তর হিন্দুস্তানের দিকে, যায় আফগানে, ইরানে, ব্রহ্মে এবং চীনদেশে। বাঙালী বিদ্যাধর চট্টচার্য গিয়েছিল রাজপুতানার প্রান্তে, বাঙালী শ্রীজীব গোস্বামী গিয়েছিল বৃন্দাবনে, বাঙালী রামমোহন আর শরৎ দাস তিব্বতে। বাঙালী দীপঙ্করকেও আজ ভুললে চলবে না। লাণ্ডিকোটালে গিয়ে দেখি, হুগলীর মিঃ ঘোষ আছেন খাইবার গিরিপথের টানেলগুলির পরিদর্শনে, এবং আফ্রীদী

শ্রমিকের পরিচালক রয়েছেন চট্টগ্রামের বাঙালী মিঃ মজুমদার। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে যে-পথ অন্তহীন পর্বতমালা পেরিয়ে কাশ্মীরের দিকে চলেছে, তারই একান্তে ঘোড়াগল্লির পাহাড়ে দেখেছি সেদিনকার মিঃ চ্যাটার্জিকে পূর্ত-বিভাগের কাজ নিয়ে রয়েছেন। ওপারে কাশ্মীর, এপারে ভারত—মাঝখানে অরণ্যলোকে বিজনবাহিনী বিতস্তার খরতর প্রবাহ. তারই তীরভূমে দেও দারের বনে 'কটেজ-গার্ল'-এর ছিল ডালপালাছাওয়া ছোট্ট কাঠের ঘর। সে ঘরেও একদা এক বাঙালীকে দেখে বিস্ময়বোধ করেছিলুম বৈকি। পাঠান আর মোগল আমল থেকে বাঙালী বেরিয়েছিল দিগ্বিজয়ে, কিন্তু ইংরেজ আমলের মধ্যকালে বাঙালী আরামের চাকরি পেয়ে ঘর থেকে আর বেরোয়নি; ইংরেজি ছাড়া কিছু শেখেনি,—সেইজন্য জীবনটা হয়েছে বদ্ধজলা। অথচ সুবিধা পেলে বাঙালী যে এগোয় না, এ কথাও সত্যি নয়। এই সেদিনও দেখে এলুম সিকিমে, মানে গ্যাংটক শহরে—বাঙালী পানের দোকান দিয়ে বসেছে। পোস্টাপিসে বাঙালী, পি-ডব্‌লু-ডি'তে বাঙালী। আর কিছুদূর এগিয়ে নাথু-লা-পাস পেরিয়ে তিব্বতের ধারে য়াটুংয়ে এই সেদিনও বাঙালীরা সামরিক তাঁবু বেঁধে বসেছিল। বাঙালী কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের কথা কে না জানে! বাঙালী এম-এন-রায়। বাঙালী সুভাষ বসু।

বাঙালী যে মৃত্যুকে ভয় পায় না, ইংরেজ আমলের শেষদিকে এই খবরটা পেয়ে গেছে সীমান্তের খান্-রা, ওই আজকে যাদের নাম পাখতুন—পুস্তু যাদের ভাষা। ওদের চোখে সন্দেহ আর কৌতুকের সঙ্গে তাই কিছু সম্ভ্রম, যেন ঈষৎ বন্ধুভাব। ওরা সব চেয়ে ক্রুদ্ধ পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমান আর শিখদের ওপর। তাদের হাতেই ওদের যত হয়রানি। তাদের সঙ্গেই ওদের লড়াই আর প্রতি-দ্বন্দিতা। ইংরেজ টমী ওদের কাছে শিশু। ক্যাম্প থেকে ছোঁ মেরে টমীকে তুলে নিয়ে ওরা পালিয়েছে, এমন ঘটনা আকছার। একটি চপেটাঘাতে ইংরেজ টমী প্রাণ হারিয়েছে এমন ঘটনা একাধিক। তাই দেখা যায় ইংরেজ টমীরা নিরীহ গাড়োয়ালী পল্টনকে সামনে থেকে গুলী ক'রে মেরেছে, কিন্তু আফ্রীদীর মাঝখানে গিয়ে কখনও বেয়নেট্ চার্জ করেনি। টমীর হাতে রাইফেল যখন কাঁপে, ততক্ষণ পাঠান স্নাইপারের রাইফেলের অব্যর্থ লক্ষ্য টমীর কপাল ভেদ ক'রে চ'লে যায়।

খাইবার গিরিপথের ভিতর দিয়ে কয়েক মাইল অগ্রসর হ'লে প্রথম দুর্গ হল জমরুদ। জমরুদ নানা ইতিহাসে জড়িত। একটি হোলো এই, গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর ভিক্ষাপাত্রটির উপর একটি বৌদ্ধমঠ নির্মিত হয়। জমরুদ দুর্গটি তারই ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে এখন

চারিদিকে থাজুড়ীর বিশাল প্রান্তর, তার প্রান্তে সমস্ত দিগ্বলয় আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে শফেদকো, স্বরাটাক্, পাঘমান, পঞ্চশির, হিন্দুকুশ প্রভৃতি পর্বতমালা। অনেকগুলি চূড়া তাদের দুগ্ধফেন তুষারে আবৃত। এই অন্তহীন প্রান্তরের মাঝখানে জমরুদ দুর্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে উদ্ধত হিংস্রতার মতো। পিকেট রয়েছে আশেপাশে। 'শত্রু' রয়েছে চারদিক ঘিরে। কিন্তু দুর্গ হিসাবে জমরুদের কোনো বাহার নেই,—নীরেট কঠিন কাঁকর পাথরের জমাট স্তূপের মতো। পাটনা শহরের মাঝখানে যে ঐতিহাসিক গম্বুজাকৃতি চাউলের ভাণ্ডারটাকে ইংরাজিতে বলা হয়, 'মন্থমেণ্ট অফ ফলি,—জমরুদ দুর্গের আকারটাও যেন অনেকটা ঐ রকম, অনেকটা যেন নিউ দিল্লীর মানমন্দিরের চেহারা। সমস্তটাকে ঘিরে শুধু চোরাগর্ত দিয়ে গুলী চালাবার জন্য অসংখ্য ছিদ্রপথ। শত্রু মনে করি বলেই ত' এত হিংসার আয়োজন। একের হিংসাবোধ আর বিদ্বেষবুদ্ধি অপরের পশুপ্রকৃতিকে খুঁচিয়ে জাগায়। কিন্তু যদি কারোকে শত্রু মনে না করি? যদি কায়মনোবাক্যে অহিংসাবাদী হই, তাহলেও কি আমার চারিদিকে এই হিংসার আয়োজন চলবে? ঠিক এই মনোভাব নিয়ে পাখতুন সমাজে উঠে দাঁড়ালো এক সর্বচিত্তজয়ী বীর। কথা উঠলো, বীরত্বের শ্রেষ্ঠ গৌরব কী? একজন ছাড়া আর কোনো পাখতুন এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না! মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় কী? এই প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ালো ওই বালুপাথর আর অঙ্গার-প্রধান পাহাড়ে পর্বতে; প্রশ্ন ঘুরে বেড়ালো কুরমে, মিরনসাহে, ওয়াজিস্তানে, ডেরাইসমাইলখানে, দাউদখেলে, হাজারায়, কোহাটে, কোয়েটায় এবং ওই পর্বতের গুহায় গুহায়, আফ্রীদী পাঠানদের পাড়ায় পাড়ায়। সেদিন ওদের মধ্যে সেই একজন মহাপুরুষ উঠে দাঁড়ালো। তিনি বললেন, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হোলো অহিংসা আর প্রেম। তাঁর নাম খাঁন আবদুল গফ্ফর খাঁন। তাঁর আবির্ভাবে সমগ্র পাখতুনিস্তান নতুন জীবন-ব্যাখ্যায় ভ'রে উঠলো।

সামনের মাঠের আয়তন নাকি প্রায় তিনশো বর্গমাইল। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল পার্বত্য বেষ্টনী। এখানে লড়াই চলে এসেছে চিরকাল। আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ,—তারপর শক হূন তাতার, জয়পাল আনন্দপাল থেকে মহম্মদ ঘোরী, গজনীর মামুদ থেকে বাবর মোগল। এই মাঠের পাথরের স্তরে স্তরে ঐতিহাসিক কঙ্কাল আজও থেকে গেছে; ওই হিমালয় চিরকাল ধ'রে তার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। এই মাঠের প্রান্ত ঘেঁষে চলেছে পায়ে চলা পথ, আর পাশে পাশে রেলপথ। একসময় দুটো পথই মিলিয়ে গেছে দূরে গিয়ে খাইবারের পাহাড়ের জটিলতায়। রুক্ষ অনুর্বর ধূসর পর্বত, না আছে ছায়া, না মায়া।

আশ্রয় আতিথ্য আনন্দ—কিছু নেই কোথাও। শুধু ক্যারাভানের উটের গলা থেকে ডিং-ডং ডিং-ডং ঘণ্টার আওয়াজ দূরে থেকে দূরে যায় মিলিয়ে,—সমস্ত চেতনাটার উপরে হাজার হাজার বছরের কেমন একটা ক্লান্ত তন্দ্রা নেমে আসে —হাওয়ার মধ্যে যেন বিগত ইতিহাসের হাহাকার শোনা যায়।

আলীমসজিদ এলাকায় এসে পড়লুম। মসজিদ হয়ত আছে কোথাও পাহাড়-তলীতে, তবে এখানে দেখা যাচ্ছে একটি মস্ত বিদ্যায়তন, নাম ইসলামিয়া কলেজ। অসভ্য জাতিকে সুসভ্য ক'রে তোলার একটা আয়োজন আছে এখানে। পড়াশুনার জন্য বেতনাদি লাগে না, এমন কি ইংরেজ মিশনারীর যেমন বিনামূল্যে ছাপা বই বিলিয়ে বেড়ায়, আমেরিকান মিশনারীরা যেমন কাগজমোড়া খাদ্য এবং খামে ক'রে টাকার নোট উপহার দিয়ে বেড়ায়—এখানেও প্রায় তাই—পাঠানদেরকে আকর্ষণ ক'রে আনার জন্য নানাবিধ উপঢৌকনাদি বিতরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এত ক'রেও সেই স্কুল-কলেজে ছাত্র জোটে কম। যেমন আরোহী জোটে কম খাইবার রেলপথে। আফ্রীদী পাঠানরা যদি টিকিট না ক'রে ট্রেনে আনাগোনা করে, তবে এক হুকুম বহাল আছে যে, ভাড়া আদায়ের জন্য ওদেরকে যেন পীড়াপীড়ি না করা হয়। ফলে, রেলপথে ওদের অবাধ স্বাধীনতা। আপেলের আর আঙুরের পুঁটলী নিয়ে উঠলো গাড়িতে,—চিবোতে চিবোতে চললো একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোনো দল বা নামলো মাঝপথে। রাস্তা পেরিয়ে কোনো পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথে ঢুকে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ের গায়ে গর্ত দেখা যাবে একটার পর একটা। আরেকটু গলা উঁচু করলে চোখে পড়বে পাহাড়ের প্রাচীরের পাশে ওদের ছোট ছোট ঘর—, জানলা নেই, দরজা নেই, নীরেট দেওয়াল, কিছু সবুজের দাগ, কিছু বা ঘাস-লতা,—কিন্তু তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজ,—ওখান থেকে ওরা তাক করে দুশমনের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে। অব্যর্থ লক্ষ্য। ওদের প্রত্যেকটি ঘর হলো দুর্গ, প্রত্যেকটি লোক হলো যোদ্ধা, এবং প্রত্যেকটি পাহাড় হলো আত্মরক্ষার প্রাচীর। চেয়ে দেখো, চারিদিক জনহীন, সেই শব্দহীন নির্জনতায় মনে সংশয়াতঙ্ক দেখা দেবে, ধুধু রৌদ্রে পার্বত্য-প্রান্তরের অঙ্গার ধূসরতায় ক্লান্ত দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরবে। কিন্তু একটি সাংকেতিক আওয়াজ করো, অমনি উল্কা-গতিতে ছুটে বেরোবে পাহাড়ের গহ্বরের ভিতর থেকে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে দুর্ধর্ষ হিংস্র রণোন্মত্ত অসমসাহসিক ওয়াজিরি-আফ্রীদী পাঠানের দল। দূরের থেকে কামান দাগো, বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করো, বিধ্বস্ত করো তাদের ওই সংখ্যাতীত মাটির কেল্লা,—দেখবে শতকরা পাঁচজনও তাদের ধ্বংস হয়নি, তারা অদৃশ্য হয়েছিল পাহাড়ের তলায় সুড়ঙ্গলোকে শৃগালের মতো।

একথা কে না জানে, ওরা বাগে পেলে মানুষ চুরি করে নিয়ে পালায়। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কোতোয়ালী থেকে, ক্যাম্প থেকে এবং পেরিমিটারের বেড়ার ভিতরে ঢুকে গোটা একটা আস্ত সৈন্যকে কাঁধে তুলে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে—এমন ঘটনা বহু আছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার যেমন একটি শিশুকে কামড় দিয়ে তুলে নিয়ে পালায়, তেমনি ওরা পালাতো ইংরেজ টমীকে নিয়ে জনটি পার্বত্য সুড়ঙ্গের অন্তরালে।

পাহাড়ের পথ সুদীর্ঘ চক্রাকারে ঘুরে গেল। সেই বাঁকে পাওয়া গেল শাগাই দুর্গ। রক্তিমবর্ণ পাথরের তৈরী বিশাল দুর্গ। বিশাল তার তোরণদ্বার, ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে প্রস্তুত। সামনে সশস্ত্র প্রহরী। বুঝতে পারা যায়, এই পাথর এদেশের নয়। আজমীঢ় থেকে যোধপুরের আরাবল্লী পাহাড়ের দিকে ঢুকলে যে-সকল ঘোরালো রক্তবর্ণের পাহাড় চোখে পড়ে, কিংবা সুলেমান পর্বতমালার কোনো কোনো স্তরে,—সম্ভবত এইসব পাথর ওইসব অঞ্চল থেকেই আনা। এদিকে খাইবারের দীর্ঘ বিস্তার। চারিদিকে গগনচুম্বী পর্বতমালা, মাঝখানে দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, এদিক থেকে ওদিকে পথের রেখা চ'লে গিয়েছে দূর দূরান্তরে। এ অঞ্চল হলো খাইবার গিরিপথের মধ্যকেন্দ্র—এবং শাগাইকে যেহেতু দুইদিক রক্ষা করতে হয় সেই হেতু এখানকার অস্ত্রশালা অনেক বড়। একদিকে জমরুদ, অন্যদিকে লাণ্ডিকোটাল। কোনকালে শাগাইয়ের পতন যদি ঘটে, তবে পেশাওয়ারের পতন অনিবার্য। পেশাওয়ারের পতন যদি ঘটে তবে নওশেরা-আটক-ক্যাম্বেলপুর রক্ষা করা দুঃসাধ্য। আজও তাই। পাকিস্তানকে আজ একই কারণে পাহারা দিতে হচ্ছে। ইংরেজ ওদেরকে বিশ্বাস করেনি, পাকিস্তানও ওদেরকে ঘরে ডেকে স্নেহের কথা বলেনি। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারা যায়, শাগাই থেকে রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলি সুদীর্ঘ অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে পরস্পর সংযুক্ত।

আবার অগ্রসর হলুম। চারিদিকের ধূসর পর্বত-বেষ্টনীর মাঝখানে রক্তবরন বিশাল শাগাই দুর্গ পিছনে প'ড়ে রইলো। তারও পিছনে প'ড়ে রইলো ভারতবর্ষ।

শাগাই থেকে লাণ্ডিকোটাল প্রায় বারো মাইল পথ। চোখে দেখতে পাচ্ছি ভারত আক্রমণের প্রাচীন গিরিসঙ্কট। ময়ূর সিংহাসন গেছে এই পথ দিয়ে, এই পথ দিয়ে লুট হয়ে গেছে হাজার হাজার আর্য হিন্দু নারী যুগে যুগে, শত শত কোটি টাকা মূল্যের হীরা স্বর্ণ মুক্তা মণিমাণিক্যের সম্ভার গিয়েছে উটের ক্যারাভানে এই পথ দিয়ে। ছড়িয়ে পড়েছে এই পথে কত সোনার আশরফি, কত জড়োয়ার নূপুর, কত ছিন্নভিন্ন জহরতের মালা, কত বুকফাটা লবণাক্ত

অশ্রু, বক্ষপঞ্জরের কত বিগলিত রক্তধারা। এই পথে এসেছিল ঘোড়সওয়ার গ্রীক সেনাপতির দল সিন্ধুবিজয়ে, এসেছিল তুর্কি-তাতারের বন্যাস্রোত, এসেছিল গ্রীক-ইসলাম সভ্যতার ভারতবিজয়ী সৈন্যবাহিনী। আবার এই পথ ধ'রে গিয়েছে গৌতম বুদ্ধের কল্যাণবাণী, মন্ত্রোচ্চারণ করেছে তারা প্রদীপ হাতে নিয়ে এই পথের অন্ধকারে,—ওম্ মণিপদ্মে হুম্! ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! তারা গিয়েছে সীমান্তে, আফগানে, গান্ধারে, ইরানে, কশ্যপ সাগরের তীরে তীরে।

এ পথে কোন পথিক পাখি আসে না,—বৃক্ষলতার চিহ্ন কোথাও নেই; ক্বচিৎ কখনও দেখা যায় দূর হিমালয়ের থেকে নেমে এসেছে ধূসর ভল্লুক, কখনও এক আধটা হায়না, কিংবা হয়ত একটা ভীষণপ্রকৃতি সর্প—ব্যস, আর কোনো জানোয়ারের দেখা সাক্ষাৎ নেই। চেয়ে দেখছি পূর্বোত্তরে হিমালয়ের দিকে—ভ্রূকুটিকরাল, তৃষ্ণালোলুপ, ভস্মাচ্ছাদিত উলঙ্গ ফকির। বজ্রদণ্ডের ঘোর-ঘোষণা নেই, মেঘমেদুরতা কল্পনাতীত, ছায়াপথের ছবি ফোটেনা কোথাও, নীলনয়না পল্লীবালার বাঁকা কটাক্ষপাতে সরোবরের কোরক শতদলে পরিণত হয় না। চেয়ে দেখছি হিমালয়ের আশ্চর্য পরিবর্তন। মহাকালের অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে বারম্বার আনছে রূপান্তর—মানুষের, ভাষার, ভাবের, কল্পনার, প্রকৃতির, এমন কি জন্তুজানোয়ারের।

রেলপথটি মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে কোন সুড়ঙ্গলোক থেকে। আবার থামছে,—প্রতি পদে একটা করে লুপ। যাচ্ছে, আবার আসছে—জিগ্‌জ্যাগের মতো। সশস্ত্র পাহারা তা'র পথে পথে, ঘাঁটি ধ'রে পিকেট্ দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক তুলে। প্রত্যেকটি পাহাড় অবিশ্বাস্য, প্রত্যেকটি বাঁক সন্দেহজনক। মনে পড়ছে ঠিক এইখানে—এই সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের আশেপাশে সীমান্তের ইংরেজ গভর্নর স্যর ওলাফ কারোর উস্কানিতে উৎকোচপ্রাপ্ত এক শ্রেণীর আফ্রীদী বছর আষ্টেক আগে পণ্ডিত নেহেরুকে আক্রমণ করেছিল। সেটি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের মাঝামাঝি। পণ্ডিত নেহেরু তখন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সাহেবের নীচের ভারত গভর্নমেণ্টের প্রধান কর্তা। কংগ্রেসের হাতে তখন স্বরাষ্ট্র বিভাগ। পণ্ডিত নেহরুর নিরাপত্তার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সেই মুহূর্তে রাইফেল থেকে যখন তাঁর গাড়ির উপরে গুলীবৃষ্টি হতে থাকে তখন মৃত্যুভয়হীন কাশ্মীরী পণ্ডিত জওহরলাল গাড়ি থেকে নেমে পথের উপরে দাঁড়ান মৃত্যুর মুখোমুখি। রয়টারের বিদেশী সংবাদদাতা লিখলেন, **"The bravest man of the world before the gravest provocations."** তিনি লিখলেন, প্রতি সেকেণ্ডে রাইফেল গুলী ছুটে যাচ্ছে পণ্ডিতজীর

শরীরের আশেপাশে, আর সেই মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই অকম্প অপরাজেয় বীর পণ্ডিত নেহরু সহাস্যে ক্ষমা করেছেন তাদেরকে। **"The dramatic scene was the sight for even the gods to see."** সেই নাটকীয় মুহূর্তে পণ্ডিতজীকে প্রসারিত দুই বাহুতে যিনি আলিঙ্গন ক'রে দাঁড়ান, তিনি হলেন সীমান্তকেশরী ডাঃ খানসাহেব। অতঃপর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ জিন্নার ফুৎকারে ডাঃ খান সাহেবের কন্‌গ্রেসী মন্ত্রিসভা ধুলো হয়ে উড়ে যায়, এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্বেও মিঃ জিন্নার অঙ্গুলিসঙ্কেতে অন্তরীণাবদ্ধ হন।

লাণ্ডিকোটালে এসে পৌঁছলুম। দূরের বাঁক থেকে কতকটা নীচের দিকে দেখা যাচ্ছিল লাণ্ডিকোটাল—একটি উপত্যকায়। তিনদিকে পাহাড়ের অবরোধ, মাঝখানে তাঁবুর সমষ্টি। সমস্তটাই অস্থায়ী, কেননা এ অঞ্চল প্রকৃত সামরিক ঘাঁটি। জালালাবাদ হয়ে কাবুলের দিকে যাবার এই একমাত্র রাজপথ। সৈন্যদলের ঘাঁটি, অধিকার রক্ষার আয়োজন - সুতরাং দোকান-বাজারও অস্থায়ী। স্ত্রীলোক ও শিশু বিকাল চারটার পর আর এ অঞ্চলে থাকবে না এই নিয়ম। অতএব ওই উভয় জীবকে এ অঞ্চলে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না কোথাও ঘরকন্না। এখানে কাছাকাছি আছে একটা জলাশয়, দূরের পাহাড় থেকে তুষার বিগলিত হয়ে জল এসে জমা হয়, কিছু বা আছে বৃষ্টির পশলা। এ জল শুকোয় শীত পড়লে,—তখন জল আনতে হয় পেশাওয়ার থেকে। গোরা ছাউনীগুলির অনতিদূরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দুর্গ, জমরুদের অনেকটা সমগোত্রীয়, রয়েছে দাঁড়িয়ে। তা'র কামানের মুখটা ঘোরানো রয়েছে গিরিসঙ্কটের দিকে। আশেপাশে যাদের দেখছি তা'রা কে? উৎকোচ পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে এমন পাখতুন অনেককেই দেখছি। তা'রা ঝাড়ুদার, চাপরাশি, কুলী, ধোবা, জনমজুর। তা'রা পয়সা পায়, পায় মাংসের টুক্‌রো, তাই পেয়ে সেলাম ঠোকে। কিন্তু তবু তাদেরকে চিনিনে, তা'রা তুর্ক-ইরানী রক্তে তৈরী। আমি বাঙালী, কিন্তু কাথিয়াবাড়ে গিয়ে সেখানকার মানুষকে পর মনে করিনি, রাজপুতানায় বা গোয়ালিয়রে নিজেকে পরদেশী ব'লে মনে হয়নি, হায়দারাবাদে মাদুরায় অথবা কৃষ্ণা-রেবা-বেত্রবতী তপতীর তীরে তীরে যাদেরকে দেখে বেড়িয়েছি—মনে হয়েছে তা'রা যেন আমার কতকালের আপন। উড়িষ্যায়, আসামে, নেপালের পার্বত্যলোকে, সিকিমের উত্তর প্রান্তে, ভুটানের সীমানায়—স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মন মিলে গেছে। মনে হয়নি তা'রা আমার অপরিচিত। গ্যাংটকে একটি তিব্বতী দম্পতির সঙ্গে সমানে তিন দিন কাটিয়েছি—কেউ কা'রো ভাষা জানিনে—কিন্তু

কেউ কারো কাছে ছুর্বোধ্য ছিলুম না। কিন্তু এখানে ভিন্ন কথা। এরা একেবারে অজানা অচেনা। এদের মুখের রেখায়, চোখের চাহনিতে, ভুরুর ভঙ্গীতে এবং চলন-ধরনে বিশাল ভারতের কোনো চেতনা নেই ; আত্মপ্রকৃতির কোন সমগোত্রীয়তা ওদের মধ্যে খুঁজে পাইনি।

ছুজন মাত্র বাঙালী এখানে ছিলেন, আগে তাঁদের নাম করেছি। মধ্যাহ্নে মিঃ ঘোষের কাছে আতিথ্য নেওয়া গেলো। সঙ্গে নবলব্ধ বন্ধু মিশ্রজী। অন্নব্যঞ্জন সহযোগে আপ্যায়ন করলেন শ্রীযুক্ত ঘোষ। পরে জানা গেল, চাউল আর সব্জি এসেছে সিন্ধুনদের ওপার থেকে। এখানকার মূল্যে সেই চাউলের দর মণপ্রতি দেড়শত টাকার ওপর পড়ে। কুলীসর্দার দ্বিতীয় বাঙালী মজুমদার মশায়কে পাওয়া গেল। নামে বাঙালী, বাড়িও চট্টগ্রামে, কিন্তু আচার-আচরণে প্রায় পাঠান। তিনি আবাল্য গৃহপলাতক। জাহাজের খালাসী হয়ে তিনি ঘুরেছেন ইউরোপ, এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ায়। নিঃস্ব ব্যক্তি ব'লে আমেরিকার বন্দরে তিনি নামতে পারেননি। ব্যাঘ্র শিকারে তিনি পটু, তবে ব্যাঘ্র একবার তাঁকে শিকার করেছিল। ফলে, সেই নরখাদকের নখরের আঁচড়ে আজও তাঁর মুখখানা ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত। প্রকাশ, জনৈক পাঠান সর্দার একদা মল্লযুদ্ধে মজুমদার সাহেবকে আহ্বান করে এবং সেই যুদ্ধে মজুমদার জয়লাভ করার পর পাঠান সর্দার সদলবলে তাঁর কাছেই বশ্যতা স্বীকার করে। এই অমিতশক্তিশালী মজুমদার যখন গল্প শোনাচ্ছিলেন, দেখলুম তাঁর সামনের গোটা তিনেক দাঁত নেই। মিঃ ঘোষ সহাস্যে বললেন, তিনটে দাঁতের তিন টুকরো ইতিহাস! সে সব কাহিনী শুনতে গেলে আপনার লান্দিখানা অভিযান অসমাপ্ত থেকে যাবে!

সরাইখানার দিকে অগ্রসর হলুম। পিছন থেকে উটের দল আসছে এগিয়ে ধূলো উড়িয়ে। অলস মধ্যাহ্ন রৌদ্রে সেই ডিং-ডং ডিং-ডং ঘণ্টা বেজে চলেছে। কেমন যেন ক্লান্ত উদাস সুর। কিছু স্বপ্ন জড়ানো, কিছু বৈচিত্র্যের আভাস মাখানো। ঘেরাটোপের মধ্যে আছে আফগানী মেয়ের কালো-কালো সুর্মাটানা চোখ। ওরা এসে আজকের মতো সরাইতে বিশ্রাম নেবে।

সরাই তাদের জন্য যারা হিন্দুস্তানে অর্থাৎ ভারতের দিকে যাবে। তোরণের সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালুম। নবাগত যাত্রীদের চোখে আমরাও অদ্ভুত জীব। আমাদের দেহ কোমল, হ্রস্বকায়, মুখে আমাদের ভারতীয় ছাঁদ,—যাকে বলে দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়,—আমাদের চেহারায় নশ্বর পেলবতা, ওদের একখানা হাতের মোচড়ে আমাদের হাড়-গোড় গুঁড়িয়ে যায়। সুতরাং 'গালীভাররা' চেয়ে রয়েছে আজব 'লিলিপুটেদের' দিকে। আমরা বিচিত্র

জীব। ওরা আমাদেরকে মুঠোর মধ্যে পেলে পুতুলের মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে পারে।

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখি বহু পাঠান আর তুর্কি নরনারীর সমাগম। একদল উট দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে। এধারে রক্তাক্ত মুরগি বালুর ওপর শোয়ানো, ওধারে মরা বাছুরের ছালসুদ্ধ পাঁজর। ভেড়া জবাই হয়েছে, তখনও তার পা নড়ছে। কাঠের আগুনে মাংস পোড়ানো হচ্ছে। পুঁটলী থেকে বেরোচ্ছে মোটা মোটা রুটি শক্ত সিটনো। তামাকের গড়গড়া নিয়ে বসেছে কয়েকটি লোক। মেয়েরা ধরেছে সমরখন্দ থেকে আনা চরসের ছিলিম। রক্তমুখী সুশ্রী মেয়ের কালো ঘোমটার ভিতর থেকে চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছে চরসের রসে টসটসে। এই সরাইকে মনে ক'রে একদা একটি কবিতা রচনা করেছিলুম:

পাহাড়ের অতিকায় প্রেতাত্মারা
সারি সারি চলেছে দুর্গম নিরুদ্দেশ;
যেন ছিন্নমস্তার আলুলিত ধূসর জটাদল।
ঝামা আর পাথরের স্তূপাকার—
বিবর্ণ, বোবা, তৃষ্ণার্ত,
যেন নিঃশব্দ বিভীষিকার সঙ্কেত।
নেই ছায়াপথের স্বপ্ন,
নেই অরণ্যের নীলাভ স্নেহ।
বালুপথে হারানো প্রাচীন কোনো
পিপাসার্ত জন্তুর কঙ্কাল,—আর
হয়ত কোনো দুঃসাহসিকের শোচনীয়
জীবন-মরণের
করুণ অবশেষ।
শুধু তপ্ত হাওয়ায় আর বালুর কণায়
শত শত মরুপ্রেতিনীর আর্তনিশ্বাস
গুহায় গুহায় ফিরে বেড়ায় নিভৃতে।

রুদ্রজ্বালা কর্কশ পাথর আর
কাঁকরের ভীড় পেরিয়ে
হারিয়ে গেছে দূরান্তরে
পামীর আর পূর্বতুর্কিস্তানের মৃত্যুপথ।

তাক্‌লা-মাকান্‌, খোটান্‌ আর
ইয়ারখন্দ্‌ নদী যে-অজানায়—
দিগন্তলীন মরুপাথরের স্তবকে স্তবকে
যে পথ অবসন্ন, মন্থর, ভীমগতি।
সেই পথের উপরে
অতিকায় নরখাদকের মরা চোখের মতো
বিবর্ণ আকাশ।
ভারতবর্ষের উপান্তে প্রথম পান্থশালা।
দুর্গম পেরিয়ে-আসা ক্যারাভানের দল,
আর দমকা বালুর তাড়নায়
আরণ্যক কাবুলীরা সেখানে আশ্রিত।
তারা পিঙ্গল-নীল চোখে চায়
নিরুদ্দেশ পথের সন্ধানে।
লোলজিহ্বা মরুপথে
দ্বাদশ সূর্যের জ্বলজ্বালা।
তারা উদ্‌ভ্রান্তে খোঁজে ভারতের প্রাচীন তোরণ।

লোহার শিকলে বাঁধা
চিম্‌টার ঝণঝণায়
আর কাঠের গড়গড়ায়—
কাঁচা তামাকের বিষাক্ত ধোঁয়ায়,
তারা বোনে দিবাস্বপ্ন
সুন্দর ভারতের,
অরণ্যময় হিন্দুস্থানের,
নিমীলিত বন্য-চোখে।
উটের গলায় ঘণ্টার করুণ ধ্বনি
দূর থেকে দূরান্তর—অলস আর উদাস—
মরুপথে দোলে মধুর মায়া।
পান্থশালায়—
এখানে ওখানে ছড়ানো মরা ভেড়া
আর কচি তিতিরের রক্ত,
আর বাছুরের রাং—

জটপাকানো রক্তে আর কোনো জন্তুর
স্তব্ধ হৃৎপিণ্ড।
জ্বলন্ত সূর্যের লেহনে বাষ্প কেঁপে ওঠে
রক্তচ্ছটায়, কপিশ নীলাভায়।
ওধারে বাসি হাড়, পোড়া মাংস,
চামড়া আর হিঙের গন্ধ
কুণ্ডলী পাকায়।

তার পাশে কালো বোরখার আড়ালে
রক্তগোলাপ,—কাবুলীমেয়ের উজ্জ্বল কৌতূহল,
এধারে কুক্‌রির ফলকে বক্‌রি জবাই।
ময়লা জরি আর রেশমী পাগড়ি
আর শালোয়ারপরা তরুণ পাঠান—
বর্বর হাসিতে হিংস্র চোখ।
সে-চোখ একদিন হিন্দুস্থানের মাধুর্য পাবে।
এখন সে-দৃষ্টিতে অনাবিষ্কৃত দেশের আদিম ভাষা।
একপাশে খান্ গোণে আফ্‌গানি আসরফি।

সভ্যতার স্বাদ নেবার আগে ওরা,—
বন্য কাবুলী আর অসভ্য তাতার
আর বোরখাবাসিনী রহস্যময়ী—
ওরা সবাই বিশ্রাম নেয়
কৌতূহল আর ক্লান্তিতে, নিরুদ্বেগ সরাইখানায়।
—শ্রান্ত ক্যারাভানের মধুর অবসাদ।*

রেলপথটি চ'লে গেছে লাণ্ডিখানার দিকে, সেখানেই পথের শেষ। এখান থেকে মাইল চারেক। কিন্তু বিনা ছাড়পত্রে সেখানে যাওয়া যায় না। পথ বড় বন্ধুর, পানীয় জল নেই কোথাও, খাদ্যও নেই। দু'ধারে এখানে ওখানে কাঁটালতার ঝোপ, এতটুকু আশ্রয় নেই কোথাও। কিছুদূর গিয়ে একটি বাঁকে

---

*অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত এবং অধুনালুপ্ত 'বৈজয়ন্তী' মাসিক পত্রিকায় এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)

রেলপথ পাহাড়ের কোলে অদৃশ্য হয়ে যায়। উত্তরে বহুদূর গেলে কাবুল নদী, তারপর কাফ্রীস্তান। হিমালয় এখানে স্পষ্টত দ্বিধাবিভক্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসেছে হিমালয় নানা শাখাপ্রশাখায়, তারই সঙ্গে ব্যবধান রেখে দক্ষিণ হিন্দুকুশ অন্তহীন দিগন্তলোক আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে—তারই মাঝখানে এই জনশূন্য তৃণশূন্য জলশূন্য লাণ্ডিখানার পথ। সেই ভীষণ ভয়াল মরুপ্রস্তরময় চিরনির্জন উপত্যকায় দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে।

কোন দ্রষ্টব্য বস্তু নেই লাণ্ডিখানায়, এমন কি রেল স্টেশনের চিহ্নও নেই। আছে কেবল এপারে আর ওপারে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য পাহারা। মাঝখানে একটি প্রণালী, সেইটেই হোলো সীমান্ত আর আফগানিস্তানের সীমানা,—ডুরাণ্ড লাইনের তথাকথিত বাঁটোয়ারা। দুইয়ের মাঝখানে কাঠের সীমানা-পোস্ট, ইংরিজী ভাষায় সীমানার সঙ্কেত!

কিন্তু এখানে—ঠিক এইখানে, এই প্রণালীর ধারে, এই দুর্গম বন্ধুর বালু-পাথরের পথের কিনারায় পরবর্তীকালে আধুনিক ভারত পুনরায় তা'র বিচিত্র নাটকীয় ইতিহাস রচনা ক'রে গেছে। সেদিন সমগ্র অবিভক্ত ভারতের পুণ্য-তীর্থসঙ্গমক্ষেত্র হয়ে দেখা দিয়েছিল এই অতি ক্ষুদ্র লাণ্ডিখানার সীমানা-প্রণালীটুকু। বেশী দিনের কথা নয়। জনাব জিয়াউদ্দিন নামে একজন সুদর্শন অভিজাত এবং বধিরকর্ণ তীর্থযাত্রী জনৈক সঙ্গীসহ এই পথ পেরিয়ে যেদিন ছদ্মবেশে কাবুলের দিকে তীর্থযাত্রা করলেন সেদিন থেকে ভারতের রাজনীতির ইতিহাস দু'শো বছর পরে আবার পাল্‌টে গেল। তীর্থযাত্রা যিনি করেছিলেন তিনি বধিরকর্ণ জিয়াউদ্দিন নন, তিনি ছদ্মবেশী নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

উপত্যকায় আর গিরিগহ্বরের আশেপাশে অন্ধকার ঘনাচ্ছে। হেমন্ত শেষের আকাশ হয়ে এসেছে অবেলার রৌদ্রে রক্তিম। হাত পা-গুলো ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে আমাদের বন্দুক নেবার সুবিধা থাকলেও সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি। মৃত্যু অথবা হত্যাকাণ্ড ঘটলে এদিকে পুলিশের তদন্ত বড় একটা হয় না। এখানে হত্যার বদলে হত্যা, তা নিয়ে মামলা কিছু নেই। তবে কিনা হত্যা করা অপেক্ষা হত্যা হওয়া এ অঞ্চলে বেশী সহজ। পেশাওয়ারের পর থেকে এইটেই রীতি।

অতএব বেলাবেলি পাহারাদারদের সহযোগে লাণ্ডিকোটাল থেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বন্ধুরা বিদায় অভিবাদন জানালেন। অন্ধকার গুহাগহ্বর পেরিয়ে পাহাড়ের জটিলতা অতিক্রম ক'রে গাড়ি চললো শাগাই আর জমরুদ ছাড়িয়ে পেশাওয়ারের দিকে।

॥ ৩ ॥

ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই হরিদ্বার। সেই হরিদ্বার—তিনি হাজার বছর আগেকার। পরিব্রাজক হুয়েন সং মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিলেন হরিদ্বারকে দেখে। এখানে তিনি বাস করে গেছেন বহুকাল। এটা কিন্তু আমারও বিশ্রামের জায়গা। এখানে এসে পৌছলে গায়ে হাওয়া লাগে, ধীরে ধীরে তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে আসে। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ কর, সমস্ত হিমালয় ছুটে বেড়াও আত্মতাড়নায় —কপাল বেয়ে ঘাম ঝরুক, মুখ দিয়ে ফেনা পড়ুক, মালিন্যময় হোক সর্বাঙ্গ, নিগ্রহ-পাণ্ডুর হোক দেহ,—কিন্তু ফিরে এসো হরিদ্বারে। সুশীতল ওর জলে নবজন্ম, ওর মধুর হাওয়ায় দেহমন স্নিগ্ধ। অত্যন্ত পুরনো সেই হরিদ্বার, কিন্তু ওর নূতনত্ব কাটে না। আমিই যেন ওকে দেখছি হাজার হাজার বছর থেকে—দেহ থেকে দেহান্তরে—এক জীবন থেকে অন্য জীবনে। তবু নতুন। নিবিড়ভাবে নতুন মৃতসঞ্জীবনী সুধার মতো ওর নীলজলের স্বাদ। ও যাদু জানে।

যাদু জানে বলেই হরিদ্বারের আদি নাম হলো 'মায়া'। শক্তি ওর মোহিনী,—তাই ইন্দ্রজাল বোনে প্রতি মানুষের মনে। সেই ইন্দ্রজাল—যাকে বলে 'ইলিউশান্'—সেই বস্তুর আকর্ষণ অচ্ছেদ্য। একবার যে হরিদ্বারে গেছে, দ্বিতীয়বার যাবার জন্য তার আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখেছি। একেই বলে মায়ার খেলা। ভক্তরা সেইজন্য ওখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন মায়াদেবীর মন্দির, তার থেকে মাইলখানেক এগিয়ে গেলেই মায়াপুরীর সন্ধিস্থল। অনেকবার মনে করেছি যে, হরিদ্বারকে দেখবো পুঙ্খানুপুঙ্খ, কিন্তু বত্রিশ বছর ধ'রে আনাগোনা ক'রেও সেই দেখা আর হয়ে ওঠে না। হাতের কাছেই ত' কলকাতার কালীঘাট, কিন্তু উৎসাহ কম। কাশী গেলেই ত' বৈঠকখানা,—অন্নপূর্ণা আর বিশ্বনাথকে দেখিনি কতদিন, মনেই পড়ে না। এলাহাবাদে আনাগোনা করি যখন তখন। কিন্তু ওই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। ত্রিবেণী প'ড়ে থাকে, প'ড়ে থাকে এই প্রয়াগ-দুর্গের তলায় অক্ষয়বট, আর প'ড়ে থাকে বৌদ্ধতীর্থ কৌশাম্বী প্রয়াগের পথের ধারে। হরিদ্বারও ঠিক তাই। ওর পথে ঘাটে যখন কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় জলতো তেলের আলো, আর অন্ধকারে এখানে ওখানে হাঁটতে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তুম,—তখন ছিল ওই মায়াপুরী রোমাঞ্চকর। কত লোক বলে, কপিলমুনি এখানে ব'সে তপস্যা করতেন—এই গঙ্গার ধারে, সে নাকি কঠিন তপস্যা। সুতরাং মায়াপুরীর সঙ্গে হরিদ্বারের আরেকটা নামও জড়ানো আছে, সে হলো কপিলস্থান। কতলোক

এখানে আসে কত দেশদেশান্তর থেকে। তারা দেখে বেড়ায় সূর্যকুণ্ড আর সপ্তধারা, গৌরীকুণ্ড আর পিছোড়নাথ, ভৈরব আর নারায়ণশিলা। ঘাটের ঠিক ধারে যে মন্দিরটি দেখে আসছি এতকাল ধরে, ওর মধ্যে নাকি আছে শ্রীবিষ্ণুর চরণচিহ্ন। আর মায়াদেবীর মন্দির, সেও এক দৃশ্য। দেবী হলেন চতুর্ভুজা দুর্গা, ত্রিমুণ্ড করাল মূর্তি। তাঁর এক হাতে মানবজাতির প্রতি অভয় আশীর্বাদ, অন্য হাতে মহাচক্র, তৃতীয় হাতে নর-কপাল, চতুর্থ হস্তে ত্রিশূল। ওর ব্যাখ্যা জানিনে; জানবার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু এ কথা জানি, সমস্ত মূর্তিটি অর্থহীন নয়—ওর মধ্যে কথা আছে, আছে তত্ত্ব, আছে রহস্য। কতদিন ঘুরে এসেছি ওই বনচ্ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত বিল্বকেশ্বর মন্দিরে, কিন্তু কোনদিন একথা আলোচনা করিনি, ওটার প্রকৃত নাম বিল্লোকেশ্বর, অথবা 'বিল্লকেশর।' কিন্তু পথঘাটের কোলাহল থেকে দূরে ওই মন্দিরটির পরিপার্শ্বে পিপ্পল অশ্বত্থের আবছায়ার তলায় লতাগুল্ম গাঁদা সন্ধ্যামণির ঝাড়ের গায়ে প্রাচীন শিবমন্দির—ওরই কাছে গিয়ে পাথরের শিলায় ব'সে আমার কত প্রভাত গিয়ে মিলেছে মধ্যাহ্নে, কত অপরাহ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে গেছে সন্ধ্যার কোলে! যাত্রীরা এসেই ছোটে হয়ত নীল্লোকেশ্বরে কিংবা কনখলে, কিংবা পঞ্চমুখ-অষ্টবাহু সর্বনাথ শিবদর্শনে। কতদিন ভেবেছি মায়ামন্দিরের বাইরে ওই যে মহাসিদ্ধ বোধিসত্ত্বের মূর্তি,—হয়ত ওরই নাম বিশাল ভারত। অমনি নিমীলিতনেত্র, অমনি তপস্বী, অমনি জরাব্যাধি বিকারবিহীন অনাদ্যন্ত-কালের ভারত,—কল্প-কল্পান্তের সমস্ত পতন-অভ্যুদয়ের আদিসাক্ষ্য ভারত।

কিন্তু আমার কোন তাড়া নেই, হরিদ্বারে এলে আমার ঘুম পায়। এখানে অবকাশ অনন্ত বলেই এত ঔদাসীন্য। এখানে কোন কাজের চাকা ঘোরে না, কেবল পূজার প্রহরের গম্ভীর মধুর ঘণ্টা বেজে বেজে থেমে যায়। সেই আওয়াজ ওই খরস্রোতা নীলধারার ওপর দিয়ে বহু দূর দূরান্তরে হিন্দু দর্শনের বার্তা ঘোষণা করে,—যেদিকে মর্ত্যলোক, যেদিকে দেবতার চেয়ে মানবতার দাম বেশী, জ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানের, আনন্দের চেয়ে আহ্লাদের। চ'লে যায় সেই আওয়াজ পাহাড় থেকে পাহাড়ে, মনসা থেকে চণ্ডী, মায়াবতী থেকে কনখল, হালতারাবাগ থেকে গুরুকুল। আমি গা এলিয়ে প'ড়ে থাকি ওই শ্রবণনাথ ঘাটের পাশে অশ্বত্থের তলায় রক্তবরন ঘাটের পাথরের সিঁড়িতে,—ওখানে জলস্রোতের ধারে কম্বল বিছিয়ে শু'লে পৃথিবীর সমস্ত ঘুম এসে আমার দুই চোখের পাতা জড়িয়ে ধরে। ওই জলস্রোতের তলায় আছে কিছু একটা ভাষা, কিছু একটা কাব্যের ব্যঞ্জনা; সেটা এত ঘন, এত নিগূঢ়—কিছুটা যেন তার উপলব্ধি করি, কিছু বা তার দুর্বোধ্য। বত্রিশ বছর ধ'রে শুনেছি ওই

কলস্বনা জাহ্নবীর মর্মের ভাষা,—আজও বুঝতে পারিনি। আজও জানতে পারিনি, সে-মন্ত্র কেন আমার রক্তে এমন করে ভেসে বেড়ায়।

সেই হরিদ্বার আজ নেই। সেই পাথরে হোঁচটখাওয়া রাস্তা, সেই ছোট্ট খোলা স্টেশন, আশেপাশে পাহাড়ি গুহাগর্ভে স্থানীয় লোকের বস্তী,—সেই অগণ্য গেরুয়াধারী সাধু-সন্ন্যাসীর ধুনিজ্বালানো আসন এখানে-ওখানে-সেখানে সেদিনকার হরিদ্বারের প্রাকৃত রূপের সঙ্গে দারিদ্র্যটা যেতো মানিয়ে। একটি দুটি পয়সায় প্রচুর সুযোগ সুবিধা মিলে যেতো। অন্নসত্র ছিল অবারিত। আহার ও আশ্রয় বিনামূল্যে—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জুটে যেতো। কে খাওয়াতো, কে জায়গা দিত, তামাকের আসরে কে ডেকে নিত, কেমন ক'রে জুটে যেতুম কথকের আসরে, কোন্ সাধুর হাত থেকে ভস্মতিলক পাবার লোভে কেমন করে তার পায়ের কাছে ভক্ত হনুমানের মতন বসে যেতুম—সে সব কথা এখন আর ওঠে না। সে মন নেই, সেই আবহাওয়া নেই, সে-হরিদ্বার নেই! এখন গেলে প্রথম চোখে পড়বে বিড়লা সাহেবের অত উঁচু ঘণ্টা ঘড়ি, ব্রহ্মকুণ্ডের মাঝপথে নেতাজী সুভাষের প্রস্তরমূর্তি! রাস্তা-ঘাট পিচঢালা, বিজলী বাতির ছয়লাপ, মহাদেবের জটানিঃসৃত গঙ্গার আলোকিত ফোয়ারা-মূর্তি পথের মাঝখানে। সর্বভারতীয় লক্ষপতিদের তৈরী শতাধিক প্রাসাদ। হাল আমলের স্নানাগার, মার্বেল পাথরের দালান, অসংখ্য মোটরযান, সিনেমা হাউস, রেডিয়ো যন্ত্রে বোম্বাই প্রেমের রসতরঙ্গ সঙ্গীত। সাধু সন্ন্যাসীরা বহু পালিয়েছে, তাদের দখল ক'রে নিয়েছে পাঞ্জাবের কামিনী-কাঞ্চন। গাঁজা-চরসের ধোঁয়া নেই কোথাও, তা'র বদলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বোতলে ভরা ঘোলা জল। কথকের আসর উঠে গেছে, দর্শনতত্ত্বের সভা গা-ঢাকা দিয়েছে; ভেট-ভোজনের রেওয়াজ উঠে গেছে,—তারা সব এখন জায়গা ছেড়ে দিয়েছে রাজনীতির ধাক্কায়। দুধ-মালাইয়ের দোকানের আশে-পাশে এখন চা ও কফি পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। ঠাকুর আর মন্দিরের পট উঠে গেছে, তার বদলে কোটপ্যান্ট পায়জামা আর চুড়িদার পরা মেয়েপুরুষ কোডাকের ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। ধর্মান্বেষী অপেক্ষা এখন স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড় ওখানে। আগে পাওয়া যেত উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ক পুরি, এখন দালদার চপ-কাটলেট। মাছ, মাংস, ডিম—কেউ খায় না হরিদ্বারে। কিন্তু পেঁয়াজটা চালু আছে। আর জোয়ালাপুর যখন হাতের কাছে, তখন সেখান থেকে গোপনে মাছ-মাংস-ডিম এনে যে-কোনো ধর্মশালার বন্ধ ঘরের মধ্যে বিনা পেঁয়াজে রাঁধলে কেই বা জানছে? সেই হরিদ্বারের হাওয়ায় চন্দনের গন্ধ আর পাওয়া যায় না।

এগুলো মন্দ কি ভালো—এ আলোচনা থাক্। কিন্তু এগুলো সময়-কালের তরঙ্গঘাত, সুতরাং মানতে হবে। মানুষ বদলেছে, সুতরাং হরিদ্বারও বদলাবে বৈ কি। মনসা পাহাড়টা উড়িয়ে দিতে পারলে বর্ষার সময় হরিদ্বার কিছু নিরাপদ হয়, হয়ত কর্তৃপক্ষ একদিন একথা ভাবতে বসবে। এখানকার ঘাটে ঘাটে যে লক্ষ লক্ষ মাছ ঘুরে বেড়ায়—এই মাছ চালান দিলে রাজ্যের প্রচুর আয় বাড়তে পারে, হয়ত একথা লোকের মাথায় ঢুকবে একদিন। সম্ভবত সেদিন বেকার সাধুসন্ন্যাসীরা কাজ পাবে, মন্দিরের মধ্যে মাইনে-করা পুরোহিত বসবে, ধর্মশালারা মেহনতি জনতার কোয়ার্টারে পরিণত হবে। এই ত' সেদিন কন্‌খলে গিয়ে দেখলুম—দক্ষঘাটের সর্বনাশ। বট-অশ্বত্থের তলায়-তলায় যে নীল জলস্রোত ছুটে যেতো প্রমত্ত তুরঙ্গদলের মতো, সে-জলের চিহ্নও নেই। ঘাট শুকনো। তলা থেকে পাথর বেরিয়েছে, সামনে পচা বদ্ধজলা, ওপারে বালুপাথরের ডাঙ্গা। পাণ্ডারা কপালে হাত দিয়ে বসে। যাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়—না আছে দক্ষঘাটের মহিমা, না আছে সেই প্রাচীন দিনের উদাসী হাওয়া। ভাগ্য ভালো, দাক্ষায়ণী বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির এই দুর্দশা দেখে আরেকবার দেহত্যাগ করতেন। পাণ্ডারা বললে হরিদ্বারের গঙ্গাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এদিকে স্রোতের ধারা ছেড়ে দেওয়াটা এখন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন। অতএব কন্‌খলের প্রাণরস অনেকটা গেছে শুকিয়ে। জলের সঙ্গে আসে জীবনের চাঞ্চল্য, তাই প্রবহমান জলধারার ধারে ধারে জনপদ গ'ড়ে ওঠে, মন্দিরে লোকে পূজা দেয়, সংসারযাত্রা হয় ক্রিয়াশীল। আজও সেই দক্ষপ্রজাপতির মন্দির বৃক্ষচ্ছায়াময় তপোবনে রয়েছে দাঁড়িয়ে, সেই রয়েছে দুর্গপ্রকারের ভগ্নাবশেষ, সেই পথের সামনে রয়েছে বাঙালী-পরিচালিত নাগেশ্বর মন্দির—কিন্তু ঘাটে জল নেই, তাই কোথাও রস নেই! মনে হচ্ছে যেন একটা জগৎজোড়া বিশালকায় বৈজ্ঞানিক দৈত্য—যার নাম আধুনিক—সে যেন দিক-দিগন্ত আচ্ছন্ন ক'রে এগিয়ে আসছে। সে গ্রাস করবে সব! বিজ্ঞানের শাসনে মনুষ্যজাতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

মোতিবাজার ছাড়িয়ে ভীমগোড়া পেরিয়ে সন্ধ্যার দিকে একা একা যেতে একদিন ভয় করতো, লালতারাবাগের সেই অশ্বত্থতলার গঙ্গার ধারটা ধ'রে নিরঞ্জনী আখড়ার পাশ দিয়ে একদিন একা একা মায়াপুরীর পথ পেরিয়ে যেতে সাহস হোতো না। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন সবটা সহজ, আলোক-মালায় সুসজ্জিত। হৃষিকেশের রাস্তাটায় ছিল দেরাদুন উপত্যকার ঘনগভীর অরণ্য,—আজও অনেকটা আছে,—কিন্তু ওই পথে বেরিয়ে দিনমানেও গা

ছমছম করতো—কেউ বলতো বাঘের উপদ্রব, কেউ বা বলতো ডাকাতদলের হানাহানি। আজ আর ও রাস্তায় এসব কথা ওঠে না। আগে ছিল হাঁটা, পরে হোল টাঙ্গা, এখন মোটর। মোটর বাস এখন ধুলো উড়িয়ে অবিশ্রান্ত আনাগোনা করে, সাধু-মহান্তরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। দুঃসাধ্য পথ এখন হয়ে গেছে সহজসাধ্য, অগম্য অঞ্চলই এখন অনেকের গন্তব্যস্থল। আগে হৃষিকেশ থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে কেদারনাথ হয়ে চামোলি পৌঁছতে লাগতো প্রায় বাইশ দিন, এখন মোটর বাসে লাগে একদিন আর একবেলা—অবিশ্যি কেদারনাথ বাদ দিয়ে। চেষ্টা করলে রেলস্টেশন থেকে কেবলমাত্র বদরিনাথ এখন মাত্র এক দিনে পৌঁছানো যায়। ভোরবেলা হৃষিকেশ থেকে ট্যাক্সি ছাড়লে সন্ধ্যায় বদরিনাথ।

চেষ্টা করেছি আধুনিক মন নিয়ে হরিদ্বারে ব'সে থাকবো। কিন্তু সম্ভব হয়নি। এক ফোঁটা হিন্দুরক্ত গায়ে থাকলেই ওটা যেন পেয়ে বসে। অবিশ্বাসীকে একবার থমকে দাঁড়াতে হবে, শ্রদ্ধাহীনকে ভাবতে হবে আরেকবার। সমস্ত আধুনিক উপকরণ সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বার অথবা হৃষিকেশে গিয়ে পৌঁছও, ক্রমশ দেখবে সেগুলো তোমার কাজে আসছে না। পোশাক আর পরিচ্ছদের বাহুল্যটা বেমানান লাগছে, প্রসাধন বিলাসটা অর্থহীন মনে হচ্ছে, ভোজনের বিস্তৃত আয়োজনটায় যেন অরুচি আসছে—আমিষের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছে। পেলে হয়ত খাই, না পেলেও ক্ষতি নেই। তুমি যদি সমস্ত একে একে ত্যাগ করো,—উৎকৃষ্ট ভোজন, আরামদায়ক বাসস্থান, মূল্যবান পোশাক, প্রচুর সম্ভোগের সুবিধা, শরীরকে নিত্য পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা,—এবং সব ছেড়ে যদি অত্যন্ত দীন-দরিদ্রের মতো পথে পথে বাসা বেঁধে বেড়াও—কেউ প্রশ্ন করবে না। কেননা তোমার এ চেহারাটা এখানকার সঙ্গে মিলবে। বরং বিপরীতকেই মেলানো কঠিন। অনেক রং মাখা পাউডার-বুলানো রেশমী মেয়েকে দেখেছি ওখানে পথের ধারে বসে হাসিমুখে বাসন মাজছে,—এতটুকুও আড়ষ্টতা নেই। আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাদের একটুও দেরি লাগে না।

মিথ্যা নয়, শ্মশান-বৈরাগ্যটাই এখানে মনের ওপর চেপে বসে। ওটা অদ্বৈতবাদের সংস্রব কিনা, ঠিক আমি জানিনে। কিন্তু হরিদ্বারের হাওয়াটা উত্তরের,—দেবতাত্মা হিমালয়ের হাওয়া! যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও সম্পদ—এগুলো প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তিই কামনা করে। কিন্তু এখানে এলে ওদের দাম ক'মে আসে। ওরা দ্বারের বাইরে প'ড়ে থাকে, কেননা এটা হরিদ্বার। ওদের নিয়ে প্রত্যহের যে কচ-কচি,—এখানে এলে তা তুচ্ছ, এখানে এলেই তারা

শাস্ত। যেটা অত্যন্ত দরকারি, সেটাই এখানে অর্থহীন। যে বস্তুটা কলকাতায় না হলেই চলেই না, সেটার কথা এখানে মনেই পড়ে না। হরিদ্বার থেকে চ'লে যাও দিল্লীতে অমনি ইচ্ছা হবে মন্দোদরীর পাশে সীতা এসে বসুক, লঙ্কা হোক স্বর্ণচূড়াময়, ত্রিভুবনের উপর প্রতিপত্তি হোক, স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত আমাকে ভয় করুক—আমার সমস্ত সাধ পূর্ণ হোক। হরিদ্বারের কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই, আজ শুদ্ধ শান্ত ধ্যানমৌন আনন্দ। এখানে সমস্ত জড়িয়ে যেন একটি স্তব, একটি ওঁকারধ্বনি—একটি অখণ্ড মহাকাব্য। যত পৌরাণিক কাহিনী আছে ব'লে যাও,—বিশ্বাস করবো। যত দেব-দেবতার অবাস্তব আজগুবী রোমাঞ্চকর রূপকথা আছে—সমস্ত মেনে নেবো। কেননা তাদেরকে এখান থেকে যেন দেখতে পাচ্ছি! এই তাদের লীলানিকেতন, এই দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে। দেখতে পাচ্ছি ভগীরথ গিয়েছিলেন এই পথ দিয়ে, এই পথে এগিয়ে গেলেই কর্ণপ্রয়াগে দাতাকর্ণের তপস্যার সঙ্গম। এই পথ দিয়ে সূর্যবংশাধিপের যাত্রা, এই পথই হোলো পাণ্ডবদের। কিচ্ছু অবিশ্বাস করবো না, কারণ এটাই হোলো 'মায়াপুরীর' মায়াজাল।

কখনো অসময়ে গিয়ে পড়েছি হরিদ্বারে। থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। চারিদিকে নিঃঝুম নির্জনতা। প্রভাতে মধ্যাহ্নে রাত্রে শুধু বেগবতী গঙ্গার দুরন্ত জলপ্রবাহের আওয়াজ। পথে পথে ঘুরে দেখেছি সমগ্র হরিদ্বার তন্দ্রাচ্ছন্ন। ধর্মশালার সিঁড়ির তলা দিয়ে পেরিয়ে গঙ্গায় গিয়েছে, জনহীন মন্দিরের চত্বরে গিয়ে পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছি,—কী যেন নিগূঢ় আশ্চর্য গন্ধ পাথরে পাথরে। কানে কানে কী যেন কথা হয়, কী যেন বীজমন্ত্র জপ করে। পাহাড়ের উপর থেকে চেয়ে থেকেছি, প্রাণিজগতে কোথাও যেন গতিবেগ নেই, চাকা ঘুরছে না, ঘড়ির কাঁটা চলছে না। যতদূর দৃষ্টি চলে, একটা উদাসীন অধ্যাত্ম শান্তি ছড়ানো, তা'র চাঞ্চল্য নেই কোথাও। হয়ত এইটিও ভারতের সত্য পরিচয়। এই শান্তিকে আহত করতে চেয়েছে কত যুগের কত জাতি, কত সভ্যতা, কত দস্যুতা। সাময়িক কালের সেই তরঙ্গাঘাতে হয়ত এই মহা-প্রাচীন ঐতিহ্যের তন্দ্রা ভেঙেছে, দুই চোখে হয়ত জ্বলেছে রুদ্রবহ্নি, হয়ত বা তা'র তাণ্ডব নর্তনে অসুরের হৃৎকম্প দেখা দিয়েছে—তারপরে আবার মহাস্থবিরের নিমীলিত নেত্রে এসেছে শান্তি, এসেছে ধ্যানবুদ্ধের অধরে প্রসন্ন স্মিতহাস্য। ধীরে ধীরে আবার ফিরে এসেছে সেই অনাদি প্রাচীনের চিরনবীন ধারাবাহিকতা। ওই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছি, আমার শিরা-উপশিরার রক্তের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে সেই তিন হাজার বছরের

ইতিহাস। ঝড়ের আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়েছি, অপমানে লুণ্ঠিত হয়েছে মাথা, হিংস্র অসুরের দংষ্ট্রাঘাতে ছুটেছে কত রক্তধারা, বেদনায় আড়ষ্ট হয়েছে সর্ব অঙ্গ, যন্ত্রণায় অশ্রু গড়িয়েছে কত শত বছর,—কিন্তু আঘাতের পরিবর্তে আমি প্রত্যাঘাত হানিনি, হিংসা করিনি, মনুষ্যত্ববোধের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটাইনি। আজ তিন হাজার বছর পরে সেই আমার সকলের বড় সান্ত্বনা। আমার ওই প্রাচীন বট-অশ্বত্থের কোটরে, ওই হিমালয়ের গুহা-গহ্বরে, ওই সুবিশাল সমতলের অসংখ্য প্রান্তরে, নগরে, জনপদে, নদীপথে, সাগরের বালুবেলায়, অরণ্যের বিজন ভীষণতায়—সংখ্যাতীত সভ্যতা এসে ছোট ছোট বাসা বেঁধেছে। তাদের অনেকে আজও রয়েছে এই ভারত-পথিকের হৃদয়ের মধ্যে। যুগে যুগে তা'রা সঞ্জীবিত হয়েছে আমার প্রাণরসে।

ওই চণ্ডীপাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরচত্বরে দাঁড়িয়ে কতবার দেখেছি ওই বিশাল ভারতকে, দূর দক্ষিণে চ'লে গেছে আমার দৃষ্টি, চ'লে গেছে আমার প্রাণপথিক। এই আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি সেই আমিকে। সে চলে গিয়েছে সমগ্র ভারত পরিক্রমায়। মানস সরোবরের থেকে গিয়েছে সে সিন্ধুনদে, গিয়েছে শতদ্রুর তীরে তীরে, গিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের পথে-পথে। সে জপ ক'রে ফিরেছে গোদাবরী, বেত্রবতী ও রেবার উপকূলে পাথরের আসনে-আসন। দৃষদ্বতীতে চন্দ্রভাগায় বিপাশায় যমুনায় গঙ্গায়—আর্যাবর্তকে আলিঙ্গন করেছে সে কতবার। সে চ'লে গিয়েছে পূর্ণায় মঞ্জিরায় ভীমায় কৃষ্ণায় আর বেদবতীর তটে তটে। চ'লে গিয়েছে সে রামগিরি মধ্যগিরি কৃষ্ণগিরি পেরিয়ে কবরীর অববাহিকা ছাড়িয়ে সেতুবন্ধের দিকে ভারতের আদি সভ্যতার পথের চিহ্ন ধ'রে। সে আমি কোথাও স্থির নয়, তবু নিত্য চাঞ্চল্যের মাঝখানেও সে শান্ত, সে উদাসীন, সে যোগাসীন। সমস্ত ক্ষয় ক্ষতি রক্তপাত রাষ্ট্রবিপ্লব মহামারী শত্রুভয় অরাজকতা—সকলের মাঝখানে থেকেও সে সকলের থেকে দূরে। সমস্ত সাময়িক চাঞ্চল্যের বাইরে, সকল উত্থানপতনের সীমান্তে। অনাদি অনন্ত ঐতিহ্যের ধারবাহী সেই আমি এই ভারতের নিত্য পথিক।

পাহাড় থেকে নেমে এলুম। আপাতত এবারের মতো বিদায় নেবো। যোগতন্দ্রায় আত্মনিমজ্জিত থাক্ হরিদ্বার। আমার পায়ের শব্দে তার ঘুম না ভাঙ্গে। মন্দিরে মন্দিরে পারাবতের ক্লান্তকণ্ঠে বৈরাগ্যবোধ অটুট থাকুক। নদী-নির্ঝরের আবর্তে আবর্তে তার মূল মন্ত্র নিত্য উচ্চারিত হোক, সামগান-মুখরিত মুনি-কি-রেতীর তপোবনে ঋষির আশ্রমোপান্তে বন্য ময়ূরের কেকারব শাঁওনকে আহ্বান করুক,—আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি।

এই গঙ্গা চলুক আমার সঙ্গে সঙ্গে, এই গঙ্গাকে চিনে চিনেই আবার আমি ফিরবো। আমি গাঙ্গেয়। এই হরিহরের দ্বার খোলা থাক্, এখান থেকে আবার এরা সবাই আমাকে ডাক দেবে। এই নীলধারা, মনসা-চণ্ডী, ওপারের অরণ্য, মায়াপুরীর আশ্রম, অশ্বত্থতলের এই রক্তবর্ণ প্রস্তরসোপান, হৃষিকেশ চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে ওই স্বর্গাশ্রম, ওই অন্তহীন টেহরী-গাড়োয়াল-ব্রহ্মপুরার পার্বত্য রহস্যলোক—ওরা ডাক দেবে আমাকে আবার। আপাতত ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিদায় হই !—

॥ ৪ ॥

শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথির আর মাত্র দিন চারেক বাকি। কিন্তু গতকাল অপরাহ্ণ থেকে পহলগাঁওর আকাশ এদিকে ওদিকে মেঘময় দেখা যাচ্ছে, সমগ্র কাশ্মীরে এখনও বৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু বৃষ্টি ত' দূরের কথা, আকাশে কোথাও মেঘের টুক্‌রো দেখলেই অমরনাথ-তীর্থের পাণ্ডারা মনে মনে উদ্বিগ্ন বোধ করে। ওই 'বাদলের' ছোট্ট টুক্‌রো থেকেই যাত্রীদের যত 'তকলিফ'—এ তারা জানে।

শিখদের পরিচালিত পহলগাঁও হোটেলে আছি প্রায় স্বর্গসুখে। কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে একবারও থাকিনি, কিন্তু এর চেয়েও তার পরিবেশ কি ভালো? এমন নিজের দখলে সুসজ্জিত ঘর এবং ঘরের প্রত্যেকটি জানলায় আর বারান্দায় নিজের দখলে এমন হিমালয়,—তুচ্ছাতিতুচ্ছ গ্রাণ্ড হোটেল! আমাদের বারান্দার সামনে লনের নীচে দিয়ে ছুটেছে নীলগঙ্গা,—যার বেয়াড়া নাম দেওয়া হয়েছে লিডার নদী। কাল থেকেই দেখছি নীলগঙ্গার ওপারে—ওই যেদিক দিয়ে চ'লে গেছে নিরুদ্দেশের পথ আমার হৃৎপিণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে—ওই ছোট্ট মন্দিরের পিছনে সাধুর আশ্রমের গায়ে পাইনের ঘন অরণ্য উঠে গেছে ন' হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে—ওরই কোলে-কোলে শিশু মেঘেরা বাসা বেঁধেছে—যেন জননীর বক্ষলগ্ন। গত কালও দেখেছি ওর উত্তুঙ্গ চূড়া থেকে সহস্রধারায় স্বর্ণরক্তিম রশ্মিদল নেমে এসেছিল নীলগঙ্গায়, তখন সূর্যদেব পশ্চিম পর্বতের অন্তরালে নেমেছেন, লগ্ন গোধূলি, অদূরবর্তী কিষণজির মন্দিরে বেজে গেল আরতির ঘণ্টা—আর সনাতন ধর্মমন্দিরে তখন বেদমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল·-শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা—! তারপরে এলো ধীরে ধীরে ঘন সন্ধ্যার ছায়া—যেন বিরাট একটি শতদল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো। দেখতে দেখতে চটুল মেঘের ফাঁকে নেমে এলো শুক্লা দশমীর দিকদিগন্ত

হিমালয়-ভরা জ্যোৎস্না। ইতর জনতার ভিড় নেই কোথাও আশেপাশে। চতুর্দিকব্যাপী পর্বতমালার ফাঁকে এই পহলগাঁও অঞ্চলটুকু হলো একটি উপত্যকা। নানা ধারায় গিরিনদীরা নেমে এসে একটি ধারার সঙ্গে এখানে মিলে সেটিকে প্রশস্ত করে তুলেছে। পাইন অরণ্যের এমন বিশাল বিস্তার হিমালয়ে কোথাও হঠাৎ চোখে পড়ে না। দার্জিলিং শিলঙ মনে আছে। গুলমার্গ কিংবা কুলু উপত্যকা ভুলিনি। ভুলিনি রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িয়ে মারী পাহাড় কিংবা কোহালার পথ। কিন্তু এখানকার পাইন অরণ্যের বিশালতার সঙ্গে কেমন যেন জড়ানো আছে এক রাজমহিমা, মন থেকে কেবল যে ভালো লাগে তাই নয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে ভ'রে ওঠে। শুক্লপক্ষের ভরা জ্যোৎস্না হিমালয়ে দেখেছি কত শত বার। এই জ্যোৎস্না ধ'রে ব'সে থেকেছি হৃষিকেশে কতবার—ওই যেখানে চক্রাকারে ঘুরেছে নীলধারা সগর্জনে, যার তীরে তীরে ঋষিকুলের তপোবন। এখানে তপোবন চোখে পড়ছে না, কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রির যাদুমন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে পর্বতমালায় আর নীলগঙ্গার অধিত্যকায়। দিনের বেলা স্পষ্ট ছিল পহলগাঁওর শোভা সৌন্দর্য। জলের ধার থেকে উঠে উপত্যকা পেরিয়ে পাইনের বন চ'লে গেছে পর্বতের দূর দূরান্তরে, যেমন তার সঙ্গে গেছে নিরুদ্দেশ নীলগঙ্গা,—অতুলনীয় দে-দৃশ্য। কিন্তু জ্যোৎস্নালোকে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি হয়ে গেল মায়াপুরী। আমি যে দাঁড়িয়ে আমি বাস্তব পৃথিবীর কঠিন প্রস্তরসঙ্কুল পথে, একথা ভুলেছি আমার অজ্ঞাতসারে—আমার সমগ্র অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটেছে এই স্বপ্নালোকে,—চেতনার বিন্দু একেবারে নিশ্চিহ্ন! আশ্চর্য সেই জ্যোৎস্নারাত্রি।

আমি যাচ্ছিলাম অমরনাথে। মনে ছিল হিমালয়ের অভিনবত্বের লোভ। মন্দিরের বদলে এবার গুহা। বিগ্রহ নয়, প্রস্তর শিলা নয়—একটা তুষার-আয়তন। ধীরে ধীরে সেটা নাকি চান্দ্রমাসের যোগ অনুসারে শিবলিঙ্গের আকার ধারণ করে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই লিঙ্গ দর্শন করে এমনভাবে একদা সমাধিস্থ হন্ যে, তীর্থযাত্রীদের অনেকে গিয়ে তাঁকেই অমরনাথ ব'লে ঠাওরান। তখন মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের আমল। আরও একটা বড় লোভ, এদিকের হিমালয়ের চেহারা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য। হিমালয় কখনও ধূসর, ঊষর, কখনো বর্বর, কখনও বা রুক্ষ। কখনও সে রুদ্রলোচন, কখন বা নিমীলিত-নেত্র। তাকে কখনও দেখলে জ্বালা করে চোখ, কখনও চোখ দুটো মধুর তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে। কখনও সে হিংস্র শার্দুলে, ভয়াল ভল্লুকে অথবা উন্মত্ত হস্তীতে ভীষণ, আবার কখনও সে গৈরিকবাস সন্ন্যাসীদলের তপোবনের প্রান্তে সামগানে মুখরিত। এখানে হিমালয়ের বিচিত্র চেহারা। সমগ্র কাশ্মীর এবং

তার চতুর্বেষ্টনী পর্বতমালার বহুলাংশ হলো মৃন্ময়, প্রস্তরময় নয়। এ চেহারা আমার কাছে নতুন। কাশ্মীর বড় কোমল—এত কোমল আগে মনে হয়নি। কিন্তু সে কথা এখন থাক। এখান থেকে হিমালয়ের উত্তরদিকে বিস্তার শুরু হলো—সোজা উত্তরে। তিব্বতকে ডান দিকে রেখে উত্তর হিমালয় চলে গেছে কৃষ্ণগঙ্গা পেরিয়ে কারাকোরাম পর্বতমালা অর্থাৎ কৃষ্ণগিরির শেষ পর্যন্ত। আশেপাশে দেখছি অসংখ্য পায়েচলা পথ চ'লে গেছে উত্তরে ও পূর্বে। কোনোটা গেছে কোলাহাই হিমবাহের দিকে, কোনোটা লাদাখে, কোনোটা লিডারবৎ ছাড়িয়ে সিন্ধু উপত্যকায়; কোনোটা তিব্বতে, কোনোটা বা দক্ষিণ লাদাখ হেমিস গুম্ফার দিকে—যেখানে যীশুখ্রীষ্টের ভারতভ্রমণের সমস্ত তথ্য-প্রমাণাদি গুম্ফার মধ্যে আজও সযত্নরক্ষিত আছে। অনেক পথ অপ্রত্যক্ষ, সেগুলি পাহাড়ী গুর্জরদের করায়ত্ত। আমরা যেসব অঞ্চলকে আমাদের অভ্যস্থ সংস্কারের দিক থেকে দুঃসাধ্য ও অগম্য বলি, একজন স্থানীয় মেষপালক তা বলে না। তারা অনায়াসে আনাগোনা করে পাহাড় থেকে পাহাড় পেরিয়ে তিব্বতে ল।দাখে পামীরে কারাকোরামের গিরি-সঙ্কটে অথবা মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু এই পহলগাঁও থেকে প্রত্যক্ষ একটি পথ নীলগঙ্গার ধারে ধারে গেছে শেষনাগের দিকে—যেখানে শেষনাগের বিশাল সরোবর। যেমন শতদ্রু কিংবা সিন্ধু নদের তীর ধরে গেলে, পাওয়া যাবে মানস সরোবর। কিন্তু কারো পক্ষে সেই নদীপথ ধ'রে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা যাবো শেষনাগের দিকে, শেষ-নাগের পথ ধরে গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়েই অমরনাথের উদ্দেশে আমাদের যাত্রাপথ। অনেকে বলে অমরনাথ এখান থেকে মাত্র তিরিশ মাইল, অনেকে বলে আরো কম। অর্থাৎ মোটামুটি তিনটি পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে গেলে আমরা পৌছতে পারবো। আমরা যাবো উত্তর-পূর্ব পথে। আমি নিজের হিসাবে পাই, দেড়দিন অথবা দুদিনে পৌছবো। কিন্তু আমার পাণ্ডা পণ্ডিত বদরিনাথ বলে, না, আপনারা চারদিনের দিন পৌছবেন, তার আগে পারবেন না। তার কথায় কিছু বিস্ময়বোধ করেছিলুম। তখন বুঝতে পারিনি এ পথের ক্ষেপ আছে, আবশ্যিক বিরতি আছে এবং পথের অনুশাসন মেনে চলতে আমরা বাধ্য।

তরণীযাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপিনীগণকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের মধ্যে কা'র ওজন কত পরিমাণ! গোপিনীরা মনে করলো, যে যত ভারী তা'র তত ভালোবাসা। সুতরাং কেউ বললে দেড় মণ, কেউ বললে দু'মণ, কেউ বা বললে আড়াই মণ। অবশেষে বাজি জিতলেন শ্রীমতী। তিনি বললেন, আমার ওজন এক মণ। এক মন নিয়ে তোমাকে দেখি, আমি একাগ্র একান্ত!

অতএব পহলগাঁও আপাতত থাক্—আমার একমাত্র লক্ষ্য হলো অমরনাথ আমি একমন।

হোটেলে আমাদের জিম্মায় দুটি ঘর, কিন্তু বাইরে যেতে গেলে আমার ঘরটি পেরিয়ে যেতে হয়। চমৎকার বসবাসের ব্যবস্থা আসবাবপত্র সমেত। বাথরুম, ড্রেসিং রুম আলাদা। দুটি ঘর মিলিয়ে দৈনিক চার টাকা। সেটি ১৯৫৩। পাশের ঘরটিতে আছেন আমার সাময়িককালের বন্ধু হিমাংশু বসু। কলকাতার ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্ক অধুনা স্টেট ব্যাঙ্কের হেড অপিসে চাকরি করেন এবং সুবিধা পাবামাত্র তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। সদালাপী এবং মিষ্টভাষী ব্যক্তি; উৎসাহী এবং কর্মঠ। কিন্তু একটু বেশী বয়স অবধি অবিবাহিত থাকলে যা হয়, অর্থাৎ মঠ ও আশ্রমের সাধু-স্বামীজীদের মতো স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি তাঁর সজাগ। এসব লক্ষণ ভালো, পথে-ঘাটে এসব দরকার। তাছাড়া তাঁর শরীরটাও বেশ হালকা, পাহাড়-পর্বতে ওটা কাজে লাগে। এখানে একটু অবান্তর কথা ব'লে ফেলি। বাইরে গিয়ে আমার সামান্য আত্মপরিচয়টুকু চিরদিনই আমি গোপন করি, বিশেষ ক'রে প্রবাসীবাঙালী সমাজে। ওতে আমার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতাটা অব্যাহত থাকে। কিন্তু দিন তিনেক আগে শ্রীনগর হোটেলের খাতায় আমার নাম সই দেখে হিমাংশুবাবু তেতলা থেকে নেমে আসেন। ভদ্রলোকের মুখের ওপর মিথ্যে বলতে গিয়ে থতিয়ে গেলুম। সেই থেকে আলাপ। পহলগাঁওয়ে এসে দ্বিতীয় বিপত্তি। কলেজ স্ট্রীটের পাড়ার দুটি যুবক যাচ্ছিলেন অমরনাথে—তাঁরা আমাকে পথের মাঝখানে চিনে বা'র করলেন। ফলে পরবর্তীকালে 'কুণ্ডু স্পেশালের' বাঙালী যাত্রীদের মাঝখানে আমাকে যেতে হয়েছিল ভূরিভোজের আসরে। ভাটপাড়া থেকে এসেছেন রেল কোম্পানির বাবু, ভট্‌চার্যি মশায়ের দল—অতি অমায়িক লোক তাঁরা। তাঁরাও জুটে গেলেন গায়ে গায়ে। এঁরা ছাড়াও দেখি আমাদের হোটেলের একটি শিপ ছোকরা বাহাদুর সিং—স্বত্বাধিকারীর ভাইপো। সে এমন ন্যাওটা হোলো যে, সহজে জট ছাড়াতে পারিনে। রাত্রে নৈশভোজের আসরে গিয়ে দেখি, কয়েকজন পাঞ্জাবী তরুণ-তরুণীর মাঝখানে বসে আছে বাহাদুর সিং আমাকে পরিচিত করাবে ব'লে। এপাশে হিমাংশুবাবু সহাস্যবদন। বুঝলাম ক্ষেত্রটা আগে থেকেই প্রস্তুত করা। হঠাৎ ওদের ভিতর থেকে একটি মেয়ে উঠে এলো। সুশ্রী ও দীর্ঘাঙ্গী বাঙালী মেয়ে। বুনো হাঁসের মধ্যে রাজহাঁসকে এতক্ষণ দেখতে পাইনি। তরুণীটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে শান্ত কণ্ঠে আলাপ করলেন। মুখ তুলে দেখি সাজসজ্জায়, দৈর্ঘ্যে, প্রসাধনে, ভ্যানিটি ব্যাগে—তাঁকে মানায় চৌরঙ্গীর পাড়ায়, কিংবা সিনেমায়। আঙুলের ডগায় নেইল্-

পালিশের ফলে প্রত্যেকটি নখের উপরে যেন রক্তিম হীরার আভা জলছে,—সুশ্রী চেহারার সঙ্গে প্রসাধনসজ্জার পারিপাট্যে সেই আভা মানিয়ে গেছে।

আহারাদির পর হিমাংশুবাবু নিয়ে গেলেন পান খাওয়াবার জন্য তাঁর দিদির বাংলোয়। দিদি? আজ্ঞে হ্যাঁ—আমার কেমন অভ্যেস, মেয়েদের সঙ্গে একটু পরিচয় হলেই আমি তাঁদেরকে ভগ্নীর মতন দেখি, দিদি বলি। উনি হলেন শ্রীনগর ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের এজেন্ট মিঃ রায়ের স্ত্রী। উনি যাচ্ছেন অমরনাথে, সঙ্গে আছেন একটি পাঞ্জাবী যুবক। মহিলা খুব সামাজিক সন্দেহ নেই।

জ্যোৎস্নার আলোয় পথ চিনে আমরা একটি ফুলবাগান-ঘেরা হোটেলে উঠে এলুম। নীচের খরতর প্রবাহ চলেছে। মিসেস রায় মিষ্টহাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। পান এনে দিলেন সযত্নে। মুখ তুলে দেখি তাঁর দুই চোখ ঈষৎ সুর্মাটানা। ভদ্রমহিলার বয়স আন্দাজ—না থাক মহিলাদের বয়স নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। তিনি জানালেন, পহলগাঁওর বহু অধিবাসী ও দোকানদার তাঁকে 'বহিনজী' ব'লে ডাকে। এখানে এলে তাঁর কিচ্ছু নগদ খরচ হয় না। শ্রীনগরে তাঁর স্বামীর কাছে বিল চ'লে যায়,– টাকাটা জমা পড়ে ব্যাঙ্কে, পাওনাদারের একাউন্টে। এখানে আসেন তিনি যখন-তখন। যেখানেই দরকার হবে আমরা যেন বলি শ্রীনগরের 'বহিনজীর' লোক আমরা—ব্যস, আমাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না। আর এই যে মোহন,—আমার পাঞ্জাবী ভাই,—আমিই ওকে বাঙলা শিখিয়েছি অনেক যত্নে।

পান খেয়ে খুশী হয়ে আমরা হোটেলে ফিরে গেলুম। আগামীকাল মধ্যাহ্নে আহারাদির পর আমাদের যাত্রা স্থির হলো।

যা বললুম এতক্ষণ, তা আগে-ভাগে ব'লে রাখা ভালো। এতে আমাদের যাত্রার আবহাওয়াটা বুঝতে পারা যায়। আজ হিমাংশুবাবুর সারাদিনের তৎপরতায় যাত্রার ব্যবস্থাগুলি প্রায় প্রস্তুত। প্রধান হলো দুজনের জন্য চারটি ঘোড়া, দুটি তাঁবু, পাটকরা খাটিয়া,—এছাড়া টুকিটাকি বহু আবশ্যক সামগ্রী। যে পথে যাচ্ছি সেখানে লোকালয়, খাদ্য, অথবা মানুষ বলতে কিছু নেই, পশু-পক্ষীও নাকি মেলে না। পাণ্ডারা ব'লে রেখেছে, চন্দনবাড়ি ছাড়ালে মানুষের চিহ্ন আর পাবেন না। জাস্কার পর্বতমালার গা ঘেঁষে আমরা যাবো। তার আশে পাশে ভারতের মানচিত্রের রাজনীতিক জরীপটা যথেষ্ট স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়।

আমরা আছি লিডার উপত্যকার মধ্যকেন্দ্রে। স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে গিরিনদীরা, এই পহলগাঁওতে তাদের প্রথম অবতরণ, এখান থেকে তারা চললো সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায়। এজন্য এই নদীটির নামও হয়েছে লিডার নদী, ওরফে নীলগঙ্গা। এখান থেকে দুটি পাহাড় অতিক্রম ক'রে গেলে

সিন্ধু উপত্যকা,—সেখানে সিন্ধুনদ প্রথম নেমেছে দুর্গম পর্বতমালা থেকে। তার এপাশে আরুবন্তি পেরিয়ে হলো লিডারবৎ এবং ওপাশে কোলাহাই হিমবাহ। চিরতুষারে আবৃত। এখান থেকে আরুর পথ হলো বনময় এবং নির্জন, যেমন পহলগাঁওর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের গভীর চিড়ের অরণ্য। আরু গিয়ে লিডার নদী এক সময় পাহাড়ের নীচে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। সে স্থলের নাম হলে 'গুরুগুম্ফা'। পহলগাঁও দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে। এক নদীপথের পাশে চলে গেছে শেষনাগের চড়াই, অন্য নদীপথ চলে গেছে লিডারবৎ ও কোলাহাই হিমবাহের দিকে। আমাদের আগামীকালের গতি শেষনাগের উদ্দেশে। শেষনাগের প্রকৃত নাম শ্রীশনাগ, শীর্ষনাগ অথবা শিষনাগ কিনা, আমার জানা নেই। রাত্রে এ নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি।

প্রভাতে প্রথম সংবাদ পাওয়া গেল, আকাশ পরিচ্ছন্ন। এর মতো সুসংবাদ সেদিন প্রভাতে আর কিছু ছিল না। গতরাত্রের জ্যোৎস্না যতবার ঘোলা হয়েছে ততবারই যাত্রীদের মুখ বিবর্ণ দেখেছি। হিমালয়ের আর কোনো দুস্তর তীর্থে এই প্রকারের উদ্বেগ দেখা যায় না। কেদার বদরির পথে যাও— আশ্রয়ের অসুবিধা কোথাও নেই। কৈলাসের অধিকাংশ পথ—অর্থাৎ লিপুলেক গিরিসঙ্কট পর্যন্ত—যেমন তেমন একটা আশ্রয় মেলে। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন যেভাবে দেখা দিক না কেন, দুচার মাইল পর পর মাথা গোঁজবার জায়গা মিলে যায়। এখানে সব বিপরীত। যাত্রী সংখ্যা বুঝে খাবারের দোকান দুচারটে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। 'ফার্স্ট এইড্' অর্থাৎ ডাক্তারী সরঞ্জাম সঙ্গে যাবে। তার সঙ্গে যাবে পুলিশ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। পাশে পাশে কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় মনোহারি ও পানচুরুটের বিকিকিনিও যাবে।

পাশের ঘর থেকে হিমাংশুবাবু সেই সুসংবাদটি নিয়ে যখন আমার বিছানার সামনে এসে বসলেন,—চা আসছে এক্ষুণি, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে নারীকণ্ঠে শোনা গেল, ভেতরে আসতে পারি কি ?

আসুন, আসুন—ব'লে সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে হিমাংশুবাবু গতকাল রাত্রির সেই চৌরঙ্গিনীকে অভ্যর্থনা করলেন। মেয়েটি সোজা সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার অসুবিধে হোলো না ত' ?

বিলক্ষণ, বসুন—

কম্বল ছেড়ে একটু উঠে বসলুম। এমন সময় চা এলো। হিমাংশুবাবু তাঁকেও চায়ে আহ্বান করলেন। আমি একটু বিব্রত বোধ করছিলুম বৈকি। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে এর জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। তবু ওর মধ্যেই একটু

গুছিয়ে নিতে হলো। হিমালয়ে এলে আমি পরিচ্ছন্ন চেহারাটা রক্ষা করতে পারিনে।

তরুণী বললেন, পহলগাঁও বেড়াতে এসেছিলুম ক'দিনের জন্যে। কিন্তু আজকেই চ'লে যেতে হচ্ছে শ্রীনগরে। আমার স্বামী আছেন দক্ষিণ ভারতে। আজ গিয়ে তাঁর চিঠি পাবার আশা আছে।

হিমাংশু প্রশ্ন করলেন, কি করেন আপনার স্বামী?

গায়ের গরম ওভারকোটটি গুছিয়ে ঢেকে তিনি বললেন, উনি কাশ্মীরের মিলিটারীতে আছেন। বিমানঘাঁটির গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু পদোন্নতির জন্য সেখানে একটি পরীক্ষা দিতে গেছেন। আমরা শ্রীনগরের কাছেই থাকি। দিন্ আমি আপনাদের চা ঢেলে দিই।

এবার তিনি দুখানি হাত বার করলেন। সেই নেল-পলিশ! কিন্তু আঙ্গুলগুলি দীর্ঘ নখর। অত্যন্ত সহজ ক্ষিপ্রহস্তে তিনি চায়ের ভরা পেয়ালা বিতরণ করলেন। হিমাংশুবাবুর জরুরী হাঁকাহাঁকিতে বয় এসে আরেক কেটলি চা দিয়ে গেল।

প্রথম প্রস্থ চা-পানের পর একটু নড়াচড়া ক'রে ব'সে তিনি বললেন, লেখকদের লেখা পড়ি মন দিয়ে, কত প্রশ্ন মনে আসে, কিন্তু লেখককে দেখলুম আমার জীবনে এই প্রথম। আপনাকে তাই দু'-একটি কথা জিজ্ঞেস করবো ব'লে সাহস ক'রে এসেছি। যদি কিছু না মনে করেন—

হাসি মুখে বললুম, একটু ভয় পাচ্ছি—!

হিমাংশুবাবুর সঙ্গে তিনিও হাসলেন, ভয় কেন?

বললুম, প্রশ্নকর্তা সামনে থাকে না তাই অনেক লেখক বেঁচে যায়। আপনার কথাটা আন্দাজ করতে পাচ্ছিনে। তাছাড়া লেখকের পরিচয়টুকু বাঙলা দেশেই ফেলে এসেছি, এখানে আমি হিমালয়-যাত্রী!

তরুণী বললেন, আমারটা হিমালয় ভ্রমণেরই প্রশ্ন।

তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। ভুল করেছিলুম কাল রাত্রে। অত্যন্ত আধুনিক প্রসাধনসজ্জার আড়ালে একটি অতি ভদ্র এবং বিনয়ী মেয়ে রয়েছে। এমন দীর্ঘাঙ্গী তন্বী এবং পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মেয়ে এযাত্রায় আর চোখে পড়েনি। কিন্তু মনে মনে ভয় ছিল, এই অতি-আধুনিক সাজ-পরিচ্ছদের অন্তরালে কি অনুরূপা দেবীর বাসা আছে? হিমাংশুবাবুর দিদির আঁচলে কি দিদিমা বাঁধা?

কিন্তু এমন মিষ্ট ভূমিকার পর তিনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন, সেটি আমার পক্ষে ক্লান্তিকর। কেননা বিগত বাইশ বছর ধ'রে সেই একই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হায়রান হয়েছি। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র 'রাণী' মেয়েটি কে?

এখন তিনি কোথায়? আপনার সঙ্গে কি আজও তাঁর দেখা হয়? তাঁর আসল পরিচয় কি?

আমার উত্তরটা কিছু রূঢ় পরিহাসপূর্ণ ছিল। উভয় শ্রোতা ও যাত্রী কিছুক্ষণ হেসেই অস্থির। পুনরায় কতক্ষণ চা ঢালাঢালি চললো। পরে তিনি বললেন, আপনারা অমরনাথ থেকে ফিরে কি শ্রীনগরে থাকবেন কিছুদিন?

ইচ্ছে আছে বৈকি। বেড়ানোটা সব এখনও বাকি।

তিনি সসঙ্কোচে বললেন, বলতে ভরসা হয় না। যদি আপনাদের অসুবিধে না হয়, আমার ওখানে থাকলে ভারি আনন্দ পাবো।

হিমাংশুবাবু বললেন, কিন্তু দিদি, আমি যে 'বোট্ হাউসে' থাকবো ব'লে স্থির ক'রে রেখেছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

অতএব আমার দিকে তিনি ফিরলেন। বললেন, আপনি না বললে শুনবো না। অন্তত দু' একদিন আমার ওখানে আপনাকে থেকে যেতে হবে,—এই অনুমতি দিন্। আমার স্বামী আপনার কথা শুনলে এত খুশী হবেন কি বলবো।

বললুম, অমরনাথ থেকে বেঁচে ফিরলে তবে আতিথ্য নেবার কথাটা ওঠে।

তিনি সোৎসাহে জানালেন, তাঁর নাম শ্রীমতী মায়া গুপ্তা এবং স্বামীর নাম সার্জেণ্ট কে সি গুপ্ত। তারপর শ্রীনগরের শহরতলীর ঠিকানাটা দিয়ে বললেন, কোনো অসুবিধে আপনার হবে না, সে-ব্যবস্থা আমি করবো। এবার আমি উঠি। বেলা দশটার বাস-এ যাবো, গোছগাছ আছে! অনেক বিরক্ত করলুম, কিছু যেন মনে করবেন না। আজ ফিরেই আমার স্বামী, আত্মীয়-বন্ধু সবাইকে চিঠি দেবো যে, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, আর আপনি আমার ওখানে গিয়ে উঠবেন।

এই ব'লে নত নমস্কার জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

এই আলাপের দিন দশেক পরে শ্রীমতী গুপ্তার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম বটে, কিন্তু জন্মাষ্টমীর দিনে শ্রীনগরের শহরতলীতে সেই সময় আকস্মিক ভাবে প্রবল বন্যার তাড়না দেখা দেওয়ায় মহিলাটিকে নিজ বাসগৃহ ছেড়ে আমার সঙ্গে শ্রীনগর ত্যাগ করতে হয়। সেই নাটকীয় কাহিনী কাশ্মীরের আলোচনায় বলবো।

আজ ২১শে আগষ্ট, ১৯৫৩। আমাদের তাড়া ছিল। চারটি ঘোড়া ঠিকাদারের জিম্মায় রাখা আছে। দুটি মালবাহী ঘোড়া আটত্রিশ টাকায় ভাড়া পাওয়া গেছে, আর বাকি দুটি চড়বার ঘোড়া চল্লিশ টাকায়। প্রত্যেকটি একজনকে-তাঁবু ছ' টাকায়। খাটিয়া দু টাকা, তোশক এক টাকা। অশ্বরক্ষীরা

সঙ্গে সঙ্গে লাগাম ধ'রে হেঁটে যাবে। সকলেই তা'রা কাশ্মীরের গ্রাম্য মুসলমান। এদিকে আমাদের তোড়যোড় করতেই এগারোটা বেজে গেল। আজ যাত্রীদের প্রথম গন্তব্যস্থল হলো চন্দনবাড়ি। চন্দনবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে আজকের মতো যাত্রা শেষ হবে।

ঘোড়া নিয়ে যে কাড়াকাড়ি আছে আগে জানতুম না। মধ্যাহ্নের ঠিক পরেই যাত্রাকালে খবর পাওয়া গেল, দুটি ঘোড়া আমাদের নিরুদ্দেশ। তখনই ছুটোছুটি প'ড়ে গেল। একই দিনে একই সময়ে শত শত যাত্রী মিলে একত্র যাত্রা না করলে নির্দিষ্ট শ্রাবণী পূর্ণিমায় কোনোমতেই অমরনাথে পৌছানো যাবে না। অজানা পথের যাত্রী আমরা সবাই। কোনো ব্যক্তি পিছিয়ে পড়লে অথবা এক বেলার জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলে তাকে গিয়ে একা একা জনশূন্য তুষার প্রান্তরে দিগন্তজোড়া আতঙ্কের মধ্যে নির্বাসিত হতে হবে। সে চেহারা দেখেছি, পরে বলবো। সুতরাং আমরা ওই পহলগাঁও উপত্যকার মাঠে-মাঠে বিপন্নভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগলুম। ঠিকাদার, তশীলদার, পুলিশ, কোতোয়ালী ইত্যাদি নানাস্থলে উমেদারি ও সুপারিশ করতে করতে ঘণ্টা দুই পরে অবশেষে আমাদের সুরাহা হোলো। ঘোড়া চারটিকে এবার আঁকড়ে ধ'রে রইলুম। দুর্গম তীর্থপথের এই অকৃত্রিম বন্ধু কয়টিকে সকাল থেকে চোখের সামনে বেঁধে রাখলেই ভালো হতো। আমরা প্রত্যেকেই যেন স্বার্থস্বচেতন হয়ে উঠেছি।

'কুণ্ডু স্পেশালের' প্রায় শ' দেড়েক যাত্রী আগেভাগে বেরিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী মহিলা ও পুরুষ আছেন। অনেকেই গেছেন পায়ে হেঁটে, অধিকাংশ ঘোড়ায়, কয়েকজন উচ্চমূল্য ডাণ্ডিতে। এছাড়া পাঞ্জাবী স্ত্রীপুরুষের সংখ্যাও কম নয়। এবারে রাজনীতিক কারণে যাত্রিসংখ্যা কম। তবুও সব মিলিয়ে আন্দাজ সাত আট শো। এদের মধ্যেই আছে সাধুসন্ন্যাসী, আছে যোগীফকির। কেদার বদরি অথবা কৈলাসের দিকে যাত্রাকালটা যেমন দীর্ঘকাল অবধি প্রসারিত, এখানে তেমন নয়—ওই একটিমাত্র দিন শ্রাবণী পূর্ণিমা! পৌছতে যদি পারো তবে যাও, নৈলে আবার আসছে বছর। এ-যাত্রায় সকলের আগে গেছে প্রথম অমরনাথের পূজারীর দল, তারা প্রথম-অভিযাত্রী, গেছে পায়ে হেঁটে। তাদের সঙ্গে আছে শ্রীঅমরনাথের আসাসোঁটা আর রাজছত্র, আছে পুজোর উপকরণাদি, আছে শঙ্খ-ঘণ্টা। এরা প্রতি বছরই সকল যাত্রীর আগে গিয়ে গুহায় পৌছয়। মার্তণ্ড শহর থেকে ওরা প্রথম রওনা হয়। রাজ সরকার থেকে ওরা সাহায্য পায়।

আমরা প্রায় সকলের পিছনে পড়েছি। তবু এখনো অপরাহ্ন আড়াইটে-

বোধ হয় বাজেনি। রৌদ্র বেশ প্রখর। মেঘ যদি না করে আমাদের অসুবিধা কিছু নেই। প্রথমটা পথ যথেষ্ট প্রশস্ত নয়, পাশাপাশি দুটি ঘোড়া যাওয়া অসুবিধা। শান্ত পাহাড়ী ঘোড়া অনেকটা তার নিজের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে আমাদেরকে নিয়ে চললো উত্তরপথে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বাঁকে দেখতে পাচ্ছি সুদীর্ঘ পথে শ্রেণীবদ্ধ ঘোড়ার ক্যারাভান। পহলগাঁও ছাড়ালেই লিডার নদীর নড়বড়ে সাঁকো পাওয়া যায়, তারপরেই সরকারি টোল আপিস। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই, দরিদ্র অশ্বরক্ষীদের কাছ থেকে এখানে অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করা হয়। তীর্থপথে কোনো ট্যাক্স নির্ধারিত থাকলে মন ছোট হয়ে আসে। দরিদ্র ব'লে রেহাই পায় না কেউ। দোহন থেকেই দাহনের উৎপত্তি—একথা কর্তৃপক্ষ মনে রাখলে ভালো হয়।

পথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হচ্ছে, আমাদের ঘোড়া চলেছে সার বেঁধে। একের পিছনে আর একজন সারবন্দী। কেউ কেউ পাশ কাটিয়ে ঘোড়া নিয়ে সোৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। প্রশস্ত উপত্যকা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কটাপন্ন হয়ে এলো। ক্রমশ নাগাধিরাজের রহস্যদ্বার আমাদের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। আকাশে ছোট হয়ে আসছে। নদীর ঝরো-ঝরো আওয়াজ বেড়ে উঠছে। আমরা নরলোক থেকে যাচ্ছি দেবলোকে। এখানে পথ চার ফুট থেকে ছয় ফুট আন্দাজ প্রশস্ত, কিন্তু অতিশয় বন্ধুর। যে-ব্যক্তি আমার অশ্বরক্ষী, তার নাম গণিশের। জাত কাশ্মীরী, কিন্তু চেহারায় আর্য। ঘন সবুজের সঙ্গে নীলাভ দুটি চোখ টানা টানা। দীর্ঘকায় সুশ্রী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মানুষটি যেমন নিরীহ, তেমনি ভদ্র। কাশ্মীরের মুসলমানরা সাধারণত দাড়ি-গোঁফ রাখে না। আচরণে দেখেছি এদের ত্রিসীমানার মধ্যে অসাধুতা, অশিষ্ট আচরণ, যাত্রীর প্রতি অবহেলা কি ঔদাসীন্য, এসব কিছু নেই। এদের কোনো ব্যক্তিকে নমাজ পড়তে দেখিনি কোনো পথে। মুখেচোখে সর্বদা সহাস্য বন্ধুত্ব, নিরন্তর স্নেহ ও সহযোগিতা। অনেক সময়ে ওদেরকে পরমাত্মীয় ব'লে মনে করেছি। এরা পাহাড়ের সন্তান, পাহাড়ের কাঠিন্য এবং সৌন্দর্য দিয়ে এদের দেহমন তৈরী, উদার পর্বতমালার থেকে এরা আপন স্বভাবকে আহরণ করেছে। গাড়োয়ালে ঠিক এই দেখেছি—এই স্নেহ, এই সাধুতা, এই সহযোগিতা। দেখেছি সীমান্তের পাঠান মহলে, দেখেছি নেপালে, ভীমতালে, দেখেছি কামরূপে, দেখেছি কৌশল্যা নদীর পারে সোমেশ্বরে। সমগ্র হিমালয়ের থেকে এরা পেয়ে এসেছে বন্য সাধুতা আর সরলতা।

চড়াইপথে চলেছি, কখনো নামছি, কখনো বা উঠছি। মাঝে মাঝে কাশ্মীরী মেয়েরা সামনে এগিয়ে এসে ভিক্ষা চাইছে। সেই ঘনকৃষ্ণ চোখ

বনহরিণীর, পরনে ঘাঘরা, মাথায় কাপড়ের টুকরো বাঁধা, দুধে আর রক্তে মেলানো বর্ণ। এরা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কিন্তু দরিদ্র। মুসলমান, কিন্তু পর্দা নেই। বাঙ্গলার গ্রামে যে দারিদ্র্য, তার সঙ্গে এখানে বর্ণে বর্ণে মেলে। তবে তফাৎ এই, বাঙ্গলায় অর্ধনগ্ন অথবা উলঙ্গ থাকলে সহজে মরে না, আর এখানে উলঙ্গ থাকা যায় না। এদের চেহারা দেখলে আমি বিস্মিত হই, কারণ অবিভক্ত ভারতের কোনো মুসলমানের সঙ্গে এদের চেহারার মিল নেই। তুর্ক ইরাণী রক্ত নয়, এরা আগাগোড়া আর্য। রক্তের মধ্যে হিংসা ও বর্বরতা আনেনি। সেই কারণে সীমান্তের থেকে যখন পাঠান দস্যুরা এই সেদিন কাশ্মীরকে আক্রমণ করে, কাশ্মীরের আর্য মুসলমানরা তাদের সঙ্গে হাত মেলায়নি। রক্তের মূল পার্থক্য আছে ব'লেই পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পাকিস্তানের মিল কোনোমতেই ঘটতে পারছে না। অমন সুন্দর মেয়েদের চোখ, অমন ব্যাকুলতা—কিন্তু কারুণ্য এবং মিনতি সুস্পষ্ট। শত শত বছরে ওদের এ দারিদ্র্য ঘোচেনি। পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার বাইরে যে সমতল ভারত-ভূভাগ অতি বিশাল কিংবা পৃথিবী অনেক বড়—এ ওরা জানে না। ওরা জানে, যারাই আসে কাশ্মীরে তারাই ধনী, তারাই দাতা। ওরা কেঁদেছে অনেক কাল, মার খেয়েছে শত শত বছর ধ'রে। আফগানীরা মেরেছে, আফ্রিদী পাঠানরা মেরেছে, তুর্কীরা মেরেছে, হুনদের হাতে মার খেয়েছে, তাতাররা মেরেছে বারম্বার—এমনকি এই সেদিনের শিখ রাজত্ব—তাদেরও হাতে ওদের হাড়পাঁজরা গুঁড়িয়ে গেছে। মোগল অথবা ইংরেজ ওদের মারেনি। মহারাজা গুলাব সিংহের আমল থেকে ওরা আর মার খায়নি। এই শত সহস্র বছরের অপমানজনক ইতিহাসকে সরিয়ে ওরা আজও ঘর গুছিয়ে তুলতে পারেনি, আজও কর্মী পুরুষকে মানুষ ক'রে তুলতে পারেনি। তাই ওরা পথের মাঝখানে এসে শত শত হাত পেতে দাঁড়ায়, সভ্য জাতিদের কাছে প্রাণের আবেদন জানায়। আমাদের কাছে কাশ্মীর ভূস্বর্গ, ওদের কাছে কাশ্মীর চির দারিদ্র্যের নরককুণ্ড।

পথ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পাহাড়ের গা-বেয়ে চলছি। পাশেই নীলগঙ্গার গভীর নীচু খাদ। দুইধারে পর্বতমালার বন্য শোভা। মাঝে মাঝে জলপ্রপাত এপাশে ওপাশে সগর্বে নামছে। এখনও লোকালয় পাওয়া যাচ্ছে, এখনও সুশ্রী বলিষ্ঠ আর্যনাসা ও চক্ষুযুক্ত পার্বত্য স্ত্রীপুরুষকে মাঝে মাঝে দেখছি। এপারে ওপারে একটু আধটু গ্রামের চিহ্ন—কোথাও কাঠের কাজ, কোথাও বা দর্জির ঘর। তাদের মাঝখান দিয়ে আমাদের সুদীর্ঘ ক্যারাভান চলেছে দীর্ঘবিলম্বিত বিরাটকায় প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো। নীলগঙ্গার

অবিশ্রান্ত ঝরো-ঝরো আওয়াজ শুনতে শুনতে অশ্বারোহী যাত্রীর দল শান্ত মনে পাহাড়ীপথ অতিক্রম ক'রে চলেছে। ডাণ্ডি চলেছে বাঙালী মহিলাকে নিয়ে। ভাটপাড়া চলেছে হেঁটে তরুণ দলের সঙ্গে। পাঞ্জাবী মেয়ে আর শিশু চলেছে ঘোড়ায়। এদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মালবাহী ঘোড়ার দল। গাছের ডাল হাতে নিয়ে আমরা চলেছি ঘোড়সওয়ার—আশঙ্কায় কণ্টকিত, কোমরের ব্যথায় আড়ষ্ট। কখনো অজস্র বহুবর্ণ বন্য ফুলের গন্ধ, কখনো পতঙ্গদলের রঙ্গীন পাখার গুঞ্জন, কখনো বা অনামা পাখিদলের এপার থেকে ওপারে যাবার ডানা চালনার আওয়াজ। স্তব্ধ পার্বত্যপথ, শব্দহীন অরণ্যলোক। চোখের মুখে সকলের নির্বাক বিস্ময়, এক পথ থেকে অন্য পথে যেন একটির পর একটি অজানালোক আমাদের চোখের সামনে তাদের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন করছিল। আমরা চলেছি ভূস্বর্গে।

সহসা সামনের দিক থেকে একটা কলরব ভেসে এলো পিছন দিকে। আমরা একটা নির্ঝরিণীকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গেলুম। কাছে গিয়ে দেখি একটি অপঘাত ঘটেছে। ছোট একটি পাঞ্জাবী মেয়ে-পুরুষের দল যাচ্ছিল। তাদের ভিতর থেকে একটি মহিলা ঘোড়া থেকে নদীর খাদের দিকে প'ড়ে যান। মাথাটা পড়েছিল নীচের দিকে, তাই কান ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, সর্বাঙ্গের ক্ষতচিহ্নগুলি রক্তাক্ত। কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান ছিল না, এখন প'ড়ে রয়েছেন পথের ওপর। আত্মীয়রা অপেক্ষা করছে আশেপাশে। 'ফার্স্ট এইড' দেওয়া হচ্ছে। কারণটা হোলো, সঙ্কীর্ণ পথে ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার ধাক্কা লেগে খাদের দিকে তিনি ছিটকে পড়েন। অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, নদীর নীচে গড়িয়ে যাননি। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার থেকে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করলো।

মাঝে মাঝে পথ নেই, আছে পায়ে চলার দাগ, আছে বড় বড় গাছ-পাথরের ফাঁক। সেটাকে পথ বলো, স্বীকার করবো। কখনো মাথা হেঁট হয়ে ঘোড়ার পিঠে উপুড় হতে হচ্ছে, মাথায় লাগতে পারে গাছের ডাল, কিংবা পাথরের খোঁচা। কখনো ঘোড়ার পিঠে ব'সে হাঁটুতে লাগছে পাথরের ধাক্কা, কিন্তু পা সরাবার উপায় নেই, ভারসাম্য রক্ষা হয় না। চোখ দুটো থাকে পথের রেখায়, পার্বত্য সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশ কম। নীচে থেকে উঠছি উপরে, উপর থেকে নীচে। যাঁরা ডাণ্ডিতে চড়েছেন চারটে মানুষের কাঁধে, তাঁদের পাদুটো কখনো উপরদিকে এবং মাথাটা নীচের দিকে। কখনো পাদুটো এত নীচে ঝোলে যে, ডাণ্ডি থেকে পিছলে না প'ড়ে যান। মাঝে মাঝে নদীর নীচের দিকে শষ্পাচ্ছন্ন লতাগুল্মসমাকীর্ণ গুহাগহ্বরে অন্ধকারের

দল পাকানো। পাথরের উপরে দুগ্ধফেননিভ গর্জমান জলপ্রবাহ আছাড় খেয়ে ধূমেল শিকরকণা উৎক্ষিপ্ত করছে। ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যবিটপীর নীচে উন্মত্ত তরঙ্গের সেই উদ্দাম মাতামাতি চোখ ভ'রে দেখলে মন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যেমন দেখেছি কত শতবার অলকানন্দায় আর কোশীতে, বাগমতীতে আর তিস্তায়, বিপাশায় আর চন্দ্রভাগায়, নীলধারায় আর মন্দাকিনীতে। ওদের তীর থেকে কতদিন কত পাখি উড়ে গেছে আমার মনের খবর নিয়ে, কত তৃষ্ণার্ত তীর্থপথিক জলপান ক'রে উঠে গেছে নিরুদ্দেশে, কত জন্তু আর সরীসৃপ ওদের ধার থেকে আমায় দেখে স'রে গেছে গুহাগহ্বরে আমারই উদগ্রীব রহস্যবোধের ক্ষুধা নিয়ে। টের পাই আমার মধ্যে আছে একটি কীট, সেই কীট কেবলই খোঁজে এই হিমালয়ের পথ আর পাথর। তার বন্যপ্রকৃতি কামড়ে থাকে এই নগাধিরাজের প্রতি পাথরের টুকরো, প্রতি নির্ঝরিণীর তট-প্রান্তের শৈবালের মূল, প্রতি বৃক্ষের কোটর, প্রতি পাতায় গুল্মে, তুষারে বরফে নদীপথে, প্রতি তীর্থে, প্রতি পথিকের পায়ের তলায়,—সে বাসা বেঁধে থাকে বড় আনন্দে! সে থাকে হিমালয়ের প্রতি ধূলিকণায়, প্রতি রন্ধ্রে আর গহ্বরে, প্রতি মন্দিরের প্রাচীন পাথরে, প্রতি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায়। অমৃত যুগে, সমুদ্রমন্থনে, দেবাসুরের সংগ্রামে, ত্রেতাযুগে, বাল্মীকি-বেদব্যাসে, ভারতের আদিম সভ্যতায়, আর্য-অনার্যের সজ্ঘর্ষণে, বেদে উপনিষদে, পুরাণে ইতিহাসে,—সেই কীট চ'লে এসেছে কল্পে-কল্পান্তে, যুগ থেকে যুগান্তরে, মানুষের বংশপরম্পরায়, অস্তিত্বের পর্বে পর্বে। আমি সেই কীট হিমালয়ের,—সেই কীটানুকীট সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনক্রমে।

থাক্, আমাদের পথ আজকের মতো ফুরিয়ে এসেছে। উত্তুঙ্গ পর্বতমালার শীর্ষে দিনান্তের রক্তিম রোদ দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে চন্দনবাড়ির অধিত্যকাটি চোখে পড়ছে। প্রায় আট থেকে ন' মাইল পথ পেরিয়ে এলুম। সাড়ে নয় হাজার ফুটে এসে এবার যেন বেশ শীত ধরেছে।

প্রায় ঘণ্টা চারেক লাগলো বৈকি চন্দনবাড়ি পৌঁছতে। পথের শেষ অংশটা বড়ই বন্ধুর ছিল। যারা বরাবর হেঁটে এসেছে তাদের পায়ের ইতিহাসটা আমার জানা। মনে মনে তাই সমবেদনা বোধ আসে। আমরা ঘোড়ায় আসছি, কিন্তু তা'তে পায়ের কিছু স্বস্তি থাকলেও মেরুদণ্ডের নেই। কাঠ হয়ে ব'সে থাকতে থাকতে পিঠের দিকে টনটন করে। তা ছাড়া ঘোড়ার পায়ের ওপর বিশ্বাস আসে না। খাদের ধার ঘেঁষে চললে আতঙ্কিত শরীর

ডৌল হয়ে আসে পলকে পলকে। সবচেয়ে নিরাপদ হোলো পায়ে হাঁটা, কেননা সেটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে।

চন্দনবাড়ি অধিত্যকা হোলো একটুখানি অবকাশ মাত্র। চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, মাঝখানে এইটুকু ফাঁক। সামনে কয়েকখানি লাল রংয়ের করোগেটের চালা, লোহার ফ্রেমে আঁটা। বছরে দু' একটি দিন এসে গরীব তীর্থযাত্রীরা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি বাঁচিয়ে এখানে আশ্রয় পায়, তারপর সমস্ত বছর শূন্য চালা হা হা করে। অত্যধিক তুষারপাতের সময় পাহাড়ী ভালুকরা এখানে এসে জায়গা নেয়, কিংবা উপত্যকার অন্যান্য জন্তু। পাশ দিয়ে অনেক নীচে খরতর প্রবাহে চলেছে নীলগঙ্গা বা লিডার নদী। আমরা এসে যখন ঘোড়া থেকে নামলুম, তখন সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের একটু কাঁপিয়ে দিল। অশ্বরক্ষী গণিশের এবং তা'র সহকারী মিলে খোঁটা পুঁতে আমার ও হিমাংশু-বাবুর তাঁবু দুটি খাটিয়ে দিল। তাঁর একটু জ্বরভাব থাকলেও উৎসাহটা ঢিলা নয়। সন্ধ্যার ছমছমে ছায়ায় এদিক-ওদিক ঘুরে দেখি আমাদের আগে এসেছে প্রায় সবাই এবং সমস্ত অধিত্যকাটি জুড়ে তাঁবু পড়েছে এবং নানা জিনিসের দোকান ব'সে গেছে। তাঁবুর পর তাঁবু—পা বাড়াবার উপায় নেই। কোথাও কেউ জ্বেলেছে কাঠের আগুন, কেউ ময়লা হারিকেন, কেউ বা মোমবাতি। শীত ধরেছে সকলের, অনেকে জবুথবু হয়ে কম্বলের রাশির তলায় ঢুকেছে। সাধু, মহন্ত, বাবাজী, সন্ন্যাসী, নাগা ফকির, গৃহস্থ স্বামী-স্ত্রী, এমন কি কয়েকটি কচি শিশু ও বালক-বালিকাও সঙ্গে এসে উপস্থিত। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এলো এবং ওপারের পাহাড়ের পাশের চাঁদ এপারের পাহাড়ের চূড়াটিকে ঈষৎ উজ্জ্বল ক'রে তুললো। আমাদের ছোট অসমতল প্রান্তরটুকু নীচের দিকে প'ড়ে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো। শত শত লোক তাদের একটি রাত্রির জীবন নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুব দিল। পথঘাট বলতে কিছু নেই। বর্ষার জলস্রোতের আঘাতে যেটুকু ভেঙে এসেছে, সেইটুকুই হোলো আনা-গোনার পথ। আশেপাশে ঘন জঙ্গল, এখানে-ওখানে একটু-আধটু লোকালয়। আগেকার কালের তীর্থযাত্রায় যে শ্রেণীর লোক আসতো তা'রা সংসার থেকে প্রায় বরখাস্ত ছিল। অল্পবয়সী স্ত্রী-পুরুষ বড় একটা চোখে পড়তো না। ইদানীং চাকা ঘুরছে। কাঁচা বয়সের যাত্রীরা যায় সর্বত্র। সবটা অধ্যাত্মপিপাসা নয়, কিছু দুর্গম ও দুঃসাধ্য পথের টান, কিছু অভিনব জীবনযাত্রার আকর্ষণ, কিছু বা আবিষ্কারের আনন্দ। সামাজিক জীবন থেকে সাময়িক একটা স্বচ্ছন্দ মুক্তি, সেটাও কম লোভনীয় নয়। আমরা আসবার সময় দেখেছি, অল্প বয়সের অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ,—তাদের মধ্যে বাঙালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, মাদ্রাজী

অনেকেই আছে! একটি দম্পতি এসেছে ছয় মাসের শিশুকে নিয়ে, তাদেরও দেখেছি। অসমসাহস সন্দেহ নেই।

শীতে ঠকঠক করছে বহুলোক। ফুটন্ত চা গিলছে অনেকে। মিলিটারী এসেছে একদল, পুলিশের লোক এসেছে কয়েকজন। অদূরে শিখ দোকানদার রুটি সেঁকছে, পরটা ভাজছে, চা বানাচ্ছে,—ভিড় জমেছে সেখানে। গণিশেরের দল ভাত আর ভাজি এনেছে তাদের পিঠে ঝুলিয়ে,—কাঠের আগুন সামনে রেখে তা'রা ব'সে গেছে। হিমাংশু গিয়ে জুটেছেন ওই শিখের দোকানে। তিনি আলাপী লোক, অতএব আসর জমিয়ে বসেছেন দোকানের বেঞ্চিতে। সামনে হারিকেন জ্বলছে।

অন্ধকার থেকে আলোয় এসে বসলুম বেঞ্চির এক কোণে। হিমাংশুর পাশেই জন দুই মিলিটারী যুবক খাবার খাচ্ছে। কথা কইতে কইতে জানা গেল ওদের মধ্যে একজন বাঙালী। এ অঞ্চলে মিলিটারী বাঙালী? হিমাংশুবাবু মহা খুশী হয়ে নতুন উৎসাহে আলাপ করতে শুরু করলেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সামরিক বিভাগে যে মেডিক্যাল ইউনিট্ আছে, তার মধ্যে শতকরা ষাটজনই বাঙালী অফিসার। এই যুবকটি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে যাচ্ছেন অমরনাথ দর্শনে। তীর্থের মোহ ঠিক নয়, দুর্গমের আকর্ষণ। আমার সঙ্গে হিমাংশুবাবু তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফলে, সহসা যুবকটির চোখে মুখে সেই হারিকেনের আলোয় কেমন একটা নাটকীয় চমক লাগলো। আমার অলক্ষ্যে বার বার তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শুনলুম তাঁর নাম মিঃ মজুমদার। চেহারাটা পল্টন দলেরই উপযুক্ত। যাই হোক, কোনোমতে আহারাদি সেরে বেশী কথাবার্তা আর না ব'লে সেদিনকার মতো তিনি বিদায় নিলেন। আলাপটা দীর্ঘস্থায়ী হোলো না।

আমাদের পাণ্ডা বদরিনাথ বুদ্ধিমান লোক। সে তার ভাই শিউজীকে রেখেছে আমাদের তত্ত্বাবধানে। সে এসে আমাদের তাঁবুর কাছ দিয়ে ঘুরে-ফিরে যাচ্ছে, খবরদারি করছে। এইভাবে অনেক যজমানকেই সে নজরবন্দী ক'রে রেখেছে। আমাদের তাঁবু দুটো পড়েছিল নদীর ধার ঘেঁষে। তাতে কিছু দুর্ভাবনাও ছিল,—অর্থাৎ জন্তু জানোয়ার অথবা সাপের ভয়, স্বস্তি কিছু ছিল - নিরিবিলি থাকা। গণিশের ও তার দলবলের লোকরা ঘোড়াগুলির পা বেঁধে এখানে ওখানে ছেড়ে দিল, -সেগুলো সমস্ত রাত ধ'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘাস খেয়ে বেড়াবে। নিজেরা শুলো লুই কম্বল মুড়ি দিয়ে আশেপাশে। আমরা গিয়ে ঢুকলুম নিজ নিজ তাঁবুর মধ্যে।

এর আগে বনভোজন উপলক্ষে দিনমানে তাঁবুর অভিজ্ঞতা আমার ছিল।

কিন্তু একাকী এভাবে তাঁবুর মধ্যে রাত্রিবাস কখনো করিনি। আমার তাঁবুটি ছয় ফুট লম্বা-চওড়া,—টেনে বাঁধলে চারদিকে ফুটখানেক ক'রে বাড়ে। এইটুকুর মধ্যে আমার এই বিচিত্র রাত্রির সংসারযাত্রার সীমা। পাটকরা খাটিয়ার ওপর একখানা ভাড়াটে তোশক, বালিশটা আমার নিজের। সাজসজ্জাটা এবার কম নয়, উপকরণের কিছু বাহুল্যই আছে। একখানা ফোল্ডিং চেয়ার ভাড়া করে এনেছি, তার হাতলের ওপর মোমবাতিটি জ্বালিয়ে রেখে নোট বইটির কাজ শেষ করলুম। রাত্রি ঘনিয়ে উঠলো।

মানুষের একটু-আধটু কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণ অবধি শোনো যাচ্ছিল। তারপর সব চুপ। সেই নীরবতার পরিমাপ করা কঠিন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে পেচক শৃগাল-কুকুর—এদের ডাক শোনা আমাদের অভ্যাস। ঝিঁঝিঁ পোকা কিংবা ব্যাঙ ডাকে। জঙ্গলের ধারে থাকলে অনেক সময় ফেউ ডাকে। গাছ-পালা ঘন হয়ে থাকলে এক এক সময় সরীসৃপের ডাকও শোনা যায়। কিন্তু এখানে প্রাণিশূন্য জগতে চেতনার চিহ্ন কোথাও নেই—একেবারে মৃত্যুর মতো অসাড় এবং অবলুপ্তি। শুধু পার্শ্ববর্তী নীলগঙ্গায় তরঙ্গভঙ্গের আছাড়ি পিছাড়ি আর্তনাদ এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে প্রান্তরচারী শীতার্ত, ক্ষুধার্ত ঘোড়াগুলির কণ্ঠের বিচিত্র আওয়াজ। দেখতে দেখতে সেই অবরোধ-ঘেরা অধিত্যকায় নেমে এলো জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার আশ্চর্য চেহারা আমাদের কাছে পরিচিত নয়; গাঙ্গেয় সমতল ভূভাগের জ্যোৎস্না সে নয়,—সেই জ্যোৎস্না হিমালয়ের গহন রহস্যলোকের। হঠাৎ যদি দেহের বিলোপ ঘটে এবং তার-পরেও যদি থেকে যায় জীবন-কল্পনা—আমরা ভেবে নিই একটা কিছু অবাস্তব মায়ালোক। সেটা স্বপ্নে, রঙে, কল্পনায়, তন্দ্রায় আলোছায়ায় যেমনই অবাস্তব, তেমনই অপ্রাকৃত। চেয়ে দেখি রাত্রির কোন অদৃশ্য প্রহরী এসে যেন সৌরলোক এবং মর্তলোকের মাঝামাঝি দ্বার খুলে দিয়ে গেছে। নীচে প্রাণিচ্ছায়াশূন্য প্রান্তরের উপরে মৃত্যুর অসাড়তা এবং উপরে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অপ্সরালোক। কোনদিন কোন মানুষের দুটো চোখ যা দেখতে পায় না, যা জানতে পারে না, উপলব্ধির মধ্যে আসে না—তাই যেন দেখছি স্পষ্ট, জানছি অতি অনায়াসে, বোধ করছি নিবিড়ভাবে। জনতার ভিড়ের মধ্যে যারা চির-জীবন কাটিয়ে যায়, তারা বলবে—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—" কিন্তু সত্যি কি মানুষের উপরে কিছু নেই? যা আমাদের সংস্কারের, বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের অতীত? যেটা ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে ভোলায়, বুদ্ধিজীবীকে দিশাহারা করে, হিসাবীকে ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে, জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাগল বানায়,—সে বস্তু কী? সে কেমন?

থাক্‌, আজ এই আরামের শয্যায় আর কাজ নেই। খোলা থাক বাকি রাতটুকু ওই তাঁবুর পর্দা। এর জবাব চাই,—এর ব্যাখ্যা, এর ভাষ্য, এর চরম অর্থটা জেনে যাওয়া চাই। দেবতাত্মা হিমালয় তার শেষ কথাটা সহজে এবার বলুক আমার কানে কানে।

ভোরবেলায় সাড়া পেলুম হিমাংশুবাবুর। তাঁর শরীর যথেষ্ট সুস্থ নয়, তবু এরই মধ্যে তাঁর প্রভাতের পদচারণা হয়ে গেছে। এখানকার আয়ু অল্প, তল্‌পিতল্‌পা যথাসম্ভব শীঘ্র গুছিয়ে নিতে হবে। ভোরের আকাশ প্রসন্ন ছিল ব'লে বহু সাধু ও সন্ন্যাসী এবং মার্কামারা তীর্থযাত্রীর দল আগেভাগে হাঁটা পথে বেরিয়ে পড়েছে। পণ্ডিত শিউজী এসে জানিয়ে দিল, এখান থেকে কিছুদূর গেলেই মস্ত চড়াই—সেই চড়াই দেখে অনেক যাত্রী ভয় পেয়ে পালায়। শীঘ্র শীঘ্র তৈরী হয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার।

চা-পানের জন্য বেরিয়ে পড়বো, এমন সময়ে কয়েকজন বাঙালী যুবক—সাহেবী পোশাকপরা—এগিয়ে এসে সহাস্যে নমস্কার জানালো। তারাও যাচ্ছে। সঙ্গে আছেন একজন সুইডেনবাসী ছাত্র—তিনিও চলেছেন ওদের সঙ্গে। সুইডিস যুবকটি নাকি বেরিয়েছে পৃথিবী ভ্রমণে। ভারতে এসে তুষারলিঙ্গ অমরনাথের নাম শুনেছে দিল্লীতে। তা'র অসীম কৌতূহল—কেমন ক'রে প্রকৃতির খেয়ালে এমন অদ্ভুত ধরনের তুষার-শিবলিঙ্গের আয়তন তৈরী হয়ে ওঠে! তিনি আলাপ করলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি ভাষায়। যুবকটির সঙ্গে আছে জনচারেক স্থানীয় শ্রমিক এবং পাচক। চার-পাঁচটি ঘোড়া। দুটি তাঁবু। বিছানাপত্রে আর আসবাবে প্রচুর উপকরণ-বাহুল্য। সঙ্গে ভালো দুটি ক্যামেরা। আলাপের মাঝখানে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের ছবি তোলা হোলো। বাঙালী যুবকরা সকলেই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। অসামান্য তাদের উদ্দীপনা। স্বাস্থ্য, শ্রী ও শক্তিতে সকলের চেহারাই প্রদীপ্ত।

সকলের আগে বেরিয়ে গেল 'কুণ্ডু স্পেশ্যালের' যাত্রীরা। মেয়ে, ছেলে, বৃদ্ধ, প্রবীণ, প্রৌঢ় মিলিয়ে প্রায় দেড়শো। মস্ত তাদের আহারাদির আয়োজন, বিস্তৃত তাদের যানবাহনের ব্যবস্থাদি। তাদের দখলে আছে প্রায় চারশো ঘোড়া, পনেরো কুড়িটি ডাণ্ডি, গোটা পঞ্চাশেক তাঁবু এবং প্রচুর পরিমাণে ভোজ্যবস্তু। পরিচালনা ও বিধিব্যবস্থা দেখলে আমাদের মতো লোকের মাথা ঘুরে যায়।

ক্রমে ক্রমে দোকানপত্র অদৃশ্য হোলো, যাত্রীদল নিয়ে সারবন্দী ঘোড়াগুলি শান্তগতিতে দূর পাহাড়ের অন্তরালে মিলিয়ে গেল। একটি একটি তাঁবু উঠে

গেল, পুলিশ ও মিলিটারীর দল অগ্রসর হোলো। দেখতে দেখতে সেই পর্বতমালার প্রাচীরঘেরা ক্রোড়ভূমি আবার হয়ে এলো জনশূন্য। আমরা পড়েছি প্রায় শেষের দিকে, কারণ আমাদের সব দেখে যাওয়া চাই। শোনা গেল, পহলগাঁও থেকে আজও মধ্যাহ্নের দিকে কিছু যাত্রী আসবে, তারা আজ সন্ধ্যায় পৌঁছবে বায়ুযানে। সুতরাং চন্দনবাড়িতে দু-একটি খাবারের দোকান থেকে যাবে বৈকি। আজ আমাদের গন্তব্য স্থল হোলো বায়ুযান,—শেষনাগের হিমবাহ আজ আমরা অতিক্রম করবো। যখন আমরা চন্দনবাড়ি থেকে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়লুম, বেলা তখন নটা। রৌদ্র আজ আর প্রখর হ'তে পারছে না, মাঝে মাঝে একটু-আধটু মেঘের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগছে বেশ,—যারা পায়ে হেঁটে যাবে, ঠাণ্ডায় তাদের সুবিধা। যেদিকটায় পর্বতের ছায়া, ঠাণ্ডা সেদিকে বেশী। আজকের পথ বনময়। কোথাও কিছু পথ ভালো, কিছু পথ পাহাড়ের ভাঙনে বিঘ্নসঙ্কুল। নীচের দিকে দেওদারের ঘন বন, মাঝে মাঝে চিড় আর শিশুম্, ভূর্জপত্র আর আখরোটের জঙ্গল, এপাশে ওপাশে গিরিগাত্রের নির্ঝরিণীর ঝরঝরানি শব্দ। এই পর্যন্ত নাকি জন্তু-জানোয়ারের শেষ আশ্রয়, এর পর থেকে তাদের সংখ্যা বড়ই কম। গতকালকার রৌদ্রে আর রাত্রের তুহিন ঠাণ্ডায় যে কারণেই হোক আমাদের পথে প্রচুর হিমকণাপাত ঘটেছে। সমস্ত পথটা সেজন্য পিছল ও সপসপে। আমরা ধীরে ধীরে উঠছি উপরে। যারা পায়ে হাঁটা, তাদের গতি মন্থর হয়েছে। তারা লাঠি ঠুকে চলছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, তাদের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে পেরিয়ে যেতে আমাদের কিছু কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে—সন্দেহ নেই। অর্থাৎ মনের মধ্যে কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন অক্ষমতা ও পরাজয়বোধ অনুভব করছি। উপায় নেই, এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

প্রায় মাইল দেড়েক এসে আমরা সেই সুপ্রসিদ্ধ চড়াই-পথ পেলুম। এর নাম 'পিসর' চড়াই—এটি চন্দনবাড়ি অঞ্চলে অতি কুখ্যাত। অনেকে বলে, এটি হোলো প্রথম এবং সর্বপ্রধান অগ্নিপরীক্ষা। নীচের দিকে নিবিড় অরণ্য, আস্তে আস্তে উঠতে থাকলে অরণ্যলোক হালকা হয়ে আসে। পথের প্রথম দিকে এত পাথরের জটলা এবং সে-পাথর এত আলগা যে, যদি দৈবাৎ একটি কি দুটি স্থানচ্যুত হয়, তবে সর্বনাশ! নীচের দিকে অসংখ্য যাত্রী হয়ত প্রাণ হারাবে। নাগা-সাধু, সন্ন্যাসী ও মহন্ত মহারাজরা চলছে মন্ত্র জপতে জপতে। প্রতিটি পদক্ষেপ ক্লান্তিকর। লাঠির ভর দিয়ে দু-পা ওঠো, আবার দাঁড়াও, নিশ্বাস নাও, আবার ওঠো। পথ বিপজ্জনকভাবে পিছল। পিছল বলেই নাম 'পিসর।' নীচের থেকে মাথা উঁচুতে তুললেও পর্বতের চূড়া দেখা যায় না।

ঘোড়া উঠছে,—সামনের দুটো পা উঁচুতে, পিছনের পা দুটো নীচে। মানুষের মতো ঘোড়াও সন্তর্পণে পা তুলছে, পাছে পিছলে যায়, পাছে হোঁচট খায়। এ তাদের অভ্যাস, এ তারা জানে। কিছুদিন আগে গিয়েছিলুম ভুটানের দিকে বক্সা দুর্গে। মাঝখানে আন্দাজ আধ মাইল এই প্রকার পথ ছিল। কিন্তু তার বিস্তৃত আঁকাবাঁকা ছিল ব'লে এতটা বুঝতে পারা যায়নি। এখানকার পাক-দণ্ডিতে ঘোড়ার দেহের সামনের অংশটা যখন বাঁক নিয়ে উঠছে, পিছনের শরীরটা তখন আগেকার বাঁকপথে থেকে যাচ্ছে,—অর্থাৎ পরিসর এত সামান্য। দিল্লীর কুতবমিনার উঁচু আড়াইশো ফুট, কিংবা কলকাতার মনুমেণ্ট উঁচু দেড়শো ফুট। কিন্তু ওদের ভিতরকার সিঁড়ি যদি ঘুরে-ঘুরে চার মাইল পথ উঁচুতে উঠতো—তাহলে? কুতুবমিনারের ভিতরের সিঁড়িতে সোজা হয়ে এক একবার দাঁড়ানো যায়। এখানে সিঁড়ি নেই, পাহাড়ের খাঁজ নেই, জিরোবার স্থান নেই, দাঁড়াবার অবকাশ নেই। সবচেয়ে বিপদ তাদের, যারা নীচের দিক থেকে এখনও উপরে উঠছে। ঘোড়ার পায়ের ঠোকরে যদি একটি পাথর গড়ায়, তবে সেটি ঠেলবে আরেকটি পাথরকে—দুটিতে গিয়ে তৃতীয়টিতে দেবে ধাক্কা,—তারপর? তারপর নীচেরতলাকার যাত্রীদের সেই শোচনীয় অপঘাত-মৃত্যু আর ভাবতে পারিনে। পাশ দিয়ে যাচ্ছেন ডাণ্ডিতে চ'ড়ে বাঙালী মহিলা। আতঙ্কে তাঁর চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়েছে। বিজ-বিজ ক'রে বলছেন, জয় অমরনাথ! জয় বিপদতারণ মধুসূদন। চোখে আঁচল চাপা দিচ্ছেন ভদ্রমহিলা।

উপুড় হয়ে আমরা ঘোড়ার গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে আছি। খদের দিকে তাকাচ্ছিনে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'তে পারে। উপর দিকে তাকাতে পারছিনে, মাথা ঘুরে যায়। শুনেছি যারা আত্মহত্যা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তারাও অপঘাত মৃত্যুকে ভয় করে! নীচের দিকে কোথায় চন্দনবাড়ির শূন্য অধিত্যকা হারিয়ে গেছে, অরণ্যের শীর্ষস্থান আর খুঁজে পাচ্ছিনে, পৃথিবী আমাদের অনেক নীচে, অনেক পিছে প'ড়ে রইলো! তেরো চৌদ্দ বছর আগে পণ্ডিত নেহরু এসেছিলেন এখানে, শেষনাগের তুষার-নদী দেখবার ইচ্ছা ছিল তাঁর,—কিন্তু এই পিসর চড়াই তাঁর পথে বাধা ঘটিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খান আবদুল গফ্‌ফর খান এবং শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। পণ্ডিতজীকে তাঁরা এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন এক একটা বাঁক আসতে লাগলো যে, আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়বার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলুম। সবচেয়ে বিপদ ছিল, এই অদ্ভুত পাহাড়ের এক একটি স্থলের মৃন্ময় পিচ্ছিলতা, এক-একটি স্থলে ধারালো পাথরের ফাঁকে মাত্র এক ফুট কিংবা ছয় ইঞ্চি পরিমাণ

পা রাখার জায়গা। একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ, একটি মুহূর্তের অন্যমনস্কতা, সামান্য একটি হিসাবের ভুল,—তারপর মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত। মাঝে-মাঝে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে যাত্রীর মালপত্র প'ড়ে গিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে; ক্লান্ত ঘোড়া তার পিঠের সওয়ার এবং মালপত্র ফেলে দেবার চেষ্টা করছে,—সেখানে তার আত্মরক্ষণীবৃত্তির আদিম চেতনা। মাঝে মাঝে তাদের অবাধ্যতা, মাঝে মাঝে তাদের অবস্থান-ধর্মঘট। গণি ধরেছে শক্ত হাতে আমার ঘোড়ার লাগাম। সতর্ক তার চক্ষু, সতর্ক প্রহরা। অভয় দিচ্ছে আমাকে, সান্ত্বনা দিচ্ছে, আশ্বাস দিচ্ছে। গণি নিজে হাঁপাচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে মুখের থেকে এক-একটা আওয়াজ বার করছে। কখনো ঘোড়াদের দিকে শিস দিচ্ছে, কখনো বা নিঃঝুম পাহাড়ের মধ্যে চেঁচাচ্ছে—'হোউস,--সাব্বাস! হোউস,—সাব্বাস!' ওটা তাদের বুলি, ও বুলিটা ঘোড়ারা বোঝে। যে দুটি ঘোড়া আগে-পিছে চলে, তারা নিজেদের মধ্যে মন জানাজানি করে, একজনকে ফেলে আরেকজন এগোয় না, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে পথের মাঝখানে জিদ ধ'রে দাঁড়ায়, চেঁচায়, অবাধ্য হয়। ওদের এই প্রকৃতি রক্ষকরা জানে এবং সেইমতো ব্যবস্থা করে। এই পথের সম্বন্ধে বায়ুযানের তাঁবুর মধ্যে ব'সে আমার নোট বইতে যেটুকু লিখে রেখেছিলুম, এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি:

"সর্বাপেক্ষা উঁচু চড়াইপথ পার হচ্ছি। সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী সমস্তটা ভয়াবহ। আমার জীবনে এমন সঙ্কটসঙ্কুল চড়াই খুব কমই অতিক্রম করেছি। পথ অতিশয় পিছল, দুঃসাধ্য এবং দুরতিক্রম্য। অবকাশ নেই, নড়বার জায়গা নেই, বড় বড় পাথর সমস্ত পথে ছড়ানো। মালপত্র ফেলে দিচ্ছে ঘোড়ারা মহিলারা প'ড়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। একটি ভুল মানেই মৃত্যু। আশেপাশে বিভীষিকাময় গহ্বর, তুষার-গলা প্রপাত, শক্ত বরফে আচ্ছন্ন নদী, তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ পর্বত এবং সমস্ত পথের দুই পাশে মধ্য শরৎ-কালের বিবিধ রঙীন বর্ণের অজস্র ফুলের সমারোহ শোভা। প্রত্যেক পদে পদে সাধু-সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, বালকবালিকা, অশ্বরক্ষক ও কুলীর দল,—প্রত্যেকে এক একবার হাঁ ক'রে নিশ্বাস টানবার চেষ্টা করছে। এই প্রকার মর্মস্পর্শী দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট আরো উপরে উঠে—এলুম।"

নীচেরতলা থেকে উঠে ছাদের খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালুম। এটা উপত্যকা। চন্দনবাড়ি অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ, তবে লম্বা অনেকখানি। সামনে সুদীর্ঘ সমতল দেখে আমাদের মুখে-চোখে অসীম স্বস্তিবোধ। যারা এখনও পিছনে আসছে, তাদের কথা ভাবতে ভয় করে। কামনা করি, তারা নিরাপদে

আসুক। আমরা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুটের উপর উঠেছি কাগজপত্রের হিসাবে। পর্বতমালার তৃতীয় স্তরে আমরা এসেছি। চতুর্থ স্তর হোলো 'গ্লেসিয়ার'—অর্থাৎ বরফ-জমা নদী নীচে উপরে এবং চারিধারে। সেই নদীরা ঝুলে থাকবে আমাদের চোখের সামনে। আশেপাশে দেখি, কারো চোখ থেকে বেরিয়ে এসেছে আনন্দের কান্না, কেউ ধুঁকছে, কেউ বা বাক্‌রুদ্ধ। অনেকেই বিশ্বাস করেনি নিরাপদে উঠবে। শোনা গেল জন আষ্টেক বাঙ্গালী পুরুষ এবং চার-পাঁচজন মাদ্রাজী মেয়ে-পুরুষ ভয় পেয়ে ফিরে গেছে। 'কুণ্ডু স্পেশালের' পরিচালক শ্রীমান শঙ্কর কুণ্ডু এই নিয়ে আমার কাছে বড় দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বাঙালীর উৎসাহ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি তারা পিছিয়ে যায়। কিন্তু জাতি-চরিত্র বিচারের সময় তখন নয়। কণ্ঠ, তালু, টাগরা সব শুষ্ক - আগে একটু চা খেয়ে বাঁচি। ছোট্ট একটি চা-কচুরীর দোকান আমাদের আগে-ভাগে এসে গেছে। এই উপত্যকাটির নাম হোলো যশপাল। কেউ বলে, যোজপাল। হিমাংশুবাবুর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটেছে। ঘোড়া থেকে নামলেন কয়েকজন বাঙালী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধা। দুঃসাধ্য তীর্থযাত্রায় এরই মধ্যে আমরা সকলেই পরস্পরের আত্মীয় ও বন্ধু হয়ে উঠেছি। আশেপাশে গাছপালা ক'মে এসেছে,—তবু দেবদারু আর রুদ্রাক্ষের কয়েকটি গাছ চোখে পড়ছে। ঘাস-লতা আছে এখানকার উঁচু-নীচু প্রান্তরে। বৃষ্টির কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম আর কষ্টস্বীকারের বাইরে পার্বত্য প্রকৃতি তার সমস্ত শোভা নিয়ে বিরজমান। ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটেছে অজস্র। যতদূর দৃষ্টি চলে, ফুলের বিছানা পাতা। একই বৃন্তে পাঁচ-সাত রংয়ের ছোট ছোট আশ্চর্য ফুল। প্রত্যেক পাপড়ির রং পৃথক, একটি বোঁটার সঙ্গে অন্য বোঁটার বর্ণের মিল নেই। কোনো ফুলের নাম জানিনে, কোনো ফুল চিনিনে,—তাই এত আনন্দ হচ্ছে। আগে বলেছি, সমগ্র কাশ্মীর হোলো মৃন্ময়। তার পাহাড়, তার প্রান্তর, তার অরণ্যলোক, তার নদীপথ, তার উপত্যকা-অধিত্যকা,—সমস্ত মৃত্তিকাময়। এই মাটির ক্ষয় হয়ে চলেছে যুগে যুগে। আশেপাশে পর্বতমালায় অসংখ্য অগণ্য ক্লীফ্‌—কলমের ডগার মতো একটার পাশে আরেকটা দাঁড়িয়ে। সেই চূড়াগুলি মৃন্ময়—তা'তে ক্ষয় ধরেছে বহুকাল থেকে। কেউ যদি বলে, হাজার পাঁচেক বছরের মধ্যে কাশ্মীরের পর্বতমালার এ উচ্চতা থাকবে না—আমি অসঙ্কোচে বিশ্বাস ক'রবো। কাশ্মীরের এত স্খলন কেবল তার মৃন্ময়তার জন্য। যশপাল থেকে বেরিয়ে যত দূরে যাচ্ছি, এই ক্ষয়িষ্ণু পর্বতের একই চেহারা। অন্য কোন দেশে—বিশেষ ক'রে এই উচ্চতায় এ প্রকার স্খলন হয় না। সমগ্র গাড়োয়ালে নেই, কুমায়ুনে নেই,

হিমাচল প্রদেশে নেই, নেপালে কিংবা সীমান্তে নেই। সেখানে সর্বত্র গ্র্যানাইট পাথরের ভিড়,—দশ হাজার ফুট পর্যন্ত সেখানে ফলন। সেসব অঞ্চলে গেলে কাশ্মীরের চেহারাকে বিশ্বাস করা যায় না। কাশ্মীরকে লোকে ভূস্বর্গ ব'লে এসেছে বহুকাল থেকে, কিন্তু কাশ্মীরের মতো ভূস্বর্গ সমগ্র হিমালয়ে শত-সহস্র আছে। আদি-অন্ত হিমালয়ে যেখানে-সেখানে ভূস্বর্গ। ব্রহ্মপুত্রে, সুরমায়, তিস্তায়, বাগমতীতে, কৌশল্যায়, শারদায়, গোমতী ও রাপ্তিতে, ব্রহ্মপুরা ও সমগ্র কুমায়ুনে, বিপাশা আর চন্দ্রভাগায়,—যেখানে অরণ্য-সমাকীর্ণ দুর্গম পর্বতমালার আশেপাশে গিরিনদীরা চলে গেছে, সেখানেই ভূস্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরের কথা পৃথক। এখানে সমস্ত প্রকার খাদ্য, সব্জি ও ফলপাকড় অজস্র। এখানকার গ্রামে ঢুকলেই মনে হবে বাঙলা দেশ। সেই থোড়, মোচা, কাঁচকলা, সেই শশা, ঢেঁড়শ, ঝিঙে; সেই বেগুন, পটল, আর লাউ। আদা, লঙ্কা, তেঁতুল, সজ্‌নে আর নটে। নদীতে অজস্র মাছ, উঠোনের মাচানে লাউ আর কুমড়োর লতা। সেই অঙ্গন আর মাটির ঘর, সেই ধানঝাড়া আর চালকোটা। সেই মৌরীফুল, আর কাঁচা ডালিমের গন্ধ। সেই দারিদ্র্যের রুগ্নতা আর নগ্নতা, সেই রোগ আর জরা। ওর পাশে তাকাও,—আঙুর আর আপেলের বন, বাগুগোসা, খোবানি, বাদাম,—আরো কত রকমের ফল, কত মেওয়া। অজস্র খাঁটি ঘি, অজস্র সুন্দর সুগন্ধি চাউল। মাছ, মাংস, মাখন, ডিম,—চারিদিকে প্রাচুর্য। কিন্তু সমগ্র দেশে নেই পয়সা, রোগে আর দারিদ্র্যে মরে কাশ্মীর। আর যারা বাইরের থেকে মোটা টাকা নিয়ে বেড়াতে যায়, তারা ফিরে এসে বলে—ভূস্বর্গ!

আরো চার মাইল এগিয়ে যাচ্ছি। আকাশে একটু-আধটু কালো মেঘের ইশারা দেখছি। ডানদিকে বিরাট পর্বতের সারি চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। চেহারা প্রায় ওই একই, ক্ষয়িষ্ণু মৃন্ময়। মাঝখানে আবার গেছে কিছুক্ষণ প্রাণান্তকর চড়াই—প্রায় সাত আটশো ফুট। আমাদের আগে এগিয়ে গেছে বহু লোক। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া,—দক্ষিণে অনেক নীচে দিয়ে গেছে সেই নীলগঙ্গা। সেটি মিলেছে শেষনাগ নদীতে, যার নাম দুধগঙ্গা। চড়াই আর উৎরাই চলেছে—তবে চড়াই বেশী বরাবর। এদিকের পথ কিছু ভালো, কিছু সহ্য করা যায়, কিছু বা চওড়া। কিন্তু ঘোড়ার উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে ভয় করে। মাঝে এক-আধবার যাযাবর গুজরদের এক-আধটি বস্তি চোখে পড়েছিল। তারপরে আর কিছু নেই। যতদূর দেখছি, মহাশূন্য। পাখি, জন্তু, মানুষ, গাছপালা—কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না। আকাশে এক-আধ টুকরো মেঘের চলাফেরা দেখে সকলেই উদ্বেগ

বোধ করছে। আমাদের ক্যারাভান চলেছে সঙ্কটসঙ্কুল পর্বতমালার সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধ'রে বিরাট সরীসৃপের মতো।

শেষনাগ এলো। হঠাৎ যেন খুলে গেল দিগন্তের পূর্বদ্বার। পশুরাজ সিংহ যেন ব'সে রয়েছে উত্তর পূর্বদিগন্ত জুড়ে। সমগ্র দেহে ধবল তুষার-শোভা। তারই নীচে বিশাল হ্রদ। এত বিস্তৃত এবং এত ব্যাপক তার পটভূমি যে, সেই হ্রদের আয়তন সহসা ঠাহর করা যায় না। স্থির ঘন নীলাভ জল। একটি তুষার নদী এসে নেমেছে হ্রদে এবং একটি নদী বেরিয়ে গেছে সেই হ্রদ থেকে। যেমন কৈলাসের চূড়ার অদূরে মানস সরোবর এবং রাবণ হ্রদ। শেষনাগ হ্রদের ওপারে সোজা উঠেছে কোহিনূর পর্বতমালা ও হিমবাহ, এপারে কিন্তু বালুবেলা। বহু যাত্রী পাহাড়ের তলায় নেমে গেল স্নান করতে প্রায় এক মাইল উৎরাই পথে। আমাদের পথের থেকে আন্দাজ পাঁচশো ফুট নীচে সেই হ্রদ। সুতরাং সেই জল স্পর্শ ক'রে আসা কঠিন নয়। অনেক পাঞ্জাবী মেয়ে নেমে গেল, অনেক উৎসাহী যুবকও। আশ্চর্য শোভা ব'লেই তার দুর্বার আকর্ষণ। ওপারের নানা পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে তুষার নদী। এই হ্রদের জলে আছে নাকি নানা ধাতব পদার্থ মিশ্রিত,—যারা স্নান করে, তাদের আর এ জীবনে নাকি চর্মরোগ হয় না। তুষারগলা জল, ডুব দিলে অসাড় হয়ে আসে সর্বশরীর। কিন্তু অনেককে বলতে শুনেছি, স্নানের পরে সকলে আশ্চর্যরকম সুস্থ বোধ করে। তারা আর ঠাণ্ডায় কাতর হয় না। যদি কল্পনা করি, জ্যোৎস্না রাত্রে এই স্বচ্ছ নীল জলে অবগাহন করতে আকাশ থেকে নেমে আসে কিন্নরী আর অপ্সরীর দল,—তাহলে সেটা সত্য মনে হবে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কোন নির্দিষ্ট নিরীখ সত্য সত্যই এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন একটা বিশাল সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, যেখানে আমরা ভিন্ন আর কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই। হয়ত যারা এখানে আছে, তারা অশরীরী, আমাদের চর্মচক্ষু তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। আমরা তাদেরকে ধ্যানে পাই, ধারণায় পাই,—কিন্তু ধারণে পাইনে। হয়ত আমাদের দেখছে তারা সকৌতুকে। কিন্তু আমরা যাদের দেখতে পাচ্ছিনে, তারা যে নেই,- একথা কে বললে? থার্ড ডাইমেনশনে কেমন করে দেখতে পাচ্ছি? কেমন করে দেখছি টেলিভিশনে? হয়ত একদিন আমরা নতুন ধরনের লেন্স আবিষ্কার করবো,—তা: সাহায্যে দেখতে পাবো, যা দেখবার জন্যে মানুষের এত আকুলি-বিকুলি, দার্শনিকদের এত খোঁজা-খুঁজি। তপস্বীরা অনেকদিন ধ'রে চোখ বুজে রইলো, অনেক সাধু ঘর ছেড়ে যোগের আসনে ব'সে জীবনপাত করলো, পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সবাইকে

লুকিয়ে অনেকেই গা-ঢাকা দিয়ে রইলো, যদি ঈশ্বরকে দেখা যায়। চোখে দেখতে না পেয়ে বললে, বেশ ত' মন দিয়েই দেখবো! খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ—ঐ একই চেষ্টা সকলের। তবে কি বিজ্ঞান দেখিয়ে দেবে ঈশ্বরকে? এমন লেন্স আবিষ্কার করবে একদিন—যা চোখে দেবামাত্রই দেখতে পাবো—যা এতদিন চোখের সামনে থাকা সত্বেও দেখতে পাইনি! যন্ত্রের সাহায্যে যদি আসল মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধ'রে রাখা যায়,—যেটা অশরীরী, তবে অশরীরীকে যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যাবে না কেন?

উপর থেকে ক্রমশ দেখা যাচ্ছে বায়ুযানের শূন্য হিমকান্ত প্রান্তর। মধ্যাহ্ন পেরিয়েছে, কিন্তু শীত ধরেছে খুব। তুহিন বাতাস উঠেছে। হাত অবশ হয়েছে ঠাণ্ডায়। আমরা বায়ুযানে এসে পৌছলুম।

শেষনাগ থেকে বায়ুযান আন্দাজ মাইল দেড়েক। এটাকে পথ বলবো না পথের নিশানা মাত্র। পথ বলতে কোথাও কিছু নেই। পাহাড় ছেড়ে পাহাড়ে ওঠা কিংবা নামা, পাথর ডিঙ্গিয়ে যাওয়া, নিজেকে কোনমতে বাঁচিয়ে এগিয়ে চলা। শেষনাগ অ.ধি আমরা পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছিলুম, এবার নেমে এসেছি পাঁচ সাতশো ফুট। আকাশে মেঘ করেছে, সেজন্য আমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন। মেঘ মানে ভয়, মেঘ মানে প্রায় হাজারখানেক লোকের মুখ শুকিয়ে যাওয়া। আমার মনে আছে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সেবারও এমনি করে মেঘ জমেছিল বায়ুযানে। দেখতে দেখতে বৃষ্টি, দেখতে দেখতে তুষারনদী মূল পাহাড় থেকে খ'সে নেমে এলো পঞ্চতরণীতে, তুষারের প্রপাত নেমে ছুটলো উপর থেকে নীচে। চারিদিকে বরফ জমে গেল দশ ফুট উঁচু। তার পরের ঘটনাবলী জানে সংবাদপত্রের তৎকালীন পাঠকরা। সরকারী মহলের আন্দাজ, কমবেশী দেড় হাজার লোক তুষার-গর্ভে সমাধিস্থ হোলো, পালাতে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরেছে শত শত, গাছে উঠে বাঁচতে গিয়ে গাছের ডালে ম'রে আটকে আছে, না খেয়ে মরেছে অজস্র,—কিন্তু তালিকা বাড়ানো উচিত নয়। ১৯২৮-এর কথা এখন আমি কোনো ব্যক্তিকে শোনাচ্ছিনে, হিমাংশুবাবুকেও না। শুনলে সবাই ভয় পাবে। বেশ মনে পড়ে সেবার ছয়শো ঘোড়াকে এক হাজার মণ রসদসহ পহলগাঁও থেকে পাঠানো হয়েছিল এখানে। মিলিটারী স্যাপার্স ও মাইনার্স ইত্যাদি মিলিয়ে শত শত লোক ও স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল এদিকে। কিন্তু সাহায্য এসে পৌছবার আগেই প্রথম চোটের ঢালাও মৃত্যু ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে পুলিশ আর মিলিটারীর কিছু লোক যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আসে প্রতি বছর। সেই সময়টায় তরুণ বয়সে আমি কাশ্মীর-সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যান-বাহন

বিভাগে চাকুরে ছিলুম ব'লেই এসব খবর আমার জানবার সুযোগ ঘটেছিল। এই নিয়ে একটা গল্পও লিখেছিলুম 'ভারতবর্ষে'।

সেই বায়ুযানকে ঘিরে সমস্ত আকাশ আজকেও ধীরে ধীরে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এলো। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ কিন্তু এত ঠাণ্ডা যে, দু'হাতের দশটা আঙুলে ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে ওই লোহার পাতটাকে ধ'রে রাখতে পাচ্ছিনে। আঙুলগুলো অসাড় নীলবর্ণ হয়ে আসছে। সবাই ক্ষুধার্ত, কিন্তু আকাশের চেহারা দেখে আহারে রুচি কমে গেছে অনেকখানি। বায়ুযানে পৌঁছে আমরা যে যার তাঁবু বানিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। শেষনাগ থেকে এ অঞ্চল পাঁচ-সাতশো ফুট নীচু এবং এখানকার উপত্যকাটা বোধ হয় চন্দনবাড়ি অপেক্ষা কিছু প্রশস্ত। উপত্যকা কিংবা হিমলোক, কিংবা তুহিন প্রান্তর—ঠিক কোন্‌টা বলবো বুঝতে পারছিনে। মুখ দিয়ে আওয়াজ নির্গত হচ্ছে ঠাণ্ডায়। বিছানাপত্র এলিয়েছি, কিন্তু সে-বিছানা এত ঠাণ্ডা যে, ছোঁয় কার সাধ্য! মেঘের সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছে বরফানি বাতাস—সেই বাতাস মাঝে মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওই তুহিন উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের তাঁবুর খুঁটি ধরে মাঝে মাঝে শাসিয়ে যাচ্ছে। শিশু ও বালক এসেছে কয়েকটি। ঘোড়ার পিঠে তাদের করুণ ভয়ার্ত শীতার্ত কান্না দেখতে দেখতে এসেছি। কেউ কেউ এনেছে নতুন ধরনের নিশ্ছিদ্র রবারের তাঁবু—ওরকম তাঁবু মাঠের ওপর খাটালে বাতাস ও বৃষ্টি নাকি কোনমতে ভিতরে ঢোকে না। অমনি একটি তাঁবুর মধ্যে মা-বাপের সঙ্গে শুয়ে আছে সেই ছয় মাসের শিশুটি। আজ ভোর থেকে তার কান্না থামছে না কিছুতেই।

বৃষ্টি এলো ফোঁটা ফোঁটা। আমাদের তাঁবু পড়েছিল একটি শীর্ণ ঝরনার পাশে, ওপাশে পুলিস আর মিলিটারীর তাঁবু। তাদের সঙ্গে কিছু রসদ, কয়েকটি গাঁইতি আর বন্দুক, কিছু আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা, কিছু বা মদ আর দুধের গুঁড়ো, অথবা অতিরিক্ত কিছু গরম আচ্ছাদন। বৃষ্টি আরম্ভ হ'তেই তাদের দুজন লোক 'পরচা' নিয়ে এখানে ওখানে ছুটে গেল। এই বলে যাত্রীদলকে সাবধান করে এলো যে, এখান থেকে কেউ আর এক পা না নড়ে। যদি কোনো জরুরী অবস্থা দেখা যায়, তবে পহলগাঁওকে সঙ্গে সঙ্গেই 'এলার্ট' করা হবে।

হিমাংশুবাবুর গা বেশ গরম, বোধ হয় জ্বর একটু বেড়েছে। তিনি তাঁবুর মধ্যে ঢোকার পর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আহারাদির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আমাদের সঙ্গে কিছু রুটি ছিল, কিন্তু হাত-পা অসাড় হবার পর থেকে সেগুলো আর বার করা হচ্ছে না। বৃষ্টি বেশ পড়ছে।

এক একটি ফোঁটা, এক একটি চাবুক। আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করেছে অনেকে কিন্তু যে পরিমাণ উত্তাপ ওই কাঠের আগুনে সৃষ্টি হলে চারিদিকের তুহিন ঠাণ্ডার মধ্যে জল গরম হয় কিংবা রুটি সেঁকে নেওয়া যায়,—সেই উত্তাপ ওই আগুনে পাওয়া যাচ্ছে না। কাঠ জ্বলে শেষ হচ্ছে, কিন্তু আধ সের আন্দাজ জল কোনমতেই গরম হলো না। আট আনারও বেশী কাঠ পুড়ে গেল। পণ্ডিত শিউজী হায়রান হয়ে শেষকালে গা ঢাকা দিল। সাড়া নিলুম হিমাংশুবাবুর, তিনি পাশের তাঁবুতে ছিলেন লেপের মধ্যে,—কাঁপতে কাঁপতে সাড়া দিলেন।

আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু আমিও কাঁপছিলুম খাটিয়ায় শুয়ে। মাথাটা ব্যালাক্লাভায় ঢাকা, গায়ে সবচেয়ে মোটা পট্টুর কোট, তার নীচে সোয়েটার, তার নীচে তিনটে সুতী জামা, পরনে খুব মোটা ব্রেজারের প্যাণ্ট, তার নীচে পশমের ড্রয়ার, হাতে দস্তানা,—কোমর থেকে পা পর্যন্ত মোটা ওভারকোট ঢাকা,—তার ওপরে দুখানা কম্বল,—শীতে আমি কাঁপছিলুম! কাঁপছে হাজারখানেক লোক, কাঁপছে গণিশেরের দল, কাঁপছে ঘোড়াগুলো।

অপরাহ্নের দিকে বৃষ্টি এলো জোরে। উঠে বসলুম। আমার তাঁবুটি বড় দরিদ্র। উপরের দুইদিকের কাপড়টা পাতলা, মাঝে মাঝে টস-টস করে জল গড়াচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় পর্দাটা স্থির থাকছে না। খোঁটা পুঁতে দড়িগুলি টেনে বাঁধা সত্ত্বেও তলা দিয়ে রাশি রাশি হাওয়া ঢুকছে। কিন্তু নিরুপায় আর নিষ্ক্রিয় হয়ে সেই ঝুপসির মধ্যে চুপ করে বসে রইলুম। সেইখানে বসে নোটবই নিয়ে যেটুকু লিখে রেখেছিলুম, তার একটু অংশ এখানে তুলে দিই:

"পেন্সিল সরছে না ঠাণ্ডায়, হাত অবশ। তাঁবুর বাইরে কোনমতেই আসতে পাচ্ছিনে। সমস্ত গরম বস্ত্র আর শয্যাদ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে হচ্ছে। পহলগাঁওর পর থেকে উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ময়লা রুটির টুকরো চিবোতে হচ্ছে। এ অঞ্চল জনশূন্য, তৃণশূন্য, জল নেই, চা নেই। দুটো চলতি দোকানে খাদ্যের নামে অখাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাঁবুর মধ্যে দিনমানটা কাটছে অত্যন্ত কষ্টে আর ঠাণ্ডায়। আকাশ পাণ্ডুর। দুরন্ত তুহিন ঝাপটের সঙ্গে মেঘের দৃশ্য ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছে। মাঝখানে নামলো বৃষ্টির সাপট, রাত্রির কথা মনে ক'রে আমরা উদ্বিগ্ন হলুম। কয়েক ব্যক্তির আমাশয় হয়েছে এবং প্রায় পঁচিশজন লোক—মেয়ে আর পুরুষ, অধিকাংশ বাঙালী—তারা মেঘ এবং বৃষ্টির ফোঁটা দেখে পহলগাঁওর দিকে ফিরে চলেছে। আমার কিছুই করবার নেই। কেবল নিরুপায় হয়ে

মাঝে মাঝে হাতঘড়িতে সময় দেখছি। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরাহ্ণ গড়িয়ে যাচ্ছে—"

তাঁবুর বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আমাকে ডাকছে। বৃষ্টি পড়ছে বৈকি তখনও। কোনো দুঃসংবাদ আছে কি পাহাড়ের দিক থেকে? কম্বল আর ওভারকোট সরিয়ে ঠাণ্ডা জুতোর মধ্যে অর্থাৎ তুহিনগর্তে পা ঢুকিয়ে বেরিয়ে এলুম তাঁবু থেকে।

দেখি সেই সপসপে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার সেই নবপরিচিত মিলিটারী বন্ধু—সেই চন্দনবাড়িতে গত রাত্রির পরিচয়সূত্রে—মিঃ মজুমদার এবং তাঁর পাশে একটি মোটা চশমাপরা তরুণী—ঈষৎ খর্বকায়া, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। মজুমদার বললেন, কাল রাত্তিরে আপনার সঙ্গে কথা না বলেই চলে গিয়েছিলুম, এত চমক লেগেছিল আপনাকে দেখে। ইনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছেন—মিস মুখার্জী। ইনিও 'আর্মি-মেডিক্যাল ইউনিটে' আছেন। ইনি এম-বি, বি-এস। মিস মুখার্জি কাল রাত্রে বিশ্বাস করেন নি, আপনি এসেছেন।

নমস্কার বিনিময়ের পর প্রশ্ন করলুম, আপনার বাড়ি নিশ্চয়ই বাঙলা দেশে নয়?

হাসিমুখে শ্রীমতী মুখার্জী বললেন, কেমন করে বুঝলেন?

বললুম, বঙ্গবাসিনী মেয়ের মুখে রাঙা-রাঙা ছোপ দেখতে পাইনে।

উভয়ে হাসলেন। পরে সোৎসাহে বললেন, আসুন আমাদের ওই তাঁবুতে, আপনাকে চা দিতে পারবো।

চললুম তাঁদের সঙ্গে। আন্দাজে বুঝতে পারি মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশের মধ্যে। চেহারাটা একেবারে রাঙা। দার্জিলিংয়ের ভুটিয়া ছেলেমেয়েদের মতো গাল দুটো ছোপ ছোপ লাল। তাঁবুতে এসে ঢুকে মেয়েটি বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের বাড়ি শিমলায়—বাবা থাকেন সেখানে। 'আর্মি মেডিক্যালে' কাজ করি, বাবার ইচ্ছে নয়!

হাসিমুখে বললুম, বাবার ইচ্ছেটা কি সহজেই বুঝতে পারি।

তিনজনেই হাসলুম। ফ্লাস্ক থেকে ওরা গরম চা ঢাললো। মজুমদার বললেন, আমরা 'অফ ডিউটি'তে আছি, তাই শ্রীনগর থেকে এবার বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের দলে অনেকেই আছেন, তবে বাঙালী আমরা শুধু দুজন।

মেয়েটি বললে, আমরা পাহাড়ে মানুষ, কিন্তু এই তিরিশ মাইল যে এত দুর্গম, আগে একবারও মনে হয়নি। আপনার কেদার-বদরির পথও কি এই রকম?

বললুম, মাত্র তিরিশ মাইলের মধ্যে এত দুঃসাধ্য পাহাড় কেদার-বদরির

কোথাও নেই। সেখানেও দুস্তর এবং দুরারোহ আছে বহু ক্ষেত্রে—কিন্তু তারা ছড়িয়ে আছে দুশো মাইলে। এ ঠাণ্ডা কেদারে আছে, কিন্তু বদরিতে নেই।

মজুমদার শুধু বললেন, চড়াই এখনো অনেক বাকি।

মেয়েটি বললে, আরো ?

হ্যাঁ, মোটামুটি সাড়ে সতেরো হাজার ফুট পর্যন্ত উঠবো, অনেক সময় আঠারো, তারপর নামবো পনেরোয়, তারপর আবার উঠবো ষোলয়।

মেয়েটি বললে, আমাদের কাছে সব রকমের জিনিস আছে, আপনার কিছু দরকার হলে আমরা দিতে পারবো।

ওদের তাঁবুর মেঝেতে মোটা চাটাই পাতা। বিছানাপত্রের ব্যবস্থা মোটা-মুটি ভালো। আহারাদির আয়োজন সন্তোষজনক। ওদের দুজনের মধ্যেকার সম্পর্কটা নিয়ে আমার চোখে মুখে কিছু জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটছিল, কিন্তু কোনো অশোভন কৌতূহল পাছে প্রকাশ পায় এজন্য সতর্ক ছিলুম। ওদের মিলিত তীর্থযাত্রাটাকে মনে মনে সেদিন তারিফ করেছিলুম সন্দেহ নেই। মজুমদার এক সময়ে বললেন, একটি দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে, পুলিশ রিপোর্টে জানলুম। আজ সকালে একটি লোক হার্টফেল্ ক'রে ঘোড়া থেকে প'ড়ে যায়। বোধ হয় নীচের দিকে তাকিয়ে আসছিল। জোয়ান লোক! ঘোড়ার পিঠের ওপরে থাকতেই মারা যায়!

বাইরে রীতিমতো বর্ষাকাল নেমে এলো। ঘন ঘোরালো সন্ধ্যা ছমছমিয়ে নামছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আবার বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু তাঁবুতে না ফিরে সোজা গেলুম এগিয়ে। তাপমাত্রা নেমে গেছে ৩০ ডিগ্রির অনেক নীচে শুনলুম। ওই তাঁবুতে সেই শিশুর কান্না এখনও থামেনি। আর কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই; সবাই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে চারিদিক বন্ধ ক'রে নিঃসাড়ে রয়েছে। গায়ে বৃষ্টি পড়ছে, পায়ের মোজা জুতো ভিজে। ঝাপসা মেঘ নেমেছে উপত্যকায়। প্রচণ্ড বাতাস ঘুরছে চারিদিকে। এতক্ষণে চোখ পড়লো চারিদিকের পাহাড়ে। প্রচুর বরফ পড়েছে অপরাহ্ণের দিকে পাহাড়তলীর আশেপাশে, এতক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য করিনি। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে বরফজলের ধারা। বেশী পরিমাণ বৃষ্টিতে কোনো তাঁবু নিরাপদ থাকবে না। আকাশের ভ্রূকুটি-করাল চেহারার দিকে তাকিয়ে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকলুম। সেখানে শোনা গেল, খানিকক্ষণ আগে মিলিটারীর লোক পুনরায় 'পরচা' জারি ক'রে যাত্রীদের সতর্ক ক'রে গিয়েছে।

দোকানের মধ্য চাটাইয়ের উপর ব'সে কিছু আগুনের উত্তাপ পাওয়া গেল। আমার জলের পিপাসা শুনে দোকানদার শিখসর্দার অবাক। আজ সকাল

থেকে কেউই নাকি জলস্পর্শ করেনি। খাবার খেয়ে কেউ ঠাণ্ডা জল পান করে, এখানে এ খবর তাদের জানা নেই। চা ও রুটি এখানে মেলে, গরম পরটার অনেক দাম। তার সঙ্গে একটুখানি আলুর ঘাঁটি। সব শেষে ফুটন্ত চা। গলার মধ্যে যখন যায়, সে চা তখনও টগবগ করে।

দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম তাঁবুর দিকে। সেই মেডিক্যাল ছাত্র-বন্ধুরা ধরলো তাঁবুর পথে। তা'রা নাকি আমার কুশলবার্তা জানতে বেরিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে কোনো পক্ষেরই এখানে দাঁড়িয়ে দুটো প্রাণের কথা বলাবলির অবকাশ ছিল না। কোনোমতে বন্ধুত্বটা বজায় রেখে যে যার তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলুম। গলা বাড়িয়ে একবার হিমাংশুবাবুর সাড়া নিলুম, মনে হোলো তিনি কতকটা যেন সুস্থ হয়েছেন। আমি তাঁকে খাবারের দোকানের খবর দিলুম।

তাঁবুর মধ্যে ঠাণ্ডাটা যেন জমাট বেঁধে রয়েছে, যেন তুষারাচ্ছন্ন গুহাগর্ভ। বাইরে গেলে শরীরটা নাড়া পায়, মাংসপেশী সচল থাকে। এখানে স্থাণু সুতরাং রক্ত চলাচল নেই। মাথা ঠেকে যাচ্ছে তাঁবুর আচ্ছাদনে। শুনতে পাচ্ছি, সপ-সপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে তা'র ওপর। জল চুঁইয়ে নামছে ভিতরে। দেশালাই জেলে, মোমবাতি ধরালুম। ঠাণ্ডা মোমবাতি, হাতে লাগে। সিগারেটের প্যাকেট, ঘটি, চায়ের পেয়ালা, চেয়ারের হাতল, বালিশ এবং আমার নিজের নাকের ডগা এতই ঠাণ্ডা যে, ছোঁওয়া যায় না। দেশালাই জেলে মোমবাতির পলতে ধরাতে সময় লাগলো। জুতো জোড়া খুলে বিছানার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে হোলো। হিমগর্ভ জুতো!

দড়ি দিয়ে তাঁবুর পর্দাটা বেঁধে দিতে গিয়ে বুঝতে পারা গেল, আঙুল-গুলো কোনোমতেই আজ আমার বাধ্য হবে না। বাইরে থেকে তুহিন বাতাসের ঝাপটায় মাঝে মাঝে সমস্ত তাঁবুটা ন'ড়ে উঠছে। রাত্রে কোনো সময় গোটা তাঁবু যদি আমার উপর উল্টে পড়ে তা'হলে যথেষ্ট রকম আহত হবো কিনা সেটা একবার আন্দাজ ক'রে নিলুম। এদিকে পিছনের পাহাড় থেকে নেমেছে বৃষ্টির ধারা। তাঁবুর তিন দিকে ইঞ্চি তিনেক সরু ক'রে পরিখা কেটে দেওয়া হয়েছিল, জল নেমে এসে সেই পরিখা দিয়ে অন্যত্র চ'লে যাচ্ছে; ভিতরে আর জল আসছে না। পণ্ডিত শিউজি নিরুদ্দেশ, গণিশের এবং তা'র দলের লোকদের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এইভাবে সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোলো এবং এইভাবেই সেদিন রাত্রি ঘনিয়ে এলো। বৃষ্টি পড়ছিল সপসপিয়ে।

তাঁবুর বাইরে ঘোলাটে অন্ধকার। পাঁজি অনুসারে আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। একপ্রকার আলো দেখা যাচ্ছে বাইরের ওই মৃত্যু-উপত্যকায়,—সে-আলোটা

ঠিক নৈসর্গিক নয়। এমনি আলো দেখা ছিল কেদারনাথের তুষার প্রান্তরে। কিছু আলো আসছে মেঘাবৃত আকাশ থেকে, কিছু আলো তুষারচূড়া থেকে প্রতিফলিত। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হয় গহন অরণ্যলোক, কিংবা বনময় গ্রাম। কিন্তু ঘোর অমাবস্যার দিনেও উন্মুক্ত প্রান্তর সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না! এখানে সমস্ত বর্ষণ এবং দুর্যোগের মধ্যেও আলোর আভা দেখছি, কিন্তু দশ হাত দূরেও কিছু চিনতে পাচ্ছিনে। একবার ঝাঁসীতে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের দুর্গের মধ্যে ঢুকে হামামের ভিতরে গিয়েছিলুম। চতুর্দিক অন্ধকারে ঝুপসি, কিন্তু স্ফটিকের থেকে ছিল একটা বিস্ফুরিত আভা,—সেই আভায় হামামটাকে চিনতে পারা যায়। এখানকার আকাশ-বিচ্ছুরিত সেই আলোর আভায় এবং তুষার-প্রতিবিম্বিত আলোয় দেখতে পাচ্ছি ওই অসাড় প্রান্তরের মৃত্যুপাণ্ডুরতা। দেখলে ভয় করে। পৃথিবী এখান থেকে অনেক দূরে, ফেলে এসেছি সেই পৃথিবীকে কবে কোথায়—সেই স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। হয়ত সেখানে এখন আকাশভরা জ্যোৎস্নার রোমাঞ্চ হরষ, হয়ত সেখানে এখন শরতের মধুর মদিরতা!

কম্বলের মধ্যে ডুব দিয়ে বহুক্ষণ নিজের হাত দু'খানা মুচড়ে-মুচড়ে আঙুলগুলোকে একটু সচল করা গেল। তারপর ঠাণ্ডা নোটবইখানা খুলে তা'র পৃষ্ঠায় কোনোমতে পেন্সিল চালাতে লাগলুম :

"আর কিছু করবার নেই। নিরুপায়ের মতো প্রহর গুনছি। দুরন্ত বাতাস বইছে। বর্ষা নেমেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে কোনোমতেই নিজেকে গরম ক'রে তোলা যাচ্ছে না। কতক্ষণ নোটবইখানা আলোর সামনে ধ'রে রাখতে পারবো জানিনে, কারণ মুহূর্তে মুহূর্তে হাত অবশ হয়ে আসছে। সিগারেট ধরানো যাবে না, কারণ ওর জন্য হাত এবং মুখ বার ক'রে রাখতে হয়। বিছানার মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চল না থেকে উপায় নেই, কেননা যেটুকু জায়গা নিয়ে দেহটা স্থির হয়ে রয়েছে, তা'র এক ইঞ্চি এপাশ ওপাশ হ'লে বরফের ছেঁকা লাগছে বিছানার মধ্যেই। উপর থেকে মাঝে মাঝে টসটসিয়ে বিছানার ওপর বরফ-জলের ফোঁটা পড়ছে। রাত্রে নিদ্রা যাবার মতো উত্তাপ সৃষ্টি বিছানার মধ্যে হবে কিনা বলা কঠিন। সমস্ত শরীর কনকন করছে শীতের যন্ত্রণায়। রাত এখন প্রায় বারোটা। মোমবাতি নিভে আসছে—"

সহসা বাইরে কিসের আওয়াজ। অত্যন্ত ক্ষীণ কান্নার শব্দ! কান পেতে শুনে বুঝতে পারা গেল, সেই শিশুটির কান্না এখনও থামেনি। প্রকৃতি ওকে অমনি ক'রে কাঁদাচ্ছে সারাদিনরাত। শীতের যন্ত্রণায় যত কাঁদবে ততই ওর দেহটুকুর মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি হবে। এছাড়া ওর বাঁচবার উপায় নেই!

না, ভুল করেছি। শিশুর কান্না নয়,—অন্য কিছু। ক্ষুধাতুর, সর্বহারা যন্ত্রণাজর্জর মানুষের মৃত্যুর ঠিক আগেকার কান্না। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম। দেখতে দেখতে সেই কান্না যখন আমার তাঁবুর ঠিক পাশের থেকে হঠাৎ শোনা গেল,—তখন বুঝতে পারলুম, এ কান্না মানুষের নয়, আমাদেরই ঘোড়াগুলির। একটা দীর্ঘ শীর্ণ সকরুণ আওয়াজ ওদের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসছে, যে কণ্ঠস্বর আগে আমার এমন ক'রে জানা ছিল না। উপযুক্ত খাদ্য ওদের সারাদিনে জোটে না, ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা ব'য়ে আনে, চন্দনবাড়ির পর আর বিশেষ কোথাও ঘাস খুঁজে পায় না, ঠাণ্ডায় আশ্রয় নেই কোথাও, তুষারের হাওয়ায় আর বৃষ্টিতে পাগুলো ধীরে ধীরে জ'মে আসছে—এবং একজোড়া পা দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা। ওরা তাই অমন স্খলিত ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওদের ভাগ্য-নিয়ন্তার কাছে! সমস্ত সৌরবিশ্বের দিকে এক একবার উঁচু গলায় তাকিয়ে যন্ত্রণাজর্জর কণ্ঠে অন্তিম ঘৃণা প্রকাশ ক'রে চলেছে! আমার আরামের বিছানাটা দেখতে দেখতে যেন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠলো!

বাবু!

তাঁবুর বাইরে গণিশের ও তা'র সঙ্গীর সাড়া পেলুম। মোমবাতির ক্ষীণ আলোটা তখনও নেভেনি। সাড়া দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললুম, কি চাই?

পর্দাটার গেরো খুলে ওরা ভিতরে এলো। সর্বাঙ্গে বৃষ্টির জল। ওরা নিজেদের ভাষায় বললে, বহুৎ মুশকিল হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের একটা ঘোড়াকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না এই পাহাড়ের গায়ে উঠেছিল ঘাস খেতে। আহমদ মিঞা ওকে খুঁজতে এই তাঁবুর পাশের পাহাড় বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায়,—'বহুৎ বারিষ হোতা হ্যায় পাহাড়মে—'

বললুম, তারপর? ঘোড়া পেলে?

নহি।—গণি বলতে লাগলো, পাহাড়ের ওপরে অনেক গুম্ফা, সেখানে ঘোড়া ঢুকেছে কিনা এই তদারক করতে গিয়ে হঠাৎ বিপদ! 'ঘোড়ে ত' নহি মিলা, পরন্তু একঠো কালা জান্‌বর গুম্ফাসে নিকাল্‌কে আহমদকো উপর তাং কিয়া,—আহ্‌মদ ডরসে ভাগা।

কেমন জানোয়ার? বাঘ?

মালুম নহি পড়া! শের ইধর নহি মিলি, ভ্যা'ল হো শকৃতা! ব্যস হিঁয়াসে দো রসি উপর! উ ত' হ্যায় হুঁয়া!

ঈষৎ উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, ভালুকটা আমাদের তাঁবুর দিকে নেমে আসতে পারে মনে করো?

গণিশের বললে, মালুম হোতা কি এত্না বারিষমে কোই জানবর উৎরেগা নহি!

কিন্তু ঘোড়াটাকে যদি ওটা মারে, তবে কাল আমাদের গতি কি হবে? কেমন ক'রে পৌছবো?

গণিশের ও আহমদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর যাবার সময় ব'লে গেল, কাল ভোর হ'লেই আবার ঘোড়াটাকে খুঁজতে বেরোবো, "হাতিয়ার লেকে যায়েঙ্গে!"

ওরা চ'লে যাবার পর মোমবাতিটা এক সময় শেষ শিখা উঁচিয়ে নিভে গেল। তারপর ভিতরটা নিঃঝুম নিরেট ঠাণ্ডা অন্ধকার। সমস্ত তাঁবুর বোঝাটা যেন বুকের ওপর চেপে ধরেছে। কম্বল আর ওভারকোটের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে নিঃসাড় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম, কতক্ষণে সেই কালো মস্ত জানোয়ারটা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে প্রথমেই আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকবে, এবং বড় বড় নখরযুক্ত দু'খানা হাত দিয়ে আমার পা ধ'রে টানবে!

পা দু'খানা হিম হয়ে আসছে। ঘোড়ার কান্না—সেই বুকফাটা কান্না চলতে লাগলো অবিশ্রান্ত। প্রভাতের জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলুম।

নিদ্রার মতো উত্তাপ কোনোমতেই পাওয়া গেল না। অতএব চার পাঁচ ঘণ্টা পরে মুখের উপর থেকে কম্বল সরিয়ে দেখলুম, প্রভাতের স্বচ্ছতা চিক-চিক করছে তাঁবুর পর্দার ফাঁকটুকু দিয়ে। ব্যস, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। নিদ্রার অভাবে কোনো ক্লান্তি কিংবা অবসাদ বোধ করছিনে। আমি কেবল চাচ্ছিলুম উত্তাপ। একটুখানি আগুন,—এক পেয়ালা চা, এক ঘটি গরম জল। উঠে বাইরে এসে দেখি, এক আধজন যাত্রী এবং বৈরাগী এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে হি-হি করতে করতে। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। পাহাড়-পর্বতের দিকে প্রভাতকালে সব চেয়ে কম দুর্যোগ। যত বেলা বাড়ে, ততই অবস্থা বদলায়। বরফ পড়তে থাকে সাধারণত বেলা দশটার পর থেকে। যাই হোক, গতকাল সন্ধ্যা অপেক্ষা এখন আকাশের অবস্থা উন্নত। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কথা স্মরণ ক'রে কখন যেন মৃত্যুভয় ঢুকেছিল মনে,—কালো সরীসৃপ যেমন ঢোকে গর্তে। এবার থেকে আর ভয় পাবো না,—কোনমতেই ভয়কে প্রশ্রয় দেবো না। ভয় মানেই মৃত্যু। ভালুক থাক্ পাহাড়ের চূড়ায়, আকাশে থাক দুর্যোগ, থাক তুহিনঢাকা আমাদের সমস্ত পথ,—ভয় আর পাবো না। অতএব পর পর গোটা দুই সিগারেট টেনে রুমাল দিয়ে এলুমিনিয়মের ভয়ানক ঠাণ্ডা ঘটির কানাটা ধ'রে সোজা গেলুম সেই শিখসর্দারের চা-খাবারের দোকানে। সবেমাত্র সে কাঠ দিয়েছে উনুনে—আমি তার প্রথম খদ্দের। গত

পরশুদিন চন্দনবাড়ি থেকে সর্দার এনেছে দুধ, সেই দুধেই চা তৈরী হয়ে আছে দুদিন থেকে। সেটা কেবল আমাকে গরম ক'রে দেবে মাত্র। সেই ঘোলাটে ফুটন্ত জলটুকুর দাম চার আনা। হোক চার আনা, দুঃখ করবো না। কিন্তু ওই সঙ্গে একঘটি ফুটন্ত জল না পেলে আমার কিছুতেই চলবে না। গতকাল এক টাকার কাঠ খরচ হয়েছে, কিন্তু জল গরম হয় নি। শিউজি বলেছে, পাঁচ টাকা খরচ করলেও একটি গাছের ডালও আর পাওয়া যাবে না। কাঠ নেই এ অঞ্চলে।

হিমাংশুবাবুকে সকালের দিকে একটু সুস্থ দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে মোটা লেপ ছিল, সুতরাং ঘুমোতে পেরেছিলেন। পরম্পরায় জানা গেল, মিলিটারীর লোকেরা পুনরায় 'পরচা' বার করেছে,—তাদের বিনা হুকুমে কেউ আজ অগ্রসর হ'তে পারবে না। যদি কেউ যায়, তবে তার নিজের দায়িত্বে। রাজসরকার নিজের ওপর কোনো ঝুঁকি নেবে না। আজকের আবহাওয়া সংবাদ নাকি ভালো নয়! আমাদের সামনে এখনও মহাগুনাস গিরিসঙ্কট বাকি, তারপর বাকি পঞ্চতরণী, সেখানকার পথে একাধিক স্রোতস্বতী অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। পঞ্চতর্ণী অথবা পঞ্চতরণী যাই বলো—সেখানে থেকে অমরনাথ আর মাত্র চার পাঁচ মাইল।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলেছে। আমাদের নির্বোধ বানিয়ে দেবী প্রকৃতি দেখাচ্ছে তা'র নানা চটুল রঙ্গ। ভয় দেখাচ্ছে, ভাবনায় ফেলছে, দেখাচ্ছে কখনও ঊষর অনুর্বর দিকদিগন্ত, নিয়ে যাচ্ছে কখনও সহস্র বরনের কুসুমাস্তীর্ণ উপত্যকাপথে, কখনও গিরিগাত্রের নির্ঝরিণীর পাশ কাটিয়ে, কখনো বা বিজনতায় ভীষণতায় মহাশূন্যচারিণী রাক্ষসীরূপিণীর আলুথালু তুষার ঝটিকায় উন্মত্ত রণরঙ্গের মাঝখানে। সেইজন্য দুরবস্থার মধ্যে মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও রস পাচ্ছি মনে মনে। রসো বৈ স—তিনি রসের মধ্যে আছেন! ঈশ্বর যদি রসের মধ্যে থাকেন, তবে রাজি আছি। রস পাচ্ছি ব'লেই অমরনাথ—নৈলে গুহা আর বরফ ছাড়া কিছু নয়। এমন কোনো যাত্রী দেখিনি—বুড়ো-বুড়ি ধ'রেই বলছি—যারা তীর্থপথ থেকে ফিরে গিয়ে অনুশোচনা করেছে! রস পায় বলেই তীর্থ। তিনি রসময়! ওই রসে মৌমাছির মতো ডুবে মরে তীর্থযাত্রীরা। আমরা দুর্গমে রস পাই, রস পাই দুঃসাধ্য পথে, রস পাই মৃত্যুকে কলা দেখিয়ে পালানোয়, রস পাই অবশ্যম্ভাবী আত্মনিগ্রহে! নৈলে কালীঘাট ছেড়ে ছুটি কেন কামাখ্যায়? কাশীর কেদার ছেড়ে কেন ছুটি কেদারনাথে আর পশুপতিনাথে? যদি কেউ এখন প্রশ্ন করে, ঈশ্বরকে চাও, না অমরনাথ যেতে চাও? তৎক্ষণাৎ জবাব দেবো, ঈশ্বর আপাতত থাক্, অমরনাথ

যেতে চাই! অমরনাথ যাত্রায় রস! বিনিদ্র রাত্রি যাপনে রস, ভল্লুকাতঙ্কে রস, উপবাসে আর বিপদশঙ্কায় রস, চারিদিকের গগনস্পর্শী পর্বতমালা এক রাত্রের মধ্যে তুষারধবল হয়ে গেছে—ওর আশ্চর্য সৌন্দর্যতেই রস!

ওই সময় ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলুম এই ক'টি কথা :

"সকালে চা নেই, খাদ্য নেই, শৌচাদি সম্ভব নয়,—জলের ব্যবহার অভাবনীয়। যে যার তাঁবুর মধ্যে রয়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। বাইরের চড়া হাওয়ায়, ঠাণ্ডায়, বৃষ্টিতে বেরোবার সাহস কারো হচ্ছে না। পাহাড়ের উপরে তুষারপাত হচ্ছে, দল বেঁধে মেঘেরা নামছে নীচে আমাদের তাঁবুর ওপর। মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছি মেঘের মধ্যে। আশা ভরসা আর খুঁজে পাচ্ছিনে। আমাদের তাঁবুগুলি ভিজে সপসপ করছে। ঘোড়াগুলির করুণ চীৎকার এখনও থামেনি। এমন সময় আকাশ কিছুক্ষণের জন্য একটু স্বচ্ছ হয়ে এলো। বৃষ্টি আপাতত থামলো। পুলিশের তাঁবু থেকে খবর এলো, আমরা পঞ্চতরণীর দিকে এবার যাত্রা করতে পারি। বেলা তখন ন'টা বেজে গেছে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁবুগুলি উপড়ে তুলে নিয়ে আমরা যখন যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন গণিশেরের লোক এসে জানালো, হারানো ঘোড়াটা প্রায় দুমাইল দূরে পাহাড়ের পথ থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে। আমরা এই সুসংবাদে নতুন ক'রে সাহস পেয়ে যাত্রা করলুম।"

আজকের পথ অত্যন্ত পিছল এবং সঙ্কটসঙ্কুল। সারবন্দী ঘোড়ারা যখন মালপত্র এবং সওয়ার নিয়ে রওনা হোলো তখন আবার খবর পেলুম, প্রায় তিরিশজন যাত্রী বৃষ্টি-বাদলের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে পহলগাঁওর দিকে রওনা হয়েছে। তাদের মধ্যে 'কুম্ভ স্পেশ্যালের' কয়েকজন যাত্রীও ছিল। পথে দেখছি, পাঞ্জাবী মেয়েরা সবচেয়ে শক্ত। তাদের অধ্যবসায় অক্লান্ত। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এক সময় ঠিকই তা'রা গিয়ে পৌঁছয়। কায়িক শক্তিতে পুরুষ হোলো প্রধান,—কারণ সে জন্মদাতা, সৃষ্টিকর্তা। পরিশ্রমে মেয়ে হোলো প্রধান,—কারণ সে ধৈর্যশীল। অপরিসীম পরিশ্রম করে মেয়ে ওই কোমলাঙ্গে! কী নশ্বর, কী পেলব,—কিন্তু ভিতরে কী কঠিন! পৃথিবীর বলিষ্ঠতম পুরুষ জন্মায় ওই নবনীতকোমলার জঠরে; দিগ্বিজয়যাত্রায় ঐশ্বরিক শক্তি খুঁজে পায় পুরুষ ওই লাবণ্যলতার প্রাণদায়িনী স্তন্যে! সেইজন্য পুরুষ ওদের প্রিয়,—চিরশিশু ব'লেই প্রিয়! প্রতিভাধর পুরুষকে দেখে ওরা আনন্দ পায়,—জানে, সে ওদেরই দেহনিঃসৃত; বর্বর পুরুষকে দেখে ওরা কৌতুক বোধ করে,—জানে, ওদেরই স্তন্যপায়ীর এই রণরসরঙ্গ! ওরা কোনো চেহারায় পুরুষকে দেখে ভয় পায় না,—কেননা ওরা শক্তিরূপিণী! সেই কারণে মহাশক্তির ভিক্ষু

নাম হোলো অভয়া! অভয়া একই জঠরে ধারণ করেন দেবতা ও অসুরকে। এই দেবাসুরের নিত্য দ্বন্দ্বে তিনি প্রমত্তা। কখনও তিনি জগদ্ধাত্রী, কখনও বা মহাকালী। একই শক্তি, কিন্তু বিভিন্ন তা'র অভিব্যক্তি।

ধীরে ধীরে আমাদের ক্যারাভান পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করছে। এবার চলেছি পূর্বলোকে। পথ বড় কষ্টসাধ্য, বড় প্রস্তরসঙ্কুল, বড়ই বিপজ্জনক। গণিশের লাগাম ধ'রে চলেছে। মাঝে মাঝে কণ্টকিত সওয়ারকে পরম বন্ধুর মতো অভয় দান করছে, 'ডরো মৎ।' ডরিয়ে উঠছে অনেকে সামনে আর পিছনে। শীতে ঠক-ঠক ক'রে কাঁপছি সবাই, কিন্তু আমরা যেন বেপরোয়া। যত উপরে উঠছি,— একটির পর একটি ধবলচূড়া। বরফ পড়ছে তখনও পর্বতমালায়—দেখতে পাচ্ছি তাদের অস্পষ্ট ধূম্রজাল। বৃদ্ধ, যুবা, স্থবির, ধনী, দরিদ্র, সাধু, শিশু, নারী, পণ্ডিত, পাণ্ডা, মুসলমান, মিলিটারী—সবাই চলেছে ওই একই লক্ষ্যে। চলেছে ঘোড়া ডাণ্ডি, মিউল্ চলেছে ভাটপাড়ার দল, চলেছে কুণ্ডু স্পেশাল, চলেছে পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র তামিল বিহার আর বোম্বাই। বায়ুযানে যতটুকু নামতে হয়েছিল, আবার চড়াই পথে উঠে আসতে হোলো আন্দাজ হাজার ফুট। নিঃশ্বাসের জন্য অনেকেই কষ্ট পাচ্ছে, অনেকেরই বমির ভাব। দেখতে দেখতে ষোল হাজার ফুটের উপত্যকায় এসে পৌঁছলুম। আকাশ বড় হয়ে উঠলো, সামনে পাওয়া গেল উঁচুনীচু ময়দান। আশেপাশে জমাট বরফের ভিতর থেকে জলের প্রবাহ আসছে, দেখতে পাচ্ছি তুষারাচ্ছন্ন নদী আর হিমবাহ, দেখতে পাচ্ছি সহস্র বৈচিত্র্যভরা বহুবর্ণকুসুম-লতাবল্লরী আস্তীর্ণ পথে পথে। গাছপালা কোথাও নেই, চিহ্ন নেই কোনো ফলনের, মানুষের ছায়ামাত্র নেই দূরদূরান্তরে। কোথাও কোথাও শুক্‌নো সাদা কঙ্কাল, কোথাও বা গত বছরের যাত্রী সমাগমের চিহ্ন ছড়ানো। আমরা সারবন্দী চলেছি। মাঝে মাঝে অশ্বরক্ষীর গলার আওয়াজ— 'হোস, সাব্বাস, হোস সাব্বাস'—প্রান্তরে আর পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কখনও চলতে চলতে দেখছি একই পাথরে বহুবর্ণসমন্বয়, কখনও নীল ফুলের আস্তরণ, কখনও নাকে আসছে জলপ্রপাতের সঙ্গে তীব্র গন্ধকের গন্ধ, অনুর্বর পর্বতরাজির শিরে শত শত ক্ষয়িষ্ণু মৃন্ময়ের ক্লিফ্। সামনে দিয়ে অগম্য পায়ে চলা পথ গেছে বলতালের দিকে জোজিলা গিরিসঙ্কটে, লাদাখের পথ ঘুরে ঘুরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, পূর্ব প্রান্তে তিব্বতের দুরতিক্রম্য পর্বতমালা দেশান্তের বিরাট প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে—অজয়-অমর অনাদি-অনন্ত! আমরা কখনও নামছি নীচে—নদী-ঝরনা পার হচ্ছি, কখনো উঠছি উপরে। চারিদিকের পার্বত্য প্রকৃতির মাঝখান দিয়ে এইভাবে মহাগুনাস গিরিসঙ্কট অতিক্রম ক'রে

চলেছি। নদীর গতি ছিল এতকাল আমাদের পিছনদিকে, এবার তাদের বিপরীত গতি। আমরা চলেছি নদীপ্রবাহ পথ ধ'রে।

সহসা আমাদের গতি রুদ্ধ হোলো। ছয় হাজার বছর আগে এখানে নাকি এক ঋষি এসেছিলেন হিমালয়ের কোন্ প্রান্ত থেকে। তিনি মহাগুনাসের নৈসর্গিক শোভা দেখে পথের ধারে থমকে দাঁড়ান, এবং কালক্রমে প্রস্তরীভূত (fossilised ?) হয়ে যান। পথের বাঁদিকে একটু পাশে সেই ঋষির আয়তন পাহাড়ের সঙ্গে মিশে একাকী দাঁড়িয়ে। আমরা স্তব্ধ, বিমূঢ়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় এমন একটা মানুষের আকার-আয়তন কল্পনা করা আছে। আমরা যেন অনেকটা মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সেই আযতনকে (outline) এককালের ঋষি ব'লে ভাবতে লাগলুম। ঝাঁঝরা পাথরে আকৃত একটা অদ্ভুত মানুষের কল্পনা সহসা মনে আসে বৈকি। বিচিত্রবর্ণ পাথরে, নানা রংয়ের ফুলে ও লতায়, বিভিন্ন গুল্মে ও শিকড়ে এবং পরিশেষে মানব-অবযবের কল্পনায় দৃশ্যটা অভিনব সন্দেহ নেই। শোনা গেল, বহু শত বছর ধ'রে বহু জাতির লোক এর কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে চলে যায়।

সুদূর আকাশে হঠাৎ এক সময়ে গুরু-গুরু ঘোষণা শোনা গেল। চেয়ে দেখি, তুষার-শুভ্র পর্বতমালার উপর দিয়ে আবার মলিন মেঘদলের ষড়যন্ত্র চলছে। আবার দেখতে দেখতে যাত্রীদের মুখে চোখে আতঙ্ক দেখা দিল। মাঝপথে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। এখনও অনেক পথ বাকি। পাহাড়ে দ্রুতগতিতে চলা যায় না। অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল পথ। বছরে মাত্র দুটি দিন মানুষে এই পথ মাড়ায়। একবার যায়, একবার ফেরে। পায়ে হাঁটা সবচেয়ে নিরাপদ। কেননা যদি মৃত্যু হয়, তবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গোলযোগে, আর নয়ত পাহাড়ী আমাশয়ে,—অন্য অপঘাতের সম্ভাবনা নেই। অনেকটা সুবিধা, ঘোড়া কিম্বা ডাণ্ডি, কিন্তু দুটোতেই ভয়। হিমাংশুবাবু বললেন, জনৈক যাত্রী ডাণ্ডিতে যাচ্ছিল পাহাড়ে। ঘণ্টা চারেক পরে ডাণ্ডিওয়ালারা আবিষ্কার করলো যাত্রীটি মৃত,—ভয়ে ও ঠাণ্ডায় কখন মরেছে জানা যায়নি।

লাগাম ক'সে ধরেছে গণিশের। পথ নেই, আছে পেরিয়ে যাবার একটা রেখা। কাঠ হয়ে আছি ঘোড়ার পিঠে। দুখানা হাতই অচেতন। বজ্রমুষ্টিতে ধ'রে আছি ঘোড়ার পিঠ, সেই মুষ্টি মৃত্যুর পরেও হয়ত আলগা হবে না। জমাট কঠিন মুষ্টি পাথরের মতো হয়ে থাকবে। ডান হাঁটু প্রায় ঠেকছে পাহাড়ে, বাঁ-হাঁটুর পাশে গভীর খাদ—হাজার ফুট নীচু। একটু ভারসাম্যের এদিক ওদিক, ব্যস,—অবধারিত মৃত্যু! গণিশের মাঝে মাঝে সেই অভয়বাণী উচ্চারণ করছে,—'ডরো মৎ।' বৃষ্টি এলো ফোঁটায়, ফোঁটায়, এলো আবার তুহিনের

ঝাপটা, এলো সেই ১৯২৮-এর সম্ভাবনা। আসুক, তবু ব'লে যাবো—যা দেখে গেলুম এর তুলনা কোথাও নেই। নীলগঙ্গা আর অমরাবতীর তীরে তীরে কাশ্মীরের অমৃত আত্মাকে দর্শন ক'রে গেলুম। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য কল্পনা, শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যের পরম মধুর ভাবনা, শ্রেষ্ঠ যোগ ও সাধনা - মানবাত্মার নিগূঢ় রহস্যলোক থেকে যা কিছু উদ্ভূত হয় - এই পথে যেন তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

বৃষ্টির ধারা নামছে। সমস্ত শরীর আবৃত মোটা গরম পোশাকে। শুধু নিজের নাক এবং তার চারদিকে ঘা ফুটেছে কাল থেকে। হাতের দস্তানা খুলেছি। বৃষ্টিতে ভিজছে মুখ আর হাত। দেখতে দেখতে ঘন বৃষ্টিধারা। কিন্তু আমরা শান্ত,—এ আমাদের ধৈর্য, সাহস ও সহনশীলতার পরীক্ষা। এবার চুড়া থেকে এঁকে-বেঁকে পাকদণ্ডী দিয়ে নামতে থাকি। এতটুকু ভুল, ঈষৎ পদস্খলন, সামান্য বিভ্রান্তি, একটুখানি দ্রুতগতির চেষ্টা—নিশ্চিত অপঘাত। একটি স্বাস্থ্যবতী পাঞ্জাবী তরুণী তার কমরেডকে নিয়ে ছোটবার চেষ্টা করেছিল দেখেছিলুম। পরে হিমাংশুবাবুর কাছে শুনতে পাই, নিজের ভারসাম্য রাখতে না পেরে মেয়েটি ছিটকে প'ড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। হিমালয় কখনো বদ্‌সাহসীকে ক্ষমা করে না।

অমরাবতী নদীর দিকে নামছি। কেউ কেউ বলে অমরগঙ্গা। এই অমর-গঙ্গার পাঁচটি ধারা এখানকার আশেপাশে রয়েছে এবং ওই পাঁচটি ধারা পেরিয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছবো 'পঞ্চতর্ণী'র প্রশস্ত ময়দানে। এরা নাকি মূল সিন্ধুরই শাখা-প্রশাখা। এই গঙ্গার চারিদিকে তুষারাবৃত পর্বতমালা অতি অপরূপ। পর্বতের পাদমূলে বলেই এখানে নানাদিকে নেমেছে গিরিনদীর দল। কোনোটি জাস্কার গিরিমালার মধ্যে হারিয়ে গেছে, কোনোটি বা অপর একটি সিন্ধুর উপনদীর সঙ্গে মিলেছে। আমাদের সামনে বিরাট ভৈরবঘাটের পর্বতচুড়া এবং তারই পাশে অমরনাথ পর্বতের তুষারশৃঙ্গ। গুহা কোথায় জানিনে। শুধু জানি ভৈরবঘাট পর্বত অতিক্রম ক'রে আমাদের আরোহণ করতে হবে অমরনাথ পর্বতে।

আবছায়া অন্ধকারে দিকদিগন্ত ঘিরে মুষলধারায় বৃষ্টি নামলো। ঠিক পঁচিশ বছর আগে এইখানে এইপ্রকার বৃষ্টিতে নেমে এসেছিল বিরাটকায়া তুষার নদী মূল পাহাড়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। পরের বছরে শত শত লোকের কঙ্কাল এই মৃত্যু উপত্যকায় খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রবল বৃষ্টি ও তুহিন ঝড়ের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করা চলছে না।

আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায় এবং শান্তভাবে এক এক পা ক'রে নদীর দিকে চললুম। বৃষ্টির প্রবল ধারায় আমরা দিশাহারা হয়ে গেলুম।

এই আমাদের কপালে ছিল। ভাগ্যদেবতা কানে-কানে বললেন, ভয় নেই, তোদের মারবো না, কেবল শীতের চাবুকে ঠাণ্ডা করবো। এই ত্যাখ, মুষলধারায় বৃষ্টি। এবার বল্ ঈশ্বরকে মানিস কিনা?

শোনো কথা। পৃথিবীর বহু ঈশ্বর-ভক্তের চোখে দিনরাত অশ্রু গড়ায় কেন? মার খেয়ে তাদের হাড়পাঁজরা ভাঙে কেন? পুণ্যের সংসারে কেন আগুন লাগে? ভক্তিমতী বিধবার একমাত্র সন্তান কেন মরে অপঘাতে?

আবার তর্ক? তর্কে পাবি কিছু? তবে নে,—মর!

মনে মনে বললুম, যাবার সময় মেরো না, দোহাই। ফিরতি পথে 'এভালান্স্' পাঠিয়ো—একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সেই ভালো! ছা-পোষা লোক, দেশে গিয়ে আর দুঃখ পেতে হবে না! মরে বাঁচবো!

পিছন থেকে হিমাংশুবাবু চেঁচালেন,—ও মশাই, এ কি হোলো?

প্রবল বৃষ্টির ঝাপটায় আমাদের ঘোড়া স্থির থাকছে না। গণিশেরের কাছে ছিল আমার ছাতা। ঘোড়ার পিঠে ব'সে ব'সেই সেই ছাতা নিলুম বাঁহাতে। কিন্তু এক হাতে ঘোড়ার পিঠে ভারসাম্য রক্ষা করা যে ভয়ানক সমস্যা। উত্তর-দিক থেকে নদী বয়ে এসে ছুটছে পূর্বদিকে। এই মস্ত নদী আমাদের পেরোতে হবে। ঠাণ্ডায় অসাড় হচ্ছি প্রতি মূহূর্তে। কিন্তু ওর মধ্যেই অতি সন্তর্পণে ছাতা নিয়ে বাঁ হাতে ধ'রে থাকতে হোলো। নদীর খানিকটা অংশ পায়ে হাঁটা, খানিকটা কাঁচা সাঁকো। সামনে পিছনে মেঘের মধ্যে আমরা ডুবেছি। তার উপরে অবার প্রবল বারিধারার জন্য একটা আবছায়া যাদুজাল সৃষ্টি হয়েছে। যতদূর দক্ষিণে দৃষ্টি চলছে, পাহাড়ে পাহাড়ে শুধু তুষারের মুকুট। একদিকে লাদাখ, একদিকে তিব্বত, উত্তর-পশ্চিমের দিকে বলতাল ছাড়ালে জোজিলা গিরিপথ এবং উত্তর-পূর্বে ভৈরবঘাট পেরিয়ে অমরনাথ পর্বতচূড়া। নীচে এই খরস্রোতা অমরাবতী নদী—যাকে বলা হচ্ছে অমরগঙ্গা। আমরা পুনরায় ষোল থেকে পনেরো হাজার ফুটে নেমেছি।

বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় আমাদের ধাক্কা দিচ্ছে। হিমাংশুর সর্বাঙ্গ—মাথা সমেত —ঢাকা আছে পাতলা প্লাস্টিকের ওয়াটার প্রুফে। আমি ভিজছি মোটা জামা ও প্যাণ্ট সমেত। জল লাগছে হাতে পায়ে পিঠে—কেবল ছাতার জন্য বাঁচছে মাত্র মাথাটা। বরং মাথাটা গিয়ে বাকিগুলো বাঁচলে কাজ দিত। আমরা কাঠ-পাথরে জোড়াতাড়া লাগানো যেমন-তেমন একটি সাঁকো পার হচ্ছিলুম। ভাগ্যবিধাতার চেষ্টা ছিল, ঘোড়াসুদ্ধ ধাক্কা দিয়ে নদীগর্ভে তিনি আমাদের

ফেলে দেন্ এবং ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু গণিশের কাছে তিনি পরাজিত। তাঁর কৌতুকরঙ্গ গণিশের বোঝে—সেইজন্য সে সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকে। ধীরে ধীরে আমরা সেই প্রবল বারিবর্ষণের ভিতর দিয়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠলুম। ওপারে বালু ও পাথরের চড়া,—তারই পিছনে বিস্তৃত পঞ্চতর্ণীর তুহিন উপত্যকা। উপত্যকার পিছনে ভৈরবঘাটের বিশাল পর্বতচূড়া তুষারমণ্ডিত! চোখ ভ'রে দেখে নিচ্ছি সব, চোখ থেকে আমাদের কিছু না হারায়। এখানে আমার ডায়েরী থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করি:

"ধীরে ধীরে তিন মাইল বরফানি বাতাসের ভিতর দিয়ে নদীগর্ভে এসে নামলুম। ঝড়বৃষ্টির ঝাপটায় কোনো কিছু দেখতে পারলুম না। কে কোথায় রইলো, কা'র কি গতি হোলো কে জানে। ঘোড়ার উপরে ব'সে সর্বশরীর ঠাণ্ডায় শিটিয়ে উঠছে। এখানে তাপমাত্রা বলতে আর কিছু নেই। ভয়ের কথা এই, সমস্ত জামাকাপড় এবং বিছানাপত্র ভিজে থকথক করছে। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত, ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি যেন। নদী পেরিয়ে এপারে এলুম। মাথার উপরে বরফের চূড়া। তুহিন বাতাস মুহুর্মুহু ঝাপটা দিয়ে চলেছে তুষার ঝড়ের মতো। কিন্তু সমস্তটা কী অপরূপ, কী অভিনব আমাদের চোখে। সর্বপ্রকার বিপদ-আপনাদের বাইরে এখানকার পার্বত্য প্রকৃতির যে স্বাভাবিক শোভা দেখে গেলুম, সেই ত' আমাদের পরম পুরস্কার। তাকেই ত' লালন করবো মনে মনে চিরদিন! যাই হোক, খানিকটা চড়াই উঠে গিয়ে বিস্তৃত পঞ্চতর্ণীর উপত্যকা পাওয়া গেল। সেখানে পৌঁছে সেই বৃষ্টির মধ্যে ধৈর্য সহকারে গণিশের আমাদের তাঁবু খাটিয়ে দিল। বেলা তখন দুটো বেজে গেছে। হিমাংশুবাবু তাঁবুর মধ্যে ঢুকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন, আর তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। আমরা হাড়ের মধ্যে ঠক-ঠক ক'রে কাঁপছি- কষ্ট পাচ্ছি এবং আর্তনাদ করছি। পকেটে খান দুই স্যাঁতসেঁতে বিস্কুট ছাড়া এই দুর্যোগে আর কোনো আহারাদির কথা ওঠে না। গরম চা স্বপ্ন! তাঁবু থেকে কারো বেরোবার সাহস হচ্ছে না। কেমন ক'রে আহার্য অন্বেষণ করা হবে কেউ জানে না। নীচে দিয়ে নদী বইছে, তার তটে এই তুহিন প্রান্তর। কোথাও কোথাও একটু-আধটু ঘাস দেখতে পাচ্ছি। বাদ বাকী সমস্তটাই শূন্য ধূসর আবছায়াময় জনচিহ্নহীন পার্বত্য প্রকৃতি। তাঁবুর মধ্যে ব'সে যখন এই কথাগুলি এলোমেলোভাবে লিখে যাচ্ছি, তখন সন্ধ্যা সাতটা। শরীরের নীচের দিকটা বলতে গেলে অসাড় হয়ে গেছে এই বৃষ্টিবাদলের ঠাণ্ডায়।"

বৃষ্টি কমে গেছে সন্ধ্যার পর। কিন্তু তাঁবুর বাইরে আর কোথাও কিছু দেখা

যায় না। ধূসর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অদূরে খরতর নদী বয়ে চলেছে ইস্পাতের ফলকের মতো। চারিদিকে তার এমন ভীষণ বৃক্ষলতাহীন অনুর্বর পাহাড়তলী, সহসা আর কোথাও দেখা যায় না। আন্দাজে বুঝতে পারি মেঘেরা নেমেছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। মেঘ আর গ্লেসিয়ার ঝুলছে প্রত্যেক পাহাড়ের কোলে কোলে। গতকাল থেকে সেই দুর্যোগ এবং বাতাস এখনও কমেনি। ইতিমধ্যে পেয়েছিলুম গরম চা এবং কিছু খাদ্য, তাতে উপোস রক্ষা হয়েছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনোমতে পছন্দসই আহার জোটাতে পারি! আজ নিয়ে তৃতীয় দিন হোলো পহলগাঁও থেকে বেরিয়েছি। তিনদিন কিংবা তিন বছর সহসা ঠাহর করা যায় না। ভুলে গেছি সব, স্মৃতিশক্তি অনেকটা যেন লোপ পেয়ে গেছে। প্রতি ঘণ্টায় আবিষ্কার করেছি নতুন স্বপ্নলোক, নতুন জগৎ, নতুন প্রকৃতি। প্রতি মাইল পথ হোলো আমাদের জীবনের এক একটি পরিচ্ছেদ, এক একটি ইতিহাস। এত অল্প পথে এমন দুস্তর গিরিলোক আগে আমার দেখা ছিল না। গতকাল প্রভাতে বায়ুযানের পথে একটি পাহাড়ী মেষপালককে দেখেছিলুম তেলনাড় নামক অঞ্চলের কাছাকাছি, তারপর যাত্রীদল ছাড়া পাহাড়ে পাহাড়ে মানুষের চিহ্ন আর কোথাও দেখিনি। এটা নতুন বটে। মানস সরোবর, কেদার-বদরি, যমুনোত্রি-গঙ্গোত্রি, পশুপতিনাথ—কোথাও এমন নয়। অথচ বুঝতে পারা যায়, এটা মধ্য এশিয়ার দিকে যাবার ভিন্ন একটি পথ। আমি যদি এখান থেকে নিকটবর্তী পাহাড়-শ্রেণী পেরিয়ে পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করি, তবে পথ অবারিত। পূর্বপর্বতের তলা দিয়ে জাস্কার গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে যতদূর খুশি চ'লে যাও, ভারতের সীমানা কোথাও নির্দিষ্ট নয়।

ঠিক বায়ুযানের মতো! সমস্ত রাত্রি ওই নদীতীরের তুষার-বাতাসের ঝাপটায় তাঁবু নড়তে লাগলো। কম্বলের তলায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে তেমনি বিনিদ্র রাত্রিযাপন। চোখ বুজে রইলুম বটে, কিন্তু হাড় পাঁজরার মধ্যে এমন মোচড়াতে লাগলো যে, কোনো মতেই ঘুম এলো না। সন্ধ্যা রাত্রের দিকে হিমাংশুবাবু একখানা উপরি কম্বল আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও সুবিধা হয়নি। তাঁবুর চালে বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ কোনো সময়েই থামেনি। কে জানে আগামী কালের জন্য আমাদের ভাগ্যে আর কি জমা আছে! এখান থেকে অমরনাথ আর মাত্র চারপাঁচ মাইল পথ। এত অনিশ্চয়তা, এত দুর্ভাবনা, এত আশঙ্কা—তবু মন আছে প্রফুল্ল, আমাদের বহুকালের বহু প্রত্যাশার স্থলে গিয়ে পৌছতে পারবো। শিশুকাল থেকে শুধু ছবি দেখে এসেছি, গল্প শুনেছি, দুঃসাধ্য পথের ইতিহাস জেনেছি, মানচিত্রে এর অবস্থান-চিহ্ন দেখে কতদিন কত কল্পনা

করেছি,—আগামী কাল সমস্ত কৌতূহলের পরিসমাপ্তি। মর্ত্যসীমার প্রান্তে দাঁড়িয়ে অমর্ত্যলোকের দ্বার উন্মোচন করবো। কাল আমাদের পূর্ণ যাত্রা! কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রির অনাগত ইতিহাস এখনও বুঝতে পারছিনে। বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামে নি। জানি তুষার-সমাকীর্ণ হবে আমাদের সমস্ত পথ। কিন্তু নেমে আসবে কি 'গ্লেসিয়ার' এই উপত্যকায়? ছুটে আসবে কি 'এভালান্স' ওই অমরগঙ্গায়? শত শত প্রাণীর পক্ষে এমন ভয়ার্ত রাত্রি কবে কে কোথায় দেখেছে? মৃত্যু-সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এদের মতো কে কোথায় এমন করে প্রহর গুণেছে?

ঠিক মনে নেই। বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইনি। হিমাংশুবাবুর গলার আওয়াজ শুনে কম্বলের রাশির ভিতর থেকে মুখ বার করলুম। বিশ্বাস করিনি, প্রভাত হবে এত শীঘ্র! জানতুম দুঃখ আর যন্ত্রণার রাত্রি বড় দীর্ঘ হয়।

বিশ্বাস করিনি এই আশ্চর্য প্রভাত! কবে বৃষ্টি হয়েছিল, কোনো চিহ্ন তার নেই। কবে মৃত্যুভয় পেয়েছিল সবাই, কোনো স্মৃতি তার মনে পড়ে না। সমগ্র আকাশ যেন নীলোজ্জ্বল এক মহাকাব্য। মধুর সূর্যকিরণ পড়েছে অমরাবতীর নীলাভ জলরাশিতে। প্রভাতের মৃদু স্নিগ্ধ সমীরণ-শিহরণ দূর দূরান্তরে জানিয়ে দিচ্ছে অভয়বাণী। দুগ্ধশুভ্র তুষারের আবরণে সমস্ত পর্বতগুলি সূর্যরশ্মিজালে ঝলমল করছে। অভিমান এলো মনে। তবে কি এই তুমি! তবে গতদিন কেন অমন রুদ্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করেছিলে? কেন অমন মত্ত মহাকালের জটাজালে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে শিশু মানবের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করেছিলে? এত সুন্দর তুমি, কেন তবে এত ভীষণ কান্না এলো দুই চোখে।

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ মৃত্যোর্মামৃতং গময়ঃ,—অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যুর থেকে নিয়ে যাও অমৃতলোকে! হয়ত এ সেই অমৃতলোক। পিছনে ছিল মৃত্যু—সামনে অমরাবতী। অসত্যের থেকে সত্য, ভয় থেকে জয়। জয়বার্তা বিঘোষিত হচ্ছে আমাদের সম্মুখপথে। প্রসন্ন প্রভাতের সূর্য এনে দিচ্ছে যেন মধুরের ধ্যানাবেশ, আনন্দে আবার হেসে উঠেছে সেই প্রাচীন পৃথিবী! দেবতাত্মা হিমালয় তাঁর রত্নগিরির দ্বার খুলেছেন। গত দুদিনের ইতিহাস দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মুছে নিয়ে চলে গেল।

আমাদের পিছন দিকে প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল কুণ্ডু স্পেশালের তাঁবু। সেখানে সরকারি চালা আছে। সেখান থেকে আমাদের যাত্রাকালে আবার এলো দুঃসংবাদ। এক বাবাজী শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টে কাল মারা গিয়েছে এবং

পেটের পীড়ায় একজন মৃত্যুশয্যায়। শঙ্কর কুণ্ডু বললে, আবার কয়েকজন পালিয়েছে ভয়ের হিড়িকে। মেয়েরা কাঁদতে বসেছিল আকাশের চেহারা দেখে, আশা ত্যাগ করে চলে গেছে অনেকে। কতগুলি মেয়েপুরুষ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত, কেউ কেউ শ্রান্তিতে ধরাশায়ী।

আন্দাজ সাড়ে সাতটায় আমরা যাত্রা করলুম। আমাদের মালপত্র সমেত তাঁবু এখানে পড়ে রইলো অশ্বরক্ষীদের জিম্মায়, আহমদ রইলো তত্ত্বাবধানে। অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। আজ পূর্ণিমা তিথি, হিন্দুমতে উপবাস। দর্শনান্তে শত শত লোক জলগ্রহণ করবে, তার আগে নয়। শীতের হাওয়ায় আর রৌদ্রে আজকের যাত্রা বড় আনন্দদায়ক। আকাশের উজ্জ্বল নীলাভা বলছে, এ বছরে আর বৃষ্টি হবে না, নিশ্চিত থাকো। সুতরাং পুনর্জীবন লাভ করেছি আমরা।

কিন্তু আজকের পথ বড় পিছল। সকলেই অতি সতর্ক। উঠছি উপরে, উপর থেকে উপরে। ঠিক যেন বিরাট কোনো প্রাসাদের কার্নিশের উপর দিয়ে চলা। মাথা টললেই মৃত্যু। ঘোড়ার পা পিছলোলে ঘোড়াসুদ্ধ তলিয়ে যাওয়া। পথ মানে, পথ নয়। অত্যন্ত আতঙ্ক ফুটছে মুখে চোখে, শরীরের রক্ত চলাচল মাঝে মাঝে যেন স্থির হয়ে আসছে। আজ আর কেউ নিরাপদ মনে করছে না। পাকদণ্ডি একটির পর একটি। ঘোড়াকে এক একবার টেনে তুলতে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে শঙ্কিত, সচেতন, ত্রস্ত এবং আড়ষ্ট। কিন্তু গণিশের আমার রক্ষক, জানি তার হাতে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার নীলাভ দৃষ্টিতে কী স্নেহ, মৃন্ময় কাশ্মীরের সমস্ত মধুর পেলবতা ওর ব্যবহারে। কিন্তু কী দরিদ্র সে। ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ, ছিন্ন কম্বল, একেবারে নিঃস্ব। পায়ে ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া শেরওয়ানী। ওর খাওয়া দেখলে কান্না পায়। চার দিন আগেকার রান্না পোড়া ভাত, আর সেই পললগাঁও থেকে আনা লাউয়ের শুকা,—ব্যস। আমি জোর করে ওর হাতে দিয়েছিলুম কিছু রুটি। প্রথমটা নিতে চায়নি, পাছে ওর জাত যায়। এদিকে গ্রাম্য মুসলমানদের ধারণা, হিন্দুর হাতের তৈরী কিছু মুখে দিলে তাদের সমাজচ্যুতি ঘটবে। এটা জাতিগত অভিমান বুঝতে পারি। সেই একই ইতিহাস আসমুদ্রহিমাচল। এক রক্ত, এক প্রকৃতি, একই সংস্কৃতি। আফগানী তুর্কিরা একদা এদেরকে ধরে গায়ের জোরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর এরা ফিরে আসে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের কাছে। পণ্ডিতেরা এদের গ্রহণ করেনি। এরা পাহাড়ে পর্বতে দেহাতে উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

পাহাড়ে পাহাড়ে নদী ঝুলছে তুষারমণ্ডিত। জলপ্রপাত নামতে গিয়ে

বরফে জমাট বেঁধে স্থির হয়ে গেছে—তাদের ভিতর থেকে চুঁইয়ে নামছে জলের ধারা। তুহিন নদী ও নির্ঝরিণী পথে পথে। কোথাও শ্যাওলা নেই, কোথাও নেই তৃণচিহ্ন। পথের ধারে মাঝে মাঝে আবার সেই কুসুমশয্যা—সেই নানাবর্ণ—সেই মৃৎপাথরের ভিতর থেকে প্রাণবন্যা। তৃণপুষ্পে কাশ্মীরের হৃদয়ের অর্ঘ্যসম্ভার। ধীরে ধীরে আমরা উঠছি—দৃঢ় পদ, দৃঢ় ইচ্ছা, দৃঢ় মনোযোগ আমাদের। উদার ভাবনা, মধুর স্বপ্ন, মহৎ চিন্তা—তার সঙ্গে ভয় আর অনিশ্চয়তা তার সঙ্গে পায়ে আর শিরদাঁড়ায় অসহনীয় কনকনানি। আমরা শুধু এগিয়ে যাচ্ছি। এই পথে আসতো শক আর হুন—আসতো তুকি-তাতার, আসতো মধ্য এশিয়ার অনামা অজানা যাযাবর দস্যুর দল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে তারা প্রথম খাদ্য আর আশ্রয় পেতো, প্রথম পেতো মানুষের সমাগম—সেই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল প্রথম গ্রাম, অর্থাৎ পহলগাঁও!

মাইলের পর মাইল চড়াই আর উৎরাই। বায়ুশীর্ণতার জন্য আমরা কষ্ট পাচ্ছি। এ-যাত্রায় প্রায় সতেরো হাজার ফুটের উচ্চতায় উঠেছিলুম। এবার নামবার পালা। ধীরে ধীরে পথ ঘুরছে পূর্বদিকে। ভৈরবঘাটের সীমানা শেষ হচ্ছে। ডান দিকে ঘুরে যাচ্ছি। আশেপাশে চলেছে সাধুসন্ন্যাসী, চলেছে বাবাজী-বৈরাগী। ধীরে ধীরে নামছি। পোড়ামাটির মতো পথ, কিন্তু বৃষ্টি ভেজা,—পিছল। ফিরছি ডান দিকে, ভৈরবঘাটের পিছনে,—আবার নামছি। নামতে নামতে এসে পৌঁছলুম তুষারনদীর প্রান্তে। তুষারমণ্ডিত পথ আর উপত্যকা পেরিয়েছি অনেকবার, কিন্তু এবার নতুন অভিজ্ঞতা। তুষারনদীর ওপর ঘোড়া নিয়ে নেমে এলুম। পায়ের তলায় বরফের নীচে দিয়ে প্রবল নদীর স্রোত, আর আমরা উপরতলার কঠিন বরফের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি। যদি চিড় খায় কোথাও, যদি কোথাও নরম থাকে—তবে রক্ষা নেই। বাঁকের মুখে সোজা উত্তরে চ'লে গেছে একটি নদীর ধারা তিব্বতের মধ্যে, কিন্তু এইটি হোলো অমরগঙ্গার মূল প্রবাহ। এপারে ভৈরব ঘাট, ওপারে অমরনাথের চূড়া। কিছুদূর গিয়ে গণিশের বললে, বৎরাইয়ে! - হয়ত তার মনে দুর্ভাবনা ছিল, যদি দৈবাৎ আমাদের পায়ের তলায় ধস নেমে যায়! সুতরাং আমরা এবার নামলুম সেই তুষার নদীর ওপর। পায়ের তলায় বরফ কচমচ ক'রে উঠলো। এমন বরফ কিনতে পাওয়া যায় কলকাতার বাজারে সর্বত্র। বড় বড় ডেলা, মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা যায় না। রংটা স্বচ্ছ শাদা নয়, ঈষৎ ঘোলাটে। পায়ের তলায় দুরন্ত নদীর প্রবাহ। মাঝে মাঝে পায়ের পাশে ছোট বড় গহ্বর, তার ভিতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছি কালো জল

আবর্তিত হচ্ছে। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে চলছি, প্রতি পদে যেন শিহরণ হচ্ছে। নদী ধরেই চললুম কিছুক্ষণ। এক সময়ে গণিশের আবার তুললো ঘোড়ার পিঠে। কিছুদূর গিয়ে এই নদীই আবার উত্তাল উদ্দাম জলধারাসহ প্রকাশ পেলো। আমরা এলুম সাঁকোর কাছে। সেটা অমর গঙ্গারই সাঁকো। সেই ছোট্ট সাঁকো পার হয়ে ওপারে অমরনাথ পর্বতের পাদমূলে গিয়ে আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে এবার নেমে পড়লুম। এর পর আর ঘোড়া যাবে না। সামনের চড়াই ধরে কমবেশী পাঁচশো ফুট উঠে গিয়ে পাবো অমরনাথের গুহামুখ।

প্রসন্ন নীলাভ দুই চক্ষু প্রসারিত ক'রে স্মিত হাস্যে সামনে দাঁড়ালো আমার ভয়ত্রাতা সৌম্যদর্শন মুসলমান গণিশের। দুর্দিনের দুর্যোগের আতঙ্কের অভয়দাতা আমার নিত্য সঙ্গী—আমিও তাকালুম তার প্রতি। অন্তর্যামী আমার কানে কানে বললে, থাক্ অমরনাথ, সকলের আগে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করো ওই গণিশেরের পদতলে! তোমার পঞ্চপিতার এক পিতা হোলো ওই দরিদ্র হতভাগ্য চিরবুভুক্ষু গণিশের, কারণ ও তোমার ভয়ত্রাতা—রক্ষক! অভিমান ত্যাগ করো, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্ত হও, মানুষের অন্তর্নিহিত নারায়ণকে স্বীকার ক'রে নাও! পদধূলি গ্রহণ করো ওই পরমাত্মীয় মুসলমানের!

পারলুম না! হাজার হাজার বছরের রক্তের ধারাবাহিকতার সংস্কার দিল বাধা। বংশপরম্পরাগত জাত্যভিমান পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ালো মাঝখানে। কী ছোট আমি! কী ক্ষুদ্রচেতা, কী দরিদ্র! নিজেকে চাবকালুম শতবার। চোখে জল এসে দাঁড়ালো। অবশেষে দু'খানা প্রাণহীন বাহু বাড়িয়ে গণিশেরকে সহসা ঘন আলিঙ্গনে বেঁধে দিলুম। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী অপমান ক'রে ফেললুম নিজেকে, যখন তাড়াতাড়ি মনিব্যাগ খুলে কয়েকটা টাকা দিলুম তার হাতে। প্রাপ্য তার কানাকড়িও নেই, সুতরাং গণিশেরের চোখে-মুখে ছিল কিছু বিস্ময়। কিন্তু আমি আর পিছন ফিরে কোনোমতেই তাকাতে পারলুম না।

প্রখর রৌদ্র। অমরগঙ্গার আঘাটা থেকে উঠে গেছে এই পথ সোজা গুহা পর্যন্ত। তুহিন ঠাণ্ডা নদীতে বহু লোক সাহস ক'রে স্নান করতে নেমেছে। এই নদী তিব্বতের দিকে চলে গেছে। আশেপাশে সামনে পিছনে পাহাড়ের গা বেয়ে তুষার নদীগুলি ঝুলছে। এরা চিরস্থায়ী, সহজে গলে না। মে-জুন মাসে কি হয় বলতে পারিনে। রৌদ্র এত প্রখর যে, তুষার আবহাওয়া সত্ত্বেও কোনো কষ্ট আমাদের হচ্ছে না। বরং রাশীকৃত গরম আচ্ছাদনে এবার বেশ

অসুবিধা বোধ করছি। এখন বুঝতে পারা যায় মোটমাট কত যাত্রিসংখ্যা এ বছরের। পুরো এক হাজার কি হবে? মনে হয় না। সেই সুইডিস ছাত্রটি এসেছে, একজন বৃদ্ধ ফরাসী ভদ্রলোক এসেছেন। অদূরে দেখছি সেই মিলিটারী যুবক মিঃ মজুমদার এবং তাঁর সঙ্গিনী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়কে। এদিকে ভাটপাড়ার এন. পি. ভট্টাচার্য মহাশয়ের দল আর কুণ্ডু স্পেশালের লোকজন। উপরে উঠছেন ঘোষ মশাই তাঁর মাকে নিয়ে। চন্দনবাড়ির পথে সেই যে পাঞ্জাবী মহিলাটি ঘোড়া থেকে পাহাড়ের ধারে প'ড়ে গিয়ে আহত হন—তিনিও এসে পৌঁছেছেন, কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আরো বহু এসেছেন, যাঁদের সঙ্গে মুখচেনা হয়েছে গত পাঁচ ছয় দিনে। এসেছেন সেই মিসেস রায়—শ্রীনগর ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের এজেণ্টের স্ত্রী,—হিমাংশুবাবুর পাতানো দিদি। পুলিশ মিলিটারী সবাই আজ এসেছে।

এই শেষ চড়াইটুকু বড় গায়ে লাগছে। বায়ুশীর্ণতার জন্য পরিশ্রম খুব বেশী মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে প্রায় উপরে উঠে এলুম। আর পঁচিশ ফুট উঠতে পারলেই গুহামুখ পাই।

ঘোষ মশাইয়ের বৃদ্ধা জননী শুয়ে পড়লেন। আর তাঁর ওঠবার শক্তি নেই। বোধকরি জ্ঞানহারা হবার সম্ভাবনা ছিল। মাথা ঘুরছে, বমি ভাব। ঘোষ মশাই দিশাহারা হয়ে ছুটে নেমে যাচ্ছিলেন। মায়ের যদি অন্তিম ঘনিয়ে থাকে? এখনও যে দর্শন হয়নি! ডাক্তার কি এখানে মেলে না?

দাঁড়ান্ বাধা দিলুম ঘোষ মশাইকে।—মা ঠিক বাঁচবেন, কিন্তু আপনি মুখ থুবড়ে যদি গড়িয়ে পড়েন নীচে, আপনি বাঁচবেন না! আপনাকে যেতে দেবো না!

মা বাঁচবেন? কেমন ক'রে? কিন্তু—

কিচ্ছু ভয় নেই। আকণ্ঠ পরিশ্রমের পর কোলের কাছে এসেছেন অমরনাথ,—তাই বৃদ্ধার উত্তেজনা! বিশ্রাম দিন্, নিশ্বাস নিতে দিন্—উনি নিজেই উঠে যাবেন উপরে।

আপনি কেমন ক'রে জানলেন? মা যে তিনদিন কিছু খান্নি। আজ আবার পূর্ণিমা!

আমারও উত্তেজনা এলো। বললুম, এরকম কেস্ অনেক দেখেছি তাই বলছি। আপনার মা যদি উঠে ধূলো পায়ে নিজের শক্তিতে দর্শন না করতে পারেন, তবে আমিও ব'লে রাখছি, অমরনাথকে না দেখে আমিও এখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরে যাবো।

ঘোষ মশাই থমকে দাঁড়ালেন। মিনিট পনেরো পরে তাঁর মা নিজে গা

ঝাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে আবার গুহামুখে উঠতে লাগলেন। ঘোষমশাই চললেন মায়ের পিছু পিছু। ক্যামেরা হাতে নিয়ে হিমাংশুবাবু হাসিমুখে চললেন। মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে বহু যাত্রী উঠছে, কেউ কেউ নেমেও আসছে। সকলের মুখচোখ আনন্দে আর উৎসাহে উজ্জ্বল। আজ সকলের যাত্রা সার্থক হয়েছে। সূর্যের প্রখর আলো যেন সকলের জন্য অভাবনীয় আশীর্বাদ বহন ক'রে এনেছে।

ক্লান্ত পা তুলছি টেনে টেনে উপর দিকে। ঘোড়ার পিঠে ব'সে শিরদাঁড়া আড়ষ্ট, পা দু'খানা ভারী,—বিনিদ্রা আর উপবাস। আর কয়েক পা বাকি। তার পরেই গুহার ওই বারান্দা! কিন্তু হঠাৎ থামলুম।

না, আগে দর্শন নয়, এখানে একবার দাঁড়াও, নিশ্বাস নাও আগে। এখানে দাঁড়িয়ে আগে একবার মাতৃমন্ত্র জপ ক'রে নাও!—ওই উনি মা, যিনি একটু আগে ধরাশায়িনী হয়েছিলেন। ওই মাকে নিয়ে স্মরণ করো সেই স্বর্গতা জননীকে, যিনি তোমার মাতা দেবী বিশ্বেশ্বরী, দেবতাত্মা হিমালয়ে আজ যিনি পরিব্যাপ্ত! থাকুন অমরনাথ—আগে স্মরণ করো তাদের কথা, যাদের এই পথে মৃত্যু ঘটেছে, যারা পৌঁছতে পারলো না কিছুতেই, যারা দেবতাত্মার পদতলে শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলে যেতে পারেনি! তাদের কথা এখানে দাঁড়িয়ে আজ স্মরণ করো, যাদের পিতা সন্তান বন্ধু পরিজন—কেউ কোথাও নেই, যাদের পিপাসার্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় নিত্য প্রেতলোকে! যাদের কেউ কোনোদিন স্মরণ করেনি।

ধীরে ধীরে উঠে এলুম গুহার সম্মুখভাগের অলিন্দে। সামনে লাল রেলিং-ঘেরা গুহার অভ্যন্তরভাগ। পনেরো হাজার ফুটের উপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। গুহামুখ উত্তর-পশ্চিমে ফেরানো। গুহার মাথার উপর আরো প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু গিরিচূড়া। সেখান থেকে ঝুলছে তুষার নদী। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে ভয়াবহ অনুর্বরতা,—বৃক্ষ, শষ্প, লতা, গুল্ম—কোথাও কিছু নেই। তুষারগলা জলধারা নেমে আসছে প্রতি পাহাড়ের গা বেয়ে। ক্ষার, গন্ধক ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থ এবং বহু বর্ণময় মৃতপ্রস্তর চারিদিকের পাহাড়ে আকীর্ণ।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, পাথুরে কালো মাটি মসমস করছে। ভিতরে গুহার ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। সামনে তিন-চারটি ধাপ উঠে রেলিংয়ের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলুম। গুহার পরিধি আন্দাজ শ' দেড়েক ফুট। ভিতরের অবকাশটুকু কমবেশী চল্লিশ ফুট বিস্তৃত। ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল উপরের বহু ফাটল থেকে অবিশ্রান্ত জলের ফোঁটাগুলি চুঁইয়ে পড়ছে টপটপ ক'রে।

গহ্বরের চারিদিকটা খড়ি পাথরের। ছুরি দিয়ে খোঁচাতে থাকলে মুঠো মুঠো চুনপাথরের গুঁড়ো পাওয়া যায়। ঢোকবার সময় ধাপগুলি ডানদিকে রেখে সোজা বাঁদিকের কোণের কাছে এলেই দেখা যায় একটি গহ্বর—তারই ভিতর থেকে পরিণত হয়ে উঠেছে একটি তুষার আয়তন। এইটিই অমরনাথ। পাড়-বাঁধানো একটি চৌবাচ্চার মতো গহ্বর—মাঝখানে বরফের একটি স্তূপ—নীরেট, কঠিন। উপর থেকে ফাটল চুঁইয়ে তুষারগলা জল পড়ছে টসটস করে। বরফের স্তূপটির উপরটি কচ্ছপের পিঠের মতো। মধ্যাংশ ঈষৎ উঁচু—চতুর্দিক ঈষৎ ঢালু। এতকাল শুনে এসেছি চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই তুষারস্তূপ কমে এবং বাড়ে। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমায় শিবলিঙ্গের আকার অন্তত তিন-চার ফুট উঁচু হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তা হয়নি। সুতরাং তীর্থযাত্রীদের প্রাচীন বিশ্বাসটি সত্য ব'লে মনে হয় না। গতমাসের পূর্ণিমায় যখন যুবরাজ করণ সিং সস্ত্রীক এখানে আসেন, তখন লিঙ্গটি অবশ্য পূর্ণআকার প্রাপ্ত ছিল। এই প্রকার স্বচ্ছ ধূমেল বরফের চাংড়া কলকাতায় চলন্ত লরীর ওপর মাঝে মাঝে দেখি, কিন্তু হ্রাসবৃদ্ধিই হোলো এর বৈচিত্র্য। অনেকে বললে, উপরের ফাটল থেকে যে জলবিন্দু পড়ে, সেই জল অনেক সময় ঝুলনের রজ্জুর আকারে জমে যায়, এবং চৌবাচ্চার ভিতরকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যহেতু অমরনাথ লিঙ্গটি ক্রমশ স্ফীত ও উচ্চাকার ধারণ করতে থাকে। ক্রমে উভয়ে সংযুক্ত এবং একাকার হয়ে যায়। ভূ-তত্ত্বে এর কৈফিয়ৎ এবং অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় ব'লেই এর পরমার্থের দিকটা তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করে। প্রকাশ, প্রায় চারশো বছর আগে এক দল গুজর মুসলমান মেষপালক ওপরের পাহাড়ের উপর থেকে এই গুহাটি আবিষ্কার করে, এবং লোকজনসহ এখানে এসে অমরনাথের পূর্ণলিঙ্গ দেখতে পায়। বোধহয় সমগ্র ভারতে এই একমাত্র তীর্থ, যেখানে খ্রীষ্টান মুসলমান হরিজনাদি জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকের অবাধ প্রবেশাধিকার দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের প্রত্যেকের পায়ে ছিল ঘাসের তৈরী জুতো—দাম এক আনা—নৈলে এই ভয়ানক ঠাণ্ডায় আমাদের দাঁড়াবার উপায় ছিল না। অমরনাথ লিঙ্গের উপরে একটি ঘণ্টা ঝুলছে। যাত্রীরা স্পর্শ করছে লিঙ্গ। আমাদের হিমাংশুবাবু সেই লিঙ্গের থেকে এক টুকরো বরফ ভেঙে তাঁর শিশিতে সংগ্রহ করলেন। অনেকে নিলেন গুহামধ্যকার খড়িপাথরের গুঁড়ো। চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ছে দূর দেশ থেকে আনা অজস্র ফুল আর বেলপাতা। প্রদীপ জ্বলছে আশেপাশে। প্রসাদ সংগ্রহ করছে অনেকে। কেউ মন্ত্র ও স্তবপাঠ করছে, কেউ কাঁদছে হাউ-হাউ ক'রে, কেউ মাথা ঠুকছে, কেউ বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিকৃতকণ্ঠে অধীর, অস্থিরভাবে প্রলাপোক্তি করছে। অত্যন্ত

দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল তীর্থস্থানে না এলে এইপ্রকার আত্মহারা ভাবাবেগ কল্পনা করা যায় না। মূল অমরনাথের লিঙ্গের কয়েক ফুট দূরে-দূরে গণেশ ভৈরব ও পার্বতীর ওই একই প্রকার তুষারলিঙ্গ। তবে তাদের ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধির চেহারা কি প্রকার, ঠিক একথা নিয়ে তখন আর কেউ আলোচনা করে না। যাঁরা অমরনাথের পাণ্ডা ও পূজারী, তাঁরা সকলেই থাকেন মার্তণ্ড শহরে,—পহলগাঁও থেকে খানাবলের পথে। এতক্ষণ পরে চোখে পড়লো গুহার ভিতরে 'সিলিং'-এর একটি কোটরে দুটি পায়রা দিব্যি বাসস্থান ক'রে নিয়েছে। এরা নাকি আছে আদিকাল থেকে, এরা নাকি দৈবপারাবত। প্রাণিচিহ্নহীন পর্বতমালার মধ্যে এরা নাকি দৈববার্তা বহন ক'রে বেড়ায়। এদের দর্শন করা পুণ্য। এই তুষার পারাবত দুটিকে সকলেই ভক্তিভরে দেখতে লাগলো।

ভিতরটায় ঘুরে-ফিরে আবার এলুম বারান্দায়। সামনে গণিশের দাঁড়িয়ে। তার জিম্মায় আমাদের লাঠি, জুতো ও ছাতা, এবং গরম কোট। তাকালুম নীচের দিকে অনেক দূরে অমরগঙ্গার পারে। লোকে ওপারে গিয়ে এপারের এই গুহার ছবি তোলে, সেইজন্য চড়াই পথটা ছবিতে দেখা যায় না। চড়াইয়ের নীচে নদীতে স্নান করছে সাধু ও সন্ন্যাসী, মেয়ে আর পুরুষ। তুষারগলা জলে নীল হয়ে যায় দেহ, কিন্তু উলঙ্গ স্নান এখানে বিধি। অনেক নারী স্নানে নেমেছে একবারে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে। যদি এই দুর্গমে এসে পৌঁছে থাকো তবে এই ব্রহ্মলোকের তীরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ আত্মদান করো। কোনো লজ্জা রেখো না, সমস্ত আবরণ মোচন করো, সমস্ত আভরণ জলাঞ্জলি দাও—এখানে পৃথিবী নেই, সমাজ নেই, লৌকিক সংস্কার নেই। চেয়ে দেখছি, কোনো বয়স বাদ যায়নি। পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, দক্ষিণী, বাঙালী, বিহারী, উত্তর-প্রদেশী,—উলঙ্গ নরনারী দলে-দলে নেমেছে ঘাটে। হঠাৎ মনে হয় স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের নৃত্যসভায় অপ্সরা উর্বশী মেনকা রম্ভার নাচের ডাক পড়েছে। সেখানে যাবার আগে লজ্জা মান ভয় বিসর্জন দিয়ে ওরা এসে নেমেছে এই অমরাবতীর শিলাতলে অবগাহন-স্নানে। আকুলিত কেশে ওদের উল্লাসের অজস্রতা। তুষারনদীর ওপর বইছে হু-হু বাতাস,—প্রখর রৌদ্রে চারিদিক আনন্দময়। কিন্তু কিছু নেই এখানে। খাদ্য এবং আশ্রয়ের চিহ্নও নেই—উপর থেকে তিন শো ফুট নীচে না নেমে গেলে তৃষ্ণার জলও নেই। সকল তীর্থেই কোথাও না কোথাও দাঁড়াবার মতো জায়গা পাওয়া যায়। তুঙ্গশীর্ষ কেদারনাথে যাও, কিংবা ভারতমহাসাগরের তীরে কন্যাকুমারিকার বালুবেলাতটে যাও, আহার ও আশ্রয় দুই মেলে। এখানে সব শূন্য। মাইলের

পর মালই,—অন্তহীন রুক্ষ অনুর্বর তরুতৃণশূন্য ভীষণকায় পর্বতমালা ও তুষার-নদী ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

বিস্ময়ের কথা এই, অমরনাথ গুহাটি একক নয়। অমরাবতী নদীর পথে অগ্রসর হবার কালে আরও কয়েকটি ছোট-বড় গুহা চোখে পড়ে। সেগুলি তুষারে ঢাকা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গাকার মনে হয়। উত্তরপথে আরেকটি নদীর ধারা কোনদিকে গিয়ে যেন হারিয়ে গেছে, ওটি নাকি 'জ্ঞান-গঙ্গা'। অমরাবতী পার হয়ে অমরনাথ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করতে পারলে যে প্রাণীচিহ্নহীন তুষার উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানকার মধ্যস্থলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি নীলকান্ত স্বচ্ছসলিল সরোবর চোখে পড়ে, একটি 'জ্ঞানসায়র', অন্যটি 'সোমসায়র'। কিন্তু এই দুঃসাধ্য পার্বত্য পথের দিকে অভিযান করার মতো উদ্দীপনা বিশেষ কারও দেখা যায় না। অমরনাথ পর্বতের গা বেয়ে যে পথটি জোজিলার দিয়ে গেছে, সেইটি ধ'রে লাদাখ অবধি পৌঁছনো যায়।

বন্ধুরা ছবি তুললেন কতকগুলি। তারপর মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে আবার আমরা গুহামুখ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলুম। গণিশের ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুত ছিল। আমরা আবার সারবন্দী হয়ে তুষারনদীতে অবতরণ করলুম। সেই একই পথ, বৈচিত্র্য কিছু নেই। সেই ভীষণাকৃতি পিশাচ-প্রকৃতির পর্বত-মালার চড়াই, সেই ঘোড়ার পিঠে কার্নিশ বেয়ে চলা,—জন্তু আর মানুষ একই প্রকার ক্ষুধার্ত। সূর্যকরোজ্জ্বল তুষারকিরীটের তলা দিয়ে পথ, নদী এবার ডানদিকে। সেই আমাদের অতি সতর্ক আড়ষ্ট দেহ, চোখে সেই পতনাশঙ্কা —কিন্তু উদ্দীপনা আর কঠোর অধ্যবসায়ের পর,—এবার তন্দ্রাতুর অবসাদ। আমাদের সকল উত্তেজনার অবসান।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এলুম পঞ্চতর্ণীতে। প্রথমেই চোখে পড়লো নদীর ধারে বসেছে একটি পুরির দোকান। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে প'ড়ে কে আগে ছুটতে পারে ওই দোকানে! হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেলে ঘোড়ায় আর মানুষে। বাবা অমরনাথ রইলেন আমাদের মাথায়, কিন্তু ওই 'গুহামুখ' আমরা সকলে। অতএব মুখ ব্যাদান ক'রে সকলে দাঁড়ালো দোকানে। পুণ্যসঞ্চয় করেছি সকলে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষুধা সঞ্চয় করেছি তার চেয়ে অনেক বেশী। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ভাটপাড়া, মানিকতলা, হাওড়া, অমৃতসর, জম্মু, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা—সবাই লালায়িত।

পঞ্চতর্ণী পেরিয়ে মহাগুণাস গিরিসঙ্কটের পথ পার হয়ে চলেছি বায়ুযানের দিকে। কুণ্ডু স্পেশালের শঙ্কর কুণ্ডু ব'লে রেখেছিল, পঞ্চতর্ণীতে আমাদের তাঁবুতে আপনাদের নিমন্ত্রণ! কিন্তু পুরির দোকান দেখে আর অতদূরে যাবার ধৈর্য আমাদের ছিল না। হিমাংশুবাবুর জ্বর আর নেই, কিন্তু আমার এসেছে জরা। অতএব আর কোথাও দাঁড়ানো নয়। এবারের পথ অধিকাংশ উৎরাই। ঘোড়ার ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পাহাড়-তলীতে না ছিট্‌কে পড়ি, এই ছিল ভয়। দেখতে দেখতে এসে পড়লুম বায়ুযানে। বিশ্বাস করলুম না, কেননা চিনতে পারা গেল না। শূন্য তুহিন প্রান্তর ধূ-ধূ করছে। আমরা এখানে রাত্রিবাস করেছি, তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। আবার প'ড়ে রইল ওই প্রান্তর আগামী তিনশো চৌষট্টি দিনের জন্য। দিনে রাত্রে এবার চ'রে বেড়াবে ওখানেই সেই তিব্বতী ভালুকের দল, নেমে আসবে হয়ত ঈগল-পাখি ছোট জন্তুর খোঁজে, কিংবা নাম-না জানা কোনো বিচিত্র অতিকায় জানোয়ার - যারা হয়ত আজও অনাবিষ্কৃত।

শেষনাগ থেকে এগিয়ে অপরাহ্ণে পথের ধারে পাওয়া গেল গরম চা। বৃষ্টি-বাদল নেই, সুতরাং সবটা সহজ। জনহীন পার্বত্য জগৎ, কিন্তু তীর্থযাত্রীদের পথে ব'সে কিছু সংস্থান ক'রে নিলে মন্দ কি? সুতরাং শিখ সর্দারের কাছে চা খেয়ে আবার আমরা অগ্রসর হলুম। পথ উৎরাই। অতএব ঈষৎ দ্রুতগতি। কথা ছিল যশপালে রাত্রিবাস ক'রে যাবো। যশপালে যখন এলুম, তখন অপরাহ্ণের শেষ,—চরটা বাজে। আশ্চর্য, এও সেই শূন্যভূমি—মাথা গোঁজবার মতো কোথাও কোনো আশ্রয় নেই। আরেকটু এগিয়ে গেলেই সেই বিভীষিকাময় পিসর-চড়াই। প্রায় আমরা পনেরো মাইল চ'লে এসেছি অমরনাথ থেকে।

হিমাংশুবাবু বললেন, আশা করি দু'ঘণ্টার মধ্যে চন্দনবাড়ি পৌঁছতে পারবো। আকাশ পরিষ্কার, আজ পূর্ণিমা।

নীচে বিস্তৃত অরণ্যলোক। সঙ্কটসঙ্কুল উৎরাই পথ সেইপ্রকার পিছল। অন্ধকারে সেই ভয়াবহ আঁকাবাঁকা ঢালুপথে ঘোড়ায় চ'ড়ে নামা চলবে না। পিছনে আসছে অনেকে,—সকলেরই চেষ্টা চন্দনবাড়ি পৌঁছনো, নচেৎ রাত্রির আশ্রয় আর কোথাও নেই। অতএব দুর্গা ব'লে গভীর 'কুয়ার' পথে নেমে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

ঘোড়া ছেড়ে রবারের জুতো-পায়ে এগিয়ে চললুম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আশেপাশে ঝরনার শব্দ শুনছি। বাঁদিকে তিন হাজার ফুট নীচু খদ। নীচের দিকে অরণ্যানী। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। বাতাস তুহিন ঠাণ্ডা। প্রাণহীন

শব্দহীন পার্বত্যলোক। আমরা সেই আবছায়া অন্ধকারে পাকদণ্ডীর রেখা ধ'রে নীচের দিকে পা চালিয়ে দিলুম।

থামবো না। বিশ্রাম নেবো না কোথাও। আন্দাজে সতর্ক পায়ে কেবল নীচের দিকে তলিয়ে চলেছি। কেবলই ঘুরে ঘুরে নীচের দিকে, আরও নীচে; একজন আরেকজনকে আর দেখতে পাচ্ছে না। গণিশের ঘোড়া নিয়ে নামছে। একটির পর একটি ঘোড়া, একের পর এক যাত্রী। অরণ্যে নামছি। জ্যোৎস্নার টুকরো নামছে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে। কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, কিন্তু পাও থামছে না। চার মাইল নামতে হবে এমনি ক'রে। দিক্‌চিহ্ন নেই, পথের সঙ্কেত নেই, দাঁড়াবার মতো পাশ নেই। পিছন থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, তাদের পায়ের হোঁচটে আল্‌গা পাথর গড়িয়ে নামলেই সর্বনাশ। কিন্তু কোনো অপঘাত ঘটছে না,—আশ্চর্য। কে বাঁচাচ্ছে, কেমন ক'রে নিরাপদ হচ্ছি, বিপদে কেন পড়ছিনে,—সমস্তটা আশ্চর্য। হিমাংশুবাবু দ্রুতপদে অনেক এগিয়ে গেছেন, আমি অনেককে পিছনে ফেলে এসেছি,—কিন্তু নীচেকার ঘনঘোর অন্ধকারে মাঝে মাঝে প্রেতহাস্যের ঝলকের মতো জ্যোৎস্না আমাকে সাহায্য করছে। কোন্‌টা ঠিক নির্দিষ্ট পথ, জানছিনে—অথচ পা দুটো থামছে না। চার মাইল, কিন্তু এতই কি দীর্ঘ সেই চার মাইল? চার, না চারশো? নীচের দিক থেকে প্রবল জলরাশির শব্দ শুনছি অনেকক্ষণ থেকে। সেই শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হয়ে। অন্ধকার অরণ্যলোক ক্রমশ সঙ্কীর্ণ থেকে বিস্তৃত হতে লাগলো। ক্রমশ নদীর আছাড়ি পাছাড়ি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এবার ওর খোলা জগৎটায় গিয়ে একবার ভাল ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবো। চার মাইল শেষ হয়েছে।

জ্যোৎস্না এবার অবারিত। অপ্সরালোকের অমরাবতীর দ্বার আবার খুলে গেছে। আরো এক মাইল চ'লে এসে সেই শিখ সর্দারের দোকানের সামনে দেখলুম হাসিমুখে হিমাংশুবাবু দাঁড়িয়ে। রাত তখন প্রায় সওয়া আটটা। দু'জনেই ফিরেছি নিরাপদে, দু'জনেই বিস্মিত।

অবিস্মরণীয় সেই অমর্ত্যলোকের জ্যোৎস্নারাত্রি কাটলো চন্দনবাড়ির সেই প্রখর নীলগঙ্গার তীরে, তাঁবুর মধ্যে। একে আর শীত বলে না, বাঙ্গলাদেশের ডিসেম্বরের শেষ। এখন আমাদের তুঙ্গে বৃহস্পতি, সমস্তগুলো সহজলভ্য হচ্ছে। উৎকৃষ্ট চা, ঘৃতপক্ক পরটা, ঘন গরম দুধ, মসালেদার তরকারি, সুশীতল জল, মূল্যবান সিগারেট। তুঙ্গে বৃহস্পতি! তারপর তুষারলিঙ্গের কৃপায় নাসিকাধ্বনিসহ ঘনঘোর নিদ্রা!

পরদিন প্রভাতে অধিত্যকার অরণ্যপক্ষিকুলের কূজনগুঞ্জনের ভিতর দিয়ে

অশ্বারোহণে আমাদের যাত্রা। সকাল সাতটা। নীচে উষাকাল, উপরে নবসূর্যবন্দনা সভা বসেছে। পাশেপাশে নীলগঙ্গার নীলাভ তরঙ্গদলের রণরঙ্গ চলেছে। বাতাস স্নিগ্ধ। পর্বতগাত্রে প্রভাতসূর্যের রশ্মিচ্ছটা শিশিরবিন্দু-গুলিকে বর্ণাঢ্য ক'রে তুলেছে। আমাদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ। ভয় ক্ষোভ বেদনা দুশ্চিন্তা উদ্বেগ,—দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ সবগুলিকে মুছে দিয়েছে। বসন্তের কুসুমকাননের পথ দিয়ে স্বর্গলোক থেকে নেমে চলেছি মর্ত্যের মানবসংসারের দিকে। অমরাবতীর পরম আশীর্বাদের বার্তা বহন করে চলেছি।

আমরা অনেকটা প্রথম দলের লোক। সঙ্গে সঙ্গে আসছে ভাটপাড়া, আর কুণ্ডুর দল। পিছনে আসছে কোটপ্যাণ্টপরা মিসেস রায়, সঙ্গে সঙ্গে মজুমদারসহ শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। প্রশস্ত পথে ঘোড়ারা এবার একটু-আধটু ছুটছে। পিছনে পিছনে আসছে বোম্বাই আর পাঞ্জাব। গ্রাম ছেড়ে আসছি, ঝরণা পেরিয়ে যাচ্ছি,—কাশ্মীরী মেয়েদের ভিক্ষা চলছে এখানে ওখানে। পথের ধারে বসেছে বৃদ্ধ কাশ্মীরী ঝুলি নিয়ে। প্রখর রোদ উঠেছে, বেলা সাড়ে ন'টা।

দেখতে দেখতে এসে পৌছলুম টোল অপিসের ধারে। সেখানে ঘোড়া-ওয়ালাদের কাছে ট্যাক্স আদায় চলছে। সামনে লিডার নদীর সাঁকো। আশেপাশে উপত্যকায় পড়েছে বায়ুবিলাসিনীদের তাঁবু। পিছন দিকে কোলাহাই হিমবাহের পার্বত্য পথ। এপারে ওপারে ঘন পাইনের বন দূর দূরান্তরে চ'লে গেছে। পাহাড়ীরা চলেছে হাটের দিকে। গ্রামের মেয়েরা শিশুদের সঙ্গে ময়লা জীর্ণ শয্যাগুলি রৌদ্রে নামিয়ে দিচ্ছে।

প'ড়ে রইলো পিছনে একটা জীবন—সেটা তীর্থযাত্রীর। এবার যেন উত্তীর্ণ হলুম জন্মান্তরে। পৃথিবী সেই প্রাচীন; সুন্দরের সেই শোভা দিকে দিকে। ধীরে ধীরে এসে পৌছলুম আমাদের পরিচিত নদীর ধারে—সনাতন মন্দিরের পাশ কাটিয়ে, সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রয় ছাড়িয়ে। আমাদের পুরাতন বন্ধু পহলগাঁও।

ঘোড়া থেকে নেমে বুঝলুম আমি অকর্মণ্য। গত রাত্রের সেই পিসর উৎরাই একটানা নেমে সর্বশরীরে এবার প্রবল আড়ষ্টতা এসেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হোটেলের দিকে চললুম। এখানে বাস করবো কয়েকদিন।

৫

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ সপ্তাহটায় লাহোরের পথ খুব আরামদায়ক নয়, একথা আগে জানতুম বৈকি। কিন্তু শীতের দিনেও ত' দেখেছি লাহোরকে—যে ঠাণ্ডাটা বাঙালীর চামড়ায় সহ্য হ'তে কিছু দেরি লাগে। তার হিম, তার বৃষ্টি, তার সূক্ষ্ম তুষারকণা, এবং ডিসেম্বরের শেষ দিকে তার আকাশের ভ্রূকুটি-করাল চেহারাটা। ঘরের মধ্যে আগুনজ্বালা, আর দিনরাত বাতাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য শার্সি বন্ধ করে রাখা। সেই লাহোর জ্বলে-পুড়ে যায় জুনের প্রথম সপ্তাহে। জানুয়ারীতে লাহোরের গরীব লোক শীতে কুঁকড়ে পথের ধারে কাঠ হয়ে মরে থাকে, আবার তারাই মরে জুনমাসের সর্দিগর্মিতে।

আমাকে যেতে হবে লাহোর ছাড়িয়ে। দুধারের পথ আর প্রান্তর দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। শুনছি বৃষ্টি নামতে পারে নাকি প্রায় আরো একমাস দেরিতে কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ যা সহ্য করার অভ্যাস করে, তাই সে সয়। যে মাঠ জ্বলছে, সে মাঠে মানুষ এই রোদ্দুরে কাজও করছে। শিখ চাষী, মাথার পাগড়ি বেঁধে গায়ে জামা এঁটে পায়ে জুতো দিয়ে লাঙল ঠেলছে। গ্রামের পা-জামা-পরা বউ ইঁদারা থেকে জল তুলছে। বুড়ি জাব দিচ্ছে বলদকে। ছোট শিখ ছেলে ছড়ি হাতে নিয়ে ছুটছে ভেড়ার পিছনে। উঁচু-নীচু ডাঙা,—কোথাও পাহাড়ী টিলা, কোথাও বা কাঁকর পাথর। হঠাৎ এসে পড়ে নধর সবুজ গাছপালার পাড়া,—অমনি তা'র সঙ্গে ছায়া ঝিলিমিলি চাষীদের ঘর। তারই কোনো নিভৃত অঙ্গনে একটুখানি কবিতা, একটু বা ব্যঞ্জনা। মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে কোমল সবুজ উপত্যকা, কখনও নদীর সেতু, কখনো সুড়ঙ্গপথ, কখনও বা ঘননীল পার্বত্য শোভার সঙ্গে বৈরাগিনী নদীর শান্ত সৌন্দর্য। ঝিলমের তীরে শুনে এসেছি দেবমন্দিরের শাঁখঘণ্টার আওয়াজ। মনে পড়ে গিয়েছে কাশীর মনিকর্ণিকা। তারপর সেটুকু আবার হারিয়ে যায় চোখ-ঝলসানো প্রান্তরে। রুক্ষ প্রস্তরময় অসমতল। হিমালয় থেকে অসংখ্য ছোট বড় নদী নেমে এসেছে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে, কিন্তু তাদের জল বড় শীঘ্র পালায়। তারা বিশেষ কোথাও ধরাবাঁধা থাকে না। 'সুক্কুর বারেজ' না থাকলে পাঞ্জাব এতদিনে শুকিয়ে যেতো।

কয়েকজন বালুচ সৈন্য ছিল আমার কামরায়। তাদের নাকি শীতাতপ কোনোটাই গায়ে লাগে না। সুর্মা-লাগানো চোখ, গায়ের রং তামাটে, মুখখানায় কোনো স্বাস্থ্যশ্রী নেই, সরু সরু হাত-পা,—কিন্তু মাথায় সকলেই

প্রায় ছয় ফুটের বেশী। তুলনা করার জন্য ক্ষমা চাইছি, গ্রে-হাউণ্ড কুকুরের সঙ্গে ওদের কোথায় যেন মিল আছে। ওরা জলের দেশে বাস করে না ব'লেই মানুষের জলপান করাটা তেমন বোঝে না। বড় জোর বরফ-দেওয়া সোডা-লিমনেড, আর নয়ত সেই লম্বা কাঁকড়ি চিবোতে থাকে।

পশ্চিম পাঞ্জাব হোলো দুর্গপ্রাকারের দেশ। টিলা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রাম, কিংবা জমিদারের পাঁচিলঘেরা বাড়ি—আর তার নীচে পরিখা এবং আশেপাশে কাঁটালতা ঝোপঝাড়ের প্রান্তর। প্রাচীন অতীতকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ অবধি পশ্চিম পাঞ্জাব মার খেয়ে এসেছে যুগে যুগে। চিরস্থায়ী বাসস্থান কেউ কখনও পায়নি, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে শুধু পালিয়ে বেড়িয়েছে। তাই উঁচুনীচু উপত্যকার মতো প্রান্তরে যতগুলি গ্রাম এবং আবাসভূমি চোখে পড়ে, তাদের অধিকাংশ হলো প্রাকারবেষ্টিত এবং মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত,—চারিদিকে তার পরিখা খনন করা। কাঁকর-পাথরযুক্ত মাটি দিয়ে দোতলা তিনতলা ইঁট গাঁথা, বাইরে পলস্তারা প্রায়ই চোখে পড়ে না। মেয়েরা আশৈশব পায়জামা পরা, কেননা তারা বংশ-পরম্পরায় জেনে এসেছে একস্থান থেকে অন্য স্থানে পালাতে হবে,—বিশেষ ক'রে শিখ নারীরা। পূর্ব-পাঞ্জাবের মেয়েরা—যারা অধিকাংশ হিন্দু—তারা শাড়ি পরে। কিন্তু মুসলমান ও শিখপ্রধান পশ্চিম পাঞ্জাব মেয়েদের জন্য শাড়ি বরাদ্দ করেনি। উভয়ের পূজ্য বস্তুও প্রায় এক—অর্থাৎ দুখানা পবিত্র গ্রন্থ। এমন কি শারীরিক লক্ষণও প্রায় এক। আহারাদির তালিকায় প্রভেদ নেই বললেই চলে। ভোজের আসরে উভয়েই একাসনে বসে এবং স্বভাবপ্রকৃতির প্রখরতায় কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, আচার আচরণ সমস্তই এক, উভয়ের ধমনীতেও আর্যরক্ত প্রবাহিত,—কিন্তু ধর্মটা ভিন্ন। অনেকের ধারণা, তুর্ক-ইরানী-তাতার রক্ত প্রচুর জমা আছে পশ্চিম পাঞ্জাবে। হয়ত সেই রক্তের অনেকটা স্খলিত হয়ে গেছে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের রক্তপ্রবাহে।

সন্ধ্যার আগেই এলুম রাওয়ালপিণ্ডি ছাউনী স্টেশনে। এটা শিখপ্রধান শহর—যেমন লাহোর আর অমৃতসর, যেমন জলন্ধর আর লুধিয়ানা, যেমন লায়ালপুর, শিয়ালকোট আর লালামুসা! এ-অঞ্চল অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সেদিনকার এই পশ্চিম পাঞ্জাবে সংখ্যায় মুসলমান অনেক বেশী হলেও সম্পদের প্রাচুর্য ছিল শিখ আর হিন্দুদের হাতে। সিন্ধুতেও ঠিক একই কথা। তবে সেখানেও ছিল হিন্দু প্রাধান্য। এমন কি সীমান্তে ও বেলুচিস্তানের লক্ষপতি যারা, তাদের অধিকাংশ হিন্দু ও শিখ। ১৯৩৫-এ কোয়েটার ভূমিকম্পে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা আশী ভাগ ছিল

হিন্দু। বেলুচিস্তানের খালাৎ, শিবি, হিন্দুবাগ ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে কেবল যে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাই নয়, শিক্ষাদীক্ষায় ঐশ্বর্যে সম্পদে বিলাস-বৈভবে তারা সমগ্র সীমান্তলোকে বিস্ময়ের আধার ছিল। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক্যের নাম জানবার আগে—কি মেয়ে কি পুরুষ—কোনোমতেই জানা যেতো না তারা হিন্দু অথবা মুসলমান। সিন্ধুতেও অনেকটা তাই, হিন্দু মুসলমানের প্রায় একই চেহারা ও পোষাক। আচার্য কৃপালনীকে দেখে সিন্ধুকে চেনা যাবে না,—কারণ ওঁদের ঘরে ঢুকেছে বাঙালী মেয়ে, ওঁদেরকে বাঙালী ক'রে ছেড়েছে।

আমার পরনে এবার ধুতি-পাঞ্জাবী দেখে পথের লোকেরা অবাক। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল বাঙালী ডাক্তারখানা। নামে বাঙালী, চেহারায় ভাষায় পাঞ্জাবী। তাঁরা আমাকে আশ্রয় দিতে প্রথমটা একটু 'কিন্তু' হলেন। বাঙালীর ছেলের পরিচয় এদিকে একটু অন্য রকম। তারা সন্ত্রাসবাদী, তারা পুলিশ ও গোয়েন্দার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়, তারা রিভলবার নিয়ে পথে-ঘাটে ঘোরে। তাদের আশ্রয় দিয়ে অবশেষে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।' সুতরাং গৃহস্থঘরের পরিবর্তে ওঁদেরই দোতলায় ঔষধপত্রের গুদামে কোনোমতে স্থান পাওয়া গেল। রাস্তার কলে সেদিন সন্ধ্যায় স্নান করলুম মহানন্দে। কিন্তু সমস্ত রাত ধ'রে সেই ঘরের বিচিত্র ঔষধের সংমিশ্রিত গন্ধে আমাকে অত্যন্ত অস্থিরভাবে কাটাতে হয়েছিল। এ কাহিনীটুকু আগেও বলেছি,—আবার বলছি। এইদিনের এই কাহিনীটুকু আমার মন থেকে কিছুতেই মুছতে চায় না।

পরদিন পিণ্ডি থেকে যাত্রা হিমালয়ের দিকে। রৌদ্র ঘন হয়ে ওঠার আগে আমাদের মোটর বাস ছাড়লো। আনন্দের সেই হৃৎকম্প ভুলিনি, ভুলিনি সেদিনকার উদ্বেগের অস্বস্তি। যখনই এগোই হিমালয়ের দিকে, তখনই পিছনের পথ মুছে দিয়ে চ'লে যাই। আমাকে সমতলে মানায় না, হিমালয় হলো আমার সত্য পরিচয়। ঘরের মধ্যে আমি পরদেশী, কিন্তু হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশের পথে নামলে আমি মনের মতন ঘর খুঁজে পাই। কলকাতার এলবার্ট হল-এ ঢুকলে কিছু চিনতে পারিনে, কিন্তু নেপালের ভীমপেড়ীর ধর্মশালাটা আমার অচেনা নয়। শিলংয়ের হিন্দু বোর্ডিং কিংবা দার্জিলিংয়ের পাষাং বিল্ডিং আমার যেন চিরদিনের চেনা। সেই কারণে যতই এগোচ্ছিলুম পিণ্ডি থেকে পাহাড়তলীর দিকে, ততই আমার সমগ্র চেতন-লোক যেন উগ্র পুলকে থরথর করছিল।

যত পাহাড়ের দিকে গাড়ি অগ্রসর হচ্ছে, ততই নিরিবিলি হয়ে আসছে। বাতাস মধুর স্নিগ্ধ। দীর্ঘ ঋজু পথ কতদূর গেছে কিছু জানা যায় না। আশে-

পাশে শুষ্ক নদী-পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ। দুধারে চলেছে সুউন্নত শালপ্রাংশু। চারিদিকে তার পাতা ঝরছে অজস্র। পথের বর্ণ রক্তিম। যেখানে শাল বন, সেখানেই রাঙামাটি। মেদিনীপুরে, বাঁকুড়ায়, বর্ধমানের কোনো কোনো অঞ্চলে, সাঁওতাল পরগনায়, দুমকায়, মুঙ্গেরে - যেখানে যাও দেখবে রাঙামাটির পথ বেয়ে চলেছে শ্রমিক, আর তাদের পথের দুধারে শালবন। কোথাও মাটি গোলাপী, কোথাও বা ঘনরক্তিম। এখানেও তাই। পাহাড়তলী ঘন অরণ্যে ভরা; মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বড় বড় গাছের গুঁড়ি-চেরাইয়ের গোলা,—কাশ্মীরী কুলীরা সেখানে কাজ করছে। সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে রয়েছে কাঁচা কাঠের গন্ধ—যেটার বন্য বিভ্রান্তকর আমেজ সমগ্র হিমালয়ের ঘন গূঢ় রহস্যকে মনের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে। ভূটানের দিকে যাও, ওই যেদিকে দলশিংপাড়ার পথ আলীপুর দুয়ারের ওপর দিয়ে চ'লে গেছে,—ওখানকার কাঠের কারখানাতেও পেয়েছিলুম এই গন্ধ, এবং এই গন্ধ পেয়ে একদা বিহ্বল হয়েছিলুম কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা নদীর তীরে রামবান অঞ্চলের পাহাড়ের পথে। সেদিন জ্যোৎস্না নেমেছিল চন্দ্রভাগায়।

রৌদ্রের চেহারা দেখে এই জ্যৈষ্ঠমাসের দিনে আর ভয় করছে না। নগরের উত্তেজনা, কলকোলাহল, আর রৌদ্রপথের ধূলিধূসরতা সমস্তই পিছনে ফেলে এসেছি। রাওয়ালপিণ্ডি জেলার বহু অঞ্চলে যেমন দেখে এলুম কালী-মন্দির, শিবস্থান, গুরুদ্বার—যেমন সমগ্র পাঞ্জাবে কালীস্থাপনা এবং শক্তিপূজা,—তেমনি রাওয়ালপিণ্ডির এ অঞ্চলেও। এই পার্বত্যলোকেও তেমনি শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি অরণ্যভূমিকে কোথাও কোথাও মুখর ক'রে তুলছে। পাঞ্জাবী শিখরা শক্তিপূজারী,—সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে একথা সত্য। কাল্কায়, কাংড়ায়, চাম্বায় একথা সত্য। একথা সত্য ধরমপুরে, জলন্ধরে, জ্বালামুখীতে এবং সিন্ধু-পঞ্চনদের এপারে ওপারে। ওরা শক্তিলাভ করতে চেয়েছে এতকাল, আরাধনা ক'রে এসেছে শক্তির,—শক্তির দ্বারা ওরা আপন অস্তিত্ব রক্ষা করেছে, শক্তির দ্বারা জয়ী হয়েছে। পেপস্থতে একথা বিদিত, হিমাচল প্রদেশে একথা স্বীকৃত, পাতিয়ালায় একথা প্রচারিত। কিন্তু লজ্জা করে যখন একশ্রেণীর শিখকে বলতে শুনি, তারা হিন্দু নয়। নবদ্বীপের বোষ্টমরা যদি ব'লে বেড়ায় আমরা হিন্দু নই—কেমন লাগে? আহমেদীরা যদি বলে বেড়ায়, আমরা মুসলমান নই,—কেমন শোনায়? ভারতীয় বৌদ্ধরা যদি ব'লে বেড়ায়, আমরা হিন্দু নই,—কী বলতে ইচ্ছে করে? ওরা শান্ত মনে একথা ভাবতে চায় না যে, হিন্দু হলো বনস্পতি, তা'র নানা শাখাপ্রশাখায় নানা সম্প্রদায়। বিশেষ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ এক শ্রেণীর আর্যহিন্দু গুরু নানকের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর

শিষ্য হন। সেই শিষ্য মানে শিখ, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। কিন্তু পাঞ্জাবে সর্বত্রই হিন্দু-শিখ বিবাহ প্রচলিত। হিন্দু-পাঞ্জাব মনে করে না শিখ-পাঞ্জাব তা'র কাছে অপরিচিত। খুড়তুতো-জাঠতুতো, মামাতো-পিসতুতো, শ্বশুর-জামাই, শ্যালী-ভগ্নিপতি—কেউ পাঞ্জাবী শিখ, কেউ বা পাঞ্জাবী হিন্দু। ভিন্ন ধর্মী নয়, ভিন্ন মতবাদী। কারো নাম তারা সিং, কেউ বা নানকচান্দ।

গাড়ি চলেছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সশব্দে—কখনও সেকেণ্ড গীয়রে, কখনও বা থার্ড গীয়রে। সমতল হিন্দুস্থান রয়ে গেল অনেক নীচে। চুপ করে আছে সবাই, নৈঃশব্দ্যের ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না। কলরব করি আমরা বাইরে, কিন্তু ভিতরে এসে স্তব্ধ। হিমালয়ের আত্মাকে দেখি যখন মুখোমুখি, তখন আর কথা সরে না। পরমের আস্বাদ যখন পাই, তখনই বাক্যহারা হই। তাজমহলের গম্বুজের মধ্যে ঢুকেও আমরা কথা কই, কিন্তু মূল সমাধির গহ্বরের মধ্যে যখন নেমে যাই, তখন সবাই নির্বাক। এখানে কথা সরছে না কারো মুখে, কেননা এটা হিমালয়ের গহনলোকের কাছাকাছি। অবরোধ স'রে গেছে সামনের থেকে, দেখছি মহামহীধরের বিশাল বিস্তার। উপরে গগনলোক এখনও কতকটা সঙ্কীর্ণ, কিন্তু তা'র জলদলেশহীন নীলকান্ত চেহারাটায় যেন অমৃত আস্বাদ লেগে রয়েছে। হঠাৎ পাখি ডেকে গেল। চমকে উঠে দেখি, আমরাই চুপ ক'রে আছি, কিন্তু পার্বত্য প্রকৃতি নিত্যকলমুখর। অবিশ্রান্ত শুনে যাচ্ছি ঝিল্লীর একটানা ডাক, লতায় পাতায় শাখায় প্রশাখায় সরীসৃপের অক্লান্ত আনাগোনা, কূজনে গুঞ্জনে বসন্তের পাখিরা মুখর ক'রে রেখেছে বনভূমি, আশেপাশে বনকুক্কুট আর খরগোশের ছুটোছুটি। ওদের রাজ্যে আমরা বে-আইনী প্রবেশ করেছি।

ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছি। ঘন দেওদার বনের তলা দিয়ে ঝরাপাতা উড়িয়ে স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে চলেছে। চারিদিকের অরণ্যে বসন্তের সমারোহ। এখানে এখন বনকুসুমের মাস। অজস্র বিবিধ বর্ণের ফুল দেখে চলেছি, ঘাসে, লতায়, ডগায়, শাখায়, চূড়ায়। নাম জানিনে কোনো ফুলের, যেমন জানিনে পাখির, যেমন জানিনে নানা ফুলের, নানাবিধ বৃক্ষলতার। কতকাল ধরে ভেবেছি সত্য লাহাকে ধ'রে পাখি চিনবো, বিভূতি বাঁড়ুজ্যেকে ধ'রে গাছপালা চিনবো, রাখাল বাঁড়ুজ্যেকে ধ'রে স্থাপত্য চিনবো, এন্টিকোয়েরিয়ন্ বীরেন রায়কে ধ'রে পাথর চিনবো। কিন্তু কোনোটাই হয়নি। এই হিমালয়ের গহনলোকে প্রাচীনতম মন্দিরের মধ্যে ওই যে অলকানন্দার তীরে গোপেশ্বর কিংবা গরুড়-গোমতীর তটে বৈজনাথ আজও মহাকালের সমস্ত শাসন উপেক্ষা ক'রে দণ্ডায়মান, ওদের ওই ভগ্ন জরাজীর্ণ পাথরের অন্দরে কন্দরে আজও

প্রাচীন দুর্জ্ঞেয় ভারতের যে উদাসী বাতাস বয়ে যায়—ওদের কি জেনেছি, ওদের কি চিনেছি? চিনেছি কি সামান্য একখানি পাথরের আদি কাহিনী? ওই যে উপেক্ষিত দেবমূর্তিখোদিত পাথরের টুকরোগুলো গয়াকাশী-প্রয়াগ-মথুরা-বৃন্দাবনের পথে ঘাটে ছড়িয়ে থাকে, ওদের সত্য পরিচয় কি পেয়েছি কখনও? ওই যে দাক্ষিণাত্যে অজন্তার গুহায় গিয়ে যেদিন সজল নয়নে দাঁড়ালুম মহাভিক্ষুর অন্তিম শয়ান মূর্তির সামনে, তখন কী দেখেছি? কা'কে দেখেছি? কোন্ বস্তু খুঁজেছি? ওই যে কনারকে গিয়ে সপ্তাশ্ববাহী রথচক্রের উপর সূর্যমন্দিরের সামনে নিমীলিত নেত্রে দাঁড়ালুম, সেখানে কি শুধু দেখেছি প্রস্তরখোদিত নরনারীর নগ্ন মৈথুনের বিবিধ বৈচিত্র্য? ওর মধ্যে খুঁজিনি কি কোনো পরমাশ্চর্যকে? ওর কিছু কি জেনেছি, যা জানা যায় না? সামান্য দুটি আঁখিপল্লবের উপরে কি ধারণ করতে পেরেছি হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ও সর্বকালজয়ী সভ্যতাকে? না, কোনো রহস্যই জানতে পারিনি। শুধু মূঢ়ের মতো চেয়ে থেকেছি! যেমন চেয়ে থেকেছি বিস্ময়াহত হয়ে পাতাল-গঙ্গায় মহিষমর্দিনীর ছায়ান্ধকার ভগ্ন মন্দিরে। সেখানে মনকেমনের হাওয়ায়-হাওয়ায় হাহাকার করেছে আমার সমগ্র সত্তা। বাস্তবের বাঁধন ডিঙিয়ে আপন অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছি। মানুষের বিবর্ত ছাড়িয়ে দৈবসত্তার উপলব্ধিটাকে সহজ মনে করেছি। চেয়ে থেকেছি বিরহী নদীর তীরে ব্যাসগুহাগর্ভে! নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে থেকেছি ত্রিপাশার তীরে প্রাচীন-ত্রিলোকনাথের মন্দিরের দিকে। আমি শুধু নিঃসঙ্গ বিমূঢ় দর্শক—আবিষ্কার করতে চেয়েছি ভারত-আত্মাকে হিমালয়ের স্তরে স্তরে, মন্দিরের মণিগহ্বরে, ছায়াচ্ছন্ন গুহাভ্যন্তরে, নীলনয়না নদীমেখলী গিরিশৃঙ্গমালার তুষার স্তবকে। কিন্তু আমি মূঢ়, আমি জানি আমার উদাসীন ব্যর্থ পরিব্রজ্যা নিষ্ফল আত্মানুসন্ধানে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কোনো কোনো কাফিখানার সামনে গাড়ি থামাতে হচ্ছিল। কোথাও রুটির দোকান, কোথাও বা ভিন্ন জলযোগের ব্যবস্থা। এ গাড়ি যাবে কাশ্মীরে ঝিলম্ নদী পেরিয়ে। কিন্তু 'সানি ব্যাঙ্ক' পর্যন্ত গিয়ে এ গাড়ি বাঁক নেবে মারী পাহাড়ের দিকে, তারপর যাত্রী কুড়িয়ে নিয়ে যাবে কোহালায়। কোহালা থেকে নদী পেরিয়ে উরির পথ। সন্ধ্যার পরে কোনো এক সময় এ গাড়ি গিয়ে পৌঁছবে শ্রীনগরে।

দেওদারের ছায়ায় নীচে কোথাও কোথাও সেনানিবাস। সমস্ত পথ সামরিক সজ্জার দ্বারা শৃঙ্খলিত। সীমান্ত অঞ্চল বেশী দূরে নয়। হাজারা জেলায় প্রবেশ করার নানা পার্বত্যপথ আশেপাশে চলে গেছে। দুর্ধর্ষ এবং বন্যপ্রকৃতি

পাঠানদের ওপর আধিপত্য রাখার জন্য হাভেলিয়ানে আছে মস্ত সামরিক ঘাঁটি। এই অঞ্চল থেকেই সেদিন কাশ্মীর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং এই পথে দাঁড়িয়েই কয়েক বছর আগে মিঃ জিন্না, স্যর ওলাফ্ কারো, সীমান্তের প্রধানমন্ত্রী আবদুল কৈয়ুম ও ইংরেজ সেনাপতি কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাক-সৈন্যসামন্ত এবং হাজার হাজার বন্য মুসলমান যাযাবর—যারা কয়েক বছর থেকে হাজারা জেলায় আশ্রিত, তাদেরকে ও পাঠান দস্যুগণকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন।

আমার পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবী-চটিজুতো। সুতরাং প্রত্যেক যাত্রীর কাছে আমি দ্রষ্টব্যবস্তু ছিলুম। তারা বাঙালীর নাম জানে, পোশাক জানে না। বাঙালী হলো মুন্সী বা কেরানীর জাতি ওদের কাছে। যেমন এখন মাদ্রাজীরা, যেমন হাল-আমলের পাঞ্জাবীরা, যেমন নতুন কালের নব্য বিহারী আর উত্তর প্রদেশীরা,—তাই বাঙালী ওদের চোখে বাবু। বাবু মানে মিস্টার নয়, এখানে বাবু মানে কেরানী, ইংরেজ ব'লে গেছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু, রবীন্দ্রবাবু, জগদীশবাবু? ইংরেজ একথার জবাব দিয়ে যায়নি। এখানে ওখানে সেখানে —প্রায় সর্বত্রই বাবুমহল্লা, অর্থাৎ কেরানী-পল্লী। পেশাওয়ার, পিণ্ডি, লাহোর, চাকলালা, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ,—যেখানেই মিলিটারী একাউণ্টস্, সেখানেই বাবুমহল্লা। জন আষ্টেক বাঙালী যদি গায়ে গায়ে থাকে—তবে সেইটিই বাবুমহল্লা। যেখানে কালীবাড়ি সেখানে বাবুমহল্লা। বাঙালীর মাথা ঠাণ্ডা, হিসেব-নিকেশ ভালো জানে, ভালো ইংরেজি বলতে পারে এবং লিখতে পারে,—বুদ্ধি পরামর্শ দেয় ভালো, আইনকানুন মেনে চলে,—সুতরাং তারা বাবু। কিন্তু সেই বাবুরা পথে ঘাটে ধুতি পাঞ্জাবী প'রে বেরোয় না—তাদের হলো চাকুরে পোশাক। সুতরাং আমি এখানে অদ্ভুত বৈকি। আমি বাঙালী, কিন্তু কে আমি? বাড়ি কোথা? বাপের নাম কি? বিষয়কর্মাদি কি করা হয়? মশায়ের নাম? এদিকে আসার উদ্দেশ্য?

চারিদিকের রাশি রাশি নোংরা কৌতূহল আমাকে যেন নিরন্তর বিদ্ধ করতে লাগলো। এমন আড়ষ্ট কখনও হইনি; নিজেকে এমন নির্বোধ আর কখনও মনে হয়নি।

অনেক উপরে উঠেছি, বায়ুস্তর লঘু হয়েছে ব'লেই কানে তালা লাগছে। যেমন এরোপ্লেনে ওঠা। কিছুদূর উঠলেই কান কটকট করে, তারপর শ্রুতিগহ্বরটি একেবারে অবরুদ্ধ। তখন তুলো চাই, তুলো গোঁজো কানে। ভদ্র কোম্পানীর বিমানে চড়লে 'হোস্টেস্' এসে তুলোটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়। তুলো গুঁজলে কিছু স্বস্তি। ধীরে ধীরে তখন বিমানের ভয়ানক কান-ফাটা আওয়াজটাও সয়ে যেতে থাকে। সে যাক্।

নীচেকার বনরাজিনীলা প্রকৃতি উপরদিকে উঠে হাল্কা হয়ে এসেছে। এখানে অরণ্যের শোভা কম, পাহাড়ে রুক্ষতা দেখা দিয়েছে। নীচের দিকে আর নজর চলছে না। খাদের দিকে তাকালে হৃৎকম্প হয়। চারিদিকের বিশালতা বেড়ে গেছে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে পেরিয়েছি বস্তি। বড়কাগাঁও, বর্ত্ত, দুত্তর, নালিপন্থ—এরা চ'লে গেছে। দূরের পাহাড়গুলির গায়ে চাষীদের ঘর, কিন্তু ঘরগুলি দূরের থেকে দেখে মনে হচ্ছে, ওরা ছোট ছোট পোকার মতো পাহাড়কে কামড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা চিরকাল আছে, বংশপরম্পরায় আছে। যুগে যুগে রাষ্ট্রশাসনভার এক হাত থেকে অন্য হাতে গেছে এক জাতির হাত থেকে অন্য জাতির হাতে, এক সভ্যতার পরে এসেছে অন্য সভ্যতা --কিন্তু ওরা কামড়ে আছে হিমালয়ের গা। ওরা চলে না, ওরা টলে না। ওরা হিমালয়ের আদি সন্তান,—বক্ষলগ্ন হয়ে রয়েছে যুগযুগান্তর, ঘন আলিঙ্গনের নিরাপদ শান্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছে। কোনো হুজুগ, কোনো আন্দোলন, কোনো বিপ্লব বা অরাজকতা ওদেরকে চঞ্চল করে না।

'সানি ব্যাঙ্ক' যখন গাড়ি এসে দাঁড়ালো, তখন তা'র ইঞ্জিন গরম হয়ে উঠেছে। প্রায় ছয় হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে হয়েছে। মাঝে মাঝে আরো বেশী। যাত্রীদের মতো ইঞ্জিনও এখন তৃষ্ণার্ত। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে অপরাহ্ণের দিকে যাচ্ছি। বাতাস ঈষৎ স্নিগ্ধ বটে, কিন্তু তবুও ধূ ধূ করছে রোদ। ছোট শহর 'সানি ব্যাঙ্ক'। মোটর বাসের স্ট্যাণ্ডটা মস্ত বড়। সেনানিবাস ও স্টোর আপিসকে ঘিরে একটি বাজার গ'ড়ে উঠেছে। কাছেই একটি যাত্রী-নিবাস। কসাইদের দোকানে ঝুলছে গরু বাছুরের হাড়পাঁজরা,—রং কিছু রক্তিম হরিদ্রাভ। স্থানীয় জনতা অনেকটা যেন ভেসে বেড়ায়। ফলওয়ালা, কাপড়-ওয়ালা, মোটর ড্রাইভার, রুটিমাংস-বিক্রেতা, কাশ্মীরী মেওয়া-ব্যবসায়ী, পল্টনের সেপাই, মিলিটারী অফিসার সহ ইঙ্গভারতীয় স্ত্রীলোক, তুর্কী পাঠান কিংবা কাশ্মীরী কুলি, হাজারা জেলার বন্য দেহাতী—ইত্যাদি নানাশ্রেণীর মিশ্রিত জনতায় সানি ব্যাঙ্ক পরিপূর্ণ। দরিদ্র কাশ্মীরী কুলীরা মোটা মোটা দড়ি গলায় অথবা হাতে ঝুলিয়ে পথের পাশে ব'সে রয়েছে। বলিষ্ঠ, হ্রস্বকায়, রক্তিম গৌর, ছাঁটা দাড়ি গোঁফ, মাথায় ময়লা চাঁদি-টুপি, পায়ে চপ্পল এবং ছিন্নজীর্ণ ময়লা পোশাক,—ওরা কেউ পাঠান, কেউ বা কাশ্মীরী। ওরা মানুষ হয়ে জন্মায়,—কুলী হয়ে মরে। বছরের প্রায় আট নয় মাসকাল পাহাড়ী শহরগুলির আশেপাশে রুটি খেয়ে আর মোট বয়ে বেড়ায়, পথে পথে রাত্রি কাটায় কাঁধের ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে। রুটি আর সব্জির পুঁটলী রাখে সঙ্গে, পথে যদি কোথাও জোটে একটু ফল আর বাদাম, কিংবা বরাতক্রমে টুকরো

দুই মাংস,—সেই ওদের জীবনযাত্রা। মুখে চোখে বন্য সরলতা, ভাষাটা পুস্তু আর কাশ্মীরী 'বোলি'—জাতি গোত্র একই, কিন্তু রক্তের প্রকৃতি ভিন্ন। এমন আছে শত শত পাঠান আর কাশ্মীরী কুলী,—যারা দেহাত ছেড়ে এসেছে সেই বাল্যকালে, আজও ঘরে ফেরেনি। নিজের নামটা জানে,- ব্যস। না জানে বাপের নাম, না নিজের বয়স, না নিজের গাঁও। এমন ঘটনা দেখেছি, সহোদর দুই ভাই দলবদ্ধভাবে কুলীগিরি করছে বছরের পর বছর, ছেলের সঙ্গে বাপ একই মেয়ে নিয়ে টানাটানি করছে,—কিন্তু কেউ কা'রো পরিচয় জানে না। তবু ওরা শান্ত মনে মোট বয়, দুদিনে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল পাহাড় ভাঙে, কুঁজো হয়ে বোঝা তোলে পিঠের ওপর দুই বগলে দড়ি বেঁধে, খানিকটা জিরোয় পাহাড়ের গায়ে বোঝা ঠেসে ধ'রে, কপালের ঘাম হাত দিয়ে ঝরায়, তারপর আবার মোটা মোটা কঠিন দৃঢ় পায়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে থাকে।

এখান থেকে মোটর পথ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। একটি গেছে কোহালার দিকে, অপরটি গেছে কো-মারীতে। মারী এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পথ। উত্তর ভারতের সামরিক ঘাঁটির প্রধান দপ্তর। 'সানি ব্যাঙ্ক' থেকে আবার চড়াই শুরু মারী পাহাড়ের দিকে। এবারের পথ অপরূপ,—দেওদারের ছায়ায় আর স্নিগ্ধতায়, বায়ুর মধুর ব্যজনে এবং বিশাল বৃক্ষশ্রেণীর মর্মরিত পাতায় পাতায় যেন গীতিকবিতার ব্যঞ্জনা ঘুরে ফিরে চলেছে। ঝরাপাতার রাশির ঝরঝরানি শুনতে পাচ্ছি আমাদেরই মোটরের চাকার তাড়নায়। একদিকে দেখতে পাচ্ছি দূর দুরান্তর দিগ্বলয়ের সীমানায় উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। দেখতে পাচ্ছি কারাকোরাম, দেখতে পাচ্ছি নাঙ্গার চুড়া, দেখতে পাচ্ছি হরমুখের অস্পষ্ট শিখর। ওরা চিরতুষারে আবৃত, চিরদিনের ধবলাধ'ব। ওদের ছাড়িয়ে আরো দূরে দিগন্তচিহ্নহীন কোনো একটা পৃথিবীর কোণে দেখতে পাচ্ছি আমার সেই ছোট্ট ঘর, খোলা বাতায়নের নীচে দিয়ে উঠেছে লতানে জুঁইয়ের ডগা, তা'র পাশে ছোট চারা উঠেছে সন্ধ্যামণির,—ঠাকুরঘরের দিকে আর কিছুক্ষণ পরে মা যাবেন সন্ধ্যাদীপ হাতে নিয়ে, সেই মলিন আলোর মৃদু আভায় যেন বহুদূর থেকে দেখছি বিষণ্ণ জননীর মুখ।

অপরাহ্ণের রোদ পাহাড়ে পাহাড়ে এখনও ধূ ধূ করছে। বেলা এখন চারটে। সাড়ে আটটার কাছাকাছি এদিকে সন্ধ্যার আলো জ্বলে। রাত চারটের সময় ভোর হয়। আমরা কাশ্মীরের পশ্চিম সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। এই পাহাড় নেমে গেছে ঝিলম নদীতে। ঝিলম পেরোলেই কাশ্মীর। আমাদের নিরিবিলি পথ নানা 'বেণ্ড' ও পথের নিশানা পেরিয়ে মারী পাহাড়ের

দিকে এগিয়ে এলো। ছোট শহরের ঠিক নীচেই মোটর স্ট্যাণ্ড, সেখান থেকে খানিকটা চড়াই উঠে গেলে মারীর 'ম্যাল' পাওয়া যায়। এ অঞ্চলটার নাম মারী-বাজার। এ শহরটি দার্জিলিংয়ের মতো নয়। কোনোদিকে পাহাড়ের দেওয়াল নেই। এখানে এলেই মনে পড়ে লান্সডাউন, মনে পড়ে শিমলা। মারী শহর দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায়। কালিম্পংয়ের মতো এখানে রয়েছে মস্ত গির্জা,—সেখান থেকে ঘণ্টা বাজলে বহুদূর পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। হিন্দুর আছে দেবালয়, শিখদের গুরুদ্বার। কিন্তু আশ্চর্য, মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে মসজিদ সহসা চোখে পড়ে না। যেমন কাশ্মীর,—সমস্ত দেশ জুড়ে রয়েছে রাজা ললিতাদিত্যের কীর্তি, অগণ্য মন্দির এবং হিন্দু স্থাপত্য, আর্য গ্রীক আমলের বিবিধ বৌদ্ধ কীর্তি,—কিন্তু মসজিদের সংখ্যা নগণ্য। যেমন জম্মু, তেমনি কাশ্মীর,—ব্যতিক্রম কিছু নেই। এই পাহাড়ের উপর দিয়ে কবে নাকি গিয়েছিলেন পঞ্চপাণ্ডব, তাঁদের সেই পথের নিশানায় আজও রয়েছে ইংরেজি নেম্-প্লেট্।

থমকে দাঁড়িয়েছি কতদিন ওই পথের নিশানাটার কাছে। পথটা সরু হ'য়ে এঁকেবেঁকে চ'লে গেছে অনেক দূর, সেখান থেকে নীচের দিকে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। লতাবিতানে ছাওয়া নিরিবিলি পথ। বড় বড় গিরগিটি আশেপাশে চ'রে বেড়ায়, ওদের ভয়ে ঘন জঙ্গলে ঢুকতে পারতুম না। এই পথ দিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে যায় কাঠুরে,—ওদের সঙ্গে আসে সেই কাচা দেওদার কিংবা পাইনের গন্ধ,—যে গূঢ় নিবিড় গন্ধটা হলো হিমালয়ের অনন্ত রহস্যলোকের। ওই পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি মহাভারতের আদি সূত্রপাত। ভারতের প্রথম সভ্যতার জন্ম এই অঞ্চলে, এই উত্তর-পশ্চিমে। কুষণ নয়, কণিষ্ক নয়,—তারও অনেক আগে—চার হাজার বছরেরও আগে। মহাজনপদের প্রারম্ভে নয়, গৌতম বুদ্ধ কিংবা, অজাতশত্রুর আমল নয়। সেই যখন প্রথম এসেছিল আর্যরা,—কে জানে তা'রা পামীরের, কি মধ্য এশিয়ার, কিংবা কারাকোরামের ওপারের। কিন্তু এই অঞ্চল দিয়ে ছিল তাদের ভারত প্রবেশের পথ। তারা যে কুরু-পাণ্ডবের পিতৃপুরুষ নয়, কে জানে! হিমালয় থেকে যেমন নেমে গেছে সিন্ধুর ধারা, যেমন নেমে গেছে এই বিতস্তা বিপাশা শতদ্রু ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার ধারা, যেমন নেমে গেছে গঙ্গা, যমুনা ও কালি-শারদার ধারা, ভারত সভ্যতার ধারাও তেমনি নেমে গেছে ওই জলপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। দেবাদিদেবের জটা থেকে যেমন নেমেছে গঙ্গা, হিমালয় থেকে তেমনিই ত' নেমেছে ভারতসভ্যতা! সমগ্র ভারতের ঐক্যবন্ধনের আদিমন্ত্র দিয়ে গেছে ওই আর্যরা, প্রতি মানুষের জপমালায় সঙ্গে সেই আগমনী মন্ত্রই ত'

ধ্বনিত হয়, গঙ্গেচ যমুনাশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী! সাতটি নদী নিয়ে এই অখণ্ড ভারত, সাত নদীর সভ্যতা নিয়েই ত' এই ভারতের সংস্কৃতি।

ম্যালের উত্তরাংশ হলো 'কাশ্মীর পয়েণ্ট।' কাশ্মীরের পার্বত্যশোভা কতদিন দেখেছি ওই পয়েণ্টে ব'সে। ওখান থেকে হারাতো আমার মন পাহাড়ে পাহাড়ে, পাইনবনের তলা দিয়ে, উপত্যকার ধার দিয়ে, পায়ে-চলা পথের নিশানা দিয়ে। মন মিলিয়েছি কতদিন গুহাগহ্বরের আনাচে-কানাচে, অরণ্যপুষ্পের গন্ধে, আকাশের টুকরো মেঘের সোনার বর্ণে, হরমহেশ আর কৃষ্ণগিরির তুষারকিরীটে। বোঝাপড়া করেছি কত বন্ধুর সঙ্গে,—লেখরাজ, রূপলাল, আজিজ আহমদ, মতি সিং, পণ্ডিত সদানন্দ, জগদীশ চন্দর! জানিনে তারা আজ কে কোথায়! বৃদ্ধ চাকুরে বাঙালী ছিলেন একজন, তিনি গুপ্ত সাহেব। তিনি আজ নিশ্চয়ই নেই। ওদের নিয়ে যেতুম ছিকাগল্লি আর সেই স্ট্রবেরীতে, যেতুম পিনাকল আর কনভেণ্টে। ঘোড়ায় চড়ে যেতুম 'পিণ্ডি পয়েণ্ট' পেরিয়ে লরেন্স কলেজের দিকে, সেখানে ছিলেন দ্বিতীয় বাঙালী মিঃ চ্যাটার্জি। কো মানে যেমন পাহাড়, গল্লি মানেও তেমনি পার্বত্য অঞ্চল। বাঁশরা-গল্লি হলো হাজারা জেলার পাঠানদের পথ। তারপর আছে ছাংলা গল্লি, ঘোড়া গল্লি ইত্যাদি।

মীরার দক্ষিণে হোলো 'পিণ্ডি পয়েণ্ট'। এখানে দাঁড়ালে দেখা যায় বহু দূরে ধূসর বিরাট হিন্দুস্তানের সমতল। সীমাহীন দিগন্তে গিয়ে সেই সমতল অস্পষ্ট হয়ে গেছে। চেরাপুঞ্জিতে গিয়ে দাঁড়ালে যেমন দেখা যায় সুরমা উপত্যকা, কার্শিয়াং থেকে যেমন দেখা যায় তিস্তা উপত্যকা, মুসৌরী থেকে যেমন দেখা যায় দেরাদুন উপত্যকা আর উত্তর প্রদেশের সমতল, এখানেও তেমনি। দেখতে দেখতে আসে গোধূলির ছায়া, আগে সন্ধ্যা ঘনিয়ে, আসে দিগন্তের নীচের থেকে সন্ধ্যাতারা। একান্ত, একাগ্র বৃহদাকার সেই তারা,— নিমেষনিহত চক্ষে আমাকে সে দেখেছে কতদিন।

এই হিমালয়ের উপরে এসেছে নববর্ষা। মেঘেরা এসেছে নীচের থেকে, মেঘের মধ্যে ডুবে গেছি কতদিন। দৈত্য-দানবের মতো পাহাড়ে পাহাড়ে ওরা দস্যুগিরি ক'রে গেছে, ত্রাসগ্রস্ত জীবজন্তু ও মানুষ বর্ষার চেহারা দেখে পালিয়েছে, করকাপাতে আহত হয়েছে কত পাহাড়ী পথিক। গাছ ভেঙেছে, পাথর গড়িয়ে পড়েছে, বজ্রাঘাতের আচমকা আওয়াজে মানুষের চেতনা লোপ পেয়েছে। দেখতে দেখতে মহারুদ্রের কালকটাক্ষ আবার শান্ত নিমীলিত হয়ে এসেছে। দেবতাত্মা হিমালয় আবার বসেছেন যোগাসনে মহাভারতের অনাদ্যন্ত কালের মহামৌন প্রহরীর মতো। তারপর আবার ওই মেঘেরা আমার

সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেছে পাঞ্জাবে, সিন্ধুতে, সীমান্তে, উত্তরপ্রদেশে। যক্ষ বিরহীর মতো ওদেরকে পাঠিয়েছি বিশাল হিন্দুস্তানের সমতল ভূভাগে।

পূর্ব হিমালয়ে বর্ষা হলো দীর্ঘস্থায়ী, মধ্য হিমালয়ে অনেকটা—যে-ভূভাগ নেপালের প্রান্তবর্তী, কিন্তু উত্তর পশ্চিমে বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী নয়। বর্ষার ঝাপটা আসে, কিন্তু দাঁড়ায় না। পাঠানকোট, শিয়ালকোট, লালামুসা ও পিণ্ডিজেলা অবধি বর্ষার বেগটা বেশ প্রবল, কিন্তু সে অনেকটা বন্যার মতো। ঢল যখন নামে, তখন বনজঙ্গল পাহাড় জনপদ গ্রাম—সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু উত্তরপশ্চিমে বর্ষা আসে খেয়াল খুশিতে। প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামে, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই সব ফর্সা, কোথাও আকাশে বর্ষার চিহ্নও পাওয়া যায় না। সেই কারণে অনেক স্থলে জল ধরে রাখার ব্যবস্থাও আছে এবং পনেরো-কুড়ি মাইলের মধ্যে নদী থাকলে সেখান থেকেও পাম্প করে জল আনা হয়। মারী পাহাড়ের উপর যেমন বৃহৎ দুটি 'রিজার্ভয়ের' আছে।

'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে মোটর পথ চ'লে গেছে কোহালায় ঝিলমের তীরে। সেপ্টেম্বরের এক প্রত্যুষে আমরা কোহালার পথে অগ্রসর হলুম। কিন্তু 'সানি ব্যাঙ্কে'র পথ দিয়ে নয়; মারীপাহাড় থেকে সোজা একটি কাঁচা লাল কাঁকর-পাথরের পথ কোহালার দিকে নেমে গেছে, সেই পথে আমরা অগ্রসর হলুম। কোথাও কোথাও সামান্য চড়াই, কিন্তু উৎরাই অনেকটা। এ পথটা নিরিবিলি। শোনা গেল, তিন হাজার ফুটের নীচে গেলে জন্তু-জানোয়ার আছে। মাঝে মাঝে উপত্যকা পাবো, সেখানে কাশ্মীরের নানা অচেনা রঙীন পাখি চোখে পড়বে। দুম্বা ভেড়া ও পাহাড়ী ছাগলের পাল নিয়ে চলেছে পাহাড়ীরা। এত বড় লোমযুক্ত মস্ত-মস্ত ছাগল কম দেখা যায়। গলায় তাদের ঘণ্টা বাঁধা। কুলীরা হাঁটা পথে মোট নিয়ে চলেছে কাশ্মীর থেকে পিণ্ডি শহরে। পুঞ্চের পাহাড়তলী নাকি বিপজ্জনক, সেই কারণে এই দিক দিয়ে যাওয়া নিরাপদ। পৃথিবী পর্যটন যাঁরা করেছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পীঠস্থান তাঁরা দেখেছেন শত সহস্র, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পথ দিয়ে যখন গিয়েছি, যখন গিয়েছি কুমায়ুনে, আসামে, গাড়োয়ালে, দুন উপত্যকায়, কুলু-কাংড়ায় কিংবা জম্মু থেকে কাশ্মীরে, বার বার তখন মনে হয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ আর না দেখলেও চলবে। এত রং, এত রস, এমন বর্ণাঢ্যতা, এমন সৌন্দর্যের সুষমা, অরণ্য ও পর্বতের আলো আর ছায়ান্ধকার মিলে এমন আশ্চর্য সুনিবিড় আনন্দোপলব্ধি সম্ভবত সমগ্র ভারতের কোথাও নেই। থমকে দাঁড়িয়েছি কতদিন ওই শিবালিক পর্বতমালার প্রান্তে, দাঁড়িয়ে থেকেছি কালদণ্ড পর্বতের চূড়ায়, ঘুরে বেড়িয়েছি কমল-নয়ন আর পুণ্যগিরির

আশেপাশে, সমস্তটা মনে হয়েছে আশ্চর্য! ভিতর থেকে যেন ফুঁপিয়ে উঠেছে মন অজানা বেদনায়, অস্তিত্বকে অবাস্তব মনে হয়েছে।

এও সেই পথ, শাল শেগুন পাইন চিড় ঝাউ আর দেওদারে আচ্ছন্ন। পৃথিবী স্তব্ধ গম্ভীর; আমরা যেন আদিকালের প্রথম ক্ষুদ্র মানবক—খান্না, রূপলাল আর আমি। এখানে যেন প্রথম পদচিহ্ন পড়ছে মানুষের, যেন আমরা জীবসৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তি। নিজেদের পদশব্দে আমরা নিজেরাই এক-একবার চমকে উঠছিলুম। অরণ্যের স্বপ্নাবেশ না ভাঙে, মহামৌনী হিমালয়ের যোগ-তন্দ্রা না টুটে, অরণ্যচারী প্রাণীদের অবাধ চলাফেরা যেন সচকিত না হয়। সেই জন্য হাতের লাঠি না ঠুকে, কেডস্ জুতোয় শব্দ না তুলে আমরা অত্যন্ত লঘু পদক্ষেপে শান্ত মনে পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। কথা আছে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আজ রাত্রিবাস করবো এবং পূর্ণিমা তিথি কাটবে ঝিলম-এর তীরে। আগামী কাল যদি শরীর ভালো থাকে, তবে পায়ে হেঁটেই আবার ফিরবো। আমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি হেঁটে ফিরতে চাইবে না, সে কাশ্মীরের মোটর-বাস ধরে 'সানি ব্যাঙ্ক' ফিরবে। আমরা স্থির করলুম, কোহালার মধুর পরিবেশের মাঝখানে ডাক বাংলায় আমরা রাত্রিযাপন করবো।

পথে অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি নদী পেরিয়েছি। এগুলি পার্বত্য স্রোতস্বিনী, বর্ষায় ঢল নামে, পাহাড় ভেঙে পাথরের টুকরো গড়িয়ে আসে, খরতর বেগে স্রোত প্রবাহিত হয়, পাহাড়ের বনের গাছপালা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, গ্রাম প্লাবিত করে, কিন্তু শীতের প্রাক্কালে যায় শুকিয়ে। কেবল পড়ে থাকে নীরস পাথরের জটলা। সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে এই একই নিয়ম। বর্ষায় হাতী ভেসে যায়, শীতে পাখির স্নান হয় না।

কোহালায় এলে মনে পড়ে যায় লছমনঝুলা, মনে পড়ে যায় হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি শহরের প্রান্তে বিপাশার পুল, মনে পড়ে যায় তিস্তার উপরে সেবকপুল। দুদিকে পর্বতমালা, মধ্যে স্বচ্ছতোয়া নীল নদী। কিন্তু এখানে তার কিছু ব্যতিক্রম। নদী খরস্রোতা, কিন্তু চন্দ্রভাগার জলের মতো রক্তিম গৈরিক। এই ঝিলমকে দেখেছি শ্রীনগর, সোপোরে, বরমূলায়, ভেরিনাগে, জল কোথাও স্বচ্ছ নয়। শীত বর্ষা গ্রীষ্ম কোনো সময়েই নয়। এর কারণ হলো সমগ্র কাশ্মীরের উপত্যকা ও পর্বত্য অঞ্চল মৃৎপ্রধান, শিলাপ্রধান নয়। কাশ্মীরের প্রত্যেকটি নদী পলিমাটি নিয়ে যায় পশ্চিম পাঞ্জাবে; সেই জন্য পশ্চিম পাঞ্জাব তার খাদ্য লাভ করে কাশ্মীরের বদান্যতায়। নদীর জলই পাঞ্জাবের সম্পদ্।

কোহালা সমুদ্রসমতা থেকে দেড় হাজার ফুট উঁচু হ'লেও গ্রীষ্মকালে

উত্তপ্ত। বাতাস এখানে কম, কেননা পর্বতের দেওয়াল ঘেরা। নদীতে স্নান এখানে আরামদায়ক, কারণ জল হলো নিত্য স্নিগ্ধ ও পার্বত্যলোকে যত দূর দৃষ্টি চলে ঘন নীল অরণ্যের নীচে রক্তিম মৃন্ময়তা। শুধু চেয়ে থাকো সৃষ্টিরহস্যের দিকে, যেমন চেয়ে থেকেছো ভূটান-ভারতের তল সীমানায়, সিকিমের পথে রংপোর নীচে, রুদ্রপ্রয়াগের মন্দাকিনীর তটে, যেমন ধবলী গঙ্গার এপারে আর ওপারে, বাগমতী আর ত্রিস্রোতার তীরে তীরে।

কোহালার পুল হলো কাশ্মীর আর ভারতের সংযোগস্থল। যেমন পাঠান-কোট থেকে জম্মুর পথে পড়ে মাধোপুরায় ইরাবতীর পুল। সেখানেও কাশ্মীর ও ভারতের সংযোগ ঘটেছে। এই দুই কাশ্মীর ভারত সংযোগস্থলে আধুনিক ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় দুইজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একজন কংগ্রেস-ভারতের নেতা বলে মুক্তিলাভ করেছিলেন, অন্যজন হিন্দু-ভারতের নেতা বলে মৃত্যুলাভ করেছিলেন। একজন পণ্ডিত নেহরু, অন্যজন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। এই পুল পেরিয়ে গেলে 'দুলাই' ও 'দোমেলের পথ'। দোমেলে মিলেছে কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তা। অনেকে বলে এটি বিতস্তারই একটি শাখা—মূল ধারা থেকে ছেড়ে আবার এসে মিলেছে। কেউ বলে টিটওয়ালের কাছে কৃষ্ণগঙ্গার মূলধারাই দেখা যায়। কেউ বা বলে, মূল টিটওয়ালের ধারা মিলেছে উলার হ্রদে। এই পুল পেরিয়ে পাঠান আর পাকিস্তানীরা এই সেদিন কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল এবং এরই পুরাতন পুল পেরিয়ে একদা শিখরাও একবার কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল এই শতাব্দীর প্রারম্ভে। আর কিছু এগোলেই পাওয়া যায় সেদিনকার শিখ দুর্গ এবং দেবমন্দির। শিখরা সেদিন সোপোর নামক অঞ্চল জয় করে' রাজ্যপাট বসিয়েছিল, আর এই সেদিন পাকিস্তানী পাঠানরা গিয়ে সোপোরে বিতস্তার তীরে শিখ অধিবাসীকে সর্বাগ্রে ধ্বংস করতে চেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসের আগেই ভারতীয় কাশ্মীর সৈন্যদান বাধাদান করে। এখান থেকে আরম্ভ হলো কাশ্মীরের দেবমন্দির, বিগ্রহস্থান এবং প্রাচীন আর্য, গ্রীক ও বৌদ্ধ-হিন্দু স্থাপত্যের নানাবিধ পুরাকীর্তি।

এখন বর্ষার শেষান্ত। কিন্তু রৌদ্র বড় প্রখর, তার সঙ্গে নদীর প্রবাহ প্রখরতর। চারিদিক বায়ুহীন, আমাদের পরিশ্রান্ত দেহ ঘর্মাক্ত। ডাক বাংলা খুঁজে পাবার আগে আমরা নদীর কাছাকাছি গাছের ছায়াতে এসে বিশ্রাম নিতে বসলুম। মাঝে মাঝে ধুলা উড়িয়ে প্রাইভেট মোটর চলেছে শ্রীনগরের দিকে। সন্ধ্যার সময় তারা পৌঁছবে শ্রীনগরে। এখন কাশ্মীরে শরতের মধুর স্নিগ্ধতা, তার সঙ্গে অজস্র ফলফুলের সমারোহ। কাশ্মীরে শরৎ ও হেমন্ত শ্রেষ্ঠ ঋতু।

দেখতে দেখতে অপরাহ্ণ পেরিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে ডাকবাংলা সম্বন্ধে খান্না অথবা রূপলাল কারোরই উৎসাহ বিশেষ নেই। আমি ওদের অতিথি, সুতরাং আমার সিদ্ধান্তের মূল্য সামান্য। পথের ধারে চা ও জলযোগ সারা হোলো। তারপর খান্না গেল বিশেষ এক কাজে এবং আধ ঘণ্টা বাদে হাসি মুখে ফিরে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। ঘাট থেকে কিছুদূর উঁচুতে উঠে সামনেই পথে একটি মস্ত কাঠের গোলা। চারিদিকেই শাল-দেওদারের জঙ্গল। ফলে, এ অঞ্চল ছায়াচ্ছন্ন। কারখানাটার সর্বত্র শিখ ও মুসলমান এবং কাশ্মীরী কুলীর আড্ডা। সম্পূর্ণ অজানা এবং অপরিচিত সমাজ আমার কাছে বটে, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে শ্রমিকদের ভাষাগত ঐক্যের জন্য সহজেই অন্তরঙ্গতা ঘটেছে। আমরা স্তূপাকার গাছের গুঁড়ির জটলা পেরিয়ে ছোট একখানা কাঠের বাড়ির অন্ধকার ছমছমে আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করলুম। আমাদের সম্মিলিত পায়ের শব্দ পেয়ে প্রথমেই যে বেরিয়ে এল, সে প্রৌঢ়বয়স্কা এক শ্রমিক নারী, জাতে কাশ্মীরী মুসলমান, পরনে কাশ্মীরী আলখাল্লা গলা থেকে পা পর্যন্ত, মাথায় টুকরো কাপড় বাঁধা এবং কানে মোটা মোটা অলঙ্কার, রং খুব ফর্সা। সে হাসিমুখে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে যে ব্যক্তি হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন, তিনি খান্না ও রূপলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সম্ভবত একটু আগে আমার আসার খবর তিনি পেয়ে থাকবেন। এবার সহাস্যে কাছে এসে বন্ধুবর সোজা ভাঙা বাঙলায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন। ধরে নেওয়া যাক তাঁর নাম মিঃ চৌধুরী। আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই, এখানে বাঙালী হিন্দু শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, অসম্ভবও বটে।

হাসি তামাসা চললো বহুক্ষণ। এই প্রথম জানতে পারলুম, এর নাম 'কটেজ'। এমন 'কটেজ' এ অঞ্চলে বহু আছে। অর্থের বিনিময়ে আহার ও বাসস্থান পাওয়া যায় এবং প্রধানত স্ত্রীলোকেরাই এই প্রকার 'কটেজ' পরিচালনা করে। চৌধুরী এসেছেন এখানে গতকাল 'দপ্তর' থেকে ছুটি নিয়ে,— এরা সকলেই একই দপ্তরের লোক। চৌধুরী চিরদিনই উত্তর-পশ্চিমে মানুষ। বাঙলার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, বাঙলা ভাষাও তার কাছে অপরিচিত।

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির উৎসাহ কম নয়। কলাইয়ের মগে চা ও দুখানা রেড়ো বিস্কুট এনে আমাদের খেতে দিল। আন্দাজে বোঝা গেল, আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে সমস্ত আয়োজন আগে থেকেই চলছে। এমন কি মুখ ধোবার জল এবং এক কুচি সাবান গুছিয়ে রাখা পর্যন্ত। ঘরদোর অত্যন্ত ছোট ছোট, ভিতরটা একটু দম-আটকানো, ওর মধ্যে আছে একখানা রঙীন ছবি পেরেকে ঝোলানো, মক্কাতীর্থের। তামাকের ব্যবস্থা, এলুমিনিয়মের বাসন, রুটির

টুকরোর সঙ্গে মুরগীর পালক ছড়ানো, কাঁচা কাঠের টুল আর তক্তা, ময়লা বালিশ আর ছেঁড়া নোংরা কম্বল। আরও যেসব আপত্তিকর পানীয় সামগ্রী সুবিন্যস্ত রয়েছে তাদের কথা এখানে নাই বা তুললুম। আমার একটু দিশাহারা ভাব লক্ষ্য করে চৌধুরী বললেন, একটা রাত আপনার কেটেই যাবে, ভাববার কিছু নেই, আসুন।

খান্না আর রূপলাল আমাকে রেখে বাজারের দিকে গেছে। খানিক পরেই ফিরবে। চৌধুরী আমাকে নিয়ে গেল ভিতরে আর একটা ঘরে। একই চালার নীচে ছোট ছোট খুপরি, তাকেই ঘর বলতে হচ্ছে। কিন্তু সেই ভগ্ন জীর্ণ আসবাবের পাশে নিয়ে গিয়ে চৌধুরী দাঁড় করালো আরেকটি স্ত্রীলোকের সামনে। এর বয়স কম। মাথায় রুমাল বাঁধা নেই, অত্যন্ত ময়লা আলখাল্লা, এবং মাথায় তেল-চকচকে পাটি-করা চুল—যেমন কাশ্মীরী মেয়েরা বাঁধে, কানে রূপো-বাঁধানো লাল পলা, পিছন দিকে দু-তিনটে বেণী ঝুলছে। চোখে সুর্মা। নাক এবং চোখ দুইই ধারালো। চৌধুরী সামনে দাঁড়িয়ে বাকি সমস্ত কথাটা কেবলমাত্র হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, অর্থাৎ বুঝতে যেন বাকি না থাকে! মেয়েটা তাড়াতাড়ি আমাদের হাতে সিগারেট দিল, এবং নিজেও ধরালো।

চায়ের পেয়ালাটা আমার এক হাতে ছিল, অন্য হাতে সিগারেট ধরিয়ে সটান বাইরে এসে বসলুম। শাল আর দেওদারের নীচে ছমছমে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কারখানার মজুররা অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়েছে। সুতরাং একটু নিরিবিলি একটা গাছের কাটাগুঁড়ির ওপরে বসে চা গিলতে লাগলুম বিস্কুটের সঙ্গে। নতুন হাওয়া বটে।

এত দূর এবং দুরূহ স্থানে বাঙালীকে পাওয়া সত্ত্বেও চৌধুরীর সঙ্গে আমার দূরত্ব ঘুচলো না। কেবল তাই নয়, এই 'কটেজ' এবং 'কটেজ গার্ল' সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করে তার কিছু বিমর্ষতাও দেখলুম। ফলে, আরও দূরত্ব বেড়ে গেল। আমার ভয় ছিল, পাছে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বন্ধুরা আঘাত পায়; পাছে আমার কোন আচরণ অথবা ভ্রূভঙ্গীর বৈলক্ষণ্যে ওরা আমার মধ্যে নৈতিক গোঁড়ামির গন্ধ পায়। সুতরাং একদিকে যেমন আড়ষ্ট হয়ে রইলুম, অন্যদিকে তেমনি স্থির করলুম, হাসি-পরিহাসে সর্বক্ষণ সকলকে উল্লসিত করে রাখতে চেষ্টা পাবো।

যতদূর মনে পড়ছে মেয়েটার নাম মুসম্মত মশনি। বোধ হয় মুশানি থেকে মশনি। বাড়ি তার বরামূলা পেরিয়ে কোন্ পাহাড়ের দিকে। বর্ষার শেষে মায়ের সঙ্গে আসে এদিকে, শরৎ ও শীতকালটা এদিকে থাকে, তারপর গ্রীষ্ম

ও বর্ষার আগে চলে যায় দেশে। মা কাজ করে কাঠগোলায়, নিজে এই 'কটেজ' চালায়। কটেজের আয় নিয়ে দেশে চলে যায়।

হট্টগোল থেকে যখন ছুটি পাওয়া গেল, তখন রাত বারোটার কম নয়। বন্ধুরা তখন কিছু স্তিমিত। মশনিও খুব সুস্থ নয়। আমি বাইরে এলুম। পূর্ণিমার চন্দ্র দেখা যাচ্ছে বিশাল দেওদারের ভিতর দিয়ে—একেবারে মাথার ওপর। পাহাড়তলীর ওদিক থেকে মাঝে মাঝে জন্তুর ডাক শোনা যাচ্ছিল। আমার প্রিয় সেই গাছের গুঁড়িটির উপরে এসে কিছুক্ষণের জন্য বসলুম। এমন নিবিড় জ্যোৎস্না, সমস্তই চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তবু কিছুই স্পষ্ট নয়। ফলে একপ্রকার অবাস্তব এবং বিভ্রান্তকর স্বপ্নাবেশ সর্বত্র জড়িয়ে রয়েছে। বাতাস অতি মৃদু, কিন্তু শরতের স্নিগ্ধতা নেমেছে আকাশভরা জ্যোৎস্নার থেকে। আলোছায়াময় পাহাড় উঠে গেছে অদূরে, তার বিশালতা দেখলে যেন গা ছমছম করে। ওর গা বেয়ে উঠে এই জ্যোৎস্নালোকে কোথাও উধাও হয়ে গেলে কোনো এক রূপকথার রাজ্যের তোরণ খুঁজে পাবো, হয়ত পৌঁছতে পারবো পর্বতমালা পেরিয়ে কোন এক বিচিত্র লোকে—এই বিতস্তার তীরে বসে যেন তার আস্বাদ পাচ্ছি। বুঝতে পারিনি আপন অস্তিত্ববোধের চেতনার কখন বিলুপ্তি ঘটেছে! তন্ময় হয়ে ছিলুম।

ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো একেবারে কাছাকাছি। ঠাহর করে দেখলুম সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলেকেটি। আপন ভাষায় জানালো, আমি এখনও রুটি খাইনি। আমার জন্য সে অপেক্ষা করে আছে। বেটা, ভুখে রহোগে কৈঁও, কুছু খা লেও।

খুপরিগুলো প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। বন্ধুরা তাদের আবিল উদ্দীপনার মধ্যে লক্ষ্যই করেনি যে, তাদের অতিথি এবেলায় অভুক্ত। লক্ষ্য না করাই স্বাভাবিক, অপরাধ কিছু নেই।

কিন্তু সে রাত্রে এই স্ত্রীলোকটির সদ্বিবেচনার কথা আমি ভুলিনি। আহারাদি সেরে যদিও বাইরের দিকে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল, আমি কিন্তু কোন কষ্টই পাইনি। ময়লা বালিশও একটা কপালগুণে জুটেছিল।

পরদিন মধ্যাহ্নের পর অনেক হায়রানি ও ছুটোছুটির মধ্যে একসময় পিণ্ডির দিকে যাবার মোটরবাস পাওয়া গেল। আমি একাই চড়ে বসলুম গাড়িতে। কেননা আমার হাতে সময় কম। মনে হচ্ছে বন্ধুরা আজ রাত্রেও এখানে থেকে যাবে। আমি 'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে মারী যাবো। সেখান থেকে শীঘ্রই পিণ্ডি হয়ে ফিরবো।

॥ ৬ ॥

সমগ্র হিমালয় হলো শৈব ও শাক্তের লীলাভূমি। যত দুর্গমেই যাও, মহাদেব এবং পার্বতীর মন্দির পাওয়া যাবে সর্বত্র। যতদূরে যাও, যেখানে খুশি যাও—মহাকালীর স্থাপনা! শক্তির আরাধনা চলছে আবহমানকাল থেকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ধরো, পেশাওয়ার থেকে রাওয়ালপিণ্ডি, ঝিলম্, শিয়ালকোট, জম্মু পাঠানকোট,—তারপর চ'লে এসো পাঞ্জাব রাজ্যে, হিমাচলপ্রদেশে, কাংড়া-কুলুতে, এসো শিমলায়, গাড়োয়ালে, কুমায়ুনে, নেপালে, ভূটানে, আসামে—শুধু শিব ও দুর্গা, চণ্ডী, মহাকালী, মহিষমর্দিনী। তারপর উত্তর দিকে যাও,—সমগ্র কাশ্মীরে শিব ও শক্তিপূজা। নেমে এসো নীচে কুমায়ুনে, তারপর পূর্বদিকে তিব্বতে ঢোকো, মানস সরোবরের পথে পাবে শক্তি আরাধনা। তিব্বতের খোচরনাথ গুম্ফার গর্ভলোকে মহাকালীর মূর্তি, অমাবস্যায় সেখানে পশুবলিদান হলো বিধি। হিন্দুদর্শনের বনস্পতির থেকে নানা শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে,—কোনটা শৈব, কোনটা শাক্ত, কোনটা বা বৌদ্ধ। ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতি যুগ যুগ ধ'রে কেবল পরস্পরের ভিতরে সংহতি সাধন ক'রে চলেছে। এই সংস্কৃতি রাষ্ট্রের কোনও সীমান্তরেখাকে মানেনি, রাজনীতিক জরীপকে স্বীকার করেনি, তুষারমণ্ডিত শত শত গিরিশৃঙ্গমালার অবরোধকে গ্রাহ্য করেনি, কেবলমাত্র আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসের শক্তিতে চিরকাল ধ'রে তা'রা হিমালয়ের পারাপার ক'রে এসেছে। ঠিক এই কারণেই সিকিমে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, এটা তিব্বতের অংশ, নেপালে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে এটা ভারতের অংশ। যাঁরা কুমায়ুন, কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ, লাদাখ,—অথবা এই কাছাকাছি উত্তর বিহারের কোনো কোনো উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিংবা যাঁরা শিমলা থেকে তিব্বত হিন্দুস্থান রোড ধ'রে গেছেন কিন্নরদেশে—তাঁরা জানেন, খণ্ড খণ্ড 'তিব্বত' এই ভারতের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। আবার যখন দেখি তিব্বতের অসংখ্য গুম্ফায় হিন্দু দেবদেবীর নিত্য আরাধনা চলে, তখন বুঝতে পারি, খণ্ড খণ্ড ভারত তিব্বতের মর্মে মর্মে বাসা বেঁধে রয়েছে অনাদিকাল থেকে।

উত্তর বিহার পেরিয়ে যখন সগৌলি থেকে রক্সৌল স্টেশনে গাড়ি থেকে নামলুম, তখন এইপ্রকার নানা তর্ক ছিল মনে। আমি নেপাল যাচ্ছিলুম। সেই প্রথম নেপালে যাওয়া,—১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারী। সঙ্গে ছিলেন পালিত মশাই। তাঁর গতি ছিল কিছু মন্থর। একটি কথা ব'লে রাখা ভালো।

এবারের যাত্রায় আমার অনেকটা আর্থিক অনটন ছিল, সেজন্য পালিত মশাই সঙ্গে নিয়ে চলেছেন একছড়া সোনার বিছাহার। হারছড়ার মালিক কে, এটা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কথাটা পরে উঠতে পারে সেজন্য আগে ব'লে রাখা ভালো।

রক্সৌলে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে ছমছমিয়ে। পাশাপাশি দু'টো স্টেশন তার মধ্যে একটি হলো ভারতীয় রক্সৌল, অপরটি নেপালী। ছাড়পত্র পেতে অসুবিধা ছিল না, তবে দু'টি পয়সা লাগলো। দু'জনের জলযোগে লেগে গেল আনা চারেক। উভয় দেশের প্রহরীরা ছিল আশেপাশে। এখন শিবরাত্রি আসন্ন, পশুপতিনাথে মস্ত মেলা, অনেক রকমের যাত্রীর আনাগোনা। বাঙালী বিপ্লবী দলের ছেলে এই সুযোগে নেপালে গিয়ে ঢুকলে পুলিশের চোখ এড়ানো যায়; অথবা নেপাল থেকে যদি কোনো অস্ত্রশস্ত্র আনা সম্ভব হয়, সে চেষ্টাও চলে। যাই হোক, এখান থেকে অমলেকগঞ্জ আন্দাজ ত্রিশ মাইল,— দু'জনের ট্রেন ভাড়া তখন আনা দশেকের বেশী নয়, দু'খানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক'রে আমরা অমলেকগঞ্জের গাড়িতে উঠে বসলুম। পালিত মশাই ইতিমধ্যে কোথা থেকে যেন এক গাল পান কিনে খেয়েছেন, তার সঙ্গে জর্দা। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে বিড়ি ধরিয়ে তিনি বললেন, সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট করলেই ত' হতো বেশী ত' লাগতো না। বড্ড ভিড় এ গাড়িতে।

এবারের তীর্থযাত্রার তহবিলে তিনি কিছু চাঁদা অবশ্য দিয়েছিলেন, কিন্তু সে চাঁদায় হাবড়া থেকে মোকামাঘাট পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আসা যায় মাত্র। কিন্তু আমার মনে আনন্দ ছিল যে, এ যাত্রায় একজন সুরসিক সঙ্গী পাওয়া গেছে। আরেকটা অপ্রাসঙ্গিক কথাও এখানে বলা চলে। দীর্ঘদিন ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় জেনেছি যে, হিমালয়ের এমন বহু অঞ্চল আছে যেখানে আমাদের অভ্যস্ত খাদ্য, পানীয় এবং নানাবিধ বিলাসদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য। সেই কারণে প্রাত্যহিক জীবনের অনেক প্রকার অভ্যাস ছেড়ে অনেক উপকরণের উপর আসক্তি ত্যাগ করে বেরিয়ে না পড়লে পদে পদে মন খারাপ হ'তে থাকে। অভাব-বোধের কাঁটা খচখচ করে।

আমাদের ছোট্ট খেলাঘরের ট্রেনখানা চলেছে পাহাড়ী গ্রামের মাঝখান দিয়ে এবং অন্ধকারের ভিতর দিয়েই দেখতে পাচ্ছি গ্রামের লোক গাড়িখানাকে বিশেষ গ্রাহ্য করছে না। বহুযাত্রী চলেছে হাঁটাপথে, তাদের তাঁবু পড়েছে পথের আশেপাশে। এই যৎসামান্য রেলপথটুকু ছাড়া সমগ্র নেপালে যান-বাহনের আর কোনো ব্যবস্থা নেই। নেপালরাজ ত্রিভুবনবিক্রম তখনও নেপালের ত্রিসীমার বাইরে যাবার হুকুম পান না, এবং তাঁর ত্রিভুবনবিজয়ী

বিক্রমকে খর্ব ক'রে রাখার জন্য মহারাজা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি তাঁকে একপ্রকার নজরবন্দী ক'রেই রাখেন।

এটা হিমালয়ের তরাই অঞ্চল। সমস্ত নদীনালা ঝরনা ও জলপ্রপাতের গতি এইদিকে। বৃষ্টিবাদল এইদিকে বেশী,—এবং এইদিকে যেমন বেশী ফসল ফলে, তেমনি বেশী লোকে ম্যালেরিয়ায় ভোগে। এই তরাই অঞ্চল এখানেই শেষ হয়নি। দক্ষিণ কুমায়ুন থেকে আরম্ভ ক'রে সমগ্র যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাঙলা, সিকিম, দক্ষিণ ভূটান ও উত্তর-পূর্ব আসামে চ'লে গেছে। এর দীর্ঘতা হাজার মাইল না হ'লেও তার কাছাকাছি। সমগ্র হিমালয় থেকে তুষার-বিগলিত জলধারা নামে, মৃত্তিকা ও পলিমাটি নামে, বর্ষা ও ঝড়ের আঘাতে নেমে আসে উন্মূলিত বনজঙ্গল এই বিশাল তরাই অঞ্চলে। এই অঞ্চলের ঘন গহন অরণ্যানীর সঙ্গে তুলনা চলে কেবল আগেকার সুন্দরবনের। কুমায়ুনের পূর্বপ্রান্ত শিলগড় পর্বত থেকে কালগিরি, টনকপুর, পিলিভিৎ, মাইলানি, কৌড়িবাজার হয়ে অগণ্য নদীনালা জলা পেরিয়ে এই টিরাই চ'লে গেছে বীরগঞ্জ ছাড়িয়ে যোগবাণীর দিকে, সেখান থেকে জলপাইগুড়ি, শুকনা, আলিপুর দুয়ার ও দক্ষিণ সিকিম পেরিয়ে আসামে। এই হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে যেমন একদিকে পাওয়া যায় শত শত বৎসরের পুরাতন স্থাপত্য, মন্দির, দেবালয়, নানা ঐতিহাসিক কীর্তি, তেমনি এর ভয়ভীষণ অরণ্যলোকে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে, চিতা, গণ্ডার, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ, শত শত বরনের পাখি ও বিষাক্ত সর্প—এই সুবিশাল ভূভাগের প্রতি স্তবকে-স্তবকে চিরকাল ধ'রে অব্যাহতভাবে বাস ক'রে চ'লেছে। আজও হিমালয়ের সর্বত্র রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত ওষধি-বন, অনাবিষ্কৃত ভূমিজ ও খনিজ সম্পদ্—যা খুঁজে এনে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ফেললে কেবল যে কোটি কোটি টাকা আয় হ'তে পারে তাই নয়,—ওই বিশাল অরণ্যের বিচিত্র ওষধিলতার সাহায্যে আজকের এই আণবিক বিস্ময়ের যুগে হয়ত মানুষের চিরকালের দুরাশার বস্তু মৃতসঞ্জীবনী পদার্থও মিলে যেতে পারে। অবিশ্বাস্য ঘটনা ব'লে কোনো কিছু একালে আর নেই!

বীরগঞ্জের বিশাল অরণ্যের একাংশে আমাদের গাড়ি অতি ধীর গতিতে চলেছে। শোনা গেল, মহারাজা হস্তিপৃষ্ঠে এই পথে আজ শিকারে বেরিয়েছেন। তাঁর লোকলস্করের তাঁবু পড়েছে জঙ্গলের ধারে ধারে। রাত্রে কিছু দেখা যায় না, কারণ সরকারী কোনো আলোর বালাই নেই। কেরোসিন আসে ভারতবর্ষ থেকে, তার দাম অনেক। অন্ধকারে নেপালকে রাখা দরকার, কেননা সভ্যতার আলো প্রবেশ করলে পাছে এ রাজ্যের অধিবাসী আপন

দুর্গত জীবনের চেহারা দেখে শিউরে ওঠে, পাছে মহারাজার হাত থেকে শাসনদণ্ড খ'সে পড়ে! তাছাড়া, জাতিতে বৌদ্ধ হ'লেও ওদেরকে শক্তিপূজায় উৎসাহ দান করা হয়। কারণ ইংরেজের সাহায্যে পৃথিবীর নানা দেশে লড়াইয়ের জন্য গুর্খা সৈন্য না পাঠাতে পারলে রাজ্যের আয়-ব্যয়ের কোনো ভারসাম্য থাকে না। এমন নির্ভয়ে, এমন ঠাণ্ডা রক্তে, এমন অবলীলাক্রমে— গুর্খা সৈন্যের মতো আর কেউ বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এমন কি সীমান্তের পাঠান, বালুচ, রাজপুত জাঠ, ডোগরা, শিখ—এরাও গুর্খা সৈন্য দেখে স'রে দাঁড়ায়। সমগ্র ভারতে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, দূর প্রাচ্যে, আরব ও উত্তর আফ্রিকায়, ইউরোপের বহু অঞ্চলে—এরা নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও দয়াহীনতার জন্য প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল। এদের প্রাথমিক শিক্ষাই হলো শত্রুর প্রতি নির্মমতা। এমন বাধ্য ও নিয়মানুগত, এমন কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়স্বাস্থ্য, এমন সরল ও নির্ভরযোগ্য—সহসা দেখা যায় না। ইংরেজের মন্দভাগ্যের কালে প্রায় সকল শ্রেণীর সৈন্যদলই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল,—কিন্তু গুর্খা সৈন্যের বিদ্রোহ একবারও শোনা যায়নি।

অমলেকগঞ্জ হলো শেষ স্টেশন। আমরা যখন নামলুম তখন সন্ধ্যা রাত। স্টেশনটি পাহাড়ের কোলে। চারিদিক অন্ধকার। কেরোসিনের আলোয় এখানে ওখানে দেখি কয়েকখানি মাড়োয়ারীর দোকানপাট। ওর মধ্যেই ওরা দাঁড়িপাল্লা ধরেছে, ওর মধ্যেই কাঁচি আর কাটাকাপড় নিয়ে বসেছে, এবং ওর মধ্যেই বনস্পতির তেলে ময়লা রংয়ের পুরি ভাজতে লেগেছে। ওরা যে এককালে জয়পুর-উদয়পুর-চিতোর-বিকানের-যশলমেরের অধিপতি ছিল একথা ওরা এবং আমরা উভয়েই ভুলেছি। ব্যবসায়ের সঙ্গে বিক্রমের কোনো যোগ ওরা রাখতে দেয়নি।

গাড়ি থেকে নেমে রাত্রির আশ্রয় খুঁজে পাবার আগে পালিত মশাই ধ'রে বসলেন একটু গরম চা খাবো।

ইতিমধ্যে জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। যাত্রীনিবাস হয়ত পাওয়া-যেতো, কিন্তু আমি নিজে সে নরককুণ্ড কোনদিনই পছন্দ করিনি। ফলে, নানাবিধ কাঁচামালসংযুক্ত একটি দোকান ঘরের মেঝেতে সেই রাত্রির মতো আশ্রয় পাওয়া গেল। চতুর্দিকে জঙ্গলের এবং পাহাড়তলীর ঝুপসি অন্ধকার ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই দোকান ঘরের মেঝেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে যখন পড়েছিলুম, তখন আমার মনে প'ড়ে গেল রাওয়াল-পিণ্ডির সেই ঔষধের গুদাম। শত সহস্র প্রকার ঔষধের সংমিশ্রিত উৎকট গন্ধে সমস্ত রাত্রি আমি পায়চারি করে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলুম। গোয়েন্দার

চোখে সন্দেহভাজন হবার ভয়ে সেই জ্যৈষ্ঠের রাত্রে ঘরের বাইরে বেরোতে পারিনি, এবং এখানে এই কাঁচামালের আড়তে ও কাঁচাকাঠের তৈরী ঘরের বাইরে এসে একবারও নিশ্বাস নিতে পারলুম না—কারণ এই অমলেকগঞ্জের বাজারের উপর থেকে গতকাল রাত্রেও নাকি একটি নরখাদক বাঘ একটি স্ত্রীলোককে তুলে নিয়ে গেছে। ফলে, আমাদের ঘরটির চারিদিকে একদম ইন্দি-ছিন্দি বন্ধ করা হলো। ভিতরে শীতে কাঁপছে সবাই।

পালিত মশাই সঙ্গে এনেছিলেন বিছানার পুঁটলি। তার ওপর বেশ আরামে শুয়ে পান-জর্দা চিবিয়ে, বিড়ি ধরিয়ে এবং নস্য নিয়ে বললেন, আপনার হিমালয় আপনারই থাক্। আপনার পাল্লায় প'ড়ে আরো কি কপালে আছে জানিনে।

তাঁকে আনা ছিল আমার গরজ, সুতরাং ভয়ে ভয়ে ছিলুম। তাঁর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আমার কড়া নজরও ছিল। তিনি ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, মুখখানা ঠাণ্ডায় ফেটেছে! বাজারে ঘুরছিলুম ভেসলীন্ কেনবার জন্যে—জংলীরা ওটার নামই জানে না! যত অগামারার দেশ!

পাতলা লেপখানা বেশ ক'রে মুড়ি দিয়ে তিনি পাশ ফিরে শুলেন। তারপর নিশ্চিন্তমনে ঘুমোবার আগে একবার বললেন, বাঘ এসে যদি দরজা ঠেলাঠেলি করে আমাকে ডেকে দেবেন!

অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডি মাইল চব্বিশেক পার্বত্য পথ। সকালের দিকে শীত পড়েছে, বাতাস বইছে কনকনিয়ে। সমস্ত অরণ্যলোক ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। শীতের মধুর রৌদ্র তখনও নামেনি অমলেকগঞ্জে, পূর্বদিকের পর্বতমালা রৌদ্রকে আড়াল ক'রে রেখেছে বহুদূর পর্যন্ত। উত্তর ও পশ্চিমে ছায়াচ্ছন্ন ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের নীচে দিয়ে চলেছে বাগমতী নদী—এ নদী নেপাল থেকে বিহারে নেমে গিয়ে বোধকরি মুঙ্গেরের দিকটা হয়ে গঙ্গায় মিলেছে,—সঠিক আমি জানিনে। কিন্তু উত্তর প্রদেশ ও বিহারকে জলদান ক'রে চলেছে নেপালের নদী। সারদা, ভেরি, রাপ্তি, কালিগণ্ডক, ত্রিশূলগঙ্গা, গণ্ডক—এরা সকলেই নেমে এসেছে নেপাল থেকে। নেপাল তথা উত্তর বিহারের জল পেয়ে গঙ্গা গৌরবগর্বিতা হয়েছেন।

মোটর চলেছে পার্বত্যপথ দিয়ে। এ পথ অপরিচিত নয়। সুকনা থেকে তিনধরিয়া, গৌহাটি থেকে শিলং, কাল্কা থেকে শিমলা, পিণ্ডি থেকে মারী, জম্মু থেকে বানিহাল, কোটদ্বার থেকে লান্সডাউন, তিস্তা থেকে দার্জিলিং, জ্বালামুখী থেকে কাংড়া, কিংবা রংপো থেকে গ্যাংটক,—এ আমার অতি

পরিচিত পথ, কিন্তু তবু অতি পরিচয়ের পরেও মনে হচ্ছে ওরা যেন আমার চিরকালের বিস্ময়। ওদের প্রত্যেকটি পাথর আমাকে যেন যুগযুগান্তর ধ'রে মোহমদির ক'রে রেখেছে। ওরা আমাকে টেনে এনেছে বার বার ওদের মাঝখানে। এই আমি মানবগোষ্ঠী-পরম্পরায় বংশানুক্রমিক দেহ-দেহান্তরের ভিতর দিয়ে ওদেরকে দেখে এসেছি হাজার হাজার বছর ধরে। প্রতি পাথর কথা বলেছে আমার কানে কানে। ইতিহাস শুনিয়েছে, রহস্য-যবনিকা তুলে ধরেছে। জানিয়েছে অনেক, দেখিয়েছে অনেক বেশী। পর্বতের নিভৃত কন্দরে শৈবালাচ্ছন্ন প্রাচীন পাথরের গন্ধে আমার মন কতদিন অমর্ত্যলোকের দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সৃষ্টির আদিকালে গলিত অগ্নিগোলক যেদিন থেকে জমাট বেঁধেছে,—সেদিনকার প্রথম জীব আমি যেন কীটানুকীট; তারপর সরীসৃপের মধ্যে আমি; তারপর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন—সেই আমি নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছি যুগে যুগে। এসেছি আদিবাসীর চেতনার ভিতর দিয়ে, এসেছি বন্য বর্বর মানবেতর প্রাণীর ভিতর দিয়ে,—এসে পৌঁছেছি আমার সেই প্রাথমিক ইতিবৃত্তে। সেই আমি এসেছি রামায়ণে এসেছি মহাভারতে—আবর্তিত হতে হতে এই আমি অবশেষে এসে পৌঁছলুম আর্য সভ্যতায়। দেখে এসেছি আমার নিজেরে লক্ষ লক্ষ বছরের কাহিনী এই হিমালয়কে সাক্ষ্য রেখে। ওদের ওই জঠরে, কোটরে, গহ্বরে, গুহায়, ছায়ায়, মায়ায়, আমার আবহমানকালের প্রাণসত্তা আছে লুকিয়ে। তাই আমার মন বার বার কেঁদে ওঠে ওই গুল্মলতাসমাকীর্ণ পাথর জটলার মধ্যে আমার অজয়—অমর আত্মাকে আবিষ্কার ক'রে। কেঁদে বেড়ায় আমার মন ঝরনার ধারায়, প্রাচীন পাইনের ছায়ায়, ভয়-ভীষণ প্রস্তর স্তূপে আর গিরিমেখলের আশেপাশে—ঘুরে বেড়ায় আমার চির পুরাতন প্রাণ ওই ওক্ গাছের শাখায় শাখায়, পুষ্পিত অর্কিডের চারায় লতায়, রডোডেনড্রনের গোছায় গোছায়। প্রতি কীটে, পতঙ্গে, সরীসৃপে, প্রতি উপলের অনুপরমাণুতে, প্রতিটি ঝরনার শিকর-কণিকায়, প্রতি বনস্পতির লতায় পাতায় শিরায় উপশিরায়—আমি উপলব্ধি ক'রে চলেছি আপন অস্তিত্বকে।

পথের অসংখ্য বাঁক পেরিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল। সন্দেহ নেই, পাহাড়ে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ হলো পায়ে হাঁটা—যদি বন্যশ্বাপদ ও সর্পভয় না থাকে। মোটর হলো সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, কিন্তু সবচেয়ে বেশী বিপদাশঙ্কাপূর্ণ। এক ইঞ্চি দু' ইঞ্চির ব্যবধানে মৃত্যুকে প্রতি বাঁকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে অবশেষে আসে ক্লান্তি আর অবসাদ। তার ওপর ড্রাইভার যদি মাদকবস্তু সেবন ক'রে দ্রুত গাড়ি চালাতে থাকে, তবে আগাগোড়া অস্বস্তির

অন্ত থাকে না। গত পঁচিশ বছরে অন্তত পাঁচ হাজার বার আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সুযোগ ছিল, কিন্তু দেবতাত্মা হিমালয়ের ক্রোড়ে দুরাত্মাদের বোধ হয় ঠাঁই নেই। ধরো, কাঠগুদাম থেকে যারা আলমোড়া যায় রাণীক্ষেত হয়ে, তাদের মোটর পথে কমপক্ষে এমন একশত 'বেণ্ড' (বাঁক) পড়ে যে, মোটরের একটি চাকা এক আধ ইঞ্চি এদিক ওদিক হ'লে মৃত্যু অথবা দারুণ অপঘাত অবধারিত। কিংবা ধরো যারা হিমাচল প্রদেশে মণ্ডিশহর হয়ে কুলু-মানালির পথে একবার গিয়েছে বিপাশা নদীর তীরে তীবে,—তা'রা ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজেদের বেঁচে থাকাটাকে বিশ্বাস কবেনি। পাহাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভদ্রপথ হলো দার্জিলিংয়ের পথ। সে যাক্। এই কিছুদিন আগেই গিয়েছিলুম আলমোড়ায়। সেখানকার প্রধান আকর্ষণ হলেন প্রখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বশীশ্বর সেন মহাশয়। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের শিষ্য, এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'হোস্ট' —যাকে বলে অতিথি-সেবক। তাঁর কাছে গল্প শুনলুম, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে ব'লে-ক'য়ে তিনি গ্রীষ্মকালে আলমোড়ায় নিয়ে যান। মোটরযোগে আলমোড়ায় পৌঁছে মহাকবি কিছুকাল সেন মহাশয়েব সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। ওখানকার ওই বেণ্ডগুলি পেরোবার সময় কবির মনে যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ সঞ্চারিত হচ্ছিল তার জন্য তাঁব অপবিসীম ক্লান্তি ও অবসাদ আসে।

পথে একটি সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে এক সময় আমরা ভীমপেড়িতে এসে পৌঁছলুম। এ অঞ্চলটি সুউচ্চ পর্বতের পাদদেশস্থিত একটি ছোট উপত্যকা। এখান থেকে 'রোপওয়ে' অথবা রজ্জুপথ চ'লে গেছে নেপালেব দুরারোহ পর্বতমালার গর্ভে। কিছুদূর পর্যন্ত নজর চলে, তারপরে রজ্জুপথটি অদৃশ্য। ভীমপেড়ি অথবা ভীমপেহড়ী—যাই বলো। ভীমপাহাড়ী বললেও কেউ নালিশ করবে না। নেপাল ভূভাগটি 'মহাভারতীয়' পর্বতমালার অন্তর্গত, এবং সমগ্র হিমালয়ের একটি অংশমাত্র। বুঝতে পারা যায়, দ্বাপর যুগে মহামতি দ্বিতীয় পাণ্ডব প্রচুর পরিমাণে হিমালয় ভ্রমণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিমালয় থেকে তাঁর ভ্রমণের চিহ্ন দেখতে দেখতে কুমায়ুন বিভাগে ভীমতালে এসে পৌঁছই,—সেখানে সামনেই দেখি হিড়িম্বা পর্বত, এবং ভীমেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। তারপর ওই আসামেও দেখা যাবে হিড়িম্বাপুর—সেটা অধুনা ডিমাপুর এবং কো-হিমা, অর্থাৎ হিড়িম্বা পাহাড়। বুঝতে পারা যায়, সহধর্মিনী ঘটোৎকচের জননীকে নিয়ে বৃকোদর হিমালয়েব নানাস্থানে ধর্মাচরণ করেছিলেন।

এটাও ভীম পাহাড়ের কোল, পাশেই বাগমতী নদী। নেপাল রাজের ধর্মশালা একটি আছে বটে, কিন্তু ভিড় বাঁচিয়ে আমরা পথেই এসে বসলুম।

পালিত মশাই এবার দেখি সেই হারছড়াটি গলায় ঝুলিয়েছেন। তিনি বললেন, চা না খেয়ে পাদমেকং ন গচ্ছামি! তার সঙ্গে চাই পান-জর্দা।

কাঠমাণ্ডু শহর এখান থেকে কাছেই। আন্দাজে বুঝলুম কুড়ি-বাইশ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষা হলো এই পথটুকু। এখান থেকে ঘোড়া, ডাণ্ডি, ঝাঁপান অথবা কাণ্ডি—প্রায় সবই বন্দোবস্ত করা যায়। কিন্তু আমাদের পুঁজি হলো যৎকিঞ্চিৎ। অতএব চড়াই ধরে হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। চারিদিকে নেপালী অথবা গুর্খা কুলি দড়ির গোছা হাতে নিয়ে ঘুরছে। এ সময়টা ওদের মরসুম। আমরা ভীমপেডীতে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না ক'রে চড়াই পথে পা বাড়িয়ে দিলুম। অমলেকগঞ্জ থেকে এখানে আসবার সময়ে দেখে এসেছি পথে-পথে বসন্তকালের নবীন সমারোহ। কোথাও সে রক্তিম পীতাভ, কোথাও 'বা সে নীলিমায় সবুজে আশ্চর্য। ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রাম পুষ্পস্তবকে আর উপত্যকার পাখির কলকূজনে পরিপূর্ণ। মনে করেছিলুম সেই বসন্তশোভা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবে। কিন্তু সিসাগড়ি পাহাড়ের চড়াই কিছুদূর ভাঙতে ভাঙতে সে ভুল আমাদের ভাঙলো।

ভীমপেডীতে আমরা যদি স্নানাহার ক'রে বিশ্রাম নিয়ে পা বাড়াতুম, তাহলে হয়ত এ ভুল এমনভাবে ধরা পড়তো না। আমরা ভেবেছিলুম সিসাগড়ি ওরফে শ্রীশগিরি অতিক্রম ক'রে ফুলেখালি ধর্মশালায় গিয়ে একেবারে বিশ্রাম নেবো। কিন্তু শ্রীশগিরিতে না ছিল শ্রী, না বসন্তকাল। রৌদ্র প্রখর হলো, প্রখর থেকে প্রখরতর,—সেই রৌদ্র জৈষ্ঠ্য মাসের আগ্রা জেলাকেও বোধ হয় হার মানালো। পথে কোথাও ছায়া অথবা পানীয়জল দেখছিনে, চটি ধর্মশালার চিহ্নও চোখে পড়ে না, পথের আন্দাজও পাইনে,—কেবল সেই রৌদ্রে পাকদণ্ডিপথে এক চড়াই থেকে অন্য চড়াই ভেঙে চলা। গাড়োয়ালের বিজনী চড়াই কিংবা ছান্তিখালের চড়াইয়ের সঙ্গে কেবল এই চড়াইয়ের তুলনা চলে। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টা আড়াই পরে নেপাল সরকারের গোরা ছাউনী এবং পল্টন দপ্তর পাওয়া গেল। এখানে স্নান করবার সুবিধা পেলুম বটে, কিন্তু আমাদের রসনার মতো যেমন-তেমন কোনো আহার্যবস্তু জুটলো না।

মধ্যগগনের প্রচণ্ড রৌদ্র এই রুক্ষ পাহাড়ের উপরে অগ্নিক্ষরণ করছিল। পালিত মশাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে লাঠি দিয়ে এক-একটা পাথরের ঢেলার ওপর সজোরে আঘাত করছিলেন। পথে কোনো স্থলে এক-আধটা পরিত্যক্ত ভগ্ন দেবালয় পার হয়ে যাচ্ছিলুম। পালিত মশাই

খেদোক্তি ক'রে বললেন, রাবিশ। স্নান ক'রে যেটুকু জল টেনেছিলুম, ঘাম দিয়ে সেটুকু বেরিয়ে গেল।

মুখ ফিরিয়ে দেখি তিনি গাত্রাবরণ কতকটা সরিয়েছেন। কপাল থেকে অসংখ্য ঘামের ফোঁটা নেমেছে। হিমালয় থেকে যেমন গিরি-নদীর ধারা। নামতে নামতে গলা পেরিয়ে সোনার হারছড়াটা ভিজিয়ে আরো নেমে গেছে। সহানুভূতির সঙ্গে বললুম, আপনার কৌটোয় পান আছে, একটা খান্ না?

নাঃ—!

তবে না হয় নস্যি নিন্ এক টিপ?

পালিত মশাই হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে লাঠি আছড়ে শুধু বললেন, থাক্।

সাধুরা চলেছে চিমটে বাজিয়ে,—জয় পশুপতিনাথ! জয় শম্ভো! ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ডাণ্ডিযাত্রী। পাশ দিয়ে গাছের ডাল ছিপটিয়ে তিব্বতী টাট্টু চলেছে সওয়ার নিয়ে। মাঝে মাঝে ভালো ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সরকারী অফিসার। পিঠে বন্দুক ঝুলছে। মাথায় পিতলের তক্‌মা আঁটা মিলিটারী। ওদিক থেকে আসছে গোর্খা কুলী পিঠে মস্ত বোঝা নিয়ে, কিংবা আসছে পাহাড়ী লোমশ ছাগলের পাল প্রত্যেকের পিঠের দুই দিকে পুঁটলী ঝুলিয়ে।

আসবার সময় সেই উত্তর বিহারের সীমান্ত থেকে মানুষের মুখের রেখা বদলাতে আরম্ভ করেছে। উত্তর বিহারের অনেক স্থলে ঢুকেছে মঙ্গোলীয় রক্ত। উচ্চতায়, চোয়ালে, দুই চোখের ব্যবধানগত অবস্থিতিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই পরিবর্তন। দেখতে দেখতে এসেছি। যত ভিতরে যাচ্ছি ততই সেই পরিবর্তন প্রকট। শুধু মানুষ নয়, গরু ও মহিষ, ছাগল ও মেষ—এদের আকৃতি ও গঠন যাচ্ছে বদলে। এই ক্রমবিবর্তন দেখেছি আলমোড়ায়, গাড়োয়ালে, হিমাচল প্রদেশে, পহেলগাঁও থেকে জোজিলা গিরিপথের দিকে। এক অঞ্চল মিলছে ভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে। এক রক্তস্বভাব মিশিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন রক্তে। সিকিমে দেখে এসেছি তাদের, যাদের নাম লেপ্‌চা। সিকিমের আদিবাসী, তার সঙ্গে বাঙালী, তার সঙ্গে গুর্খা, তার সঙ্গে নেপালী—এই মিলিয়ে ধরলেই লেপ্‌চা। এমনি ক'রে অনাদিকাল থেকে সমস্ত মানুষের সঙ্গে সমস্ত মানুষকে মিলিয়ে দিচ্ছে এক অদৃশ্য নিয়ন্তা। ইচ্ছায় মিলছে, অনিচ্ছায় মিলছে, অজ্ঞাতে মিলছে। বাধা দেবার সাধ্য তোমার-আমার নেই। হিট্‌লার বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু নিজের শক্তিতে নিজেই ফেটে মরেছে। প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনকে বাধা দেবার সাধ্য হয়নি।

সাত আট মাইল—যতদূর আন্দাজ করতে পারি। যখন কুলেখানতে এসে পৌঁছলাম তখন অপরাহ্ণ। এত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত যে, পালিত মশাইয়ের দিকে তাকাতে সাহস হলো না। সামনে মস্ত সরকারী যাত্রীনিবাস। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে নেপালী গুর্খাদের বস্তি। আমরা পরিশ্রান্ত দেহে যাত্রী-নিবাসের ভিড়ের মধ্যেই আশ্রয় নিলুম। আজ থেকে চতুর্থ দিনে পড়বে শিবরাত্রি, সুতরাং হাতে আমাদের সময় ছিল।

কুলেখানির মস্ত যাত্রীশালাটা তিব্বতী স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় দেয়। শুধু যাত্রীশালা নয়, মন্দিরও তাই। বড় বড় বাসস্থান, দেবালয়, গুর্খা বস্তির ঘরদোর,—এরাও তিব্বতী শিল্প প্রভাবে গ'ড়ে উঠেছে। অধিকাংশ স্থাপত্য হলো কাঠের তৈরি। তার ওপর খোদাই, তার ওপরেই নক্সা। নেপাল বৌদ্ধপ্রধান, কিন্তু শাক্তমতি। মহিষমর্দিনীর জন্য মহিষ চাই পদে পদে। অধিকাংশ আমিশাষী। খড়্গ চাই, রক্ত চাই, বলির জন্তু চাই,—মৎস্য, মাংস, মদ্য, তন্ত্রমন্ত্র ভূত প্রেত পিশাচ—সবই পাওয়া চাই। অনার্য (!) শিবকে চাই—যিনি শ্মশানচারী; অনার্য ছিন্নমস্তাকে চাই যিনি রক্তলোভাতুরা। চণ্ডীকে চাই যিনি শত্রুবিমর্দিনী। সিংহ-বাহিনী জগদ্ধাত্রীকে চাই, যিনি সর্বপালিকা। আমার কাছে আজও স্পষ্ট নয়, নেপাল বৌদ্ধ অথবা শাক্ত। খ্রীষ্ট ও বৌদ্ধধর্মপন্থী যারা তারা এ-যুগে 'অহিংসা পরমধর্ম'—এ আদর্শ মেনে চললো কিনা, এতে আমার সন্দেহ আছে। কেননা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষে এই সেদিন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল, তার প্রধান নায়করা ছিল খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধধর্মের লোকেরা। হিন্দু এবং মুসলমান স'রে দাঁড়িয়েছিল। অহিংসার সঙ্গে অহিংসার জগৎজোড়া রক্তপাত হয়ে গেল।

নেপালের প্রায় সমস্ত স্থাপত্যকীর্তিতে যে সমস্ত চিত্র খোদিত দেখা যায়, তা'র অধিকাংশই নগ্ন নরনারীর মৈথুন চিত্র। এ দৃশ্য নতুন নয়: কাশীতে, পুরীতে, কোনারকে, খাজুরাহোতে, বাঙলার কোনো কোনো স্থাপত্যে—এর প্রাচুর্য সবাই জানে। অশ্লীলতায় এরা ভয় পায়নি, কারণ ওটাকে এরা সুন্দর ক'রে তুলেছে। মৈথুন চিত্রের ভিতর দিয়ে এরা সবাই তুলে ধরেছে সেই বিপুল অগ্নিস্রাবের সঙ্কেত—যার থেকে মানবগোষ্ঠী, যার থেকে সভ্যতার পর সভ্যতা, এবং বিশ্বব্যাপী জীবসৃষ্টি বিবর্তিত। পৃথিবীর সমস্ত জাত এই অভিব্যক্তিকে ভয় ক'রে এসেছে, তা'রা দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে জীব-জন্ম-রহস্যকে সকলের চোখের আড়ালে। কিন্তু একমাত্র হিন্দু, যারা এই রহস্যকে দেখেছে দর্শনের চোখে। যাদের কাছে জ্ঞান বড়, বিজ্ঞান বড় নয়। যারা তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করেছে, শুধু তথ্য খুঁজে বেড়ায়নি। যারা দেখে এসেছে

মহাশক্তির আধারযোগে পলকে পলকে নিঃস্রাবিত হচ্ছে জীব-জন্ম-সমারোহ। পুনরায় গ্রাস করেছেন মহাকালী আপন মৃত্যুগহ্বরে সকল জীবকে। জন্ম-মৃত্যুর এই বৃত্তাকার খেলা চলেছে শাশ্বতকাল।

পরদিন আমরা একটি নদী পার হলাম। নদীটি ছোট, বলা বাহুল্য বাগমতীরই শাখা। চারিদিক পর্বতমালায় বেষ্টিত, সভ্যতা থেকে দূরে, ছোট ছোট গুর্খাবস্তি বাদ দিলে চারিদিক নিঃঝুম, শব্দহীন। কিছুদিন আগেই এ অঞ্চলে তুষারপাত হয়েছে, এখনও প্রবল শীতের বাতাস। সামনে চড়াই-পথ পেরিয়ে এবার পাওয়া গেল উপত্যকা। পথ পিচ্ছল, কিছু মৃন্ময়, কিছু বা রক্তিম। এপাশে ওপাশে অরণ্যলোক। তবু ওরই মধ্যে কিছু কিছু চাষ আবাদের চিহ্ন আছে, ওরই মধ্যে ফসল। সামনে পাশে পর্বতগাত্র, ওপারে কিছু দেখা যায় না। শ্রীশগিরি পেরিয়ে এসেছি, এবার পার হতে হবে চন্দ্রগিরি। পথ বহুদূর, কিন্তু চড়াই কম। দুই সুবৃহৎ পর্বতশৃঙ্গের মাঝখানে এটি উপত্যকা। একটু উৎরাই পেলেই ভাবনা হয়, কেননা অতটাই আবার চড়াই ভাঙতে হবে। আমরা সমতল পেলেই খুশী থাকি।

আরাম ও আহারাদির কথা ওঠে না, কারণ আমরা তীর্থপথিক। যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাবো, এই ছিল চেষ্টা। সকালের দিকে নোংরা চা গিলে পালিত মশায়ের প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। তাঁর মনের কথাটা ছিল এই যে, শিবরাত্রির মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অত বেশী তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ছাড়পত্রে যখন সময় বেশী আছে, তখন ধীরেসুস্থে এক-আধদিন এখানে ওখানে কাটালে ক্ষতি কি?

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাঁর গলায় সোনার হার আছে বলেই তাঁর সাহস আছে, এদিকে আমার তহবিল কিন্তু উৎসাহজনক নয়। ফলে, আমার তাড়া ছিল। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, আমি যত দ্রুত এগিয়ে যাই, পালিত মশাই ততই পিছিয়ে পড়েন। মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে আমি এক পাথরখণ্ড আশ্রয় ক'রে তাঁর জন্য অপেক্ষা করি, কিন্তু তিনি হয়ত তখন এক মাইল পিছনে পড়ে আরেকখানা পাথর আশ্রয় করে বসে থাকেন। এইভাবে যেতে যেতে অপরাহ্ণকালে আমরা চেৎলাং ধর্মশালায় এসে পৌঁছলুম। শেষের দিককার পথটা ছিল কষ্টদায়ক, সেজন্য বিশ্রামের বিশেষ দরকার ছিল।

বাগমতীর তীরে সরকারী এক ছোট্ট চালা পাওয়া গেল। সেটা লতাপাতায় ছাওয়া তাঁবু। ভিতরে কিছু নেই, বালুপাথরে কাঁকরে পরিপূর্ণ। শয্যাদ্রব্য হিসাবে খড় সংগ্রহ ক'রে আনা গেল। কিন্তু নদীর স্রোত যদি হঠাৎ খরতর

হয়, তবে জল আসবে ভিতরে। আমাদের মনে উদ্বেগ ছিল, কিন্তু তা'র চেয়েও দুর্ভাবনা ছিল এই, তুহিন ঠাণ্ডার মধ্যে আমাদের রাত্রি কাটবে কেমন করে ?

পাথরের টুকরোর সাহায্যে উনুন বানিয়ে ভাত ফোটাবার চেষ্টা চললো। কাঠের সেই আগুনটাই হোলো আলো, তার বাইরে সব অন্ধকার হয়ে আসছে। শোনা গেল, এখন এদিকে নাকি নরখাদক বাঘের উপদ্রব চলছে। মানুষের গন্ধ ও সাড়াশব্দ পেলে তা'রা আসতে পারে বৈ কি। হিমাচ্ছন্ন সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় আমরা নদীর তটে ব'সে এমনিতেই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিলুম, তার উপরে এলো নরখাদকের আতঙ্ক। পালিত মশাই এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঠের আগুনটা ছেড়ে তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন। গরম গরম চা ও জলখাবার পেয়ে তাঁর আবার পরিহাসবোধ ফিরে এসেছিল। এবারে কিন্তু অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমরা কেবল উদ্বিগ্নচক্ষে চেয়েছিলুম পশ্চিম দিকে, দুই বিশাল পর্বতের নীচেকার গহ্বর থেকে যেখান দিয়ে বাগমতীর দুরন্ত জলধারা সশব্দে ছুটে আসছে। গত কয়েকদিন রৌদ্র অতিশয় প্রখর ছিল, বরফ গলেছে নিশ্চয় অনেক বেশী। মধ্যরাত্রের দিকে স্রোত স্ফীত হবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের মন দুশ্চিন্তায় ভ'রে রইলো।

আহারাদি সেরে তৃণশয্যার উপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে যখন পড়েছি তখন আমাদের তাঁবুটি যাত্রীর সংখ্যায় দেখতে দেখতে ভ'রে উঠেছে। ভিতরে জন আষ্টেকের মতো জায়গা হ'তে পারতো, কিন্তু জন পনেরো এসে জায়গা নিল। ভিখারী, বৃদ্ধা, খঞ্জ, বাউণ্ডুলে, সাধু—নানা লোকে ভ'রে গেল। ওর মধ্যে ছিল একজন কাঁচা বয়সের কৃষ্ণাঙ্গী বিহারী স্ত্রীলোক। কপালে টিপ—মাথায় সিঁদুর, হাতে রূপার চুড়ি, পরনে কালাপাড় শাড়ি—আগে থেকেই আমাদের মুখচেনা হয়েছিল। সে এসে জায়গা নিল এক কেশবিরল বৃদ্ধ মহারাজের পাশে। স্ত্রীলোকটির কলকণ্ঠে, পরিহাসে, স্পষ্টবাদিতায় এবং গুনগুনানি সঙ্গীতসাধনায় মরুভূমির উপর যেন কাজল মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল। হিন্দি-ভাষায় পালিত মশায়ের ব্যুৎপত্তি কম, তবুও কম্বল মুড়ি দিয়ে ভিতরে ভিতরে হেসেই খুন। স্ত্রীলোকটির প্রাণশক্তি ছিল অসামান্য, তাঁর কলকণ্ঠের তাড়নায় ঘুম পালাচ্ছে সকলের চোখ থেকে। কিন্তু একথাটা শোনানো হোলো যে, মানুষের গলার আওয়াজ পেলে নরখাদকের পক্ষে পথ চিনে তাঁবুর মধ্যে ঢোকা সম্ভব এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রতি নরখাদকের আকর্ষণ বেশী,—তখন সে চুপ করলো।

মধ্যরাত্রে চেঁচামেচিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। পুঁটলী থেকে মোম-

বাতি নিয়ে আলো জ্বালানো হোলো। আমরা লাঠি বাগিয়ে ধরলুম। কিন্তু ব্যাপারটা একটু ভিন্ন রকমের। বৃদ্ধ কেশবিরল গেরুয়াধারী মহারাজ শুয়েছিল স্ত্রীলোকটির ঠিক পাশে। সহসা মধ্যরাত্রে ঘুমের ঘোরে স্ত্রীলোকটি অনুভব করে, নরখাদক ব্যাঘ্রের থাবা তা'র শরীরকে আঁকড়ে ধরেছে। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারে, নরখাদক নয়—বৃদ্ধ মহারাজেরই থাবা। আলো জ্বেলে আমরা দেখি, বিরলকেশ মহারাজের মাথায় স্ত্রীলোকটি সজোরে চপেটাঘাত করছে। কিন্তু মহারাজ স্বয়ং বহুকাল তপশ্চর্যার ফলে এমনি সংযম ও অহিংসায় ব্রতী ছিলেন যে, এত প্রহারের ফলেও তাঁর আক্রোশ হচ্ছে না। বৃদ্ধ এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, ঘুমের ঘোরে তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে স্বপ্নে দেখে হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাঁর কথায় তিলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন না ক'রে এই কথাটাই চীৎকার ক'রে জানাতে চায় যে, পুরুষের হাতের এবং আঙুলের ভাষা প্রত্যেক যুবতী নারী বোঝে এবং এই মধ্যরাত্রে মহারাজের ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের যে অগ্ন্যুত্তাপ অনুভব করা যাচ্ছিল, তার ভিতরকার রহস্যটা অভিজ্ঞ মেয়েমানুষের কাছে দুর্বোধ্য নয়।

চেঁচামেচি এবং তর্কবিতর্ক চললো অনেকক্ষণ পর্যন্ত। মোমবাতির মালিক আলোটা নিবিয়ে মোমবাতিটা কাছে নিল। স্ত্রীলোকটি এবং মহারাজ যেখানে শুয়েছিল ঠিক সেখানেই রইলো। যতদূর মনে পড়ে শেষরাত্রের দিকে আবার উভয়ের মধ্যে একটা চাপা কলহ এবং লাঞ্ছনা পুনরায় আমাদের কানে আসছিল।

তারপর সকাল হোলো। শীতে জ'মে যাচ্ছিল হাত-পা। আজ ভোর-ভোর আমরা চেংলাং ছেড়ে চন্দ্রগিরির চূড়া অতিক্রম করবো। চড়াই খুব কঠিন, তবে এইটিই শেষ চড়াই। এরপর নামতে হবে থানকোটে, সেখান থেকে সোজা কাঠমাণ্ডু। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম। রোদ ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়বো।

পালিতমশাই সহজে নড়তে চান না, তিনি একটু ধীরগতি। তাঁর চা-পান চাই ঘন ঘন। একটু মশগুল হয়ে বসা, একটু গত রাত্রির আলোচনা,—তার সঙ্গে গরম গরম পুরি-কচুরি। সমস্তটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, তবে কিনা পকেটের ভাষাটা একটু অন্য রকমের। যত দেরি হবে ততই তহবিলে টান ধরবে, এই মুশকিল। যাই হোক, আমাকেও একটু ঢিলে দিতে হোলো।

আজ সকালে আমরা আবিষ্কার করলুম, মহারাজ এবং সেই হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটির মধ্যে বেশ সদ্ভাব ঘটেছে। মেয়েটি পরিহাসে বেশ সরস, এবং বৃদ্ধ মহারাজও কর্মোৎসাহে বেশ চঞ্চল। দুজনে একসঙ্গেই চলাফেরা করছে।

পরম্পরায় জানা গেল, স্ত্রীলোকটির সন্তানাদি হয় না ব'লে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করে একা পশুপতিনাথে চলেছে। বাবা পশুপতিনাথ যদি তা'র মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এই আশা! এই কাহিনীটিকে কেন্দ্র ক'রে আমি পরে 'দেবতার গ্রাস' নামে একটি রচনা প্রকাশ করেছিলুম। বাবা পশুপতিনাথ স্ত্রীলোকটির মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন!

চেৎলাঙের সামনেই সুবিশাল পর্বতচূড়া ওরই গা বেয়ে উঠেছে শত শত যাত্রী পিপীলিকাশ্রেণীর মতো। সিসাগড়ির মতো এটারও নাম চন্দ্রাগড়ি।—অত্যন্ত কষ্টসাধ্য পাকদণ্ডি পথ,—সোজা খাড়াই। অমরনাথ তীর্থে যাঁরা গেছেন, যাঁরা মন্দাকিনী থেকে উখীমঠে গেছেন, যাঁরা বিশ-বাইশ বছর আগে ত্রিযুগীনারায়ণ কিংবা গুপ্তকাশী গেছেন—তাঁরা বুঝবেন চন্দ্রগিরির চড়াই পথ। একমাত্র সান্ত্বনা এই, এই পথের দীর্ঘতা কিছু কম—মাইল চারেকের বেশী নয়। যেমন ভূটানের সীমানায় বক্সা বন্দীশালার পথ,—মাইল দেড়েক চড়াই তাই রক্ষে, নইলে কষ্টটা মনে থাকতো। যেমন মুসৌরী থেকে 'কেম্পটি' জলপ্রপাতের পথ,—ছয় মাইল মাত্র চড়াই ব'লেই লোকে সহজে ভুলে যায়। কিন্তু যে কারণে লোকে নৈনীতালের 'চায়না-পীকের' কথা ভোলে না,—সেই কারণেই চন্দ্রগিরির কথা আজও আমি ভুলিনি। সম্প্রতি জানা যাচ্ছে রক্সৌল এবং কাঠমাণ্ডুকে সংযুক্ত ক'রে সম্প্রতি-পরলোকগত সম্রাট ত্রিভুবন বিক্রমের নামে একটি রাজপথ নির্মাণের কাজ চলছে।

শ্রীশগিরি এবং চন্দ্রগিরি—দুটো চূড়াই সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় আট হাজার ফুট উঁচু। কিন্তু ভীমপেডির পর চার থেকে আন্দাজ পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত চড়াই উঠতে হয়। বাকি চড়াই উৎরাই অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডি অবধি মোটর বাসেই আনাগোনা চলে। চন্দ্রগিরির চূড়া এবং এদিক ওদিকের পর্বতমালা ঘন অরণ্যে আবৃত, হিংস্র জন্তুর অবাধ বিচরণভূমি। চূড়ার দিকে অগ্রসর হলেই চারিদিকের দিগন্ত বিস্তার লাভ করতে থাকে। নীচের দিকে যখন থাকি, নিজে তখন অনেক বড়। যত উপরে উঠি, যত বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি যায়, তখন দেখি নিজে আমি কত ক্ষুদ্র! সংসার যাত্রায় আমার আশেপাশে যত লোভ, মোহ, অভিমান, আকর্ষণ, আমার সুখ দুঃখ, আমার ভিতরকার ষড়রিপুর খেলা—তারা কী নগণ্য, কী সামান্য! আকাশ এখানে অনেক বড়। এ পৃথিবী আশ্চর্য।

চন্দ্রগিরির চূড়ায় দেখি, কাপড়ের টুকরো বাঁধা অসংখ্য পতাকা! হিমালয়ের যেখানে যাও, এ দৃশ্য চোখে পড়ে। সিকিমে এই, অমরনাথে এই, গাড়োয়াল কুমায়ুনে এই, ভূটানের সীমানায় এই, হরিদ্বারের চণ্ডী পাহাড়ের

পথে এই। এতই যখন চল্‌তি, এটি প্রচলিত কুসংস্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কুসংস্কার এক অখণ্ড ঐক্যবন্ধনে বেঁধে রেখেছে সমগ্র হিমালয়কে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। কালো কাপড় উড়িয়ে কাক তাড়ানো যায়, লাল কাপড় দেখলে নাকি মহিষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, সাদা কাপড়ের টুকরো ওড়ালে নাকি হিমালয়ের ভূত প্রেত পিশাচরা সে তল্লাট ছেড়ে দূর হয়ে যায়। এই শ্বেতপতাকা ওড়ে সমগ্র তিব্বতের গুম্ফায়-গুম্ফায়।

চূড়ায় উঠে দেখি সেই প্রাচীন পৃথিবী; কিন্তু উত্তরে তার স্বপ্নলোক। সমগ্র হিমালয়ের তুষার রাজ্য,—তার প্রত্যেকটি শৃঙ্গ দুগ্ধশুভ্র বরফে ঢাকা। প্রত্যেকটি যেন তুষারশুভ্র মন্দির, প্রত্যেকটি যেন মহাযোগে আসীন। বায়ুস্তর ভেদ ক'রে গিয়ে ওদের উপর পড়েছে রৌদ্র—একটি অত্যুজ্জ্বল গৈরিক স্বর্ণাভার আবহ সৃষ্টি করেছে। এখানে সব চুপ। মানুষের কথা, ভাষা, মন্ত্র, স্তব, কলকণ্ঠ—সমস্ত স্তব্ধ। চেতনা, প্রাণ, চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি—সমস্তগুলো যেন থরথরিয়ে কাঁপছে আমার এই দৃষ্টিবিন্দুতে। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নড়িয়ে বুঝতে হয় যে, এবার আমাদের এগোতে হবে।

উপর থেকে চোখ নামিয়ে নীচে আনতে হয়। নীচের দিকে বিরাট নেপাল,—নীলাভ তা'র উপত্যকা এবং শস্যপ্রান্তর। বড় বড় মন্দির ও প্রাসাদের চূড়া—কিন্তু এখান থেকে কী ক্ষুদ্র! মাঝখানে রৌপ্য-রৌদ্রাভ নগর কাঠমাণ্ডু,—সমস্তটা যেন পুতুলের ঘর সাজানো। যত বিরাট, যত ব্যাপক, যত বিস্তৃত, যা কিছু হোক—হিমালয়ের কাছে অতি নগণ্য। এই পশ্চাদ্‌পটের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত কাঠমাণ্ডু শহরটাকে ফুটখানেক লম্বা-চওড়া একটা ছেলেখেলা ব'লে মনে হ'তে লাগলো। এমনি করে দাঁড়িয়ে কতবার কত উপত্যকা দেখেছি হিমালয়ের কত বিস্ময় দুই চোখে নিয়ে। মুসৌরির উপরে দাঁড়িয়ে দেরাদুন, বানিহালের সুড়ঙ্গলোকের মুখ থেকে সমগ্র কাশ্মীর; হনুমান চটি ছেড়ে গিয়ে দূরের থেকে বদরিকাশ্রম, গোপেশ্বরের পাহাড়ের উপর থেকে বহুদূর অলকানন্দার তীরে চামোলির পার্বত্য শহর, বজ্রেশ্বরীর মন্দির অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবের বিশাল কাংড়া উপত্যকা, চণ্ডীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে হরিদ্বারের মনোরম দৃশ্য।

কতক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা এবার অবতরণের দিকে পা বাড়ালুম। আমাদের নামতে হবে আন্দাজ হাজার চারেক ফুট নীচে, কিন্তু কিঞ্চিদধিক দু' মাইলের পরিসরে। কাজটি শক্ত। বুঝতে পারা যায়, এই বিরাট প্রাকৃতিক প্রাচীরের অন্তরালে রাখা হয়েছে কাঠমাণ্ডু শহরটিকে; এই অবরোধের বাইরে

রাখা হয়েছে সভ্যতাকে। কিন্তু এই বিপজ্জনক অবতরণের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা আমরা প্রমাদ গণলাম। নামবার সময় দেহের ভারসাম্য না রাখতে পারলে অপঘাত অবধারিত! তা ছাড়া ভয় ছিল হাঁটুর ওপর অতিশয় চাপ পড়বে। পাহাড়ের চড়াইতে বিপদ নেই,—কেবল বুকের মধ্যে আঘাত লাগে এবং পরিশ্রম হয়; কিন্তু উৎরাইতে লাঠি ঠিক ক'রে ধ'রে না রাখতে পারলে বিপদের সমূহ আশঙ্কা। মনে পড়ে যাচ্ছে পরেশনাথের কথা। ওই হাজারী-বাগের ওদিকে। যারা শ্বেতম্বরী দিগম্বরী ধর্মশালার ওদিক দিয়ে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরে উঠেছেন, তাঁদের খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তবু পরেশনাথের সুবিধা এই, পথটা ছয় মাইল ছড়ানো। এখানে বড় জোর আড়াই মাইল। শোনা গেল, এই উৎরাই পথে প্রতি বছরে বহুসংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটে! অসতর্ক পায়ের ধাক্কায় নীচের দিকে অনেক সময় পাথর গড়িয়ে পড়ে। অনেকে পা ফসকে নীচে গড়িয়ে যায়। কিন্তু তীর্থযাত্রাপথে কতকটা দুর্গম অঞ্চল থাকে ব'লেই সেটা মানুষের সাহস ও শক্তিকে আকর্ষণ করে। সমগ্র হিমালয় ভ্রমণে মানুষের শক্তি, সাহস, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং আত্মনিগ্রহের অগ্নিপরীক্ষা এইভাবেই চলে; তুমি শান্ত, তুমি নম্র, তুমি ধীর, তুমি একাগ্র, তুমি কষ্টসহিষ্ণু —তবেই তুমি হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপকে দর্শন করবে!

প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো থানকোটে এসে পৌঁছতে। ছোট গ্রাম্য শহর। চারিকে দারিদ্র্যটা বড় প্রকট। এখান থেকে কাঠমাণ্ডু আন্দাজ মাইল ছয়েক পথ। এখান থেকেই মোটরবাস ছাড়ে। এবারে আমাদের চেহারায় তীর্থ-যাত্রীর ছাপ ফুটেছে। ধুলোবালি-মাখা কম্বল, নোংরা পরিচ্ছদ, ময়লা মাথা, শীতের ছাপ-ছাপ চামড়া-ফাটা দাগ,—তার সঙ্গে নিগ্রহের কৃশতা। এবার সহজে মিলে গেছি যাত্রীর জনতার সঙ্গে। এর আগে দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের কেউ কেউ আমাদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছে, এবার আমরা যদি ভিক্ষে করতে চাই, তবে আমাদের চেহারায় বেমানান হবে না। পাহাড় থেকে নেমে বড় স্বস্তিবোধ করলুম। গত তিন-চারদিনে সমান সহজ রাস্তা যেন ভুলে গেছি। আমরা বাসে চ'ড়ে বসলুম।

পিছনে প'ড়ে রইলো চন্দ্রগিরির আরণ্যক বন্য শোভা গুহাগহ্বরে, কন্দরে; পাহাড়তলীর নীচে নীচে জানোয়ার ও সরীসৃপরা তাদের চিরস্থায়ী বাসা নিয়ে আছে; আর এই পর্বতমালার কোন এক রহস্যলোকের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে বাগমতী,—যার এপারে ওপারে বহু অঞ্চলে আজও মনুষ্যপদচিহ্ন স্পর্শ করেনি। মনে পড়ছে অলকানন্দার কোন এক শাখা নদীর কথা। চলতি পথের থেকে কিছুদূরে যেখানে যাবার প্রয়োজন ঘটে না কারো। ভীরু

পায়ে গিয়ে নামলুম সেই নদীর কোলে প্রস্তর-শিলায়। কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে সেই নদী দুই বৃহৎ পর্বতের মাঝপথ দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোন মানুষ কখনো গিয়েছে সেখানে, তার কোন চিহ্ন নেই। উপর থেকে নামছে সেই জলধারা, তার দুরন্ত বেগ ছুটে এসে পাথরের উপরে ধাক্কা খেয়ে উৎক্ষিপ্ত ফেনায়িত হচ্ছে। বড় বড় মাছ উপর থেকে জলের সঙ্গে নীচে নেমে যাচ্ছে। বসন্তকাল পরিপূর্ণ সমারোহে নেমেছে ছোট নদীর দুই ধারে, পাহাড়ের গায়ে, বনময় গুহাগহ্বরের আশেপাশে। শৈবালাচ্ছন্ন পাথর আর প্রাচীন শিকড়ের পাশ দিয়ে বনবল্লরী উঠে গেছে মস্ত গাছগুলিতে। অজানা অনামা পুষ্পসম্ভার ঝুঁকে পড়েছে গাছ থেকে নদীতে। বড় বড় রঙীন পাখিরা ডাকছে। প্রকাণ্ড দুই ডানা মেলে নেমে এলো দুই লালমোহন। পাহাড়ের কোটরে ডিম পেড়েছে অপরিচিত পাখি। মস্ত পাথরখানার পাশে প্রকাণ্ড বিচিত্রবর্ণ সাপ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে আরো গিয়েছি এগিয়ে। মধ্যাহ্নের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় পাখির কূজনের মধ্যে মেলানো সরীসৃপের ডাক। নানাবর্ণের বন্য মাকড়সারা জাল বেঁধে ঝুলছে কাঁধের পাশে পাশে পাহাড়ে। দূরের বস্তির থেকে কখনো কোন গৃহপালিত পশু আসে না এই নদীতে জল খেতে। সম্পূর্ণ নিঃঝুম পাহাড়তলীর এই বন্যপ্রকৃতি। বিশ্বাস করেছি সেদিন ওইখানে দাঁড়িয়ে, আকাশপথের জ্যোৎস্নালোক থেকে নেমে আসে শুক্লপক্ষ দেববালার দল—ওরা এসে অবগাহন ক'রে যায় ওই নীলাভ জলধারায়, উঠে বসে ওই শিলাতলে,—তাদের দেহের শোভায় পাহাড়তলীর এই মায়াকানন রোমাঞ্চ-হরষে পুলকিত হয়। উপরে দূর ঈশান কোণের পর্বতগাত্র বেয়ে মানুষের চলার সঙ্কীর্ণ পথ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আর এই নীচে অদূরে পাথরের উপরে দেখেছি শুষ্ক রক্তের ধারা তখনও রক্তিমাভ এবং তারই অদূরে ঝোপের পাশে সদ্যহত শৃঙ্গজড়ানো হরিণের খণ্ডদেহ। হঠাৎ সন্দেহ হয়েছে আশপাশ থেকে আমাকে কোন একটা প্রাণী তাক করছে, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি অনুভব করতে পারছি,—অমনি একটি মুহূর্তে আমার সর্বশরীর ছমছমিয়ে এসেছে। আমি বাইরের লোক, এ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছি, ওদের কেউ একজন মুখ বুজে আমাকে লক্ষ্য করছে। সহসা সজাগ হয়েছি, আমার হাতে হাতিয়ার কিছু নেই। তখন ভারী পা দুটো টেনে উঠে আবার ফিরে গেছি।

বালু-পাথরে আকীর্ণ পথ ভেঙে আসতে মোটরবাসের লাগলো আধ ঘণ্টা। যেখানে নামলো সেখানকার কাছেই ছিল জলের কল। এখানে পৌঁছবার আগে

বাগমতীর পুল পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু প্রথমেই কাঠমাণ্ডুর চেহারা দেখে মন বড় বিষণ্ণ হলো। যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি ঘিঞ্জি—সমস্তটা মিলে কেমন যেন বুকচাঁপা সঙ্কীর্ণতা। প্রত্যেক চতুষ্কোণযুক্ত দোপাট্টা চালাঘরের ভিতরে যতই দৃষ্টি যাচ্ছে, কেমন যেন অস্বাস্থ্যের চিহ্ন, কেমন রুগ্নতা, কেমন একপ্রকার নোংরা অসুস্থ জীবনযাত্রা। কাছেই ত্রিপুরেশ্বরের মন্দির। কাঠের ওপর অমন চমৎকার কারুশিল্প, এমন অপূর্ব নক্সায় প্রত্যেক বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে—তা'র ছন্দ, তা'র মাত্রা, তার সুষমা ও সুসঙ্গতি,—দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের কপালগুণে নাগরিকদের অপরিষ্কার এবং বিশৃঙ্খল গৃহস্থালীর দিকে চেয়ে অত্যন্ত নিরুৎসাহ বোধ করলুম।

পথের উপরে পড়ে রয়েছে সিঁদুরমাখা শিবলিঙ্গ, তার পাশে হাঁড়িকাঠ—সেখানে টাট্‌কা রক্ত থিক্‌থিক্ করছে। এটা স্বাধীন দেশের একটা রাজপথ হলেও শ্রী ও শোভনতার উপর ভ্রূক্ষেপ কারো নেই। কোথাও গম্বুজ, কোথাও প্যাগোডা, কোথাও বা শাক্ত-মন্দির।

অত্যন্ত তীব্র রোদ, সুতরাং ঠাণ্ডা কলের জলে যেমন তেমন করে পথের ওপরেই সকলের আগে স্নান করে নিলুম। নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলুম। গলা ধ'রে গেল, মাথা ভার হলো। স্নান সেরে হাঁটতে হাঁটতে এসে আমরা অতিথিশালা খুঁজে বার করলুম।

কাঠমাণ্ডুর প্রকৃত নামটি কি, আমার জানা নেই। অনেকে বলে, এর মূল নাম কাষ্ঠমণ্ডপ তথা কাঠমণ্ডপ,—কাঠমাণ্ডু এদেরই অপভ্রংশ। আধুনিক কাঠমাণ্ডু সৃষ্টি করেছেন পরলোকগত মহারাজা চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর। রাজপথের ধারে তাঁর প্রস্তরমূর্তি। অদূরে কলকাতার লালদীঘির মতো একটি সরোবর - রাণীবাগ। সরোবরের ঠিক মাঝখানে একটি মন্দির,—অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দিরের মতন। রাণীবাগের ওপারে একটা ঘণ্টা ঘড়িঘর; যাকে বলে টাওয়ার ক্লক। চতুর্দিকে পাহাড়, মাঝখানকার এই উপত্যকায় হলো কাঠমাণ্ডু। এরই আশেপাশে ছোট ছোট পার্বত্য গ্রাম্য-শহর হলো, স্বয়ম্ভু, দক্ষিণ কালী, পাটান, নারায়ণথান, দত্তাত্রেয়, চৌবাহার ইত্যাদি। কিছু গৃহ-শিল্প, কিছু বা চাষবাস, এই হলো সাধারণ জীবিকা। এ ছাড়া চাকরি-বাকরির সুবিধা কম। ছেলেরা বড় হতে পারলে চোখ পড়ে পল্টনের দপ্তরে, মেয়েরা বয়স্থা হলে 'কেটি' হয়ে যাবার কামনা করে রাজসংসারে। যিনি রাজা, তিনি ধীরাজ নামে পরিচিত, প্রধান মন্ত্রী হলেন মহারাজা। ধীরাজ হলেন 'পাঁচ সরকার,' মহারাজা তিন 'সরকার'—যতদূর কানে এলো! এগুলো বাইরের লোকের কাছে কোন অর্থ বহন করে না, তাই এসব নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না।

চারিদিকে পর্বতমালা, মাঝখানে এই উপত্যকা নাকি ছিল এককালে এক বিশাল হ্রদ। এই হ্রদের জল যিনি তরবারির একটি আঘাতে বার করে দেন, তিনি হলেন নেপালবাসীর উপাস্য দেবতা মৈঞ্জু দেব। তরবারির সেই আঘাতেই বাগমতী নদীর সৃষ্টি। সেই থেকে এই উপত্যকা মানুষের বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। কাশ্মীরেও ঠিক এই গল্প চলে। সেখানে ছিল কশ্যপমুনির কৃপা। কশ্যপ-মীর, এই নিয়ে কাশ্মীর। শ্রীনগর প্রান্তের ডাল হ্রদটিকে নালিপথে বার করে দিলে খুব খারাপ কাজ হয় কিনা আমার জানা নেই। নৈনীতালেও তাই। নৈনীহ্রদের নীচে থাকতেন নয়নীদেবী,—এদিক থেকে তাঁর অবশ্য কোন কৃপা হয়নি।

আজ নেপালে বয়ে চলেছে নতুন হাওয়া, সুতরাং আগেকার কাহিনী ওর ইতিহাসের মধ্যেই থাক্। এই সেদিনও রাজার পক্ষে নেপালের বাইরে যাওয়াটা ছিল অমঙ্গলসূচক একটা গর্হিত কাজ। আজকে সেই ধারণা এক ফুৎকারে উড়ে গেছে। রাজসংসারে 'কেটি' হয়ে থাকতে পারলে মেয়েদের বরাত ফিরে যেতো। কিন্তু এই রেওয়াজও বোধ হয় এবার কমে এলো। নেপালের বুদ্ধি ছিল প্রাচীনপন্থী, জ্ঞান ছিল রক্ষণশীল, সংস্কারে আচ্ছন্ন—সমাজে, ধর্মে, শিক্ষায়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সেই কারণে মন ছিল পিছিয়ে। ফলে, ব্যাধি, অস্বাস্থ্য রাজনিগ্রহ এবং হতাশা কামড়ে ধরেছিল এতকাল ওদের সমাজ-জীবনকে। এই অবস্থায় বাঙালী গিয়ে পৌঁছেছিল নেপালে। তারা নিয়ে গিয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি। স্কুল-কলেজে, ডাকঘরে, রাজকোষে, সরকারী দপ্তরে, হাসপাতাল আর পূর্তবিভাগে এবং আইন আদালতে—যেখানে সেখানে ঢুকেছিল বাঙালী আমি যখন গেলুম, তখন দেখি প্রধানমন্ত্রী মহারাজার গৃহশিক্ষক, মুন্সী, চিকিৎসক, এমন কি তাঁর রন্ধনশালার অধিনায়ক সকলেই বাঙালী। বাঙলার অনেক বিপ্লবী দলের ছেলে এককালে নাম ভাঁড়িয়ে নেপালে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। বাঙালীরা আজো নেপালে খুব জনপ্রিয়। এই সেদিন পর্যন্ত ইংরেজরা ওদের ডাকবিভাগ দখল ক'রে রেখেছিল, ওদের ভালো-মন্দ নিয়ে গায়েপড়া অভিভাবকত্ব করতো এবং পাসপোর্টের নামে ভারতবর্ষকে নেপালের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিত না। ইংরেজ চলে যাবার পর শ্রীশগিরি ও চন্দ্রগিরির দেওয়াল অতিক্রম করা এখন সহজ হয়েছে। নতুন রাস্তা খুলেছে। ইংরেজের খয়ের-খাঁ যারা অর্থাৎ মহারাজার দল এতদিন পরে রাজ্যপাট তুলে স'রে পড়েছে। দক্ষিণের হাওয়া লেগেছে ওদের মনে। ওদের বাঁধন সব খুলে গেছে।

আগামীকাল পশুপতিনাথে শিবরাত্রির মেলা। আমি জ্বরে পড়েছি,

মাথা তুলতে পারছিনে। জ্বর বেড়েই চলেছে। পালিত মশাই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য-লাভ করেছেন, সোৎসাহে তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সরোবরের ধারে ধারে বায়ুসেবন করে ফিরছেন গলায় সেই সোনার হারছড়াটা ঝুলিয়ে। তাঁর বাঁ-হাতের দুটি আঙুল সেই হারগাছটা প্রায়-সময়েই ছুঁয়ে থাকে। গান তিনি জানেন না এই আমি জানতুম এবং গান তিনি যখন নিতান্তই গাইতে থাকলেন, তখনও বিশ্বাস করলুম, গান তিনি জানেন না।

হাসপাতালের বাঙালী এক ডাক্তারের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম। তিনি আমার চিকিৎসার ভার নিলেন। ভদ্রলোক একা থাকেন, সুতরাং পথ্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা ছিল। সে যাই হোক, একটি ঘর পেয়েছিলুম ভালো। তারই জানালা দিয়ে চেয়ে রইলুম কাঠমাণ্ডুর দিকে। আমার বেশ মনে পড়ে, এই জানলার ধারে ব'সে মহাপ্রস্থানের পথের একটি অনুচ্ছেদ লিখতে আরম্ভ করেছিলুম।

নেপালের ইতিহাস আমার ভাল জানা নেই। শুনেছি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ নেপালকে আক্রমণ করেন এবং নেপালরাজ অংশুবর্মার কন্যা ভৃকুটির সহিত তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। সেই থেকেই তিব্বতের সঙ্গে নেপালের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক যোগ ঘটে। আজও তিব্বতীগণের নিকট নেপালভূমি তীর্থস্থান, এবং প্রতি বছর শত সহস্র তিব্বতী নেপালের মহাবোধি, স্বয়ম্ভু ও নমোবুদ্ধায় প্রভৃতি মন্দির পরিক্রমার জন্য এসে জড়ো হয়। অতঃপর কোনও এককালে মুসলমান আক্রমণের ফলে বহু রাজপুত পরিবার পালিয়ে আসে নেপালে। সেও প্রায় ছয়শো বছর হতে চললো। তখন নেপালে ছিল মঙ্গোলীয় পার্বত্য জাতি। তারা শুধু শান্তিপ্রিয় নয়—তারা নিজের শিল্পকলা ও স্থাপত্য নিয়ে থাকতো। রাজপুতরা তাদের হাত থেকে শাসনভার তুলে নেয়। ফলে সেই মঙ্গোলীয় ও রাজপুতের সংমিশ্রণের ফলে গুর্খা জাতির উৎপত্তি। সেই গুর্খারা পশ্চিম নেপালে ক্রমে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং গুর্খা রাজ্যের পত্তন করে। অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে তারা এবং সমগ্র নেপালকে তারা শাসন করতে থাকে। আজও সেই তাদেরই রাজ্যপাট এবং তাদেরই প্রতিপত্তি। অবশ্য মাঝে মাঝে এখনও দুই দলের মধ্যে কলহের কথা শোনা যায়। একদল হলো গুর্খা নেপালী, অন্য দল হলো রাজপুত নেপালী। সে যাই হোক, নেপালের বহু অংশ আজও অনাবিষ্কৃত এবং উপেক্ষিত। দুর্গম ও দুরারোহ পর্বতমালার আশেপাশে উপত্যকা আছে, কিন্তু সেখানে বিরল বসতি। কোথাও চিরস্থায়ী তুষারের স্তূপ, কোথাও হিমবাহের আতঙ্ক, কোথাও বা ভীষণাকার তুষারবিগলিত জলপ্রপাত-

ঘেরা বৃক্ষলতা-তৃণহীন প্রস্তর প্রান্তর। এদেরই উত্তর সীমানায় রয়েছে কাঞ্চন-জঙ্ঘা ও গৌরীশৃঙ্গ। কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় দুশো মাইল পেরিয়ে গেলে নাম্‌চে-বাজার,—সেখান থেকে গেছে গৌরীশৃঙ্গের পথ। সেখানে গৌরীশৃঙ্গের একটি প্রাদেশিক নাম প্রচলিত।

কাঠমাণ্ডুর কেন্দ্র থেকে আন্দাজ আড়াই মাইল দূরে পশুপতিনাথ। মন্দিরের নামেই গ্রাম। যেমন কেদার-বদরি, যেমন জ্বালামুখী, যেমন বৈজনাথ। শহর থেকে মোটরবাস যায়, কিন্তু ভিড়ের চাপ ছিল বেশী। সেজন্য প্রবল জ্বর নিয়েও পরদিন আমাকে হেঁটে যেতে হলো। পালিত মহাশয়ের পুঁজি বোধ হয় কিছু ছিল, তিনি গেলেন মোটরবাসে। কথা রইলো মন্দিরে অথবা ফিরে এসে আবার দেখা হবে। পায়ে হাঁটা সুবিধা, কেননা ভ্রমণটা সত্য হয়। হিমালয়ের মধ্যে যখনই মোটরে ভ্রমণ করেছি, দেখেছি অনেক, কিন্তু উপলব্ধি সত্য হয়নি। পথে যাবার সময় রাজবাড়ি পড়ে বাঁদিকে। কিন্তু রাজবাড়ি বলতে যেমন উদ্যান সরোবর আর ফোয়ারার কল্পনা আসে, এ তেমন নয়। এ এক বিশাল ইমারত,—তার তুলনায় সামনের দিকে অবকাশ কমই। কোচ-বিহারের রাজবাড়ি, নাটোরের রাজবাড়ি, কলকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউস, দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন,—এরা চোখে স্বস্তি আনে। কিন্তু এ রাজবাড়ি একে-বারে নীরেট। শহরের উপর দিয়ে গেছে সেই ভীমপেডির রজ্জুপথ—যেমন দার্জিলিংয়ে। জনস্রোতের ভিতর দিয়ে চলেছি। জ্বরের তাড়নায় পথে বসেছি কয়েকবার। চোখ দুটো ছিল ঘোলাটে, তাতে দেখার অসুবিধা হয়েছে। ক্রমে আমরা এসে পৌঁছলুম বাগমতীর পুলের কাছে। অদূরে শ্মশানঘাটা। নদীর ওপারে গুহ্যেশ্বরীর মন্দির ও পীঠস্থান। পশুপতিনাথের মন্দির বাগমতীর তীরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূল মন্দির-চূড়া সোনার পাতে ঢাকা, রূপার তোরণ, এবং মন্দিরের বাইরে বিশালকায় এক কনককান্তি বলীবর্দ। পশুপতিনাথের আশেপাশে আরো অনেকগুলি মন্দির দাঁড়িয়ে। মন্দিরের চত্বর অনেকখানি এবং চতুর্দিক মার্বেল পাথরে মোড়া। মূল মন্দিরের ভিতরে পশুপতিনাথের কৃষ্ণকায় পঞ্চমুখী প্রস্তর-বিগ্রহ কষ্টিপাথরের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরটা, যেমন অনেক মন্দিরেই দেখি - অন্ধকার। ভিড়ের চাপকে রোধ করার জন্য মূল মন্দিরের চারদিকে চারটি দরজায় কাঠের বেড়া দেওয়া হয়। কিন্তু যাত্রীদলের প্রচণ্ড চাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভালো করে দেখতে দেয় না।

গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে মূর্তি নেই, আছে প্রস্তরশিলা, সোনার পাতে ঢাকা। ওটাই হলো মহাপীঠ—এখানে সতীর গুহ্যস্থান পড়েছিল। যেমন কামাখ্যায়

দেখে এলুম সতীর যোনিপীঠ—মন্দিরের ভিতরে গিয়ে কয়েকটি ধাপ নেমে অন্ধকারের মধ্যে সেই শিলাখণ্ড দর্শন। পশুপতিনাথে শৈবপূজা, কিন্তু গুহ্যেশ্বরীর পূজা হলো শাক্ত,—এখানে মোরগ ও পশুবলি হয়। শক্তি হিন্দু ও বৌদ্ধ এখানে মিলেছে। এই মিলন দেখা যায় নেপালের মচ্ছেন্দ্রনাথের দেবস্থানে। উভয় জাতির লোক এখানে পূজা দেয়। সম্রাট অশোক এসেছিলেন পশুপতিনাথে, তাঁর আমলের বৌদ্ধমূর্তি চারিটি এখনো এখানে বিদ্যমান। পাশে রয়েছেন মৈঞ্জুদেবের মন্দির—যাঁর তরবারির আঘাতে জলরাশি স'রে গিয়ে এখানকার উপত্যকার জন্ম হয়। এখানে প্রবাদ, মঞ্জুশ্রীদেব এসেছিলেন চীন দেশ থেকে। সেই কারণে চীন, তিব্বত ও নেপালের ধর্মীয় যোগ ঘনিষ্ঠ। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে বুধনাথ স্তূপে—তারা আসে কাঠমুণ্ডু পর্যন্ত সেই স্তূপের থেকে নির্গত পবিত্র জল নিয়ে যায় তারা চীনে ও তিব্বতে। দালাই লামা সেই জল স্পর্শ করেন।

শিবরাত্রির মেলায় এলো রাজার মস্ত শোভাযাত্রা। রাজদর্শন ঘটতে বিলম্ব হলো না। শিবিকায় এলেন রাজার পুরনারীরা, যাঁরা অন্তঃপুরিকা অসূর্যম্পশ্যা! তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন অমাত্যগণ এবং রাজপুরুষ। পালিত-মশাইকে সেই জনারণ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

কাঠমাণ্ডুর কাছে নেপালের কুচকাওয়াজের মাঠ বড় আধুনিক,—এদিকটায় এলে নব্য সভ্যতার কিছু স্বাদ মেলে। এর সীমানায় প্রাচীন নেওয়ারদের রাজধানী ছিল,—এর নাম ষণ্ডিখাল। এই নেওয়ারদের হাত থেকেই পরবর্তী-কালে গুর্খারা শাসনদণ্ড কেড়ে নিয়েছিল। এ ছাড়াও পরিভ্রমণের অঞ্চল রয়েছে সাটান ও ভাটগাঁও। এরা ছিল প্রাচীন নেপালের রাজধানী। সেখানেও নেওয়ারদের স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। যাত্রীরা নীলকণ্ঠের ধারে গিয়ে বিষ্ণুমূর্তি ও বসুধারা দর্শন করে আসে। অসুস্থ দেহ নিয়ে সেখানে আমি যেতে পারিনি।

পরবর্তী তিনদিন একটু বেশী জ্বরে অনেকটা যেন বেহুঁশ থাকতে হয়েছিল। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা ভ্রমণের মধ্যে এই আমার প্রথম ও শেষবারের অসুস্থতা। যাই হোক, ডাক্তার সে-যাত্রায় নিউমোনিয়া ও বিকারের লক্ষণ সন্দেহ করে নেপাল ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। শ্রীশগিরি ও চন্দ্রগিরির আন্দাজ কুড়ি মাইল পাহাড় আমাকে ঝাম্পানে যেতে হবে।

যেতেই হবে ঝাম্পানে। কিন্তু টাকা! ঝাম্পানের ওই অতিরিক্ত কুড়ি টাকা ত' আমার কাছে নেই! পালিত মশাই আহারাদি সেরে পান চিবোতে চিবোতে এসে আমাদের চেহারা দেখে ত' হেসেই খুন। একি, বাবা পশুপতি

নাথের পায়ে মাথা রেখে চোখ বোজবার চেষ্টা করছেন দেখছি!' সে কেমন করে হয়!

উনি একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলেন আমার দুই আঙুলের ফাঁকে। কিন্তু যে কারণেই হোক সিগারেটটা প'ড়ে গেল হাত থেকে। উনি সন্দেহ করে কাছে এলেন এবং একটু যেন ভয়ই পেলেন। আমি হাসছিলুম। পালিত মশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখুন, হারগাছটা আমার গলাতেই আছে, এটা এখনই বিক্রী করা চলে,—তাছাড়া এটা আপনারই বান্ধবীর জিনিস; কিন্তু ব্যাপারটা একটু 'ডেলিকেট্' ত' তাঁর জিনিস তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিলেই আমার মান রক্ষা হয়!

কথাটা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু কিছু ভাববার আগেই ডাঃ দাশগুপ্ত পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গম্ভীরভাবে পালিত মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঁর হাতে আমিই পঁচিশটি টাকা দিচ্ছি, ওতেই ওঁর হবে।

ফাইন্!—বলে পালিত মশাই লাফিয়ে উঠলেন।

ওই আমার প্রথম ঝাম্পানে চড়া। ফিরবার পথে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চোখ দুটো প্রায় বন্ধ করে চারজন মানুষের কাঁধের উপর যেন ভাসতে ভাসতে চললুম। থানকোট থেকে ভীমপেডি। দেহের মতো চোখ দুটোও কেমন একপ্রকার আচ্ছন্ন ছিল। চোখ বুজে নেই, চেয়ে নেই, ঘুমিয়ে নেই—ওই একরকম। খররৌদ্র ছিল মাথার ওপর। অমনি করে আমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আমার নিয়তি হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোনদিন তার বিরতি নেই। ওই একটা অস্বাভাবিক আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও যেন শুনতে পাচ্ছি আবার নতুন পাহাড়ের ডাক—ওরই ভিতর দিয়ে কেমন একটা রুক্ষ বন্য ক্ষুধার্ত কঠিন আত্মনিগ্রহের ডাক। ওই ডাক আমাকে কোনদিন কোথাও স্থির থাকতে দেয়নি।

আমার বহুকালের ধারণা, হিমালয় পরিভ্রমণকালে যদি কেউ অসুস্থ হয়, তবে ওখানকার নদীতে অবগাহন-স্নান করলে তার সব অসুখ সারে। সন্ধ্যার সময় ভীমপেডিতে পৌঁছে বাগমতীতে আমি স্নান করেছিলুম! ঠাণ্ডা হাওয়া আর ঠাণ্ডা জল সত্ত্বেও আমার শীত ধরেনি। বাড়ি যখন ফিরেছি, তখন আমি সুস্থ। সেই কথাটা জানিয়ে ডাঃ দাশগুপ্তকে তাড়াতাড়ি পঁচিশ টাকার মনিঅর্ডার পাঠিয়ে দিলুম। পালিত মশাই কলকাতায় ফিরে তাঁর গলায় ঝোলানো সোনার হারছড়াটা মালিকের হাতে অবশ্যই ফেরৎ দিয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রত্যর্পণে কিছু কৌতুকজনক আড়ম্বর ছিল। কিন্তু হারছড়া যিনি ফেরৎ পেলেন, সেই মহিলা আমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনে পালিত মশাইকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেননি!

দ্বিতীয়বার নেপালে গিয়ে পৌঁছই বিমানযোগে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে,—অর্থাৎ সাতাশ বছর পরে। এখন আর ভিক্ষু বৈরাগীর বেশ নয়,—পোষাকটা সাহেবী। কবি-বন্ধু শিউমঙ্গল সিং ওরফে 'সুমন' গৌচর বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন এখানকার ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে। উভয় উভয়কে দেখে উল্লসিত হয়েছিলুম। ভারতের 'প্রজাতন্ত্র দিবস' উপলক্ষে ভারত গভর্ণমেণ্ট আমাদের কয়েকজনকে এখানে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে আছেন ভারতপ্রসিদ্ধ তবলচি বন্ধুবর শ্রীমান্ চতুর্লাল, শরোদশিল্পী শ্রীমতী শরণরাণী এবং পাঞ্জাবের সুলেখিকা ও কবি শ্রীমতী অমৃত প্রীতম। আমি কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ, সেজন্য আমাকে 'মোড়লের' ভূমিকা নিতে হয়েছিল। কিন্তু এ-যাত্রা সেই সাতাশ বছর আগেকার ভিক্ষুবেশীর তীর্থযাত্রা নয়। দুঃখ, দুর্গতি, ব্যাধি, অনাহার ও দুর্দশা – এ যাত্রায় ছিল না। ছিল বিস্তৃত অট্টালিকার বিলাস-ব্যসন, রাজপুরুষগণের সঙ্গে মিলিয়ে নাচ-গান ও কাব্য-সাহিত্যের আসর; সভাসমিতি, গার্ডেন পার্টি এবং বিভিন্ন ভোজের ডাক, আনন্দ-বিহারের নানা আমন্ত্রণ ও সামাজিক সম্মেলন। এক সপ্তাহকাল আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, উল্লাসে কোথা দিয়ে যেন্ কেটে গেল।

কিন্তু ওদেরই ফাঁকে-ফাঁকে যখন পশুপতিনাথের মন্দির, মঞ্জুশ্রী, পাটান, ললিতপুর এবং হনুমানধোকার আশেপাশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছিলুম, সেই সময় একদিন দু'টি ভদ্রলোক আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। দু'জনকেই চিনলুম। একজন নরেন্দ্র মুস্তফী এবং অন্যজন সেই ডাক্তার দাশগুপ্ত,—সাতাশ বছর আগে যাঁরা আমার পরম শুভাকাঙ্খী ছিলেন। এঁদের কাছে আমি ঋণী। আরেকবার সানন্দে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে গেলুম।

যাই হোক, এই আনন্দের হাট ভেঙ্গে যাওয়ার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি সংবাদ পেয়ে বড় মর্ম্মাহত হয়েছিলুম। বন্ধুবর শ্রীমান্ চতুর্লালের মৃত্যু ঘটেছে দিল্লীতে। সে ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তবলচি। ইউরোপ আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, কানাডায়, জাপানে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে সে বারম্বার গিয়েছে এবং প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। তার মৃত্যুতে দিল্লীর বেতার কেন্দ্রের একটি অংশ পঙ্গু হয়ে পড়ে।

'সুমন' বছর দুই পরে কাঠমাণ্ডুর ভারতীয় দূতাবাসের কাজ ছেড়ে দেয়। এক সময় আমার মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ কালে উজ্জয়িনীতে তার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে যায়। সে তখন বিক্রমাদিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। সে আজন্ম কবি। হিন্দি সাহিত্যে তার প্রতিষ্ঠা অবিসম্বাদিত। কাব্য, সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তা'র পরম অনুরাগ অনেক সময় আমাকে অভিভূত করত।

॥ ৭ ॥

হরিদ্বার থেকে আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ মাইল হলো দেরাদুন। এখানে স্টেশনের কাছেই মনসা পাহাড়ের সুড়ঙ্গ, এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ট্রেন চ'লে যায় ভীমগোড়া পেরিয়ে এঁকে-বেঁকে সত্যনারায়ণের দিকে। কিছুদূর এগিয়ে রায়ওয়ালার কাছে রেলপথ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ডানদিকে গঙ্গাপথ, —হৃষিকেশে গিয়ে গাড়ি থামে। বাঁদিকে দেরাদুনের পথ। এটি অরণ্যলোক। দেরাদুন উপত্যকার অরণ্য হলো সুপ্রসিদ্ধ। হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কাকার, বিবিধ সরীসৃপ, লেপার্ড ও চিতাল, প্যান্থার ও শম্বর,—এরা আশেপাশের অরণ্যে চিরস্থায়ী। কিছুদিন আগেও এই পথের ধারে চিতাবাঘের দৌরাত্ম্য ছিল অতি প্রবল। তীর্থযাত্রীরা দল বেঁধে না গেলে ভয়ের কারণ ছিল। এখন আর সেদিন নেই। অরণ্য প্রায় তেমনি আছে, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার ভিতর দিকে স'রে গেছে। জায়গা দখল করেছে শ্রেষ্ঠ জন্তু—অর্থাৎ মানুষ!

আমরা ট্রেনেই যাচ্ছিলুম। এটা শিবলিঙ্গ পর্বতমালার পাদমূল। সুতরাং দেরাদুনে পৌঁছবার আগেই পাহাড়ী বনজঙ্গল চারিদিক থেকে বেষ্টন করে। এই বন গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে পূর্বে ও পশ্চিমে। পূর্বে গঙ্গার মূল প্রবাহ এবং পশ্চিমে যমুনার ধারা। এই উভয় নদীর মাঝখানে এবং দক্ষিণে প্রায় শাহারাণপুর জেলার সীমানা অবধি এই উপত্যকা কমবেশী দু'শো মাইল পরিধি নিয়ে অরণ্য-বেষ্টিত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাংড়ার ন্যায় দেরাদুন উপত্যকাও পশুশিকারের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। অরণ্যের ভিতরে ভিতরে শিকারীদের জন্য ডাকবাংলো পাওয়া যায়।

আমার পক্ষে মুশকিল এই, চলতি অর্থে আমি 'টুরিস্ট' নই, সেজন্য আনুপূর্বিক তথ্যের দিকে আমার স্বভাবতই ঝোঁক কম। আমি এসেছি নিশ্বাস নিতে নতুন দেশে, নতুন পটভূমিতে। দেরাদুনের চাউল অতি সুন্দর ও সুস্বাদু, কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। এ অঞ্চলে ঔষধিবন হলো বিশাল, এবং লতাগুল্ম ও শিকড়ের গবেষণার জন্য মস্ত এক সরকারী কলেজ এখানে প্রসিদ্ধ। বেশ মনে পড়ে, আমরা সেখানে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা যাপন করলেও আমাদের কৌতূহল মেটেনি। এখানে দেওদার শাল চীড় হলুদ তুন শিশুম—ইত্যাদি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা অনেকগুলি চা-বাগান দেখে বেড়িয়েছিলুম।

দেরাদুন স্টেশনে নামলে রাঁচিকে মনে পড়ে। দুই থেকে আড়াই হাজার ফুট উঁচু সমুদ্রসমতা থেকে, কিন্তু বোঝবার জো নেই। আমার চোখ ছিল এখান থেকে প্রধান দুটি পথের দিকে। একটি গেছে রুড়কি, অন্যটি চক্রতা। কিন্তু কোনো পথটিই নিতান্ত সহজ নয়। চক্রতা এখান থেকে কমবেশী ষাট মাইল পথ। আন্দাজ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত গেলে শাহারাণপুরের পথের সঙ্গে মেলে। তারপর সেখান থেকে আরো ত্রিশ মাইল। কোটদ্বার থেকে যেমন লান্সডাউন, তেমনি শাহারাণপুর রোডের ওই সংযোগ থেকে চক্রতার পথ গিরিগাত্র বেয়ে চ'লে গেছে চক্রতার দিকে। পথ উঠেছে ঘুরে ঘুরে চড়াইয়ের পর চড়াই পেরিয়ে। গিরিনদী, ঝরনা, উত্তরে তুষারশুভ্র হিমালয়ের বিস্তৃত শোভা, নীচের দিকে অরণ্যবেষ্টিত দেরাদুনের বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র। পথে পড়ে চোহারপুর, তারপর যমুনার পুল। এই পুল পেরিয়ে একদিকে চ'লে গেছে নাহান রোড, অন্যদিকে মোটরপথ চক্রতার দিকে। ইংরেজ আমলের ভারত গভর্নমেণ্ট কোনোদিন গাড়োয়ালীকে এবং গুর্খাকে বিশ্বাস করেনি। সেজন্য তা'রা এই চক্রতায় এবং লান্সডাউনে সৈন্যদলকে স্থায়ীভাবে মোতায়েন ক'রে রাখতো। পাঠানকে তা'রা বিশ্বাস করেনি, সেজন্য সমগ্র পাঞ্জাব এবং সীমান্তে অতগুলি গোরা ছাউনী। অথচ এই গাড়োয়ালী, গুর্খা এবং পাঠানদের মতো নির্ভরযোগ্য যোদ্ধাও তা'রা আর ভূভারতে খুঁজে পেতো না। ইংরেজ আজ নেই, কিন্তু গুর্খা সৈন্য পাবার জন্য তাদের আকুলি-বিকুলি থেকে গেছে।

চক্রতা প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে। এখানে বেড়ানো যায়, কিন্তু বসবাস করা চলে না। সৈন্যসামন্তের পরিবারেরা মাঝে মাঝে এসে বাস করে এবং তা'র জন্য দেহাতীদের ছোটখাটো বাজার বসে। প্রা: জনের সীমানাটা পেরোলে আর কোথাও কিছু নেই। সৈন্যদলের ব্যারাকের বাইরে কিংবা দপ্তরের সীমানা ছাড়িয়ে না আছে সমাজ, না বা কোনো আত্মীয়-গোষ্ঠী। ফলে, একবেলা থাকলেই হাঁপিয়ে ওঠে মন। কার্তিক মাস পড়লেই দুরন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া আসে এই চক্রতার পথে কিন্তু যমুনার বন্য ও পার্বত্য শোভা মনকে আগাগোড়া কেমন যেন অভিভূত ক'রে রাখে। চক্রতার পরেই কইলানা অঞ্চল। এটি চক্রতারই অংশ, কিন্তু কইলানা 'নেক্-এর' দ্বারা পৃথক। দুটি মিলিয়ে এক, কিন্তু দুটি বিচ্ছিন্ন। কলকাতা এবং ভবানীপুর,—মাঝখানে চৌরঙ্গী।

দেরাদুন থেকে আন্দাজ পঁয়ত্রিশ মাইল দূর হলো হরিপুর। হরিপুরের সামনে হিমালয়ের নিসর্গ দৃশ্য পথচারীকে আনন্দে স্তম্ভিত করে। হিমালয়

পেরিয়ে মর্ত্যে প্রথম নেমেছেন যমুনা। ওখানে গঙ্গার আবির্ভাব হলো হরিদ্বারে, এখানে কালিন্দীর আবির্ভাব ঘটলো হরিপুরে। যেমন আমরা দেখে এসেছি আলমোড়ার উত্তর প্রান্তে বৈজনাথ,—সেখানে গোমতীর প্রথম অবতরণ ঘটছে মর্ত্যলোকে। হরিপুরের প্রান্তে কালসি অঞ্চলে সম্রাট অশোকের শিলালিপি অতি প্রসিদ্ধ। সেখানে মোট চৌদ্দটি অনুজ্ঞা প্রস্তরগাত্রে খোদিত রয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সেই আবহ এখানকার জনশূন্য পার্বত্য প্রান্তরে নীলাভ আকাশের নীচে প্রখর রৌদ্রে আজও যেন অনির্বচনীয় গীতি-কাব্যের ব্যঞ্জনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার প্রখর অতি-আধুনিক মন কোথাও কোনো প্রাচীনের চিহ্ন লক্ষ্য করলেই যেন সমগ্র সত্তা দিয়ে লেহন করতে থাকে।

দ্বাপরযুগে আচার্য দ্রোণ তাঁর একটি অস্ত্রশিক্ষা শিবির স্থাপনার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এখানে ওখানে। অবশেষে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা পেরিয়ে উপগিরি ও বহির্গিরির মাঝামাঝি দেওদার পর্বতের কোলে এই সুবিশাল উপত্যকাটি তিনি বেছে নিলেন। দ্রোণাচার্যের আশ্রম এখানে ছিল ব'লেই এ অঞ্চলের নাম হয় ডেরাদ্রোণ, ওরফে দেরাদুন। প্রাচীন হস্তিনাপুর থেকে দেরাদুন বেশী দূরে ছিল না। এই উপত্যকার ভিতর দিয়ে পরবর্তীকালে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। পৌরাণিক কাল থেকে আধুনিক ইতিহাসের কাল অবধি অনেক ঝড় ব'য়ে গেছে এই দেরাদুনে। এই উপত্যকা বরাবরই ছিল গাড়োয়ালের অধীনে। সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে এলো মোগল। শাহজাহানের সেনাপতি খালিলুল্লার সঙ্গে গাড়োয়ালরাজ পৃথ্বীশার লাগলো যুদ্ধ। রাজা সন্ধি করলেন তাদের সঙ্গে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে শতাব্দীর শেষভাগে গুরু রাম রায় এলেন দেরাদুনে। মোহন গিরি-সঙ্কটের কাছে গুরু রাম রায় তাঁর ভক্তগণকে নিয়ে আবাস রচনা করলেন। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটাবার চেষ্টায় তিনি যেদিন প্রথম দেরাদুনে পা দিলেন, সেই দিনটিকে স্মরণ ক'রে আজও প্রতি বছর এখানে 'ঝাণ্ডা' উৎসব-মেলা হয়ে থাকে। গুরু রাম রায়ের মন্দির—যেটি মোগল স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত—সেটি এখানে অতি প্রসিদ্ধ। এখানে গুরুর শয্যাদ্রব্য ও চিতাভস্ম সুরক্ষিত রয়েছে। গুরু রাম রায়ের শিষ্যসেবকদের এখানে বলা হয়ে থাকে 'রামরাইয়া।'

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড রাজনীতিক দুর্গতি দেখা দেয় এই দেরাদুনে। 'এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল।' আফগান সেনাপতি নাজিবুদ্দৌলা এবং তাঁর নিষ্ঠুর নাতি গোলাম কাদির দেরাদুন আক্রমণ ক'রে রক্তের বন্যা

বইয়ে দেয়। এই সময় দেরাদুন ঐশ্বর্যে ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। নাজিবুদ্দৌলা ছিলেন শাহারাণপুরের শাসনকর্তা। তিনি শিবলিঙ্গ পর্বতমালা পেরিয়ে এসে দেরাদুন আক্রমণ করেন। এই সময় গাড়োয়ালের রাজা এবং দেরাদুনের অধিপতি রাজা ফতে শা আপন গুণ-গরিমার জন্য চারদিকে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। কিন্তু রোহিল্লা দলের শাসন ও সেনাপতি নাজিবুদ্দৌলা প্রতিবেশীর এই সমাদর বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। রক্তপাত ঘটলো সামান্যই। দেরাদুন তিনি অধিকার করলেন। কিন্তু সে মাত্র অল্পদিন। তারপরেই নাজিবুদ্দৌলার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর ফতে শা যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন—সেই সব রাজপুত ও গুজর সম্প্রদায়—যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য বহির্ভারত থেকে আসতো, এবং পাঞ্জাবের শিখরা অথবা নেপালের গুর্খারা—একে একে এই উপত্যকার উপর হানা দিতে আরম্ভ করলো। দেখতে দেখতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে দেরাদুনের দুর্গতি উঠলো চরমে। শ্মশানে পরিণত হোলো উপত্যকা। কিন্তু এর পরেও শেষ হয়নি। হিমালয়ের ওই পাথর রক্ত-রাঙা হয়ে উঠেছে বার বার শিখ-সর্দার বুঘেল সিং এবং পাঠান সেনাপতি গোলাম কাদিরের তরবারির খোঁচায়। লুট করেছে উভয়ে। হত্যা করেছে প্রাণের পুলকে। আগুন জ্বালিয়ে উল্লাস করেছে দুজনে। অতঃপর গোলাম কাদির গরুর রক্ত নিয়ে গুরু রাম রায়ের মন্দিরকে রঙীন ক'রে তুলেছে।

গোলাম কাদিরের পরে এলো গুর্খা আক্রমণ। তারা জাতিতে হিন্দু কিন্তু নিষ্ঠুরতায় গোলাম কাদিরকেও হার মানালো। গুর্খারা জয় করলো সমগ্র কুমায়ুন, পরে দেরাদুন। তা'রা বিধ্বস্ত করলো সমগ্র গাড়োয়ালকে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে দেরাদুনের পথের উপর রাজা প্রদ্যুম্ন শাকে হত্যা করলো। অবশেষে গুর্খারা কেমন ক'রে ইংরাজের নিকট পরাজিত হয় এবং গাড়োয়ালরাজ সুদর্শন শা কিরূপে ইংরাজের সাহায্য নেন, সেকথা আমি আগেও ব'লে এসেছি, পরেও সামান্য বলবো।

দেরাদুনে গুর্খাদের রাজত্বকালটুকু কেমন কলঙ্কের মসীলিপ্ত হয়ে রয়েছে সে সম্বন্ধে দু' একটি কথা এখানে বলি। ওরা যখন এই উপত্যকায় এসে কুকৃরি ও বন্দুক হাতে নিয়ে পথে ঘাটে প্রাণের আনন্দে হত্যা ক'রে বেড়াতে লাগলো, তখন উপত্যকার প্রায় সব নরনারী পালাতে লাগলো এখানে ওখানে। কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতে না পেরে গুর্খারা হরিদ্বারের বাৎসরিক মেলায় গিয়ে গাড়োয়ালী ছেলে ও মেয়েকে বিক্রি ক'রে আসতো। একটি ফুটফুটে ছেলে পঁচাত্তর টাকা, একটি সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়ের দাম দেড়শো টাকা। কৌতুকের বিষয় ছিল এই যে, সেই মেলায় একটি ঘোড়া পাওয়া যেতো আড়াই শো টাকায়।

দেরাদুন থেকে মাইল পাঁচেক এগিয়ে টনস নদীর কাছাকাছি পাওয়া যায় একটি 'ডাকাতে গুহা।' ডাকাতের দল কোথাও নেই বটে, তবে এখানকার নিরিবিলি নিভৃত চেহারাটার মাঝখানে এসে দাঁড়ালে যে একটু গা-ছমছমে ভাব হয় না তা নয়। এখানে নদীর জল সহসা নুড়ি-পাথরের তলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আবার কিছুদূর গিয়ে প্রবাহের আকারে দৃশ্যমান হয়। আশেপাশে প্রাকৃতিক শোভা মনের মধ্যে কাব্যের ব্যঞ্জনা আনে সন্দেহ নেই।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না, দেরাদুন শহর থেকে রাজপুর বোধ হয় আন্দাজ মাইল নয়েক পথ। এই পথ বাঁধানো, এবং মোটর চালনার পক্ষে অতি উত্তম। এই রাজপুরের কাছাকাছি গন্ধকজল ও গরম জলের ঝরনা দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্র গাড়োয়াল কুমায়ুন এবং পাঞ্জাবের বহু পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রকার ধাতব এবং উত্তপ্ত জলের ঝরনা শত শত। কিন্তু এখানে এর পরিবেশটি বড় মধুর এবং আনন্দদায়ক। একটি গুহাশীর্ষ থেকে অবিশ্রান্ত জলধারা নামছে, এ দৃশ্যটি দৃষ্টিকে মুগ্ধ ক'রে রাখে। এই দৃশ্যটিকে যাঁরা 'সহস্রধারা' নামে প্রথম অভিহিত করেছেন তাঁদের রসবোধকে তারিফ করি বৈকি। চারিদিকে অজস্র লতাগুল্মের ভিড়, ঋতুর মরসুমে চারিদিকে নানা ফুলের সমারোহ, শরতে-বসন্তে নেমে আসে হিমালয়ের নানা রঙীন পাখি—আর তাদের মাঝখানে এই নিভৃত কাব্যকাননে শান্ত মৃদু ঝরনার ঝরঝরানি শব্দ অনেকটা যেন গীতিময়।

শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে গারহি গাঁও ছাড়িয়ে কয়েকটি চা বাগান ও ফরেস্ট রিসার্চ কলেজ পেরিয়ে গেলে শীর্ণ একটি স্রোতস্বিনীর নীচে তপোকেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরটি হোলো একটি মস্ত গুহার মধ্যে, নদীর কোলের ভিতরে। এটি এখন এক বাঙ্গালী পূজারীর দখলে। তিনি গেরুয়া পরেন, গল্পগুজব করেন এবং পান-সিগারেট খান্। অনেকে বলে, এ অঞ্চলে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম আমরা। ভিতরে কয়েকটি মূর্তি ও দেবলিঙ্গ। ভারতের সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমনি প্রতি বছরে শিবরাত্রির দিন মস্ত মেলা বসে। মেলা হলো মিলনের কেন্দ্র। একটি মেলার তারিখ ধ'রে আসে শত সহস্র নরনারী। ভারত সংস্কৃতির প্রধানতম প্রতীক হলো দেশদেশান্তরের মেলা। মেলায় দাঁড়িয়ে আজও ডাক দেওয়া যায় বিশাল ভারতের জনসাধারণকে। তপোকেশ্বরের ওপারে আছে দেরাদুন মিলিটারী কলেজ। ভারতের যাঁরা ভবিষ্যৎ সমর-নায়ক হবেন, তাঁরা বালককাল থেকে এখানে যুদ্ধবিদ্যা ও চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন। খোঁজ ক'রে দেখেছি, এখানে নিয়মানুগত্যের শিক্ষা অতিশয় কঠোর; এবং জীবনযাত্রার প্রণালী অতিশয় রুক্ষতার সঙ্গে শেখানো হয়ে থাকে। এর জন্য

মনে মনে তারিফ করেছি। মহাভারতের আচার্য দ্রোণ যে এখানে অস্ত্রশিক্ষা দান করতেন, তা'র সঙ্গে আজকের এই একাডেমির মিল আছে বৈকি। চারিদিকে পাহাড় আর অরণ্য; দুই পাশে দুই নদী,—আর মাঝখানে এই বিশাল উপত্যকা। অস্ত্রবিদ্যা ও রণকৌশল শিখবার উপযুক্ত স্থান, সন্দেহ নেই।

দেরাদুনের আর দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার ভালো লেগেছিল। এমনি নিরিবিলি পাহাড় আর অরণ্যের মাঝখানে যদি কেউ বালক-বালিকাদের সৎশিক্ষা দানের কথা ভাবে তবে সেটি আনন্দের কথা বৈকি। পরলোকগত এস আর দাশ মহাশয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় বালকদেরকে কেমন ক'রে গ'ড়ে তোলা যায়, সে কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি এই প্রকার ভাবনা নিয়ে বহু বছর আগে দেরাদুনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেখানে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল বালক শুচিতাসম্পন্ন বিদ্যালাভ করতে পারে। স্বর্গত দাশ মহাশয়ের এই দুন্ স্কুল ছাড়াও মেয়েদের জন্য আরেকটি বিদ্যালয় রয়েছে, তা'র নাম কন্যা গুরুকুল। এই বিদ্যালয়টি পার্বত্য মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, রাজপুরের পথে। শীতের দিনে এখানে প্রবল ঠাণ্ডা, আবার গরমকালে স্নিগ্ধ। এই বিদ্যালয়টি প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচুতে,—অবশ্য সমুদ্রসমতা থেকে। কিন্তু চারিদিকের বন্য পার্বত্য শোভার দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাঙলার ছেলেমেয়েরা যে কত দুর্ভাগ্য, এবং একশ্রেণীর পিতামাতা যে কী অদূরদর্শী,—সেকথা বুঝতে পারি যখন দেখি ভারতের সকল প্রদেশই আজ শিক্ষা স্বাস্থ্য চরিত্রগঠন এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় ছেলেমেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। উত্তরপ্রদেশে শতকরা আশীটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য ভালো, একথা শুনলেও আনন্দ পাওয়া যায়। কন্যা গুরুকুলের মতো বিদ্যালয় দেখে এসেছি শিমলায়, দার্জিলিংয়ে, কার্সিয়াঙে, কালিম্পঙে এবং শীলঙে। কিন্তু এমন আনন্দদায়ক পরিবেশ সহসা চোখে পড়ে না। এখানে বালিকাদের বয়স দশ বছরের বেশী হ'লে আর ভর্তি করা যায় না—এই নিয়ম। অনেকটা আশ্রমিক বিধি অনুযায়ী বালিকারা এখানে বিদ্যালাভ করে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেরাদুনে অনেকগুলি।

দেরাদুন স্টেশন থেকে কিছু দূরে সেই জৈন ধর্মশালাটা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে। বাঙালী হোটেল একটি ছিল, এখনও হয়ত আছে, কিন্তু ধর্মশালার আবহাওয়াটা আমার ভালো লাগে। কাঠকয়লা আর পেন্সিলে লেখা অসংখ্য নাম আর ঠিকানা,—একটুখানি আবেদন, একটি করুণ মিনতি,—আমাকে মনে রেখো! এ মিনতি কোথাও বাদ যায়নি। পাথর কেটে এমনি ক'রে নাম-ধাম

লেখা আছে কত দেশের কত মন্দিরে। এ মিনতি দেখে এসেছি কুতব মিনারের চূড়ায়, আবু পাহাড়ের নীচে, দ্বারকার ধর্মশালায়, বোম্বাই-সমুদ্রগর্ভের হস্তীগুহায়, অজন্তায়, রামেশ্বরমে, ভুবনেশ্বরে, রাজস্থানের সাবিত্রী পাহাড়ে, কোথাও বাদ যায়নি। শুধু, মনে রেখো। পৃথিবীর পট থেকে একদিন মুছে যাবো মনে-মনে জানি, কিন্তু আমি যে ছিলুম, এই সংবাদটুকু রেখে যেতে চাই! যদি ধর্মশালার এই দেওয়ালের দিকে তোমার চোখ পড়ে—জানি পড়বেই এক সময়ে,—তবে আমাকে মনের কোণে একটু ঠাঁই দিয়ো! যাই হোক সম্প্রতি আরও দুই একটি আধুনিক ধর্মশালা এখানে ওখানে নির্মাণ করা হয়েছে।

হরিদ্বারের ওপারে চণ্ডীপাহাড়ের নীচে গঙ্গার মূলধারার তীরে দাঁড়ালে চোখ পড়ে সোজা উত্তরে,—বদরিনাথের তুষারশুভ্র চূড়া এত দূরে থেকেও চিকচিক করে। মনসা পাহাড়ে কিংবা চণ্ডীর মন্দিরে দাঁড়ালে ত' কথাই নেই। একটি কাক যদি উড়ে যায়, তবে আকাশপথে হয়ত পঁচিশ মাইলের বেশী হবে না, কিন্তু পথ ধরে গেলে দুশো মাইল। শোভা দেখতে চাও ত' দূরের থেকে, নৈলে পায়ে হাঁটা পথ প্রাণান্তকর। পাহাড় হোল শক্তির অগ্নিপরীক্ষা।

দেরাদুন থেকে আমরা জনতিনেক যাচ্ছিলুম মুসৌরীর দিকে। হেমন্তকাল। ঠাণ্ডা হাতাসে শুষ্কতার টান ধরেছে, 'কোল্ড-ক্রীম' মুখে মাখবার সময় এসেছে। 'চেঞ্জাররা' পাহাড়পর্বত থেকে বিদায় নিচ্ছে একে একে। তারা হয়ত বোঝে না, পর্বতবাসের পক্ষে উপযুক্ত সময় এইবার আসন্ন। যত ঠাণ্ডা, যত হাওয়া এবং যত রৌদ্র—তত স্বাস্থ্যশ্রী। বস্তুত, অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অবধি মুসৌরী, নৈনীতাল, আলমোড়া, দার্জিলিং প্রভৃতি পার্বত্য শহরে বসবাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠকাল। কিন্তু বাঙালীর সীজন্ শেষ হয় অক্টোবরের সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং আমরা যাচ্ছিলুম সীজ্নের পরে। আমাদের প্রাণের টান ভিন্ন রকমের। একজন সঙ্গী বললেন, বেশ নতুন লাগছে।

নতুন, সন্দেহ নেই। যতবার এই প্রকার পথে এসেছি—নতুন। গৌহাটি থেকে রংপোর পথ, কাল্কা থেকে ধরমপুর, জম্মু থেকে বানিহাল, মণ্ডি থেকে কুলু, চম্পা থেকে ডালহাউসী, কাঠগোদাম থেকে ভাওয়ালী, শুক্না থেকে তিনধরিয়া,—চিরকাল নতুন। যারা যায়নি তারা দুর্ভাগ্য,—যারা গিয়েছে তাদের মনে কোনোদিন দাগ মুছবে না! আমরা এগোচ্ছি রাজপুরের কাছাকাছি। মসৃণ পথে চলেছে আমাদের মোটরবাস। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, দেরাদুন থেকে মোটরপথে মুসৌরী বোধ করি মাইল বাইশেক হবে।

আট-ন' মাইলের পরে গিয়ে এক সময় পড়ে রাজপুর। বছর পঁচিশেক আগে ঘোড়ায় চড়ে যাবার একটা সহজ পথ ছিল দেরাদুন থেকে মুসৌরী, কিন্তু সে পথে এখন আর কেউ যায় না।

দ্রোণাচার্যের কাল থেকে এই পর্বতটির নাম দেওয়া হয়েছে দেওদার পর্বত। শিবলিঙ্গ পর্বতমালা এবং দেওদারের মাঝখানে দেরাদুনের বিশাল উপত্যকাটা চোখে পড়ে রাজপুর ছাড়িয়ে গাড়ি যখন চড়াই পথে উঠতে থাকে। বাঁধানো মোটরপথ অতি চমৎকার ; নৈনীতাল দার্জিলিং মনে পড়ে। মুসৌরী পাহাড়ের পুবদিকে অনেক নীচে দিয়ে চলেছে গঙ্গা, এবং পশ্চিমে যমুনার ধারা। হিমালয়ের শত-সহস্র পাহাড়ের নামে শত সহস্র রূপকথা লোকমুখে প্রচলিত। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। এই দেওদার পর্বতের চূড়ায় থাকতো নাকি এক দানব,—নাম মানাসুর। তারই অপভ্রংশ হলো মুসৌরী। অনেকে বলে, এই যে এখানে অনেক অঞ্চলে মনসুরি বৃক্ষ দেখা যায়, এর থেকেই নাকি মুসৌরী নাম প্রচলিত।

রাজপুর পর্যন্ত পথ মোটামুটি সমতল। তারপর চড়াই আরম্ভ হয়। চমৎকার পথ, কিন্তু বেণ্ডগুলির সংখ্যা বেশী, সেজন্য সংঘর্ষ ও অপঘাতের আশঙ্কা থাকে। এই কারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখানে একমুখী যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করেছেন। ওঠবার সময় চড়াই এখানে অত্যন্ত দুঃসাধ্য মনে হতে থাকে, এবং নামবার সময়ও তেমনি ভীতিজনক। আমাদের মোটরবাস তার সমস্ত শক্তি এবং হিংস্র আর্তনাদ প্রকাশ করা সত্বেও ধীরগতিতে উপরে উঠছিল। পায়ে হেঁটে যারা এক-আধজন ঠুক ঠুক করে আসছে, মোটরের মধ্যে বসেও তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসে। আমার মনে হয়, এই পথটিকে অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য করে তোলা দরকার।

একটির পর একটি 'বেণ্ড' আমরা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। পিছন দিকে দেরাদুনের বিস্তৃত উপত্যকা ছবির মত হয়ে আসছে। যত উঁচুতে উঠি, ততই বিস্তার, ততই ব্যাপকতা। চড়াই যত ওঠে, চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য পদ্মের মতো এক একটি যেন দল মেলতে থাকে। দূরদূরান্তরে ছুটে যাচ্ছে দৃষ্টি। আলমোড়া, নৈনীতাল, গাড়োয়াল,—প্রত্যেকটি পার্বত্য জেলা ; পাহাড়ের পর পাহাড়, দিগ্‌দিগন্ত অবধি প্রসারিত। পথের পাশে কোথাও প্রপাতের শব্দ, কোথাও গিরিগাত্র বেয়ে নামছে ঝরনা, কোথাও বনময় ছায়ান্ধকারে মৃদু কলতান। উপরে রৌদ্র প্রখর, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস প্রখরতর। চুপ করে বসে আছি বলেই বোধ হয় শীত-শীত করছে। অন্যান্য পাহাড়ী শহরের মতো

এখানেও 'টোল্‌ট্যাক্স' দিতে হয়। আমাদেরও দিতে হলো মাথা পিছু দেড় টাকা। ঝরিপানির 'চেকপোস্টে' গিয়ে ট্যাক্সের রসিদটি আবার না দেখালে চলে না। ঝরিপানি ছাড়িয়ে খানিকটা দূর গেলে নেপাল মহারাজার প্রাসাদটি চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাসাদ বলতেই তার ছবি ফোটে মনে, বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ঝরিপানি ছাড়িয়ে গেলে আর একটি ছোট জনপদ পাওয়া যায়। নাম বার্লোগঞ্জ। এখানে একটি কলেজ এবং শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমাদের গাড়ি এলো একটি ঝোলাপুল পেরিয়ে। তলা দিয়ে তার নদী চলে গেছে দেরাদুনের দিকে।

মুসৌরী শহর বটে, কিন্তু সমগ্র পাহাড়টিকেই এখন মুসৌরী বলা হয়ে থাকে। দেওদার পর্বতের নাম মানুষ কবে ভুলে গেছে তার ঠিক নেই। বার্লো-গঞ্জের পরে আসে কুলরি বাজার; এখান থেকে আরেকটি পথ চলে গেছে লাণ্ডুরের দিকে। লাণ্ডুরের দিকে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে মস্ত একটি ঘণ্টাঘর। এই ঘণ্টাঘড়ি ঘরটি ঠিক মুসৌরী এবং লাণ্ডুরের মধ্যপথে অবস্থিত।

বাস থেকে নেমে মালপত্র কুলীর মাথায় দিয়ে আমরা উপর দিকের পথ ধরে চললুম। এ সময়টা সুবিধা। হোটেলের দাম যেমন সস্তা, জায়গাও মেলে তেমনি প্রশস্ত। ধর্মশালা মুসাফিরখানা—কোনোটারই অভাব নেই। আর্যসমাজ মন্দিরেও অনেক রকম জায়গা পাওয়া যায়। এমন কি বিনামূল্যে আহার ও আশ্রয়। কিন্তু আমাদের পছন্দের জাত আলাদা। অবশেষে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় পছন্দসই একটি হোটেল পাওয়া গেল। তিন-চার খানা ঘর নিয়ে থাকলেও দৈনিক দু'টাকার বেশী লাগবে না এবং আহারাদি আমাদের ইচ্ছামতো। হোটেল-মালিক হলেন এক পার্শী ভদ্রলোক। আমরা ভিন্ন তাঁর আর কোনো বোর্ডার বর্তমানে নেই। এই রকমটিই আমরা চেয়েছিলুম। আমরা এখানে গোবর্ধন নামক জনৈক গাড়োয়ালী পাচককে নিযুক্ত করেছিলুম। ছত্রি ব্রাহ্মণ, কিন্তু মাংস ও মাছ রাঁধে ভাল। তার বাড়ি হলো দেবপ্রয়াগের দিকে। সে ভদ্রগৃহস্থ ঘরের ছেলে, লেখাপড়া জানে, এবং গাড়োয়ালীর স্বাভাবিক প্রসন্নতা তা'র মুখে চোখে নিত্য উদ্‌ভাসিত দেখে আমরা সকলেই আনন্দিত।

বন্দরপঞ্চের পর্বতমালা সোজা উত্তরে চোখে পড়ে। আর কোনো পাহাড়ী শহরে বোধ হয় এত কাছাকাছি তুষারচূড়া সামনে দাঁড়িয়ে নেই। উত্তর অংশটা একেবারে শূন্য, সেই কারণে মুসৌরীতে তুহিন বাতাস এত প্রবল। দার্জিলিংয়ে কিম্বা শিমলায় উত্তরাঞ্চলে অনেকটা বাঁধন আছে, আলমোড়াতেও খানিকটা অংশে পাহাড়ী দেওয়ালের অবরোধ দেখা যায়; নৈনীতাল পড়ে আছে

অনেকটা যেন চৌবাচ্চার মধ্যে। কিন্তু মুসৌরী একেবারে খোলা। হঠাৎ চূড়াটা উঠেছে যেন যূথভ্রষ্ট হয়ে, চারিদিকে খোলা অবকাশ। 'ক্যামেলস্ ব্যাক'-এর চূড়া আছে পাশেই, কিন্তু সেটা অবরোধ নয়। 'ক্যামেলস্ ব্যাক-' এর আগে নাম ছিল 'গান্-হিল্'। ওখান থেকে আগে বেলা বারোটায় কামান দাগা হতো, শহরবাসীরা ঘড়ি মিলিয়ে নিত। কিন্তু তার জন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে এমন আচমকা কাঁপন লাগত যে, শহরের লোকরা ওটাকে আর পছন্দ করল না। এখন আর কামানের আওয়াজ নেই।

লাণ্ডুরের উত্তর-পূর্বে 'টপ্ টিব্বা' হলো মুসৌরী অঞ্চলের সর্বোচ্চ চূড়া। এটির উচ্চতা সাড়ে আট হাজার ফুটের ওপর। এই চূড়ায় উঠে দাঁড়ালে শুধু দূরের বন্দরপঞ্চ নয়, একে একে নীলাঙ্গ, শ্রীকান্ত, সতোপন্থ, কেদারনাথ কামেত, বদরিনাথ,—প্রায় প্রত্যেকটি চূড়া দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। আকাশ পরিষ্কার ও নির্মেঘ থাকলে আরও দূরে পূর্বদিগন্তে দেখা যায় পৃথিবীর উচ্চতম চূড়াগুলি। যেমন নন্দাদেবী, ত্রিশূল, দ্রোণগিরি ইত্যাদি। অনেক সময় কৈলাস পর্বতের শ্রেণীও এখান থেকে স্পষ্ট আন্দাজ করা যায়।

মুসৌরী থেকে গঙ্গোত্রী যাবার পথ আছে। বহু লোক গাড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ-টিহরী-ধরাসুর পথ যেমন ধরেন, এখান থেকে তেমনি একটি পথ ফেড়ি ও লালকৌড়ি হয়ে ধরাসুর দিকে চলে গেছে। এ পথ নির্জন বনময়, জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব আছে,—সেজন্য দল বেঁধে যাওয়া নিরাপদ। পথে চড়াই এবং উৎরাইয়ের সংখ্যা কিছু বেশী বলেই যাত্রীরা দেবপ্রয়াগের পথটা ইদানীং পছন্দ করে। এ পথে পাওয়া যায় বহু বিচিত্র বর্ণের অরণ্যপুষ্প এবং ঔষধি-লতাপাতা। কিন্তু দেশীয় প্রকৃতির এই অফুরন্ত সম্পদের প্রতি আমাদের মোহ বরাবরই কম। চলতি পথের বাঁধা অভ্যাসটাই আমাদের প্রিয়, সেজন্য উদ্বেগ এবং আকুলতা নেই। সে যাই হোক, গঙ্গোত্রীর দূরত্ব এখান থেকে একশো ত্রিশ মাইলের বেশী নয়।

কতবার দেখেছি এই পাহাড়ের পথ, কত গিরিনদী আর নির্ঝরিণীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তার জন্য এদের সবাইকে দেখে পুরনো বন্ধুত্বের আস্বাদ যেন পাই। আমি ওদের আশেপাশে গিয়ে ঘুরলে ওরা যেন আমার কুশলবার্তা জানতে চায়। মহাকালের তুলনায় আমি ক্ষণায়ু, ক্ষণজীবী,—কিন্তু ওরা চিরকালের, আদি-অন্তের। আমি নতুন পাখি, নতুন কাকলী শুনিয়ে যাবার জন্য এসেছি ওদের ওই গহনলোকে। শুনতে চায় ওরা কান পেতে,—যেমন শুনে এসেছে হাজার হাজার বছর। ওরা জরা-ব্যাধি-মৃত্যু এবং কাল-ক্রমিক মানুষের উত্থানপতনের অতীত,—তবু ওরা শুনছে নতুন পাখির

কাকলী ! আমিও কতবার শুনেছি ওদের ভাষা। নির্ঝরের কলস্বনে, সরীসৃপের ও পশুপক্ষীর কণ্ঠে, ঝিল্লীর ডাকে, পতঙ্গের গুঞ্জনে। শুনে এসেছি ওদের মর্মের ভাষা অনাহত শুদ্ধতার মধ্যে।

এই অঞ্চল থেকেই চলে গেছে আরেকটি পথ যমুনোত্রীর দিকে। এখান থেকে আন্দাজ এক শো দশ মাইল। রাণুগাঁও হয়ে পথ চলে গেছে কুনলারি ও রাজটোরের দিকে। সেখান থেকে কাউনসালি হয়ে খুরসালির দিকে। খুরসালি থেকে যমুনোত্রী দেড় ক্রোশ মাত্র। এখান থেকে চক্রতা রোড ধরে কেম্পটি প্রপাত ছাড়িয়ে নাগটিব্বা পর্বতমালার ভিতর দিয়ে পথ। একেবারে যমুনার কূলে গিয়ে মিলেছে, সেখান থেকে যমুনা উপত্যকা পেরিয়ে চড়াই পথে সোজা উত্তরে চলে যাওয়া। কিন্তু এই পথে প্রায়ই গভীর অরণ্যলোক অতিক্রম করে যেতে হয়। আগে যমুনোত্রী এবং সেখান থেকে খুরসালি, চিনপুলা ও ভৈরংঘাটি হয়ে গঙ্গোত্রী আসাই সুবিধা। পথ অতি দুস্তর এবং দুরতিক্রম্য; ঠাণ্ডায় অতীব কষ্টকর,—তারপর উপযুক্ত খাদ্য এবং আশ্রয়ের অনেকটা অভাব। কিন্তু কোনোমতে যদি দেখে নেওয়া যায় জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তবে তা রইল এ জীবনের গর্বের মতন ! যুক্তি ও গবেষণা সহ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে, কৈলাস শিখরশ্রেণী থেকে নেমে এসেছে মূল গঙ্গার ধারা; বিশ্বাস করতে মন যাবে যে, দেবাদিদেবের জটা-জটিলতার মধ্যে "জাহ্নবী তার মুক্তধারায় উন্মাদিনী দিশাহারায়—।" যাই হোক, গঙ্গোত্রীর পথে হরসিলের কাছে এসে গঙ্গা মিলেছে ত্রিধারায়,—নীলগঙ্গা, হরিগঙ্গা ও গুপ্তগঙ্গা ! গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার পথ কষ্টকর—আন্দাজ মাইল পনেরো। ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। এখানে যেমন তুষার নদীর দৃশ্য অতি সুন্দর, তেমনি যমুনোত্রীতেও তুষার নদীর শোভা অতি মনোহর। যমুনোত্রীর উত্তপ্ত ঝরনা যেমন আরামদায়ক, মন্দিরটিও তেমনি আনন্দ দান করে।

মুসৌরী থেকে চক্রতা প্রায় চল্লিশ মাইল এবং দেওবন, আরও ধরো ছয় মাইল। চক্রতা থেকে দুটি পথ গেছে শিমলার দিকে। একটি টিউনী ও আরাকোট হয়ে চলে গেছে এঁকেবেঁকে—প্রায় একশো পঁচিশ মাইল; অন্যটি চক্রতা থেকে সিন্‌গোটা পুল পেরিয়ে চলে গেছে। এ পথে গেলে দূরত্ব কিছু কম। চক্রতা থেকে কোয়াখেরা, তারপর চেপাল ও ফাগু হয়ে শিমলা। অর্থাৎ প্রায় একশো মাইল। মুসৌরী থেকে ঝাল্‌কি হয়ে টিহরী যেতে গেলে বিয়াল্লিশ মাইল পড়ে। টিহরী থেকে নৈনীতালের পথ হলো দ্বারহাট আলমোড়া রানীক্ষেত ও খয়রনার ভিতর দিয়ে। কোশীর পুল পেরিয়ে যেমন আলমোড়া, খয়েরনার পুল পেরোলে তেমনি নৈনীতাল। অর্থাৎ মুসৌরী

পাহাড় রয়েছে এমন একটি কেন্দ্রে, যার চারিদিকে হলো একটির পর একটি পার্বত্য রাজ্য। হিমাচল প্রদেশের শিমলা, পাঞ্জাবের কুলু উপত্যকা, এদিকে কুমায়ুনের পর্বতমালা এবং নীচের দিকে দেরাদুন ও শাহারানপুর। মনে হয়, মুসৌরীর ওপারে এসে দাঁড়ালে একদিকে গাড়োয়াল এবং অন্যদিকে হিমাচল প্রদেশ যেমন দেখা যায়, তেমন অন্য কোথাও থেকে সম্ভব নয়।

আমার মনে ছিল অস্বস্তি। বোধ হয় কিছু যেন বাকি থেকে যাচ্ছে। দেখা মানেই ত' সঞ্চয়,—সঞ্চয়ের ঝুলি শূন্য না থেকে যায়। পাহাড়ের নিজস্ব ভাষা কিছু নেই, কিন্তু তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করুক আমার মধ্যে। আমি সেখানেই সার্থক। হিমালয় তার দিকদিগন্তজোড়া মহাকাব্য কাহিনী মেলে ধরে রয়েছে, তুমি কেবল তাকে প্রকাশ করো! তোমার মধ্যে তার অভিব্যক্তি, তার মহিমা। বিশ্বব্যাপী হয়ে রয়েছে বিপুল সৃষ্টি, তুমি দেখছ তার পিছনে স্রষ্টার সঙ্কেত। স্রষ্টাকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু তুমি উপলব্ধি করছ তাকে। এটা তোমার অন্তরের মহিমা, তোমারই নিজস্ব অভিব্যক্তি। ঈশ্বর আছে কি না, সে কথা থাক। আমি কৌতূহলী এই আমার পরিচয়, আমি সংশয়বাদী। আমি জানিনে কোন্‌টার থেকে জ্ঞানের জন্ম,—বিশ্বাস না সংশয়? বুদ্ধি, না যুক্তি। উপলব্ধির থেকে জ্ঞান,—এ বরং বিশ্বাস্য! ইনট্যুইশন থেকে দিব্যদৃষ্টি,—যুক্তির দ্বারা বিশ্বাস করি! কিন্তু ভক্তি থেকে বিশ্বাস,—এ অসম্ভব! অন্ধ ভক্তি কোথায় টানে, এ আমি জানি! পাহাড়ে পাহাড়ে আমি প্রতিফলিত, তাই আমার এই আনন্দ! আমার মধ্যে প্রতিফলিত হিমালয়, ওইতেই আমার এই অন্তর্যামী আনন্দিত। আমি খুশী করতে চাই আমার মধ্যের আমিকে। সেই আমি কাঙ্গাল, সে হাত পেতে বেড়ায় হিমালয়ে, সে কেঁদে বেড়ায় ভূভারতে! আত্মতুষ্টি সাধনের জন্য প্রতি পাথরে সে দিয়ে যাচ্ছে আলিঙ্গন, প্রতি অরণ্য-পুষ্পের পল্লবে নিবিড় চুম্বন, প্রতি নির্ঝরিণীতে তার প্রেমের অঞ্জলি, প্রতি চূড়ায় তার অনুরাগের অর্ঘ্য! আমি বোধ হয় প্রস্তরপ্রেমিক, তাই আমার হিমালয় দেখা কোনমতেই শেষ হয় না। যখনই দেখি, তুমি নতুন! তোমার অঙ্গে অঙ্গে অভিনবত্ব, তুমি মোহিনী মায়া, তাই আমার দুই চোখে ঘন অনুরাগ। আমার লুব্ধ দৃষ্টি তোমার বর্ণাঢ্যতার দিকে! আমার বন্যক্ষুধা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তোমার সামনে এলে! তোমার কঠিন প্রকৃতির স্তবকে স্তবকে আমার মৃত্যু যেন নেচে বেড়ায়,—আমার হিংস্র ভালবাসা যেন তোমার প্রতি অঙ্গে নখরের আঘাত হানতে থাকে, ধারাল দাঁতের দংশনে তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করে। তুমি আমাকে কতবার নিয়ে গেছ তোমার ওই অন্ধ গুহা-গহ্বরের প্রেতচ্ছায়াময় মৃত্যুর মধ্যে, নিয়ে গেছ তোমার সুশ্যাম বসন্তকাননে

মন্ত্রবশীভূত করে, নিয়ে গেছ তোমার নিভৃত রহস্যনিকেতনে,—আমার কাছে প্রকাশ করেছ তোমার মর্মকাহিনী! আমি সেই ভিক্ষু আনন্দ,—তোমার ওই অন্তহীন রাজ-মহিমার মধ্যে আমি বার বার নবজন্মলাভ করে ফিরেছি।

রাজা প্রদ্যুম্ন শার পুত্র সুদর্শন শার কাছ থেকে জনৈক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দেরাদুন উপত্যকাটি খরিদ করেন। তিনি আবার এই উপত্যকাটি বাৎসরিক বারো শত টাকা খাজনা পাবার সর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর করেন। এর কিছুকাল পরে নেপালের গুর্খারা এই উপত্যকাটির লোভে ব্রিটিশ সিংহের ল্যাজ ধরে টান দেয়। পশুরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে গুর্খা দলের উপর আক্রমণ করে এবং নেপাল ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে। মুসৌরী তখন দেরাদুনের অন্তর্গত, কিন্তু তদানীন্তন মুসৌরীতে দেরাদুনের হিংস্র শ্বাপদের দল স্থায়ীভাবে বসবাস করতো, মানুষের চিহ্ন কোথাও ছিল না। আজও শীতের তিন মাসের মধ্যে জন্তুজানোয়ারের দল আসে মুসৌরীর পাহাড়ে পাহাড়ে,—যখন পাহাড় ছেড়ে শীতের ভয়ে সবাই চলে যায় নীচের দিকে এবং সমস্ত শীতকালটায় সমগ্র মুসৌরী ও লাণ্ডুর প্রায় তিন ফুট উঁচু বরফে সমাচ্ছন্ন থাকে। সে যাই হোক, একথা সত্য, গত একশো বছরে মুসৌরী শহরটি সাহেবসুবার হাতেই এক প্রকার গড়ে উঠেছে। এক ডালহাউসী ছাড়া সম্ভবত আর কোনো পার্বত্য শহরে এমন সর্বাঙ্গীণ সাহেবী চেহারা দেখা যায় না। এ শহরের আগাগোড়া প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয় প্রকৃতির যোগাযোগ একপ্রকার নেই বললেই হয়। এই সেদিন অবধি পাউণ্ড ওজনে খাদ্য এবং ইংল্যাণ্ডের ওজনে আবহাওয়া চালু ছিল। স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকাংশই সাহেব-মেমদের পরিবার, শ্মশানের বদলে সাহেবদের গোরস্থান, লাইব্রেরী বলতে অ-ভারতীয় বই, কাগজ বলতে স্টেটসম্যান এবং ধর্মমন্দির বলতে গির্জা। ওরা শীতপ্রধান দেশের লোক, সুতরাং এদেশের প্রত্যেকটি পার্বত্য শহরে—যেখানে প্রচুর ঠাণ্ডা—এক-একটি খণ্ড ক্ষুদ্র ইংল্যাণ্ড তৈরি করে তুলেছিল। এমন সুন্দর ও সুসজ্জিত ফুলের বাগান, লতাবিতানে ছাওয়া এমন চমৎকার এক-একটি বাংলো, এমন সুরুচিপূর্ণ ও সুশ্রী জীবনযাত্রা—আর কোনো পার্বত্য শহরে এমন বিস্তৃতভাবে আমার চোখে পড়েনি। এটা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত হলেও এখানে উত্তর-প্রদেশীর সংখ্যা ছিল অতি কম, কারণ তাদের অতিশয় হিন্দুয়ানি এখানে তাদের বসবাসের পক্ষে ছিল পর্বতপ্রমান বাধা। সেই কারণে পাঞ্জাবীরা এখানে জায়গা পেয়েছিল বেশী। বলা বাহুল্য, সর্বত্রগামী মাড়োয়াড়ীরা পশ্চাৎপদ ছিল না।

বিদ্যালয় মানেই ইংরেজি স্কুল—ইংরেজিই তার মাধ্যম। এদেশের একটি

ছেলেমেয়েকেও তারা জায়গা দিতে নারাজ ছিল। তাদের বই ছেপে আসতো বিলেত থেকে। ইতিহাস পড়তো বিলেতের। ধর্মগ্রন্থ মানে বাইবেল। পরিচ্ছদ বিলেতী বস্ত্র। কোনো নেটিভের সঙ্গে কোনো সামাজিক যোগ ছিল না। এখানে থেকেই তৈরি হত ভবিষ্যৎ আর্মি অফিসার, ভাইসরয়ের স্টাফ, জেলাশাসক, পুলিসের কর্তা এবং নিউ দিল্লীর সেক্রেটারীর দল। ওরাই হতো ভারত সাম্রাজ্যের রক্ষক। কোনকালে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ এক পা নড়বে না, এই কথাটা মনের সামনে রেখেই তারা কায়েমী স্বার্থের কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু হায়, "তবু চলে যেতে হয়, তবু ছেড়ে চলে যায়।" আমার এক বন্ধু বলেন, মৌমাছির অসহ্য দংশনে অস্থির হয়ে পশুরাজ পালালো। ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করেছিল একশো বছরও নয়, দুশো বছরও নয়,—মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর! অর্থাৎ ১৯১২ থেকে ১৯৪৭। তাও স্বদেশীদের যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে। এদেশের মন পাবার জন্য ওরা 'হেঁট মাটি ওপর' করেছে। দেড়শো বছর ধরে ওদের লাঠালাঠি শেষ হয়নি। সন্ধির পর সন্ধি করে নানা জাতকে ওরা নিরস্ত করেছে। নপুংসক দেশীয় রাজাদের মাথায় মুকুট পরিয়ে তাদের দরজায় ওরা দারোয়ানি করে এসেছে এতকাল। মাথায় করে কাপড় বয়ে এনেছে, পাড়ায় পাড়ায় ইস্কুল বসিয়েছে, মেয়েদের মন পাবার জন্য টয়লেট তৈরি করে এনেছে,—ওরা করেনি এমন কাজ নেই। তারপর বসালো দিল্লীর দরবার। মনে করল কপালের ঘাম মুছে এবার থেকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজ্যপাট ভোগ করবে। কিন্তু বিধি বাম। ভবীর মন কিছুতেই ভুললো না। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ পালিয়ে বাঁচল। সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি সবচেয়ে কম সময় টিঁকে ছিল। ভাগ্যের এমন পরিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

কয়েকটি জলপ্রপাত আছে মুসৌরীতে। যেমন ভাট্টাপ্রপাত,—ভাট্টা গ্রামের কাছাকাছি। এখান থেকে মুসৌরীর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে। শহর থেকে নীচে কার্ট রোড ধরে অনেকটা পথ গেলে তবে এটি দেখা যায়। আরেকটি আছে হার্ডি প্রপাত—ভিনসেণ্ট পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে! কিন্তু অনেকটা দুস্তর পথ পেরিয়ে যেতে হয়। এ দুটী ছাড়াও বার্লোগঞ্জের ওদিকে রয়েছে মসি ও হিয়ার্সি প্রপাত,—কিন্তু তাদের কাছে পৌছবার পথ হলো একটি বাগানবাড়ির ভিতর দিয়ে। অন্য আরেকটি আছে, তার নাম মারী প্রপাত,—সেটি লাণ্ডুর থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল পড়ে।

আমরা একদিন স্থির করলুম, কেম্পটি জলপ্রপাত দেখতে যাব। আমাদের হোটেল থেকে আন্দাজ সাড়ে সাত মাইল পথ। সকালবেলায় আমরা যাত্রা

করলুম। পাচক শ্রীমান গোবর্ধন আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের উপকরণ সঙ্গে নিয়ে চলল।

এটি চক্রতা যাবার পথ। কিন্তু এপথে মোটর চলে না। পথ সঙ্কীর্ণ এবং অধিকাংশই উৎরাই! এমনই উৎরাই—যেন পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে চলে। শরৎকালের যাত্রীর মরসুম শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং প্রায় সমস্ত পথই জনবিরল। বনময় পথ আমাদের অজানা, সেই বন ঘন হতে থাকে যতই আমরা এগোই। শীতের দিন, তাই আমাদের ক্লান্তি কম। সমস্ত পথটা এসে পৌঁছতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগলো। কেম্পটিতে একটি ছোটখাট ডাকবাংলো এবং বারান্দা রয়েছে। আন্দাজে পাই, এ অঞ্চলটা মুসৌরী থেকে প্রায় হাজার দুই ফুট নীচে। সুতরাং রৌদ্রে খানিকটা তাপ আছে। সামনের পাহাড়ের মধ্যে একটি চক্রাকার ক্রোড়গর্ভ, অনেকটা অশ্বক্ষুরের আকৃতি। তারই একটি বিরাট পর্বতশীর্ষ থেকে স্ফীতকায় একটি জলপ্রপাত নীচের দিকে পড়ছে ঝরঝরিয়ে। আশেপাশে ছোটখাটো প্রপ্রাতও আছে দু'একটি। নীচে গিয়ে তারা জলাশয় সৃষ্টি করছে! আসামের চেরাপুঞ্জীতে দেখেছিলুম এই দৃশ্য, হস্তীপ্রপাতে ও গিরিডির উশ্রীপ্রপাতে, দার্জিলিংয়ের পাগলাঝোরায় এবং কাশ্মীর যাবার পথে জম্মুর বিশাল পর্বতশ্রেণীতে,—যেটাকে বলে পীর পাঞ্জাল পবতমালা। এখানে লোভনীয় পরিবেশ তেমন কিছু নয়। দু'চারজন 'ভিজিটর' মেয়ে-পুরুষ দেখা গেল বটে, কয়েকজন মিলে হট্টগোলও করলো,—যদিও এখানে পরিভ্রমণের সুবিধা তেমন বিশেষ কিছু নেই। তবে কিনা ভুনি-খিচুড়ি সহযোগে ওখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের আসরটা জমে উঠেছিল বটে। বলা বাহুল্য, আমাদের আহার্য তালিকায় হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটেছিল।

জলহাওয়ার গুণে আমাদের পরিপাকশক্তি যত প্রবলই হোক, ফিরবার পথে আমাদের অবস্থাটা ছিল কষ্টকর। উদরপূর্তির ফলে পা চলে না সহজে এবং চড়াই পথে ওটাই নিবিদ্ধ। পাহাড়ে চলতে খেলে কখনও যে পেট ভরে খেতে নেই, একথা মনে রাখার দরকার ছিল। সেই প্রমাদের জন্য ফিরে আসতে লেগেছিল চার ঘণ্টারও বেশী। হোটেলে ফিরে ঘণ্টাখানেক অবধি কেউ কারো সঙ্গে আর কথা বলিনি। সেটা কৃষ্ণপক্ষ। সন্ধ্যার পরে তারকায় ছেয়ে গেল আকাশ এবং সে-আকাশ যেন আমরা হাত বাড়ালে পাই। কিন্তু নীচেকার দৃশ্য আরও অপরূপ। আমরা বেছে বেছে এমন একটি হোটেলে উঠেছিলুম, যেখান থেকে সমগ্র দেরাদুন উপত্যকাটি ঘাড় ফেরালেই দেখে নিতে পারতুম সন্ধ্যায় দেরাদুন শহরে জলে উঠেছে আলোর মালা। সাত হাজার ফুট উঁচুতে একটি জায়গায় বসে নীচের তলাকার সেই দীপালীর দৃশ্য বিস্ময়ের মতো চোখে

লেগে থাকে। এমন একটা দৃশ্য দেখেছিলুম বোম্বাইয়ের মালাবার পাহাড়ের উপর সেই রিজ্ হোটেল থেকে নীচেকার সমুদ্রের দিকে। সেখানে সমুদ্রের কোলে সমগ্র বোম্বাই অর্ধচন্দ্রাকার, তার ভিতর দিয়ে এসেছে মেরিন্ ড্রাইভ। সন্ধ্যার পরে অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমের কোলে দীপমালা জ্বলে উঠেছে। স্থানীয় লোকেরা ওই গোলাকার বৃত্তের নাম দিয়েছে 'কুইনস্ নেকলেস'। দুই চোখভরা বিস্ময় ছিল আমার।

॥ ৮ ॥

সিন্ধু আর শতদ্রুর মতো বন্য ও পার্বত্য নদী ভারতে তৃতীয় আর নেই। ডায়রীতে একদা লিখেছিলুম—গঙ্গা হলেন রাজতরঙ্গিনী, কিন্তু শতদ্রু আমার বিস্ময়! আদিতে বিস্ময়, অন্তেও বিস্ময়। উপমহাদেশ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করেছে শতদ্রু। তিব্বত থেকে সে যাত্রা করেছে। কৈলাস পর্বতশ্রেণীকে কেটেছে, তারপর জাস্কার, তারপর ধবলাধার, শূলশৃঙ্গ ও শিবলিঙ্গ পর্বতমালা —অর্থাৎ সমগ্র হিমালয়কে কাটতে কাটতে এসে পাঞ্জাবের বিলাসপুরে মোড় ঘুরেছে। আশ্চর্য নদী। সবাইকে টেক্কা দিয়ে পাঞ্জাবের ভিতর দিয়ে সোজা নেমে গেছে দক্ষিণে, তারপর সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আরব সমুদ্রে। বন্য শতদ্রু আজ শৃঙ্খলিত হয়েছে বাখ্ড়া-নাঙ্গালে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অবাক হয়ে শতদ্রুর দিকে চেয়ে থাকে।

বিলাসপুরের দিকে যখন শতদ্রু এলো, তখন সে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত। মুশকিল এই, পার্বত্য পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ এমন একাকার যে কোন্ তহশীল কার মধ্যে, হঠাৎ বলা কঠিন। চাম্বা যদি হিমালয় প্রদেশে হয়, তবে কাংড়া ও কুলু এসেছে পাঞ্জাবে—এটা শুনতে অবাক লাগে। একটার সঙ্গে একটার সংযোগ নেই কোথাও। পশ্চিমবঙ্গের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে গেলে সেদিন অবধি যেমন বিহার অথবা আসাম পেরিয়ে যেতে হতো, তেমনি হিমাচল প্রদেশে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে গেলে পাঞ্জাব না মাড়িয়ে উপায় নেই। পেপসুও প্রায় তাই এবং পশ্চিম ভারতে বরোদারও ওই একই নমুনা। এর ফলে এই হয় যে, বাইরের থেকে কোনও প্রকার আঘাত এলে প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমি বিস্ময় বোধ করেছিলুম, যখন শিমলাকে আনা হলো হিমাচল প্রদেশের মধ্যে। কেননা, হিমাচল প্রদেশের মূল প্রকৃতি হলো রাজপুত এবং

সিমলার হলো পাঞ্জাবী। বিচ্ছেদটা কামনা করিনে, কিন্তু মিলনটা বিস্ময়কর। পাঠান আর মোগলের আমলে হাজার হাজার রাজপুত পরিবার পালিয়েছিল হিমালয়ে পাঁচ ছশো বছর আগে। স্থানীয় লোককে হটিয়ে তা'রা আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য, শিক্ষা এবং সুশাসনের গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এইভাবে নেপালও যেমন গ'ড়ে ওঠে রাজপুতের হাতে, তেমনি উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের মাঝামাঝি পার্বত্য অঞ্চল—যেটাকে আজ নাম দেওয়া হচ্ছে হিমাচল—সেটাও রাজপুতরা আগে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এর ফলে খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন বহু ছোট ছোট রাজ্য একে একে গ'ড়ে ওঠে। দু-চারটি পাহাড় নিয়ে এক একটি রাজ্য—আশেপাশে কোন নদীর সীমানা এবং এইটিই প্রধান—ব্যস্, প্রত্যেকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। এই প্রকার একুশটি ছোট-বড় রাজ্য নিয়ে আজ হিমাচল প্রদেশ গ'ড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে চাম্বা, মণ্ডি, বিলাসপুর, শিরমুর—এরাই হলো বড় বড়। যাই হোক, ইদানীং অনেক সমস্যা মিটেছে। শিমলা, কুলু-কাংড়া প্রভৃতি এখন হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত হয়েছে।

শিমলাতে বাস করেছিলুম কিছুদিন। ওটা নাকি পাতিয়ালার মহারাজার জমিদারির মধ্যে ছিল, কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ওটা নিজের দখলে রাখেন। পাঞ্জাবে গরম হলো অসহনীয়, সেজন্য পাহাড়ী শহর না হ'লে সাহেবদের চলতো না। এই সূত্রে য়্যালান্ ক্যাম্বেল জনসনের "Mission with Mountbatten"—বইখানার একটি পৃষ্ঠা মনে পড়ে! পূর্বপাকিস্তান জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে জনৈক ইংরেজকে গভর্ণরের পদটি নেবার জন্য জিন্না সাহেবের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের এলাকায় শিলং ও দার্জিলিং পড়েনি বলেই সেই ইংরেজ ভদ্রলোক চাকুরি নেননি। সে যাই হোক, পাতিয়ালার প্রাসাদ আছে বটে শিমলায়, তবে তিনি তখন বাস করেন চাইল্ শহরে। শিমলা থেকে চাইল্ দেখা যায় রাত্রের দিকে, যখন চাইল্-এ আলো জ্বলে। দিনের বেলায় অস্পষ্ট। শিমলা থেকে চাইল যাবার মোটর পথ আছে, এটি কান্দাঘাটি হয়ে যায়।

পার্বত্য শহরের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র শিলং, যেখানে পৌঁছলে একথা মনে হয় না যে, পাঁচ হাজার ফুট ওপরে বাস করছি! কেননা, পথঘাট আশ্চর্য রকম সমতল সেখানে। অন্য কোন হিল্ স্টেশনে সে সুবিধা নেই। অবশ্য শিলং হলো হিল্ সিটি, হিল্ স্টেশন নয়। শিমলা এর বিপরীত। যতদূর মনে পড়ছে, উচ্চতায় শিমলা সাত হাজার ফুটেরও বেশি এবং মুসৌরী ও রাণী-ক্ষেতের মতো শীতের দিনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে এবং তুষারপাত

হয়। কোন কোন বছরে শিমলায় চার-পাঁচ ফুট অবধি বরফ পড়ে। শিমলায় যাবার পথঘাটও খুব সোজা নয়। কেননা, মণ্ডি, চাম্বা অথবা বিলাসপুর থেকে শিমলায় পৌছতে গেলে যে পরিমাণ দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হবে, তাতে রাজধানীর সঙ্গে নিত্য সংযোগ রাখা খুবই দুরূহ। উত্তুঙ্গ পর্বত, অনধ্যুষিত উপত্যকা, ভীষণ অরণ্যানী এবং দুরতিক্রম্য নদীনির্ঝরিণীর দ্বারা একটির সঙ্গে আরেকটি চিরকাল বিচ্ছিন্ন।

কাল্‌কা থেকে শিমলা পর্যন্ত রেলপথ, তার সঙ্গে আছে রেল-মোটর এবং তারই পাশে পাশে প্রশস্ত কার্ট রোড! যেমন দার্জিলিংয়ে কিংবা গৌহাটী থেকে শিলং অথবা কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ার পথ। পথ আঁকাবাঁকা, বন্ধুর, অনেকগুলি লুপ, অনেক টানেল্‌—যতদূর মনে পড়ে। এই পার্বত্য পথে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল রয়েছে। একটি হলো ডগ্‌সাই—যেখানে ভারতীয় সৈন্যদলের অফিস। একটি হলো সোলন্‌,—যেখানে ভারতপ্রসিদ্ধ মদ্য প্রস্তুতের কারখানা। তৃতীয়টি হলো কসৌলী—কুকুরে কামড়ালে যেখানে বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, এবং চতুর্থটি ধরমপুর—যেখানকার হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগীরা আশ্রয় পেয়ে থাকে। সমতল পাঞ্জাবের ধূলিধূসরতা থেকে দূরে, পর্বতের নিভৃত বনময়তার মধ্যস্থলে ধরমপুর অতি মনোরম স্থান। কার্শিয়াংয়ের হাওয়ায় জলীয় অংশ বেশি, এমনকি, নৈনীতালের ভাওয়ালীও হয়ত অনেকের পক্ষে সঁ্যাতসেঁতে মনে হ'তে পারে, কিন্তু ধরমপুরের শুষ্ক এবং স্বাস্থ্যকর বায়ু ও জল বাঙালীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপকারী। এখানকার পারিপার্শ্বিক পার্বত্য বনভূমি, নানা বর্ণের অজস্র হিমালয়ের পাখি, নির্ঝরিণীর কলমুখরতা—যে কোন পর্যটকের কাছে অমরাবতীর সংবাদ এনে দেয়।

কাল্‌কা থেকে শিমলা মনে হচ্ছে আন্দাজ ষাট মাইল পাহাড়ী পথ। বিস্ময় লাগে, এই পথ এককালে যারা জরীপ করেছিল! তাঁরা নমস্য সন্দেহ নেই। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে দেহাতিদের পায়েচলা পথ, সে ত' সংখ্যাতীত, তেমনি জটিল—কিন্তু কিছুতেই এবং কোনমতেই যেখানে পথের আন্দাজ পাওয়া যায় না, সেখানে প্রত্যেকটি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পারস্পরিক সংযোগ আবিষ্কার করা, এ কাজ অতিমানবিক। এখানেও ঠিক দার্জিলিংয়ের মতো। রেলপথের সঙ্গে সঙ্গে মোটর-পথ। নেউল যেমন সাপকে নিয়ে খেলা করে, তেমনি এখানেও মোটরের সঙ্গে ট্রেনের খেলা! উভয়ে কখনও অদৃশ্য, অর্থাৎ উভয়েই হারিয়ে গেছে পার্বত্য বনপথে; কিন্তু যথাসময়ে সহসা আবার দেখা হয়ে গেল। যাকে বলে, শেষ পর্যন্ত নেউলের হাতেই সাপের পরাজয়। মোটর আগে গিয়ে পৌছয় শিমলায়। শিমলার প্রবেশপথে আছে অক্‌ট্রয়, সেখানে

একটা খানাতল্লাসীর ব্যাপার থাকে, তারপর পোল্‌-ট্যাক্সের কথা ওঠে। অতঃপর ছাড়পত্র সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জাবের (বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের) এবং ভারতের পার্বত্য রাজধানীতে মাথা গলানো যায়। এককালে পাহাড়ের দুই প্রান্তের দুটি মালভূমির উপর প্রদেশের গভর্নর এবং ভারতের ভাইসরয়ের আবাসভূমি ছিল। অতি স্পষ্টত এটি হলো ইংরেজের গ্রীষ্মাতঙ্ক। ওয়েস্ট রীজের পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে মাসোব্রায় হলো বড়লাটের প্রাসাদ, প্রাসাদের নাম 'রিট্রীট্।' এই 'রিট্রীটে' পাইন বনের নীচে চায়ের আসরে বসে ভারতের ভাগ্য বহুবার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এখানকারই একটি নিভৃত কক্ষে বসে কোন এক শেষ রাত্রে পণ্ডিত নেহরু পাকিস্তান সৃষ্টিতে রাজী হয়েছিলেন।

ওই ওয়েস্ট রীজের দিকে, অর্থাৎ আপার শিমলার কেন্দ্রীয় পরিষদের কাছাকাছি ব্রাহ্ম মন্দিরের পাশ কাটিয়ে নীচের দিকে একটি বাড়িতে বাস করেছিলুম অনেকদিন। এখান থেকে চক্রাকারে ঘুরে গেছে শিমলা শহরের পথ। ওদিকে হলো লোয়ার শিমলা। এধার দিয়ে পথ চলে গেছে যক্ষ পর্বতের দিকে। ওখানে যার চলতি নাম হলো 'জ্যাকো হিল।' ওখানে পরিশ্রম করতে যায় অম্লরোগীর দল, আর মেহনতি মেয়েপুরুষ। সমগ্র পাহাড়টি পরিভ্রমণ করতে গেলে মাইল আষ্টেক হাঁটতে হয়। ওখানকার মায়াকাননের আশেপাশে অনেক মেনকা বাঁকা নয়নে টেনে নিয়ে যায় অনেক আধুনিক বিশ্বামিত্রকে। এদিকে ম্যাল ধরে সোজা চলে গেলে একটি নিরিবিলি অঞ্চলে বাঙালীসমাজ পরিচালিত কালীবাড়ী। এই কালীবাড়ী পরলোকগত স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের চেষ্টায় এক সময়ে প্রচুর উন্নতি লাভ করে। তিনি তৎকালীন সরকার তরফের লোক হলেও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বাঙালী সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। কীর্তির্যস্য স জীবতি।

আমি ছিলুম বন্ধুবর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসুর অতিথি। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাহিত্যসমালোচক। কিন্তু তিনি অধুনা পরলোকে। তাঁর কথা অন্যত্রও বলেছি। তাঁর কাঠের বাংলোটি ছিল শিমলায় পাহাড়তলীর এক নিভৃত বনময় অঞ্চলে! তিন দিকে সুউচ্চ পাহাড়ের প্রাচীর, নীচের দিকে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকা, আশেপাশে সুবিশাল পাইন, শাল ও চিড়ের ছায়ানিবিড় নিকুঞ্জলোক। কিন্তু অমন নিভৃতবাসের মধ্যেও আমাদের কয়েকজনকে মিলে একটি দল গ'ড়ে উঠেছিল। বরিশালের নেতা শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত, যিনি স্বর্গত অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র—তিনি ছিলেন নাটের গুরু। সুরসিক এবং পণ্ডিত। এদিকে সাংবাদিক সত্যেনের কাছে আসতেন সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুত দুর্গাদাস, আসতেন তৎকালীন শ্রমিক নেতা এবং অধুনা

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি, আর আসতেন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ নেতা স্বর্গত সত্যমূর্তি, প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম এল এ, সুদর্শন শিল্পী শ্রীযুক্ত সৌরেন সেন এবং আরো অনেকে। মেয়েদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী বসু,—অধুনা পরলোকগতা। কবি অজিত দত্তের শ্যালিকা শ্রীমতী মিণ্টু ও তাঁর এক বান্ধবী শ্রীমতী রমা। এছাড়া আরেকজন ছিলেন, শ্রীমান পাতঞ্জলি গুহঠাকুরতা। কিন্তু সেদিন সে আমাদের কাছে 'বলাই' নামে খ্যাত ছিল, 'পাতঞ্জলি' হয়ে ওঠেনি। আরেকটি সুদর্শন তরুণ ছাত্র আসতো আমার কাছে মাঝে মাঝে। তার নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। অপ্রাসঙ্গিক যদি না হয় তবে বলি, সেদিনের সেই প্রভাত পরবর্তীকালে বিবাহ করে বলাইয়ের সহোদরা ভগ্নী শ্রীমতী অরুন্ধতী গুহঠাকুরতাকে—যিনি মহাপ্রস্থানের পথে' চিত্রে 'রাণীর' ভূমিকায় অভিনয় ক'রে প্রথম অভিনেত্রী-যশোলাভ করেন। অতএব আমাদের দলটি সেদিন নেহাৎ ছোট ছিল না। সত্যেনের ঘরে ছিল বিনামূল্যের টেলিফোন, সুতরাং বহু উপভোগ্য কাহিনী টেলিফোনের সাহায্যেও রচিত হতো।

শিমলা থেকে তারাদেবীর ছোট গ্রামটি নিকটবর্তী। যতদূর মনে পড়েছে এখানে একটি কালীমন্দির দেখেছিলুম। যেমন আগে বলেছি, আসামের উত্তর প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে ভূটান, সিকিমের দক্ষিণ অংশ, দার্জিলিং, নেপাল, কুমায়ুন এবং তারপর কাংড়া ও হিমাচল প্রদেশ—সমগ্র হিমালয়ের প্রথম স্তরে শক্তিপূজার আয়োজন। চণ্ডীর পরে এলেন কালিকা, তারপর তারাদেবী, তারপর কিন্নরের ভীমকালী, শাকম্ভরী, মহিষমর্দিনী—এইভাবে চলেছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং ধারণা থেকে সমাজ-মনের উৎপত্তি। সেই সমাজ-মন লালন করেছে ধর্মীয় সংস্কৃতি, চিৎপ্রকর্ষ, এবং সমষ্টিগত জ্ঞানলাভের বাসনা। যদি কেউ বলে, আমি বিশ্বাস করিনে, বলুক, কিন্তু বিশ্বাসটা চলে এসেছে। কাল থেকে কালে, যুগ থেকে যুগে। ভারতীয় মনের এই সর্বকালীন ধারাবাহিকতা এখনও অটুট।

শিমলার নীচের সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট। উর্ধ্বতন কর্মচারীরা এখানে মধ্যে মাঝে শিকারে আসেন এবং অবসর বিনোদনের জন্য কিছু দূরবর্তী আনানদেল্ মাঠে যান ঘোড়াদৌড়ে জুয়া খেলতে—শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে নীচের দিকে। যেমন দার্জিলিংয়ের প্রান্তে লেবং-এর মাঠ। বড় শিমলা পেরিয়ে ছোট শিমলার ধার দিয়ে একটা পথ চলে গেছে বয়লুগঞ্জ ছেড়ে প্রসপেক্ট পাহাড়ের দিকে। সে-অঞ্চলটি জনবিরল বলেই বনভোজনের পক্ষে ভারি সুবিধে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে হিমাচল প্রদেশের বিস্তার ও বৃহত্তর চেহারা দেখা যায়।

সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান, বড় বড় হোটেল এবং বোর্ডিং হাউসে শিমলা শহর সকল সময়েই জনবাহুল্যে গমগম করে। এত অধিক সংখ্যক বাসস্থান বোধ হয় আর কোন পাহাড়ি শহরে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকরা প্রধানত ব্যবসায়ী অথবা শ্রমিক, বাদ বাকি প্রায় সকলেই চাকুরে। তৎকালে এমন অনেক বাঙালী ছিলেন,—যাঁদের মধ্যে অনেকেই উন্নাসিক সমাজের লোক—যাঁরা এই শহরে চিরস্থায়ী বসবাস করে থাকেন। অনেকে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও দিল্লী-শিমলার মোহ আজও ত্যাগ করতে পারেননি। সত্যি বলতে কি, মোহ ত্যাগ করাও কঠিন। জল, বায়ু, আহার, বিহার এবং একটা আনুপূর্বিক স্বাচ্ছন্দ্য—এইটেই শিমলার বৈশিষ্ট্য। এই শহরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য পাঞ্জাব এবং ভারত—উভয় গভর্নমেণ্টই সুদীর্ঘকাল ধরে মাথা ঘামিয়েছেন।

শিমলার নীচে দিয়ে চলেছে বিস্তৃত কার্ট রোড—যে-পথ দিয়ে শিমলায় প্রবেশ করতে হয়। সমগ্র শহরের পরিশ্রমসাধ্য চড়াই আর উৎরাই ছেড়ে এই পথ চলে গেছে বহুদূর। এই 'হিন্দুস্থান টিবেট রোড' ধরে শিমলা থেকে নারকান্দা প্রায় চল্লিশ মাইল মোটরপথ, অতঃপর পায়ে হাঁটা। শিমলা থেকে কমবেশী মোট দেড়শো মাইল অতিক্রম করলে তবে 'চিনি' শহর, অর্থাৎ বুশাহর রাজ্যের এলাকা। কিন্তু ওখানেই পথ শেষ নয়,—দুঃসাহসীদের পথ অবারিত রইল বিচিত্র জগতের দিকে—যে-পথ দিয়ে গেলে শিপ্‌কি গিরিসঙ্কট ছাড়িয়ে তিব্বতে ঢোকা যায়। কিন্তু এই পথটি অতিশয় দুস্তর। পূর্ব-কাশ্মীরে যেমন কারগিল হয়ে লাদাখ যেতে হয় এবং বহু দুর্গম গিরিসঙ্কট এবং অজানা অনামা ও দুরারোহ অঞ্চল পেরিয়ে লাদাখের রাজধানী লে শহরে পৌঁছানো যায়, এখানেও তেমনি। ঘোড়া ঝব্বু, অশ্বতর—এরা ভিন্ন আর কোন বাহন নেই! আহারের আয়োজন নিতে হয় সঙ্গে, তার সঙ্গে একটি তাঁবু, মাইনেকরা দুটি পথনির্দেশক,—এছাড়া দুঃসাধ্য। ঠিক অরণ্যের মতো, পাহাড়ে পথ হারানো অতিশয় বিপজ্জনক। পথ যেখানে শাখাপ্রশাখায় বহু বিভক্ত, সেখানে গাইড ছাড়া চলে না—কেননা, কোন পথের কোন সঙ্কেত নেই। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে বায়ুর বিশেষ একটি স্তরে গিয়ে পৌঁছলে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গোলযোগ ঘটতে বাধ্য। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি অল্প পরিশ্রমেও কেন যে ক্লান্তি বোধ করছেন, তিনি নিজেও বুঝতে পারবেন না। সে যাই হোক, এই পথে 'শিপ্‌কিসঙ্কট' পর্যন্ত গেলে তবে হিমাচল প্রদেশের সীমানা। এই সীমানার মধ্যেই বুশাহর রাজ্য পড়ে, এবং এই রাজ্যেরই একটি অঞ্চলের নাম কিন্নর দেশ। একদিকে তিব্বত, দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ, পূর্বে গাড়োয়ালের

প্রান্ত সীমানা—এবং এ অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আশ্চর্য শতদ্রু নদী—এদেরই মধ্যস্থলে হলো কিন্নর দেশ। বুশাহরের প্রকৃত রাজধানী হলো শরণ, এখানে ভারতপ্রসিদ্ধ ভীমকালীর অতি সুদৃশ্য মন্দির—ভারতীয় ও তিব্বতী স্থাপত্য শিল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। আগেও আমি বলেছি, পূর্ব-কাশ্মীরে, নেপালে, উত্তর গাড়োয়ালে এবং সিকিম-ভূটানে তিব্বতীয় স্থাপত্য প্রভাব অতিশয় প্রকট। হিন্দু মন্দির ত' দূরের কথা, মুসলমানের কোন কোন মসজিদও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি। অনেক সময়ে তিব্বতী ধরনের হিন্দু দেবদেবী—যেমন শিব, কার্তিক, কালী, লক্ষ্মী ইত্যাদি এদের গঠন ও সজ্জা-পারিপাট্যের মধ্যেও তিব্বতী প্রভাব অনায়াসে মিশে গেছে। অবশ্য হিন্দু দেবদেবীও বিভিন্ন নামে এবং বিচিত্র সংজ্ঞায় তিব্বতে পূজা পেয়ে থাকেন সন্দেহ নেই। শতদ্রু নদীর তীর ধরে প্রাচীন পথ চলে এসেছে তিব্বত থেকে ভারতে। এই পথ বুশাহর রাজ্যে যখন প্রবেশ করে, তার আগে পাওয়া যায় প্রাচীন রামপুর। কিন্তু এই শহর অতিক্রমের পর অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কিন্নর দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে ভারতীয়, অন্যভাগে তিব্বতীয় সংস্কৃতির প্রভাব। ভারতীয় ভাগটি মন্দিরপ্রধান; আচার ও আচরণে যেমন দেখে এসেছি সমগ্র হিমাচল প্রদেশে, তেমনি হিঁদুয়ানি। কিন্তু তিব্বতীয় প্রভাবের ভাগটি ভিন্নরূপ। তাদের ধর্মগুরু হলো লামা। তাদের ধর্মস্থান হলো গুম্ফাজাতীয়, তারা বৌদ্ধ। তাদের চোখ থাকে তিব্বতের দিকে—চেহারায় জাতি মিশ্রণ, আচার ও ব্যবহার লামাজাতীয়। সেই ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং দৈত্য-দানবের বিরুদ্ধে মন্ত্রোচ্চারণ। স্পষ্ট বুঝা যায়, কিন্নরের দেশ হলো ভারত ও তিব্বতের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ। এই কিন্নরের প্রধান কেন্দ্র হলো 'চিনি', বর্তমান নাম 'কল্পা'। চিনির দক্ষিণে বিশাল অধিত্যকা অঞ্চল হলো গহন অরণ্যময়। আশ্চর্য, বৃহৎ রঙীন পাখি অরণ্যে অরণ্যে ডাক দিয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত, নীচে দিয়ে অবাধে চলেছে শৃঙ্গশোভী বন্য হরিণের পাল। এছাড়া তিব্বত থেকে নেমে আসে ধূসর বর্ণের ভালুক।

নারকাণ্ডা থেকে রামপুর যাবার পথে কোটগড় পড়ে। একটু বাঁকা পথ। কিন্তু রামপুরের পর থেকেই পথ অরণ্যসমাকীর্ণ। চড়াই উঠেছে, উৎরাইতে আবার নেমেছে। এপথ দিয়ে যাবার কালে সভ্য জগতের কোনো চিহ্ন সহজে মেলে না। বছরের একটা বিশেষ সময়ে ব্যবসায়ীদের ক্যারাভান কেবল আনাগোনা করে। তিব্বত হোলো একপ্রকার নিষিদ্ধ দেশ, কিন্তু ভারতের দরজা চিরদিনই খোলা! কে না জানে, ভারতের দরজা বন্ধ হ'লে তিব্বতী

ব্যবসায়ীদের দুর্গতির শেষ থাকবে না। সেইজন্য তিব্বতীয়দের স্বার্থের দিক থেকেই 'টিবেট্-হিন্দুস্থান রোড' কোনোদিনই বন্ধ হয়নি। রামপুর থেকে ওয়াংটু, ওয়াংটু থেকে চিনি। কিন্তু ওয়াংটু হোলো অরণ্যের কেন্দ্র, কোথাও অবকাশ নেই। দেওদার এবং পাইন এবং আখরোটের বন, শাল ও সেগুনের অরণ্য। পর্বতশ্রেণীর তরাই অঞ্চলে ঘন গভীর এই অরণ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় কাঠুরিয়াদের ঘর। তারা প্রায় সমস্ত বছর ধ'রে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কাঠ কেটে বেড়ায় এবং বড় বড় কাঠের গুঁড়ি ও স্লিপার শতদ্রুর প্রখর নীলাভ জলস্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেয়। সেই কাঠ ভেসে আসে পাঞ্জাবের দিকে। এ ব্যবসা চলেছে যুগযুগান্ত থেকে। ওয়াংটু থেকে চিনি হোলো চড়াইপথ। পথের মাঝখানে একটি ঝুলন-সাঁকো। সন্ধ্যার পরে এই সাঁকো দিয়ে এপার থেকে ওপারে বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা চলতে থাকে। এই সাঁকো পেরিয়ে ধীরে ধীরে যেতে হয় চড়াই পথে। রক্তিম আপেলের বন চলেছে, আঙুরের ক্ষেত তা'র গায়ে গায়ে। মেয়েরা সলজ্জ সুন্দর চোখে তাকায়; আঙুরের মতো টসটসে মুখ, আপেলের মতো আরক্তিম দুটি গাল। সুঠাম দেহখানি নজরে পড়ে না, এমনি ক'রে ঢেকে রাখে সর্বাঙ্গ,—পাছে পথচারীর কোন গুপ্ত বাসনার দাগ এঁকে যায় সেই কিন্নরীর লাবণ্যলতায়। সভ্য মানুষকে ওরা ভয় পায়।

'চিনি' অনেক উঁচু, হয়ত বা দশ-এগারো হাজার ফুট। হঠাৎ সামনে পাওয়া যায় মস্ত উপত্যকা সমতল আর অসমতল মেলানো। তিনদিক তা'র চক্রাকার, নীচের দিকে বৃহৎ ভারতবর্ষ। কিন্তু এই আঙুর আর আপেলের প্রান্তর পেরিয়ে সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে আকাশছোঁয়া পর্বতশিখর,—চূড়ার পর চূড়া—চিরতুষারে সমাচ্ছন্ন। প্রত্যেক চূড়ার নাম তিব্বতী আর ভারতীতে মিলানো, নাম মনে রাখা কঠিন। এখানে, ধরো, একশো মাইলের মধ্যে মিলেছে, গাড়োয়াল, পাঞ্জাব, তিব্বত এবং কাশ্মীর। পাহাড়ের চূড়ার উপর দাঁড়ালে সমস্তটাই দৃশ্যমান। সিকিমে গিয়ে গ্যাংটকের দরবার গুম্ফার প্রাঙ্গণে দাঁড়ালে যেমন দেখা যায় উত্তরে তিব্বত, পূর্বে ভূটান, পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ,—ঠিক এখানেও তেমনি। এই ভূভাগেরই ভিতর দিয়ে চলে এসেছে শতদ্রুর নানা শাখাপ্রশাখা অসংখ্য বিভিন্ন নামে। ঠিক এইখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে কিন্নরদেশ। উত্তরে দুস্তর পার্বত্যপথ, শস্যতরুলতাহীন তা'র চেহারা; দক্ষিণে অনন্ত শ্যামশ্রী এবং মাঝে মাঝে অগণিত দেবালয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি লোকবসতির আশেপাশে দেবস্থান।

এত মন্দির ও দেবস্থান কেন হিমালয়ে? এর জবাব পেয়েছিলুম নিজেরই

মনে। পার্বত্য শহরের কাছাকাছি যখন আসছি, যখনই এসে পৌছচ্ছি একটা কর্মজগতের কোলাহলে,—তখনই দেবালয়ের সংখ্যা কমে আসছে। যখনই দুঃসাধ্য দুস্তর পার্বত্যলোকের দিকে এগোই তখনই এর সংখ্যা যায় বেড়ে! এর কারণ স্পষ্ট। মানুষ একা থাকতে চায় না, মানুষ চায় মিলন। ভালোবাসা দিয়ে বাঁধে, বন্ধুত্ব দিয়ে সেতু নির্মাণ করে, স্নেহের দ্বারা সম্পর্ক লালন করে। দেবালয় হোলো সেই মিলনের কেন্দ্রস্থল। এই দেবালয় থেকে শঙ্খের ফুৎকার আর মঙ্গলঘণ্টার আওয়াজ দূরদূরান্তরে চ'লে যায়; ডাক দিয়ে আসে পাহাড়ে পাহাড়ে, বার্তা পাঠিয়ে দেয় গ্রাম থেকে গ্রামে; প্রতি মানুষের মনে মিলনের চেতনা জাগায়। এই দেবালয় মানুষের মনে আনে নীতিবোধ, সমাজধর্মচেতনা, অন্যায়ের প্রতি অনাসক্তি, শুচিশুদ্ধ জীবনেব প্রতি অনুরাগ। একটি বিচারালয় আছে চিনি-তে,—কিন্তু সেখানে না আছে মক্কেল, না আছে মোকদ্দমা। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি—এসব কিছু নেই, —বিচারালয় উপবাস ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিভৃত কিন্নরের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার চেহারা সন্দেহ নেই, মনের মধ্যে সম্ভ্রমবোধ আনে। দক্ষিণ কিন্নর নাচে আর গানে মুখর। চাষী মেয়ে নেচে-নেচে গান ধরে আর মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও সে নাচিয়ে বেড়ায়! অলঙ্কার আর আভরণ ফিরিয়ে দিলে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটলো, ব্যস, বাকি জীবন নেচে গেয়ে কাটানো। নেচে এলো ঘরের বউ শ্রমিকের সঙ্গে। বনকুসুমের কোরক ধরেছে যখন, যখন ঘনশ্যাম অরণ্যতলে নেমে এসেছে নব-বসন্তের রক্তিম আভা,—কিন্নরীর দল তখন গিয়ে নৃত্যগীত ক'রে এলো তরুণ সুকুমার কাঠুরিয়াদের সঙ্গে। ভিন্ দেশের পর্যটক কিংবা পরিব্রাজক গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে—কটাক্ষবতী নর্তকী এলো এগিয়ে মধুর বিস্ময়ে ডেকে নিয়ে গেল আপন অঙ্গনে,—আঙুরে, আপলে, মাখনে, মিষ্টান্নে করলো তা'র অভ্যর্থনা। তারপরে ওরা মধুর কণ্ঠে গান গাইল,—সে-গানের ভাষা দুর্বোধ্য, সুরও অপরিচিত, কিন্তু সেই কাকলীকণ্ঠের মর্মস্থলে আছে অনাস্বাদিত উপলব্ধি, আত্মার রহস্য-উচ্ছ্বাস, আনন্দের সুদীর্ঘ জয়ঘোষণা! পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে শতদ্রুর তীরে তীরে সেই সঙ্গীত সেখানে পরম সত্য, কেননা ওই গানের সঙ্গে সেখানে,—হ্যাঁ, কেবল সেখানেই পরমার্থের আস্বাদ মেলে। পাল-পার্বণ উপলক্ষে গানের সঙ্গে নূতন ধরনের নৃত্য,—যেমন কুলু উপত্যকায়,—অসুরের মুখোশ,—পিশাচের, প্রেতের জন্তুজানোয়ারের। নাচের সঙ্গে *প্রাণের প্রবল আবেগের উত্তাপ, যাকে বলে প্যাশন,—অন্যায়কে ভয় দেখানো,* পাপকে বিতাড়িত করা, মহতের মৃত্যুকে অস্বীকার করা, পুণ্যের জয়যাত্রার

সঙ্গে জনতার স্বীকৃতি মেলানো। আলুথালু হয়ে নাচে কিন্নরী মেয়ে, অঙ্গে অঙ্গে তা'র নাচের দোলা, নাচে তা'র জীবন আর মরণ। সেই নাচের সঙ্গে মেলানো থাকে ঝড়ের তাড়না, বর্ষার বেদনা, বসন্তের যৌবনযন্ত্রণা! সেই নৃত্যরঙ্গের কাঁপন গিয়ে স্পর্শ করে প্রান্তরচারী মেষপালককে, পথচারী ব্যবসায়ীকে, কুটির শিল্পের কর্মচারী তরুণ যুবককে,—ওই সঙ্গে তারাও গান গেয়ে ওঠে দীর্ঘকণ্ঠে। সমগ্র কিন্নরের পার্বত্যলোকে সেই গান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়।

উত্তর কিন্নরে ভিন্ন চেহারা। দক্ষিণের পাপ এখানে না ঢোকে। বিশাল তোরণের তলা দিয়ে এসে প্রবেশ করো, সমস্ত অকল্যাণ রেখে এসো বাইরে। রুক্ষ, ঊষর, উপলবহুল, কঠিন পার্বত্যপথ,—ওইখান দিয়ে এসে আনত বিনয়ে লামাদের পায়ে সাষ্টাঙ্গে পূজা নিবেদন করো এবং আশীর্বাদ মাথায় তোলো। সেই যেমন আগে দেখেছি, এখানেও প্রতি পদে পদে শত শত ছিন্ন কাপড়ের টুকরো,—প্রেত-পিশাচের বিরুদ্ধে ওই শ্বেত পতাকা,—ওই পতাকার প্রতি দোলনে প্রার্থনা ভেসে চলেছে গৌতম বুদ্ধের উদ্দেশে, যিনি লামাদের পরম গুরু। প্রতি মানুষ পড়ছে মন্ত্র, যেমন তিব্বতের স্বভাব—প্রতি মানুষের হাতে পূজাচক্র। আশেপাশের পাথরে-পাথরে লেখা—'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'। যে-বস্তিটি ওরই মধ্যে একটু বড়, সেখানে একটি গুম্ফা। সেখানে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত এবং বাইরে একটি প্রকাণ্ড ঢোলডঙ্কা। মেয়েরা পূজার্থিনী, মুখে চোখে সৌম্যভাব, চেহারা রুক্ষতার মধ্যেও সুশ্রী, মাথার চুল ছাঁটা। সমগ্র জীবন ধ'রে দেবসেবা লামাসেবা! লামারাই সর্বাধিনায়ক। লামাদের হাতেই সমাজ-ব্যবস্থা, জীবন-মরণের দায়িত্ব। এই উত্তর কিন্নর দিয়ে তিব্বতের পথ সোজা চ'লে গেছে গারটকের দিকে শতদ্রুর ধারে ধারে, ড্যাবলিং ছাড়িয়ে এবং 'শিপকি' পর্বতের বিরাট তুষারাচ্ছন্ন চূড়ার তলা দিয়ে। মাঝখানে পড়ে লুক এবং পিয়াং নামক দু'টি জনপদ। দেখতে দেখতে দুর্গম পর্বতমালা পেরিয়ে গারটকে গিয়ে এই ক্যারাভান্ পথটি মূল পথের সঙ্গে মেলে। গারটক হোলো ভারত আর তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যের একটি প্রধান ঘাঁটি। এই শহরের আগে পর্যন্ত দুর্গম এবং অনধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে ভারত ও পশ্চিম তিব্বতের সীমানা সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট। কাগজপত্রে এবং মানচিত্রে এর কতখানি সমাধান করা আছে বলা কঠিন। গারটক থেকে ক্যারাভান্ পথ গেছে চারিদিকে। দক্ষিণ পূর্বে কৈলাস ও মানস সরোবরের পথ,—এপথে যায় অনেকে। কিন্তু ঠাণ্ডার জন্য মৃত্যুভয় এখানে প্রচুর। উত্তরে একটি পথ গেছে সিন্ধুনদের দিকে, যেখানে লাদাখ ও কাশ্মীর যাবার

প্রধান ক্যারাভান পথ। উত্তর-পূর্বে একটি পথ গেছে তিব্বতের হৃৎকেন্দ্রে— যেদিকে থোক্ জালুঙের সোনার খনি। অন্য একটি উত্তরের পথ তাগিসঙ হয়ে মধ্য এশিয়ার দিকে চলে গেছে। সুতরাং গারটক হোলো তিব্বত-ভারতের অন্যতম প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। সম্প্রতি চীন-ভারত চুক্তির মধ্যে গারটকের কথাটাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কৈলাস পর্বতশ্রেণীর প্রায় মধ্য-কেন্দ্র বিরাট পর্বতচূড়ার উপরে এই গারটক শহর অবস্থিত,—উচ্চতায় পনেরো হাজার ফিটেরও বেশী। আমাদের পরিচিত পৃথিবীর থেকে এই পার্বত্য জগৎ এতই পৃথক এবং এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব বন্য বিস্ময় আনে যে, সমতল জগৎ ও আধুনিক সভ্যতাটাকেই স্বপ্নবৎ মনে হয়। পৃথিবীর আদিম চেহারাটা চোখের সামনে আনে, আনে হাজার হাজার বছর আগেকার একটা অদ্ভুত চেতনা,—কেমন একটা দিগন্তজোড়া নির্বাক বিস্ময়, যেটার কথা মনুষ্যসমাজের কাছে গিয়ে বর্ণনা করলে নিজের কানেও অলীক শোনাবে। এমনি একটা উপলব্ধি কাশ্মীরের প্রান্তে জোজিলা গিরিসঙ্কটের কাছাকাছি গিয়ে আমার মনে এসেছিল। এখানে ঘোড়া, কিংবা টাট্টু, কিংবা ঝব্বু ও চমরী—যেটা মহিষের লোমশ কুটুম্ব এবং অতি শান্ত নিরীহ জীব,—এরা ছাড়া যানবাহনাদির আর কোনো কথা ওঠে না। পৃথিবীর কোথাও চাকার গাড়ি আছে, কিংবা চর্বির প্রদীপ ছাড়া পেট্রল-কেরোসিন নামক কোনো পদার্থের গন্ধ আছে, এ একেবারে অজ্ঞাত। সম্প্রতি নারকান্দা অবধি মোটরপথ চলছে, এবং আবহাওয়া ভালো থাকলে জীপগাড়িতে আউট হয়ে কুলুউপত্যকার পথেও যাওয়া যায়। কিন্তু নারকান্দা থেকে রামপুর তথা চিনির পথ যথাসম্ভব সুগম করা দরকার। চিনির পথে সম্প্রতি চীন সৈন্যদলের যে বেআইনী প্রবেশ ঘটেছিল সে-সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্ট-এর পক্ষে সচেতন থাকা প্রয়োজন, এবং যানবাহনের সুব্যবস্থা যত শীঘ্র উন্নত হয়, ততই মঙ্গল।

শিমলা থেকে নেমে এসেছিলুম বহুদিন পরে। কিন্তু সেখানকার পাহাড়-তলীর সেই ফুলবাগান ঘেরা ছোট্ট বাড়িটি, তার পাশে ঝরণার সরসরানি, তা'র সঙ্গে বন্ধুবান্ধবগণের মধুর সঙ্গ—অনেকদিন অবধি আমার মনকে উন্মনা করে রেখেছিল। কিন্তু অতিশয় দুর্ভাগ্যের কথা, কলকাতায় ফিরে গিয়ে সবেমাত্র যখন সবিস্তারে গল্প ফেঁদে বসেছি, এখন সময় শিমলার এক নিদারুণ সংবাদ 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' ছাপা হোলো, আমার অতিথিসেবক সাংবাদিক বন্ধু সত্যেন্দ্র প্রসাদ বসু গতকাল অপরাহ্ণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

তা'র শেষকৃত্যের সময় ভারতের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি এবং স্বয়ং স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার উপস্থিত ছিলেন।

এই সংবাদটি প্রকাশিত হবার ঠিক পরের দিন শিমলা থেকে সত্যেনের স্বহস্তলিখিত এক পত্র আমার হাতে এলো :

"তোরা একে একে বিদায় নিয়ে আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলি, আমিও এর প্রতিশোধ নেবো ব'লে রাখলুম।···দিন চারেক আগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এখানে এসেছিলেন তাঁর কাছে! আমার সেই পুরনো হার্টের অসুখ তোর মনে আছে ত'? ডাঃ রায় এবারে আরেকবার পরীক্ষা ক'রে বললেন, "পাহাড়ে থাকা তোমার কিছুতেই সইবে না, তুমি এক্ষুণি নীচে নেমে যাও।" কিন্তু আমি গেলে এখানে 'ইউনাইটেড প্রেস'-এর কাজ আর কেউ চালাতে পারবে কি? সমস্যার প্রতিকার কি, তাই ভাবছি···"

সত্যেনের মৃত্যুর পর শিমলার প্রতি অরুচি এসেছিল বেশ কিছুকালের জন্য। কিন্তু হিমাচল প্রদেশ ভ্রমণ অসমাপ্ত থাকার জন্য অতঃপর বারম্বার হিমলায় যেতে হয়েছিল। বিলাসপুরের নিচে শতদ্রু, সুন্দরনগরের মনোরম উপত্যকা, বাস্‌পা ভ্যালি, কাংড়ার বজ্রেশরী, ধরমশালা থেকে চামুণ্ডা, জ্বালামুখী-যোগেন্দ্রনগরের পথ, কুলু-মানালির অমর্ত্যলোক,—এদের আকর্ষণ এড়ানো যায়না। শিমলায় তাই বারবারই যেতে হয়।

১৯৭৮-র অক্টোবরের কথাটা বলি। ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগ আমাকে নিয়ে চললেন সেই কিন্নরলোকে। এবার মোটরপথ,—এককালে যা ছিল স্বপ্নবৎ। মসৃণ সুন্দর পথ চলে গেছে সনজৌলি আর কুফরি ছেড়ে নারকান্দার ক্ষুদ্র জনপদে। সেখান থেকে উৎরাই পথে ওদ্দি-হাওয়ানের ঘন পাইন বনের ভিতর দিয়ে কুমারসাঁই ও দত্তনগর ছাড়িয়ে শতদ্রুর তীরে সেকালের সেই রামপুর। এটি প্রাচীন বুশাহর রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখনও তার মধ্যযুগীয় চিহ্নাদি বর্তমান। রামপুর ছাড়িয়ে গেলে নতুন পথ। এপথ নির্মাণ করেছেন ভারত গভর্নমেণ্ট। রামপুর থেকে ওয়াংটু, তাপরি, কারচাং, পিয়ো—সমস্ত পথই এখনও বিঘ্নসঙ্কুল এবং শঙ্কাজনক। আগেকার পথ ছিল উপর দিকে,—সে পথে যাওয়া যেত ঘোড়ায়। কিন্তু এখনকার পথ শতদ্রুর তীরে-তীরে। এটি সীমান্ত ভূভাগ, সুতরাং সামরিক দিক থেকে এর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। পাহাড় কাটতে হয়েছে, সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে হয়েছে, পথ নানাভাবে ঘোরাতে হয়েছে,—এবং এর জন্য বহু শ্রমিক ও জওয়ানকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

হিমালয়ের বন্য সৌন্দর্য কিন্নরদেশের মতো বোধ হয় অন্য কোথাও এমন

অভিব্যক্ত নয়। এ যেন আদিমকালের আরণ্য ও পার্বত্য ভূভাগ। এই ভূভাগের প্রধান কেন্দ্র 'চিনি' জনপদটি প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে যেন নিঃসঙ্গ তপস্বীর মতো ব'সে রয়েছে। চিনির বর্তমান নাম 'কল্পা।' কিন্তু সামরিক বিভাগে এখন 'চিনি'র নাম উলটিয়ে রাখা হয়েছে 'সুগার সেক্টর।' অর্থাৎ রামপুরের পর থেকে স্পিতি উপত্যকার তিব্বত সীমানা পর্যন্ত প্রায় পৌনে দুশ' মাইল ব্যাপী পথের সামরিক ব্যবস্থাপনার নামই দেওয়া হয়েছে 'সুগার সেকটর।'

এই 'সুগার সেক্টর' পরিদর্শন করার দরকার ছিল আমার। এটি আদিম হিমালয়ের গহনলোক। শিমলা থেকে বেরোলে এর শেষ প্রান্ত অবধি পৌঁছতে এখন প্রায় সাড়ে তিনশ' মাইল দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হয়। এতকাল এ অঞ্চল সামন্ত রাজার অধীনে থাকার জন্য আধুনিক কালের উন্নত জীবনযাত্রার পরিবেশ এদিকে বিশেষ কোথাও চোখে পড়েনা। পাহাড়ের দেওয়াল ঘেরা অবরোধের মধ্যে এরা জীবন কাটিয়ে এসেছে এতকাল। এদের প্রধান কুটুম্ব হলো কুলু উপত্যকার অধিবাসীরা,—সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী অতিক্রম ক'রে গেলে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। সমতল ভারতের সঙ্গে এদের জনসংযোগ ছিল খুবই কম। ভারত অপেক্ষা তিব্বতকে এরা বেশি চিনত। কাজ-কারবার, বেচা-কেনা,—তিব্বতের সঙ্গেই ছিল বেশি। ফলে, জাতি-মিশ্রণ, সমাজ-মিশ্রণ ও ভাষা-মিশ্রণ ঘটেছে পদে পদে।

পিয়ো থেকে কল্পা ৪০ মাইল পথ। শেষের দিকে বন্য নদীপথ ছেড়ে চড়াই উঠতে হয়। সামরিক বিভাগের অশ্রান্ত উদ্যমে এদিকে পথঘাটের এবং বিভিন্ন নির্মাণকর্মের যে ধরণের উন্নতি ঘটেছে, সেটি দশ বছর আগেও কিন্নর দেশের পক্ষে অভাবনীয় ছিল। এ ছাড়া বিনামুল্যে চিকিৎসাকেন্দ্র, বহুস্থলে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রসূতি সদন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্ম-সংস্থানের সুযোগ, গৃহনির্মাণের সুবিধাদান,— ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগ এগুলিকে তাঁদের কর্তব্য বলে ধ'রে নিয়েছেন।

কল্পার একদিকে বিস্তৃত উপত্যকা এবং সেই উপত্যকার আশেপাশেই অল্পবিস্তর জনবসতি। উচ্চ মালভূমিতে ঝর্ণার জলেই চাষ-আবাদ ও পানীয়ের ব্যবস্থা। সুতীবস্ত্রাদির প্রচলন কম। শীতপ্রধান ভূভাগ, সেজন্য পরিচ্ছদ মাত্রই পশমের। ভুট্টা ও যব নিয়ে ক্ষেত-খামার। গত ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুম্ফাটি আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়। ভস্মীভূত হবার কারণটি রাজনীতিক বলেই অনুমান করি। সমতল ভারতের সঙ্গে এদের যোগাযোগ তেমন ছিলনা বলেই ইদানীং এদের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব মাঝে মাঝে দেখা দেয়। যুবজনের একটা অংশ প্রতিরক্ষা বিভাগে কাজও পেয়েছে!

এ নিয়ে অশান্তি ও দলাদলিও আছে। এখানকার যিনি ডেপুটি কমিশার, তিনি এক সৌম্যদর্শন বাঙ্গালী যুবক। নাম বিশ্বরঞ্জন বসু। তিনি ও তাঁর সুদর্শনা স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম। ডাকবাংলোয় আমার বসবাসের ব্যবস্থা বিশেষভাবে আরামদায়ক ছিল।

কল্পার অপর দিকে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের দেওয়াল তুষার সমাকীর্ণ। ওই বিরাট পর্ততশ্রেণীর ঠিক মাঝখানে একটি চূড়ার নাম 'ছোট কৈলাস।' এটির আয়তন মন্দিরের মতো—কিন্তু এটি মানুষের পক্ষে অগম্য। কিন্তু এই চূড়াটি প্রাকৃতিক কারণে এবং বায়ুস্তরের সপ্তবর্ণ সূর্যরশ্মির প্রভাবে সারাদিনমানের মধ্যে বার বার নিজের রং বদলায়। দৃশ্যটি কৌতুকজনক। কখনও রক্তিম বা হরিদ্রাভ, কখনও হরিৎ বা রক্তনীল, কখনও ভস্মবর্ণ, কখনও বা গৈরিক। কেউ বলে প্রকৃতির খেয়াল, কিন্তু স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস এটি দৈব।

কল্পা থেকে পুহ নামক জনপদ ৮০ মাইল। এটি অতি প্রাচীন পার্বত্য জনবসতি। পাখীরা যেমন থাকে উচ্চবৃক্ষচূড়ায়,—এ অঞ্চলেও তেমনি। চারিদিকে বৃক্ষ-গুল্মলতাহীন পর্বতের প্রাকার, অগাধ নীচে কলমুখরা শতদ্রুর দুরন্ত প্রবাহ, উপর দিকে পাখির বাসার মতোই কয়েকটি পাথুরে ঘর, এদের বাইরে এই পার্বত্য পৃথিবী জনশূন্য ও প্রাণীশূন্য। এর বিজনতা কেমন যেন একটা ভীষণতার রোমাঞ্চ আনে। সূর্য কিরণের কালেও পৃথিবী নিশ্চুপ। চাঁদিনী রাত্রের বাঁকা জ্যোৎস্নার দিকে মদির আবেশে অবাক চোখে চেয়ে থাকতে হয়। পুহ ছাড়িয়ে গেলে পথ ঘুরে এসে ডাবলিঙের সাঁকো। এখানে শতদ্রু পার হয়ে পথ চলে গেছে স্পিতি উপত্যকার দিকে ৫০ মাইল দূরে। ডাবলিঙ সাঁকো থেকে কয়েক মাইল গিয়ে চড়াই পথে উঠে গেলে 'নামগিয়ার' ক্ষুদ্র জনপদ। 'নামগিয়া' থেকে অতি রুক্ষ বালু ও পাথরের সঙ্কীর্ণ একটি রেখা পথ চড়াই ধরে উঠে গেছে 'হুপ্‌সন খদ' পেরিয়ে 'শিপকি-লা' গিরিসঙ্কটে। এটি ভারত-তিব্বত সীমানা।

হুপ্‌সন খদ-এর পথটিতে পা বাড়ালে এবং সেই সূত্ররেখাপথের বাঁ দিকে নিচের গভীরতার দিকে তাকালে যে কোনও অসমসাহসিক পর্বতারোহীর গলা শুকিয়ে যায়। আমার নার্ভের জোর এমন ছিল না যে ঘোড়ার পিঠে যাই। পনেরো হাজার ফুট উঁচু সেই অতি রুক্ষ পথরেখাটি ধ'রে যাবার কালে বায়ুশূন্যতার জন্য আমার শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে ছিলেন বাঙ্গালী এক প্রতিরক্ষা বিভাগের ডাঃ চক্রবর্তী। তিনি আমার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলেন একখানা ষ্ট্রেচার, পাছে অসুস্থ হই। সঙ্গে ঔষধপত্রাদি, পাছে অপঘাত ঘটে। কিছু খাদ্য ও পানীয়। পরিশেষে জন দুই সশস্ত্র দেহরক্ষী। এর সঙ্গে দুটি ঘোড়া ও তাদের রক্ষী। মোট জন আষ্টেক।

কিন্তু এগুলির কোনটিই আমার কাজে লাগেনি। এক সময়ে সুস্থ দেহেই নেমে এলুম 'নামগিয়ার' তাঁবুতে। এই তাঁবুতে হঠাৎ এসে হাসিমুখে যে দানবাকার ব্যক্তি সামনে দাঁড়ালেন, তিনি লেফটেনাণ্ট কর্ণেল মিঃ চীমা—যিনি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এভারেষ্ট শৃঙ্গে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন। আমরা উভয়ে পলকের মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলুম। চীমা এখন দার্জিলিংয়ে 'হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইন্‌ষ্টিটুটের অধ্যক্ষ। এই সূত্রে মনে পড়ছে বিজয়ী এভারেষ্ট অভিযানের দলপতি কমাণ্ডার কোহ্‌লী কলকাতায় আমার বাসস্থানে একটি সন্ধ্যার আনন্দ-আসরে যোগদান করেছিলেন। 'হিমালয়ান্ ফেডারেশনের' প্রেসিডেণ্ট হিসাবে আমার সঙ্গে এঁদের যোগ প্রায় অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। তা ছাড়া এঁরা ফেডারেশনের মুখপত্র 'হিমবন্ত'-র নিয়মিত লেখকও বটে।

'নামগিয়া' থেকে বেরিয়ে গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে আমরা একেকটি স্থল পার হয়ে গেলুম—যাদের নাম 'খাব, খা, মালিং, চাংগো, সালকার এবং সুমডো'। সুমডোতে কিছুক্ষণ কাটালুম। এটি পড়ে স্পিতি উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। শতদ্রু ঠিক এইখানে দু'তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। মূলধারাটি প্রবেশ করেছে হিমাচলে। এখানে উপত্যকার আগাগোড়া বালুপাথরে আকীর্ণ। যত দূর দেখা যায় বালুর ঢিবি পাহাড়, বালুময় স্রোতধারা এবং পাথরের স্তূপ। চারিদিকের অনুর্বর উষরতা দেখলে চোখ ঝলসিয়ে যায়। এখানেও একজন বাঙ্গালী কর্মীকে পাওয়া গেল, তিনি মিঃ সরকার। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে আলাপ করতে লাগলেন। আমি তাঁর অচেনা নেই। লক্ষ্য করলুম, সুমডো একটি প্রবীন কর্মকেন্দ্র। শুনলুম, এখানকার পাহাড়-পর্বতের নানাস্থলে কমবেশী সাড়ে তিনশ' বাঙ্গালী ও ওড়িয়া কর্মী রয়েছে।

সুমডো থেকে 'কৌরিকি'র সীমান্তরক্ষীর ঘাঁটি কয়েক মাইল বালুপথে চড়াই উঠে যেতে হয়। ঘাঁটির প্রাঙ্গণে ভারতীয় পতাকা উড়ছে। ঘাঁটির গা ঘেঁষে তিব্বতের বালু-পাথর ভূমি। বহুদূর পর্যন্ত তিব্বতভূমি আপাতদৃষ্টিতে জনশূন্য। এখানে এখন প্রচণ্ড শীত, এবং অতি শুষ্ক ঠাণ্ডা হাওয়া। দিন রাত জবজবে ক'রে ক্রীম না মাখলে গায়ের চামড়া দেখতে দেখতে চিরে গিয়ে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ে। প্রতি একমাসে এখানে 'রক্ষী' বদলাতে হয়। শীতের চার পাচ মাস এই ভূভাগ তুষার সমাধিস্থ থাকে।

এটি হিমাচল প্রদেশের শেষ প্রান্ত, এবং আমার পক্ষে এই যাত্রায় হিমাচল প্রদেশ ভ্রমণ সম্পূর্ণ হ'ল।

॥ ৯ ॥

মানসখণ্ডের সীমানায় দাঁড়িয়ে তিনটি তরুণ ব্রাহ্মণ একদা কৈলাসপতির প্রসন্ন আশীর্বাদ লাভ করেছিল,—তোমাদের ভারত বিজয়যাত্রা সার্থক হোক, তোমরা দেবভূমির উদার নীল নভোতলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বার্তা বহন ক'রে নিয়ে যাও। কালপ্রহরীর মতো ভারতকে তোমরা আবহমান কাল বেষ্টন ক'রে থাকো!

তরুণী ভৈরবী এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে তা'র এলোচুল ফিরিয়ে। বললে, প্রভু, 'অনবতপ্তা' মানসের নীলপদ্মপাত্র থেকে আমিও অঞ্জলি ভরেছি। আদেশ করুন দেবাদিদেব, আমিও যাত্রা করতে চাই!

কৈলাসপতির নির্দেশক্রমে তিনিটি বাহ্মণ গেল তিনদিকে—উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে। হাস্যোচ্ছলা যোগিনী যুবতী চললো দক্ষিণে জননী ভারতের ললাট সীমন্তের মতো। যাত্রারম্ভের পূর্বে ওরা চারজনে মন্ত্রপাঠ করতে করতে সাতবার কৈলাস-মানস প্রদক্ষিণ করেছে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার এই কাহিনী। কিন্তু ওই চারজন আপন আপন পথে কোথাও বাধা মানেনি। ওরা তুষারকেতনকে অতিক্রম করেছে, ঝঞ্ঝাগতি হিমপ্রপাতকে পরাজিত করেছে,—তারপর বিজন ভীষণ অরণ্যানী, গগনচুম্বী গিরিশৃঙ্গমালা, ভয়াল প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব—, ওরা সব তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে গেছে। অপরের মুখাপেক্ষী হয়নি, ভিক্ষা করেনি পিপাসার জল, স্থির হয়ে থাকেনি কোথাও,—আপন শক্তিতে আপন আপন পথ সৃষ্টি করেছে। ঐশ্বর্য আহরণ করেছে পথে পথে, ফলবান ক'রে গেছে ওরা যাত্রাপথের দুই পার এবং প্রাণের প্রাচুর্যের দ্বারা অস্থির অশ্রান্ত গতি লাভ করেছে। সার্থক হয়েছে কৈলাসপতির আশীর্বাদ!

ওই তিনটি ব্রাহ্মণের নাম হোলো—সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র ও শতদ্রু। আর প্রমত্তা ভৈরবী যিনি, তিনি হলেন কর্ণালী! এরা চারজন বিচিত্র ঐশ্বর্য বহন করেছে চিরকাল। শতদ্রু তার ধারাপথে নিয়ে গেছে স্বর্ণরেণুসম্ভার, রূপের সঙ্গে রৌপ্যচূর্ণ ঝলমলিয়ে উঠেছে কর্ণালীতে, অজস্র হীরকচূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সিন্ধু, এবং ব্রহ্মপুত্র তার পূর্বধারাপথে নিয়ে চলেছে স্ফটিকরত্নসম্ভার। শতদ্রুর জলপান করলে হস্তীর মতো বলবান হয়, কর্ণালীর জলপানে ময়ূরের

মতো সৌন্দর্যশোভাবর্ধন ঘটে, সিন্ধুর জলপানে সিংহের মতো বিক্রম লাভ হয়,—ব্রহ্মপুত্রের জলে আছে বলশালী অশ্বের কঠিন গতি ও অধ্যবসায়!

কর্ণালীর গতি বড় বিচিত্র। কুমায়ুনের কালীনদী আর সরযূর সঙ্গে মিলে সে হয়েছে শারদা, এবং নেপালে প্রবেশ ক'রে কর্ণালী ছদ্মনাম নিয়েছে ঘাগরা,—যার অপভ্রংশ হোলো ঘর্ঘরা,—এই দুই আলুলায়িতা নদী গলাগলি করেছে চৌকাঘাটে, তারপর ওরা ছাপরা থেকে নেমে গিয়ে গঙ্গায় মিলেছে। সরযূই হোক আর ঘর্ঘরাই হোক—পরিণতি ঘটলো গঙ্গায়। ত্রিভুবনতারিনী তরল তরঙ্গিনী গঙ্গা। ভীমা, ভয়ঙ্করী, রুদ্রানী কর্ণালী জাহ্নবীধারায় মিলে হয়েছেন শান্ত এবং আত্মসমাহিত।

পূর্বপথে ব্রহ্মপুত্র জপ ক'রে চলেছে বীজমন্ত্র, তার ধ্যানভঙ্গ হয়নি। চলেছে সে হাজার মাইল পূর্বপথে,—ভারতের ঈশান কোণে 'নামচাবারোয়ার' পর্বত-শিখর প্রদক্ষিণ ক'রে আসামে গিয়ে সে প্রবেশ করেছে। হিমালয়ের অপর পার দিয়ে ষোলহাজার ফুট উচ্চ মালভূমির সমতল পেরিয়ে সুদীর্ঘবিস্তৃত এক সহস্র মাইল ধারাপথে ব্রহ্মপুত্র চ'লে এসেছে,—এর উদাহরণ দু'একটির বেশি নেই। ব্রহ্মপুত্রের আভিজাত্য হোলো, সে কৈলাসমেরুর মানসপুত্র। কিন্তু এই নদ প্রথম বাধা পেলো সেইখানে, যেখানে দেবতাত্মা হিমালয় তাঁর জটারাশির গ্রন্থি খুলে দিয়েছেন উত্তর আসাম থেকে দক্ষিণ আরাকানের দিকে। ওই উত্তর-পূর্ব আসামের তথা নেফার উত্তুঙ্গ গিরিশিখর 'নামচাবারোয়ার' পার্বত্য অঞ্চলে সভ্য মানুষ হয়ত আজও পদার্পণ করেনি, ইতিহাসের যুগেও এই অঞ্চল অকথিত থেকে গেছে। সমতল আসামকে আমরা পাই ইতিহাসে, কিন্তু পার্বত্য বন্য আসামকে পাঠান-মোগল অথবা ইংরেজ আমলে অপেক্ষাকৃত সামান্যই পাই। কেবলমাত্র বর্তমান শতাব্দীর মধ্যকালে এসে আমরা দেখি, প্রাণস্পন্দন যাচ্ছে পার্বত্য আসামে। প্রাণ স্ফুরিত হচ্ছে পাটকাই গিরিশ্রেণীর এখানে ওখানে, নাগা-পাহাড়ের কোলে-কোলে, মিসমি আর মিকিরদের শোনা পাড়ায় পাড়ায়। দেখা যাচ্ছে আগ্নেয়গিরির গলিত অগ্নিস্রাব নেমে আসছে নাগাদের পায়ে পায়ে। ভৈরবের ভয়াল রক্তচক্ষে সভ্যতার বিরুদ্ধে ওরা অস্ত্র-ধারণ করেছে এই শতাব্দীতে। ওখানে এতকাল ধ'রে ভারত সংস্কৃতির পায়ের চিহ্ন পড়েনি, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ওদের কোনওদিন ডাক দেওয়া হয়নি। জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গ-পক্ষী-সরীসৃপের সঙ্গে পার্বত্য আসাম এতকাল ধ'রে আপন জীবনকে মিলিয়ে একপাশে পড়ে ছিল। নাগাভূমির প্রগতিশীল সভ্যতার সঙ্গে ইংরেজ আমলে সমতল ভারতের পরিচয় ঘটেনি।

ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণপথে ঘুরে এসেছে পাং সিং থেকে 'কানি' উপত্যকায়। এই কানি উপত্যকায় এসে ব্রহ্মপুত্রের মূল ধারার স্থানীয় নাম হয়েছে ডিহং। হিমালয়ে কোনও নদী একা আসেনি। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, শতদ্রু, অরুণ, সূর্যকোশী, সপ্তকোশী, জলঢাকা, মানস,—কেউ একা নয়। ভারতে প্রবেশ ক'রে ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের নানা নদীর সাহায্য নিয়েছে। এই কানি উপত্যকার দুই পারে যে বিশাল পার্বত্য ভূভাগ,—এর রাষ্ট্রীয় সীমানা হয়ত আজও নির্দিষ্ট হয়নি। কেউ জানে না, হিমালয়ের অন্তর্গত মিস্‌মি পাহাড়দলের শেষ সীমানা কোথায়! কোথায় গিয়ে ভারতবর্ষের পূর্বোত্তর সীমা খুঁজে পাবো,—কেউ জবাব দেয় না। সভ্য মানুষকে দেখে এখানকার পার্বত্য জাতির লোক এবং আরণ্যক মানুষ হয় ভয়ার্তচক্ষে দূর দূরান্তরে পালায়, আর নয়ত দলবদ্ধ হয়ে এসে সহসা আক্রমণ করে। নিতান্ত দুচারজন ছাড়া কেউ কোনও দিন এদের ভাষা বোঝেনি, এদের প্রকৃত জীবনকে চেনেনি, এদের মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেনি। এখানে নাম-পরিচয়-গোত্রহীন বন্য মানুষের দল বাস করে; ঘর বাঁধে তা'রা বিচিত্র ধরনে,—সেসব ঘর লতাপাতা ও গাছের ডালে ছাওয়া। এদের এক শ্রেণী হোলো যাযাবর, তা'রা ভারত-ব্রহ্ম-চীন-তিব্বত—এসব কিছু বোঝে না। তা'রা সন্ধান ক'রে বেড়ায় ক্ষুধার খাদ্য আর তৃষ্ণার জল। বর্শা, বল্লম, তীরধনুক—এই সব নিয়ে তা'রা ছোটে হিংস্র জন্তুর পিছনে-পিছনে। যেসব জানোয়ারকে দেখে ভীত মানুষ পালায়, কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা সংহার করে,—এদের দেখলে সেই সব জানোয়ার প্রাণভয়ে দৌড়তে থাকে। ত্রিরিশ হাত লম্বা পার্বত্য ময়াল সাপ এদের পক্ষে লোভনীয় খাদ্য। বন্য কুকুরের কাঁচা মাংস এদের কাছে উপাদেয়। এদের কোনও জাতি-পরিচয় নেই,—পাহাড়ের নামে এরা পরিচিত। অরণ্যে পর্বতে জলাভূমিতে তুষারে বন্যায় ভূমিকম্পে—এরা থাকে জড়িয়ে। পিতা মাতা পুত্র কন্যা,—সবাই উলঙ্গ লজ্জার কোনও সংস্কার কোথাও দেখা যায় না। বর্ষায় বসন্তে ঝড়ে রৌদ্রে শীতাতপে—এদের কাজ হোলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অভিযান করা, এবং খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ানো। এরা কোনওকালে কোনও শাসন মানেনি কোনও সভ্যতাকে চোখে দেখেনি, এবং কোনও রাজকে কল্পনা করেনি। এইসব কারণে ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্ত সমতল তর চোখে চিরকাল রহস্যাবৃত। বোধ করি হিমালয়ের আর কোনও ত অন্ধকার নয়।

য়ের যে-প্রধান শাখা আসামের শেষ প্রান্তে উত্তর থেকে দক্ষিণে তা'র নাম পাটকাই গিরিমালা। এই গিরিমালা ভারত ও

ব্রহ্মের মাঝখানে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত প্রাচীর। এই পার্বত্য ভূভাগের উপত্যকার প্রান্তে কুম্‌কি জনপদ থেকে চৌকন্ গিরিসঙ্কটে পৌছে বোধ করি ভারত সীমান্তেরও শেষ হয়। আরেকটি সীমান্ত অঞ্চল বাকি থেকে যায়—সেটি আসাম, ব্রহ্ম, চীন এবং তিব্বতের সন্ধি-স্থল; সেখানে পার্বত্য বন্য নদী শালবনীর তীরে পৌছে ভারতে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শেষ হলেও কিছু কথা বাকি থাকে বৈকি। ভারতের সীমানা তথা আসামের প্রশাসনের সীমানার গায়ে-গায়ে আছে নানা পার্বত্য অঞ্চল,—তা'রা কি আজও উত্তর-পূর্ব-সীমান্ত এজেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?

একদা চীন ব্রহ্ম তিব্বত ভারত—প্রত্যেকের উপর ইংরেজের দখল ছিল। সেই কারণে এই চতুঃশক্তির সীমানারেখা নিয়ে কখনও কথা ওঠেনি। আজ চাকা ঘুরছে। কিন্তু দুঃসাধ্য দুস্তর এবং অগম্য সেই সব সীমানা অঞ্চলে ভারতের অধিকার কি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে? প্রত্যেকটি সীমারেখার কি নির্দিষ্ট চেহারা পাওয়া গেছে? পাহাড়ে-পাহাড়ে এ প্রশ্ন আজ উঠেছে বৈকি।

হিমালয় থেকে প্রথম যখন ব্রহ্মপুত্র পাংসিং উপত্যকা পেরিয়ে ভারতে এসে প্রবেশ করলো তখন তা'র ছদ্মনাম হোলো ডিহং। মিস্‌মি গিরিশ্রেণীর পশ্চিম পার্বত্য উপত্যকার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর সকল প্রকার হিংস্র জানোয়ার ও সরীসৃপের আবাসভূমি পেরিয়ে ডিহং নদ যখন পাসিঘাট ও 'কোবো' অঞ্চলে সদিয়ার কাছাকাছি এলো, তখন দেখি আর একটি সুবিস্তৃত নদ বয়ে এসেছে ওই সদিয়া নগরের গায়ে-গাঁয়ে, তা'র নাম হোলো ডিবং। ডিহং আর ডিবং যখন একাকার হোলো, তখন পূর্বদিক থেকে এসে পৌছলো লোহিত নদী। এরা তিনজনেই হিমালয়ের সন্তান, কিন্তু তিনজনেই মিস্‌মির বিরাট পার্বত্য ভূভাগ ও অগণ্য উপত্যকাকে নানাভাগে বিভক্ত করেছে। মানুষের কোনও সভ্যতা এখনও এই সুদূরবিস্তৃত পার্বত্য এলাকায় কোথাও আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। এই মিস্‌মির ভিতর দিয়ে তেরো হাজার থেকে প্রায় উনিশহাজার ফুট চড়াই পথে উত্তরপূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হলে যে গিরিসঙ্কট পাওয়া যায়, সেটি ভারতের অন্যতম তোরণদ্বার। কিন্তু এর পর থেকে কত দূর অবধি অগ্রসর হ'লে ভারতের সীমারেখা পাওয়া যাবে, এটি আলোচনার বস্তু। আমার বিশ্বাস, এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে যে-প্রকার আন্তর্জাতিক রাজনীতিক চেতনা দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রসীমা নিয়ে যেসব নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে,—এরা আগে ছিল না। কেউ খবর রাখেনি, ভারতের পার্বত্য অঞ্চল কোথায় এবং কতদূরে বিস্তৃত, অথবা হিমালয়ের প্রকৃত ভারতীয় সীমারেখা কোন্‌স্থলে পৌছলে পাওয়া যায়। সমতল আসাম উপত্যকাকে সবাই জেনে এসেছে

এতকাল, কিন্তু পার্বত্য আসামের প্রকৃত স্বরূপকে জানবার চেষ্টা না করায় তা'রা ধীরে ধীরে যুগে যুগে অনাত্মীয় হয়ে উঠেছে। মিকির, ডাফলা, মিরি, আরব, বোরি, মিস্‌মি ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি বাসা বেঁধে আছে মূল হিমালয়ের নীচে আসাম উপত্যকার উত্তরাংশে। ওই সব জাতির সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াই, তখন দেখি তামাসা, তখন দেখি প্রদর্শনী। ওরা নাচে অর্ধনগ্ন হয়ে, মেয়েরা গায়ে কাপড় দেয় না,—ওরা তীরধনুক নিয়ে থাকে, অদ্ভুত ওদের জীবনযাত্রা,—ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা ওদের ছবি তুলে আনি, কাগজে ছাপি,—এবং নগ্ন নৃত্যের শিল্প-বিচার নিয়ে রসিক সমাজের সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু একথা কখনও মনে করিনে, ওরা আমাদেরই লোক, ওদের সমাজ এবং জীবনধারা আমাদেরই একটা অংশ মাত্র, ওদের অন্নবস্ত্র আশ্রয় জোটে না—সে আমাদেরই অপরাধ। ওরা যে দুর্গম অঞ্চলের অধিবাসী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, সে আমাদেরই প্রাণের টানের অভাবে। ইংরেজ একথা জানে, আমেরিকানরাও একথা বোঝে,—সেজন্য তা'রা মিশনারী পাঠিয়ে একদিকে যেমন শত সহস্র অসমিয়াকে খ্রীষ্টান বানিয়ে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে তাদের গভীর পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, তেমনি অন্যদিকে অনুচর পাঠিয়ে সমগ্র আসামের পার্বত্য অঞ্চলকে উসকিয়ে তা'রা জাতীয়তাবাদী ভারতের সঙ্গে তাদের বিবাদ বাধতে চেয়েছে আজ পার্বত্য আসামে গিয়ে কোথাও-কোথাও দাঁড়িয়ে চেনবার জো নেই, এরা প্রকৃত ভারতীয় কিনা। এদের সমাজ, এদের আচার-আচরণ, এদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি,—প্রায় সমস্তই ভারতচিত্ত বিরোধী। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা কেউ ভোলেনি—যখন ইংরেজের ক্যাবিনেট্‌ মিশন ভারতে এসে সমগ্র আসামকে 'সি' স্টেটে পরিণত করতে চেয়েছিল মুসলিম সংখ্যাপ্রধান বাঙলার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে। পরবর্তীকালে আসাম-কংগ্রেসের অমনোযোগ ও ঔদাসীন্যের ফলে শ্রীহট্ট ভূভাগ হস্তান্তরিত হয়ে এই চক্রান্তের আংশিক সাফল্যলাভ ঘটায়।

সমতল ভারতের স্নেহমমতা পায়নি ব'লে পার্বত্য আসাম কেঁদেছে অনেকদিন। তাদের মিনতি কেউ শোনেনি, তাদের প্রার্থনায় কেউ কান দেয়নি, এবং তাদের অনেকে যখন সভ্য সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন কেউ বিশেষ আমলও দেয়নি। সেই একই দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় রক্ত,—যার থেকে উৎপত্তি বাঙালীর,—সেই রক্তে অসমিয়ারও সৃষ্টি, সেই রক্তে ভূটান আর সিকিম্‌—সেই রক্তই গেছে ত্রিপুরায়, মণিপুরে, আর ব্রহ্মদেশে। অনেকে বলে, দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয় রক্তে বঙ্গোপসাগরের উত্তরপূর্ব ভূভাগ সৃষ্টি হয়। আর্যজাতি

এদিকে এসেছে তাদের শেষ অভিযানের পূর্বে। কিন্তু তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কতখানি প্রভাব হিমালয়ের এই ভূভাগে রেখে গেছে বলা কঠিন। আমাদের আচমনী মন্ত্রে ব্রহ্মপুত্র নেই, প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে আসামের উল্লেখও কম। মহাকাব্যের যুগে এসে দেখি, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। বর্তমান ডিমাপুর সেই প্রাচীন 'হিড়িম্বাপুর' কিনা কে জানে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাগরাজকন্যা উলুপীকে আবিষ্কার করেন এবং মণিপুররাজ দুহিতা চিত্রাঙ্গদা এবং উলুপী—দুইজনের সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়। এর পরে পার্বত্য আসামের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার যে-সকল যোগাযোগ, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে গল্পের আকারে কানে আসে। কিন্তু ইতিহাসের যুগে এসে দেখি, পার্বত্য আসাম অনেক দূরে স'রে গেছে উপত্যকাময় আসাম থেকে। ওরা কেউ খোঁজ রাখে না ওদের ইতিহাস। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও ঘটেছে প্রচুর।

যারা এতকাল ধ'রে বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত হয়ে এসেছে, যারা কোনোদিন ভারত-রাষ্ট্রের সভ্যসমাজে আমল পায়নি, সেই নাগাগিরিশ্রেণী আজ আগ্নেয়-গিরিতে পরিণত হয়েছে। ভারতকে তারা চেনেনি কোনওকালে, ভারতও তাদেরকে সময়মতো আবিষ্কার করেনি। তা'রা চিরকাল স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দচারী; বশ্যতা স্বীকার করেনি তা'রা কোনওকালে। তাদের কাছাকাছি যারা ছিল তা'রা হোলো ইংরেজ মিশনারী, চা-বাগানের সাহেব-মেম। তা'রা চেনে বন্য জীবন এবং নিজস্ব জগতের স্বাধীনতা। পাটকাই পর্বতমালার এপারে তা'রা পেয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক স্বাধীন মণিপুর এবং ওপারে পেয়েছিল ব্রহ্মউপত্যকার অবাধ বিচরণক্ষেত্র। তা'রা বর্মা-মণিপুরকে চেনে, ভারতকে চেনে না। ভারতের সঙ্গে তাদের কোনও নাড়ীর যোগ থাকার সুযোগ ছিল না। আজ যখন তা'রা মিশনারী এবং সাহেব-গুপ্তচরের উস্কানীতে উৎসাহিত হয়ে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক স্বাধীনতা চেয়ে বসলো, তখন তাদেরকে ভালোবাসার দ্বারা জয় করা দরকার। তাদের মধ্যে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুখদুঃখে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নেবার প্রয়োজন। বর্তমান কালে নাগা পাহাড় ব্যতীত সমগ্র হিমালয়ের আর কোনও অঞ্চলে এমন ব্যাপক ভারত বিদ্বেষ আর কোথাও দেখা যায়নি। অথচ এই জাতি আপন উচ্চশিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানোন্নয়নে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সামাজিক জীবনে এদের মতো রুচিবান সম্প্রদায় উত্তরপূর্ব ভারতে বিরল,—এটি এখন সুবিদিত। ঠিক একই কারণে পূর্বকাশ্মীরের লাদাখ প্রদেশটি এই সেদিন হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু যথাসময়ে

হস্তক্ষেপ করায় বেঁচে গিয়েছে। নাগাজাতির সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃত্ব আজ কঠিন এবং সঙ্কটসঙ্কুল পরীক্ষায় উপস্থিত, এতে সংশয় নেই।

শিলচর থেকে পথ চ'লে গেছে পূর্বদিকে। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি। বরাক নদী পার হয়ে এসেছি। দিন পনেরো আগে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে, এবং পাকিস্তানের জন্মলাভ ঘটেছে। নবচেতনার একটা চমক রয়েছে চারিদিকে। সেই চমকে হতচকিত ছিল পূর্ববঙ্গ। আনন্দ-উল্লাস-কোথাও দেখিনি মুসলমান মহলে, শুধু দেখে এসেছি রুদ্ধকণ্ঠ অনিশ্চয়তা। তাদের দেশের নতুন নামকরণের ফলে দুঃখ দারিদ্র্য এবং অভাব অভিযোগ ঘুচবে কিনা—এই ছিল তাদের মুখে চোখে প্রশ্ন। সেদিন কুমিল্লায় কয়েকটি সভা-সমিতি উপলক্ষ্যে বহু শত বাঙালী মুসলমানকে কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিলুম। তাদের স্বভাবসারল্যে ও আত্মীয়প্রীতিতে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

বরাক নদী পেরিয়ে প্রভাতকালে চলেছি শিলচর থেকে মণিপুরের পথে। বর্ষার কারুণ্য লেগে রয়েছে দুই পাশের সজলতায়। গ্রামের পথ চ'লে গেছে এঁকেবেঁকে দিশাহারার মতো। এপাশে উপত্যকাপথ চ'লে গেছে পাহাড়-তলীর দিকে। এমন শান্ত এবং আত্মসমাহিত বনময় পথ অনেকদিন চোখে পড়েনি। দূরে দূরে যে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল চোখে পড়ছে তা'রা সম্ভবত বরাইল গিরি শ্রেণীরই অন্তর্গত,—কিন্তু সঠিক আমার জানা নেই। আমরা ছিলুম জনচারেক। তৎকালীন 'যুগান্তর'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী। আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল একটি ক্ষুদ্র বনময় পাহাড়ের শিখরদেশ। নাম তা'র 'অরুণবন্ধ।' পরেশবাবু তাঁর পাহাড়ী চা-বাগানে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন! এমন উদারপন্থী এবং ধৈর্যশীল অতিথিসেবক সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমরা চারটি ব্রাহ্মণ মিলে কলকাতা থেকে সেবার যাত্রা করেছিলুম। অর্থাৎ, অধ্যাপক ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু আগের দিন অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি সঙ্গত্যাগ ক'রে গেছেন। সে যাই হোক, পরেশচন্দ্রের অতিথিসেবার তালিকায় হিন্দু-মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের উদার ও অবাধ মিলনের ক্ষেত্র যেমন প্রস্তুত ছিল, তেমনি ছিল বিবেকানন্দবাবুর সহজ প্রাণপ্রাচুর্যের অবারিত লীলাক্ষেত্র! এমন বলিষ্ঠ আত্মস্বাতন্ত্র্য সহসা চোখে পড়ে না।

আসামের রোমাঞ্চ-কৌতুক ছিল আমার মনে। কতকাল আগে থেকে শুনে এসেছি চিত্রবাহন আসামের কথা। এখানে একদিকে যেমন আছে

রহস্যলোকের মায়াজাল, তেমনি অন্যদিকে পথে-পথে আতঙ্ক ছড়ানো। অরণ্যজাত দুরারোগ্য ব্যাধি, বিষাক্ত জল, কালাজ্বর, নরখাদক ব্যাঘ্র, উন্মত্ত হস্তী, অপরাজেয় গণ্ডার, অজগর সাপ এবং নরমুণ্ডশিকারী পার্বত্যজাতি,—এরা নাকি পার্বত্য আসামকে চিরদিন রোমাঞ্চরহস্যের ক্ষেত্র ক'রে রেখেছে। বস্তুত, হিমালয়ের শাখাপ্রশাখায় এক আক্রীদী অঞ্চল ছাড়া অপর কোথাও এমন গা ছমছম করে না। সমতল ভারতে বহুলোকের বিশ্বাস, আসামের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে পাওয়া যায় মায়াবিনীর দলকে,—যারা চাহনির দ্বারা মানুষকে বশীভূতই করে না, তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তিও ঘটায়। গল্পে আছে, ছয়শো বছর আগে মহম্মদশাহর আমলে পাঠান যোদ্ধার প্রকাণ্ড দল গিয়েছিল হিমালয়ের এই অঞ্চলে আসাম জয় করতে, কিন্তু পর্বত প্রাচীরের অন্তরালে এক লক্ষ অশ্বারোহী সেনা নাকি কোনও রহস্যজনক কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি।

'অরুণবন্ধে'র নীচে দিয়ে একটি নিরিবিলি পাকা পথ চ'লে গেছে মণিপুরের দিকে। বিগত যুদ্ধের কালে এই পথে ইঙ্গ-আমেরিকান যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিপুল পরিমাণ জোড়জোড় ছিল। এখান থেকে বিমানে গেলে মণিপুর পৌঁছতে মাত্র পনেরো মিনিট লাগে। আশেপাশে পাহাড়তলীর ভিতরে ভিতরে বিস্তৃত চা-বাগানে কাজ চলছে। আসামের সমগ্র পরিচয়টিই হোলো জনসংখ্যার স্বল্পতা। মেঘ-বৃষ্টি ও কুয়াশার এত প্রাচুর্য ভারতে আর কোথাও নেই, আসামের উদ্ভিদ্‌জীবন তাই বিচিত্র। ভীষণ গহন অরণ্যানী আসামের প্রধান পরিচয়। নীলপাড়া, বালিপাড়া, কাজিরঙ্গ—ইত্যাদি পার্বত্য জলাভূমি গণ্ডার, হরিণ, হস্তী, বাইসন প্রভৃতি বহুবিধ জানোয়ারের আবাসস্থল, এবং এরা 'সংরক্ষিত অরণ্য' হিসাবে পরিচালিত। এসব অঞ্চলের গণ্ডার এবং বাইসন্ পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। আমাদের অরুণবন্ধ পাহাড়ের উপর বসবাসকালে একদিন রাত্রে সাহেব ম্যানেজারের ওখানে নৈশভোজন সেরে বাইরে এসেছি, এমন সময় বনের মধ্যে সোরগোল শোনা গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই কয়েকটি লোক মস্ত একগাছা দড়ি বেঁধে যে জীবটিকে অন্ধকারে টানতে টানতে নিয়ে এলো, তাকে দেখামাত্র আমরা সবাই হতবাক। ফুট পনেরো লম্বা একটি স্ফীতকায় বহুবিচিত্র বর্ণের অজগর সাপ। ওরা সাপটিকে মেরে এনেছে, তবে এখনও সম্পূর্ণ মরেনি। এই ধরনের ময়াল নাকি হরিণ খরগোস প্রভৃতি নিরীহ জানোয়ারকে মোহিনী দৃষ্টির দ্বারা বশ ক'রে কাছে এনে তাকে সহসা আলিঙ্গন করে। যে-আসামকে জানিনে, কোনওদিন চিনিনে, যার আশ্চর্য ও আরণ্য-পার্বত্য সম্পদ চিরদিন আমার নিকট অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল, সেই

অজানা-অচেনা আসাম যেন এই রাত্রির অন্ধকারে ওই দীর্ঘ ভয়াল অজগরের সর্বাঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করলো। ওর ওই বর্ণাঢ্যতার মধ্যেই এখানকার হিমালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতির পরিচয়কে জানতে পারা যায়। যাদের নাম শে-লা, আবর, মিস্‌মি, তিরাপ, মিকির, সুবনশিরি প্রভৃতি। এরা প্রধান, স্বাধীন এবং শাসন-বিহীন জীবনের জন্য এরা পাগল। এদের সঙ্গে অরণ্যচারী পশুপক্ষীর প্রকৃতি বরং মিলবে, কিন্তু সভ্য নাগাদের সঙ্গে মিলন এদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু আরণ্যক নাগাদের সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে—যাদের অনেকগুলিকে অলীক ব'লে মনে হয়। জন্তুর চামড়া ওরা নাকি গায়ে জড়ায়, পাখির পালক ওরা মাথায় চড়ায়, হাড়ের মালা ওদের ভূষণ, ভালুকের লোম ওদের পোশাক, বাঘের দাঁত আর নখ নাকি ওদের কাছে অলঙ্কার। অনেকে বলে, নরমুণ্ড না দেখাতে পারলে মেয়েদের কাছে ওদের সমাদর নেই। প্রকাণ্ড পাহাড়ী পাখির মতো নাচতে না পারলে ওদের আনন্দ হয় না। মন, লাডা, গারো, খাসি-জৈনতিয়া, ডাফলা, আবর, নাগা, মিস্‌মি—যেখানে যাও, এই চেহারা। লোহিত নদীর তীর ধ'রে যাও পরশুরামকুণ্ডে, ব্রহ্মকুণ্ডে, বশিষ্ঠাশ্রমে, মিস্‌মির এখানে ওখানে—সর্বত্র একই কথা। একই পরিচয়, কিন্তু বিভিন্ন নাম। পদম, মিনিয়ং গালং মিজু, দিগারু, তরাওন, চুলিকাটা, হ্রুসো, বুগুন, দিদামাই,—যা খুশি ব'লে ওদেরকে ডাকো। এতগুলির মধ্যে একটিমাত্র জাতিকে বেছে নিয়ে একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করা চলে, এমনই বিস্ময়কর ওদের পরিচয়। সম্পূর্ণ আসাম আজও অনেকটা অনাবিষ্কৃত।

শিলচর থেকে বরাক এবং সোনাই নদী ছাড়লে দক্ষিণে চ'লে গেছে আইজলের পথ লুসাই পর্বতমালার ভিতর দিয়ে। ধলেশ্বরীর প্রবল প্রবাহ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত, এরই তীরে দাঁড়িয়ে আইজল জনপদ। এটি মিজোদের বাসভূমি। তারা এ অঞ্চলে আপন বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করে চলে। লুসাই গিরিশ্রেণীর পশ্চিমে নদী পার হ'লে পার্বত্য চট্টগ্রাম,—যেখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি অনেককাল থেকে বাসা বেঁধেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে উঠে এলে একদিকে আসাম এবং পশ্চিমে সমগ্র ত্রিপুরা। ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমানায় ফেণী নদী প্রবাহিত।

মণিপুর রাজ্য রয়ে গেল বরাক নদীর ওপারে পূর্বপ্রান্তে—বর্মার পশ্চিম সীমানায়, চিন্দুইনের উপত্যকায়, নাগাপাহাড়ের কোলে-কোলে। ওরা বভ্রুবাহনের বংশ—যারা ওখানকার রাজবংশীয়। আসামের বহু অংশে যেমন—ওখানেও তাই, ওরা হোলো নারীপ্রধান সমাজ। ঐরাবতবংশীয় নাগরাজ

উলুপীর গর্ভে জন্মেছিল ইরাবত,—যেমন জন্মেছিল বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদার গর্ভে। ইরাবতী নদী আজও সেই পৌরাণিক কাহিনীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। সমগ্র মণিপুর এবং রাজধানী ইম্ফল নাচে গানে কীর্তনে বৈষ্ণবপ্রেমে অতিথি-পরায়ণতায় হিমালয়ের কোলে ব'সে আপন মহৎ প্রকৃতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ নাগা-পাহাড় প্রদেশ এবং মনিপুর—ইরাবত এবং বভ্রুবাহনের সেই দুই প্রাচীন রাজ্য—প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। কিন্তু শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি—এরা মণিপুরের স্বভাবসম্পদ্। এদেরই প্রভাবে নাগাপার্বত্য জাতির একটি বৃহৎ শ্রেণী আজ সর্বপ্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিলাভ করেছে। মণিপুরের সর্বত্র মহারাজা চন্দ্রকীর্তি এবং যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের নামে শ্রদ্ধা ও সম্মানে মুখর। টিকেন্দ্রজিতের গৌরব ও বীরত্ব গাথায় উদ্ভাসিত মণিপুর। ইংরেজ কলঙ্কের কদর্য ইতিহাস যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসীর ভিতর দিয়ে যেন নূতন ভাবে পুনরায় জন্মলাভ করেছে। মণিপুরের সর্বাধুনিক ইতিহাসে রাজা প্রিয়ব্রত সিংহের উদ্দীপনা ও অধ্যবসায়ক্রমে তাঁর রাজ্যে শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা এবং নৃত্যগীতাদির অভিনব উন্নতি ঘটেছে।

লুসাই আর মণিপুর পেরিয়ে হিমালয়ের জটাজটিলতা নেমে চ'লে গেল দক্ষিণে অনেক দূরে। চিন্দুইনে, আরাকানে, ব্রহ্মদেশে, ইন্দোচীনে, শিয়ামে, কম্বোজে। এখানে ডিমাপুর, কোহিমা, ইম্ফল, পালেল, আর টামু,—সেখান থেকে চলেছে পার্বত্য পথ দূরদূরান্তরে কর্কটক্রান্তি পেরিয়ে। নিয়ে চলে গেল প্রাণের অনন্ত পিপাসা, নিয়ে গেল ক্ষুধা, নিয়ে গেল পূজার বীজমন্ত্র। মীকং আর মেনামের তীরে তীরে, ইরাবতী আর শালবনীর অগণ্য বালুবেলায়, চিন্দুইনের শাখা-বিশাখায়, মণিপুর নদী আর লগটগ হ্রদের পারে পারে, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হিমালয় যেন যাবার আগে তা'র আশীর্বাদ রেখে গেল। ভারতের আবহমানকালের বাণী বহন ক'রে নিয়ে গেল ওই হিমালয়ের শাখা-প্রশাখা,—যেমন একদা গিয়েছিল মহেন্দ্র আর সংঘমিত্রা, যেমন গিয়েছিল শান্তরক্ষিত আর কমলা, যেমন গিয়েছিল শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর। ওরা যেন সেই দুর্বিষহ ক্ষুধা রেখে গেল আমার মর্মে-মর্মে,—আর আমি যেন জন্মজন্মান্তব্যাপী জপ ক'রে চলেছি ওই লোহিত নদী আর ব্রহ্মপুত্রের জনহীন বালুবেলায়, নীলপদ্ম আর স্বর্ণরক্তিম উপলখণ্ড খুঁজে ফিরেছি ডিবং আর সুবর্ণশ্রীর তটে তটে ; দেখতে চেয়েছি ওই ব্রহ্মকুণ্ডে—যা কোনোদিন দেখা যায় না। রেখে গেলুম আমার পরম প্রণাম এখানকার পার্বত্য প্রকৃতির প্রতি পরমাণুতে ; ছড়িয়ে রেখে গেলুম আমার প্রাণ লক্ষ লক্ষ বিন্দুতে এখানকার বনে-অরণ্যে, গুহা-গহ্বরের মুখে মুখে, এখানকার উদার দীর্ঘ পাইনবীথিতে, শত শত অর্কিডের চারায়, সহস্র

ঝরণায়, নীলনয়না অলকায়। এখানে পৃথিবী চিরকাল আশ্চর্য হয়ে থাক্,—অরণ্যে, পর্বতে, উপত্যকায়, নদ ও নদীতে, উপবনে আর তপোবনে, ভালোবাসায় আর সৌন্দর্যপিপাসায়। লক্ষ লক্ষ অসমীয়া থাকুক আনন্দে,—আমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছি হিমালয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

অরুণবন্ধ থেকে নেমে এসেছি দামচড়ায় 'জটিঙ্গা' নদীর তীরে। বালু-পাথরের ডাঙ্গা পেরিয়ে অজগরের বন ছাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছি নদীতটে,—যার তিনদিকে পাহাড়ের অবরোধ। পাখি ডাকছে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে। ওপারের ছায়াঢাকা রহস্যলোকের পথ ধ'রে চলেছে আমার মন দামচড়া থেকে লামডিং, ডিমাপুর থেকে মার্গেরিটা, শিলঘাট থেকে শিবসাগর। বিজন ভীষণ অরণ্যে রেখে যাচ্ছি আত্মার আত্মীয়তা, রেখে যাচ্ছি বিভীষিকার আরাধনা উত্তর লখিমপুরে আর কাজিরঙ্গে, রেখে যাচ্ছি উত্তরপূর্বসীমান্তে হিমালয়ের শেষ আশীর্বাদ।

আসামের পৌরাণিক নাম ছিল কামরূপ। রাজা নরকাসুর ছিলেন কামরূপের অধিপতি,—গৌহাটির কাছে ছিল তাঁর রাজধানী। দক্ষযজ্ঞের পর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে উন্মত্ত শিব যখন ভূ-ভারতের পথে যাত্রা করলেন, শ্রীবিষ্ণু দেখলেন—সৃষ্টিস্থিতির ওপর বুঝি প্রলয়কালের কল্পান্ত ঘনিয়ে এলো। তিনি তাঁর সুদর্শন চক্র প্রয়োগ ক'রে বৃহত্তর মানবতাকে রক্ষা করতে চাইলেন। সেই সুদর্শনচক্রের আঘাতে খণ্ডিত সতীর মহামুদ্রা এই কামরূপের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রতটপ্রান্তবর্তী নীলাচল পাহাড়ে পতিত হয়। একদা এই পরম রমনীয় পাহাড়ের শিখরলোক যখন জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত, যখন চন্দ্রহসিত ব্রহ্মপুত্র নীলাচলের চরণ ধৌত ক'রে চলেছে,- সেই সময় হিমালয়ের মায়াকানন থেকে দেবলোকবাসিনী একটি যুবতী মুগ্ধ হৃদয় ও উলঙ্গ দেহ নিয়ে নেমে আসে এই নীলাচলে। সেদিনকার মায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্নালোক এত নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে, সেই যুবতীটি তা'র লজ্জাবরণ পরিধান ক'রে আসতে একেবারেই ভুলে যায়। এদিকে রাজা নরকাসুর সেই জ্যোৎস্নালোকে নীলাচল শিখরে পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সহসা তিনি দেখতে পান্ সেই নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতাকে। মুগ্ধচক্ষে চেয়ে নরকাসুর প্রশ্ন করেন, কে তুমি, সুন্দরী?

সুন্দরী জবাব দেয়, আমি কামদেবী, প্রণয়ের প্রতীক্ আমি! এই নীলাচলের পবিত্র শিখরে আমার নামে একটি মন্দির-নির্মাণ হতে পারে কিনা, তারই উদ্দেশ্যে এখানে নেমে এসেছি।

নরকাসুর উদ্বেলিতকণ্ঠে বললেন, যদি অনুমতি হয়, সে-মন্দির আমিই নির্মাণ ক'রে দেবো, সুন্দরী,—আমার প্রাণ দিয়ে, আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে!

বাঁকানয়নের কটাক্ষ হেনে কামাক্ষী বললেন, তোমার স্বার্থ কি?

নরকাসুর বললেন, তুমি তুষ্ট হবে, এই আমার সার্থকতা। তোমার ওই নগ্ন তনুলতার সঙ্গে আমার মরণের ফাঁস জড়িয়ে গেছে, দেবি,—তুমি আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করো, নৈলে এই রাজমুকুট ফেলে দেবো ওই ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গে।

কামদেবী এই প্রস্তাবে রাজী হলেন একটি সর্তে: আজই রাত্রে এই মন্দির-নির্মাণ এবং সমতলের সঙ্গে নীলাচলের একটি যোগাযোগ-পথ—যদি এ দুটি প্রভাতের পূর্বে শেষ হয়, তবেই তিনি নরকাসুরের অঙ্কশায়িনী হবেন।

নরকাসুর তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলেন। মূর্ছিত জ্যোৎস্না স্থির হয়ে রইলো মায়াবিনী কামদেবীর তনুলাবণ্যে, তিনি সেইখানেই দাঁড়িয়ে লোললালসায় লালায়িত নরকাসুরের অতিমানবিক ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

প্রভাতকালের পূর্বেই নরকাসুর তাঁর কাজ প্রায় শেষ ক'রে আনলেন, আর একটুখানি পাকাপথ তৈরীর কাজ বাকি। কিন্তু সর্বনাশিনীর ভিন্ন প্রকার অভিপ্রায় ছিল। কামদেবী আনালেন একটি মোরগ, এবং সেই মোরগ বিশেষ ইঙ্গিতে যখন অকাল প্রভাতের সাংকেতিক ডাক ডেকে উঠলো, তখন কামাক্ষী বেঁকে বসলেন। বললেন, ওই গ্যাখো, প্রভাত হয়েছে! সুতরাং তোমাকে আমি আর বরণ করতে পারিনে।

দেবী অন্তর্হিতা হলেন। রাগে দুঃখে নরকাসুর খড়্গের দ্বারা মোরগটিকে হত্যা করলেন।

সেই অসমাপ্ত পথের শেষাংশ আজও তেমনি রয়েছে। গৌহাটি যাবার পথ থেকে প্রায় মাইলখানেক চড়াই ভেঙ্গে ওই পথে উঠে এলে নীলাচল। নীলাচলের চূড়ায় আছে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। কামাক্ষার মন্দির এবং উমানন্দ-ভৈরবের আর একটি মন্দির, এই দুই মিলিয়ে তীর্থপরিক্রমা। অনেকের ধারণা, কামাক্ষার পীঠস্থানটি নির্মিত হয় প্রায় তেইশ শো বছর আগে। মন্দিরের মধ্যে নরনারায়ণ ও চিলারায়ের প্রস্তরমূর্তি দেখা যায়। এখানে চারশো বছর পূর্বেকার শিলালিপিও খোদিত।

একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে নীচের দিকে নামতে হয় কয়েক পা। কামরূপের প্রধান তীর্থ এটি। নীচে গিয়ে চোখে পড়ে একটি শিলাতল, কতকটা প্রস্তরখোদিত,—সেইটি হোলো দেবীর যোনিপীঠ। সেখানে আল্তা, সিঁদুর

এবং রাঙাপাড় শাড়ীর মস্ত সমারোহ চোখে পড়ে। এখানকার অতি ভদ্র, সাধু ও মিষ্ট প্রকৃতির পূজারী পাণ্ডারা। তাঁদের গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে যাত্রীদেরকে নিয়ে গিয়ে সানন্দে তাদের পরিচর্যা করেন। ভারতের আর কোনও তীর্থস্থানে এমন উদারচরিত্র 'পাণ্ডা' দেখা যায় না। সকলেই মধুর বাঙলা ভাষায় আলাপ করেন। পাহাড়ের মালভূমিতে কামাক্ষা হোলো একটি গ্রাম। গ্রামে জলাশয়, পথঘাট দোকানবাজার, সাধারণ বাড়িঘর সবই রয়েছে। একটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে ছিলুম কয়েকদিন, কিন্তু একটিবারও নিজেকে অনাত্মীয় কিংবা প্রবাসী মনে হয়নি। দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় সংসারযাত্রা চলতো নিজের নিয়মে, কিন্তু রাত্রের দিকে এই গ্রামের কোন কোনও অঞ্চলে কিছু রহস্যের ছায়া নেমে আসতো। আমার মন স্বভাবতই কৌতূহলী। এখানকার নানাবিধ ক্রিয়াকরণের কথা অনেকাল ধ'রে শুনে এসেছি। মারণ, উচাটন, বশীকরণ, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদির রহস্যভেদ করার জন্য কখনও কখনও নৈশ অভিযান করেছি বটে, কিন্তু প্রভাতের পূর্বেই ফিরে আসতে হয়েছে। সেই সব আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

নীলাচলের নীচের দিকে পাণ্ডু থেকে গৌহাটির পথ চ'লে গেছে। আজকের মতো সুবিস্তৃত শহর তখন গৌহাটিতে ছিল না। এত জনতা, এত কর্মচাঞ্চল্য, এত প্রকার যানবাহন সেদিন কেউ ভাবেনি। প্রধান রাজধানী ছিল শীলঙে। গৌহাটি প'ড়ে থাকতো পিছনে, সবাই মোটরে চ'লে যেতো বনময় পার্বত্য সুন্দর পথে শীলঙের দিকে। পথের পরিমাণ যতদূর মনে পড়ে, প্রায় পঁয়ষট্টি মাইল। তখন একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান এই পথে মোটরবাসের একচেটিয়া কারবার করতো। তা'রা এখন আছে কিনা খবর রাখিনে। কিন্তু গৌহাটি শীলঙের প্রশস্ত রাজপথটি সেদিন বড় ভালো লেগেছিল। মনে প'ড়ে যায় কাল্‌কা-শিমলার কথা, শিলিগুড়ি-দার্জিলিং, কাঠগোদাম-আলমোড়া, রাওয়ালপিণ্ডি-কোহালা! এরা চিরকাল স্মৃতির পটে রয়ে গেল শ্রেষ্ঠ কবিতার মতো। বিবাগী মনের অনর্থক ভাবনা আনে হিমালয়ের এইসব পথঘাট, হঠাৎ আনে অশান্তি, হঠাৎ বেজে ওঠে সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী। এই পথ দিয়ে ছুটলে প্রাণ উড়ে যায় খাসি-জৈন্তিয়া ডিঙিয়ে কোথাও যেন পথ-হারানো সুরে হিমালয়ের পর্বে পর্বে, শাখায়-প্রশাখায়। ভুবনেশ্বরীর শিখর থেকে ব্রহ্মপুত্রের শোভা অপরূপ।

গৌহাটি ছাড়ালে প্রান্তর এবং অরণ্য। পথে পাওয়া যায় শস্যক্ষেত্রের আনাচে-কানাচে শিকারের কেন্দ্র, শস্যের লোভ থেকে জন্তু তাড়াবার মাচান্। অনেক ক্ষেত্রে দিনমানেও একা পথিকের পক্ষে এপথ সেদিন নিরাপদ ছিল না।

গৌহাটি-শীলঙের প্রায় মাঝামাঝি পড়ে পার্বত্য জনপদ নাংপো। ছবির মতো শহর,—কাঠবিক্রির কেন্দ্র।

বছরের প্রায় অধিকাংশ সময় আসামে বৃষ্টিবাদল থাকে। আমাদের চোখে যেটা অতি বৃষ্টি, এখানে সেই বৃষ্টিই হলো সাধারণ। আসাম উর্বর কিন্তু স্যাঁতসেঁতে। মাটি ভিজে, সমগ্র প্রদেশ ভিজে। নীচের তলায় যারা থাকে তাদের বড় কষ্ট। জন্তু-জানোয়ার জল-জলা-জঙ্গল—এদের গায়ে জীবন জড়ানো। কিন্তু পাহাড়ে ওঠো, পাইনবনের হাওয়া লাগবে গায়ে। এমন ফুলের গন্ধ পাবে, যা আগে জানতে না! এমন লতাপাতা, যা আগে দেখোনি। এমন নরনারী চোখে পড়বে - যাদের খুঁজে পাওনি ভূভারতে।

অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একদা শীলঙে এসে উঠলুম,—সমুদ্রসমতা থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। চেয়ে দেখছি মস্ত শহর,—কিন্তু প্রায় সমতল। স্বাস্থ্যের গুণে শহর হাসছে। দার্জিলিংয়ের মতো নয়, এখানে বড় বড় রাজপথ গেছে নানা দিকে। এমন প্রশস্ত মালভূমি, -হঠাৎ মনে হয় বুঝি কাশ্মীরের শ্রীনগর। এমন বড় বড় সমতল বাগান বাড়ি,—সহসা কোনও পার্বত্য শহরে চোখে পড়ে না। চারিদিকে প্রচুর জনতা, প্রচুর মেয়ে-পুরুষ,—অনবদ্য যৌবন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে! ধনী অসমিয়া, সম্ভ্রান্ত বাঙালী,—বিশেষ ক'রে লাবান্ অঞ্চলে,—এরা রয়েছে পুরুষানুক্রমে। সাহেবসুবোর বাংলো কথায় কথায়। শহরের আশেপাশে সভ্য অসভ্য, নগ্ন অর্ধনগ্ন, ইতর ভদ্র—প্রায় রয়েছে গায়ে গায়ে। অসমিয়া, মণিপুরী, নাগা, সিলেটী, খাসিয়া,—এদের দেখে আমি মুগ্ধ। অসমিয়া হোলো আসামের আপন ভাষা,—শুনতে ভারি চমৎকার,—কিন্তু কানে যেন ঠেকে বাংলা ভাষার মধুর ধ্বনি। হয়ত কয়েকটি অক্ষরের এদিক ওদিক, হয়ত আসলে এক। আমার হোটেলে সবাই অসমিয়া,--কিন্তু তা'রা যে ঠিক বাংলা ভাষায় কথা বলছে না, এটি জানতে সময় লেগেছিল. ওদের কথার ভঙ্গীটি আয়ত্ব করার জন্য কান পেতে থাকতুম। 'অহোম' বোধ করি ওদের পার্বত্য ভাষা,—কিন্তু এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।

সমগ্র শীলঙ যেন একটি পুষ্পপাত্র। বৃক্ষলতায়, গাছের ডগায়, বোঁটায়-বোঁটায় অজস্র ফুলের আশ্চর্য শোভা। ফুল আর ফলের বাগানের কারুকার্য রুচির পরিচয় দেয়। ডালিম আখরোট আর কমলার বাগান বহু ক্ষেত্রকে বর্ণাঢ্য ক'রে রেখেছে। বাজারে গিয়ে দাঁড়ালে বিচিত্র দৃশ্য। যেন মেলা বসেছে আনন্দের হাটে। কেউ নেচে নিল, কেউ ঘুঙুর বাজিয়ে দিল। বাজারে বেচতে এসেছে চাল-ডালের সঙ্গে তীর ধনুক, শাক-সব্জির সঙ্গে পাখির পালক, তেল-নুন-লকড়ির সঙ্গে রূপোর গহনা আর হাড়ের মালা। বাজারে খোঁজ নিয়ে

দেখো, খ্রীষ্টানের সংখ্যা অনেক বেশী। ইস্কুল-পাঠশালায় যাও,—অগণ্য খ্রীষ্টান। মিশনারী মেয়ে-নেত্রীর সঙ্গে শত শত মেয়ে চলেছে,—তা'রা নানা সম্প্রদায়ের, নানা উপজাতির মিশ্রণ,—কিন্তু তা'রা খ্রীষ্টান। আমাদের হোটেলের নীচের তলায় ছিল একটি পরিবার,—বাপ মুসলমান, মা হিন্দু, মেয়ে খ্রীষ্টান, ছেলে তথৈবচ। খ্রীষ্টান হ'তে পারলে ওদের অনেক বিষয়ে আর ভাবনা থাকে না। মিশনারীরা ওদের অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে।

কথায় কথায় এগিয়ে এসেছি অনেক দূর। দক্ষিণ আসামের অসংখ্য গিরিশ্রেণী হিমালয়ের মূল মেরুদণ্ড নয়,—কিন্তু এরা সবাই হিমালয়ের শিরা উপশিরা। গারো, খাসি, জৈন্তিয়া, কাছাড়, লুসাই, মিকির, নাগা, পাটকাই, আবর, মিস্‌মি,—এরা সকলেই সেই শিরা-উপশিরার ভগ্নাংশ! অনেক সময় পরস্পরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন, অনেক সময় ধারাবাহিকতা চোখে পড়ে না,—কিন্তু শিকড় রয়েছে মাটির তলায় কিংবা উপত্যকায়, নদীগর্ভে কিংবা অরণ্যলোকে। হিমালয় এক, আদি ও অনন্ত,—হাজার মাইলের মধ্যে তা'র দূরদূরান্তর-প্রসারী অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিভিন্ন গিরিশ্রেণীর নামে প্রকাশ। যেমন, আমি ভারতীয়, এই আমার একমাত্র পরিচয়। হ'তে পারি আমি রাজস্থানী, মারাঠী, বাঙালী, মাদ্রাজী কিংবা অসমিয়া,—কিন্তু আমি ভারতীয়,—অভিন্ন অচ্ছেদ্য অখণ্ড অক্ষুণ্ণ। আমার অন্য পরিচয় হোলো আঞ্চলিক,—সেটি একেবারেই প্রধান নয়। আগে আমি ভারতীয়, পরে বাঙালী! আমার জন্মভূমি বড়, বাসস্থান বড় নয়। আমার সমস্ত সত্তা ছড়ানো কাশ্মীর থেকে কুমারিকায়, কবরীর অববাহিকায়,—গঙ্গায় আর তুঙ্গভদ্রায়। আমি স্বীকার করিনে কোনও শিক্ষা আর সংস্কৃতির আঞ্চলিক শাসন। আমি সর্বভারতীয়, আমি ভারতপথিক। কিন্তু আসামের সঙ্গে সেদিন আমি একাকার হয়ে ছিলুম।

চেরাপুঞ্জীর দিকে যাচ্ছিলুম। খড়িপাথরের পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছি। এপাশ দিয়ে ভিন্ন পথ চ'লে গেল সুদূর সুরমা উপত্যকার দিকে—শ্রীহট্টের পথে। আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। বৃষ্টি আসে কথায় কথায়। কয়েক মাইল গিয়ে পাওয়া যায় হস্তীপ্রপাত। নিভৃত অরণ্যের ছায়ায় ঢাকা জলধারা নামছে পাহাড় থেকে। এখানকার কুঞ্জবনের নিরিবিলি অঞ্চলে গদগদ কণ্ঠের কাকলী শোনা যায় যখন-তখন।

শীলঙ থেকে চেরাপুঞ্জী প্রায় চৌত্রিশ মাইল পথ। পথ কখনো প্রশস্ত, কখনো সঙ্কীর্ণ। কোথাও সমতল, কোথাও বা গভীর খদ। কোথাও আরক্তিম

গিরিগাত্র, কোথাও বা আরণ্যের উদার গাম্ভীর্য! মাঝে মাঝে দুস্তর ও দুঃসাধ্য। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ বৃষ্টি হয় এই অঞ্চলে,—বাদলের সজল হাওয়ায় সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এখানে যেন কিছু বিমর্ষ ও ধূসর।

এসে পৌছলুম চেরাপুঞ্জী শহরে। শৈবালাচ্ছন্ন সংসারযাত্রাটা সহজেই চোখে পড়ে। দুচারটে সরকারী আর বেসরকারী ঘরদোর। কিছু দূরে পাওয়া গেল একটি জলপ্রপাত,—মুসৌরীর ওদিকে যেমন কেম্পটি প্রপাত। জনহীন প্রাণীচিহ্নহীন পর্বতশিখর এখানে নিশ্চুপ। নীচের দিকে নামছে অসংখ্য ঝরণার ধারা। দূরদিগন্তে ছায়াঢাকা সুরমা উপত্যকা! পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে লৌহরজ্জুপথ চ'লে গেছে ভোলাগঞ্জের দিকে।

চেরাপুঞ্জীর উপরে আবার কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে।

॥ ১০ ॥

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ। এ বছর শীতটা কিছু দীর্ঘ-বিলম্বিত, একটু ক'মে গিয়ে আবার তেড়ে আসে। আকাশের চেহারাও গত দুদিন থেকে খুব উৎসাহজনক নয়। শুনতে পাই উত্তরবঙ্গের লোকেরা চৈত্র মাসেও অনেকে গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে রাত্রে ঘুমোয়।

কোন এক রাত্রে জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং জেলায় ঢুকেছি। দীর্ঘ প্রান্তর পেরিয়ে এসেছি অন্ধকারে। বাতাসে ঠাণ্ডা ছিল প্রচুর। আমার দুর্নাম আছে, ঠাণ্ডা আমার লাগে না। যার মোটরে আসছিলুম তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বক্সী,—মোহরগং গুল্মার চা-বাগানের তৎকালীন ম্যানেজার। আমার ভ্রমণ ব্যাপারে তিনি অতিশয় উৎসাহী,—যে কোন প্রকারের সহায়তা তাঁর কাছে মিলবে। শিলিগুড়িতে এসে তিনি কিছু কেনাকাটা ক'রে নিলেন, তারপর আবার গাড়ি ছেড়ে চললো দার্জিলিংয়ের রাজপথ ধরে। দীর্ঘপথ চ'লে গেছে উত্তরের পাহাড়তলীর দিকে।

শুক্‌নার জঙ্গলে থাকিনি কোনদিন। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের যে অরণ্যের কথা ব'লে এসেছি, শুক্‌না হোলো তারই ধারাবাহিক অরণ্য। রাত্রে হাঁটাপথে এ অঞ্চলে যাওয়া বিপজ্জনক। এই পথ পেরিয়েছি বহুবার,—দার্জিলিঙে যাওয়াটা যখন নিতান্ত সহজ ছিল। মন খারাপ হ'লে দার্জিলিং, পূজোর সময় দার্জিলিং, বৈশাখের শেষে কলকাতায় গুমোট দেখা দিলে দার্জিলিং,—কিছু না হোক, আত্মগোপনের বড় আশ্রয় হোলো দার্জিলিং! কিন্তু আজ এই প্রথম রাত্রের দিকে যাচ্ছি শুক্‌নার জঙ্গলে, কেননা জঙ্গলের

মধ্যেই হোলো ভূপেন্দ্রবাবুদের চা-বাগান এবং তাঁর বাগানের ভিতর দিয়েই চ'লে গেছে আসামের রেলপথ কোচবিহারের দিক দিয়ে। পথ সামান্য, কিন্তু ওর মধ্যেই আনে ঘন অরণ্যের উপলব্ধি। শিলিগুড়ির শাল আর সেগুন বঙ্গ-বিখ্যাত, বর্মাটীকের পরেই নাকি এর ঠাঁই। কিন্তু বাণিজ্য এক বস্তু, আর অন্ধকার রাত্রির শাল-সেগুনে আচ্ছন্ন শত শত মাইল অরণ্য অন্য বস্তু। মাত্র আট মাইল পথ, তবু ওর মধ্যেই উত্তর পর্বতের দিকে দেখা গেল, তিনধরিয়ার ঝিকিমিকি আলোর মালা; অন্ধকারে যেন মণিমাণিক্য জ্বলছে। ঠিক এই দৃশ্য,—এই প্রকার প্রদীপের মালাখচিত পর্বতের দৃশ্য দেখা যায় দেরাদুন থেকে মুসৌরী। অন্ধকার থেকে বড় সুন্দর লাগে। দেখতে দেখতেই আমরা গুল্‌মার চা-বাগানে এসে প্রবেশ করলুম। এ নিয়ে অনেকগুলি চা-বাগানে আমি অনেকদিন কাটিয়েছি, কিন্তু সেসব আলোচনা এখানে থাক্।

নিত্যই বাঘ আসে এ অঞ্চলের চা-বাগানে। গতকাল সন্ধ্যায় ঠিক এইখানে লাইনের ধারে মোটরের আলো দেখে একটি লেপার্ড থমকে দাঁড়িয়েছিল। ওরা আসে গরু-ছাগলের আশায়। তবে মানুষের আওয়াজ পেলে পালায়। মাঝে মাঝে ম্যান্-ঈটার বেরিয়ে পড়ে, তবে চা বাগান মাত্রই ভালো শিকারী রাখে। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই চা-বাগানের সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। বাগানের ভিতর দিয়েও প্রায় দু'মাইল পথ। কিন্তু অন্ধকারে দুই পাশে কিছু দেখা যায় না। তরাই অঞ্চলের নীরেট অরণ্য প্রেতচ্ছায়ার মতো চারিদিকে দাঁড়িয়ে। আমাদের মোটর এঁকে-বেঁকে বিস্তৃত বাগানবাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

ম্যানেজারের প্রাসাদের নীচে চন্দ্রমল্লিকার মস্ত বাগান। বড় জমিদারের বাগানবাড়ির সঙ্গেই কেবল এর তুলনা চলে। ভূপেন্দ্রবাবু সপরিবারে এখানে বাস করেন। তাঁর অপরিসীম যত্ন, আতিথেয়তা ও পরিহাস-সরস আলাপে সেই রাত্রি বড় আনন্দে অতিবাহিত করেছিলুম। পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর তিনি সঙ্গে দিলেন একখানি নতুন মোটর এবং একজন নেপালী ড্রাইভার। ব'লে দিলেন, এ গাড়িটি আমি যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি এবং চার-পাঁচশো মাইল যাবার মতো পেট্রলের ব্যবস্থা ড্রাইভারের সঙ্গে রইলো। অতঃপর জোর ক'রে তিনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন আজানুলম্বিত এক ওভারকোট এবং একটি ব্যালাক্লাভা টুপি। পশমের তৈরী। তিনি নাকি আমার স্বেচ্ছাচারের চেহারা দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত। কথা রইলো ফিরবার পথে তাঁর এখানে হয়ে যাবো।

অনন্যসাধারণ আতিথেয়তায় জন্য ধন্যবাদের কথা ওঠে না, কিন্তু নিজেকে হঠাৎ এমন বেপরোয়া আর কোনদিন মনে হয়নি। পাহাড়ের পথে মোটর গাড়ির মধ্যে একা বসে এমন আরাম এবং সুখের চেহারা পাইনি কোনদিন। এমন নধর গদি এবং কাচের আবরণ, এমন একান্ত নিরাপদ একা। আসুক বৃষ্টি, আসুক তুষার-ঝটিকা,—একেবারে আমি নিশ্চিন্ত। দায় নেই, ব্যয় নেই, তাগিদ নেই,—যখন খুশি, যেদিকে খুশি। ভূপেনবাবু লেখকের মনকে চেনেন।

শিলিগুড়িতে এসে গাড়ি ঘুরলো সেবকপুলের দিকে,—গেলিখোলার পুরনো রেল-লাইনের গা বেয়ে সেই পথ চ'লে গেছে পাহাড় পর্বতের অন্তঃপুরে। বিদ্যুৎ গতিতে গাড়ি ছুটলো। মাঝপথের নদীর নাম মহানন্দা, বোধ করি তিস্তার সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমানাটা এখানে ঠিক বুঝতে পারিনে। জলপাইগুড়ির সীমানা সম্ভবত শিলিগুড়ির নীচে দিয়ে এগিয়ে গেছে আলীপুর দুয়ারের দিকে অরণ্যের প্রান্তরেখা দিয়ে। সমতল পথ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে, দেখতে দেখতেই পথ সঙ্কীর্ণ! পিছনে ফেলে এসেছি প্রান্তরের পর প্রান্তর,—মাঝে মাঝে সেখানে ইদানীং ব'সে গেছে রেফুজীদের উপনিবেশ। কোথাও কাঠের ব্যবসা, কোথাও বা কুটির-শিল্প। অনেক কাঠের বাড়ি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে, যাকে বলে পোঁতা,—মাঠ থেকেই কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরতলায়। এরকম বাড়ি তরাই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। গৌহাটি থেকে নাংপোর পথে দেখে এসেছি এই প্রকার, আলীপুর দুয়ারের এই, কোচবিহারের অনেক অঞ্চলে এই। যেখানে বন্যার ভয়, যেখানে পার্বত্য-নদীর ঢল নেমে আসে অকস্মাৎ, কিংবা জন্তু-জানোয়ার সাপখোপ,—সেখানে মানুষ এইভাবে নিজেকে নিরাপদে রাখার প্রয়াস পায়।

গেলিখোলার পুরনো শীর্ণ রেলপথটি দেখতে পাচ্ছি পাশে পাশে তিস্তার দুরন্তপনার জন্য এপথে ট্রেন চলাচল আর সম্ভব হলো না। জলের ধাক্কায় লোহায় লাইন মুচ্‌ড়ে যায়, স্লিপারগুলি উৎখাত হয়ে অদৃশ্য হয় এবং গাড়ি ও এঞ্জিন ডুবজলে তলিয়ে থাকে। ফলে আজকাল মোটরবাস ও লরীওয়ালাদের রামরাজত্ব। তিস্তার এই পথটিতে আমার প্রথম অভিযানটির কথা মনে পড়ছে। সেবার শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে আসছিলুম। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুবর শশাঙ্ক চৌধুরী। আগের দিন থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে পাহাড়ে যেমন ভাঙন ধরেছিল, তিস্তারও তেমনি দুরন্তপনা বেড়ে উঠেছিল। ফলে কালি-ঝোরা পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন আর যেতে পারলো না। কিন্তু দুর্যোগ যতই ঘন

হোক, আমাদের কোথাও থামলে চলবে না। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং বাঙলা তারিখ ছিল ২৫শে বৈশাখ। মহাকবির জন্মদিন উপলক্ষে আমরা যাচ্ছিলুম কালিম্পঙে। রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে। তাঁর পাদপদ্মে দেবার জন্য কিছু নৈবেদ্যও ছিল সঙ্গে। তার মধ্যে শ্রীঅমল হোম হাত দিয়ে প্রণামী পাঠিয়েছিলেন। একঝাড় রজনীগন্ধা এবং একটি কলম। ফুল যদি বা শুকোয়, কবির কলম যেন শুকোয় না কোনদিন!

তিস্তা বিস্তৃতিলাভ করেছে মাঝপথে। সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে দীর্ঘপথ এসে প্রথম সে গা এলিয়ে দেয় উপত্যকায়। পাহাড় ভেঙে আনে সঙ্গে, আনে কাঁকর আর বালু। আমার মোটর চলেছে তারই প্রান্ত-সীমানা বেয়ে। দেখতে দেখতে এলো করনেশন ব্রীজ। এরই চলতি নাম হলো সেবকপুল। এপারে দার্জিলিং জেলা, ওপারে জলপাইগুড়ি। যতদূর মনে পড়ছে মোটরপথ চ'লে গিয়েছে আলীপুর এবং কোচবিহারের দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে যেতে হয়। পথটি ডান দিকে রেখে মোটর চললো এবার পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। পাশে রইলো তিস্তা। কোথাও রৌদ্রের প্রখরতা, কোথাও বা মেঘচ্ছায়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক,—আজ ফাল্গুনের এই প্রথম সপ্তাহে খেলাটা জমেছে ভালো। চড়াই পথ উঠছে, ভূপেনবাবুর ড্রাইভার এবার সতর্ক। বনময় পাহাড় দেখছি দুই পারে, প্রথম স্তরের পর দ্বিতীয় স্তর, তারপর ধীরে ধীরে মহাহৈমবন্তের বিশাল ব্যাপকত্ব। উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে তার শিখরদেশ। কতকাল ধ'রে দেখছি, কতবার ক'রে। শ্রদ্ধা নিয়ে দেখা ব'লেই আনন্দদর্শন, নৈলে হিমালয় কেবল পাথরের পুঁজি। মাটি আর পাথরের পুতুলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয় ব'লেই ত' আনন্দ। তার নিজস্ব আকারের মধ্যে মহিমা কিছু নেই, কিন্তু মহিমা আছে আমার মনে। ইউরোপের আল্‌প্‌স্ পর্বতমালা নিয়ে এক শ্রেণীর লোক অতিশয়োক্তি করে, আমাদের কাছে ওটা অর্থহীন। আমরা হিমালয়কে মিলিয়েছি দেবতার সঙ্গে, দেবাদিদেবের প্রতীক হলো হিমালয়,—তিনি শিব, তিনি কল্যাণের আধার। কিন্তু ইউরোপের চোখে আল্‌প্‌স্‌-এর সে মহিমা একেবারেই নেই।

আন্দাজ বত্রিশ মাইল পথ শিলিগুড়ি থেকে। তারপর এলো তিস্তার দ্বিতীয় পুল। বাঁদিকে সোজাপথ চলে গেল চড়াই ধ'রে দার্জিলিং শহরের দিকে। ওর নাম পেশক রোড। এখান থেকে দার্জিলিং বাইশ মাইল,—পথে পড়বে ঘুম্। ডানদিকে তিস্তা পুল পেরিয়ে উপর দিকে চমৎকার পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে কালিম্পঙে! মাইল দশেক পথ। পুল পার হবার আগে

পড়ে জেঠমল ভোজরাজের মস্ত গদি। এরা একশো বছরেরও বেশী হোলো দার্জিলিং জেলা ও সিকিমে আমদানি-রপ্তানির কাজ করে আসছে—ব্যবসাটা প্রায় একচেটিয়া। এরা হলো পাঞ্জাবী রাজপুত। যখন কোন যোগাযোগ ছিল না, রেলপথ এবং মোটরগাড়ী যখন ছিল স্বপ্নবৎ—তখন এরা আসে হিমালয়ে। এদের প্রতাপ ও প্রভাব এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আমার মোটর চললো কালিম্পঙে। সুখ আছে সঙ্গে, তাই অস্বস্তিও আছে। এত সুখ সইছে না। দ্রুতগতি মোটরে ভ্রমণ সিদ্ধ নয়। গ্রহণ করবার সময় পাচ্ছিনে কোথাও, মন কোথাও দাঁড়াতে পাচ্ছে না, সেজন্য দেখাটাও সত্য হচ্ছে না। শরীরে ক্লেশ নেই, পথশ্রম অনুভব করছিনে, প্রতি পদক্ষেপে পথের স্পর্শ পাচ্ছিনে,—সুতরাং এ ভ্রমণ সার্থক নয়। নিঃঝুম নির্জনে কবে কোথায় হিমালয়ের কোন্ শিলাতলে বসেছিলুম, গোমতীর ধারা পেরিয়ে কবে কোন্ মধ্যাহ্নে গরুড় নামক ছোট্ট শহরে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলুম, মুসৌরীর থেকে হাঁটতে হাঁটতে কবে নেমেছিলুম কেম্পটি জলপ্রপাতের দিকে, ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে পরিশ্রান্ত দেহ টানতে টানতে কবে গিয়ে পৌঁছেছিলুম মন্দাকিনীর তীরে গৌরীকুণ্ডে—সেইসব পথের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি মুহূর্তের উপলব্ধি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। এ ভ্রমণে ফাঁকি আছে, তঞ্চকতা আছে, স্পর্শের অভাব আছে, তাই এ ভ্রমণ সিদ্ধ নয়। পোষ্ট-অফিসের পার্শেল এখান থেকে যায় বিলেত, কিন্তু সেটা ইউরোপ ভ্রমণ করলো, একথা বলা চলবে না।

দেখতে দেখতে অনেক উপরে উঠে এলুম। এবার ধীরে ধীরে বুঝতে পারা যাচ্ছে ভূপেন বক্সী মহাশয়ের হাত থেকে ওভারকোটটি নেবার মূল্য কতখানি। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হচ্ছে, কিন্তু মাত্র পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় এ প্রকার ঠাণ্ডা একটু অস্বাভাবিক। বেলা অপরাহ্ন, মেঘে-রৌদ্রে কালিম্পঙের আকাশ নানা বর্ণে শোভাময়। আমার মোটর এসে দাঁড়ালো এক বাঙালী মিঃ মুখার্জীর হোটেলের সামনে। একটুখানি ঢালু পথ দিয়ে ঘুরেই সামনে মস্ত লন্। এখন ঠিক মরসুমের কাল নয়, সুতরাং বোর্ডিং প্রায় শূন্য। ড্রাইভারের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা ক'রে আমি গেলুম ভিতরে। শ্রেষ্ঠ ঘর চাই, শ্রেষ্ঠ বিলাসব্যসন এবং তিন-চারজন হোটেল-বয়কে আমার এখুনি দরকার। অনেককাল পরে একটু নবাবী ক'রে নেওয়া যাক্। বন্ধুরা বলেন, আমি যখন একা, তখন আমি নাকি বিপজ্জনক। বয়, সোডা লাও!

মোটরের চেহারাটায় যতখানি আভিজাত্য ছিল, আমার পরিচ্ছদে তার আভাস বিশেষ মেলে না। পরিচ্ছন্ন পারিপাট্য ফেলে আসি নিজের দেশে।

কৈফিয়তের কোন দায় নেই, ফিটফাট থাকার দরকার আছে মনে করিনে। পোশাকেই হোলো পরিচয়, সে পরিচয় না পেলেই খুশী থাকি। কেউ না জানুক, মুখ ফিরিয়ে চলে যাক্, কৌতূহল প্রকাশ না করুক—সেইটি আমার প্রয়োজন। বোর্ডিংয়ের ভিতরে গিয়ে দোতলায় উঠে দেখি, এঘর থেকে ওঘর, ওঘর থেকে সেঘর—সমস্ত শূন্য। বারান্দা, শূন্য করিডর—সুতরাং স্বাধীনতাটা অবারিত। জানালা দিয়ে হিমালয়কে দেখা দরকার, যেদিকে ওই তিস্তা উপত্যকা,—যেখানে অপরাহ্ণের রক্তিম আলোয় দলছাড়া ছোট ছোট মেঘ নেমেছে উত্তরীয় উড়িয়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা দরকার দূর উত্তরে যেখানে চূড়ায় চূড়ায় অকাল বর্ষার সজলতা। ওখানে ওই গ্রেহাম্স্ হোমের উত্তরে একটির পর একটি চূড়া আবহমানকালের বিস্ময়স্তব্ধ ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। ওখানে রয়েছে মহাকবরু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, শ্রীশম্ভু, নরসিংহ চূড়া, শিনিওলচু ও লম্‌গেবোর শিখর। কে নাম দিয়েছিল জানিনে, ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। নাম যদি ওদের খুঁজে না পেতুম, ক্ষতি ছিল না কিছু। ওরা হিমালয়ের দল, এতেই আমি খুশী! ওরা আশ্রয় দিয়েছে আমার অস্থির প্রকৃতিকে চিরদিন, তাই ওদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ওরা জবাব দিয়েছে আমার অনেকদিনের অনেক প্রশ্নের, অনেক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার,—ওরা আমার অনেক দিনের অনেক গোপন অশ্রুর সাক্ষ্য আর সান্ত্বনা, —ওতেই আমি তৃপ্ত। ওদের পাথরে পাথরে দেখেছি আমার প্রাণের ভাষা, ওদের ওই পাখি-ডাকা উপত্যকায় আমার জীবন-জিজ্ঞাসার সুবৃহৎ দরখাস্ত-খানা কতবার মেলে ধরেছি, আমার হৃৎপিণ্ডের রক্তধারা কতবার ব'য়ে গেছে ওদের উপলাহতা নির্ঝরিণীর উন্মত্ত নর্তনে। ধ্যান-মৌন চিরনির্বাক হিমালয়, কিন্তু কেবলমাত্র আমার কানে কানে ওরা কথা কয়, আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় ওদের অন্তঃপুরে বার বার, আমাকে চেনে ওরা মর্মে মর্মে। ওদের মাঝখানে গিয়ে কখনও বিক্রম প্রকাশ করিনি, অসমসাহসিক অভিযানে গিয়ে ওদের মাথায় দাঁড়িয়ে কখনও নিজের মাথা তোলবার চেষ্টা পাইনি, কিন্তু ওরা দেখিয়েছে আমাকে শ্রদ্ধা আর আনন্দের পথ; দেখিয়েছে নৈবেদ্য উৎসর্গের পাদমূল। ওদের একখানি পাথরের কাছে আমি কীটানুকীট—সেই আমার একান্ত একাগ্র আনন্দ।

রামকৃষ্ণ আশ্রম রয়েছে কালিম্পঙের দক্ষিণ শিখরে। একটি উদ্দেশ্য ছিল ওখানে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল। কিন্তু ওখানকার বেণী ব্রহ্মচারী মহারাজ সহসা আমাকে দেখে উল্লসিত হলেন এবং আমি ধরা প'ড়ে গেলুম। তাঁকে কখনও দেখেছি মনে পড়ে না, কিন্তু তিনি

নাকি আমাকে দেখেছেন কোন এক উপলক্ষে। দেখামাত্রই পরমাত্মীয়ের মতো তিনি কাছে টেনে নিলেন। ফলে, আমার স্বাধীনতাটুকু সম্পূর্ণ মুছে গেলো। ফিরে আসতে হোলো সামাজিক জগতে। মহারাজ তাঁর দল ভারী করে তুললেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে ডেকে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন ছোট হাকিমের বাঙলোয়। হাকিম বয়সে তরুণ, কিন্তু তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর মিষ্ট আলাপ এবং অমায়িক আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলুম। হাকিমের নাম ডক্টর ভট্টাচার্য। আমি সিকিম যাচ্ছি শুনে তিনি সোৎসাহে ফোন্ করে দিলেন গ্যাংটকে, এবং জেঠ্‌মল ভোজরাজের নামে চিঠি লিখলেন। এমন জনপ্রিয়, ভদ্র এবং সুশিক্ষিত হাকিম সহসা চোখে পড়ে না। বর্তমানে তিনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ওখানেই পরিচয় হয়েছিল মিঃ ডি পি প্রধানের সঙ্গে, তিনি এ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট মনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়। অতঃপর গেলুম ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে। বাড়ির নীচে মস্ত ডাক্তারখানা। জলপাইগুড়ির প্রসিদ্ধ নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, এম-এল-সি আমার মারফৎ একখানা চিঠি দিয়েছিলেন ডাঃ দাশগুপ্তর নামে। ভেবেছিলুম সে-চিঠি চেপে যাবো। কিন্তু সঙ্গীরা ডাঃ দাশগুপ্তর কাছে গিয়ে আমার কথা বলতেই বুঝতে পারা গেল, তিনি আমার আসার খবর আগে থেকে জানতেন। অতএব এই সমস্ত আলাপ পরিচয়ের শেষ ফলাফল হোলো, স্থানীয় 'বাঙালী সমিতিতে' আমার এলোমেলো বক্তৃতা! কী বললুম তা মনে নেই, কিন্তু কি বলতে চেয়েছিলুম সেটা মধ্যরাত্রে তোলাপাড়া করে বুঝলুম। পরবর্তীকালে চন্দননগর কলেজের জনৈক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত আমাকে পত্রযোগে জানান, আমার সেই বক্তৃতার ফলে 'বাঙালী সমিতি' নাম বদলিয়ে 'মৈত্রী সংঘ' রাখা হয়। বলা বাহুল্য আমার কিছু জানবার এবং অনুধাবন করবার আগেই দেখলুম, আমার মালপত্র সমেত আমাকে হোটেল থেকে তুলে এনে ডাঃ দাশগুপ্তর দোতলার একটি ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং তাঁর বিদুষী দ্বিতীয়া স্ত্রী অপরিসীম যত্নে নৈশভোজনের সমস্ত রাজসিক উপকরণ টেবিলের উপর সাজিয়ে আমাকে ডেকে বসালেন। এতটুকু অবাধ্য হবার উপায় ছিল না, এবং আমি যে অন্তত দিন পনেরো এখানে থাকতে বাধ্য,—তার সর্বপ্রকার আয়োজন নাকি ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে। সহসা নিজেকে কলের পুতুল ব'লে মনে হ'তে লাগলো। ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয় একসময়ে রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা করেছিলেন।

যাই হোক, এ অভিজ্ঞতা অভিনব সন্দেহ নেই। কপালের ঘাম মুছে

এসেছি হিমালয়ে এতকাল, অন্ন আর আশ্রয় জোটেনি কতবার। নিজের পায়ে নিজে মালিশ করেছি, কাঁধ কনকন করেছে বোঝা সঙ্গে নিয়ে, পায়ে ফোস্কার ঘা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছি—এদের সাক্ষী ছিল না কেউ। আজ শুতে পেলুম পালঙ্কের গদিতে, মেঝের উপরে কার্পেট পাতা, আরাম কেদারায় মখমল বসানো, মাথার কাছে বেতার যন্ত্রে বেহাগের আলাপ। বাইরে থেকে হিমালয় ডাকছে ওই বেহাগের আলাপে, ওর ক্রন্দনকম্পিত মূর্ছনায়, ওর অব্যক্ত বেদনায়। কত সঙ্গী আর সঙ্গিনীরা মিলেছিল আমার সঙ্গে এই হিমালয়ে। মারী পাহাড়ের সেই আজিজ আহমদ আর মোতি সিং, কোহালার পথে খান্না, কাশ্মীরে এম কে ধর, জম্মুর সেই বক্সীজি ড্রাইভার, রুদ্রপ্রয়াগের সেই মারাঠা গৃহিণী, নেপালের মান বাহাদুর, কুলু উপত্যকার সুখনলাল। এরা ছাড়া ছিল বাঙালী ছেলে আর মেয়ে; বন্ধু আর বান্ধবী। অনেকে নেই, অনেকে রয়েছে আজও সগৌরবে। হারিয়ে গেছে কেউ, মিলিয়ে গেছে কেউ অন্ধকার স্মৃতির তলে; কেউ মরে গেছে, কেউ বা গৃহস্থালী নিয়ে ব'সে গেছে। বিপদ হয়েছে এই, আমার হিমালয়ের পথ এখনও ফুরোয়নি। নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা পেয়েছি, কাঁদুনে মনকে নানা খেল্না ঘুগিয়ে অন্যমনস্ক করতে চেয়েছি,—কিন্তু হাওয়ায়-হাওয়ায় হঠাৎ ডেকে যায় হিমালয়। ওর মাঝখানে এসে বুঝতে পারি, সব খেলা আর সব খেল্না মিথ্যে, ছদ্মবেশটা মিথ্যে,—এইখানেই আমার নিজের সঙ্গে নিজের নির্ভুল চেনাচেনি।

ভোরে এলো আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে। ডাক্তার গৃহিণীর ডাইনিং হলে প্রাতরাশ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। কালিম্পঙের উপর দিয়ে চলেছে রেনক্ রোড সিকিম ছাড়িয়ে তিব্বতের দিকে, কিন্তু এ পথে দুর্যোগ বেশী, এবং দুঃসাধ্যও বটে। সুতরাং এই প্রাচীন পথ ছেড়ে এখন প্রায় সবাই যায় গ্যাংটকের পথ দিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্যে কালিম্পঙ থেকে তিব্বত সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। রেনক্ রোড গিয়েছে 'জেলাপ-লা' গিরিসঙ্কটে, তারপরেই তিব্বত সীমানা। গ্যাংটক থেকে নাথুলা গিরিসঙ্কট হোলো মাত্র ছাব্বিশ মাইল; এখান থেকে জেলাপ-লা ঠিক ক' মাইল আমার জানা নেই। এই পথ দিয়ে কিন্তু তিনজন জগৎপ্রসিদ্ধ বাঙালী গিয়েছিলেন তিব্বতে। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন বাঙলার চিরদিনের গর্ব ঢাকা-বিক্রমপুরের সন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আজ থেকে নয়শো বছরের বেশী আগে ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানঋষি দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নির্মল স্বরূপকে প্রচার করেছিলেন। তিনি তেরো বছর সেখানে বাস করেছিলেন, এবং লাসার

নিকটেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। গৌতম বুদ্ধের পরেই তিব্বতবাসীরা তাঁর মূর্তিকে আজও বোধিসত্ব নামে পুজা করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আধুনিক ভারতের কুলগুরু রাজা রামমোহন রায়। তিনি তিব্বত যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তার আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত আমার জানা নেই। তৃতীয় যে-ব্যক্তির প্রতি আমি অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করি করি তিনি ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তিব্বতে, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র দাস। তিনি গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে। তাঁর কাছে আধুনিক ভারতবর্ষ ঋণী, কেননা তাঁরই ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনে একালে প্রথম আমরা তিব্বতের বিষয় জানতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড যখন তিব্বত জয় করতে যান, তখন শরৎ দাসের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই তিনি সর্বাধিক সাহায্য লাভ করেছিলেন—এটি স্যার ফ্রান্সিসেরই স্বীকারোক্তি। অতীশ দীপঙ্করের আগে আরেকজন ভারতবরেণ্য বাঙালীও তিব্বতে গিয়ে আচার্য বোধিসত্ব উপাধিলাভ করেন, তিনি হলেন যশোরের রাজপুত্র শান্ত রক্ষিত। অষ্টম শতাব্দীতে তিনি তিব্বতে যান। লামারা তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানায়। কিন্তু দীপঙ্করের যে বিপুল কীর্তির কথা আমরা জানি, শান্ত রক্ষিত সম্বন্ধে অতটা জানা যায় না। তিব্বতী ভাষার লিপি দীপঙ্করেরই অবদান।

কাশ্মীরের পূর্ব প্রান্তে ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হোলো গারটক, কিন্তু সে বহুদূর এবং বহু অগম্য অঞ্চল পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। কুমায়ুনের প্রান্তে গার্বিয়াং ছাড়িয়ে লিপু লেক গিরিসঙ্কট অতটা না হলেও অনেকটা তাই; ওখানে তাকলাকোট হোলো তিব্বতীদের ঘাটি। নেপালেও আছে নামচেবাজার দিয়ে তিব্বত। অন্যান্য পথও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙলার এই পথই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিব্বত যে এত কাছে তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। বিমানে গেলে কলকাতা থেকে দিল্লী পৌছতে ইদানীং লাগে দু'ঘণ্টা, – সেই গতিতে গেলে লাসা পৌছতে ঘণ্টা খানেক লাগে কি?

কালিম্পঙের যে পথ চ'লে গিয়েছে উত্তরে সেখানে পশমের ঘাঁটি একটির পর একটি, অসংখ্য তিব্বতী আর মারোয়াড়ী তার আশেপাশে। এইটি হোলো তিব্বতীদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু এখানে কারবারিদের উন্নতি ঘটেছে একালে প্রচুর, তার প্রকাশ্য নিদর্শন হোলো বড় বড় অট্টালিকা, আর অগণ্য ড়ি

ভোর থেকে আকাশ আজ মেঘময়, শীতের হাওয়া ছিল কনকনে। বড় গির্জাটা হোলো কালিম্পঙের ল্যাণ্ডমার্ক। তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে চড়াইপথ এদিক-ওদিক ঘুরে অনেক উঁচুতে গ্রেহাম্‌স্ হোমের দিকে। এখানে

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং সাহেব-সুবার অভিভাবকহীন ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো ক'রে মানুষ হয়। সমগ্র পাহাড় নিয়ে এ এক বিরাট কীর্তি। পরিচালনা ব্যবস্থা সমস্তই খাঁটি সাহেব-মেমদের হাতে। একটু-আধটু দেখে বেড়াতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘুরে আবার ফিরে এলুম ডাঃ দাশগুপ্তের পাড়ায়। এটা অভিজাত পল্লী। কিন্তু এরই একপাশে একটি সঙ্কীর্ণ গলির নীচে নেমে যে মন্দিরটির চত্বরে এসে দাঁড়ালুম, এটির কথা আজও ভুলিনি। দেখে নিলুম সেই অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঝুপসি ঘরখানা, যেখানায় বছর চৌদ্দ আগে একটি রাত্রি বাস ক'রে গিয়েছিলুম আমি আর শশাঙ্ক চৌধুরী। এটির নাম ছিল ঠাকুরবাড়ি, আজও সেই নামটি তেমনি প্রচলিত। সেদিনও কালিম্পঙে এসেছিলুম বটে, কিন্তু কালিম্পঙ চোখে পড়ে নি,—মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব সমগ্র হিমালয়কে সেদিন আমাদের চোখের আড়ালে রেখেছিল। মনে পড়ে সেই ২৫শে বৈশাখের অপরাহ্ণ। কবি রয়েছেন গৌরীপুর প্রাসাদে। বৈদান্তিক এটর্নী হীরেন দত্ত আছেন, আছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, অনিল চন্দ, মৈত্রেয়ী আর চিত্রিতা। শ্রীযুক্ত অমল হোমের কলম এবং রজনীগন্ধার গুচ্ছ কবির হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করলুম। আমার হাতে ছিল কয়েকখানি 'যুগান্তর' পত্রিকার 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা'। মহাকবি জানতেন, আমি তখন 'যুগান্তরের' অন্যতম সম্পাদক। আমার অনুরোধে উনি অনেকবার 'যুগান্তরে'র জন্য লেখা দিয়েছিলেন। আজকের 'যুগান্তরের' প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল শিল্পীর হাতে-আঁকা কবির একখানা রেখাচিত্র। গ্রাম-নগর-দেশ-মহাদেশ এবং দিগ্বলয় ছাড়িয়ে কবির মাথা উঠেছে তুষারমৌলী গৌরীশৃঙ্গেরও উপরে,—অর্থাৎ হিমালয়ের চেয়েও তিনি বড়,—পৃথিবীর উচ্চতম শিখর তিনি! ছবিখানার মধ্যে এই চেহারাটা প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম।

কবি বললেন, সমগ্র মহাভারতখানা তিনি নিজের হাতে একবার লিখতে চান, অত বড় এপিক্ পৃথিবীর কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই। কিন্তু কাজটি দুরূহ, অনেকদিন সময় লাগবে। হীরেনবাবুকে আনিয়েছি, ওঁর সাহায্য নেবো।—

তাঁকে যখন জানালুম, এখানকার এক ঠাকুরবাড়িতে এসে উঠেছি, তিনি বললেন, *এ ছাড়া আর ঠাকুরবাড়ি কোথায় হে?*

সৌম্য সুহাস কবির মুখখানিতে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা প্রকাশ পাচ্ছে। বাইরের আলো এসে পড়েছে সেই সুন্দর শ্বেতশ্মশ্রুময় মুখে। নরম একখানা শাল এলায়িত দেহের উপর ছড়ানো। একখানা আরাম কেদারায় তিনি অর্ধশয়ান।

দু'চারিটি কথার পরে তাঁর পরিহাস-সরস বাক্যবাণ ছুটতে লাগলো। বলা বাহুল্য, সেই বাণে আমিই বিদ্ধ হচ্ছি বারম্বার এবং হাসির রোল উঠছে এপাশে ওপাশে। কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।

সেইদিনকার সেই ২৫শে বৈশাখের সন্ধ্যায় তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি নবরচিত কবিতা বেতারযোগে পাঠ করবেন, সেজন্য কলকাতার বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কলকাতা-কালিম্পঙের মধ্যে টেলিফোনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। কালিম্পঙে টেলিফোন ছিল না, এই উপলক্ষ্যে তার প্রথম উদ্বোধন। সেজন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে টেলিফোনের খুঁটি বসানো এবং তার খাটানো হয়েছে গত কয়েকদিন থেকে। টেলিফোনের কর্তৃপক্ষ এজন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। কবি তাঁর ঘরের আসনে ব'সে টেলিফোনে কবিতা পাঠ করবেন এবং বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর কণ্ঠস্বরটি ধ'রে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ব্রডকাস্ট করবেন, এই ছিল ব্যবস্থা। কয়েকজন বেতার-বিশেষজ্ঞ এসেছেন এখানে এই উপলক্ষ্যে। তাদের মধ্যে ভারতীয় বেতার কেন্দ্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত স্বর্গত নৃপেন্দ্র মজুমদার ছিলেন অন্যতম। মহাকবি মাঝে মাঝে একবার ভীষণ শব্দে গলা ঝাড়া দেন, একথা সকলেরই মনে আছে। কিন্তু আজ কাব্যপাঠকালে সেই আওয়াজটির দাপটে সূক্ষ্ম যন্ত্রটা বিদীর্ণ হয়ে যাবে কিনা, এই আশঙ্কাটা ছিল রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের মনে! সেজন্য উদ্বেগও ছিল। মাঝখানে নৃপেনবাবু একবার আমাকে বললেন, ঠিক ওই চেয়ারে বসে যন্ত্রে মুখ রেখে কলকাতাকে একবার ডাকুন তো? আপনার গলায় যদি না ফাটে তবে আর ভয় নেই!

কেঁপে উঠলুম। ওটা যে কবির আসন! কিন্তু নৃপেন্দ্রবাবুর ফরমাশ শুনতেই হোলো। নধর মখমল বসানো চেয়ারে ব'সে কয়েকবার ড'কলুম, হ্যালো,...ক্যালকাটা......হ্যালো... ...?

কলকাতা থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এলো—'ও-কে।' (o. k.)

বোধহয় সন্ধ্যা সাতটা কিংবা আটটা। একটা বুঝি বেল্ বাজলো! কবি উঠে গিয়ে বসলেন যন্ত্রের সামনে। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে আমাদের পাশেই রয়েছে রেডিয়ো যন্ত্র,—কলকাতা ঘুরে কবির কণ্ঠ ফিরে আসবে এই যন্ত্রে,—সেই আমাদের রোমাঞ্চ পুলক। কবি মাত্র পনেরো মিনিটকাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন। বাইরে থেকে আমরা কাচের দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। শব্দ না ঢোকে।

একটি আলোর নিশানা পেয়ে কবির দীর্ঘ দীপ্ত কণ্ঠের মূর্চ্ছনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো নবরচিত কবিতায়—

"আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হ'তে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।"

আমাদের পায়ের নীচে কালিম্পঙ থরথর করতে লাগলো কিনা সে কথা তখন আর কারো মনে রইলো না। জ্যোৎস্না ছিল সেদিন বাইরে। একটা মায়াচ্ছন্ন স্বপ্নলোকের মধ্যে আমরা যেন হারিয়ে যাচ্ছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম পরস্পরের অস্তিত্ব।

"আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম—
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম,
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।"

* * * *

"ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা,
শ্মশানের প্রান্তচর আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তা'রা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।"

* * * *

বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষ-প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পুরবীর সুরে।"

* * * *

"......দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।—
আর রবে পশ্চাতে আমার নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালোবাসা—বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।"

মাত্র পনেরো মিনিট, কিন্তু আমরা বাইরে ওই জ্যোৎস্নানিমীলিত হিমালয়ের দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে কেমন যেন আদিঅন্তহীনকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলুম। সহসা পাশ থেকে যেন কতকটা রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে রথীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'যাক্, উনি গলা ঝাড়া দেননি!'

এরপর মহাকবি মাত্র তিন বছর তিন মাসকাল জীবিত ছিলেন!

চৌদ্দ বছর পরে ফিরে আসি এবার নিজের কথায়। ডাঃ দাশগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে যেমন ক'রেই হোক আমাকে এযাত্রা বিদায় নিতে হোলো! আকাশে মেঘ রয়েছে এখনও, হয়ত বা কোথাও বৃষ্টিও নামতে পারে। কিন্তু আজ আমি স্থির করলুম, ভূপেনবাবুর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এবার অন্যপ্রকারে সিকিম রওনা হবো। পথের চেহারাটা আমার জানা নেই, সুতরাং যদি কোনোপ্রকারে তাঁর গাড়ির কোনো ক্ষতি হয়, সে বড় লজ্জার কথা। অনেক ভেবেচিন্তে ড্রাইভারকে গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললুম। প্রথমটা সে একটু বিস্মিত হলো, তারপর রাজী হোলো। ফিরবার পথে—যদি নিরাপদে ফিরি—তবে ভূপেনবাবুর ওখানে হয়ে যাবো ব'লে দিলুম। সে গাড়ি নিয়ে চ'লে গেল!

ভারতবর্ষের বাইরে হোলো সিকিম, তাই একটা মিশ্র মনোভাব রয়েছে আমার! অজানা অপরিচিত সেই পথ। কিন্তু সেইটিই ত' বড় আকর্ষণ। আমি মোটর বাসে গিয়ে উঠে বসলুম।—

॥ ১১ ॥

কালিম্পং থেকে মোটরবাসে দশ মাইল নেমে এলুম তিস্তা নদীর ধারে। খানিকটা এগিয়ে গেলে সামনেই তিস্তার পুল। পুল পেরিয়ে বাঁ-হাতি শিলিগুড়ির পথ, আর ডান দিকে তিস্তাবাজার ছাড়িয়ে পেশক রোড উঠে চ'লে গেছে ঘুম্-এর দিকে; ঘুম্ থেকে দার্জিলিং। আমার পুল পেরোবার দরকার ছিল না।

একবার থমকে দাঁড়ালুম। বেলা মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আকাশের অনেকটাই মেঘমলিন, কিন্তু ঠিক বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বাতাসটা ফুরফুরে ঠাণ্ডা। আমরা সামনের দিকে গিয়ে পুল পার হবো না, আমাদের যেতে হবে পিছনের দিকে; কালিম্পং পাহাড়ের তলা দিয়ে,—যে-অঞ্চলটা হোলো সরকার-সংরক্ষিত অরণ্যভূমি। এ অঞ্চল আজ আমার কাছে একেবারে নতুন,

কিন্তু এই পটভূমি আমার অতি পরিচিত। নেপালের বাগমতি, কাশ্মীরের রামবান, হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি, হৃষিকেশ পেরিয়ে লছমনঝুলার ওপার,—একটির পর একটি ভিড় ক'রে আসে আমার মনে। জনৈক বিলাত-ফেরত বাঙালী দার্শনিক প্রফেসর একবার তিস্তাপুল দেখে গিয়ে আমার কাছে বলেছিলেন, এর তুলনা কেবল সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গেই চলে! এমন পার্বত্য নদীর শোভা, এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাঁকে বলেছিলুম, একা ভারতবর্ষ হাজার পাঁচেক সুইজারল্যাণ্ডের শোভাকে গিলে ব'সে আছে! বলাবাহুল্য তাঁর তুলনাটা আমার ভাল লাগেনি।

আমাদের মোটরবাস চললো ধীরে ধীরে। পথ এবার সঙ্কীর্ণ। কালিম্পঙের মতো পিচ্‌ঢালা প্রশস্ত মসৃণ পথ নয়, কেননা আগে এপথে কোনো চাকার গাড়ি চলতো না। তিস্তা চলেছে আমাদের বাঁদিকে পাশেপাশে। গত বর্ষায় প্রবল ভাঙন দেখা দিয়েছিল পাহাড়ে পাহাড়ে; উপর থেকে পাথরের ধস নেমে পথ ভেঙে নিয়ে গেছে নদীর গর্ভে। সে-ধাক্কা এখনো সামলায়নি, এখনও পাহাড়ের গা ক্ষতবিক্ষত। এসব ছাড়াও উপর থেকে ভীষণতরো জলপ্রপাতের আঘাতে পাহাড়ের গা খ'সে পড়েছে নানাস্থলে, সে-সব এখনও সম্পূর্ণ মেরামত হয়নি। সুতরাং প্রায় প্রতি একশো দু'শো গজ অন্তর গাড়ি থামছে, কুলীরা পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াচ্ছে, এবং গাড়িখানাকে নিয়ে যেতে হচ্ছে অতি সন্তর্পণে। 'বেণ্ড'গুলির কাছেই ভাঙন হোলো বেশী, কেননা জলরাশি সাধারণত 'বেণ্ড'-গুলি থেকেই নেমে আসে। যতদূর মনে পড়ছে দু'খানা গাড়ি দু'দিক থেকে আনাগোনার নিয়মটা বর্তমানে মুলতুবী রাখা হয়েছে, কারণ খাদের দিক থেকে এখনও ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের পথ ক্রমশ ঘুরেছে চক্রাকারে। চড়াই উৎরাই কম, কিন্তু পথ অতি সঙ্কীর্ণ। আমরা পথের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকি, ড্রাইভার কেমন ক'রে গাড়ি নিয়ে যায়। সামনের দু'খানি চাকার একখানিতে আমাদের মন এবং অন্যখানিতে প্রাণ সঁপে দিয়ে নিরুপায়ের মতো ব'সে আছি। বলা বাহুল্য, খাদের দিককার চাকাখানিতেই আমাদের প্রাণ। পাহাড়ে কেমন ক'রে মোটর অ্যাক্‌সিডেণ্ট্ হয়, এসব রাস্তায় না এলে বুঝতে পারা যায় না। প্রতি মুহূর্তে চালককে চোখ রাখতে হয় দু'দিকে, কিন্তু ওর মধ্যে একটি পলকের ভ্রান্তি অথবা অন্যমনস্কতা মানেই নিশ্চিত অপঘাত। এ ছাড়া 'বেণ্ড' ঘুরতে গিয়ে গাড়ির একটি চাকা ধারের দিকে যদি শ্লিপ্ ক'রে যায়, তবে শিবের অসাধ্য। আবার পিছনের চাকা শ্লিপ্ করলেও সমস্ত গাড়িখানাকে মাধ্যাকর্ষণে টেনে নেয়! ড্রাইভারের পক্ষে এসব পথে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। গাড়ির চলন্ত অবস্থায়

ড্রাইভার যেন সিগারেট্ ধরাবার চেষ্টা না পায়। বেণ্ডের কাছে এসে যেন প্রশস্তভাবে 'রাউণ্ড' নেয়। তৃতীয়ত, বিপজ্জনক পথে পেরোবার সময় গাড়ির যাত্রীরা নানা বিষয়ে কলরব ক'রে ড্রাইভারের অন্যমনস্কতা না আনে। আর এক বিপদ, যদি কেউ তাল-লয়যুক্ত বোম্বাই গান ধরে! কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক, খেলো ধরনের রাজনীতিক বিতর্ক তোলা!

বোধ হয় একটু উৎরাইয়ের দিকেই নামছি, কেননা উপর থেকে ছায়াচ্ছন্নতা দেখা দিচ্ছে। সায়াহ্নের মতো প্রায়ান্ধকার ছমছম করছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। পথ কেবল নির্জন বললে ভুল হবে, এদিকে মানুষের কোনো আবাস নেই। শীতের ঠাণ্ডা জ'মে রয়েছে ছায়াদলের মধ্যে। বাঁদিকে বনময় তিস্তা এঁকে-বেঁকে চলেছে। ভারতের প্রাচীনতম নদীর মধ্যে তিস্তা ওরফে ত্রিস্রোতা একটি। ডানদিকে পাহাড় উঠে গেছে কালিম্পঙের দিকে। নিস্তব্ধ অরণ্যময় পথ। গাড়ির হাঁসফাঁস ছাড়া পৃথিবী শব্দহীন, কেবল মাঝে মাঝে তা'র চেতনাকে অনুভব করছি যখন উপর দিকে হঠাৎ কোনো কোনো পথভোলা পাখি ডেকে যাচ্ছে।

দুটি জনপদ দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল। একটি 'চিত্রে', অন্যটি 'মেল্লিবাজার।' এর পরে পাবো 'তারখোলা' হাট। সম্প্রতি এখান দিয়ে গেছে টেলিফোনের তার। তিব্বত যখন থেকে চীনের প্রত্যক্ষ দখলের মধ্যে এলো, তখন সিকিমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় বৈকি। এতকাল ধ'রে এই পথটি ছিল নির্জীব, তিব্বত আর ভারতের মধ্যে নিঃশব্দে এখান দিয়ে আনাগোনা চ'লে এসেছে। কিন্তু আজ সহসা দেখা দিয়েছে প্রাণ-চাঞ্চল্য—সমগ্র ভারত ও চীনের নজর পড়েছে এই পথটির দিকে। প্রসঙ্গত এই কথাটা আসে, মাত্র কয়েকদিন আগেও ভারত গভর্ণমেণ্টের সততাকে কম্যুনিস্ট চীন বিশ্বাস করেনি। তা'র ধারণা ছিল তিব্বতস্থিত ইয়াটুং এবং গিয়ানৎসি থেকে ভারতের সৈন্যদলের ঘাঁটিকে উৎখাত করতে গেলে অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য চীনের সৈন্যসজ্জা এবং তিব্বতে বিমানঘাঁটি নির্মাণ নিয়ে এই সেদিনও চীন ব্যস্ত ছিল। এদিকে আমরা চীন-ভারত মৈত্রীসঙ্ঘ গ'ড়ে তুললেও তা'তে চীনের মন ভোলেনি। কিন্তু লর্ড কার্জনের কালে স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড যা ক'রে গেছেন, পণ্ডিত নেহরুর নীতি তা'কে গ্রাহ্যও করেনি। সম্প্রতি চীন-ভারত মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন ক'রে তিনি চীনের মন থেকে সকল সংশয় এবং অবিশ্বাস যেমন ঘুচিয়েছেন, তেমনি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-বাদকেও কিছু সংশিক্ষা দান করেছেন। শত শত বছর ধরে উদার ও সাধু রাজনীতির সঙ্গে চীনের পরিচয় না থাকার জন্য তা'র মনে ক্ষুদ্রতা জ'মে

উঠেছিল, পণ্ডিত নেহরুর পররাষ্ট্রনীতি চীনের বুদ্ধিবৃত্তিকে এই ব্যাপারে নির্মল ক'রে তুলেছে। সম্প্রতি চীনের প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন ভারতে। তাঁর আগমনের মধ্যে পণ্ডিত নেহরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও উহ্য ছিল বৈকি।

পথ অত্যন্ত খারাপ। কখন্ বুঝি ধাক্কা লাগে পাহাড়ে, কখন্ বুঝি গাড়িখানা পিছলে পড়ে নদীতে তা'র ঠিক নেই। ঘন অরণ্যের নীচে দিয়ে চলেছে আমাদের মোটরবাস। পথ বেশী নয়, তিস্তার পুল থেকে রংপো পর্যন্ত প্রায় ষোল মাইল। কিন্তু প্রাণ বাঁচিয়ে এইটুকু আসতে প্রায় দেড়-ঘন্টারও উপর লাগলো। এর মধ্যে কখন্ যেন তিস্তা হারিয়ে গেল উত্তর-দিকে, আশেপাশে রেখে গেল তা'র শাখাপ্রশাখা। আবার আমাদের পথ ঘুরলো চক্রাকারে, কালিম্পঙ মহকুমার রিজার্ভ ফরেষ্ট অতিক্রম ক'রে এসে আমাদের গাড়ি থামলো রংগীত নদীর ধারে, যেখানে সিকিম ও ভারতের সীমানা। সামনেই কাঠের পুরনো সাঁকো। এপারে ভারত, ওপারে সিকিম। এপারে একটি দপ্তর ব'সেছে, সেখানে ভুটিয়া পুলিশ অফিসার যাত্রীদের তথ্যতালাস করছিলেন।

ছাড়পত্রের রেওয়াজ ঠিক নেই। তবে নাম-ধাম পেশা পরিচয় উদ্দেশ্য,—সমস্তই ব্যক্ত করতে হয়। কেন যাচ্ছি বলা কঠিন, কিন্তু স্পষ্ট না বলতে পারলেই সন্দেহভাজন হবো। আমি সাংবাদিক, এ বরং আজকাল কেউ কেউ বোঝে! কিন্তু লেখক আবার কি! শুনলে হাসি পায়। বলো ব্যবসায়ী, বলো দাল্দার মধ্যেও ভেজাল মিশিয়ে চালাই, বলো চা'লের সঙ্গে কাঁকর খাওয়াই, কিংবা বলো দাগ-দেওয়া সস্তা গাঁইট কিনে চোরা দামের কাপড় বেচি,—সে পরিচয়টা বরং স্পষ্ট। কিন্তু লেখক মানে কি? মুহুরি বল্ছ? জাবদা খাতা লিখিয়ে? মুন্সী?—ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না! কিন্তু যাচ্ছ কি জন্যে?

আকাশ-পাতাল ভেবে বললুম, দেখতে যাচ্ছি!

কী দেখতে?

অগত্যা সাংবাদিক ভাষাতেই বলতে হোলো, Men and things.

যাবার সময় সই-সাবুদ ক'রে জানিয়ে দিতে হোলো সাতদিনের মধ্যেই ফিরবো। এরা সীমান্তরক্ষী ভারতীয় পুলিশ, যাকে বলে চেক্পোস্ট। এপারে এই, পুলের ওপারেও তাই,—একই চেক্পোস্ট, একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। সে যাই হোক, পাহাড়-পর্বত এখানে চারিদিক থেকে যেন আমাদের বেষ্টন করেছে। অনেকটা যেন আমরা পাতালের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। এখন থেকে রংগীত নদী চ'লে গেছে, পূর্বদিকে তারপর ঘুরেছে।

কোন্ দিকে ঘুরেছে বলা কঠিন। অনেকে বললে, ভুটানের দিকে চ'লে গেছে। ভুটান ত' আমাদের কাছে আজও রহস্যরাজ্য। হাজার বছরের মধ্যে কোনো সভ্যতা কোনো সুড়ঙ্গপথ বেয়েও ভুটানে আজো প্রবেশ করার সুবিধা পায়নি। তিব্বতের সঙ্গে বরং বৃহত্তর পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে, কিন্তু ভুটান আমাদের কাছে একেবারেই অন্ধকার। হঠাৎ মনে হোলো এমন প্রাচীন পাথর হিমালয়ের কোথাও চোখে পড়েনি। এমন কৃষ্ণাঙ্গ, এমন শৈবালাচ্ছন্ন, এমন ছায়াময় নদীগহ্বর, এমন প্রেতলোকের সঙ্কেত—অন্য কোথাও নেই। নিঃসন্দেহে, নতুন দেশে এসেছি। সর্বত্র কেমন একটা আদিম আবহাওয়া, প্রাগৈতিহাসিক পটভূমি। পাঠান, মোগল, ওলন্দাজ, ফরাসী পর্তুগীজ, ইংরেজ কোথা দিয়ে কবে চ'লে গেছে, এদের হুঁস নেই। এদের যোগতন্দ্রা ভাঙবার মতো সাড়াশব্দ শত শত বছরের মধ্যে কোথাও থেকে আসেনি। মানুষের আওয়াজের চেয়ে এরা পাখির ডাক শুনে এসেছে বেশী, দেখে এসেছে কেবল প্রজাপতি-পতঙ্গের খেলা বনময় পাহাড়ের আলোছায়ায়, জেনে এসেছে মানুষের সঙ্গে সরীসৃপ একই চালার নীচে সদ্ভাবের সঙ্গে বাস ক'রে চলেছে। উপকরণের আয়োজনকে এরা কখনও প্রশস্ত করেনি, সেই কারণে প্রয়োজনের সীমানাও এদের কাছে বিস্তৃত হয়নি। গাছে-গাছে মৌচাক রচনা ক'রে যেমন মৌমাছিরা তাকে আঁকড়ে থাকে,—এখানকার মানুষও তাই, পাহাড় পর্বতের গাত্রদেশে ছোট ছোট আবাস রচনা ক'রে কামড়ে প'ড়ে রয়েছে যুগযুগান্ত।

ঝোলা পুলের পর রংপো একটি অধিত্যকাময় ছোট গ্রাম। কিন্তু এখানে যে বাজারটি বসেছে, সেটি সীমান্তের শেষ বাজার হলেও আয়তনে ছোট। লেপ্‌চার সংখ্যা এদিকে কম, কিন্তু—বিস্ময়ের কথা, তিব্বতীরাও এখানে মালপত্র বিকিকিনি করে। মাড়োয়ারীরা আছে, যেমন আছে সব্র; নেপালী আছে, এমন কি বেহারী ব্যবসায়ীও আছে,—কিন্তু বাঙালী নেই। ব্যবসায়ীরা বাড়ি ঘর বানিয়ে ব'সে গেছে। প্রধানত ভারত থেকে আনে কাপড়, নুন, খেল্‌না, তামাক এবং নানাবিধ মনোহারি ও কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রী। এসব আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে লেপ্‌চারা বেশী সুবিধা পায় না, সুতরাং কালক্রমে তা'রা যদি মনে করে বাইরের লোকেরা তাদেরকে দোহন করছে, খুব অন্যায় হবে কি? অন্যান্য পাহাড়ী গ্রামে যেমন,—পথ ঘাটের বালাই এখানে নেই। ধুলোবালি কাঁকর পাথর ছাড়া আর কোনো পরিচ্ছন্ন জীবন আছে, এ কল্পনাতীত। ভারতের সীমানার কথা ছাড়ো,—এটা হোলো বাঙলা ও সিকিমের সংযোগস্থল; অর্থাৎ বাঙলা থেকে তিব্বতের দূরত্ব পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন

মাইলের বেশী নয়,—মাঝখানে পড়ে এই সিকিম! কিন্তু এখানে বাঙলার সংস্কৃতির কোনো চিহ্ন নেই। বৌদ্ধের সঙ্গে শাক্ত মেলেনি কোনো কালে। পৃথিবীতে কম বেশী অন্তত পঁচাত্তর কোটি লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু স্বয়ং গৌতমবুদ্ধের প্রতিবেশী বাঙালী,—এই পুনরুজ্জীবনের যুগ ছাড়া,—কোনো-দিন কোনো বৌদ্ধ মতবাদ গ্রহণ করেনি। অথচ, এর আগে বলেছি, এই বাঙলারই সন্তান অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে নতুন বৌদ্ধধর্ম প্রচার ক'রে আচার্য বোধিসত্ত্ব নামে আজও সমগ্র তিব্বতে পূজা পান। গৌতম বুদ্ধের পরেই হোলো তাঁর আসন।

রংপো গ্রাম ছেড়ে আমাদের গাড়ি চললো সিকিমের ভিতর দিয়ে। এবারে রৌদ্র দেখছি, আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। কিন্তু পথ তেমনি সঙ্কীর্ণ, এবং প্রস্তরসঙ্কুল। এবারেও তিস্তার শাখা নদী চলেছে আমাদের বাঁদিকে। ডান-দিকে পাহাড়ের দেওয়াল। হারিয়ে গেছে তিস্তা, কিন্তু কোথায় হারিয়েছে খোঁজ পাইনি। কেউ বলে, এখান থেকে-সোজা গিয়ে ম্যান্‌জেন্ জনপদ পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে কুম্ভকর্ণ পর্বত হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে; আবার কেউ বলে, সোজা উত্তরে স্নুটাংয়ের দিকে। আমরা চলেছি পূর্বপর্বতের গায়ে গায়ে। চারিদিকে গিরিশৃঙ্গদল শান্ত ধ্যানগম্ভীর। ধীরে ধীরে কেমন যেন গহন গভীরের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবী এখানে আশ্চর্য, আবার মনে হচ্ছে, আমার পরিচিত পৃথিবীর বাইরে, তাই যেন চারিদিকে নির্বাক বিস্ময়। এ হোলো প্রজাপতির দেশ, শত শত বর্ণের প্রজাপ্রতি আর পতঙ্গ এখানে জন্মায়। এখানে কমবেশী পাঁচশো রকমের অর্কিডের গাছ এবং লতা। ফুল এখনও ফোটেনি, লতাপাতার শিকড়ে-শিকড়ে সবেমাত্র প্রাণের আকুলি-বিকুলি ধরেছে। কিন্তু জানি অদৃশ্য মন্ত্র কাজ করছে বনে বনে,—অদূর ভবিষ্যতে পুষ্প সমারোহে দিগ-দিগন্ত প্লাবিত হবে। বাঙলার একজন প্রাক্তন গভর্ণর এই অঞ্চলে এসে বলেছিলেন, land of the thunderbolts. বজ্রপাতের দেশ। একজন বলেছেন, land of the butterflies. প্রজাপতির সাম্রাজ্য!

গাড়ি দাঁড়ালো পথের পাশে। তিব্বতী ক্যারাভান্ আসছে, ওদের পথ দেওয়া দরকার। কান পেতে শুনলুম, নিস্তব্ধ পাহাড়পল্লীতে মৃদুমধুর তন্দ্রা-জড়ানো আওয়াজ উঠছে, টিং···ডিং···টং···টাং··· আসছে ওরা যেমন আসছে চিরকাল। ওরা বেঁধে রেখেছে চিরকাল ভারতের সঙ্গে তিব্বতকে! ধর্মের মতবাদ, সমাজের আইনকানুন, রাজনীতির ঝড়,—কোনোটাই ওদের পথরোধ করেনি। ওই শ্লথগতি উদাসীন অপরিচিত পথিকের দল,—ওরা আসছে

ভারতের দিকে। টিং···ডিং···টং···টাং ঘণ্টার আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রসারিত ক'রে দিচ্ছে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। ওরা আসছে!

প্রথম বহির্ভারতীয় ক্যারাভান্ দেখেছিলুম মারী পাহাড়ে, এখন সেটা পশ্চিম পাকিস্তান,—কিন্তু সেই ক্যারাভানের লোকেরা তখন শহরে ঢুকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের মাথার টুপি, আলখেল্লা আর জুতো-মোজার চেহারা দেখে আড়ষ্ট হয়েছিলুম। তারা ছিল পামীরী, ইয়ারকন্দী, সমরকন্দী, উজবেকী, খোরাসানী এবং উত্তর তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার মধ্যবর্তী জাতির লোক। কাশ্মীরে দেখেছি ক্যারাভান্, তারা গুজর জাতির লোক,—এক প্রকার যাযাবর। এ ছাড়া আসে মধ্য এশিয়া থেকে, কিংবা সমরকন্দ; বোখারা, এবং মঙ্গোলীয় তাকলামাকান মরুভূমির পথ পেরিয়ে। চরস, চামড়া, পশম—এই তাদের কারবার। মাঝে মাঝে ঘোড়া এবং অশ্বতর বিক্রির মস্ত হাট বসে! পূর্ব পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ ও পেপস্যুর ভিতর দিয়ে ক্যারাভানের পথ আছে বহুকাল থেকে। কুমায়ুনের ভিতর দিয়েও আছে কয়েকটি পথ। কিন্তু এই ক্যারাভানদলের লোক সমতল ভূভাগে গরমের ভয়ে সাধারণত যেতে চায় না। যাক্, যা বলছিলুম, নেপালের ধর্ম হোলো মোটামুটি বৌদ্ধ, কিন্তু ওকে হিন্দুরাজ্য বলা হয়ে থাকে। সে-অর্থে সিকিম বৌদ্ধ হয়েও হিন্দু। ত্রিভুবনবিক্রম নামটি হোলো হিন্দু, কিন্তু সিকিমের মহারাজা তাসি নামগিয়াল্ সম্পূর্ণ বৌদ্ধ—কেবল বৌদ্ধ নয়, তিনি তিব্বতী। আত্মীয়পরিজন, কুটুম্বাদি—সকলেই তিব্বতী। ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগ নেই। ওরা দলছাড়া, গোত্রছাড়া।

ক্যারাভান এসে পড়লো সামনে। ঘোড়া এবং অশ্বতরের পিঠের দুইধারে কাঁচা পশমের বোঝা ঝুলছে। দলের মধ্যে কখনও পঞ্চাশ ষাট, কখনো বা দুশো একশো জন্তুও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আসে তিব্বতী কুকুর, তা'রা ওই জন্তুগুলিকে পাহারা দেয়, মালের উপরে নজর রাখে। লোমশ কালো কুকুর, ভয়ঙ্কর দুই চোখ, অত্যন্ত প্রভুভক্ত। এরা সঙ্গে আসে, আবার জন্তুদের সঙ্গে ফিরে যায়। পথে পথে যখন তিব্বতী ব্যবসায়ীরা ঘুমোয়, এই কুকুররা থাকে পশুদের পাহারায়। চোর, ডাকাত, বন্যজন্তু,—এই কুকুরের ভয়ে কাছে আসতে সাহস পায় না। অদ্ভুত পোশাকে তিব্বতী চলেছে গিরিসঙ্কটের গা বেয়ে, দূরের থেকে দেখা যায় দীর্ঘলম্বিত সরীসৃপের মতো ক্যারাভানের দল; এই পার্বত্য পটভূমিতে সমস্তটাকে মিলিয়ে আশ্চর্য মনে হতে থাকে। ওদের সঙ্গে আসে সুদূরের গন্ধ, দুস্তর গিরিশৃঙ্গ আর অনধ্যুষিত অঞ্চলের সংবাদ,—ওদের দিকে তাকালে পর্যটকের মন অকারণ দুরাশায়

কেমন যেন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। আস্বাদ পাওয়া যায় বিচিত্র জীবনের।

রংগীত নদীও বোধ হয় হারালো। এবার আমরা একটি কাঠের সাঁকো পেরিয়ে এলুম শিংতাম হাটে। রংপো থেকে সাত মাইল। আজ শুক্রবার, হাট বসেছে মস্ত বড়। সপ্তাহে এই একটি দিনই হাট। এটি অনেকটা পাহাড়তলী; পাশেই শিংতাম নদী। নদীতে স্রোত বেশ। বুঝতে পারা যায় এ ধারা হোলো তুষারবিগলিত, নৈলে ফেব্রুয়ারী মাসে এ ধারা অব্যাহত থাকে না। আশেপাশে পর্বতের চূড়া বিরাট থেকে বিরাটতর হচ্ছে। এবার আমরা যাবো চড়াই পথে। পথ গিয়েছে উত্তরে।

শিংতামের হাট লোকে লোকারণ্য। সপ্তাহে একটি দিন লেপ্‌চারা বাজার হাট করে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের আজ মস্ত মরশুম। কমলালেবু বিক্রি হচ্ছে টাকায় ত্রিশটি। মেয়েদের গালে ফুটেছে কমলালেবু। ছুরি, কাঁচি, কাটারি, কুক্‌রির বাজার। তিব্বতী পলা, আর ফটিকের মালা। পিতলের আর রূপার গহনা। কাঠের জিনিসপত্র, কাঁচা চামড়ার ব্যাগ,—কম্বল আর ধোসা। আমার পাশে সকাল থেকে ব'সে রয়েছে একটি তিব্বতী দম্পতি,—ভাষা জানিনে ব'লে হাত আর মুখনাড়ার ওপরে বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। আমার হোলো ভাঙা হিন্দি, আর তাদের হোলো ভাঙা ভাঙা লেপ্‌চা বুলি। অর্থাৎ গ্রীক আর হেব্রু! কিন্তু হাসি জিনিসটে পৃথিবীর কোনো জাতি আর কোনো ভাষাতেই দুর্বোধ্য নয়—সে এক কথায় একেবারে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। মেয়েটি বমি করছে সেই সকাল থেকে, যেমন মোটরে পাহাড় পেরোতে গিয়ে অনেকের হয়,—মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকাতে পারছে না, গাড়ির মধ্যেই মুখ গুঁজে প'ড়ে রয়েছে। ওরা যাবে তিব্বতের কোন্ গ্রামে, কিন্তু কালিম্পঙে গিয়েছিল কি যেন কাজে। গ্যাংটকে দিন তিনেক কাটিয়ে ওরা ফিরবে তিব্বতে। সাধারণত তিব্বতীদের গায়ের রং হয় সাদায় আর লালে মেলানো,—দুধে আর রক্তে! কিন্তু এ ছেলেটি অনেকটা শ্যামবর্ণ। ওর মাথার লোমশ কোণাকার রঙীন টুপি—পশমে আর চামড়ায় তৈরী,—দেখলে অবাক লাগে। কিন্তু ওই টুপি গঠনশিল্পের মধ্যেই আছে তিব্বতী গুম্ফামন্দিরের গঠনসঙ্কেত এবং কারুকার্য। পরনে তিব্বতী জোব্বা নেই, কিন্তু পশম বসানো ফুলদার চামড়ার জ্যাকেট। সে অনর্গল আমার সঙ্গে কথা বলছে, যার এক বর্ণও আমি বুঝিনে; এবং সে আমার কথার জবাবে যা বলছে, সেও আমার অজানা। অথচ বন্ধুত্ব! হাসি দিয়ে, গা ছুঁয়ে, সিগারেট বিনিময় ক'রে,—সে এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব।

গাড়ি থেমে রয়েছে। আমাদের সামনেই একটি দেশী মদের দোকান। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড় জমেছে। মা-বাপের সঙ্গে সেজেগুজে এসেছে গৃহস্থঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। মা-বাপ দিচ্ছে ওদের মদ কিনে। টিনের পাত্র মুখে তুলে চক্‌চক্ ক'রে সবাই 'চ্যাং' নামক দেশী মদ খাচ্ছে। আমার পাশে বসেছিলেন চশমাপরা একটি নেপালী ভদ্রলোক। তিনি বললেন, এখানে এই রীতি। হাটের দিনে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছে। নেশা ক'রে সকলেই আনন্দ করে। ঠাণ্ডামুলুকে এই নিয়ম। মদ নইলে ওদের একটুও চলে না।

শিংতামের বাজার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। এখানেও কিন্তু সেই মাড়োয়ারী এবং বিহারীদের প্রাধান্য। নেপালী কারবারি সামান্য কিছু আছে, কিন্তু লেপ্‌চাদের সংখ্যা একেবারেই কম। স্থানীয় যারা অধিবাসী, তাদের সঠিক চিনতে পারা কঠিন। একই মঙ্গোলীয় রক্ত, কিন্তু বহুবিধ শাখা-প্রশাখায় প্রকাশ। বিশেষ ক'রে নেপালী, ভুটিয়া, সিকিমি,—এদের মেয়েদের পার্থক্য বোঝা শক্ত বৈকি। তিব্বতী মেয়ে অন্য রকম, তাকে চিনতে দেরী হয় না। তিব্বতী পুরুষ অতি বিচিত্র। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিভিন্ন বর্ণের পোশাক, সর্বাঙ্গটাই যেন রামধনুর খেলা। সমস্ত রংগুলোই ঘন—লাল নীল কালো হলদে বেগুনি শাদা সবুজ,—পরিচ্ছদের মধ্যে এমন বর্ণাঢ্যতা হিমালয়ে আর কোথাও নেই। সমস্ত পাহাড়ীদের ভিতর থেকে তিব্বতীকে বা'র করা যায় এক পলকে,—ওই বর্ণের বাহারের জন্য। যারা একটু বাবু, তাদের ত' কথাই নেই। এক এক জনের এমন বিচিত্র পোশাক যে, রঙ্গমঞ্চে নামালেই হাততালি পড়ে। শিংতামের বাজারে এত লোক, এত নরনারী,—কিন্তু দুচারটি বেণী-ঝোলানো অথবা টুপী-পরা লামা যেখানে রয়েছে, তাদের চিনে বা'র করা সব চেয়ে সহজ!

দক্ষিণ পাহাড়ের ঢালুপথ বহু দূর উঁচুতে উঠে গেছে। যেদিকে তাকাই, জনবাহুল্য কোথাও চোখে পড়ে না। শিংতামের হাট ছেড়ে এবার গাড়ি আমাদের চললো উত্তরে। আশেপাশে পাহাড়তলীতে একটু আধটু চাষ আবাদের চিহ্ন দেখে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে দেখছি কমলালেবুর এক-একটি বিস্তৃত বাগান, কোথাও কোথাও অজস্র ডালিম ফুল ও ফল ধরেছে কোথাও, বা কাঁচা আপেলের বন। এখান থেকে শত শত পেটি ফল বাইরে রপ্তানি হয়। এবার আমাদের পথ হোলো চড়াই। নদী এবার ডানদিকে, কিন্তু এই নদীটিকে এরা নাম দিয়েছে শিংতাম। সম্প্রতি পাহাড়ের মধ্যে কোথাও ঘন বর্ষা হয়ে থাকবে, শিংতাম নদীতে তাই জলস্রোতের দুরন্তপনা দেখছি। ঢেউ

নয়, স্রোতের উদ্দামতা। নদী ঘুরেছে নানা বাঁকে, বাধা মানেনি কোথাও,—আবার কোথাও বা স্থির। কিন্তু শৈবালের এবং অজস্র বিচিত্র লতাপাতার এমন আশ্চর্য ফলন সহসা চোখে পড়ে না। ওদের মধ্যেই বহুপ্রকারের অর্কিড, বহুবিধ রডোডেনড্রন। গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল,—এদের বিষয়ে জ্ঞান আমার সীমাবদ্ধ, সে-অভিমান আমি রাখিনে। এমন বহুবিধ গুল্মলতা মাড়িয়ে চ'লে গেছি, দেখে মুখ ফিরিয়েছি,—শহরের লোকদের কাছে যার আর্থিক মূল্য অনেক। মাইল দুই আড়াই এগিয়ে আমাদের গাড়ি ঢুকলো পাহাড়ের এক সুড়ঙ্গলোকে। ক্যারাভানের বিরাম নেই, একটির পর একটি দল চলেছে। কোনোটি ছোট, কোনোটি বড়। কিন্তু একটি অথবা দুটি সেই ভীষণচক্ষু কুকুর প্রত্যেক দলের সঙ্গেই চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই অশ্বপালক, সেই স্বাস্থ্যবান রূপবান তিব্বতী। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। সাধারণ চাষী আর শ্রমিক তিব্বতী একপ্রকার,—তাদের বহুসংখ্যক দেখা যায় কালিম্পঙের এখানে ওখানে। অন্য শ্রেণী—যারা উঁচু জাত। যারা জাত সওদাগর, যারা বহু টাকার মালিক।

সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে আমাদের গাড়ি চললো এঁকেবেঁকে উত্তরে। রংপো থেকে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক হোলো আন্দাজ পঁচিশ মাইল, এবং গ্যাংটক থেকে কালিম্পঙ পঞ্চাশ মাইল। আমরা কেবল যে চড়াই পেরোচ্ছি তাই নয়, মধ্যে মাঝে উপত্যকাও পেরিয়ে চলেছি। সত্যি বলতে কি, মাত্র এই কয়ঘণ্টার মধ্যে গ্রীষ্ম বর্ষা এবং শীত—তিনটি ঋতুই অনুভব ক'রে এলুম। খুব ভালো লাগছে, কেননা ঠাণ্ডা বোধ করছি। নীচের দিকে গুমোট ছিল বেশী—যেমন সচরাচর পাহাড়বেষ্টিত অধিত্যকায় হয়। কিন্তু উপর দিকে উঠলেই বাতাস লঘু, তখন হাওয়া বইতে থাকে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বাঁকের পথে চোখে পড়ছে সুদূর দিগন্তে চমলহরির বিশাল গগনচুম্বী শিখর, মাঝে মাঝে সিনিয়লচু, কবরু এবং ক্বচিৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা। পাচ হাজার ফুট ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি উপরে চড়তে লাগলো।

কে যেন বলছিল সিকিমের মূল নাম হোলো, সুখিম,—অর্থাৎ 'নবগৃহ'। তিব্বতীরা নাকি সিকিমকে বলে, ডেনডং,—অর্থাৎ চাউলের ভাণ্ডার। ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল ব'লেই বোধ হয় সিকিম বহুকাল তিব্বত গভর্ণমেন্টের অধীনে ছিল। বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে কেবলমাত্র ধর্ম প্রভাবের দ্বারা কেমন ক'রে দেশ জয় করা যায়, তিব্বত তা'র প্রমাণ। উদাহরণ দিই। সমগ্র পূর্বকাশ্মীর, উত্তরপূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর গাড়োয়াল এবং কুমায়ুন, উত্তর নেপাল, সিকিম এবং ভূটান। আসামের উত্তরপূর্ব প্রান্তও ধরো—ভুল হবে না। এর

মধ্যে সিকিম হোলো দোটানায়। রাজনীতি দিক থেকে সিকিম যখন তিব্বত রাষ্ট্রের অধীনে ছিল, তখন সিকিমের মধ্যে কালিম্পঙ সমেত সমগ্র দার্জিলিং জেলা অন্তর্ভুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ছিল ইতিহাস। উনিশ শতাব্দীর প্রথমে গুর্খারা সিকিম আক্রমণ করে, এবং ঠিক একই সময় তা'রা আক্রমণ করে গাড়োয়াল। কিন্তু লড়াই বাধে ইংরেজের সঙ্গে। গুর্খারা ইংরেজের হাতে পরাজিত হয়ে পশ্চিমে দেরাদুন ও গাড়োয়াল ছেড়ে দেয়, এবং পূর্ব ভারতে ছাড়তে বাধ্য হয় সিকিম। কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে সিকিমের মন রইলো ভারতের দিকে, প্রাণ পড়ে রইলো তিব্বতে। আজ পর্যন্তই তাই। আত্মিক দিক থেকে তিব্বতের লামাধর্ম হোলো সিকিমের রাষ্ট্রধর্ম। বিবাহ, কুটুম্বিতা, মামার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, বাপের বাড়ি—সমস্তই তিব্বতে। রাজরানী উভয়েই তিব্বতী, ধর্মের অনুশাসন তিব্বতীয়, আচার-বিচার ব্যবহার প্রথা সমাজ নীতি এবং সর্বকার ধর্মমত তিব্বতের মুখ-চাওয়া। কিন্তু একটা কথা সত্য। ভারত ও তিব্বতের মধ্যস্থিত এই সিকিমের রাজনীতিক ভারসাম্য রক্ষা ক'রে চলেছে নেপালীরা। সিকিমের জনসংখ্যার মধ্যে নেপালীরা বেশী। উপজাতি হিসাবে লেপ্‌চারা আছে, কিন্তু তা'রা বড় নিরীহ। নেপালী, গুর্খা, তিব্বতী এবং আদিম সিকিমী,—এই চারটি সম্প্রদায়ের থেকে লেপ্‌চা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এদের রং ঘোলাটে, অত্যন্ত সরল, অসাধারণ পরিশ্রমী, এবং সততা ও সাধুতা এদের মজ্জাগত স্বভাব। সিকিমের দেড় লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে এরা ছড়িয়ে থাকে, এবং প্রায় তিন হাজার বর্গমাইল ব্যাপী পার্বত্য-লোকের পাঁচশত গ্রামের সর্বত্রই এরা বাস করে আধুনিক সভ্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। লেপ্‌চারা হোলো প্রধানত চাষী আর শ্রমিক, থাকে অনেকটা সমাজের নীচের তলায় এবং উচ্চবিত্ত নেপালী-গুর্খাদের খিৎমদ করে।

প্রজাপতির দেশের শিখরলোকের কাছাকাছি প্রায় এসেছি। জনৈক বিশেষজ্ঞ একবার বলেছিলেন, এই প্রজাপতির দেশে অন্তত চার হাজার রকমের ফুল এবং পুষ্পলতা পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, ফার্ণ পাওয়া যায় আড়াইশো রকমের, সাড়ে ছয়শো শ্রেণীর অর্কিড, ছয়শো প্রকার প্রজাপতি এবং প্রায় সাত হাজার প্রকার অন্যান্য কীটপতঙ্গ। এ সম্ভব, অবিশ্বাস করিনে। সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সিকিম হোলো সংস্কারবর্জিত, অন্তত দু'হাজার বছর ধ'রে কোনো বৈপ্লবিক নূতনতর সভ্যতার হাত পড়েনি এখানে, চারিদিকে তাই অনেকটা যেন আদিম বন্যতা। লামারা থাকে মঠ আর গুম্ফা নিয়ে, রাজারা থেকে রাজতন্ত্র নিয়ে। রাজায় প্রজায় বিরোধ নেই কখনও। প্রজারা

এগোতে চায় না, ঘর ছেড়ে বেরোতে চায় না,—রাজারাও পরম নিশ্চিন্তে দিনযাপন করে। মাথার শিয়রে যোগতন্দ্রায় ঢুলছে তিব্বত, আর পায়ের দিকে উদাসীন ভারত,—নীচের থেকে কেউ আসে না, কেউ খোঁজখবর করে না। সমগ্র সিকিমে লামাদের প্রভাব আগাগোড়া। মারণ উচাটন বশীকরণ, ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষস দৈত্য,—এই নিয়ে থাকে গোঁড়া বৌদ্ধের মতাবলম্বীরা। তাদের সঙ্গে আছে পৌরাণিক আজগুবী কাহিনীর অনুশাসন, যাদুবিদ্যা এবং অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতি অন্ধ আসক্তি। এ সমস্ত প্রচারের জন্য রয়েছে অসংখ্য বৌদ্ধবিহার ও মঠ, এবং শত সহস্র বৌদ্ধভিক্ষুর দল। সুতরাং কালো কম্বল ঢাকা দিয়ে প'ড়ে রইলো সিকিম যুগযুগান্তর।

পথের শেষ দিকের অনেকটা অংশ চড়াই। আমাদের গাড়ি সিকিমের ডাক নিয়ে চলছে। গ্যাংটকে এসে যখন পৌছলুম, বেলা তখন চারটে।

গ্যাংটকের আকাশে মেঘ জমে উঠলো অবেলায়। ফাল্গুনের প্রারম্ভে এরকম আকাশের চেহারা আশা করিনি। কিন্তু গাড়ি থেকে যখন বাজারের সামনে ওই প্রশস্ত শানবাঁধানো অঞ্চলটায় নামলুম, পা দুটো যেন নতুন দেশের স্বাদ পেয়ে শিউরে উঠলো! ভারতবর্ষ এটা নয়, প্রথমেই উপলব্ধি করলুম। বাতাসটা তিব্বতীয়। লেপচাদের দেখলুম এই প্রথম, তিব্বতী মেয়েপুরুষে ভরা পথ ঘাট। সামনে ছোট ছোট দোকান বসেছে পথের ওপর। বিচিত্র বিপণি, অনেকক্ষণ সামনে দাঁড়ালেও কৌতূহল মেটে না। হাড়ের মালা, তিব্বতী ফটিক, লামাদের টুপি, চমরীর ল্যাজের টুকরো, শুকনো চামড়া, তিব্বতী চিরুণী, নেপালী কুকরি এবং বিভিন্ন প্রকারের লৌহঅস্ত্র। আরো আছে বহুবিধ, নাম জানার উপায় নেই। মাঝে-মাঝে চলেছে লাল মখমল আর পশমের পোশাকে সজ্জিত লামা পুরোহিতের দল। তাদের সমস্ত পোশাক হোলো আভিজাত্যের সঙ্কেত। ভালো একটি গরম জোব্বার দাম দেড়শো থেকে দুশো টাকা পর্যন্ত দাবি করে। গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ওই আলখেল্লায় ঢেকে রাখা যায়। হাত দুটো থাকে ভিতরে, সেই হাতে অহোরাত্র জপের মালা, এবং অহোরাত্র মন্ত্রোচ্চারণ। পুলিশের দল অনেকাংশে তিব্বতীয়, অফিসার পর্যন্ত। বাজারের সামনে চেকপোস্টের কাছে এসে আমাকে এই নিয়ে তৃতীয়বার নাম-ধাম পরিচয় লিখতে হোলো। কিন্তু কোথাও কোনো অসৌজন্যের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হয়নি। আমার সঙ্গী সেই তিব্বতী দম্পতি এবার গাড়ি থেকে নেমে বাঁচলো। বৌটি এবার আবরণ ঘুচিয়ে হাসিমুখে স্বামীর পাশে দাঁড়ালো। গত সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ওকে দেখিনি,—যতদূর পথ এসেছি, এবং মাঝে মাঝে থেমেছি।

মেয়েটি• জাত তিব্বতী নয়, কিছু নেপালী ঘেঁষা! সুতরাং দু'চারটে হিন্দি শব্দ বোঝে, এবং স্বামীকে বুঝিয়ে দেয়। সকল কালেই মেয়েদের বাকশক্তি অপেক্ষা শ্রবণশক্তি প্রখর। মনটা অন্তর্মুখী ব'লেই অপরের ভাষাটা সহজে উপলব্ধি করে এবং দ্রুত শিখে নেয়। এখানে মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কিত কে যেন আছে, ওরা গিয়ে সেখানে উঠলো। ওরা তিনদিন এখানে থাকবে।

আমি গিয়ে দাঁড়ালুম জেঠমল ভোজরাজের গদির সামনে! সমগ্র সিকিমে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী হোলো তা'রা। বাজারের অনেকটা অংশ জুড়ে তাদের গদি। খাদ্য, বস্ত্র, মনোহারি, পোশাক, তামাকজাত বস্তু, ফলমূল, সুগন্ধী,—সিকিমের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে তাদের কারবার হোলো একচেটিয়া। কেবল তাই নয়, তা'রা হোলো মহারাজার ব্যাঙ্কার। অর্থাৎ এ রাজ্যের সমস্ত টাকাকড়ি লেন-দেনের ভার তা'রা হাতে নিয়ে আছে। তা'রা টাকা গচ্ছিত রাখে, এবং দরকার হ'লে অতিরিক্ত অর্থও সরবরাহ করে। অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব কিছু তাদের হাতে আছে কিনা আমার জানা নেই। যাই হোক, আমার কাছে কালিম্পঙের হাকিম মিঃ ভট্টাচার্যের চিঠি ছিল, সেই চিঠি দিতেই স্বয়ং দুজন মালিক হাসিমুখে উঠে এসে আমাকে নিয়ে ভিতরে বসালেন, এবং বোধ হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটি লোক চা, কেক ও বিস্কুটাদি এনে হাজির করলো। বাইরে বাদুলে মেঘ এবং দুরন্ত বাতাসের জন্য ঠাণ্ডা পড়েছিল, অতএব অপর একটি লোক একটি আগুনের পাত্র এনে আমার পায়ের কাছে রাখলো। আমার কষ্ট হয়েছে কিনা, পরিশ্রান্ত কিনা, কতদিন থাকার কল্পনা আছে, আমার প্রথম ইম্প্রেশন্ কি প্রকার—ইত্যাদি আলাপ-আলোচনায় তাঁরা বেশ খুশী হলেন। এক সময় আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলুম দেখে তৎক্ষণাৎ তাঁরা অভয় দিলেন, আমার জিনিসপত্র সম্বন্ধে কোনো উদ্বেগের কারণ নেই!

আধঘণ্টা পরে একটি লোক আমাকে সঙ্গে নিয়ে এই গদিরই সংলগ্ন একটি পশ্চিমমুখী মহলে নিয়ে গেল। সরু বারান্দা পেরিয়ে আমাকে একটি ঘরে পৌঁছে দিয়ে এবং পার্শ্ববর্তী 'গোসলখানা' দেখিয়ে দিয়ে সে আপাতত বিদায় নিল।

অপ্রত্যাশিত! এমন চমক আমার লাগেনি কোনদিন! বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেল এবং কলকাতার গ্রাণ্ড হোটেলের শ্রেষ্ঠ ঘরের চেহারা দেখেই এসেছি এতকাল, কিন্তু সেখানে বসবাসের মতো অর্থসঙ্গতি হয়নি কোনোদিন,—কিন্তু এঘর কি তাদের চেয়ে মন্দ? কিছুকাল আগে

মুর্শিদাবাদের নবাবের শয়নকক্ষে—যেখানে এই সেদিনও ইংরেজ ছোটলাট শয়ন করতেন,—সেই ঘরে একবার ঢুকেছিলুম। রাজা রামমোহনের শেষ বংশধর শ্রীমান্ শচীন্দ্রমোহন তা'র হেতমপুরের বাড়ির শৌখীন শোবার ঘরে একবার আমাকে বসিয়েছিল; কাশিমবাজারের রাজকক্ষ দেখে এসেছি, এবং দেখে এসেছি কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্তের ঘর, নদীয়ার মহারাজা আর নাটোরস্থিত মহারাজা জগদীন্দ্রনাথের বিশ্রম্ভালাপের সুসজ্জিত ঘর, কাশ্মীরের যুবরাজ করণ সিংয়ের বৈঠকখানা, যশলমীরের মহারাজা রঘুনাথ সিংয়ের শয়নকক্ষ, পান্না আর ছাতারপুর মহারাজাদের ঘর! এ ঘরে কিন্তু তা'রা সব একাকার। এর বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি কেবল ভয়ে ভয়ে ভাবতে লাগলুম, যাবার সময় কত টাকা চাইবে! হাজার হোক এরা ত' ব্যবসায়ী, টাকা না পেলে এদের চলবেই বা কি ক'রে?

পকেটের মধ্যে মনিব্যাগে হাতখানা নিজের থেকেই গেল, এবং চোখের সামনে সমগ্র সিকিম জুড়ে' প্রবল ভূমিকম্প হ'তে লাগলো। হাকিমের ওই চিঠিখানাই সর্বনাশের গোড়া। এই যে তিন-চারটে চাকর আমার পিছনে লেগে রইলো, এদের পদমর্যাদা অনুযায়ী বকশিস জোটাতে গেলেও ত দেউলে হ'তে হবে!

সহসা কাঠের বারান্দার উপর দিয়ে গুমগুম ক'রে পায়ের শব্দ হোলো, তার পরেই চতুর্থ চাকরটি মস্ত এক বালতি ফুটন্ত গরম জল, নতুন তোয়ালে, সুগন্ধি মাথার তেল, চন্দন সাবান, নতুন টুথপেস্ট এবং বুরুশ, রবারের নতুন স্লিপার, কলাইয়ের নতুন মগ—ইত্যাদি নানাবিধ স্নানের উপকরণগুলি বাথ-রুমের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে যন্ত্রচালিতের মতো চ'লে গেল! —এই রে!

দেখতে দেখতে আমিও বেপরোয়া হয়ে উঠলুম। যাই থাক্ কপালে, ভয় পাবো না—পেলে চলবেও না! দরকার হ'লে পলিটিক্যাল্ অফিসার মিঃ কাপুর, তা নৈলে দেওয়ান লালসাহেব! এতই বা কি! আমি গিয়ে বাথরুমে উঁকি দিলুম। সামনে মস্ত আয়না এবং চিরুনী-বুরুশ, পায়ের কাছে মস্ত বাথটাব, পাশে কাঠের চৌকি। গলা আমার শুকিয়ে এলো!

মেহগনি পালঙ্কে এক ফুট পুরু শিমুলতুলোর গদি মখমলে মোড়া। চমরীর লোম দিয়ে তৈরী কোমল কম্বল, দুখানা নধর লেপ, গোটা পাঁচ ছয় শিমুল তুলোর আন্‌কোরা বালিশ, সমস্ত মেঝেটা লোমযুক্ত কার্পেটে মোড়া, প্রতি আরাম কেদারায় পশমের গদী, প্রতি কাচের জানলায় পিতলের রডে টাঙানো সিল্কের পরদা, নতুন গোল্ডফ্লেকের টিন এবং য়্যাশট্রে। এ ছাড়া আয়না,

টুপির হ্যাঙ্গার, মস্ত দুই দেরাজ, ডাইনিং টেবল্, ওয়াশিং বেসিন্, রাইটিং টেবল্, আয়না, এবং ড্রয়ার। ঝকঝকে পালিশ চারিদিকে, তকতকে আসবাব। সামনের এক টিপাইয়ের ওপর কখন্ কে যেন রেখে গেছে নতুন একটি তালাচাবি।

স্নান সেরে এসে বিছানার মধ্যে ঢুকে ভাবছি বেরোবো কিনা, এমন সময় টিকিওয়ালা এক নেপালী ব্রাহ্মণ পাচক নিয়ে এলো খাদ্যসম্ভার। উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ক গরম গরম রাধাবল্লভীর সঙ্গে মুখরোচক ভাজি। দূরের থেকে খাঁটি গব্য ঘৃতের মধুর খোসবায় নাকে এলো। সঙ্গে একটি পাত্রে টাট্‌কা মালাই। পাচকের পিছনে-পিছনে পঞ্চম ভৃত্য এসে ছোট এক কেট্‌লী গরম চা, পেয়ালা ও প্লেট এবং এক ঘটি গরম জল ও একটি তোয়ালে রেখে চ'লে গেল। সমস্তটাই যন্ত্রচালিত, সমস্তটাই ম্যাজিক। ঈশ্বরকে মানো ত' ভালো, নৈলে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবতার জেঠমল ভোজরাজকে স্বীকার ক'রে নাও।

বন্ধুরা বলেন, তোমার যা পাওনা এ জন্মে তা'র চেয়ে অনেক বেশী পেয়ে গেলে! খাওয়ালে না কাউকে, কিন্তু খেয়ে গেলে সকলের কাছে!

এ নালিশের উত্তর নেই। একথা বোঝানো কঠিন, গত জন্মে সম্ভবত অনেক প্রিমিয়ম্ দিয়ে এসেছি, এ জন্মে পাচ্ছি আমার প্রাপ্য! তা ছাড়া এখনও ত' সময় যায়নি। জেঠমল ভোজরাজ যদি এই সব ভূরিভোজনের বিল্ পাঠায় তাহ'লে মধ্যরাত্রে দেবতাত্মা হিমালয়ের কোলে নিরুদ্দেশ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে কি?

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। পরিচ্ছদটা বদলে এবার বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। নতুন তালাচাবিটা ঘরে লাগাতে ভুলিনি। কিন্তু বাইরে এসে দেখি, আজকের মতো বাজার উঠে গেছে। সমগ্র গ্যাংটক এবার ঘরে উঠেছে। শীত পড়েছে বেশ, বাতাসে বেগ রয়েছে। হাত দুটো পকেটের মধ্যে না রাখলে চলে না। তিব্বতী এবং নেপালীরা পান খায় বেশ। একটির পর একটি পানের দোকান। যেমন দেখেছিলুম বর্মার রেঙ্গুন শহরে। অতি সুনিয়ন্ত্রিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পানের দোকান একটির পর একটি। রেঙ্গুনের প্রতি সড়কে প্রতি মোড়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরে একটি ক'রে পানের দোকান। এখানে ঠিক অতটা না হলেও কাছাকাছি। অর্থাৎ এতটুকু জায়গার মধ্যে এতগুলি দোকান বিচিত্র বটে। ডানদিকে কয়েক পা এগিয়ে দেখা গেল, পথের উপরেই একটি গেট,—গেটের তলা দিয়ে একটি পথ সোজা চ'লে গেছে দক্ষিণে। গেটের উপর একটি ছোট কাঠের ঘর। সেই ঘরে ভারতীয় ডাকঘর। অনেকটা যাকে বলে পর্চ্-এর মতো। নীচে দিয়ে লোক চলাচল করে আর উপরে ঘর।

ডাকঘরটিকে ডানদিকে রাখলে বাঁ দিকের পথটি পাকদণ্ডি ধ'রে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, বাজারে এসে নামার জন্য এটি শর্ট্‌কাট—রাজপথ এদিকে নয়। আমার অভ্যাস হোলো, নিজে নিজে খুঁজে বার ক'রা। সুতরাং ওই পাকদণ্ডি নিরিবিলি পথটি ধ'রেই চড়াই ভাঙতে লাগলুম। ছোট ছোট ঘোড়া এখানে ওখানে চ'রে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা পশমের বস্তা পিঠে নিয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে এক-আধটা মিউল্‌। আশেপাশেই লেপচাদের বস্তি, ওরই মধ্যে নেপালী। এ পাশে তিব্বতী মেয়ে মুর্গি তাড়িয়ে ঘরে ঢোকাচ্ছে।

বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ ক'রে, গায়ে একটু লাগে বৈকি। জোরে বৃষ্টি এলে মুশকিল,—আশ্রয় আচ্ছাদন কোনোটাই নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে বুজে আসছে গ্যাংটক। বাজার অঞ্চলে ইলেকট্রিক আলো আছে, তা'র কিন্তু উজ্জ্বলতা কম। যেমন কাশ্মীরের শ্রীনগরে। অত বড় শহর, কিন্তু সন্ধ্যা হ'লেই চোখ কানা। আলো জ্বলে পথে, কিন্তু সে-আলো যেন অন্ধকারকে বাড়িয়ে তোলে। সন্ধ্যার পরে শ্রীনগরের জীবন অভিশপ্ত। এখানেও তাই। স্বয়ং জেঠমল ভোজরাজ পেট্রোমাক্স জ্বালায়, ইলেকট্রিকের ক্ষীণ আলোয় তাদের কাজ চলে না। আমার ঘরটিতে অবশ্য বিদ্যুতের আলো দেখে এসেছি, দেখে খুশী হয়েছি। সে যাই হোক, বাজারের ওইটুকু অঞ্চল বাদ দিলে সবই অন্ধকার। কিন্তু রাজধানী শহর, আমারই বা এত উদ্বেগ কি জন্য? ধীরে ধীরে উপর দিকে পা বাড়িয়ে দিলুম। ভালো লাগছে, কারণ বহির্ভারতের স্বাদ নতুন। কোথাও কোথাও শস্পচ্ছন্নতার সঙ্গে আবছায়া অন্ধকার জড়িয়ে পথের পাশটিকে বিষণ্ণ ক'রে তুলেছে; কোথাও নতুন ঘর উঠছে—তা'র কাঁচা কাঠের মিষ্ট গূঢ় গন্ধে পথ আচ্ছন্ন। কোথাও পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে কোনো সওয়ার এধার থেকে ওধারে চ'লে যাচ্ছে। রাশি রাশি হরিদ্রাভ শ্বেত ফুলের স্তবক ঝুলে নেমেছে একখানে, ভিজা-ভিজা তা'র গন্ধ।

নাঃ—বৃষ্টি যেন বেড়েই যাচ্ছে, বেশী আর এগোনো চলে না। এক সময় অগত্যা মুখ ফেরাতেই হোলো। দেখা গেল নীচের থেকে আসছে তিনটি কোটপ্যান্ট-পরা লোক। তাদের বাঙলায় আলাপ শুনে দাঁড়ালুম, এবং নিজের থেকেই আলাপ করলুম। তাঁরা চাকুরে, এখানে সেণ্ট্রাল্‌ পি-ডবলু-ডি-তে কাজ করেন। বাঙালী এখানে আছেন কয়েকজন। কেউ এখানকার হাইস্কুলের শিক্ষক, কেউ ডাকঘরের লোক। জন আষ্টেক দশ, তা'র বেশী বাঙালী নেই। অন্য কোনো ভারতীয় এখানে চোখে পড়ে না। ভদ্রলোকরা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন উপর দিকে, কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল রাজবাড়িতে

প্রবেশ করবো, কিন্তু বৃষ্টির ধারা পুনরায় পথরোধ করলো। ফলে, উপর দিকে অনেকটা গিয়েও এক সময় ভিজতে ভিজতে ভিন্ন পথ ধ'রে নেমে আসতে হোলো। আকাশের চেহারাটা ঘন দুর্যোগের। আমার কপাল মন্দ, কারণ বছরের এ সময়ে শীত কিছু থাকলেও এরকম দুর্যোগ থাকে না। ফিরে এসে এক সময় নিজের ঘরে ঢুকলুম। সম্ভবত 'গোয়েন্দারা' আমার আশেপাশে ছিল। ভিতরে এসে সুস্থ হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে ভোজরাজের ষষ্ঠ ভৃত্য কেক-বিস্কুট সমেত ফুটন্ত চা রেখে চ'লে গেল, এবং মিনিট দুই পরে পুনরায় এসে কাচের এক কুঁজো পানীয় জল ও কাচের গ্লাস তার মুখে চাপা দিয়ে সযত্নে রেখে আবার চ'লে গেল।

মৃদুমধুর সঙ্গীতের মূর্ছনা কানে আসতেই ফিরে দেখি একটি রেডিয়ো সেট্ আমার পাশেই। বিকালে ওটাকে কাঠের সিন্দুক মনে করেছিলুম। বুঝলুম চা দেবার সময় চাকরটা প্লাগটি পরিয়ে গেছে। গান আরম্ভ হোলো এবার। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। বলাবাহুল্য, এমন ভোজ আর ভোগ্য হিমালয়ে কোনোদিন পাইনি। ভোজরাজ যদি ভোজবাজির দাম ধ'রে নেয়,—তাই আরেকবার গায়ে কাঁটা দিল।

নৈশভোজের তালিকাটা সংক্ষেপ করতে বলেছিলুম। সেজন্য পেস্তা-বাদাম কিসমিস-এলাচ-লবঙ্গ-দারচিনি দেওয়া পাঞ্জাবী পোলাও, খানকয়েক গরম পুরি, রসাদার আলুর দম, দু'খানা চপ, গোটাচারেক কালাকাঁদ, আলুবকরার চাটনি,—এ ছাড়া আর কিছু দেয়নি। ওদের ধারনা, এতে যদি হাকিম সাহেবের বন্ধুর কোনোমতে উপোস রক্ষে হয়!

বাহুল্য হলেও ব'লে রাখি, সিকিমের জল-হাওয়া বেশ হজমী!

ভোগবিলাসের এত আয়োজন সত্ত্বেও বলবো, দুর্ভাগ্য। রাত যত গভীর হচ্ছে, বৃষ্টি ততই বেড়ে চলেছে। সম্ভবত ত্র্যহস্পর্শযোগে যাত্রা করেছিলুম, যাত্রাটাই মাটি। দু'একদিনের মধ্যেই শিবরাত্রি, হয়ত তারই যোগ লেগে থাকবে। বাইরে কালীবর্ণ অন্ধকার, কি সে-অন্ধকারের শোভা মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেলেই নিউমোনিয়া। ঝড় নয়, কিন্তু বৃষ্টির সঙ্গে বায়ুগর্জন চলছে বাইরে। ঘরের মধ্যে ইন্দি-ছিন্দি বন্ধ, কিন্তু ভেন্‌টিলেটর আছে বৈকি। কান পেতে থাকলেই শোনা যায়, তুষারঝটিকার মতো দুরন্ত বায়ুর আর্তস্বর। যাত্রাটাই মাটি। বর্ষাকালে বর্ষা প্রিয়, অকালে ভালো লাগে না। সকাল বেলায় গৃহস্থ ঘরে জামাই এসে দাঁড়ালে মন পুলকিত হয় না। আগে থেকে খবর দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় জামাই এলে তবেই তা'র সমাদর।

লেপের ওপর লেপ, তার ওপর একরাশি লোমযুক্ত ভারী কম্বল। তবু

ভূপেন বক্সীর দেওয়া সেই ব্যালাক্লাভা টুপি মাথায় পরতে হোলো। অত্যন্ত সুখের বিছানা, কিন্তু কী অস্বস্তি!

পরদিন প্রভাতের চেহারা দেখে শেষ আশা ত্যাগ করলুম। সমস্ত পাহাড়গুলি মেঘের মধ্যে নিশ্চিহ্ন, কেবল তাই নয়, কাছের পাহাড়গুলিকেও আপাদমস্তক বাদলে আবৃত করেছে। সমগ্র গ্যাংটকের চূড়া, অর্থাৎ রাজবাড়ি, বৌদ্ধমঠ, কোর্টকাছারি,—মেঘের মধ্যে সমস্তই অবলুপ্ত। মেঘ নামছে নীচে পোষ্টআফিসের মাথায়, পানের দোকানের চালায়। মলিন বিষণ্ণ সকাল। অবিরাম বৃষ্টিতে সবাই পালিয়েছে। সকালের ডাক নিয়ে মোটর ছাড়েনি, পাহাড়ের পথে বৃষ্টি অতীব বিপজ্জনক। বাজারের চত্বর সম্পূর্ণ জনহীন। কয়েকটা পাহাড়ী ঘোড়া আর মিউল্ এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিল এতক্ষণ, এবার যেন ধীরে ধীরে কোন্‌দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেঘের পরে মেঘের তরঙ্গ ছুটছে এদিক থেকে ওদিকে। ধীরে ধীরে গ্যাংটক ডুবে যাচ্ছে মেঘ-সমুদ্রে। কিন্তু ওই সমুদ্রের তলায় ডুবে মাঝে মাঝে শুনছি শিঙার আওয়াজ, গম্ভীর ঘণ্টার সুদীর্ঘ ঘোষণা। মেঘলোকের মধ্যে উধাও হয়ে রয়েছে রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ, তারই একান্তের রাজগুম্ফা থেকে ডাক দিচ্ছে ওরা বিরাট হিমালয়কে। ঋতুর পর ঋতু পরিবর্তন দেখে এসেছি নীচের থেকে। ঘন বর্ষার এই চেহারাটা হয়ত আমার দেখা দরকার ছিল। সৃষ্টির এই অবলুপ্তি, এই চরাচরব্যাপী বিষাদের ছায়ান্ধকার, বৃষ্টিধারাবর্ষণের এই আকুল ব্যাকুলতা, এত বড় আয়োজনটাকে দেখতে পাওয়াটা দুর্ভাগ্য ত' নয়। মেঘে মেঘে শিঙার ফুৎকার আর ঘণ্টারব ধ্বনিত হচ্ছে—এ প্রকার অভিজ্ঞতা বিচিত্র বৈকি। অস্তিত্বলোকের চেতনা জানছিনে,—একটি প্রাণী, একটি পাখি, একটি কীট-পতঙ্গ,—কোথাও কিছু নেই! সৃষ্টির আদিকালে এসে যেন পৌঁছেছি,—জীবজন্মচেতনার আমি যেন প্রথম দর্শক।

বৃষ্টির ঝাপটা কিছু কমলো। কয়েকজন রাজপুরুষ মোটা পোশাকের ওপর বর্ষাতি জড়িয়ে এধার থেকে ওধারে পেরিয়ে গেল। আমি গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলুম ডাকঘরে। এখনই চিঠি ফেলা দরকার। ওখান থেকে নীচের দিকে অনেক দূর চোখে পড়ে। মেঘেরা নেমেছে অনেক নীচে। অদূরে দেখা যাচ্ছে একটি মন্দির, ওটা নাকি শিবস্থান। এখান থেকে মাইলখানেকের মধ্যে। ওর নাম নাকি 'মান' মন্দির। তিব্বতী স্থাপত্যের মতো অনেকটা কোণাকার গঠন। হঠাৎ কাছে এক স্থলে চোখ পড়লো, কোমরে কাপড়বাঁধা কালো জোব্বা পরা একটি তিব্বতী মেয়ে একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনের পাথরের স্তূপের ভিতর থেকে বা'র করলো মরা জন্তুর দুখানা বিচ্ছিন্ন

ঠ্যাং, যাকে আমরা ব'লে থাকি টেংরি। তারপর এদিক ওদিক উচ্চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সহসা দাঁত দিয়ে একখানা টেংরির চামড়া ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। জন্তুটার দেহের আর কোনো অংশ দেখছিনে। ওটা ছাগলের, কিংবা কুকুরের—বলা কঠিন। কিন্তু মেয়েটির সযত্ন আগ্রহটা আমার কাছে কিছু বিস্ময়কর। অবশেষে দাঁত দিয়ে সেই পরিত্যক্ত ঠ্যাংয়ের চামড়া ছিঁড়তে ছিঁড়তে যখন সে হয়রান হোলো, তখন কোঁচড়ের মধ্যে ঠ্যাং দুটিকে নিয়ে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। শীতপ্রধান দেশে মাংস ছাড়া চলে না বুঝতে পারা যায় বৈকি।

মধ্যাহ্নকালে আকাশ পরিষ্কার হোলো। রোদ উঠবার পর পাহাড়ে আর বৃষ্টির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। আহারাদি সেরে এবার বেরিয়ে পড়া গেল। অপরিসীম ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠলো আকাশের মাঝামাঝি। সেই স্বচ্ছ সুনীল কৃষ্ণাভা অগাধ সমুদ্রের মাঝখানেই সম্ভব। এখানে সূর্যালোক, কিন্তু দূর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বর্ষা তখনও চলেছে, কুহেলিজাল দেখলে বুঝতে পারা যায়। আমি চললুম এগিয়ে। গত সন্ধ্যার সেই চড়াই পথ ধ'রে উপরে উঠতে লাগলুম। গ্যাংটকের ছাদে উঠছি, আন্দাজ দেড়শো থেকে দু'শো ফুট উঁচুতে। কয়েকখানি সুন্দর বাংলোর বাগান পেরিয়ে গেলুম। সরু পাকদণ্ডির পথ অবশেষে উপরে গিয়ে প্রশস্ত রাজপথের মধ্যে মিলে গেল। এবারে কলকাতার কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ রাজপথের সঙ্গে এর তুলনা দেবো। বাতাস লঘু, কিন্তু তুহিন শীতল। রৌদ্র এত মধুর, এ যাত্রায় আর কোথাও এমন মনে হয়নি। সম্মুখের মালভূমির উপরে বিশাল তোরণ, তা'র ভিতরে প্রাসাদ এবং উদ্যান। সাধারণের গতিবিধি নিষিদ্ধ নয়,—দ্বাররক্ষীর ঔদাসীন্যে সেটা বুঝতে পারা যায়। সভ্যদেশের শাসনকর্তারা সদাসশঙ্ক, শত্রু-ভয়ে ভীত। গণ রাজনীতির দুষ্ট চক্রান্ত অসাধু ব্যক্তিকেও অধিনায়ক বানায়, নরহত্যাকারী সেনাপতিকে বানায় রাষ্ট্রের কর্ণধার। তালঠোকা হাততোলা প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ওঠে ক্ষমতার শিখরে, অন্য জনের মনে দেশজোড়া বিদ্বেষ ধূমায়িত হতে থাকে। সেই ঈর্ষা আর বিদ্বেষ থেকে ব্যক্তিগত হানাহানি। কিন্তু ভারতে এর কিছু ব্যতিক্রম। সিংহাসনারূঢ় রাজাকে হত্যার চেষ্টা হিন্দু ভারতে অনেকটা কম। মহারাজা তাশি নামগেয়াল এখানে সর্বপূজ্য,—সেইজন্য তাঁর রাজদরবার অনেকটা অবারিত।

মালভূমির উপরে এসে দাঁড়ালুম। আকাশ পরিষ্কার হয়েছে অনেকটা। চারিটি দেশ আমাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে চারিদিক থেকে, এবং তা'র প্রত্যেকটি দেশই আমার নিকটবর্তী। সামনে বিরাট তিব্বত,—এবং যে-প্রশস্ত

পথটি এই মালভূমির উপর থেকে চ'লে গিয়ে তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করছে, সেটি খুবই স্পষ্ট। আমার পিছনে নিজভূমি ভারতবর্ষ। আমার দক্ষিণে অর্থাৎ পূবদিকে বিশাল ভূটান, এবং পশ্চিমে নেপাল। এই মধ্যকেন্দ্রবিন্দুতে আমি দাঁড়িয়ে, যেটিকে আগে বলেছি গ্যাংটকের ছাদ। তিব্বত আর ভারত উভয়ের দূরত্ব এখান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল, এবং সেই ব্যবধান এখানে সুপ্রত্যক্ষ। দুই পাশে নেপাল আর ভূটান, সিকিমের অঙ্গে দুইদিক থেকেই সংলগ্ন। এখন বুঝতে পারি সিকিম একদা কেমন ক'রে তিব্বতের অঙ্গীভূত ছিল। সোজা উত্তরে দেখতে পাচ্ছি তুষার ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার সুদীর্ঘ অসম রেখা, তা'র কোলে কুম্ভকর্ণ পর্বতচূড়া। এরা সিকিমের সীমানার মধ্যে। যেমন গৌরীশৃঙ্গচূড়া নেপালের সীমারেখার মধ্যে। উত্তর পূব কোণে নাথুলা গিরিসঙ্কট এখান থেকে স্পষ্ট, কিন্তু তা'র গায়ে চুম্বি উপত্যকা এখান থেকে দৃশ্যমান নয়। এই পথটি অতি প্রাচীন, কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ বছর হোলো এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। আগে ছিল কালিম্পঙ-রেনক রোড দিয়ে জেলাপ সঙ্কট পেরিয়ে লাসা যাবার পথ, এখন এই পথ অতি সহজ এবং সুসাধ্য। কালিম্পঙ থেকে গ্যাংটক হয়ে নাথুলা। প্রতি বছর এই পথ দিয়ে তিব্বত থেকে আসে কমবেশী একলক্ষ মণ পশম, এবং তা'র পঁচাত্তর ভাগ অংশ কলকাতা থেকে সোজা চ'লে যায় আমেরিকায়। এই আমাদানি আর রপ্তানিতে কলকাতার বাঙালীর একমাত্র লাভ হোলো খানিকটা কুলিগিরি আর খানিকটা কেরানীগিরি। নাথুলা গিরিসঙ্কট পেরিয়ে প্রথম ভারতীয় বাণিজ্যঘাঁটি হোলো ইয়াটুং, এবং দ্বিতীয় ঘাঁটি গেয়ানৎসি। গত পঞ্চাশ বছর থেকে এই দুই অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যদল ছিল ভারতীয় স্বার্থের পাহারায়, এতকাল পরে গত এপ্রিল মাসে (১৯৫৪) চীনভারত সদ্ভাবচুক্তি অনুসারে পণ্ডিত নেহরু সেই সৈন্যদলকে সরিয়ে এনেছেন এবং ওই দুই অঞ্চলের উপর থেকে ভারতীয় অধিকারকে অপসারণ করেছেন।

সমগ্র উত্তরলোক তুষারাবৃত বিরাট দেওয়ালের মতো। এই দেওয়াল উত্তরের হিমঝটিকার থেকে রক্ষা ক'রে চলেছে বিশাল শ্যামল ভারতকে আবহমান কাল ধ'রে। অন্যদিকে অবরোধ ক'রে রয়েছে সমুদ্রোৎপন্ন মৌসুমী বাতাসের পথ। সুতরাং সুবৃহৎ উত্তুঙ্গ তিব্বতের শিখরদল না থাকলে ভারতবর্ষ হয়ে যেতো মরুভূমি, যেমন হয়েছে মধ্যে এশিয়া, যেমন হয়েছে ভারতের পশ্চিমের একটা অংশ। এখানে দাঁড়িয়ে দূরে দেখছি নাথুলা গিরিসঙ্কট পার হয়ে আসছে আর একটি প্রকাণ্ড ক্যারাভান্,—একটির পর একটি আসছে এগিয়ে এই গ্যাংটকের দিকে। ওরা পার হয়ে যাবে এই রাজপ্রাঙ্গণের পাশ

কাটিয়ে। ওরা সঙ্গে নিয়ে আসে তিব্বতী ঘোড়া আর অশ্বতর, আনে চমরী গাইয়ের দল, আনে নানাবিধ বিচিত্র বিপণিসম্ভার। আসছে ওরা ধীরে ধীরে তেমনি মৃদু মধুর ঘণ্টার আওয়াজ তুলে। প্রতি ঘোড়া এবং মিউলের পিঠে প্রায় দুই মণ কাঁচা পশমের বোঝা। তিব্বতের নানা অঞ্চল থেকে ওরা আসে, এবং তিনশো থেকে পাঁচশো মাইল অবধি পথ ওরা যাতায়াত করে দিনের পর দিন ধৈর্য ধ'রে। যাবার সময় নিয়ে যাবে হয়ত তুলো কাপড় ওষুধ চাউল মনোহারি চিনি বিস্কুট মেওয়া ফল তামাক,—ইত্যাদি বহু রকমের সামগ্রী।

উত্তরপূর্বে নাথুলার পথ কিন্তু সোজা উত্তরে কিছু পশ্চিম ঘেঁষে উৎরাই পথ গিয়েছে ডিকচু-র দিকে যেখানে তিস্তা ও ডিকচুর দুই ধারা মিলেছে। ডিকচু থেকে মানজেনের পথ খুব কষ্টকর নয়, সেই পথে তালুং নদীর দৃশ্য সুন্দর। মানজেন পেরিয়ে গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘার চেহারা অনেকটা বিস্তৃত এবং তা'র ধবলাধার বিশাল দেহ যে কোন পর্যটককে অভিভূত করে। চুংথাং হোলো মানজেন থেকে অনেকটা দূর। কেউ বলে চুংথাং, কেউ বা বলে সুনটাং। কিন্তু এখানে তিস্তা নদী দুই শাখায় দুদিক থেকে নেমে এসেছে। একটি শাখার নাম লাচেনচু, অন্যটি লাচুনচু! লাচেনচু এসেছে থাংগু জনপদের দিক থেকে, যেখান থেকে বহু চমরী গাইয়ের আমদানি হয়। সুনটাংয়ের নিকট তিস্তার যে সাঁকোটি পাওয়া যায়, সেইটিই বোধ হয় তিস্তার শেষ সাঁকো, তবে আমার সঠিক জানা নেই। বৃষ্টির কালে এইস্থলে তিস্তার ভয়ভীষণা মূর্তি দেখলে গা ছমছম করে। সুনটাংয়ের ডাকবাংলো থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার পারিপার্শ্বিক পর্বতমালার দৃশ্য অতি অপরূপ। গ্যাংটক ও টাংগুর মাঝখানে সুনটাং বা চুংথাং হোলো প্রায় আধাআধি পথ, অর্থাৎ ত্রিশ বত্রিশ মাইল। এর পর একদিকের পথ চ'লে গেছে লাচেনচুর ধার দিয়ে লাচেন পেরিয়ে টাংগুর দিকে,—কাঞ্চনঝাউ পর্বতচূড়ার ঠিক নীচে, এবং তা'র প্রায় দক্ষিণ পূর্বে হোলো কাঞ্চনজঙ্ঘা,—যার এপাশে আর ওপাশে নানা নদীর আর নির্ঝরিণী দুরন্ত স্রোতে মত্ত তুরঙ্গিনীর মতো ধাবিত হয়ে চলেছে। গ্রাম হিসাবে লাচেন এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। এটি যেমন চমরী গাইয়ের একটি কেন্দ্র, তেমনি আপেল ফলেরও একটি শ্রেষ্ঠ অঞ্চল! এখানকার আপেল গ্যাংটক হয়ে ভারতের দিকে যায়। বলা বাহুল্য পর্বতের বিরাট দেহগাত্রে রক্তিম আপেলের বন অতি মনোরম দৃশ্য। এখানকার উচ্চতা প্রায় ন' হাজার ফুটের কাছাকাছি এবং অধিবাসীরা প্রধানত সিকিমী ও তিব্বতীর সংমিশ্রণ। এখানে ছোট বড় কয়েকটি বৌদ্ধগুম্ফা, একটি ডাকবাংলা ও একটি ইউরোপীয় মিশনারিদের কেন্দ্র দেখতে পাওয়া যায়। লাচেন

গ্রাম থেকে চড়াই আরম্ভ হয়; লাচেন থেকে টাংগু অবধি প্রায় চার হাজার ফুট চড়াই। এ পথ অতি দুস্তর এবং অত্যন্ত ক্লান্তিকর। তবে সমস্ত ক্লান্তির উপরে বইতে থাকে কঠিন তুহিন উত্তরবায়ু, এবং এই বায়ুর তাড়নায় হাতে মুখে ঘা দেখা দেয়। এটা উত্তর সিকিমের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে এখানে কোনো নির্দিষ্ট সীমানারেখা নেই,—অবশ্য উভয় সীমানার মাঝখানে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে কাঞ্চনঝাউয়ের তুষারচূড়া। টাংগুর উপরকার ডাকবাংলো থেকে বিস্তীর্ণ বনময় পর্বতমালার বিচিত্র বর্ণাঢ্যতা দেখতে পাওয়া যায়। টাংগুর পরে এপাশে-ওপাশে বিশাল চম্বু ও গুর-ডাংমার পর্বতের চূড়া অনেকটা যেন আকাশকে অন্তরাল করে। চম্বুর নিকটবর্তী স্রোতস্বিনীর কাছে হিমালয় অভিযাত্রীদের জন্য একটি বাংলো দাঁড়িয়ে, এখানে তাদের আরামের সুবিধা আছে। কঠিন তুহিন ঠাণ্ডা এখানে পর্যটককে একেবারে নিষ্ক্রিয় জবুথবু ক'রে তোলে। ফুটন্ত জল ভিন্ন এখানে জল ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব।

টাংগু থেকে সোজা নদীপথ উত্তরে চ'লে গেছে গিয়াংগংয়ের দিকে এবং সেখান থেকে তিস্তার উত্তরশাখা লাচেনচু বেঁকেছে পূর্বে। গিয়াগং জনপদ যদিও জনহীন,—তা'র উচ্চতা পনেরো হাজারেরও বেশী। গিয়াগং থেকে গোর্দমা হ্রদ পৌছবার আগে পড়ে চোপোত্তরা। চোপোত্তরায় একরাত্রি অতি কষ্টে বাস করা চলে। গোর্দামা হ্রদের দৃশ্য চমৎকার,—পর্যটকরা বলেন। মানস সরোবরের দিকে যেমন কৈলাস ও গুরলা মান্ধাতার শিখরশ্রেণী, গোর্দামার আশেপাশেও তেমনি কাঞ্চনঝাউ এবং গুরডাংমার পর্বত। এখানকার নীল আকাশ এবং রৌদ্রালোকের স্বচ্ছতা সমতলবাসীগণের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। কারণ দুরন্তবায়ু অথবা ঝটিকার বেগে এখানে ধূলো ওড়ে না। পাথর এবং কাঁকরভরা এই পার্বত্যলোক, কিন্তু ধূলো নেই কোথাও। সুতরাং কাঞ্চনঝাউ এবং গুরডাংমার পর্বতের কোলে গোর্দামা সরোবরের তুহিন শীতল জলের উপরে সারাদিনমানব্যাপী স্বচ্ছ সূর্যালোক ও ঘননীল গগনের যে-শোভা নিত্য প্রতিবিম্বিত হয়,—তা'র নীলাভ-পীত রক্তিম-গৈরিক-হিরণ্য-হিরকাভার বর্ণবৈচিত্র্য মর্ত্যবাসীর সমস্ত চিন্তা ও কল্পনার অতীত। সেই মায়াচ্ছন্ন লোকে গিয়ে দাঁড়ালে পৃথিবীকে অবাস্তব মনে হয়।

সিকিম ও ভূটানের মাঝখানে নালিভূমির মধ্যে ঢুকে এসেছে তিব্বতের একটা সঙ্কীর্ণ অংশ। নাথুলা গিরিসঙ্কট পেরিয়ে চুম্বি উপত্যকায় এলে

বুঝতে পারা যায় এর দুই পাশে সিকিম আর ভূটান। চুম্বি হোলো তিব্বতের অন্তর্গত। এই চুম্বির পূর্বাঞ্চল দিয়ে গেছে আগেকার ক্যারাভান-পথ রেনক রোড—সোজা গেছে উত্তরে ফারিজং গেয়ানৎসি হয়ে পূর্বোত্তর পথ ধ'রে। কিন্তু এখন হয়েছে কিছু শর্ট-কাট্। কালিম্পং থেকে চুম্বি অপেক্ষা গ্যাংটক থেকে চুম্বির পথ কতকটা সহজ। সেজন্য জেলাপ গিরিপথ অপেক্ষা নাথুলা গিরিপথটিকে বেছে নিয়েছে কারবারি লোকেরা। এটা পঞ্চাশ বছর হোলো। লর্ড কার্জন যখন ভারতের বড়লাট, সেই সময় তিনি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ডকে সৈন্যদল সহ পাঠিয়েছিলেন তিব্বতে। নিষিদ্ধ তিব্বতভূমির অবরোধ ভেদ ক'রে স্যার ফ্রান্সিস তিব্বতের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের বোঝাপড়া করেছিলেন। মহাচীন তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রাষ্ট্র; তিব্বত তা'র অঙ্গীভূত হলেও প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল না। দলাই লামা ছিলেন তখন তিব্বতের প্রকৃত কর্ণধার। কিন্তু পরিশেষে তাঁকে তদানীন্তন ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট নতিস্বীকার করতে হয়েছিল। চীনের খাসদখল ছিল না তিব্বতে,—অর্থাৎ নামে মাত্র চীন ছিল জমিদার, সুজারেইনটি মানলেই চীন খুশী। এতকাল পরে আজ নতুন ব্যবস্থা যখন প্রবর্তিত হোলো, তখন সাম্প্রতিক চীন-ভারত চুক্তির মধ্যে সর্বপ্রধান কথাটাই সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হোলো। অর্থাৎ তিব্বত মানেই হোলো, "Tibet region of China."

সিকিমের রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণের উপর এসে দাঁড়ালে দুইদিকে যে বিশাল বিস্তৃত পার্বত্যলোক চোখে পড়ে, এর নাম দেওয়া হয়েছে শৃঙ্গলীলা পর্বতমালা। এই পর্বতমালা কাঞ্চনজঙ্ঘার ক্রোড়ভূমি পর্যন্ত চ'লে গেছে। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, উত্তর সিকিম ও দক্ষিণ সিকিমের মাঝখানে একটা সীমারেখা! উত্তর সিকিম অগম্যলোক, অনধ্যুষিত এবং অনেকটাই যেন অজ্ঞাত। বুঝতে পারা যায় প্রধানত তিস্তা নদী ও তা'র শাখাবিস্তার নিয়েই যেন উত্তর সিকিম ও তিব্বতকে ভাগ করা হয়েছিল। তা ছাড়া অন্য প্রাকৃতিক সীমাও রয়েছে। উত্তর সিকিমকে বেষ্টন করেছে বিরাট এক একটি পর্বতশৃঙ্গ,—যেমন কুম্ভকর্ণ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, জংশং, কাঞ্চনঝাউ, পাউহুন্‌রি ইত্যাদি। এই কাঞ্চনঝাউ এবং পাউহুন্‌রি পর্বতশ্রেণীর অঞ্চলে অঞ্চলে প্রবাহিত হয়ে গেছে তিস্তার একটি মূলধারা লাচেনচু নামে পূর্বদিকে। এখানকার নিসর্গশোভা পৃথিবীর যে কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যকেও হার মানায়। এই ভূভাগের উচ্চতা অনেক বেশী, এবং তিব্বতের সমতলীয়। এখান থেকে তিব্বত যাবার পথে আর বিশেষ চড়াই উৎরাই নেই—কেননা এর পরেই তিব্বতের বিস্তৃত, আদিঅন্তহীন এবং

প্রাণিশূন্য মালভূমি চোখে পড়ে। এর আগে কাঞ্চনঝাউ এবং গুরডাংমার পর্বতের কাছাকাছি গোর্দমা অর্থাৎ গুরুধাম হো হ্রদের কথা বলেছি; এর পরেই আসছি পাউহুন্‌রি পর্বতমালার ধারে ডঙ্কা উপত্যকায়। এই তুষারাস্তীর্ণ উপত্যকার প্রান্তে বহুবৈচিত্র্যময় চোলাম হো সরোবরটি সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কৈলাসের অন্তর্গত মানসসরোবর এবং গৌরীকুণ্ডের তুষার-কঠিন হ্রদগুলি কমবেশী পনেরো থেকে আঠারো হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত, কিন্তু চোলাম হো হ্রদটি আন্দাজ সতোরো হাজার ফুট উঁচুতে। ডঙ্কা উপত্যকায় দাঁড়ালে পৃথিবীকে পরম বিস্ময় ব'লে মনে হ'তে থাকে, এবং এই পর্বতবেষ্টিত উপত্যকা থেকে চোলাম হো হ্রদটির যে আশ্চর্য চিত্তবিমোহন দৃশ্য চোখে পড়ে তা'র সঙ্গে কাশ্মীরের শেষনাগ হ্রদটিরই কেবল তুলনা চলে। পাউহুন্‌রি এবং কাঞ্চনঝাউ পর্বতশ্রেণীর মাঝামাঝি এই চোলাম হো হ্রদ থেকেই তিস্তার আদি দুই ধারা—লাচেনচু ও লাচুনচু—প্রবাহিত হয়ে এসেছে। একটি গেছে উত্তর পশ্চিমে, অপরটি এসেছে দক্ষিণে। অবশেষে এই দুই প্রধান স্রোতস্বিনী দক্ষিণে স্থংতাংয়ের কাছে মিলিত হয়ে তিস্তা নাম নিয়েছে। এই তিস্তা অবশেষে পূর্ববঙ্গের গাইবান্ধার দক্ষিণে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

মোটামুটি তিস্তার এই হোলো আদি-অন্ত ইতিহাস। এক এক নদী নিয়ে হিমালয়ের এক একটি অংশ। সাংপো নিয়ে তিব্বত, ব্রহ্মপুত্র নিয়ে আসাম, বাগমতি নিয়ে নেপাল, শারদা-কালী-কোশী নিয়ে নৈনীতাল আর আলমোড়া, গঙ্গা নিয়ে গাড়োয়াল, বিপাশা নিয়ে হিমাচল প্রদেশ, শতদ্রু নিয়ে পূর্বপাঞ্জাব, চন্দ্রভাগা নিয়ে জম্মু, ঝিলম ও সিন্ধু নিয়ে কাশ্মীর। নদী গড়েছে হিমালয়ের প্রত্যেকটি অংশ। ঠিক এইভাবেই তিস্তা গড়ে তুলেছে সিকিম, এবং কালচিনি রায়ডাক গ'ড়ে তুলেছে ভূটানকে। সে কথা পরে বলবো।

রৌদ্র আজ বড় মধুর আর আরামদায়ক মনে হচ্ছে। আকাশ যেন উজ্জ্বল নীল, স্নিগ্ধ বাতাস তেমনি হু-হু ক'রে বইছে। সামনের ক্যারাভানের পথটা প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের পাশ কাটিয়ে কতকটা নীচের দিকে নেমে গিয়ে একসময়ে পূর্ব দিকে উঠেছে। পথের শেষপ্রান্তে নাথুলা গিরিসঙ্কটের প্রথম বাঁক এখান থেকে ঠাহর করলে দেখা যায়। মেঘে ঢাকা পড়ছে মাঝে মাঝে আবার পরিষ্কার হচ্ছে। সামনে তিব্বতের বিশাল তুষার প্রাচীর—পর্যটকের চিরকালের স্বপ্ন। ওটা অনেকটা নিষিদ্ধ অঞ্চল ব'লেই কৌতূহলকে আরো বাড়িয়েছে। স্বর্গত শরৎ দাস মহাশয় প্রায় আশী বছর আগে ঠিক কোন্ পথটি দিয়ে ছদ্মবেশে তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন আমার জানা নেই, তবে এই

পথটিই ছিল তাঁর পক্ষে সহজ। সেই বীর বাঙালী পর্যটককে গ্রেপ্তার করার জন্য লামা সমাজে বহু চেষ্টা চলেছিল, কিন্তু তিনি বার বার দুই বার ওই নিষিদ্ধ অঞ্চলে নিরাপদে পরিভ্রমণ ক'রে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে জানা যায়, তাকে স্থানীয় যারা সাহায্য ক'রেছিল তাদের ফাঁসী এবং কঠোর শাস্তি হয়।

সমগ্র গ্যাংটকের শিখরে এই মালভূমিটি মহারাজা ও রাজপুরুষগণের নিজস্ব। রাজার বর্তমান দেওয়ান এখন হলেন একজন ভারতীয়, এবং পলিটিক্যাল অফিসার—যিনি ভারত ও সিকিমের মধ্যে সর্বদা সংযোগ রক্ষা করেন, তিনিও ভারতীয়। মালভূমির দক্ষিণ অংশের সিভিল লাইনে তাঁদের বাংলো। স্বয়ং মহারাজার প্রাসাদটি এমন কিছু চাকচিক্যময় নয়, সাধারণ রুচি সম্পন্ন ভদ্র জমিদারের মতো। মহারাজা তাসি নামগেয়াল নিজে একজন অতি নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। এখানে এসে অত্যন্ত সাধারণ একজন লেপচার কাছে তার স্তবগান শুনেছি। রাজনীতিক অশান্তি সিকিমে খুবই কম।

আশেপাশে উদ্যান, তাও রাজকীয়। শত শত প্রকার অর্কিড এবং রডোডেনড্রন নিয়ে এক একটি উদ্যান পরিপূর্ণ। অত্যন্ত যত্ন এবং পরিপাটির সঙ্গে আশেপাশের পথগুলি সুসজ্জিত ক'রে রাখা হয়। সামনে একটি প্রশস্ত চারণ ক্ষেত্র, তারই মাঝখানে—ঠিক মনে পড়ছে না,—বোধ হয় পরলোকগত পঞ্চম ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের একটি প্রস্তরমূর্তি,—একটি আচ্ছাদনের মধ্যে সংরক্ষিত। এগুলো দেখবার যথেষ্ট কৌতূহল নেই ব'লেই বোধ হয় ভুলে গেছি, মূর্তিটি পঞ্চম জর্জ কিংবা মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছত্র মনে পড়ছে এই সূত্রে—

'এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল,
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
শূন্যপথে চাই,
আজ তা'র কোনো চিহ্ন নাই।

আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।

জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল।"

* * *

মহাকবির মৃত্যুর ছয় বছর আর ছয়দিন পরে এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য ও সার্থক হয়েছিল!

আগামী কাল ভারতীয় শিবরাত্রি, কিন্তু এখানে ভিন্ন নামে তা'র একটা উৎসবের আয়োজন চলছে,—বলা বাহুল্য নামটা তিব্বতীয়, এবং মনে রাখা সম্ভব নয়। শিবরাত্রি ব্রতের তাৎপর্য যাই হোক না কেন, সিকিমকে নিরাপদে রাখা দরকার! এই যে বিরাট হিমালয়, এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ, এর যে কোনো দিক থেকে ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানব দক্ষ রক্ষ ইত্যাদি যে কোনো সময়ে বৌদ্ধ সিকিমের পুণ্যভূমিকে আক্রমণ করতে পারে বৈকি। সুতরাং সমগ্র শিখরলোকের প্রাঙ্গণটির চতুর্দিকে তল্‌তা বাঁশ টাঙিয়ে শ্বেত পতাকা তোলা হয়েছে। এই পতাকা হোলো বৌদ্ধভাষ্য,—এর চতুঃসীমায় পিশাচেরা আসতে সাহস পাবে না! এই অদ্ভুত সংস্কারটি কেবল এখানে নয়, তিব্বত-প্রভাবিত প্রায় দেড় হাজার মাইল হিমালয়ের সীমানা অঞ্চলে এই প্রকার ভূত-প্রেতের আশঙ্কাটা প্রচলিত। বহু হিন্দুমন্দির এবং দেবালয় অবধি এর প্রভাব এড়াতে পারেনি। আদি অন্তকাল অবধি প্রায় সকল ধর্মতত্ত্বেই ওই একই কথা—অসুরকে দূরে রাখো, পাপের হাত থেকে আত্মরক্ষা করো! কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে পাপের সংজ্ঞা যে কত জটিল হয়েছে, পুণ্যের তথাকথিত নীতিবুদ্ধির কতটা অংশ হাস্যকর হয়ে উঠেছে, সে খবর আর যেখানেই প্রচারিত হোক না কেন, 'পৃথিবীর ছাদ' তিব্বতে এখনও পৌঁছয়নি। বুঝতে পারা যাচ্ছে একাদশ শতাব্দীর মঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধ সম্রাট কুবলাই খাঁ-র আমল থেকে তিব্বতের মনোভাব-আর পরিবর্তিত হয়নি। এতকাল পরে মহাচীন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তিব্বতের ওপর তা'র বিপ্লববাদ সঙ্গে নিয়ে। বায়ুশূন্য অঞ্চলে এবার বুঝি ঝড় উঠলো!

এই পতাকাশোভিত প্রাঙ্গণের একদিকে সরকারী লামাদের কয়েকটি ঘর এবং অন্যদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজগুম্ফা। এই রাজগুম্ফার অপর নাম হোলো দরবার গুম্ফা। সিকিমের মধ্যে এইটি সর্বশ্রেষ্ঠ। গাড়োয়ালীরা গুহাকে গুম্ফা বলে জানি। কিন্তু বৌদ্ধ গুম্ফার সঙ্গে বৌদ্ধমঠের সঠিক পার্থক্য আমার জানা নেই। দরবার গুম্ফার চেহারা দেখামাত্রই মনে সম্ভ্রম আসে। এর মূল হোলো মঙ্গোলীয় স্থাপত্যকলা, কিন্তু নানা দেশে এর প্রকার ভেদ। শ্যাম ইন্দোচীন মালয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ব্রহ্মদেশ,—এবং এদিকে সিকিম

ভূটান নেপাল, উত্তর কুমায়ুন, উত্তরপূর্ব পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর,—এই, স্থাপত্য-শিল্পের প্রভাব কেউ এড়াতে পারেনি। কাশ্মীরে একাধিক মসজিদ দেখেছি, যার গঠনশিল্পে মঙ্গোলীয় স্থাপত্যের প্রভাব অতি স্পষ্ট। গাড়োয়ালে যোশীমঠ উখীমঠ বদরিনাথ এবং আরো অনেক অঞ্চলে এই স্থাপত্যের প্রভাব অপরিসীম কিন্তু আমার পক্ষে এ আলোচনা সম্ভব নয়।

দরবার গুম্ফার গঠনেও সেই চতুষ্কোণাকার স্থাপত্য। সমস্তটায় বিস্ময়কর অলঙ্করণ, কারুশিল্পের নিখুঁৎ নিদর্শন। নানা মূর্তির মধ্যে সেই ড্রেগনিয়ান্ সঙ্কেত, সেই একটি অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি—যার ব্যাখ্যাটা দুঃসাধ্য। হাসিগুলি পৈশাচিক, ভঙ্গির মধ্যে যেন রণং দেহি। সমস্তটা মিলে প্রধানত কাঠ, পাথর আর রঙের কাজ! মরুভূমির বর্ণ হোলো হরিদ্রাভ, হিমালয়ের বর্ণ শ্বেত। উভয় অঞ্চলেই বর্ণবৈচিত্রের দারিদ্র্যহেতু এত রং নিয়ে মাতামাতি। রাজপুতনার মরুবাসীরা যেমন রংয়ের ভক্ত, তিব্বতীরাও ঠিক তেমনি। যেমন পোশাক পরিচ্ছদে তেমনি ওই রাজগুম্ফার সর্বাঙ্গে—যেন রামধনুর সাতটি রংয়ের বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে। চোখ বুলিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, এটা ভারতও নয়, সিকিমও নয়,—এ হোলো এক টুক্‌রো তিব্বত। এখানে ওখানে সর্বত্র লামা,—সেই পোশাক, সেই টুপি, সেই মন্ত্র, সেই মালা। সামনে তিব্বতী মঠ, রাজা স্বয়ং তিব্বতী। রাজগুরু স্বয়ং তিব্বত-আগত। সমস্তের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একমাত্র আমিই কেবল ভারতের চেতনাটুকু নিয়ে ধুকধুক করছি।

শিবরাত্রির আয়োজন বুঝতে পারা যায়। নীচের থেকে শুনে এসেছি কাল এখানে উৎসব। কিন্তু গুম্ফার ভিতরে প্রবেশ করতে আমার সাহস হচ্ছে না। ভাষা বুঝিনে শুধু নয়, কোনো রীতি জানিনে। প্রবেশ-পদ্ধতিটা কেমন! আমার এই অল্-ইণ্ডিয়া পরিচ্ছদ চল্‌বে কি? কোনো ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নেই ত? বাইরের লোকের অধিকার কতটুকু? কে জানে, হয়ত সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে ঢুকতে হয়, কিংবা এক-পায়ে, কিংবা নিজের হাতে নিজের কান ধ'রে! সমস্তটাই ত' আনুষ্ঠানিক! মুস্কিল এই, ওরা হিন্দি বোঝে না, আমি তিব্বতী বুঝিনে! নীচের থেকে আসবার আগে সেই তিব্বতী দম্পতির খোঁজ পাইনি,—বধূটি জানে ভাঙা ভাঙা হিন্দি। স্বামিটি থাকলেও সাহায্য পাওয়া যেতো। ওদের ধর্মানুষ্ঠানিক বিশ্বাস কতখানি স্পর্শকাতর, এই ভেবেই আমাব মনে অস্বস্তি ছিল।

প্রবল বর্ষণ ও দুর্যোগের পর মধুর রোদ পেয়েছিলুম, সুতরাং অনেকটা সময় নিয়ে হাত পা গরম ক'রে নিলুম। সে যাই হোক, এবার এক এক পা

এগিয়ে বারান্দার উপরে ওঠার আগে পায়ের জুতো খুলে প্রস্তুত হলুম। একটি লোক একান্তে ব'সে ঝিমুচ্ছে। আমার দিকে একবার তাকালো। বোঝা গেল, নিষেধ নেই। সেই সাহসে মূল দরজাটার কাছে গিয়ে পর্দা সরালুম। কিন্তু ভিতরের দিকে একবার তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলুম না। সমস্ত ব্যাপারটাই কিছু একটা পূজার আয়োজন সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন একটা অবাস্তব অনৈসর্গিক পরীরাজ্যের আভাস পলকের মধ্যে দৃষ্টিকে সম্মোহিত করলো যে, আমি দাঁড়াবো অথবা ফিরে যাবো বুঝতে পারলুম না।

একজন প্রবীণ লামা—ঠিক অপ্রসন্ন নয়, ঠিক স্বাগত সঙ্কেতও নয়,—আমার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে আহ্বান জানালো। ব্যস, ওই পর্যন্তই, আবার সে ঢুলছে! আমি অতি সন্তর্পণে ভিতরে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাথরের উপর পালিশ করা মেঝে অত্যন্ত ঠাণ্ডা। ভিতরে অতি মিষ্ট মৃদু ধূপপাত্রের গন্ধ। প্রত্যেক দেওয়ালে বিচিত্র বিস্তৃত ছবি আঁকা। সুরাসুরের ছবি,—বিভীষিকা এবং বিক্রম পাশাপাশি। দেবতা ও দানব। বিভিন্ন প্রকার ড্রেগন্। ঠিক সামনের দেওয়ালের নীচে তিনটি দেবতার বিশাল মূর্তি। সে-মূর্তি কাঠের, কি পাথরের, কি মাটির—এ আমি বুঝতে পারিনি। পরে জেনেছিলুম একটির নাম বাহাগুরু, একটি লছমন, ও একটির নাম 'মানে'। কিন্তু চারিদিকে রংয়ের ছড়াছড়ি। লাল, নীল, সবুজ, হল্‌দে, বেগুনি, কালো,—রংয়ের প্লাবন বইছে সমগ্র গুম্ফার কক্ষে। আলো এসে পড়েছে বাইরের থেকে, ভিতরটা যেন ঝলমল করছে। মেঝের উপরে মোটা রঙীণ লোমের আস্তরণ। তারই উপর বসেছে কয়েকজন লামা। তা'রা চোখ বুজে নিদ্রালু অবস্থায় অবিশ্রান্ত দুর্বোধ্য ভাষায় মন্ত্র পড়ছে। তারা ঢুলছে, কি ঘুমোচ্ছে বোঝা কঠিন। ছেদ নেই, বিরাম নেই, কেবল মন্ত্র উচ্চারণ করছে। কেমন ক'রে মানুষের এত মুখস্থ থাকে বুঝতে পারিনে। এমন অতি মানবিক স্মরণশক্তি এরা পায় কোত্থেকে?

ঢুল্‌ছে ঢুল্‌ছে,—এবার বোধ হয় ট'লে পড়বে। প্রদীপের শিখা স্তিমিত হয়ে এলে যেমন শল্‌তে উসকিয়ে দেয়, তেমনি এক এক সময়ে এরা অর্ধমুদিত চক্ষে নূতন উৎসাহে মন্ত্রটার সূত্র ধ'রে নিচ্ছে। আবার ঢুলছে, এবার বুঝি নাক ডেকেই ওঠে! সমস্ত মেঝের উপর সারবন্দী পেতেছে কাঠি আর সুতো দিয়ে এক একটি বকের মতো খেল্‌না,—সুতোয় টান দিলে শত শত কাঠির খেল্‌না যেন ন'ড়ে ওঠে। ওর রহস্য বুঝিনে। কিন্তু কোনো শিশু যদি আমার সঙ্গে থাকৃতো, সে বায়না ধরতো ওই খেল্‌নাগুলি হাত বাড়িয়ে ধরার

জন্য,—কারণ ঘরের মেঝের অধিকাংশই সেই সারবন্দী খেলনাগুলির কৌতুকে ভরা। আমার বিশ্বাস, অবাক বিস্ময়ে ছোট ছেলেমেয়েরা এইগুলির দিকে তাকিয়ে আনন্দ পেতো।

মেঝের উপরে সুদীর্ঘ ঈষৎ বাঁকা তামা নির্মিত চারিটি শিঙ্গা ও প্রকাণ্ড এক ভেরী দেখতে পাচ্ছিলুম। বহুক্ষণ মন্ত্রোচ্চারণের পর দুজন অল্প বয়স্ক লামা দুটো শিঙ্গা তুলে নিয়ে মুখের উপর লাগিয়ে ফুৎকার দিল, এবং তৃতীয়-জন বাজাতে লাগলো ভেরী। শিঙ্গা দুটি কমপক্ষে ছয় হাত লম্বা। সেই দুটি শিঙ্গায় যখন ওরা ফুৎকার দিল, তখনই বুঝতে পারা গেল,—কী অখণ্ড অনাহত নিস্তব্ধতার মধ্যে সমগ্র সিকিম এতক্ষণ যোগতন্দ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। শুধু গুম্ফা এবং ওই রাজপ্রাঙ্গণ নয়,—সিকিমের সমগ্র শৃঙ্গলীলা পর্বতমালা যেন দূরদূরান্তর অবধি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। আকাশ শিউরে উঠলো, এবং বায়ুস্তরের ভিতর দিয়ে সেই শিঙ্গার ফুৎকার তরঙ্গায়িত হয়ে চললো তিব্বত থেকে বিশাল ভারতের দিকে। শিঙ্গারবের সেই দিগন্তবিস্তৃত ঝঙ্কনা পলকের মধ্যে সীমা ও অসীমের যোগসূত্র রচনা ক'রে দেয়। ওই শিঙ্গার সঙ্গেও আবার বেজে ওঠে অষ্টধাতু নির্মিত করতাল, তা'র আওয়াজও এই অনন্ত নৈঃশব্দের মধ্যে গুরুগম্ভীর মনে হয়, কেমন যেন গা ছমছমিয়ে ওঠে।

কক্ষের মধ্যে আরেকটি বস্তু দেখে অত্যন্ত আকৃষ্ট হতে হয়, সেটি হোলো অসংখ্য কাচবসানো আলমারী এবং প্রত্যেকটিই অগণিত পুঁথিতে পরিপূর্ণ। লামারা নাকি জগৎ গুরু, এবং তা'রা নাকি ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আধার। এ জগতের কোনো সংবাদ তা'রা রাখে না অথবা রাখার প্রয়োজন আছে মনে করে না। এর কারণ আর কিছু নয়, জগৎ ব্যাপারের প্রারম্ভ ও পরিণতি সমস্তই তাদের নখদর্পণে। তা'রা ওই পুঁথির সাহায্যে বলতে পারে, এ জগতের গতি ও তত্ত্ব কি প্রকার, পরবর্তী ইতিহাস কিরূপ, সভ্যতা ও ধর্মবুদ্ধি চলেছে কোন্ দিকে, পৃথিবীর পরিণাম কি, মানব জাতির ভাগ্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কত হাজার বছর পরে কোন্ অবতার এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে, —এবং কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করলে কোন্ পথে এ জগৎ নিয়ন্ত্রিত হবে! সুতরাং পুঁথি ছাড়া কিছু নেই। সমগ্র হিমালয়ে ও তিব্বতে শত শত গুম্ফার মধ্যে এইরূপ শতশত লক্ষ লক্ষ পুঁথি সুরক্ষিত আছে। লাসার নিকটবর্তী জোখাং মঠ ও গুম্ফা এই পুঁথির জন্য প্রসিদ্ধ। পশ্চিম তিব্বতে হেমিস গুম্ফায় এই প্রকার গণনাতীত পুঁথি বর্তমান। এখানে এই দরবার গুম্ফায় এক নজরে দেখে মনে হোলো, অন্তত পাঁচ হাজার পুঁথি ত' বটেই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এই দরবার গুম্ফায় এসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল প্রকাশ

করেছিলেন। আরো অসংখ্য দ্রষ্টব্য বস্তু রয়েছে এই গুম্ফার অভ্যন্তরে, কিন্তু সেগুলির বর্ণনা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।

আমার ধারণা ঘণ্টা দুই ছিলুম ওই গুম্ফার মধ্যে। রংয়ের বন্যায় চোখ যেন আমার ধাঁধিয়ে গেছে। কিন্তু এই দু'ঘণ্টার মধ্যে আট দশবার ওই শিঙ্গা ভেরী এবং করতাল বাজলো, এবং ভেরীর সেই গুরু-গুরু ধ্বনি কাঁপিয়ে তুললো পর্বতের শিখর। তারপর এক সময় বাইরে এসে দাঁড়ালুম রৌদ্রে।

সমস্তটা বিস্ময় লাগছিল। পাহাড়ের চূড়াগুলির কোলে মেঘেরা বিশ্রাম নিচ্ছে। একটি পাখির ডাক নেই, একটি সরীসৃপের আওয়াজ নেই। পার্বত্য নীরবতার পরিমাপ করা কঠিন। কোথাও কোনো ফুলফোটার আওয়াজ দিলে তখন শুনতে পেতুম। একটি পতঙ্গের পাখার গুঞ্জন কোথা থেকে কোথায় মিলিয়ে গেল,—সমস্ত মন জুড়ে রেখে গেল তা'র সঙ্গীতের রেশ। ওই নিস্তব্ধতাকে মাঝে মাঝে বিদীর্ণ করছে শিঙ্গার সুদীর্ঘ তীব্র কর্কশ ধ্বনি। পৃথিবীকে থেকে থেকে ডাক দিচ্ছে দেবাদিদেবের প্রবল প্রচণ্ড ঘোষণায়,— শৃঙ্গলীলা থেকে মহাকবরু, সেখান থেকে চমলহরি আর সিনিয়লচু, তারপর পাউহুনরি, কুম্ভকর্ণ আর কাঞ্চনঝাউ, তারপর সেই ঘোষণা চ'লে গেল কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার-শৃঙ্গলোক পার হয়ে আরো উত্তরে। ডাক দিল সে ভারতকে, ভারতের পথ দিয়ে পৃথিবীকে।

নেমে আসবার সময় দেখি জনৈক তিব্বতী একটি চমরী সঙ্গে নিয়ে আসছে! ইংরেজিতে এই জন্তুকে বলে, ইয়ক্! ঘন কালো রং, সর্বাঙ্গে বড় বড় লোম, ঘাড়ে গর্দানে প্রায় এক, ছোট ছোট শিং। কিন্তু চোখ দুটো দেখলে দুর্ভাবনা আসে। বন্য মহিষের সগোত্রীয় সন্দেহ নেই। করাল দুই চক্ষে যদি হিংসার রক্তিম অগ্নিআভা মেশানো যায়, তবেই এর চোখের সঙ্গে তুলনা চলে। অথচ, আশ্চর্য, সবাই জানে—এর চেয়ে নিরীহ জীব আর হয় না। থাকে পাহাড়ে এবং দুর্গম তুষারলোকে,—তাই গরমে এলে এ জন্তু মারা পড়ে। অনেককে দেখেছি, এই জন্তুটিকে কাছাকাছি আসতে দেখে বিশ হাত দূরে পালাচ্ছে। আমিও দাঁড়ালুম পথের মাঝখানে। তিব্বতী লোকটি হাসলো। আমি যে ভয় পাইনি তার কারণ এই জন্তুটির প্রকৃতি আমার জানা ছিল। তিব্বতী লোকটি বোধ হয় মনে করলো, আমি চমরীটিকে কিনতে চাই। তাই সে ভাঙা হিন্দিতে বললে, দেড়শো রুপিয়া! কিন্তু আমি ক্রেতা নই,— আমি কেবল চমরীটির পিঠে কতক্ষণ হাত বুলিয়ে দিলুম। পরে নীচে গিয়ে জেনেছিলুম, ত্রিশ চল্লিশ টাকার মধ্যেই পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চমরীর চোখ দুটোই যেন মনটাকে পেয়ে বসে। বড় বড় গোল-গোল কালো চোখ!

নীচে এসে যখন বাজারের পথে পৌঁছলুম তখনও সন্ধ্যা হয়নি। ওই শিঙা আর ভেরী আর করতালের শব্দ প্রবলভাবে এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। রাজপ্রাঙ্গণে তখন আলোকসজ্জা পাহাড়ের চূড়াকে আলোকিত করেছে। গত-কালকার সেই তিনটি বাঙালী ভদ্রলোককে দেখে আমি অগ্রসর হয়ে গিয়ে একটি পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালুম। আকাশে আবার মেঘ করছিল। হাওয়া বইছে জোরে।

আশ্চর্য, পানের দোকানটি বাঙালীর। একটা নতুন আবিষ্কার বটে। লোকটির বাড়ি নোয়াখালি, নাম প্রভাত দে। দ্বিতীয় আরেকটি বাঙালীর পানের দোকান আছে বাজার পেরিয়ে বস্তির পথে। তারও বাড়ি বরিশালের বানরিপাড়ায়। নাম অমূল্য দাস। এঁদের দোকান চলছে গত পনেরো বছর থেকে। পানের দোকানে লাভ বেশী। এক আনায় একটি। বাঙলা থেকেই পান আসে। লেপচা তিব্বতী এবং নেপালীরা পান পেয়ে খুব খুশী! দোকানের বেঞ্চিতেই ছোট্ট বাঙালী সমাজ গ'ড়ে ওঠে বিকালের দিকে। বৃষ্টি এলে ওরই মধ্যে ভিতরে একটু আশ্রয় জোটে। প্রভাত দে এখানে থাকেন সস্ত্রীক পাশের ওই ছোট্ট কাঠের ঘরটির সঙ্গে আঙোনটুকু নিয়ে। সামান্য জীবনযাত্রা, ছোট্ট ঘরকন্না। ওরই মধ্যে আশা আর আশ্বাস, ওরই মধ্যে আগামী ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বপ্রকার উচ্চাভিলাষ। দুস্তর পাহাড়পর্বত পেরিয়ে দুটি বাঙালী এই গ্যাংটকে এসে দুটি পানের দোকান দিয়েছে, এর মধ্যে সমস্ত জাতির শিক্ষা নিহিত রয়েছে একথা ভুলিনি।

সন্ধ্যার পরে এলো প্রবল বায়ুবেগের সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি, এবং গতরাত্রি অপেক্ষা অনেক বেশী তুহিন ঠাণ্ডা দেখতে দেখতে এই ক্ষুদ্র পার্বত্য শহরটিকে আচ্ছন্ন করলো। পাহাড়ের সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয় না থাকলে এই ঠাণ্ডার কাঠিন্য বুঝতে পারা যায় না। ঘরের মধ্যে চারিদিক বন্ধ ক'রে সেই রাশীকৃত লোম এবং দুখানা লেপের মধ্যে ঢুকেও উত্তাপ খুঁজে পাওয়া গেল না।

নৈশভোজনের সেই বিপুল আয়োজন। জেঠমল ভোজরাজের সেই অকৃপণ আতিথেয়তা আজও সুপ্রকট! কিন্তু লেপের ভিতর থেকে হাত পা বা'র ক'রে ভোজন সমাপন করার মধ্যে যে-শাস্তি ছিল, সে কেবল ভুক্তভোগীই জানে। কিন্তু আজ আমি বিস্মিত হলুম। সমস্ত রাত্রির মধ্যেও সেই একরাশি নরম তুলা ও লোমের বিছানার মধ্যে থেকেও ঠাণ্ডার প্রাবল্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রা এলো না।

কারণটা জানা গেল পরদিন সকালে। বোধকরি অমাবস্যার যোগেই দুর্যোগটা দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি তখনও অবিরাম পড়ছে। বাইরে এসে দেখি,

—যার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না,—সমস্ত গ্যাংটকের চারিদিকের পাহাড়ে প্রবল তুষারপাত ঘটেছে। গতকাল মধ্যাহ্নে যে সব পাহাড়কে চিনে রেখেছিলুম, আজ তাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ বরফে ভ'রে গেছে, খবর পাওয়া গেল। একজন ভৃত্য এসে জানালো, এ বছরে এই প্রথম তুষার পাত। গত পৌষ এবং মাঘ মাসেও এপ্রকার ঠাণ্ডা নাকি পড়েনি।

বৃষ্টির বেগ কখনও প্রবল, কখনও স্তিমিত। ওরই মধ্যে এক সময় যখন কিছু স্বচ্ছতা দেখা দিল তখন জানলুম, একটু পরেই ডাকগাড়ি ছাড়বে,—যাবে কালিম্পং। আমার সময় ছিল কম। যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। মনে ভয় ছিল, ভোজরাজ বুঝি বিল্ পাঠায়! কিন্তু তাদের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। আবার কবে এসে তাঁদের আতিথ্য নেবো তাই তাঁরা জানতে চাইলেন।

বেলা প্রায় আটটা। তুহিন ঝাপটা বইছে দুরন্ত বেগে, তা'র সঙ্গে টিপি-টিপি বৃষ্টি। ঠাণ্ডায় হাত পা জ'মে যাচ্ছিল। আঙুলগুলি কথা শুনতে চাইছে না। ওরই মধ্যে প্রাতরাশ সেরে সেই ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির ভিতর দিয়ে মোটরে এসে উঠলুম। মাথায় ব্যালাক্লাভা, গায়ে সেই মস্ত ওভারকোট—এ দুটি বস্তুর জন্য শুক্না জঙ্গলের ভূপেন বক্সীর কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানালুম মনে মনে। এবার আমাদের ডাকমোটর যাবে নীচের দিকে—তিস্তা নদীর ধারে। ড্রাইভারের পাশে উঠে কোলের উপরে কম্বলখানা চাপিয়ে গুছিয়ে বসলুম। গাড়ি ছাড়লো।—

॥ ১২ ॥

মোটর বাস নেমে যাচ্ছে রংপোর দিকে, রংগীত নদীর তটে। সিকিম থেকে ফিরছিলুম। পথ উৎরাই, এঁকেবেঁকে গাড়ি কেবল নেমেই চলেছে। মাঝে মাঝে থামছে এক একটি ডাকঘরের সামনে। মেইল-ব্যাগ নামাচ্ছে, আবার নতুন নতুন তুলেও নিচ্ছে। রাস্তা খারাপ, পাহাড়ের ভাঙনগুলি সন্তর্পণে পেরিয়ে চলেছে। বরফ পড়েছে গ্যাংটকে, কিন্তু নীচের দিকে শিংতামের হাটতলা পেরিয়ে এসে দেখছি, গায়ের গরম কোটটা খুলে ফেলা যায়। রৌদ্র দেখা দিয়েছে, মধুর উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে।

শিংতামের হাটতলায় দেখে এসেছি মাড়োয়ারী মেয়ে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি,—বর-কনে উঠেছে আমাদেরই গাড়িতে। আর তাদের বিদায়কালে গান ধরেছিল

সদলবলে মাড়োয়ারী মেয়েরা। সেই গানের সুরে ছিল বিচ্ছেদের বেদনা,—শিংতামের হাটতলা পেরিয়ে সেই বেদনা ছায়াচ্ছন্ন করেছিল আশেপাশের পার্বত্যবনভূমি। দেবী পার্বতীকে বিদায় দিয়ে দক্ষপ্রজাপতির চোখে যেমন অশ্রু নেমেছিল। নীল আকাশে যেন 'শরৎকালের' ব্যাকুলতা দেখতে পাচ্ছিলুম।

রংপোর পুল পেরিয়ে আবার প্রবেশ করলুম বাঙলায় তথা ভারতবর্ষে। উপরে কালিম্পঙ, নীচের দিকে আমাদের পথ। তিস্তা এবার চললো আমাদের পাশে পাশে। রংপো থেকে তিস্তাবাজার পনেরো ষোল মাইল পথ। আমাদের আগেকার সেই পরিচিত পথ ধ'রে যখন তিস্তাবাজারে এসে পৌঁছলুম বেলা তখন বারোটা। মোট চল্লিশ মাইল পথের ভাড়া নিল সাত টাকা। একটু বেশী বৈকি।

জেঠমল ভোজরাজের মহাজনী গদিতে এসে উঠলুম। রৌদ্র প্রখর লাগছে। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। গতরাত্রির তুষারপাত ও তুহিন ঝটিকা এখন এখানে দাঁড়িয়ে স্বপ্নবৎ মনে হচ্ছে। ঋতুর সঙ্গে বদলেছে মন এবং দৃষ্টিকোণ। যে-অসহ্য হাওয়ার ভিতর দিয়ে কিছুকাল অতিক্রম ক'রে এলুম,—এখানে ঠাণ্ডাজলের গ্লাস হাতে নিয়ে সেটাকে অবাস্তব মনে হচ্ছিল। ধূ-ধূ করছে রোদ।

এখানে সেই একই আবহমান কালের ছবি,—হরিদ্বার ছাড়িয়ে হৃষিকেশ পেরিয়ে লছমনঝুলার পুলের ওপর দাঁড়ালে যে-ছবি দুই চোখ ভ'রে দেখে নেওয়া যায়। এখান থেকে ফিরবার পথে একটু ঘুরে গেলেই মংপু, - যেখানে মৈত্রেয়ী দেবীর আনন্দের ঘর, এবং যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধিকবার।

মোটর বাস আমাকে নামিয়ে কালিম্পঙের দিকে উঠে গেল। এখান থেকে আমার শিলিগুড়ি ফিরবার কথা। কিন্তু ইশারায় ডাকলো সামনের ওই পথ। যে-পথটি একটু উত্তর পশ্চিম ঘেঁষে উঠে গেছে দার্জিলিংয়ের দিকে। নাম পেশক রোড। বাজারের ভিতর দিয়ে সরকারী বাংলা ছাড়িয়ে সরু আঁকাবাঁকা পথ। মাত্র বাইশ মাইল, কিন্তু দুঃসাধ্য চড়াই। তা ছাড়া এমনই সঙ্কীর্ণ যে, বেবি অষ্টিন্ ছাড়া চলে না। সমগ্র দক্ষিণ দার্জিলিং জেলা এবং সিকিমের মধ্যে এই পথটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও দুস্তর,—যাঁরা অতিক্রম করেছেন তাঁরাই জানেন। কিন্তু দার্জিলিং দেখিনি অনেকদিন! এই পথেরই ধার দিয়ে যাবো, অথচ পুরনো বন্ধুর খোঁজ নিয়ে যাবো না, এ কেমন ক'রে হয়? ইতিহাসের অনেক ছেঁড়া পাতা ওখানে যে আজও ওড়ে উত্তরের হাওয়ায়-হাওয়ায়? পুরনো বন্ধু ডাক দিচ্ছে পাহাড়ে-পাহাড়ে।

চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, সুউচ্চ দেওয়ালের সারি, আর মাঝখানে এই তিস্তা। বাতাস রুদ্ধ, তা'র ওপর রৌদ্র,—ফলে গরম বেড়ে গেল অনেক। ধু-ধু করছে রোদ, বাইরে দাঁড়ানো যায় না। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ওই ভাবে কাটাবার পর কালিম্পঙের দিক থেকে নেমে এলো একখানা বেঙপাতা জীপ গাড়ি,—যাবে দার্জিলিং। ভোজরাজের গদি থেকে আমাকে বলা হোলো, দার্জিলিং পৌঁছে আপনি ছ'টাকা ভাড়া দেবেন। এদিকের ভাড়া বরাবরই বেশী।

প্রায় চারটে বাজলো জীপ ছাড়তে। মোটামুটি ছয়জন একপ্রকার বসা যায় ভিতরে। কিন্তু ড্রাইভারকে নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়ালো দশজন। জন-চারেক স্ত্রীলোক, একজন পুলিশ অফিসার, জনদুই মাড়োয়ারী এবং বাকি স্থানীয় লোক। মেয়েরা সবাই ভুটিয়া। দশজন ছাড়া শিশু আছে দুটি, এবং মালপত্র সমেত গুটিদশেক বোঝা। পায়ের কাছে বসলো জনতিনেক। ওর মধ্যে স্থান সঙ্কুলান করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু দেড়ঘণ্টা দু'ঘণ্টার পথ ব'লে অতটা কেউ আর আপত্তি তোলে না।

বাজারের অঞ্চলটা পেরিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত যখন চড়াইপথ ধ'রে গাড়িটা উঠছে, তখন লক্ষ্য ক'রে দেখলুম—প্রায় সকলেই প্রচুর মদ্যপান করেছে। মেয়েপুরুষ সবাই আমরা বসেছি ঘন জটলা পাকিয়ে, এবং ওই পোঁটলা-পুঁটলী মোটঘাট এবং বাক্সবিছানার জটিল গণ্ডগোলের মধ্যে কা'রো পক্ষে গা বাঁচিয়ে ব্যবধান রেখে বসবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না। ফলে, সবাই মিলে একাকার। পুলিশ অফিসার হলেন একজন নেপালী ভুটিয়া ও গোর্খার মিশ্রণ। মঙ্গোলীয় চোপ এবং নাকের বাহার। কিন্তু মদ্যের প্রভাবে তাঁর গাম্ভীর্য হাল্কা হয়ে গেছে। গোর্খা সেপাই দেখে বরাবরই ভয় পেয়ে এসেছি, ওরা নির্দয় কর্তব্যবোধের প্রতীক্। কিন্তু এখানে তাঁর হাস্যের সঙ্গে লাস্য দেখে ভুটিয়া মেয়েরা গদগদে আনন্দে এমনভাবে অস্থির হাস্যে লুটোপুটি করতে লাগলো যে, তা'র ধাক্কা আমাকে ঘন-ঘন সইতে হচ্ছিল। আমার পক্ষে মুস্কিল ছিল এই যে, একমাত্র সুস্থ ব্যক্তি হলুম আমি! ওদের পক্ষে মুস্কিল হোলো এই, ওদের দলের বাইরে একমাত্র আমাকেই ওরা 'অসুস্থ' ব'লে ধরে নিল।

ভয় ছিল মনে। পথ উপরে উঠছে। গাড়ি চলছে অতি দ্রুত। স্বয়ং ড্রাইভার সুরাপ্রভাবিত। আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে চেয়ে আছি তা'র ষ্টিয়ারিং ধরার দিকে। সে পান চিবোচ্ছে, বাঁ হাতে সিগারেট। ভিতরের হুল্লোড়ের সঙ্গে সেও ষ্টিয়ারিং ধরা সত্ত্বেও মেতে উঠেছে। একটি মুহূর্তের অন্যমনস্কতার ফলে

একটি পলকের মধ্যে আমাদের পরিণাম কি দাঁড়াবে সেটা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি। কিন্তু উপায় নেই। এর আগে জীপ গাড়ির সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প শোনা ছিল। এ গাড়ি যেমনই দ্রুতগতি, তেমনিই কঠিন এর প্রাণ। এ নাকি অসাধ্য সাধন করে! এ গাড়ি যখন ওল্টায় তখন সবাই মরে, কিন্তু গাড়িটি নাকি বাঁচে। সবাইকে ডোবায়, কিন্তু নিজের গায়ে আঁচ লাগে না। এই গাড়ির সঙ্গে নাকি আমেরিকান্ প্রকৃতি জড়ানো।

ভূটিয়া মেয়ে বসেছে আমাকে ঠেসে। ইতিমধ্যে তা'র জলন্ত সিগারেটের ফিন্‌কি লেগেছে আমার মুখে বার দুই। কনুইয়ের গুঁতো খাচ্ছি মাঝে মাঝে। একখানা পা আমার ছেঁচে যাচ্ছে প্রায়ই তা'র পাহাড়ী জুতোর মাড়নে। মাঝে মাঝে তা'র ওড়নাখানা উড়ে আমার মুখখানা ঢেকে দিচ্ছিল। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তা'র এই প্রকার আঙ্গিক মাখামাখি হচ্ছে এত ঘন-ঘন,—কিন্তু তা'র কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাকে পুরুষ মনে করছে কিনা সন্দেহ; আমার অস্তিত্বকেই স্বীকার করছে কিনা আরো সন্দেহ। এক একবার ভাবছিলুম, সে কি আমার পকেটের মধ্যে হাত গলাতে চায়? কিন্তু না, আমার আন্দাজ সত্য নয়। ওপাশে চলেছে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে এক মাড়োয়ারীর লাস্য। ঘটকালীর আনন্দে পুলিশ অফিসার দিশাহারা। ষ্টিয়ারিং ধ'রে ড্রাইভারও আহ্লাদে আটখানা। কন্‌ডাকটার বোধ করি অতিশয় মদ্যপানের ফলে বাইরের দিকে মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছিল, তাকে টানছে একটি মাকড়িপরা ভূটিয়া বৌ আমারই বিছানার পুঁটলীর ওপর ব'সে। উভয়ের প্রলাপজড়িত কণ্ঠের মধুর মাদকতা দেখে পুলিশ অফিসার যেমন হেসে কুটো-কুটি, আমি ঠিক সেই পরিমাণ দুর্ভাবনায় কাঠ হয়ে রইলুম। ওর মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিল বয়সে কিছু প্রবীণা,—মুখে ওড়না চাপা দিয়ে হাসছিল এতক্ষণ,—কিছু ভব্য ওদের মধ্যে। সহসা আমার চোখ পড়লো, পুলিশ অফিসারের পায়ের ওপর নিজের পায়ের আঙ্গুল টিপে সেই প্রবীণা টেলিগ্রাফের মতো আলাপ করছে! তবে কি সমস্তটাই এক জোট? ভাবছিলুম মনে মনে। তবে কি সত্যিই 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'?

সঙ্কীর্ণ সঙ্কটাপন্ন চড়াই পথ। পথের দুধারে ঘন পাইনের ঝোপে বনময় অন্ধকার। বেলা ফুরিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে দুই পাশে গভীর খদ নেমে গিয়েছে দেওদার শ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে। তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাচ্ছি বৃহত্তর হিমালয়ের দূরদূরান্তরব্যাপী শোভা। বস্তুত, পূর্বভারতে আর কোনো অঞ্চল থেকে হিমালয়ের এত বড় বিস্তার সহসা চোখে পড়ে না। কালিম্পঙ, গ্যাংটক, দার্জিলিং ঘুম্, কার্সিয়ং,—কোনো শহর থেকে এমন

বিস্তার আগে দেখতে পাইনি। শত শত মাইল বিস্তীর্ণ তুষারচূড়ার শোভা কেবলমাত্র এই পেশক রোড পেরোবার কালেই চোখে পড়ে। সূর্যের আলোর সঙ্গে এই অবেলায় বায়ুস্তরে ও মেঘের ছায়া মিলে রশ্মিগুলি হয় তির্যক। সেই কারণে তুষারের ধবলতা বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। ফলে কোথাও গৈরিক, কোথাও সবুজ নীলাভ, কোথাও রক্তিম হরিদ্রাভ, কোথাও ঘন অংশুকের আভা আপন আপন ছায়া ফেলতে থাকে। একমাত্র এখান থেকেই দেখা যায়, দিগ্বলয়ের অর্ধাংশ জুড়ে সেই মহাহৈমবন্তের বিরাট স্বর্ণসিংহাসন পাতা। পাহাড়ের চূড়া মনে হচ্ছে না,—বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে এক একটি সোনার মন্দিরচূড়া! হয়ত অতদূর থেকে সায়াহ্নের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি আমাদের কানে আসছে না, এই যা।

ধাক্কা লাগলো আমার হাতের ওপর। দেখা যাচ্ছে ভূটিয়া তরুণী উল্লাসে উতরোল। প্রাণপ্রাচুর্যের ফলে ভব্যতার নীতিটা ওর মনে থাকছে না। ওর অপরাধ নেই, এইভাবেই ও চ'লে এসেছে। স্ত্রীলোকের লজ্জা-জড়তা স্ত্রীলোকের পক্ষেই এতকাল বাধা ছিল। এই সঙ্কোচ নিয়ে খেলা করেছে পুরুষ। মেয়েরা লজ্জার কথাটা লজ্জায় স্বীকার করে না ব'লেই পুরুষের অতি-আচার ছিল বেশী। মেয়ে তার ঘোমটায় নিজের মুখখানা ঢাকে, সেজন্য এতকাল পুরুষের আস্কারা ছিল। আজ কিন্তু মেয়ে ঘোমটা খুলছে ব'লেই পুরুষের ভয়, আর মেয়েমহলে স্বকীয়তার কলরব। মেয়েকে এখন আর হঠাৎ বিপদে ফেলে পালানো যায় না, কেননা পুরুষের পালাবার পথটা সে চিনে রাখে। ঘোমটা নেই ব'লেই চোখ খুলেছে।

বুঝতে পারা যাচ্ছে আমি এখানে না বসলে মেয়েটা খুশী হোতো। ছড়িয়ে বসতো সে, এবং ওই টুপিপরা ছোকরাকে সে গায়ে--গায়ে বসাতে পারতো। ছোকরাটা পুঁটলীর মতোই ব'সে আছে তা'র পায়ের নীচে। না, আমি দেখতে চাইনে,—কী যেন ঘটছে আমার পায়ের পাশে! ড্রাইভার আরো বেশী স্পীড্ দিল গাড়িতে! পারাবতের প্রচণ্ড গতির মতো জীপ ছুটলো ভীষণ বেগে। বেঁকছি, কাৎ হচ্ছি, হেলে পড়ছি,—ভিতরের জনতাটার মধ্যে একজনের সঙ্গে আরেকজনের মাথা ঠোকাঠুকি হচ্ছে। কিন্তু এক একটি বেণ্ড্ ঘোরার সময় ভিতর থেকে ছিট্‌কে বেরোচ্ছে উল্লোল অসংবৃত হাস্য-লহরী! আর ওদের মাঝখানে আড়ষ্ট উৎকণ্ঠিত হয়ে ব'সে আমি আহত প্রতিহত হচ্ছি। শুনেছি অতিশয় মদ্যপানের ফলে নাভিকেন্দ্রের অন্ত্রতন্ত্রে যে উদ্দাম তুফান ওঠে, তা'র জন্য লৌকিক ও ব্যবহারিক সঙ্কোচ ও আড়ষ্টতা সম্পূর্ণ ঘুচে যায় এবং একজন গম্ভীর, সংযত ও শান্তপ্রকৃতির লোক সহসা তা'র

জীবনের সম্ভব ও অসম্ভব সর্বপ্রকার সুনীতি-দুর্নীতি এবং দুঃশীলতার কাহিনী বলতে থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোক ? সে কি ভাবাবেগের পুতুল নয় ? তা'র চেহারা কি হয় এই প্রকার ? নারী কি হয় কামিনী ? দেবী দানবী ?

আবার লাগলো কনুইয়ের ধাক্কা। আমার হাতে সিগারেটের আগুন গেল ছিট্‌কে, কিন্তু আমার থুঁৎনিটা বেঁচে গেল ! সিগারেটের আগুনে পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড হয় বটে, কিন্তু জীপগাড়িতে কিছু হয় না ! মেয়েটার কোলের উপর পড়েছিল আগুনের ডেলাটা, সে সেটাকে তৎক্ষণাৎ তুলে নিয়ে দু'আঙ্গুলে টিপে নিভিয়ে দিল। ভুটিয়া মেয়ের আঙুল নশ্বর নয়, সুতরাং ছ্যাঁকাও লাগে না। দুঃখ জানাবার চেষ্টা করতে গেলুম, কিন্তু গ্রাহ্যও করলো না। আমি অবিশ্রান্ত লাঞ্ছিত হচ্ছি তা'র হাতে, অথচ সে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়, এ আশ্চর্য। একব্যক্তি বসেছে তা'র গায়েগায়ে কিন্তু পুঁটুলীর মতোই সে প্রাণহীন, —এটা সে বিশ্বাস ক'রে নিয়েছে। সমগ্র জীপগাড়ির মধ্যে সম্ভবত বৈধ-অবৈধ উভয় প্রকার প্রণয়কাণ্ড চলেছে, এবং আমি যে তা'র 'মূক ও বধির' দর্শক, এতে ওদের কিছুমাত্র যায় আসে না। এর মধ্যে কতটুকু কাব্য এবং কতটুকু হর্ষরোমাঞ্চ এ অনুভব করবার আগেই এমন ধাক্কা পড়ছে আমার উপর যে, ত্রাহি মধুসূদন। এখন আমাকে ছেড়ে দিলে আমি এই দার্জিলিংয়ের পথে-পথে কেঁদে বাঁচি।

ঘুম-এ এসে নামলো কয়েকজন। মেয়েটা নেমে গেল তা'র যৌবনসম্ভার নিয়ে ছোকরাটাকে ছেড়ে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। আশ্চর্য, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ! কিন্তু ভিতরে যারা রইলো তারাও টলটলে। তবে এবার অবশ্য ভিতরে একটু জায়গা হোলো। এতক্ষণে প্রবল শীত ধরেছে। ঘুম থেকে একটি পথ উঠে গেছে টাইগার হিল্-এর দিকে, অন্যটি গেছে সন্দকপু। আশেপাশে অনুস্বার-অক্ষর-প্রধান দেহাত কয়েকটি পার হয়ে এসেছি, তাদের নাম কোনোকালেই আমার মনে থাকে না। কিন্তু গাড়ি একটু এগোতেই দেখি, অবাক কাণ্ড, চারিদিকে বরফ পড়েছে। ফাল্গুনের প্রথম দিকে বরফ, এ আশ্চর্য। সন্ধ্যা তখনও হয়নি, কিন্তু ঘুম-এর বাজার এর মধ্যেই প্রায় জনশূন্য। ছোট রেলপথটি শহরের উপর দিয়ে চ'লে এসেছে দার্জিলিংয়ের দিকে। শীতের হাওয়ায় আমি ঠকঠক করছিলুম। পাহাড়ে পাহাড়ে পথের আশেপাশে দোকান-বাজারের ধারেধারে মোটাদানাযুক্ত বরফের স্তূপ জমে রয়েছে। আরো মাইল পাঁচেক পথ এগিয়ে যখন দার্জিলিংয়ের একটি হোটেলের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো তখন জানলুম, উত্তাপের মাত্রা ৩১ ডিগ্রিতে নেমে এসেছে। পথ জনহীন। হাত পা আমার জ'মে যাচ্ছিল।

তিন ঘণ্টা আগে তিস্তাবাজারের প্রখর রৌদ্রের কথাটা এখানে প্রায় স্বপ্নবৎ মনে হোলো। পাহাড়-পর্বত তুষারপাতে শাদা হয়ে উঠেছে। এ বছরে এই নাকি প্রথম তুষারপাত।

মালপত্র নিয়ে নামলুম। পথের এপারে হোটেল, ওপারে ধর্মশালা। ধর্মশালা মন্দ কি? এমন সময় কন্‌ডাক্‌টর ভাড়া চাইলো, এবং আমি ছ'টাকা বা'র ক'রে দিলুম।

ছ'টাকা? মদমত্ত লোকটা হঠাৎ অগ্নিশর্মা হয়ে বললে,—ছ'টাকা নেবো না, আট টাকা দাও!

বললাম, ভোজরাজ ছ'টাকার বেশী দিতে মানা করেছে?

তব নেহি দেগা?—চোখ দুটো তা'র রক্তজবার মতো।

নেহি!

সহসা সে হিংস্র হয়ে উঠলো এবং নিজের প্যাণ্ট ও কোটের সমস্ত পকেটগুলি তল্লাস করতে লাগলো, ভোজালীখানা আছে কিনা। পথ জনহীন। ধর্মশালার ভিতর থেকে জনৈক দাসী স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসেছিল, সে আবার ভিতরে গা ঢাকা দিল। ড্রাইভার দুর্বোধ্য জড়িত ভাষায় কি যেন বলছে। কিন্তু পকেটের মধ্যে, গাড়িতে এবং ড্রাইভারের কাছে কোনোমতেই যখন সেই অস্ত্রখানা খুঁজে পাওয়া গেল না তখন তীব্র রক্তবর্ণ চক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে লোকটা বললে, দশ মিনিট ঠাহরো, হাম আতা হ্যায়! অর্থাৎ কুক্‌রি কিংবা ভোজালী নিয়ে সে মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরবে! লোকটা খুনে, চোখে মুখে প্রকাশ।

গাড়ি নিয়ে চ'লে গেল। আমি চেয়ে রইলুম সেই দিকে।

ঠিক বলা কঠিন, শীতে কাঁপছি কিংবা প্রাণভয়ে ঠকঠক করছি। বোধ হয় তখন এক পেয়ালা চায়ের প্রয়োজন ছিল। হোটেল অথবা ধর্মশালায় ঢুকে যদি আশ্রয় নিই, তবে লোকটা এখনই এসে ভিতরে ঢুকে একটা হাঙ্গামা বাধাবে,—তা'র চেয়ে বরং পথের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকা ভালো! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম। সেটা শেষ হোলো,—আরেকটা। সেটাও শেষ ক'রে তৃতীয় সিগারেট ধরালুম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সামনের কোনো কোনো বাড়ির কাঁচের শার্সির ভিতর থেকে আলো দেখতে পাচ্ছি। শীতে হাত পা অবশ হয়ে আসছে। আধ ঘণ্টারও বেশী উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব হোলো না। ধর্মশালা ছেড়ে এপারে এসে উঠলুম হোটেলে। সামনের ওই গোল কাঁচের ঘরটায় থাকবার অনেককালের ইচ্ছা। এবারে স্থির করেছিলুম, কোনো চেনামহলে গিয়ে উঠবো না।

ঘরটিতে দুটি মানুষের মতো ব্যবস্থা। কিন্তু মরসুম আরম্ভের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। খদ্দের নেই। অতএব আমিই রইলুম একলা ঘরে কিন্তু চা খাবার পরেও অস্বস্তি গেল না। এখনও লোকটার দেখা নেই। হঠাৎ যদি সে ঘরে এসে ঢোকে কুক্‌রি হাতে নিয়ে, তাহলে দুটো টাকা বেশী দিয়ে লোকটাকে শান্ত করবো কিনা ভেবে দেখছিলুম। স্থির করলুম, না টাকা দেবো না!

কিন্তু এমন বেকারের মতো ব'সে থাকাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া তুষার-পীড়িত সন্ধ্যার দার্জিলিং এর আগে আমার দেখা হয়নি। শীতজর্জর হিমাচ্ছন্ন ম্যাল্, ওই অবজারভেটরির ওদিকটা, ওই নীচে দিয়ে গির্জার বাগানের পথ, জলাপাহাড়ের নির্জন অঞ্চলটা, সেই আমার পুরনো বেঞ্চি ক'খানা,—ওদেরকে একবারটি দেখে আসি। দেখিনি ওদের চোদ্দ বছর হোলো। সুতরাং সেই একই পোশাকে বেরিয়ে পড়লুম হাত দুটো পকেটে পুরে। হোটেলের মল্লিক-মশাই একবার উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, আপনার কি না গেলেই নয়?

ওঁর বোধ হয় ভয় ছিল সেই খুনে লোকটাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এত ঠাণ্ডায় মদের নেশা তা'র অনেকটা কমেছে। মল্লিকমশাইকে অভয় দিয়ে আমি পথের নীচে নেমে গেলুম। অন্ধকার হয়ে এসেছে।

ফেব্রুয়ারী শেষ হ'তে চলেছে, মাত্র দিন চারেক বাকি। মার্চের বাতাস বইবে আর কয়েকদিন পর। সেই বাতাসের পরে নামবে বসন্তকাল। কিন্তু আজকের এই কুহেলীঢাকা শীতার্ত সন্ধ্যারাত্রে সেই দার্জিলিংয়ের কল্পনা হাস্যকর। পথে একটি আলো নেই, একটি দোকান খোলা নেই, একটি মানুষের সাক্ষাৎ নেই। অথচ আটটা এখনও বাজেনি। এই পথ দিয়ে সখের ঘোড়া চ'ড়ে গেছি কতবার,—লেবংয়ের রেসকোর্সের পথ গেছে এই দিক দিয়ে, বার্চ্‌হিলের পথ উঠেছে উপরে, ওপাশে দিয়ে গেলে স্টেশন, নীচের দিকে নামলে লুইস জুবিলী, চৌধুরীদের মোটর কারখানাটা পেরিয়ে বাঁ দিকে নামলে চাঁদমারির বাজার শানবাঁধানো। আমি এক অন্ধকার থেকে অন্য অন্ধকারে জনশূন্য দার্জিলিংয়ে ঘুরে বেড়ালুম। আকাশে তারা নেই, মেঘ করেছে সন্ধ্যা থেকে। বাজারের ওপাশে সেই মন্দিরের থেকে শুনতে পাচ্ছি মৃদু-মৃদু বাদ্য। আজ রবিবার, কিন্তু সমগ্র গির্জাটা যেন নিদ্রিত। অনেক দূরে-দূরে ঘোলাটে আলো জ্বলছে, কিন্তু সেই আলোর চৌহদ্দির বাইরে কোথাও কিছু দেখা যায় না। এমন নিঃসঙ্গ সবহারা প্রাণীচিহ্নহীন দার্জিলিং আমার দেখা বাকি ছিল। ঘণ্টা দুই পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে এক সময় আবার আমি ফিরে এলুম আমার হোটেলে। তাপমাত্রা আরো নেমে গেছে। হাত

পা অসাড় হচ্ছে ঠাণ্ডায়, মুখ থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে আসছে। তুহিনের ঝাপ্টা হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে!

উপযুক্ত সজ্জা এবং বিছানা এবার সঙ্গে ছিল না, বোধ করি সেই কারণেই অস্বস্তি যাচ্ছে না। রাত গভীরের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু বিনিদ্র। যে-কোনো মুহূর্তে এক মদমত্ত ভূটিয়া এসে আমাকে হত্যা করবে, সেই উদ্বেগও রয়েছে। কিন্তু মন পড়ে ছিল এই পথেরই নীচে। এ অঞ্চলটা আগে ছিল নিরিবিলি। এই জনশূন্য পথ ধ'রেই একদা জোৎস্নার আলোয় মায়াচ্ছন্ন লোকে যাওয়া যেতো মায়ামৃগর সন্ধানে!

মনে পড়ছে বহুদিন আগে এক হেমন্তকালের মধ্যরাত্রি। এভারেস্ট হোটেলের কাছে রিক্সায় উঠে বসলো শ্রীমতী আভা আমার পাশে। আভা নামটি সত্য নয়, কিন্তু এই নামেই চলুক। বৈপ্লবিক রাজনীতির ঝড়ঝাপ্টায় তখন বাঙলা দেশ নিত্য আলোড়িত। এণ্ডারসন্ তৎকালে বাঙলার শাসনকর্তা। শ্রীমতী আভা তখন অনেকটা আত্মগোপন ক'রে এখানে রয়েছে নাম বদলিয়ে। অত রাত্রে ঘুম্ পাহাড়ের দিকে যাওয়া মেয়েছেলের পক্ষে সঙ্গত কিনা, সেকথা সেদিন এই বিপ্লবীদলের মেয়ের সঙ্গে আলোচনা ছিল বৃথা। রাজনীতিক কারণে সে-রাত্রে কুমারী মেয়েকে বধূবেশ ধারণ করতে হয়েছিল। সে যাই হোক, রিক্সা টান্‌বে দুজন, এবং পিছন থেকে ঠেল্‌বে দুজন। যাতায়াত তখন মাত্র পাচ টাকা। রাত তখনও দুটো বাজেনি। আকাশে শুক্লপক্ষ। অক্টোবর তখনও শেষ হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে ঠাণ্ডা প্রচুর। দার্জিলিং থেকে ঘুম্ আন্দাজ মাইল পাচেক। রেললাইনের সঙ্গে সঙ্গেই পথ। তখনকার দিনে চোর-ডাকাত অপেক্ষা পুলিশকেই ভয় ছিল বেশী। সুতরাং শহরের সীমানা পেরিয়ে এসে শ্রীমতীর ভয় গেল ঘুচে, ঘোমটার আর প্রয়োজন রইলো না। অনেকটা দূরে আরেকখানা রিক্সা যাচ্ছে এগিয়ে, এ ছাড়া সেই গভীর রাত্রে আর কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। দূরে দূরে পাহাড়ে পড়েছিল ভরা শুক্ল-পক্ষের জ্যোৎস্না, কিন্তু সেগুলিকে একপ্রকার অনৈসর্গিক বিরাট ছায়াদলের মতো মনে হচ্ছিল। স্তব্ধ গম্ভীর পার্বত্যপথ। সাঁ-সাঁ করছিল রাত্রি। যোগ-নিদ্রায় হিমালয় সেদিন অচেতন।

ঘুম্-এ যখন পৌছলুম, তিনটে বাজতে দেরি আছে। কয়েকজন আমেরিকান টুরিস্ট নরনারী এসেছে ঘোড়া নিয়ে, তারাও যাবে 'টাইগারের' চূড়ায়। সামনেই হাঁটাপথ বাজারকে ডানদিকে রেখে উপরদিকে উঠে গেছে। শ্রীমতী আভা আগেই পা বাড়ালো। বোধ করি মাইল দুয়েক পথ। মাঝে মাঝে চক্রাকারে সেই পথ ঘুরে-ঘুরে উঠেছে প্রায় দু'হাজার ফুট। বড় বড় দেওদারের

আর সেগুন-শালের শ্রেণী, এবং নীচের দিকে নেমে এসেছে ছায়া ঝিলিমিলি চন্দ্রালোক। দিনের বেলায় সে-পথ অতি বাস্তব, কিন্তু রাত্রে কাব্যময়। প্রত্যক্ষ বস্তুর উপরে অবাস্তবের আবরণ টানা। দিনের বেলায় বন, কিন্তু জ্যোৎস্না-রাত্রে মায়াকানন। সেই পথ পেরিয়ে শেষরাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটের সময় গিয়ে উঠলুম, 'টাইগার হিল্'-এর চূড়ায়। একটু বেঁকে অন্য পথে গেলে 'সেনচল্' পাওয়া যায়। টাইগারের চূড়ার ঠিক নীচে 'রেস্ট-হাউস।'

এ প্রসঙ্গ বলেছি অন্য এক স্থলে। তবু ওই আমেরিকান-দলের অভব্যতা সেদিন কতকগুলি ভদ্রমনকে কি প্রকার পীড়িত করেছিল সেকথাটা ভুলে থাকা কঠিন। সূর্যোদয় দেখাটা ছিল ওদের পক্ষে গৌণ, মুখ্য ছিল যৌবন-উৎসব। গত যুদ্ধের কালে আমেরিকানদের বহু আপত্তিজনক আচরণের সঙ্গে আমরা অনেকটা পরিচিত। তাদের সেই প্রকাশ্য নোংরামির একটা বীভৎস নমুনা ছিল শেষরাত্রে ওই 'টাইগার হিলের' চূড়ায়। সেই নরনারীদলের উন্মত্ত রসরঙ্গের দিকে তাকিয়ে আমরা সকলেই নির্বোধ ব'নে গেলুম। মেয়েদের বিচিত্র লালসালাস্য, এবং পুরুষদের বিভিন্ন রসরঙ্গ লক্ষ্য ক'রে সকলেই বিস্ময় বিমূঢ়। মুস্কিল ছিল আভাকে নিয়ে, এ রকমটা হবে জানলে তাকে সঙ্গে আনতুম না। তা ছাড়া সে কুমারী হ'লেও একটু বয়স্থা, এবং সন্ত্রাসবাদী দলের মধ্যে তা'র জীবনের শুচিশুদ্ধতার জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল। আমি নিজে কোথায় মুখখানা লুকোবো তাই ভেবে পাচ্ছিলুম না। ওর ওপর চন্দ্রা-লোকটা স্বচ্ছ যে, সাহেব-মেমদের কোনো আচরণই অস্পষ্ট অথবা অদৃশ্য থাকতে পারছে না। অবশ্য অন্ধকার রাত্রি হ'লে অনেকটা ঢাকা পড়তে পারতো। যা দেখতে এসেছি তা ছেড়ে পালানো যায় না। এমন নির্মেঘ পরিচ্ছন্ন আকাশ পাওয়া সব সময় ভাগ্যে হয় না,—এবং অন্তত ঘণ্টা দেড়েক এখানে থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্যটা সম্পূর্ণ দেখে যাওয়া চাই। এ ছাড়া আভাও হয়ত বেশী-দিন বাইরে থাকবে না, যে-কোনো সময়ে তাকে অন্তরীণে নিয়ে যাবে। এই সমস্ত ভেবে আমরা হতবুদ্ধির মতো অপর কয়েকজন অভ্যাগতর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু আমাদের পিঠের পাশে সেই শেষ রাত্রে দশবারোটি আমেরিকান যুবক-যুবতীর স্খলিত জড়িত প্রমত্ত যৌনরঙ্গের অবাধ উদ্দামতা বেড়েই চলতে লাগলো।

শ্রীমতী আভা আড়ষ্ট, আমি হতবাক। আমরা কেউ কারো দিকে তাকাতে পাচ্ছিনে, এবং মুখে আমাদের কোনো কথাও আসছে না। ঠিক এমনি সময়ে শূন্য দিগন্ত রেখায় অজস্র রংয়ের বন্যা মৃত্তিকার তল থেকে নির্গত হ'তে লাগলো। আমাদের সকলের দৃষ্টি ছুটে গেল সেই পরম বিস্ময়ের দিকে।

পৃথিবী তখন নিদ্রায় অচেতন। আকাশভরা জ্যোৎস্না। অন্যদিকে সূর্যের সেই নবজন্ম। প্রবল ঠাণ্ডায় আপাদমস্তক গরম পোশাকে ঢেকে সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমার সেদিনের ডায়েরী থেকে এই অংশটুকু তুলে দিই—

"রাত্রিশেষে সমগ্র দার্জিলিং যখন অঘোর নিদ্রায় অচেতন, শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্র যখন নামছে পশ্চিম পাহাড়ের চূড়ায়, সেই সময় বিশাল তিস্তা উপত্যকার দিগন্তে পৃথিবী সহসা বিদীর্ণ হোলো,—সেই সর্পিল ফাটলের ভিতর থেকে ধরিত্রীর হৃৎপিণ্ড বেয়ে উঠে এলো ভলকে ভলকে লাল বেগুনী নীল সোনালী রক্তোচ্ছ্বাস······সেই নানা বর্ণের ফেনিল রক্তপ্লাবনের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠলো একটি ক্ষুদ্র অগ্নিপিণ্ড! সেটি শিশুসূর্য! অন্ধকার বসুন্ধরার প্রান্তরেখা থেকে রক্তরশ্মি ছুটে গিয়ে গৌরীশৃঙ্গের ললাট শরাহত করলো। কাঞ্চনজঙ্ঘা আর গৌরীশৃঙ্গের আহত ললাট থেকে ঝরঝরিয়ে নেমে এলো গৈরিকের বন্যা! এখানে রবীন্দ্রনাথকে একটুখানি স্মরণ করি—

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়
তোমারই হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারই হউক জয়।"

রেস্ট হাউসে সেই প্রত্যুষে চা-পান ক'রে বিপ্লববাদিনী ভিন্ন পথে চ'লে গেল। দিনের বেলায় শ্রীমতীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকা নিষিদ্ধ ছিল।

* * *

গত জীবনের সেই কাহিনীটুকু স্মরণ করতে গিয়ে আজ রাত পুইয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে অতি প্রত্যুষে চা পানের পর বেরিয়ে পড়লুম। এত ঠাণ্ডা যে, পলকে পলকে হিম হয়ে আসছে সর্বশরীর। তখনও দার্জিলিংয়ের ঘুম ভাঙতে দেরি রয়েছে। প্রত্যেকটি বাড়ি আমার চেনা, ওদের চেহারায় যেন আমার অনেককালের স্নেহ বোলানো। বাঁ দিকে রইলো পাষাণ বিল্ডিং। ওখানে ছিলুম আমি আর শশাঙ্ক চৌধুরী। বেশ মনে পড়ে একদিন নেমে আসছিলুম আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'মায়াপুর' থেকে। পথে এলো প্রবল বৃষ্টি। ছুটতে ছুটতে বাজারের পাশে নেমে আমরা একটি অপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন গৃহগুহায় এসে মাথা বাঁচাবার জন্য প্রবেশ করলুম। ভিতরে কালিঝুলিপড়া হারিকেন্ জ্বলছে। আশেপাশে ময়লা ভুটিয়া মেয়েপুরুষ তিনচারজন। মাঝখানের নোংরা টেবলের সামনে বসেছে একটি রূপবান তরুণ ইহুদী ছেলে। দেশীমদের

বোট্‌কা গন্ধে ভিতরটা আচ্ছন্ন। এটা ভবঘুরেদের আড্ডা। অনেকে মদের বোতল পকেটে নিয়ে এখানে ঢোকে খাবার খেতে।

বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি চলছে, আমাদের পা বাড়াবার উপায় নেই। ভিতরটায় ভয়-ভয় করে। খুন-জখম হয়ে গেলে বাইরে কোনো খবর পৌঁছবে না; যদি কেউ গায়ের জোরে এখানে সর্ব কেড়ে-কুড়ে নেয়, গলা ফাটালেও কেউ সাড়া দেবে না। এমন সময় আমাদের পাশে এসে বসলো আরেকজন গুর্খা, তারও পানাসক্তি প্রবল। নিরীহ শশাঙ্ক সহসা একেবারে চুপ। সে ক্ষীণপ্রাণ, কোনো প্রকার ঝড়ের আঘাত তাকে সইবে না। দেখতে দেখতে গুর্খা আর ইহুদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব জ'মে উঠলো আমার। গুর্খা লোকটি বলতে আরম্ভ ক'রে দিল এক প্রণয় কাহিনী। সে-কাহিনী মধুর, কিন্তু বিয়োগান্ত। বায়ু-পরিবর্তনে এসেছিল বাঙালী যুবক। ওই যেখানে চৌধুরীদের মোটরের গ্যারেজ, ওরই পাশে দোতালায় সে ছিল। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, কিন্তু ভুটিয়া মেয়ের ভালোবাসায় প'ড়ে সে র'য়ে গেল ওখানেই। মেয়েটি কিন্তু লেখাপড়া জানা, এবং সুসংস্কৃত। সহসা একদিন জানা গেল তা'র আগেকার স্বামী এখনও বর্তমান। এদিকে এই ছেলেটিকেও সে বিয়ে ক'রে বসেছে। সুখের ঘরকন্না চলেছিল অনেক কাল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মেয়েটা চ'লে গেল তার আগের স্বামীর কাছে। নতুন ক'রে আবার সে ঘরকন্না পাতলো! এদিকে এই বাঙালী ছেলেটি শান্তভাবে অপেক্ষা ক'রে রইলো কখন্ তা'র ভূটিয়া-স্ত্রী ফিরে আসবে। বহুদিন অপেক্ষা ক'রেও দেখলো সে ফেরে না। অবশেষে সে এক চিঠি পাঠালো। চিঠিতে লিখলো; "তুমি আছ, আমি আছি, সত্য আছে স্থির।" সে-লোকটি আজও রয়েছে ওই বাড়িতে। বিশ বছর হ'তে চলল লোকটা অপেক্ষা ক'রে রয়েছে, কখন্ ফিরবে তা'র ভূটিয়া-স্ত্রী! স্ত্রী রয়েছে ওপাড়ার তা'র প্রথম স্বামীর ঘরে। বিশ বছরের মধ্যে দুজনের আর দেখা হয়নি! শুনেছ কখনও এমন প্রণয় কাহিনী? এমন আজগুবী কাণ্ড?

সুরাগন্ধী প্রৌঢ় ভূটিয়া চুপ করলো। বৃষ্টি ধরেছে ততক্ষণ। আমরা দুজনে ভারাক্রান্ত মনে বেরিয়ে পড়লুম। সে অনেককালের কথা।

আজ আমি একেবারে নিঃসঙ্গ। ম্যাল্ ধরে চললুম সোজা হাঁটতে হাঁটতে। ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন প্রভাতের দার্জিলিং। মুখে চোখে লাগছে সজল শীতল হাওয়া। কোথাও কিছু দেখা যায় না, কুয়াশার সমুদ্রে সমস্ত ডুবে গেছে। আমি চলে এলুম গভর্নরের প্রাসাদ ছাড়িয়ে 'অবজারভেটরির' সামনে বিস্তৃত প্রশস্ত উপত্যকায়। এখান থেকে নানা পথ চ'লে গেছে আশেপাশে নীচের দিকে। একটি মানুষ এখনও কোথাও দেখছিনে। কেবল

যখন 'অবজারভেটরির' পাশ দিয়ে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করলুম, তখন দেখি একটি সাহেব বেরিয়েছে কুকুর নিয়ে। রোদের আভা দেখা যাচ্ছে ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে। আশা হচ্ছে আজ উত্তাপ পাবো।

পথের প্রতি বাঁক, প্রতি পাথর আমার চেনা। মনে হচ্ছে চৌদ্দ বছর পরে আবার ফিরেছি আপন ঘরে। যেন এক জন্ম থেকে এসেছি জন্মান্তরে। প্রতি মূক পাথর আমাকে লক্ষ্য করছে, সেই সেদিনের আমি এসেছি এতকাল পরে। ওদের কুশলবার্তা নিয়ে চলেছি মনে মনে। উত্তরপূর্ব প্রান্তের ওই ছাদঢাকা বেঞ্চিখানা তেমনি শূন্য কিন্তু ওখানে ব'সে যেতো আমাদের সেকালের জটলা, সেই তরুণ যৌবনের সমারোহ। এপাশে সেই প্রাচীন পাইনের ছায়াটা আজও তেমনি নিজেকে মেলে ধরেচে। এখানে সেই আগেকার মতো নিভৃত নির্জনতা! আমার সঙ্গে কা'রা যেন কথা কইছে আশেপাশে। পিছন থেকে ডাকছে, সামনে থেকে ইশারা করছে।

পাশ দিয়ে কয়েকজন তিব্বতী লামা পার হয়ে গেল। আবার সেই ভৌতিক নির্জনতা। সন্তর্পণে পা ফেলছি, পাছে সেই প্রাচীনের ঘুম ভাঙে। এ পথে হারিয়েছি অনেক, হারিয়ে গেছি অনেকবার। কতবার কলরোল ক'রে গেছি এইসব কালের প্রহরী স্তব্ধ দেওদারের নীচে। গায়ে-গায়ে তাদের সবুজ শ্যাওলা ধরেছে। আমার মতো তাদেরও যেন হাজার হাজার বয়স বেড়েছে! এরা যেন আজ শুনতে চায় আমার জীবনের স্বীকারোক্তি। শুনতে চায় আমার ভুল, ভ্রান্তি, ভয়, ভাবনা, ভ্রূকুটির ইতিহাস। হারানো পুরনো দিনের সেইসব বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী!· প্রতারিতের প্রতিহতের প্রবঞ্চিতের ইতিবৃত্ত! হারিয়ে গেছে কত নাম, কত ব্যক্তি কত হাসি কান্না। অসহনীয় সুখ, মহিমময় বেদনা, হর্ষ রোমাঞ্চের নিবিড় অস্বস্তি, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের উৎকণ্ঠ ব্যাকুল ভাবাবেগ। তা'রা নেই কেউ,—কেবল আমার মনে ছড়িয়ে আছে শুক্‌নো পালকের ভিড়, মরা মৌমাছির কঙ্কাল, বাসি মালার ছিন্নভিন্ন অবশেষ, আর সমগ্র দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে অসংখ্য বিলীন পদচিহ্ন,—স্মৃতির তল থেকে উঠে এসে তা'রা যেন আজ আমাকে ঘিরে ধরেছে।

রোদ উঠলো, কুয়াশা স'রে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে নামলুম এসে বাজারের দিকে। রোদ নেমে এসেছে বাজারের প্রশস্ত পথে, কিন্তু তুহিন বাতাস অশ্রান্ত বয়ে চলেছে। আশেপাশে পশারিরা ব'সে গেছে তাদের বিকিকিনি নিয়ে। ওধারে মোটরের স্ট্যাণ্ড। পরিচিত পল্লীর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবো এই ছিল আমার বাসনা। বাজারের মধ্যে লোকজন জ'মে উঠছিল।

সহসা পিছন থেকে একজন ভূটিয়া এসে হাসিমুখে আমাকে একেবারে আলিঙ্গন করলো। ফিরে দেখি, কালকের সেই খুনে লোকটা। সে বললে কস্থর মাপ কিজিয়ে, বাবু। আমার দু'টাকাই পাওনা ছিল, কাল বুঝতে পারিনি। এখানে ভোজরাজের দোকানে এসে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম। আমাকে তুমি মাপ করো!

পকেট থেকে আজ দু'টাকা বা'র ক'রে দিয়ে বললুম, এই নাও, তুমি জল-খাবার খেয়ো। আমারও জিদ চেপেছিল, কিছু মনে করো না।

দুটি টাকা পেয়ে লোকটা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। আমি অন্যত্র চ'লে গেলুম। এই চাঁদমারির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা নীচের দিকে নেমে গেল,—ওর ডানদিকে ছিল থিয়েটারের হল্, আরেকটু এগিয়ে বাঁকের মুখে লাইব্রেরী। ওই থিয়েটার হল্-এ বন্ধুবর বরেন্দ্রকে নিয়ে একদা তন্ময় হয়ে নাটক অভিনয় দেখছিলুম, সহসা এক গোয়েন্দার গন্ধ পেয়ে বরেন্দ্র সেই রাত্রেই সেখান থেকে গা ঢাকা দেয়। দার্জ্জিলিংয়ে আর তাকে দেখিনি। সেটাও বিপ্লববাদের যুগ। পরে জেনেছিলুম, রাজনীতিক হিংসাপ্ররোচনা ও উৎসাহদানের অপরাধে তা'র বিরুদ্ধে মস্ত এক মামলা ঝুলছে। এই ঘটনার বছর চারেক পরে সুদূর শিমলা পাহাড়ের নীচে এক মুসলমান বস্তির গা ঘেঁষে যখন পার হচ্ছিলুম, তখন সেই সন্ধ্যাকালে বস্তির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বরেন্দ্র,—মাথায় পাগড়ী এবং আপাদমস্তক ছদ্মবেশ, তা'কে দেখে সহসা চেনবার জো ছিল না। উর্দু ভাষায় কথাবার্তার ফাঁকে এক সময়ে সে ভয়ে-ভয়ে তা'র পলাতক জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী বলতে লাগলো। সে ছিল সুদর্শন এবং ধনীর সন্তান,—সম্প্রতি একটি পাহাড়ী নারীকে বিবাহ ক'রে ওই জীবনের মধ্যেই তলিয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেক আলাপের পর একসময় তা'কে গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। স্বামী এবং সন্তানের পিতা হিসাবে তার দায়িত্ব ছিল কম নয়। অতঃপর বরেন্দ্রের সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হয়নি। বলা বাহুল্য, কলকাতায় এসে তা'র সংবাদটি আমাকে যথাস্থানে পৌছে দিতে হয়েছিল।

লাইব্রেরী ছাড়িয়ে ডান পাশে একটি সরু সুন্দর পথ গেছে উপর দিকে। ওই পথে একদা বাসন্তীদের বাড়িতে এসে উঠেছিল সেদিনের সেই অমিতা। মেয়েটা কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ উড়িয়ে জেল্ খেটেছিল মাস ছয়েক। অমিতা ছিল অল্পবয়সের বিধবা, সেজন্য তা'র জীবনে বেদনাবোধও ছিল। এমন দিনে কলকাতার রুগ্ন নীরেন্দ্র আমার পরামর্শক্রমে এসে ভর্তি হোলো লুইস জুবিলীর যক্ষ্মাবাসে। নীরেন ছিল যাদবপুরে, সেখান থেকে এখানে। কঠিন ব্যাধি, বাঁচবার আশা কম। আমি গিয়ে একদিন দাঁড়ালুম? নীরেনের মুখ দিয়ে তখন রক্ত

উঠছে, গলার স্বর ভাঙা। হাসিমুখে সে বললে, দাদা, আপনার জন্যেই এখানে বিনামূল্যে জায়গা পেলুম, এ ঋণ ভুলবো না। এখনো কিন্তু আশা হারাইনি!

অমিতা বসে ছিল দার্জিলিংয়ে। সে নীরেনকে গান শোনাবে সকাল-বিকেল, সঙ্গ-সাহচর্য দেবে, এই রইলো ব্যবস্থা। প্রথম থেকে নীরেনের সুশ্রী চেহারা দেখে অমিতা মুগ্ধ। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই শ্রীমতী অমিতা তা'র মনপ্রাণ সঁপে দিল ওই যক্ষ্মারোগীর দুটি পায়ে। নীরেন কিন্তু সেকথা বুঝতেও পারলো না! অমিতা কেঁদে-কেটে আমার কাছে সুদীর্ঘ পত্র দিয়েছিল। নীরেনকে না পেলে তা'র ব্যর্থ জীবন আরো ব্যর্থ হবে! সে নীরেনকে সুস্থ ক'রে তুলবে, এবং বিয়ে করবে। আমি লিখে পাঠালুম, এ উত্তম প্রস্তাব।

পরবর্তীকালে যক্ষ্মারোগী সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠেছিল। অতঃপর বছর পাঁচেক পরে অবশ্য নীরেন এবং অমিতা—উভয়েই বিবাহ করে। তবে নীরেনের স্ত্রী, এবং অমিতার স্বামী—দুজনেই ভিন্ন ব্যক্তি। নীরেন তা'র স্ত্রীকে নিয়ে তখন থাকে টালিগঞ্জে, এবং অমিতা তা'র স্বামী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে মানিকতলায়। দুজনেই তখন সুখী। একজনের সঙ্গে আরেকজনের কস্মিনকালেও দেখা হয় না!

ঘুরতে ঘুরতে একসময় এসে উঠলুম কবিবন্ধু শ্রীমান্ অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়ের ওখানে। তিনি এখানে বর্তমানে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে এবং একজন বিশিষ্ট জনপ্রিয় নাগরিক। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দেখা পেলুম না, তিনি তখন কলকাতায়। একখানা হিজিবিজি চিঠি লিখে রেখে ফিরে আসতে হোলো।

চেনামহলে যাবো না স্থির ছিল। কিন্তু চায়ের লোভে গেলুম অবশেষে। কুটুমবাড়িতে গিয়ে উঠতেই সোরগোল প'ড়ে গেল। চেটে, চুষে, চিবিয়ে এবং গিলে তাঁদের আতিথেয়তাকে তৃপ্ত করতে হোলো। দেখতে দেখতে মাটি ফুঁড়ে উঠলো স্বজনপরিজন বন্ধুবান্ধবাদি। কিন্তু মাত্র দিন দুই। অতঃপর মোটরযোগে রওনা হলুম শুক্‌না জঙ্গলের দিকে। গায়ের ওভারকোট এবং মাথার ব্যালাক্লাভাটি ফেরৎ দিতে হবে বন্ধুবর ভূপেন বক্‌সীকে। তিনি সেই গুল্‌মা মোহরগঞ্জ চা-বাগানের ম্যানেজার।

মোটর ছুটে চললো রেলপথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুম্ পেরিয়ে কার্সিয়ং সোনাদা ছাড়িয়ে তিনধরিয়ার দিকে। সঙ্গে ছিল প্লেনে দমদমা যাবার টিকিট। আজ অপরাহ্ণে বাগ্‌ডোগরা থেকে প্লেনে উঠবো। সন্ধ্যার আগে কলকাতা!

গল্প

দেবতার গ্রাস

তীর্থযাত্রা পথে সাধুসঙ্গ লাভ করবো এই আশায় সেবার নেপালের পথ ধরেছিলুম। আমাদের লক্ষ্য ছিল শিবরাত্রির দিনে বাবা পশুপতিনাথ দর্শন।

রক্সৌল, আমলেকগঞ্জ, ভীমপেডী—এক একটা ঘাঁটি পার হয়ে গেছি। শারীরিক কষ্ট কিছু তেমন হয়নি। তবে নাগরিক জীবনের নিয়মভঙ্গ হ'লে একটু আধটু অসুবিধা এই যা। ভীমপেডী থেকে উঁচু পাহাড় পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুলেখানিতে এসে পৌছেছিলুম কিছু অসময়ে এবং অনাহারে।

আমাদের দলটি সেই আদি ও অকৃত্রিম। অর্থাৎ ভারতের সকল তীর্থপথেই সাধারণত যাদের দেখা যায়—সন্ন্যাসী ভিখারী, আতুর, ছদ্মবেশী ভদ্রলোক, নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধ। ভালো ক'রে পরীক্ষা না করলে কে কোন্ প্রদেশের সহসা চিনবার জো নেই। আমরা দু'জন বাঙালী, কিন্তু তরকারীতে ফোড়নের মতো আমরা ওদের দলে মিশে গিয়েছিলুম। ওদের সঙ্গে পার্থক্য আমাদের কিছু ছিল না। আচার আচরণে, বেশভূষায়, শারীরিক মালিন্যে আর অপরিচ্ছন্নতায় আমরা কারো চেয়ে কম ছিলুম না। আভিজাত্য প্রকাশ পেলে হয় আমাদের ওপর ভিখারীর উৎপাত বাড়বে, নয়ত পোঁটলা-পুঁটলি চুরি হবার সম্ভাবনা। তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্য যে কেবলমাত্র তীর্থ নয়, আমার এই সর্বভারতীয় অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য আরো দু'একজন আছে বৈ কি।

নদী যেমন গোড়ার দিকে শীর্ণ, ক্রমশ স্ফীত,—তেমনি কুলেখানি থেকে চেৎলাঙের পথে সহযাত্রীদের জনতা কিছু বেড়ে গেল। সকলেই পদব্রজে চলেছি। যান-বাহনের কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। রাজ-পরিবার অথবা মহারাজার দলের লোকদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের অবশ্য বাহন আছে, তবে যান বলতে 'ঝাঁপান' ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা অনুর্বর পার্বত্য

উপত্যকার উপর দিয়ে চলেছি। গ্রামবসতির চিহ্ন কোথাও দেখছিনে। কোথায় গিয়ে অবশেষে পৌছব তাও কিছু জানা নেই। তবে শেষকালে রাজার রাজধানী—সে যত সামান্যই হোক, আশ্রয় একটা জুটে যাবেই, মনে এই ভরসা ছিল। যেন আশা আর দুরাশা নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে চলেছি।

চেংলাঙ পৌছবার আগেই আমাদের দল বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে ব্যক্তি একটিও নেই, বরং সবাইকে জড়িয়ে একটা যাত্রীদল। স্ত্রীলোক, পুরুষ, খঞ্জ, কানা, রুগ্ন—অনেক রকম চোখে পড়ছে, কিন্তু সেই বিশেষত্ব-হীন জনসাধারণের লক্ষ্য ছিল এক এবং হাঁটা-চলা-আহার-বিরাম সমস্তটাই বৈশিষ্ট্যবর্জিত। তাই সেখানে মানুষ চোখে পড়ে না, কেবল দেখি জনতা। আর জনতা যে পীড়াদায়ক, নিরর্থক, ক্লান্তিকর একথা তো ইতিমধ্যেই জেনেছি।

চেংলাঙে এসে পৌছে মহারাজার পাকা ধর্মশালা পাওয়া গেল। কিন্তু বহু চেষ্টায়, বহু অধ্যবসায়েও আশ্রয় মিললো না। আমরা নিরুপায় হয়ে বাগমতীর তীরে এসে দাঁড়ালুম। মাঘের শেষের পাহাড়ী শীত, পাশে খরস্রোতা ছোট নদীর তীব্র হাওয়া, অপরাহ্ণ সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে চলেছে, পরিশ্রান্ত শরীর আশ্রয়ের জন্য লোলুপ, —এমনি অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে এক তাঁবু পাওয়া গেল। প্রথমে বাতাস থেকে আত্মরক্ষা, তারপর ক্ষুধার খাদ্য সংগ্রহ—এই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আমরা তাঁবুর ভিতরে ঢুকে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে ভিতরের ঠাণ্ডা ভিজা ঘাসের উপর ব'সে পড়লুম। ভিতরে দু'চার জন যাত্রী আগেভাগে এসে চাটাইগুলো দখল ক'রে জন্তুর মতো প'ড়ে রয়েছে। আমরা ঝুলি নামিয়ে বাতাস বাঁচিয়ে একান্তে জায়গা নিলুম। শীতে পা দু'খানা কনকন করছে।

চাল-ডাল চারটি কি ভাবে ফুটিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করব ভাবছিলুম, এমন সময়ে আবার একটা ছোটখাটো দল এসে আমাদের তাঁবু আক্রমণ করলো। ভিতরে স্থানাভাব ছিল, সুতরাং অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাদের বিদায় দেবার চেষ্টা করলুম। চারপাঁচজন স্ত্রীপুরুষ অন্যত্র চ'লে গেল, কিন্তু দু'জন ওদের মধ্যে কিছুতেই আর নড়তে চাইল না। সকাতর অনুনয়-বিনয় ক'রে তা'রা আমাদের পাশে এসে জায়গা নিল। তাদের আর কোথাও ঠাঁই নেই।

আসন্ন সন্ধ্যায় শীতের কুয়াশার মধ্যে এতক্ষণ নিজেরাই হি হি ক'রে কাঁপছিলুম। নবাগত যাত্রীদের লক্ষ্যই করি নি। ওদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। মাথার দিকে যাতায়াতের পথের পাশে হাত দুই জায়গা কোনোমতে নিজের দখলের মধ্যে নিয়ে সে এবার কম্বলের মুড়ি খুলে ফেললো। স্ত্রীলোকটি হিন্দুস্থানী, পরনে কালাপাড় শাড়ী, গায়ে একটা তুলোর জামা, বয়স বোধ করি ত্রিশ বত্রিশের মধ্যে। মিনিট পাঁচেক আগে যে রকম কাতর মিনতি

জানিয়ে সে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল, এখন গুছিয়ে বসবার পরে তার হাবভাবের কিছু উদ্ধত পরিবর্তন দেখা গেল। ওর চেহারার ভিতরের প্রচ্ছন্ন গর্ব এই তাঁবুর ভিতরকার তুহিন আবহাওয়াকে যেন উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের দ্বারা ইতিমধ্যেই আঘাত করতে আরম্ভ করেছে। মাঝখানে সে নিজের মাথার চুলের রাশি একবার এলিয়ে দিয়ে কাঠের চিরুণীতে আঁচড়ে নিল। বিপুল জনতার ঠেলাঠেলির মধ্যে পথে-পর্বতে এই দু'দিন যে মানব-পশুদলের ভিতর দিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে এসেছি, এই স্ত্রীলোকটি তাদের থেকে সহসা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে যেন উল্কার মতো ছিটকে এসে পড়লো।

আমরা তাকে আশ্রয় দিয়েছি সত্য, কিন্তু তার রাশভারী চেহারা আর পারিপাট্য দেখে এখন নিজেরাই যেন কুণ্ঠিত ও আড়ষ্ট হয়ে রইলুম। নিঃশব্দ অস্তিত্বের দ্বারা স্ত্রীলোকটি যেন এই তাঁবুর ভিতরকার জগতকে শাসন করতে লাগলো।

মাঝখানে একবার উঠে গিয়ে চাল ডাল সিদ্ধ করার বন্দোবস্ত ক'রে আবার এসে তাঁবুতে প্রবেশ করছি, এমন সময় এক বিশালকায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এসে তাঁবুর দরজায় দাঁড়াতেই একটা কোলাহলের ঝড় উঠলো। স্ত্রীলোকটি তাকে লক্ষ্য করেই সহসা ঝন ঝন ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো,—দেখো তো স্বামীজী, দেখো, তো বাবু, বদ্মাস মহারাজটা আবার আসিয়েছে! হামার পিছু লিয়েছে!

হঠাৎ এমন একটা ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাবুর ভিতরে আমরা সকলেই তার এই চীৎকারে চকচকিত হয়ে তাকালুম। সেই বিশালকায় গেরুয়াপরা মহারাজের কাছে আমরা বাঙালী যেন ক্ষুদ্র মানবক! বৃদ্ধ মহারাজের মাথার সুমুখের অংশটা টাকপড়া, পিছন দিকে পাকা চুলের দড়ি ঝুলছে। বললাম, কি, ব্যাপার কি?

স্ত্রীলোকটি বললে, কাল থেকে এই বদ্মাস বুড়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। হামি যেখানেই যাই, এই মহারাজ যাচ্ছে সেখানে। হামার সঙ্গে হাসি, হামার হাতে হাত লাগাইছে! যাও যাও নিকালো। হামার কাছে ওসব হোবে না,—বুঝিয়েছো? যাও, ভাগো।

মহারাজের মুখে দেখলাম, কী প্রসন্ন ক্ষমাসুন্দর হাসি! বিশ্বের নারী জাতির প্রতি কী অপরিসীম স্নেহ!

মেয়েটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলো। কেবল তাই নয়, ক্ষুধাতুর মহারাজের একাগ্র দৃষ্টি থেকে নিজের দেহটিকে গোপন করার জন্য সে চাদরখানা তুলে নিয়ে আবার গায়ে জড়ালো।

অজগর সরীসৃপ যেমন একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসে, তেমনি ক'রে বৃদ্ধ মহারাজ দু'পা নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে এলো। তা'র অসহনীয় স্পর্ধায় মুখ তুলে তাকালুম। বললাম, তোমার কি মতলব, শুনি?

মহারাজ হাসিমুখে বললে, কুছু না।

জায়গা নেই, তবুও ভিতরে আসছ কেন?

আর এক পা এগিয়ে এসে মহারাজ এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু জায়গা খুঁজতে লাগলো। কিন্তু ভিতরে ঠাসাঠাসি; গায়ের জোর ছাড়া এইটুকু পরিসরের মধ্যে সসম্মানে স্থান পাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া অনিচ্ছুক নারীর প্রতি লোকটার এই অধ্যবসায় আমাদের পুরুষের মনে এমন প্রতিরোধ স্পৃহা ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে যে, আমরা ওকে জায়গা দিতে কিছুতেই রাজী নই। কিন্তু ওর চেহারাটা শঙ্কাজনক। মুখের পাকাদাড়ি আবক্ষলম্বিত, হাত দু'খানা বিশ্বামিত্র মুনির মতো লোমশ, দুইটা চোখ সুন্দরবনের বাঘের মতো কপিশবর্ণ,—আর সমস্ত জড়িয়ে চেহারা যেন দৈত্যদলের শেষ বংশধরের মতো বিরাট। ওকে বাধা দেবো কেমন ক'রে, সেই কথাই ভাবছিলুম।

আমার সঙ্গী বললে, যাও চ'লে যাও, এখানে কিছুতেই আর জায়গা হবে না। বেশী কিছু করলে কিন্তু সেপাইকে ডেকে দেবো ব'লে দিচ্ছি।

বিদেশ বিভূঁই—রাজার সিপাইসান্ত্রীর দল হয়ত কাছাকাছি আছে। কিন্তু জনতার কোলাহল পেরিয়ে, শীত বাঁচিয়ে, এই অন্ধকারে অপরিচিত জগতে এবং শ্রান্ত শরীরে কে গিয়ে সিপাইদের খুঁজে বা'র করবে সে হোলো প্রধান সমস্যা। এত তেজ কারো নেই, ক্ষুধার্ত যাত্রীদের পক্ষে এমন উদ্যমেরও অভাব,—স্বয়ং মহারাজও একথা জানে। সুতরাং আমাদের সম্মিলিত মৌখিক প্রতিবাদের নিষ্ফলতা যেমন আমরাও জানি, সেও তেমনি বোঝে।

আবার দু'পা সে এগিয়ে এলো। আমরা নিরুপায় রোষকষায়িত দৃষ্টিতে কেবল তার দিকে তাকালুম। সন্ন্যাসী শিব এই ভাবে পঞ্চশরের দিকে চেয়ে তা'কে ভস্ম করেছিলেন, কিন্তু আমাদের চোখের তারায় সেই বিদ্যুতাগ্নির অভাব। সহসা মনে পড়লো আমাদেরই বা এত গরজ কেন? বাবার দর্শনে এতদূর পথে চলেছি অবশ্যই লৌকিক-সংস্কারমুক্ত হয়ে! একটি নারী তীর্থযাত্রীর সম্ভ্রম রক্ষার ভার স্বয়ং পশুপতিনাথই গ্রহণ করুন, আমরা পার্থিব মোহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলেছি। তাছাড়া স্ত্রীলোকটি স্বচ্ছন্দ স্বাধীন, তার চেহারায় আর চাল-চলনে নির্ভীক লঘুতা, আমাদের সঙ্গেও সে আসেনি, অতএব নিজেকে রক্ষা করার শক্তি তার অবশ্যই আছে। আমাদের চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া এস্থলে আর উপায় কি? তাঁবুতে সর্ব-সাধারণের অধিকার।

অবশেষে অধ্যবসায়ী মহারাজ জায়গা নিল আমাদের কাছাকাছি। কোনও নিষেধ, কোনও বাধা, কোনও প্রতিবাদ তা'কে নিরুৎসাহ করতে পারলো না। পথের কুকুরকে যেমন গভীর বিরক্তি আর অনিচ্ছার সঙ্গে শীতের রাত্রে লোকে আশ্রয় দেয়, স্ত্রীলোকটি সেইভাবে মহারাজকে একপাশে থাকতে দিল। মাঝখানে কেবল ব্যবধানের প্রাচীর তুলে দেওয়ার মতো ক'রে মেয়েটি তা'র পোঁটলা-পুঁটলি সাজিয়ে রাখলো এবং ঝঙ্কার দিয়ে বললে, খবরদার, আমার জিনিস চুরি ক'রো না, ডাকু কোথাকার।

মহারাজ ফুঁ ফুঁ ক'রে হাসতে লাগলো। স্ত্রীলোকটি ঘৃণাভরে তা'র দিকে একবার তাকিয়ে পিছন ফিরে পান সাজতে বসে গেল।

শীতের ঠাণ্ডায় বাইরে পাথরের উনুনে ভিজা কাঠ অতি কষ্টে জ্বালিয়ে আমরা ডাল-ভাত সিদ্ধ করলাম। কিছু আপত্তিজনক খাদ্য আমরা গোপনে সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম, আধসিদ্ধ ডালভাতের সঙ্গে সেই আমিষ বস্তুটি সংযোগ ক'রে পরমানন্দে বাইরের অন্ধকারে বসেই আহার করলুম। আগামীকাল প্রভাতে চেৎলাঙ ছেড়ে যাবো। সিসাগড়ি পার হয়েছি, চন্দ্রাগড়ি পার হ'তে পারলেই কাটমাণ্ডুর সন্ধান পাবো,—এই ছিল আমাদের পথের নির্দেশ। হিসাব ক'রে দেখা গেল, আগামীকাল মধ্যাহ্নে অথবা অপরাহ্নের কাছাকাছি আমরা থানকোট হয়ে রাজধানীতে পৌঁছতে পারবো। বৃটিশ ভারতবর্ষ আমরা পেরিয়ে এসেছি, এখন আমরা আর এক 'হিজ ম্যাজেষ্টি'র রাজ্যে উপনীত।

প্রায় ঘণ্টা দুই আমরা বাইরে থেকে শীতে আড়ষ্ট হয়ে গেছি। কিন্তু উৎকৃষ্ট ও উত্তপ্ত ভোজনের ফলে প্রাণের মধ্যে অসীম পরিতৃপ্তি ছিল। দরকার হলে শারীরিক বল প্রয়োগের দ্বারা নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে তখন আমাদের আর কুণ্ঠা ছিল না। গোপনে একটা গাছের ডালও ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছিলুম। শরীরে এবার শক্তিসঞ্চার হয়েছে। বাবা পশুপতিনাথ তাঁর কর্তব্যভার আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন—এতে আর সংশয় নেই।

তাঁবুর ভিতরে আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু সম্মুখে যে দৃশ্য দেখলাম, তা'তে আমরা স্তম্ভিত। স্ত্রীলোকটি তা'র এলাকার মধ্যে ব'সে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে স্মিতমুখে পান চিবোচ্ছে, আর সেই প্রদীপের আলোর নীচে ঝুঁকে প'ড়ে স্বয়ং মহারাজ সুর ক'রে শাস্ত্রপাঠে নিরত। মাঝখানে পোঁটলা পুঁটলির ব্যবধানটুকু অবশ্য তখনও ঠিক আছে, তবে দুই দিকে দুইজনের বিছানা পড়েছে পরম পারিপাট্য সহকারে। তাঁবুর ভিতরকার অন্যান্য যাত্রীরা পরম ভক্তিভরে করযোড়ে সমাসীন।

এমন স্বর্গীয় মহিমা দর্শন জীবনে কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? বাইরে আঁধিয়ারা রাত্রি, অজানা পার্বত্য তীর্থ পথ, তাঁবুর পারে খরস্রোতা বাগমতীর ঝরো ঝরো শব্দ, মাঝে মাঝে শীতজর্জর অজানা বন্যজন্তুর আর্তকণ্ঠ; আর ভিতরে সংসার কোলাহলহীন এই সংস্কারমুক্ত আবহাওয়া এবং পৃথিবীর লোকযাত্রা থেকে নির্বাসিত আমরা কয়েকটি তীর্থযাত্রী ও স্বল্প আলোকিত তাঁবুর মধ্যে একটি যুবতী নারীর চারিদিকে কয়েকটি জীবন বৈরাগীর মধ্যে শাস্ত্রালোচনা,—এ সৌভাগ্য সামান্য নয়। আমরা ভিতরে গিয়ে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে নিজের জায়গায় বসতেই স্ত্রীলোকটি হাত বাড়িয়ে পান দিতে চাইল এবং তারই দেখাদেখি মহারাজ তা'র তপ্‌লি খুলে সহাস্য স্নেহভরে দুই খণ্ড হরিতকি ও মিছরির টুকরো আমাদের দেবার জন্য হাত বাড়ালো। অবনত মস্তকে আমরা উভয়ের দান গ্রহণ করলুম।

গাছের ডালটা ইতিমধ্যেই লজ্জায় আত্মগোপন করেছে। ওর আর প্রয়োজন নেই। ভাবলুম, দুটোই সত্য। শুনেছি এই রকম একাগ্র যাত্রাপথে রিপুর প্রকাশও যেমন উগ্র হয়ে ওঠে, ভক্তির অতিশয়তাও তেমনি গভীরে নামে। একই শক্তির দুই বিভিন্ন রূপ। মহারাজের স্তিমিত চোখে-মুখে একটি জ্যোতির্ময়তা লক্ষ্য করছি, আর মেয়েটির মুখে-চোখে ঘৃণার বদলে বন্ধুতা। এটি কেমন ক'রে সম্ভব, তীর্থযাত্রার জনতার অন্তর্নিহিত নিঃসঙ্গতায় না এলে বোঝা যাবে না। ওদের উভয়ের এই অন্তরঙ্গতা দেখে আমরা নিজেরাই কিছু কুণ্ঠাবোধ করলুম। এর আগে লোকটার লোলুপ অধ্যবসায়ই দেখেছি, কিন্তু সত্যই তো তা'র পাশবিকতার প্রকাশ এখনও প্রত্যক্ষ করিনি।

কি যেন একটা শাস্ত্রীয় আলাপে মেয়েটির ব্যক্তিগত আলাপে মেয়েটির ব্যক্তিগত আলোচনা উঠলো। শুনলাম তা'র বাড়ি গোরক্ষপুরের ওদিকে, জাতিতে সে কুর্মী, নাম বুঝি রামপিয়ারী। একসময়ে অকপটে সে জানালো, তা'র 'ছেলিয়া' হয় না ব'লে স্বামী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, সে আবার 'বিয়া' করবে। সুতরাং রামপিয়ারী চলেছে বাবা পশুপতিনাথের স্বপ্নাদ্য কবচের আশায়। 'ছেলিয়া' না হ'লে সে তার স্বামীর পায়ের কাছে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করবে, এই হোলো পণ; তা'র সেই জীবনসর্বস্ব 'মরদ' নাকি দেবতুল্য। রামপিয়ারীর এই কাহিনী শুনে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। আমাদের বিশ্বাস, সে তা'র এই তপস্যার পুরস্কার একদিন পাবেই পাবে।

শাস্ত্রালোচনা চললো দীর্ঘকাল। অন্যান্য যাত্রীরা ভক্তিতে গদগদ হয়ে একে একে নিদ্রাভিভূত হোলো। আমরাও এক সময়ে বাবা পশুপতিনাথের শ্রীচরণে রামপিয়ারীকে সমর্পণ ক'রে কম্বল জড়িয়ে কুমড়ার মতো গড়িয়ে

পড়লাম। মোমবাতিটি টিপটিপ ক'রে জ্বলতেই লাগলো এবং বৃদ্ধ মহারাজ অক্লান্ত উদ্যমে সুন্দরী রামপিয়ারীর প্রাণে ভগবৎভাব সঞ্চার ক'রে চললো। বক্তা ও শ্রোতার এমন সংযোগ দুর্লভ বৈ কি।

পরিশ্রান্ত যাত্রীদের অনড় পাথুরে নিদ্রা তীর্থপথিকরা অবশ্যই উপলব্ধি করবে সুতরাং তার বর্ণনা অনাবশ্যক। কিন্তু সেই ঘুমও ভাঙাতে পারে, এমন গণ্ডগোল নিশ্চয়ই আছে।

রাত কত, ঠিক আন্দাজ করা শক্ত। হঠাৎ প্রবল গোলমালে, চেঁচামেচিতে এবং ঝটাপটিতে আমাদের সেই যোগনিদ্রা ভঙ্গ হোলো। ভুলে গিয়েছিলুম আমরা এক দুর্গম তীর্থযাত্রার পথিক, ভুলেছিলুম তুষার দেশের এক নদীর ধারের তাঁবুর মধ্যে আমরা শায়িত। সুতরাং ঠিক কোথায় আছি এবং কি ঘটলো—একথা সেই ঘন অন্ধকারে আন্দাজ করতে গিয়ে আমাদের কিছু সময় লাগলো। তারপর প্রথমেই মনে পড়লো, সেই গাছের ডালটার কথা। সেটা হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে পেলুম না। পরে জেনেছিলুম, মহারাজ সন্দেহক্রমে সেটি হাতসাফাই করেছে।

যাই হোক, আমরা সাড়া দিয়ে ধড়মড় ক'রে উঠতেই রামপিয়ারী উচ্চকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, হামার 'ধরম' আছে, জানিস রে বদমাস? তুমি সন্ন্যাসী হইয়ে 'অওরতের' ওপর জুলুম? চণ্ডাল কাঁহেকা! জানো না হামি সতী মেয়ে আছে?

আবার ঝটাপট শব্দ। বেশ বুঝা গেল, রামপিয়ারী মহারাজের মাথার টাকের ওপর বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছে!

আমাদের উদ্দেশ করে স্ত্রীলোকটি পুনরায় বললে, দেখিয়ে তো স্বামীজী, হামিতো বলেছি ওকে কি, হামি সতী! হামি ওসব নেই! হামার মরদ আছে, ডেরা আছে, হামাকে সতী হয়ে ফিরে যেতে হোবে। তবু—তবু শড়কি-সড়কি হাত চালিয়েছে হামার গায়ে—ওই হারামী-বাচ্ছা, ওই সন্ন্যাসী চণ্ডাল!

মহারাজ এই প্রেমের আঘাত নত মস্তকেই সহ্য করলো। তা'র চোখে-মুখে স্বর্গীয় মহিমা ছিল কিনা অন্ধকারে আমরা দেখতে পেলুম না। কিন্তু সে একেবারে নিস্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে ছিল।

ঝঙ্কার দিয়ে রামপিয়ারী বললে, আচ্ছা, হাত রাখলি হামার হাতে, চুপ ক'রে সহ্য করলাম; হামার মুখে হাত দিলি সহ্য করলাম; লেকিন্ তোহার হাত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে, আর হামি সতী হইয়ে মানিয়ে লেবো?—নিকালো হারামী, বুকের ছাতিতে মারবো লাথ, কুত্তেকো বাচ্চা!

বাইরে নিথর শনশনে রাত্রি। মারামারি ফৌজদারী করবার ক্ষমতা এই

শীতের রাত্রে কা'রো নেই। রাজার সিপাই-পুলিশ এত রাত্রে নিশ্চিহ্ন। গাছের ডালটা হারিয়ে আমরাও প্রায় নিরুপায়। তা' ছাড়া ওই বিরাটকায় দৈত্যকে মারধর করবো,—সেটাও তো বড় অসম্মানজনক!

কোথায় গেল সেই প্রথম রাত্রির ধর্মালোচনা, আর কোথায়ই বা সেই স্বর্গীয় মহিমা! সমস্ত ব্যাপারটা যেমনই লজ্জাকর, তেমনি কদর্য। স্থির করলুম, কাল প্রভাতে এর প্রতিকার করা চাই। লোকজন ডেকে অন্তত এই সন্ন্যাসীর মুখোস খুলে দেওয়া দরকার।

প্রস্তাব করলুম রামপিয়ারী জায়গা বদল করুক। আমরা উঠে যাচ্ছি মহারাজের দিকে, আর রামপিয়ারী আসুক আমাদের এই জায়গায়। অন্তত বাকি ছ'ঘণ্টা রাতটুকুর জন্যে এই ব্যবস্থাই করা যাক্। মহারাজের নাগালের বাইরে সে থাকুক,—যদি কোনমতে তার সম্ভ্রম রক্ষা হয়।

কিন্তু সে গোরক্ষপুরের মেয়ে, বাঙ্গালী ললনা নয়! প্রস্তাব শুনে রামপিয়ারী চোখ পাকিয়ে ভুরু বাঁকিয়ে বললে, কেনো যাবো স্বামীজী তুমাদের হোখানে? এ জায়গা হামার। হামি থাকবো হেখানে জবরদস্তি! সতী মেইয়া কি ভয় কোরে ডাকুকে? যাবে না হামি।

কথাটা খুবই সত্য। সতী মেয়ে যমকেও ভয় করেনি, শাস্ত্রে আছে। সতীর শক্তি, সতীর বিক্রম ও মহিমা আমাদের মতো অকিঞ্চন ভুলে গিয়েছিল। বাস্তবিক রামপিয়ারীর কথায় ভারি লজ্জিত হলুম। বনের পশু, ডাকাত, মৃত্যু—সতীর ভয় কোথাও নেই। আর এ তো সামান্য একজন সন্ন্যাসী। আমরা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিশ্চিত মনে আবার শুয়ে পড়লুম।

ঝঙ্কার থামিয়ে রামপিয়ারী অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সন্ন্যাসীকে এই ভাবে সুপরামর্শ দিতে লাগলো, খবরদার, অনিচ্ছুক স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি প্রকাশ ক'রো না। আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। স্বামী জীবিত থাকতে আমার পক্ষে সতীত্ব বিসর্জন দেওয়া অতীব কঠিন। আর তা ছাড়া দেখতে পাচ্ছ আমার চলন-ধরণ, আমি সেই জাতের মেয়ে নই। এই আমি আবার শুচ্ছি এখানে, আশা করি তোমার মতন একজন বৃদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তি আর আমাকে বিরক্ত করবে না। তোমার দুষ্টামির জন্য তোমাকে মেরেছি, সেজন্য আমি ভারি দুঃখিত।

মোমবাতির আলোটা সে আগেই জেলেছিল। এবার একটা পান খেয়ে এলোচুল গুছিয়ে আবার সে পরম নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়লো। মহারাজের দৃষ্টি স্নেহমধুর; নিমীলিত, নির্বিকার, অথচ সচেষ্ট। এমন ভদ্র ব্যক্তি সহসা চোখে পড়ে না।

রামপিয়ারী এক সময় আবার আলোটা নিভিয়ে দিল।

*　　　*　　　*　　　*

ভোরের দিকেই আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখলুম, তাঁবুর ভিতরকার প্রায় সব যাত্রীই বেরিয়ে চ'লে গেছে। রামপিয়ারী অথবা সেই লোমশ মহারাজের চিহ্নমাত্র নেই। তা'রা একত্র গেল, অথবা পৃথকভাবে—এ আমাদের জানার উপায়ও ছিল না। উদ্বেগও ছিল না। কিন্তু তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমরা বাঁচলুম।

এর পর চেৎলাঙ থেকে বেরিয়ে সকালের দিকে সেই পুরাতন পথ ধ'রে আমাদের যাত্রা সুরু। পথ বহুদূর, মাঝখানে নদী পার হওয়া, তারপর উঁচু দেওয়ালের মতো পাহাড় পেরিয়ে চন্দ্রাগড়ি পর্বতের অরণ্য এবং সেই অরণ্যের ভিতর দিয়ে সরীসৃপের মতো আমাদের অক্লান্ত মন্থর রুদ্ধশ্বাস আরোহণ।

তারপর মধ্যাহ্নের দিকে পাহাড়ের অপর পারের দিকে উৎরাই,—সে-পথ পিচ্ছিল, অরণ্যবহুল, গভীর। নামতে নামতে বহুদূরে কাটমাণ্ডু শহর আবিষ্কার—স্বপ্নপুরীর মতো। দূরে হিমালয়ের দিগন্তব্যাপী তুষারশুভ্রতা—মধ্যস্থলে বিন্দুবৎ নেপালের রাজধানী।

থানকোটে নেমে এসে মোটর পাওয়া গেল। সেখান থেকে কাটমাণ্ডু, মাঝখানে বাগমতীর পুল। পথে ত্রিপুরেশ্বর মন্দির, শহরের সিভিল লাইনে ময়দান ও রাণীবাগ। জলের মধ্যস্থলে একটি মন্দির। শহরে এসে কোনপ্রকারে আশ্রয় লাভ ক'রে অতঃপর পরের দিন এখানে ওখানে ভ্রমণ আরম্ভ। পাটান, স্বয়ম্ভূ, দত্তাত্রেয়, বিভিন্ন পার্বত্য গ্রাম। এর পর মহারাজার কীর্তিকলাপ, নগরের দৃশ্যাবলী দর্শন, ইতস্তত ভ্রমণ।

কাটমাণ্ডু থেকে প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে পশুপতিনাথ। সেখানে গুহ্যেশ্বরী পীঠস্থান, পাশে কৈলাস। শিব-চতুর্দশীর দিনে সেদিন সেখানে মেলা আর মিছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন ধীরাজ অর্থাৎ রাজসম্রাটকে দর্শন করা গেল। তিনি রাজ্য ছেড়ে কোনদিন এক পাও বাইরে যান না। নেপালী শাস্ত্রের নিষেধ।

সপ্তাহখানেক অনেকেই কাটমাণ্ডুতে থাকে, আমরাও রয়েগেলুম। আমাকে শয্যাগত অবস্থায় আসতে হয়েছিল। সে যাই হোক, বাহনের পিঠে চড়ে আবার থানকোট থেকে ভীমপেডী পর্যন্ত আসতে হোল। ফিরবার পথ একই। ভীমপেডী থেকে মোটরে আমলেকগঞ্জ এসে আবার ট্রেন। গাড়ি রক্সৌল অবধি যাবে।

এই কয়দিনে রোগে ও পরিশ্রমে আগেকার সব কথাই ভুলে গিয়েছি।

রামপিয়ারীকেও মনে ছিল না। কিন্তু আমলেকগঞ্জ থেকে ছোট ট্রেনে উঠে তেই রামপিয়ারীকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে সচকিত হলুম। জনতার মাঝখান দিয়ে দূর থেকে সে ছুটতে ছুটতে আসছে আশপাশে লোকের মনে বাসনার ঝড় তুলে! পরনে নীলাম্বরী, আঁটসাঁট দেহ, কপালে সিঁদুর, মুখে চটুল হাসি মাখা। সে ভীড় সরালো না, তাকে দেখে ভীড়ই স'রে দাঁড়ালো।

গাড়িতে উঠে এসে সে আমাদের দেখতে পেলো। হাসিমুখে বললে, স্বামীজী, ঠাকুর আমাকে 'দোয়য়া' করিয়েছেন।

বললাম, বেশ বেশ। এবার দেশে ফিরবে তো?

রামপিয়ারী গদগদ কণ্ঠে বললে, হাঁ। সতীর 'প্রাড়থানা' তিনি শুনিয়েছেন। ছেলিয়া হামার হোবে।

হবে বৈ কি, নিশ্চয় তোমার ছেলে হবে। বাবা পশুপতিনাথের দয়া।

এমন সময় আমাদের অসীম বিস্ময় উৎপাদন করে সেই মহারাজ গাড়িতে উঠে এলো। কাছে এসে তার সেই তপ্‌লি খুলে সস্নেহে আমাদের হাতে দিল ঠাকুরের প্রসাদ। তারপর রামপিয়ারীর একখানা হাত ধরে তুলে অভিভাবকের হুকুমের মতো বললে, উধার চলো।

রামপিয়ারী অনুগত দাসীর মতো নিঃসঙ্কোচে উঠে দাঁড়ালো। হাসিমুখে বললে, দেখিয়েছেন স্বামীজী, মহারাজ হামাকে ছাড়েনি। সাতদিন হামার সঙ্গে থাকবে, আর মন্ত্র দেবে! হামি কি করবে!

দু'জনে গাড়ির অন্যপ্রান্তে একাকী গিয়ে বসলো। গাড়ি ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। আমরা মনে মনে বাবা পশুপতিনাথের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলুম, সতীর কামনা যেন পূর্ণ হয়!

স্ফুলিঙ্গ

কথা বলতে চাইলো না; চুপ ক'রে শুয়ে রইলো পাশ ফিরে। মুখ থেকে কিছু একটা উচ্চারণ করতেও যেন অসীম ক্লান্তি।

কিসের শব্দ বলো তো?

কই?—বাসন্তী একবার যেন কান পেতে শোনে।

ওই যে সাঁ সাঁ করছে! ঝড়ের শব্দ কি?

না হাওয়া লাগছে নারকেল গাছের পাতায়। কানে আঙুল দাও, অন্ধকার সাঁ সাঁ করবে। রাবণের চিতা, জানো তো, জ্বলছে চিরকাল!

তোমার কি জ্বর এখনো ছাড়েনি?—হিরণ্য জানতে চাইলো।

ছাড়বে, একটুও থাকবে না জেনে রেখো।—বাসন্তী ফুঁপিয়ে ওঠে।

কেন বলো তো? একটু একটু জ্বর, একটু একটু কাশি, ভরসন্ধ্যায় আঠা আঠা ঘাম, চোখের কোণে কালি, সারাদিনের ক্লান্তি!

ভালো থাকি শেষ রাত্রে, বাসন্তী বলে, যখন সব চেয়ে অন্ধকার—ঠিক আলো ফোটার আগে।

কেন বলো তো? এ উপসর্গগুলো ভালো নয়, তা জানো?

মাস চারেক পরে হিরণ্য যেন সজাগ হয়ে ওঠে। বলে, না, এ ভালো নয়, সুবেন ডাক্তারকে দেখানো দরকার। শনিবারে আপিস থেকে ফিরেই নিয়ে যাবো।

বাসন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে বললে, মুন্নুর রক্ত-আমাশার জন্য এ মাসে পনেরো টাকা খরচ হয়েছে তা জানো? কাল থেকে ও কি খাবে জেনে এসো।

দুটি দই-ভাত দিলে হয় না? কিন্তু দইয়ের দাম যে অনেক!

ভাত? আর নয়! অত কাঁকর ওর পেটে আর সইবে না।

হিরণ্য চুপ করে রইলো। অখণ্ড শান্তি, যতটুকু রাত বাকি থাকে। সকাল মানে সমস্যা। দেড় বছরের নাটু জ্বরে ভুগছে সতেরো দিন। দুধের গুঁড়ো পাওয়া যেতো বাজারে দেড় টাকায় এক শিশি, এখন আরো চড়া। পুজো না এলে সারা বছরে কাপড়-জামার কথা ওঠে না। মেজমেয়েটা কান্না নেয় সারাদিন,—কেননা তার পেট ভরে না। চিঁড়ে-মুড়ির দর দেড় টাকা, আটা-ময়দা মানে তেঁতুলবিচি! বড় ছেলেটার পড়াশুনো বন্ধ। করলা

আনতে ছোটে ছু'মাইল দূরে, রেশন্ আনতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একবেলা, পড়তি বাজারে গিয়ে আধমরা সব্জি আর দোরসা চুনোচিংড়ি আনে। ইদানীং সংসর্গ তার ভালো নয়।

ঘুম আসছে একটু ?

না গো।

এবারে বোধ হয় মাইনে পেতে দিন দুই দেরি হবে।

বাসন্তীর চোখ জ্বালা করে শেষ রাত্রে, চোখের কোন মোছে বার বার। বললে, কেন ?

ধর্মঘট ! মাইনে বাড়তেও পারে, চাকরিও যেতে পারে।

কিন্তু রেশন্ আর বাড়িভাড়া ? হাতখরচ ?

হিরণ্য চুপ ক'রে চেয়ে থাকে। ভোরের আগে এখন সবচেয়ে বেশি অন্ধকার, ঘন নিগূঢ় রুদ্ধশ্বাস। সুবিধা এই, পাঁচ ছয়টি ছেলেপুলে সবাই খায় না,—জন দুই প্রায়ই থাকে বিছানায়। বাসন্তীর কোন খাইখরচ নেই, নারীজীবন ছাড়া আর কোনো জীবনের কথাও সে জানে না, এই সুবিধা। হিরণ্য চেনে একটা রাস্তা—যে রাস্তাটায় আপিস, মুদির দোকান আর ডাক্তারের বাড়ি। ওই পথটা ধ'রেই যাওয়া যায় মা-গঙ্গার দিকে—যেদিকে শ্মশান। শ্মশান কি সুন্দর ! বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে গেরুয়া-গঙ্গার একেবারে গর্ভে। বটের ঝুরি নেমেছে জলে, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় মন, আর চিতার ধোঁয়ার কী অদ্ভুত জীবনোত্তর গন্ধ ! কী উদাসী হাওয়ার স্বাদ করুণ বৈরাগ্যের।

হিরণ্য হাতখানা বাড়ালো।

কী দেখছ ?

দেখছি তোমার কপাল। বোধ হয় জ্বর নেই, একটু ঘাম—

বাসন্তীর চোখ আবার জ্বালা করে এলো।

নাসপাতি খেতে ইচ্ছে ক'রে ?

না।

পাকা খেজুর ?

বাসন্তী বললে, তোমার চোখে ঘুম নেই কেন ?

হিরণ্য বললে, ঘুম ছিল বছর বারো আগে—যখন বিয়ে করিনি। ঘুমোতে পারতুম, যদি এ যুগে ছয়টি সন্তান না হোতো।

বাসন্তী বললে, ভয় পেয়ো না।

পাবো না ? কেন ?

সবগুলো টি কবে না, এই ভরসা।

হিরণ্যর গলার কাছে একটা পিণ্ড উঠে এলো, ঢোক গিলে সে আবার সেটাকে নামিয়ে দিল। বুকচাপা দেড়খানা ঘর, দেয়ালগুলো কালিঝুলি মাখা,—দিনের বেলাতেও সেখানে যেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। ওরই মধ্যে রান্না, ধোঁয়া থাকে সারাদিন। পুরনো বিছানার দুর্গন্ধ, ময়লা গৃহসজ্জায় ঠাসা ঘর। তক্তার নীচে শোয় দুটো শিশু,—সারারাত মশার কামড়ে ছটফট করে। মেজমেয়েটা রাত্রে চেঁচায় কৃমিরোগে। বড় ছেলেমেয়ে দুটো ছেঁড়া মাদুর হাতে নিয়ে ঘোরে রাত্রের দিকে,—ওপাশের ভাড়াটের একফালি বারান্দায় অবশেষে রাত কাটাবার জায়গা খুঁজে পায়। ঘুমিয়ে পড়লে বাসন্তী আর ডাকে না, খাবারটা বাঁচে পরের দিন সকালের জন্য।

এবার এ বাড়িটা ছেড়ে দিতেই হবে, আর কুলোচ্ছে না।

বাসন্তী কথা বলে না। এবার আলো ফুটবে, এবারে তা'র সারাদিনের মতো অবসাদ দেখা দেবে! বোধ হয় সে চোখ বুজে থাকে।

পনেরো টাকায় কেউ এ ঘরে থাকতো না, বাড়িওলা চাইতে পঞ্চাশ! তার ওপর চায় বেনামীতে সেলামী। এই গোয়ালের ভাড়া পঞ্চাশ? ঠুকুক না নালিশ, কে দিচ্ছে টাকা?

বাসন্তী চুপ করে থাকে।

হিরণ্য বললে, তুমি বাপের বাড়ির চিঠি পেয়েছ?

না।

ওরা আর আমাদের খোঁজ নেয় না কেন বলো তো?

বাসন্তী বললে, নতুন কয়লাখনির মালিক, তাই জন্যে!

হোক না বড়লোক, আমি তো জামাই!

আমি গরীবের বউ। সম্মান নেই!

হিরণ্য উষ্ণ হয়ে বললে, চোরাবাজারে কয়লা বেচলে কি এতই সম্মান পাওয়া যায়?

বাসন্তী বললে, সম্মানের চেয়ে টাকা অনেক বড়!

মনুষ্যত্বের চেয়েও?

থামো।

একটু একটু জ্বর, তা'র সঙ্গে একটু একটু কাশি। সামান্য জ্বর ওঠে ভরসন্ধ্যাবেলা, আঠা আঠা ঘাম। জ্বর ছাড়ে শেষরাত্রে। তারপর সারাদিন অবসাদ, চোখের কোণে কালি।

কলমটা রেখে বেলা ঠিক পাঁচটায় হিরণ্য আপিস থেকে বেরিয়ে পড়ে।

পিছন থেকে কে যেন তাড়া করে, সামনের পথে কে যেন তাকে ভয় দেখায়। ভয় পেয়ে সে বাজারে ছোটে। তা'র পাশের চেয়ারের অমূল্য,—অমূল্যর কাছে এ মাস অবধি চোদ্দ টাকা ধার। আজও নিল ছু'টাকা। হিরণ্য ছোটে বাজারের দিকে। আঙ্গুরের সের পাঁচ টাকা, পাঁচ আনায় একটা নাসপাতি। একটি ডালিমের পাঁচ ছটাক ওজন দেখলে শরীর আড়ষ্ট হয়, —দাম তা'র সাড়ে বারো আনা। হয়ত এক পয়সায় দুটি দানা। এর চেয়ে ভালো ঘি কেনা—যদি ঘি থাকে আজ ভূভারতে। ঘিয়ের চেয়ে ভালো দুধ, কিন্তু জল বিক্রি শাদা রঙের। যাক্ আঙ্গুর-নাসপাতিতে ভেজাল নেই, মুড়ি আর শশায় বিষ মেশাতে পারেনি এখনও ব্যবসায়ীরা।

হিরণ্য ছুটোছুটি করে বাজারে ঢুকে। বাসন্তীকে খাওয়ানো চাই সব চেয়ে যা ভালো। বাসন্তী মানে ছয়টা শিশুর প্রাত্যহিক প্রাণধারণ, বাসন্তী মানে রান্না, বাসন মাজা, ময়লা কাচা, বাসন্তী মানে ঘরকন্নার শৃঙ্খলা। না, আরো কিছু। বাসন্তীর আসল মানে হোলো হিরণ্যর অস্তিত্ব। বাসন্তী এমন একটা আশ্রয়, যার নীচে দাঁড়ালে অসীম নিরুদ্বেগ।

দু'টাকায় দু'দিনের ফল খাওয়ানো। কিন্তু তৃতীয় দিন? হিরণ্য একবার থমকে দাঁড়ায়। হাতের মুঠোয় গোলাপী রঙের একখানা দু'টাকার নোট, বিয়ের দিনে বাসন্তীর গালের রঙ ছিল এমনি,—এ নোটখানা এমনি যাবে শুকনো ফল কিনতে গিয়ে। অমূল্যর কাছে আর ধার পাওয়া যাবে না। মাসকাবারে অনেক দেরী। হিরণ্য থমকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। মুন্নুর রক্ত-আমাশয় আজও সারেনি, নাটুর জ্বর তিন সপ্তাহ, মেজমেয়েটা ভুগছে অনেককাল। এ দু'টাকার মধ্যে তাদেরও দাবী আছে ছোট ছোট। তাদের সামনে রেখে বাসন্তী খাবে না আঙ্গুর, নাসপাতি আর ডালিম। তারা শুকোবে আর বাসন্তী খাবে দুধ? তাদের মাঝখানে ব'সে কি বাসন্তী চিবোবে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি?

কিচ্ছু কেনা হলো না। হিরণ্য ফিরলো। সেই ভালো, এ টাকা দেবে সে বাসন্তীর হাতে। যেমন সে দিয়ে এসেছে সব,—তা'র জীবন, তা'র ভালো-মন্দ, তা'র বর্তমান ভবিষ্যৎ। হিরণ্য ফিরে চললো।

দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে ঘরখানা অন্ধকার,—কিছু ধোঁয়া, কিছু ছায়া, কিছু ভয়, কিছু বা নৈরাশ্য। ওর মধ্যে কান্না নিয়েছে দু'তিনটে, ময়লা বিছানায় পড়ে আছে দু'তিনটে—প্রত্যেকটিই অবাঞ্ছিত। একপাশে অসংখ্য ওষুধের শিশি, অন্যপাশে ঘুঁটে আর কয়লায় স্তূপ। কালিঝুলি-তেল মাখা রান্নার কড়া, ফুটো এলুমিনিয়মের হাঁড়ি, কলাইয়ের চটা ওঠা বাটি, ভাঙ্গা

কাঁচের পেয়ালা। ওরই মধ্যে আছে বাসন্তীর হাতের কলাকৌশল, আছে তার পরিচ্ছন্নতার স্পর্শ, আছে তার সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন। বাসন্তী ভালোই লেখাপড়া শিখেছিল বাপের বাড়িতে।

তবু হঠাৎ সে কেন ছিটকে এলো হিরণ্যর ঘরে! চালচুলো নেই, জমিজমা নেই, পরিবার গোষ্ঠি নেই,—শুধু চাকরির ভরসায় বউ আনা ঘরে? কে জানতো বারো বছরে ছয়টা ছেলেমেয়ে? কেউ বা জানতো দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, মহামারী, যুদ্ধ? জানতো কি কেই পনেরো টাকার কাপড়, আর তিরিশ টাকার চা'ল? কেউ কি ভেবেছিল মাছের দাম চার টাকা, আর ডিমের জোড়া পাঁচ আনা? কেউ কি জেনেছিল স্বাধীন ভারতে অনেক বেশী দুঃখ বাড়বে? ঘরে ঘরে অভিশাপ প্রতিধ্বনিত? প্রাণে প্রাণে ধূমায়িত অসন্তোষ? একথা সত্যি, বারো বছর আগে বাসন্তীর বাবা কয়লা-খনির মালিক ছিলেন না—থাকলে কি আর বাসন্তীর সঙ্গে হিরণ্যর বিয়ে হতে পারতো?

ঘরে ঢুকতেই বাসন্তী বললে, গিয়েছিলে আজ?

কোথায়?

বাসন্তী আর কোন কথা বললে না, কেবল হিরণ্যর পায়ের জুতো জোড়াটা মুছে তুলে রেখে দিল। পরে বললে, ওষুধ এনেছ?

হিরণ্য বললে, ওষুধ? কই না?

তবে এত দেরী হোলো যে?

ওঃ—হিরণ্য জবাব দিল, ভুলেই গেছি, সুরেন ডাক্তারের ওখানে যাবার কথা ছিল বটে, কিন্তু, অনেকদিন পরে, আজ একটু মাঠে গিয়ে বসেছিলুম।

বাসন্তী থমকে দাঁড়ালো। বললে, মাঠে? কোন্ মাঠে? কলকাতায় মাঠ কোথায়?

গলার মধ্যে যেন তা'র কান্না, চোখে আগুনের জ্বালা! মাঠ মানে মুক্তি, মাঠ মানে পলায়ন—সে জানে। ধোঁয়ার থেকে মুক্তি, বিষাক্ত বাষ্পের থেকে ছুটে পালানো। বিয়ে মানে সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের চক্রান্ত এ কথা কি সে জানতো? সে কি জানতো স্নেহমোহবন্ধনের এই বীভৎসতা? সতীধর্মের নাগপাশ?

অনেকবার সুরেন ডাক্তারের কাছে যাবার কথা হয়েছে। কিন্তু হিরণ্যর সাহস হয়নি যাবার। গেলেই ওষুধের ফর্দ। দোকানে দোকানে দামী ওষুধ খুঁজে বেড়ানো,—অবশেষে চোরাবাজারে গিয়ে পাঁচগুণ দামে কেনা। সে-ওষুধ আনা মানে রেশনের টাকা ফুরানো, বাজার খরচ বন্ধ, শিশুদের পথ্যের অভাব। সুরেন ডাক্তার দুধ খেতে বলবে—সেটা ভয়ের কথা।

বলবে গাওয়া ঘিয়ের লুচি, বলবে হয়ত ডিমসিদ্ধ আর মাখন-রুটি,—অর্থাৎ দুর্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। কিছু না হয় তো বলবে, বিদেশে নিয়ে যান, কোনো ফাঁকা মাঠের মাঝখানে, কিম্বা পাহাড়ের ধারে—যার তলা দিয়ে বয়ে যায় স্বচ্ছ ঝরনার ধারা। দুই ধারে শ্যামল প্রান্তর, মধুর সূর্যরশ্মি, অবগাহন করো অবারিত মুক্তির সমুদ্রে। হিরণ্য ভয় পায় সেই লোভাকুলতায়। কোথা যাবে সে ছয়টি সন্তানকে নিয়ে? কত রাহাখরচ? কোথায় পাবে বিদেশে থাকার সেই জায়গা? আপিসের ছুটি ক'দিনের? আবার কি নতুন দেনা ঘাড়ে নেবে।

ঘরের মধ্যে হারিকেনের আলোটা স্তিমিত, হয়ত আজ কেরোসিন আনা হয়নি। চিমনীটা ফাটা, কাগজের আঠা দিয়ে জোড়া। কিন্তু সেই আলোয় ঘর যেন আরো অস্পষ্ট। এর চেয়ে ভালো আলো না থাকা। বরং শান্ত অন্ধকার ভালো, বরং ভালো বুকচাপা অন্ধতা। কিছু দেখতেও চাইনে, কিছু দেখতেও পাইনে। হোক মৃত্যু মানবতার, হোক ধ্বংস দেবত্বের,— চোখের আড়ালে ঘটুক সব। অন্ধকাব থাকলে তো আলোর খরচটাও বাঁচে। বাঁচে দেশালাইর খরচ,—উপরে লেখা দুই পয়সা, কিনতে গেলে এক আনা। কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা ধরাতে যাও, বলবে,—দেশদ্রোহী! অভিযোগ জানাতে যাও, বলবে—শিশুরাষ্ট্র!

রাস্তার থেকে আলোর চিল্‌তে আসে ঘরে, ওতেই কাজ হয়। ছেলে-মেয়েরা যথেষ্ট দুরন্ত নয়, কেননা জীবনীশক্তি কম। উৎপাতের মধ্যে শুধু কাঁদে আর বায়না ধরে। কিছু না পেয়ে নেতিয়ে পড়ে এক সময়ে। বাসন্তী টেনে টেনে তাদেরকে খাইয়ে দেয়। কী খাওয়ায়, অন্ধকারে দেখা যায় না— এই সুবিধা। বড মেয়েটা জেগে থাকে হিরণ্যর না ফেরা পর্যন্ত,—যদি কিছু আনে মুখে দেবার মতো। কিন্তু হিরণ্যর খালি হাত দেখে অবশেষে সে চোখ বোজে। ক্ষীণদৃষ্টি তার একসময়ে সিক্ত হয়ে ওঠে। বাকি ছেলেমেয়েগুলো আছে কোথাও অন্ধকার ঘরের এখানে ওখানে। বাসন্তীও তাদের পাশে অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে আঁচল পেতে শোয়। হিরণ্য দরজার ধারে কাৎ হয়ে ব'সে থাকে। ব'সে ব'সে কী যেন সে ভাবে দীর্ঘকাল। খেতে চাইবে সে অনেক রাত্রে, যখন ঘুম ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

বাসন্তী এক সময় নিজের কপালটা টিপে দেখে। জ্বর এসেছে চুপে চুপে। তা'র সঙ্গে আঠা আঠা ঘাম।

সুরেন ডাক্তারের কাছে অবশেষে একদিন যেতেই হোলো। দু'টাকা

তিনি নেন, পরীক্ষা করেন সযত্নে। তাঁর চেম্বার ঠিক এ পাড়ার চৌমাথার কোণে,—ছোটখাটো অনেকগুলো পথ যেখানে মিলেছে। ডাক্তারের চেম্বার এখানে হওয়াই দরকার! ঊর্ণনাভ জাল ফাঁদে ঠিক আলোর ফাটলের মুখে, যেখানে ছোটখাটো কীটপতঙ্গের অবিরাম আনাগোনা।

বাসন্তীকে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার মুখ গম্ভীর করলেন। বললেন, আরো কিছুদিন আগে আনা উচিত ছিল।

কেন বলুন তো?—কেঁপে উঠলো হিরণ্য।

ডাক্তার বললেন, এক্স-রে হয়ে গেছে কি?

আজ্ঞে না!

এর আগে কোনো ওষুধ?

এক শিশিও না।

অনেকদিন ধ'রে এর চিকিৎসা করা চাই, বুঝতে পাচ্ছেন?

হিরণ্য প্রশ্ন করলো ভয়ে ভয়ে, অসুখটা কি?

সুরেন ডাক্তার তা'র মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন। হিরণ্য ডরিয়ে উঠলো। তারপর অনেকগুলো ওষুধের ফর্দ আর পথ্যের হিসেব নিয়ে দু'জনে ফিরে এলো।

হঠাৎ অনেকদিন পরে খিল খুলে যায় বাসন্তীর মনের। এলোমেলো আলো এসে পড়ে। বাঁধনের বাইরে দেখতে পায় জীবনের একটা নতুন ব্যাখ্যা। বাঁচবার জন্য দূরের থেকে যেন একটা ডাক আসে, জলের তলায়-তলায় যেমন আসে বন্যার সাড়া। এ জীবনটা সত্য নয়, যেটা সে পায়নি সেটাই বড়। বন্ধনের থেকে সর্বাঙ্গীন মুক্তি, সেই জীবনটা। কোনো সন্তানের স্নেহ পৌঁছবে না সেখানে, না পাশবিক মোহ, শৃঙ্খলের ঝঙ্কার শোনা যাবে না পায়ে পায়ে,—সেই অবারিত আত্মিক মুক্তি। সে কি কোনো অপরাধ করেছিল? বিবাহ মানে কি পুরুষের বশ্যতা স্বীকার? শুধু কি সন্তানধারণের চক্রান্ত? দুর্ভাগ্যের আমন্ত্রণ?

তা'র ডাক নাম ছিল মাধু, স্বামীর ঘরে এসে বাসন্তী? সেই মাধুকে ফিরিয়ে আনা চাই,—নিঃসংস্কার নিষ্কলঙ্ক মাধু। মধুমাসে তার জন্ম, ফুল ফোটার মাস। মেধাবতী ছাত্রী ছিল সে। আদরের নাম ছিল বাসন্তী। আদর তা'র ফুরিয়েছে, এখন আসুক ফিরে মাধু। এসে দাঁড়াক্ বাসন্তীর চিতাভস্ম মেখে।

জ্বর হোক তা'র একটু একটু, জরা না এলেই হোলো। কত লোক যায় পথ দিয়ে কত লক্ষ্য নিয়ে। আছে দুর্গত দারিদ্র্যের বাইরে একটা মহাজীবন,

সেই ক্ষুধা বাসন্তী ভুলেছিল, মাধু ভোলেনি। আছে আনন্দ, সজীব চোখে তাকে চিনে নিতে হবে। দেশ নাকি স্বাধীন, কাজ নাকি তার অনেক। পুরনো খবরের কাগজ প'ড়ে সে জেনেছে, তারই মতো অনেক সামান্য মেয়ে হয়ে উঠেছে মহীয়সী। জন্তু থাকে গুহায়, অরণ্যের ছায়ায়, লোকচক্ষের অন্তরালে। মানুষ থাকে বাইরে, মুক্তির মাঝখানে, লোকযাত্রার কোলাহলের কেন্দ্রে। এই দিনানুদৈনিক অতৃপ্তি আর অসন্তোষে বাসন্তীর হোক অপমৃত্যু, মাধুকে উঠতে হবে এর থেকে। পিছন থেকে টান পড়লে চলবে না, মাধুর পিছনের আকর্ষণ নেই। সতীত্বের স্তব করেছে পুরুষ, মাতৃত্বের বন্দনা করেছে সমাজ,—তা'র ফাঁদে ধরা দিয়েছিল বাসন্তী, সেই ফাঁদ ডিঙিয়ে যাবে মাধু। কেননা নারীত্বের আজ আহ্বান এসেছে রাষ্ট্রের থেকে। আজ পূজা পাবে মেয়েরা,—মায়েরাও নয়, সতীরাও নয়।

অপরাধ কিছু নেই হিরণ্যর,- দারিদ্র্য অপরাধ নয়। সে হ'তে পারতো পুরুষ, কিন্তু হয়ে উঠলো শুধু জনক। সেও ফাঁদে পড়ে আঁকুপাঁকু করেছে. বন্ধনজর্জর সে। ঘুমন্ত পুরুষের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো শুধু স্বামী,— প্রেমিক, স্বার্থত্যাগী, দুঃখভোগী। তা'র চোখে আশা নেই, আশ্বাস নেই, আনন্দ নেই,—সে শুধু পিতা শুধু স্বামী গৃহগতপ্রাণ প্রতিপালক সে। তার বাইরে যে পুরুষ, সে শুয়ে রয়েছে মহানিদ্রায়। সে আত্মবিক্রয় করলো বাসন্তীর কাছে,--মাধু রইলো তা'র চোখে কবিকল্পনা; বাসন্তী ক্রীতদাসী হয়ে রয়ে গেল হিরণ্যর পায়ের তলায়, কিন্তু মাধু রয়ে গেল তপস্বিনী অপর্ণা।

চোখের জলে বাসন্তীর আঁচল ভিজে গেল।

মুক্তি? কি প্রকার চেহারা তার? আছে কি তা'র কোনো চেনা পথ? আছে কোনো নিশানা? পিঞ্জরের পাখি আকাশের দিকে ফিরে গান ধরে, কিন্তু শূন্যে তাকে উড়িয়ে দাও—অনন্ত উদার গগনে সে পথ খুঁজে পাবে না, আবার এসে ঢুকবে সেই পিঞ্জরে। মুক্তি হোলো তা'র ক্ষুধামাত্র কিন্তু মনে মনে মুক্তি তা'র কোথা? পথচারিণী মেয়েরা কলহাস্যে কেমন ক'রে হেঁটে যায় পথ দিয়ে? কেমন করে বৈমানিক উড়ে যায় আকাশপথে? কেমন করে নাবিক ভেসে যায় সমুদ্রলোকে? পথের প্রত্যেকটি মেয়ে যেন বাসন্তীরই বাসনা বহন ক'রে চ'লে যায়,—ওরা যেন তারই ছোট ছোট মুক্তিপিপাসা; ওদেরই সঙ্গে ছুটে চলে মাধু, ওদেরই মতো স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে ডাক দিয়ে যায়। আজকে মাধু যেন আর বাসন্তীকে স্থির থাকতে দেয় না। আকাশের মাধু পিঞ্জরের বাসন্তীকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

অমূল্য বললে, ধার ক'রে কদ্দিন চালাবি ?

হিরণ্য জবাব দেয়, আয়ু যদ্দিন।

শুধবি কি দিয়ে ? বাড়ি, গয়না, বীমা, জমি—আছে কিছু ?

চাকরি দিয়ে শোধ করবো।—হিরণ্য ফুঁপিয়ে ওঠে।

অমূল্য বললে, মাইনে পাস একশো কুড়ি, বাড়ি নিয়ে যাস তিয়াত্তর টাকা। বাড়িভাড়া, মুদি, রেশন, ওষুধ—থাকে কিছু তোর ?

হিরণ্যর গলার মধ্যে একটা ঢেউ জমে ওঠে। বললে, কিন্তু টাকা যে চাই !

ডাক্তার কি বললে ?

আমার মন যা বলছে তা'র চেয়ে বেশী কিছু বলেনি।

অমূল্য অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, তোর কি মনে হয়, বাঁচবার কি কোনো আশা নেই ?

হিরণ্য ককিয়ে উঠলো, কা'র কথা বলছিস ?

বলছি তোর, আমার, তা'র—আপিসে যত লোক আছে তাদের সকলের।

ওঃ তাই বল্—আশ্বস্ত হয়ে হিরণ্য চেয়ার টেনে বসলো। আজকে সবাই এক সঙ্গেই মৃত্যুমুখী এইটে যেন তার সান্ত্বনা। সবাই যদি মরে, সেই ত' আশীর্বাদ। হঠাৎ সর্বব্যাপী ভূমিকম্প, দেশব্যাপী বন্যার জলোচ্ছ্বাস,—কিম্বা ওই আজকের একটি সর্বনাশা আণবিক বোমা, একই সঙ্গে সকল সমস্যার চরম প্রতিকার। কেউ বাঁচবে না, এই আনন্দ হিরণ্যর। পাছে কেউ বাঁচে, এই ভয় তার।

অমূল্য বললে, এর প্রতিকার কি জানিস ?

কি ?

কাগজপত্রগুলো সরিয়ে দিয়ে অমূল্য বললে, কি বল্‌তো ?

হিরণ্যর বিদ্যা দৈনিক সংবাদপত্র পর্যন্ত। সে ভাবলো গৃহযুদ্ধ, ধনীহত্যা, বিপ্লব—বড়জোর আক্রমণ শাসনশক্তিকে—যারা আশ্বাস দিয়ে এসেছে এতকাল, যাদের প্রতিজ্ঞা ছিল স্বর্গসুখের, যারা রটিয়েছিল দুধ আর মধু গড়িয়ে যাবে স্বাধীন ভারতে।

শোন্—অমূল্য বললে, এর প্রতিকার হোলো মাইনে বাড়ানো, আর জিনিসের দাম কমানো। এটা বাড়বে, ওটা কমবে—নৈলে আশা নেই। শোন্, আর একবার ধর্মঘট করবি ?

যদি চাকরি যায় ? যদি আপিস উঠে যায় ?—হিরণ্য প্রতিবাদ জানালো।

বিড়ি ধরিয়ে অমূল্য বললে, তারও ব্যবস্থা আছে মনে রাখিস। কেবল

একটু সাহস, একটু জিদ। দেখছিসনে অসন্তোষে সব ভ'রে যাচ্ছে, সবাই মারমুখী,—এখন শুধু একটা ফিন্‌কি, ব্যস, আর দেখতে হবে না!

অমূল্যর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে হিরণ্য সেদিন বেরিয়ে পড়লো। অর্থনীতিশাস্ত্র অতটা তা'র জানা নেই, জানা নেই ধর্মঘটের শেষ ফলাফল। অমূল্যর কথাগুলো তার কানে বাজে। অসন্তোষ তা'র মনে, সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় তা'র ওই সঙ্কীর্ণ ঘরের দেওয়ালগুলো লাথি মেরে সে চূর্ণ করে; মাঝরাত্রে কখনও ভাবে দেশালাইর কাঠির একটা ফিনকি,—জতুগৃহ ভস্মীভূত হোক। যদি কোনো মন্ত্র জানা থাকতো তার—তবে সে শঙ্খের ফুৎকারে ডাক দিত দেশকে,—সকল ব্যবস্থাকে দিত উল্‌টে। জীবনটা কী কুৎসিত, কী নোংরা-ঘুলিয়ে-ওঠা, বঞ্চিতের বুভুক্ষিতের কী কদর্য চিত্তগ্লানিতে জীবনটা নিত্য কিলবিল করে। অমূল্য ঠিক বলেছে, সুখী মানুষরা কখনও বেপরোয়া হয় না! সে বলেছে, প্রত্যেক ব্যক্তিজীবন এখন বিষবাষ্পে ভরা, অপমানে আর অসন্তোষে অগ্নিমুখী। দুঃখ-দুর্দশার জন্য আগে ভাগ্যকে দায়ী করা যেতো,—হিরণ্য সেদিন নাবালক ছিল। এখন সে ভুল ধরা পড়ে গেছে! দেখা যাচ্ছে, গণিতের ফাঁকির থেকে মানুষের দুর্দশার জন্ম হচ্ছে। বাসন্তীর এই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য দায়ী সেই অঙ্কের কারসাজি। অঙ্কটাকে নির্ভুল ক'রে তুলতে হবে সংঘর্ষের দ্বারা,—অমূল্য ঠিক বলেছে।

ঔষধপত্র এবং কিছু ফলমূল আর মাখন নিয়ে হিরণ্য যখন ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো তখন রাত প্রায় নটা। ওপাশের ভাড়াটেদের কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ তা'র ঘরের দরজার পাশে জটলা করেছে। তাদের চাপা আলাপ আলোচনা কানে যেতেই হিরণ্য একটু চমকে উঠলো। ঘরে ঢুকে হিরণ্য দেখলো তা'র রুগ্ন বড় মেয়েটা ব'সে কাঁদছে। হিরণ্য প্রশ্ন করলো, তোর মা কোথায় মুন্নু?

মুন্নু বললে, মা দুপুরবেলায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি।

বেরিয়েছে! ওই রোগা শরীরে? কোথা গেছে?

ছেলেটা বললে, আমরা কেউ জানিনে।

দেড় বছরের ছেলেটা অনেক দিন ধ'রে জ্বরে ভুগছে। মুন্নু তাকে কোলের কাছে নিয়ে শান্ত করছিল। হিরণ্য জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সেইদিকে চেয়ে বললে, দুপুরবেলায় বেরিয়েছে? সে ত' বাইরে যায় না কখনও? কার সঙ্গে গেছে?

মুন্নু বললে, নীরেন-কাকা কে বাবা?

নীরেন-কাকা! কেন রে?

নীরেন-কাকা এসেছিল, আর একজন মেয়ে ছিল সঙ্গে তার। তাদের সঙ্গে মা গেছে!

ওঃ নীরেন! আমার এক মামাতো ভাইয়ের নাম নীরেন! হ্যাঁ মনে পড়েছে। কিন্তু—কিন্তু আমাকে ব'লে যাওয়া উচিত ছিল! তা'ছাড়া রোগা ছেলেমেয়েদের ফেলে এতক্ষণ রয়েছে কেমন ক'রে? আশ্চর্য মানুষ যা হোক—হিরণ্য এবার যেন একটু বিরক্তই হোলো।

মুন্নু বললে, তারা নিয়ে যেতে চায়নি বাবা, মা-ই গেছে জোর ক'রে। তা'রা শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা কত মানা করলো মাকে,—মা শুনলো না।

ছেলেটা এবার একটু সাহস পেয়ে এগিয়ে এলো। বললে, বাবা, জানো ত' যাবার আগে মা কী বমি করছিল!

বমি! বমি কি রে?

মুন্নু বললে, হ্যাঁ বাবা, সে কী বমি,—সব রক্ত। অনেক রক্ত বাবা।

রক্ত!—হিরণ্যর গা ডোল হয়ে এলো। ভগ্ন আর্তকণ্ঠে সে বললে, রক্তবমি? তা'র মানে? তোরা ঠিক দেখেছিস?

আমরা সবাই দেখেছি। ওপাশের ওরাও দেখতে এসেছিল। ওরা কত মানা করলো মাকে—মা তবু গেল।

হিরণ্য আকুলকণ্ঠে বললে, কোথা যাচ্ছে বললে না?

আলোটা টিপ্ টিপ্ করছে। ছায়াগুলো পড়েছে যেন আতঙ্কের। এই ছায়াদলের ভিতর থেকে কে যেন বেরিয়ে তার গলা টিপে ধরতে চাইছে। রক্তবমির রহস্য তার অজানা নয়,—সে ছেলেমানুষ নয়। ওই শরীর নিয়ে সে বেপরোয়া হয়ে বেরিয়ে পড়বে—এও বাসন্তীর পক্ষে অস্বাভাবিক। নীরেন অবিবেচক নয়,—এতকাল পরে দেখা করতে এসে হঠাৎ রুগ্না ভ্রাতৃ-জায়াকে দুপুরের রৌদ্রে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে, এতটা অজ্ঞানও সে নয়। স্বামী বাড়ি নেই, ছেলেমেয়েদের অসুখ, রান্নাবান্নার বিশৃঙ্খলা, নিজে রক্তবমি করেছে—এমন অবস্থায় বাসন্তীর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে জিদ ধ'রে ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে,—এই বা কেমন করে সম্ভব? কোথায় কিছু একটা কথা যেন চাপা থেকে যাচ্ছে, হিরণ্য কোনোমতেই সে-রহস্যের কাছে পৌছতে পারলো না। অন্যদিন এতক্ষণ সে সযত্নে আপিসের জামা-কাপড় ছেড়ে গুছিয়ে রাখতো, আজ কিন্তু সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। দরদর ক'রে ঘাম গড়াতে লাগলো তার কপাল বেয়ে।

হঠাৎ একবার সে বাইরে এলো ছিটকিয়ে। কিন্তু কোথায় যাবে সে

খুঁজতে এতরাত্রে? নীরেনের ঠিকানা তা'র জানা নেই,—কেননা নীরেন বরাবরই থাকে বিদেশে। ওদের সঙ্গে হিরণ্যর যোগসূত্র কম। সুতরাং ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেলে তাকে ব্যর্থ হয়েই আবার ফিরে আসতে হবে।

পাশের ভাড়াটেদের একটি ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপ ক'রে ওধারে দাঁড়িয়ে হিরণ্যকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এবার এগিয়ে এলেন। বললেন, আপনি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন,—হওয়াই স্বাভাবিক।

শুনতে পাই আপনার স্ত্রী নাকি অসুস্থ—

হিরণ্য বললে, তিনি খুবই অসুস্থ!

সে যেন কাঁদলো। ভদ্রলোক সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তবে কিনা আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। আমার ভগ্নী বলছিলেন, আপনার স্ত্রী সিনেমায় গেছেন।

সিনেমায়? কী বলছেন আপনি? অসম্ভব!

অসম্ভব কিছু নয়, হিরণ্যবাবু। দিনরাত ছোট্ট জায়গায় থাকেন, একটু নিঃশ্বেস ফেলতে পান না,—তাই যা হোক একটু সাধ-আহ্লাদ·· মানে, সাধ-আহ্লাদও নয়,—ঘরকন্না আর রোগভোগ থেকে একদিনের জন্যে একটু মুক্তি, একটু আলো হাওয়ায় আমোদ-আনন্দে ঘুরে আসা!

কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি ত' কখনও যেতে চাননি?

ভদ্রলোক বললেন, এটাও স্বাভাবিক, হিরণ্যবাবু। আপনার সঙ্গে দিনরাত তিনি রয়েছেন; দুঃখু-ধান্দা, অভাব-অনটন, ভাবনা-চিন্তে—সবগুলো রয়েছে আপনাকে ঘিরে। ওগুলোকে খানিকক্ষণের জন্যে ভুলতে গেলে আপনাকেও খানিকক্ষণ এড়িয়ে থাকতে হয়—এইটুকুই তাঁর ছুটি। মেয়েদের মন নিয়ে ভাবলে তবেই আমরা মেয়েদের মনের কথা বুঝতে পারি।

হিরণ্য বললে, আপনার ভগ্নী কেমন ক'রে জানলেন তিনি সিনেমায় গেছেন?

বোধ হয় জানিয়ে গেছেন তিনি।

ভিতর থেকে মুন্নু ডাকলো, বাবা,—

হিরণ্য আবার ভিতরে এসে দাঁড়ালো। মুন্নু বললে, মা সেই সিল্কের শাড়ীটা পরে গেছে, বাবা। আর সেই ব্রোকেডের জামাটা। ওই দেখ না তোরঙ্গ এখনও খোলা। আলতা পরলো পায়ে, টিপ পরলো, ওদের ঘর থেকে পাউডার আনলো। মা খুব সেজেগুজে গেছে!

ছেলেটা বললে, বাবা, মা তোমার বাজার করার ছেঁড়া চটিটা পায়ে দিয়ে গেছে। মার পায়ে কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল তোমার জুতো।

থাম্ তুই।—মুন্নু তাকে ধমক দিল।

হিরণ্য এবার গায়ের জামাটা ছেড়ে একটু নিঃশ্বাস নিল। তারপর বাজার থেকে খাবার জিনিস যেগুলো এনেছিল, তার অনেকটা অংশ ছেলেমেয়েদের ভাগ করে দিল। কাল সকালে আবার বাসন্তীর জন্য এনে দিলেই চলবে। কাল সকাল থেকে বাসন্তীর নতুন চিকিৎসার ব্যবস্থাও তাকে করতে হবে। অনেক টাকার দরকার! আপিসের সাহেবকে সব কথা খুলে না বললে আর চলবে না। হিরণ্যর এক ভাগ্নে আছে লোহার কারবারী—তার কাছে গিয়ে কেঁদে প'ড়ে কিছু টাকা আনতে হবে। তার এক বিধবা খুড়ী আছেন খিদিরপুরের কোন্ আশ্রমে, তাঁকে কিছুদিনের জন্য আনতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু তাঁর থাকবার মত জায়গা এখানে কোথায়? দুটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে হিরণ্য যদি বাইরে গিয়ে কোথাও রাতটা কাটিয়ে আসতে পারে, তবে হয়ত এখানে খুড়িমার জায়গা হয়।

বাইরে থেকে গলার আওয়াজ এলো, ছোড়দা!

কে?

আমি নীরেন।

হিরণ্য ব্যস্ত হয়ে বললে, এসো এসো, এত দেরী তোমাদের? আমি সেই থেকে বসে ভাবছি।

তুমি একবার বাইরে এসো, ছোড়দা।

যাই।—কেন বলো ত? তোমার বৌদি কোথায়?—বলতে বলতে হিরণ্য বাইরে এলো।—কই, তোমার বৌদি আসেননি?

একটি তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছে নীরেনের পাশে। নীরেন বললে, কতকাল পরে দেখা তোমার সঙ্গে, ছোড়দা। কিন্তু কথা বলবার সময় নেই, তুমি জামা গায়ে দিয়ে এসো একবারটি।

হিরণ্য ছুটে গিয়ে জামা চড়িয়ে আবার বেরিয়ে এলো।—উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, তোমার বৌদি নাকি তোমাদের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলেন? কোথায় তিনি?

নীরেন বললে, ব্যস্ত হয়ো না, আমি তার ওখান থেকেই আসছি।

তিনি এলেন না কেন?

আসতে পারেননি। ব্যাপারটা যে এমন—আগে জানলে আমি তোমার এখানে আসতুম না ছোড়দা। সব অপরাধ আমাদেরই।

তার করুণ ভগ্নস্বর শুনে হিরণ্য ভয় পেয়ে বললে, কি হয়েছে?

পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে নীরেন বললে, এঁর নাম আভা। আমরা

হু'জনে একই ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছি। আমাদের বিয়ে আসছে মাসের হু' তারিখে। তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিলুম।

আভা বললে, আমরা কখনই সন্দেহ করিনি আপনার স্ত্রী এত অসুস্থ। তিনি আমাদেরকে গাড়ীর মধ্যে বসিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে বেরিয়ে এলেন। কী চমৎকার মানুষ, কী মিষ্টি মেয়ে!

শোন ছোড়দা—নীরেন বলতে লাগলো, আমাদের সত্যিই ইচ্ছে ছিল তোমার এখান থেকে বেরিয়ে সিনেমায় যাবো। বৌদি ধরে বসলেন, তাঁকে নিয়ে যেতে হবে। হঠাৎ এত পীড়াপীড়ি—যাঁকে জীবনে একবার মাত্র দেখেছি—তাঁর কাছে আশা করিনি। আমরা চক্ষুলজ্জায় পড়েই রাজি হলুম।

আভা বললে, রাজি হওয়াই উচিত,—তিনি গুরুজন, একটা সামান্য অনুরোধ তাঁর—আমরা ত আনন্দই পেলুম। হু'জনেই ঠিক করলুম, আপনার আপিস থেকে ফেরার আগেই আমরা এসে পড়বো।

নীরেন বললে, বৌদিদি প্রথমে একটু গম্ভীর হয়েই আমাদের গাড়িতে এসে উঠলেন। ইচ্ছে নেই, অথচ যেন বেপরোয়া। গাড়িতে বসে খানিকক্ষণ আভার সঙ্গে কেমন যেন এলোমেলো গল্প করতে লাগলেন। একবার হাসতে গিয়ে কাঁদলেন। আভাকে একটু আদর করতে গিয়ে ওর হাতে নখ বসিয়ে দিলেন। আভা ত' আড়ষ্ট। যাই হোক সিনেমার টিকিট করে ভিতরে গিয়ে বসলুম। কিন্তু ছবি শেষ হবার আগে হঠাৎ চক্ষু রক্তবর্ণ করে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, কেন আনলে তোমরা আমাকে?

তারপর? হিরণ্য প্রশ্ন করলো।

আভা বললে, তাঁর চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে তাঁকে নিয়ে আমরা উঠে এলুম। বাইরে এসে তিনি হেসে একেবারে লুটোপুটি। বললেন, আমাকে মাঠে নিয়ে চলো।

নীরেন বললে, না, তার আগে বললেন, আমাকে আগে ওই ছোট ছেলেদের বেলুন কিনে দিতে হবে—ওই যেটা হাওয়ায় উড়ে যায়।

হিরণ্য বললে, মাঠে গেলে তোমরা?

ছোড়দা, কি বলবো তোমাকে! আমাদের যাবার আগেই তিনি রাস্তা পেরিয়ে ছুটলেন। আর একটু—একটুখানির জন্যে, নৈলে তিনি মোটর চাপা পড়তেন। তারপর ছুটলেন তিনি মাঠের দিকে। হোঁচট খেলেন হুবার, তবু ছুটলেন। যখন আমরা তাঁকে গিয়ে ধরলুম, তিনি তখন হাঁপাচ্ছেন, মুখখানা রক্তহীন। চেয়ে দেখি পায়ে তাঁর একপাটি চটিজুতো,—আর একপাটি কোথায় তার মনে নেই।

আর্তকণ্ঠে হিরণ্য বললে, তাকে কোথায় রেখে এলে তোমরা ?

নীরেন হিরণ্যকে গলির মোড়ে নিয়ে এলো। সেখানে একখানা মোটর অপেক্ষা করছিল। আভা বললে, আপনি গাড়িতে উঠুন।

তিনজনেই গাড়িতে উঠে বসলো।

নীরেন বলতে লাগলো, আমাদের তখন একমাত্র চেষ্টা কোনোমতে তাঁকে ভুলিয়ে তোমার ওখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া। কিন্তু বৌদি ফিরতে রাজি হলেন না। তিনি ছুটতে চান, তাঁকে ধরে রাখা যায় না।

আভা বললে, একসময়ে চেঁচিয়ে গান ধরলেন। তারপর দেখি নিজের হাতে সিল্কের শাড়ীখানা ছিঁড়ছেন। আমি গিয়ে তাঁকে চেপে ধরলুম।

হিরণ্যর গলার কাছে যেন একটা কুণ্ডলী উঠে এলো। সেটা হ'তে পারে কান্না, হতে পারে তালপাকানো হৃৎপিণ্ডের রক্ত !

নীরেন বললে, তারপর ছোড়দা, মাঠের ঘাসের ওপর প'ড়ে বৌদির কী গড়াগড়ি,—আমরা তাঁকে ধরে রাখতে আর পারিনে। আমি রাগ করলুম এক সময়ে,—কেননা আশেপাশে লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার ধমক শুনে তাঁর কী হাসি !

আভা বললে, তখন আমরা দেখলুম তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে এসেছে ! আমি তাঁকে ধ'রে রইলুম, উনি মোটর ডেকে আনলেন।

কী চিৎকার গাড়ির মধ্যে ! কী সাংঘাতিক আক্রোশ তাঁর মুখে চোখে। কিছুতেই বাড়ি ফিরবেন না !

কোনোমতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তুললুম আমরা। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শান্ত হয়ে বললেন, আঃ !

মোটরখানা সোজা হাসপাতালের ভিতরে এসে ঢুকলো। বেড নম্বর তেরো। রোগীর খবর কি ?—দাঁড়ান্ দেখে আসি।

হিরণ্যর পাশে আভা ও নীরেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে নার্স ফিরে এসে বললে, এখন দেখা হবে না।

কেমন আছেন রোগিণী।

বলবার নিয়ম নেই। আপনারা কে ?

উনি আমার স্ত্রী—। হিরণ্য এগিয়ে এলো।

নার্স মুখের দিকে চেয়ে বললে, অক্সিজেন্ দেওয়া হচ্ছে !

হিরণ্যর সহসা মনে হোলো, সে উন্মাদের মতো প্রশ্ন করে, অক্সিজেন্ কেন ? এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির জল স্থল শূন্যে এতটুকু হাওয়াও কি বাসন্তীর প্রাণধারণের জন্য অবশিষ্ট নেই ? দরিদ্রের ভগবান কি শেষ নিঃশ্বাসটুকুও শুষে নিতে চান্ ?

কিন্তু, না থাক্‌—হিরণ্য, কই, ঈশ্বরবিশ্বাসী ত' নয়! আজ হঠাৎ নিরুপায়ের মতো কেন এই আকুলি-বিকুলি? অপরাধ মানুষের, সমস্ত ব্যবস্থাপনার—যারা বায়ুকে বিষাক্ত করেছে সব দিক থেকে, যারা আজ বাসন্তীকে নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে না! ভগবানের দোষ কি?

একটু আগে জানতে পারলে ভালো হোতো। অমূল্যর কাছে টাকা নিয়ে হিরণ্য এনেছিল দুধের গুঁড়ো, টিনের মাখন, বাক্সখোলা পুরনো ফল, তেলকাগজ মোড়া খেজুর। সেগুলো এসে রাখতে পারতো বাসন্তীর শিয়রে। আর ছিল তোরঙ্গর তলায় বিয়ের সময়কার ঢাকাই শাঁখার জোড়াটা। বাসন্তীর ইচ্ছা ছিল, সোনা দিয়ে শাঁখা জোড়াটা একদিন না একদিন বাঁধাবে। আনলেই হোতো সে দুগাছা। কিন্তু ছয়টি ছেলেমেয়ের কথা হিরণ্যর ভাবতে ভয় করে।

ভোরবেলা চোখের জল ফেলে আভা আর নীরেন বিদায় নিল। যাবার সময় বললে, ছোড়দা, একা তুমি পারবে না। আমরা আবার আসছি, আমরাও শ্মশানে যাবো।

রোগা মুখের উপর বড় বড় দুটো চোখ, কপালে তার চেয়েও বড় সিঁদুরের ফোঁটা, পায়ে আলতা মাখানো,—হিরণ্য চুপ করে চেয়ে থাকে। হোঁচট খাবার ক্ষতচিহ্ন রয়েছে পায়ের মাঝের আঙুলে!

ছোটবেলাকার দেখা একটি দৃশ্য হিরণ্যর মনে পড়ে যায়। ছ্যাকড়া গাড়ির শান্ত নিরীহ ঘোড়া, দেহখানা দুর্বল কঙ্কালের একটি খাঁচা। চাবুক খেয়ে আঘাত বোধ করে না, ছোটে না, প্রতিবাদও জানায় না। সহসা একদিন সেই ঘোড়া, তোড়জোড় ভেঙ্গে শিকল ছিঁড়ে অন্ধগতিতে ছোটে—কোন্‌ দিকে ছোটে সে জানে না। কিন্তু চোখে তার বিপ্লবের ধক্‌ধকে আগুন। অবশেষে সাংঘাতিক পরিণামের মধ্যে পড়ে সেই ঘোড়া থামে। মৃত্যুর ছায়াতে সেই অগ্নিদৃষ্টি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। বোধ হয় যেন সে শান্তি খুঁজে পায়।

রুক্মিনী

নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত, নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত নাই। সেই মুহূর্তগুলি যেন দরজার বাহিরে ধূম ও কুয়াসা জড়ানো শীতের রাত্রির মতোই অসাড়; নির্বাক আর ভয়ঙ্কর। রাজপথে লোক চলাচল থামিয়া গেছে, পাথরের উপর দিয়া লোহার চাকার চলমান আর্তনাদ আর শোনা যায় না, আলোগুলি মুমূর্ষু রোগীর চক্ষুর মতো স্তিমিত হইয়া রহিয়াছে।

বলিলাম, তোমার জন্য এসেছি।

গলিপথের এক দরজায় উঠিয়া মেয়েটি কহিল, ঘরে এসো। বলিয়া হাসিল।

ঘরের দরজায় আসিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এসেছি, তোমার নাম রুক্মিনী তো?

এখন ও নামটা বদলেছি, আমার নাম রোহিনী। তুমি কেমন ক'রে জানলে আমার নাম?

উত্তর দিলাম না, কেবল হাসিলাম। আমার চোখের দৃষ্টি আলোর শিখার মতো কাঁপিতেছিল, দেবমন্দিরের দ্বারে ভক্তের হৃদয়ের মতো থরথর করিতেছিল। বছরের পর বছর পথে পথে ঘুরিয়া আজ এই রাত্রে তাহার সন্ধান পাইয়াছি, আমার উল্লাস প্রকাশ করিবার আর শক্তিও নাই। কিন্তু সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, তুমি কি পিছু পিছু আসছিলে?

বলিলাম, হ্যাঁ।

আমাকে কেমন ক'রে চিন্‌লে?

বলিলাম, আমি তোমাকে চিনি, অনেক কাল থেকে চিনি। মনে পড়ে তুমি বাগবাজারে ছিলে তোমার সেই স্বামীর সঙ্গে?

রুক্মিনী বলিল, স্বামীর সঙ্গে! ও, ছিলুম, ছিলুম, সেই সাধুর আশ্রমের পাশে বস্তিতে। তুমি বুঝি তখন থেকে জানো আমাকে?

বলিলাম, আমি সেই সাধুর আশ্রমে যাতায়াত করতাম। রুক্মিনী, তুমি আমাকে এখনো চিন্‌তে পারো নি?

রুক্মিনী আলোটা লইয়া আসিল, তারপর আমার মুখের উপর তুলিয়া অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিল, তারপর কহিল, না, চিন্‌তে পারছিনে, কে তুমি?

বলিলাম, তোমাকে দেখতুম রাস্তার কলে স্নান করতে. কী রূপ তোমার! কী স্বাস্থ্য! তোমার রাঙা মুখ আর শাদা শরীর ফুটে উঠতো ভিজে মলমলের শাড়ি দিয়ে, তোমার সুগোল সুন্দর হাতের তালে তালে আমার বুকের রক্তে লাগতো দোলা। রাত্রের ধাঁধাঁ নয়, মদের নেশা নয়, ভক্তের ফাঁকা উচ্ছ্বাস নয়। সূর্যের আলোয়, সকাল বেলা, রাজপথে, লোকজনের সমারোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতুম তোমাকে। কী রূপ তোমার!

রুক্মিনী আবার আমাকে একবার লক্ষ্য করিল কিন্তু বুঝিলাম, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে আমাকে চিনিতে পারিল না।

আমি বলিলাম, আঃ সে কী দিন! আকাশের নীল উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে কাঁপতো আমার প্রাণ! সমুদ্রের তরঙ্গের ওপরে যেমন কাঁপে প্রভাত-

সূর্য। আমি তোমাকে দেখতাম। ভুলে যেতাম আমি সন্ন্যাসীর আশ্রমের মানুষ, ভুলে যেতাম আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান।

রুক্মিনী বলিল, ভেতরে এসে বসো।

এই বসি। রুক্মিনী, এবার তোমাকে পেয়েছি বহু সাধনায়, বহু আরাধনায়। এই বলিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া অনর্গল উচ্ছ্বাস করিতে লাগিলাম, তুমি আমার কল্পান্তকালের মেয়ে, তোমার দুই চোখে আমার জীবন আর মৃত্যু, তোমার দুই হাতে সৃষ্টি আর প্রলয়! আ, কী সুন্দর তুমি।-কেন সুন্দর জানো? তোমার চোখে সেদিন ছিল অদ্ভুত শুচিতা, অদ্ভুত সারল্য। আমি স্ত্রীলোক চাইনে, চাইনে পতিতা, আমি চাই তোমাকে। মনে আছে তুমি সেদিন আমাকে কী বলেছিলে?

রুক্মিনী বিছানার উপর বসিল। বলিল, মনে নেই তো?

বলিলাম, আমার মনে আছে, তোমার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি চোখের পলক। তুমি হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলে, বাবু, তুমি কি আমাকে পছন্দ করেছো?—আ, রুক্মিনী, তোমার সেই হাসি, সেই তোমার বাহুলতার আন্দোলন, আমার আর সন্ন্যাসীর আস্তানা ভালো লাগে নি।

রুক্মিনী হাসিয়া আমার হাত ধরিল। কহিল, পাগল। এত মদ খেয়ে এসেছ কেন?

এবার হাসিমুখে বলিলাম, কই, খুব নেশা হয় নি তো?

তোমার চোখ যে লাল?

লাল চোখ তোমার জন্যে। তোমার স্বপ্নে চোখ লাল। তোমার কল্পনায় কালো রাত রাঙা, আমার প্রাণপদ্ম রক্তাক্ত।

কতদূর থেকে আসছিলে সঙ্গে সঙ্গে?

ও, অনেক দূর। চার বছর ধ'রে পথ হাঁটছি তোমাকে পাবো বলে, তোমার কাছে এসে পৌঁছবো ব'লে। আজ চার বছর ধ'রে তোমাকে স্বপ্ন দেখছি, রুক্মিনী।

রুক্মিনী আলোটা দূরে রাখিয়া আসিল। আলোটা কিছু ক্ষীণ, তাহার দরিদ্র ঘরের বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। কিন্তু আমার রাঙা চোখের ভিতরে অদ্ভুত মোহ, মনোহর আত্মবিস্মৃত স্বপ্ন। আবেশ বিলোল দৃষ্টিতে আমি রুক্মিনীর দিকে চাহিয়াছিলাম। দেখিলাম তাহার বাহু, তাহার বিশাল কালো চোখ, তাহার বক্ষের সুডৌল ঐশ্বর্যসম্ভার, তাহার পাথর কাটা কঠিন দেহ।

আমি ভাবিতে পারি না রুক্মিনী পতিতা। পতিতা বলিয়া তাহাকে মনে করিতে আমার লজ্জা করে। প্রথম যেদিন তাহাকে দেখি, তাহার

মুখে ছিল্ল সুন্দর, শুভ্র পবিত্রতা, কৌমার্যের বিশ্বজয়ী লাবণ্য···যে লাবণ্য আমার জাগরণে স্বপ্নে ও চিন্তায় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিত।

কী দেখ্‌ছ? রুক্মিনী জিজ্ঞাসা করিল।

তাহার ললিত কণ্ঠে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম। নেশার ঝোঁকে গলগল করিয়া আমার মুখ দিয়া নির্বোধ অর্থহীন বন্যা বাহির হইতে লাগিল। ফুলিয়া ফাঁপিয়া বলিলাম, দেখছি নিজেকে তোমার আয়নায়। তুমি আমার প্রিয়তমা। এই আলো সাক্ষী, সাক্ষী ওই অন্ধকার রাত্রি—ফুলের গন্ধে আমার প্রাণের মন্দির ভ'রে গেছে। আমার জীবন মরণকে তুমি মুগ্ধ করেছ রুক্মিনী, তোমার চোখে আমার আশা আর আনন্দ। চার বছর যন্ত্রণা দিয়েছ তুমি, অভিশপ্ত করেছ তুমি, প্রেতের মতো শহরের পথে পথে আমি উন্মাদের চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। রুক্মিনী, আমি জানি আমার এই ঐকান্তিক বাসনা যদি ঈশ্বরের দিকে ফেরান যেতো আমি ঈশ্বরকে পেতাম, এই আগ্রহ দিয়ে আনতাম ব্রহ্মাণ্ডকে টেনে, আমি বড় হতাম, সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হ'তে পারতাম, আমার এই কামনা শিল্পীর, বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার। কিন্তু সব এনেছি তোমার পায়ের তলায় - আমার প্রেম, আমার ত্যাগ, আমার স্বপ্ন, আমার বাসনা। আঃ, যেদিন তোমাকে আর খুঁজে পেলাম না সেখানে, কী মনে হোলো জানো? মনে হোলো, ওই আলোর পথ ধরে গিয়ে সূর্যদেবের হৃদ্‌পিণ্ডটাকে ছিঁড়ে আনি, পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে আনি বাসুকীর আত্মাকে, সাগরকে শোষণ ক'রে দিই, আকাশে আকাশে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়ে বেড়াই।

রুক্মিনি তাহার একখানা হাত দিয়া আমার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিল। তারপর বলিল, তুমি আর কোনোদিন আসো নি এদিকে?

কোন্‌দিকে?

এই ধরো মেয়েদের পাড়ায়?

না রুক্মিনী, আমি ঘৃণা করি। আমি ঘৃণা করি এই পাশবিকতাকে, ঘৃণা করি তাদের যারা কুকুরের মতন দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। পয়সা দিয়ে কামুকতা চরিতার্থ করা, বীভৎস সম্ভোগের জীবন যাপন করা····· না, না, আমি ভদ্রসন্তান, সে আমি কিছুতেই পারিনে, রুক্মিনী।

রুক্মিনী কহিল, তুমি যত বড় ভাবছো আমি তত বড় নই।

বড় নও তুমি?—আমি বলিলাম, কিন্তু তুমি পবিত্র, তুমি যদি অশুচি হও আমার আগুনে পুড়িয়ে তোমাকে খাঁটি ক'রে নেবো। পতিতার ঘরে যারা কেবলমাত্র পতিতাকে খুঁজতে আসে তারা পশু, তারা কামুক, আমি

তাদের ঘৃণা করি। আমি এসেছি তোমার মধ্যে সেই মানবীকে আবিষ্কার করতে, যে আমার জলন্ত স্বপ্ন, জাগ্রত আশা, যার মধ্যে পাবো অসীম করুণায় ভরা নারীর মন, স্নেহে আর সেবায় যে-নারী চিরসহনশীল, যার মালিন্য নেই; যার লাল বিলোল কটাক্ষ নেই। তুমিই সে নারী অনাঘ্রাত ফুলের মতো ছিল তোলার রূপ, লাবণ্যভরা তোমার দেহ।

রুক্মিনী হাসিতে লাগিল। কবি পুরুষের সকল কালের স্তাবকতা শুনিয়া চতুরা নারী যেমন করিয়া হাসে—এও তেমনি। সাদরে কহিল, এখনো বিয়ে করোনি দেখছি। বিয়ে হ'লে সেরে যেতো। কিন্তু যাকগে, আজ সে কথা ভুলে যাও! তোমারই মতন একজন আমাকে ঠকিয়ে গেছে, ওই যাকে তুমি আমার স্বামী ব'লে জানতে। আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল রাস্তায়, আমি আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছি পথে পথে।

বলিলাম, তোমাকে আর একদিন দেখেছিলাম, রুক্মিনী।

কবে।

একদিন গাড়ীতে ক'রে যাচ্ছিলে, একটা লোক ছিল সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম অনেক দূর। কিন্তু তুমি হারিয়ে গেলে। তোমার আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। আচ্ছা রুক্মিনী, তুমি টাকা নাও তো?

রুক্মিনী বলিল, নৈলে আমাদের চলবে কেমন ক'রে।

কত তোমাকে দিতে হ'বে?

চার টাকা।

কিন্তু আমি যে এবার থেকে দুবেলা আসবো, আমি যে থাকবো তোমার এখানে?

তাহ'লে কিছু কম দিয়ো।

রুক্মিনী, টাকার কথা তুমি কিছু বলো না। আমি লুকিয়ে তোমার বালিশের তলায় রেখে যাবো, যেন ভুলে টাকা ফেলে গেছি, তুমিও যেন হঠাৎ পেয়ে গিয়ে বাক্সে তুলে রাখবে। টাকা, টাকার বদলে তোমাকে পাবো এমন কথা আমাকে ভাবিয়ো না লক্ষ্মীটি।

রুক্মিনী বলিল, তুমি যদি না রেখে অমনি চ'লে যাও?

এমন কথা তুমি ভাবতে পারো? আঃ, সত্যি দেহের ব্যবসা মানুষকে কত ছোট করে। তোমাদেরো মানুষ প্রবঞ্চনা ক'রে যায়? তারা কি এ কথা বোঝে না যে নিষ্ফল মাতৃত্ব তোমাদের মধ্যে কেঁদে বেড়ায়? তোমরা যে সকলের বড়! পুরুষের সকল লজ্জা তোমরা বহন করো নিঃশব্দে। রাখো সমাজের স্বাস্থ্যশ্রী।

তুমি চুপ করো।—রুক্মিনী বলিল।

বলিলাম, আমি কি জন্য এসেছি জানো? তোমার কাছে ভালোবাসা পাবার জন্য নয়, এসেছি তোমার কাছে আত্মাঞ্জলী দেবো ব'লে। বলো রুক্মিনী, আমার ভালোবাসা তুমি গ্রহণ করবে।

কী বলছো গো ছেলে মানুষের মতন?

বলিলাম, রুক্মিনী, আজ সমস্ত রাত জেগে তোমাকে দেখ্‌ব। আজ দেবো তোমার যোগ্য মূল্য, আজ জানিয়ে যাবো তুমি পতিতা বটে কিন্তু তুমি মেনকা, তুমি উর্ব্বশী; তোমার স্থান যদি মর্ত্তেই নির্দ্ধারিত হ'য়ে থাকে তবে সে আমার মতো ভাগ্যবানের জন্য! রুক্মিনী তোমাকে পেয়েছি বটে কিন্তু এখনো ভালো ক'রে দেখিনি। এই বলিয়া আমি তাহার কাছে সরিয়া গেলাম।

সে আমাকে সরাইয়া দিল, অতি স্নেহে, অতি যত্নে,—যেন আমি তার পরমাত্মীয়, যেন তার প্রাণপ্রিয়। তারপর আমার ললাটে হাত রাখিয়া কহিল, এখনই পাগলামি ক'রো না। আগে বলো, আজ থাকবে তো?

আজ কেবল?—আমি বলিলাম, আজ, কাল, পরশু, মানে আর যাবোই না তোমার এখান থেকে।

তোমার বাড়ীতে কেউ নেই?

না, কেউ নেই। যদি বা থাকে তারা সবাই একদিকে, তুমি অন্যদিকে। একদিকে পৃথিবীর মানুষের দল, অন্যদিকে চন্দ্রকিরণ। রুক্মিনী, আলোটা বাড়াও। চোখে বুঝি তুমি কাজল পরেছ?

একটু পরেছি, এর নাম সুর্মা।

আলোটা বাড়াও।

রুক্মিনী উঠিয়া ঘরের বড় আলোটা বাড়াইয়া দিল। তারপর বলিল, কী দেখতে চাও?

আমিও উঠিলাম। আলোয় ঘর হাসিতেছে, তাহার সঙ্গে হাসিতেছিল রুক্মিনী,—আমার দেবী, আমার দীর্ঘ চার বৎসরের স্বপ্নকন্যা। তাহার কাছে সরিয়া গেলাম। দেখিলাল তাহার চোখে কাজল, কিন্তু তাহারই চারিপাশে কেমন যেন বিগত যৌবনের কুঞ্চন রেখা। সে-চোখে আলো নাই, ঔজ্জ্বল্য নাই—তাহার সহিত যেন গভীর দুষ্কৃতি ও দেহবিলাসের অবসাদ জড়াইয়া আছে। কেমন একটা মলিন ছায়া, যাহার দাগ কেবল পুরাতন গণিকাদের দেহেই মাখানো থাকে। আমার মন অবশ হইয়া আসিল।

বলিলাম, মুখে কী মেখেছ?

আমার কম্পিত কণ্ঠস্বরে সে যেন একটু চমকাইল। বলিল, রং।

রং? সেই রূপ কোথায় তোমার? যে রূপ আমি সেই প্রথম দিন দেখেছিলাম? কই দেখি!—এই বলিয়া আমি একটা প্রস্তাব করিলাম।

রুক্মিনী আমার চেহারায় কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভয় ও ভাবনার সহিত আমার আদেশ পালন করিতে লাগিল। এক সময় হঠাৎ থামিয়া কহিল আমি পারব না।

পারতেই হবে। বলিয়া আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

সে বাধা দিল, আমি বাধা মানিলাম না। আমার চোখের নেশা, মনের নেশা ছুটিয়া গেল। এ আমি কোথায় আসিয়াছি? এ কি সেই রুক্মিনী? আলোর শিখাটা যেন আমাকে রক্তাক্ত জিহ্বা দেখাইয়া বিদ্রূপ করিতেছিল। তাহার স্বাস্থ্য নাই, শ্রী নাই, তাহার রূপ নাই!

অসহ্য ঘৃণায় আমার চোখ ভরিয়া গেছে। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম, এ কি হয়েছে তোমার? কোথায় সেই যৌবন, কোথায় সেই দেবতার সিংহাসন, রুক্মিনী?

আমার গলা ধরিয়া গেল। বীভৎস মাংসস্তূপ, বিবর্ণ, বিশীর্ণ বক্ষ, কদাকার মেদময় স্থূলতা,—আমার সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রুক্মিনী নামের কঙ্কালটি কেবল দাঁড়াইয়া ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। যাহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি সেই রুক্মিনী এই মেয়েটি নয়। সম্ভবত: পতিতাকে আমি খুঁজি নাই, খুঁজিয়াছি সেই লাবণ্যলতাকে। পতিতার ভিতরে আশা করিয়াছিলাম আমার পুরাতন মানসী প্রতিমাকে, অকলঙ্ক যৌবনকে। আমার কল্পনার প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িল।

সে কহিল, তুমি তুমি বুঝি থাকতে চাও না?

আমার চোখে জল আসিয়াছিল। বলিলাম, না, আমি চ'লে যাচ্ছি।

আবার কবে আসবে? কাল?

কোনোদিন আর আসবো না।

উৎকণ্ঠে সে কহিল, বেশ, তবে টাকা দিয়ে যাও। চার টাকা।

তাহাকে টাকা গণিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আর কোনোদিন পতিতালয়ে আসিব না, আজিকার এই করুণ ব্যর্থতাময় দিনটি আমার মনে থাকিবে, সহজে ভুলিব না! রাজপথ দিয়া অন্ধকারে চলিতে চলিতে ভাবিলাম, তবে কি রূপের তৃষ্ণা জীবনকে কেবল কুরূপ করিয়াই তোলে? তবে কি রুক্মিনী বাঁচিয়া নাই, এ তাহার প্রেতিনী? তবে কি হারাইবার জন্যই আজ তাহাকে এতকাল পরে খুঁজিয়া পাইলাম?

আমার বুকের ভিতরে যেন অশ্রু জমিয়া উঠিতে লাগিল,—সে অশ্রু ব্যর্থতার নয়, কেমন যেন নিজের ও সকলের প্রতি অসীম সমবেদনার।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত